"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

৫০শ বর্ষ

(১৩৫৪ মাঘ হইতে ১৩৫৫ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী সুন্দরানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা ৷৷৵৹

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

(১৩৫৪ মাঘ হইতে ১৩৫৫ পৌষ)

উদ্বোধন

'উদ্বোধনে'র নববর্ষ

সম্পাদক

বর্তমান মাঘ মাসে 'উদ্বোধন' পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে দেশ-বরেণ্য মনীষিগণের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়া এই মাসে এই মাসিক পত্রের সচিত্র সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ-সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে বাহির করা হইবে। গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ নবযুগ-প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বার্তাবাহী 'উদ্বোধন' জাতির অভ্যুদয় সাধনের জন্য অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিয়াছে। এই মহান্ উদ্দেশ্যসাধনে এই মাসিক পত্র কতটা কৃতকার্য হইয়াছে তাহা দেশের বুধমণ্ডলী নির্ণয় করিবেন। 'কর্মেই মানুষের অধিকার কিন্তু ইহার ফলে নয়,' এই গীতোক্ত উপদেশের অনুসরণে সন্ন্যাসিসংঘ-পরিচালিত 'উদ্বোধন' পুনরায় তাহার আরব্ধ কর্মে আত্মনিয়োগ করিবে।

ধর্মভূমি ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যুগে যুগে এই দেশে নব নব ধর্মজাগরণের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে নূতন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভগবান শ্রীবুদ্ধ-প্রবর্তিত অভিনব ধর্ম-জাগরণের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং ইহার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বহু স্বাধীন বৌদ্ধরাষ্ট্র, আচার্য শংকর-প্রচারিত নব হিন্দুধর্ম প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিলে সুঙ্গ কণ্ব অন্ধ্র কেশরী গুপ্ত প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুসাম্রাজ্য, সাধু তোকারাম ও রামদাস স্বামীর প্রচারিত ধর্মের অনুপ্রেরণায় ছত্রপতি শিবাজীর চেষ্টায় স্বাধীন মহারাষ্ট্র-রাজ্য, গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিংহের প্রচারিত ধর্মজাগরণকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চনদে স্বাধীন শিখরাজ্য, দক্ষিণ-ভারতে আপ্পার স্বামী, সুন্দরমূর্তি, সম্বন্ধর, মাণিক্য বাসকর প্রমুখ ৬৩ জন 'নায়েনার' বা নেতৃস্থানীয় শৈবাচার্য এবং রামানুজ, তিরুমঙ্গল, তিরুপ্পন আলোয়ার প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য-প্রবর্তিত ধর্ম-জাগরণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পল্লব, পাণ্ড্য চোল চালুক্য কর্ণাট-প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতেতিহাসের এই চিরন্তন নীতির অনুসরণে ইংরেজের আমলেও রামমোহন কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং এই যুগধর্মাচার্যগণের পদাঙ্ক-অনুসরণে অন্যান্য ধর্ম-প্রচারকদের প্রচারিত নব ধর্ম-জাগরণকে আশ্রয় করিয়া ভারতে জাতীয় জাগরণ উপস্থিত হয়। উঁহারই প্রেরণাই যে ভারতে সদ্য স্থাপিত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের মূলে বিদ্যমান, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত তাঁহারা সকলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীনতায় তমসাচ্ছন্ন সুপ্ত ভারতে ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তক রাজা রামমোহন ছিলেন প্রথম জাগ্রত মহাপুরুষ। পরবর্তী কালে তাঁহার মতানুসরণে কেশবচন্দ্র নববিধান স্থাপন করেন। ঠিক এই সময়ে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ কর্তৃক আর্যসমাজ স্থাপিত হয়। এই তিন জন মনীষীই ধর্ম-জাগরণ সহায়ে ভারতে জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করেন। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের প্রবর্তিত ধর্মজাগরণ এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই আন্দোলনের সহিত দেশের জনসাধারণের যোগসূত্র রক্ষিত হয় নাই বলিয়া তাহারা ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইবার সুযোগ পায় নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয়কে অবলম্বন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম-জাগরণ আনয়ন করেন, ইহা শিক্ষিত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তৃত হইতে থাকে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব সাফল্য হইতে ইহার সূচনা হয়। তাঁহার হিন্দুধর্ম-মাহাত্ম্যকীর্তন পাশ্চাত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের করতালি অর্জন করে। এই সংবাদ শুনিয়া পরাধীন ভারতবাসীর আত্মসংবিদ প্রথম জাগিয়া উঠে। এই সময় হইতেই ভারতে সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। ভারতবাসী মনে-প্রাণে অনুভব করে যে, জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহাদের দান করিবার যে অমূল্য ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি আছে তাহা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির নাই।

এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভারতে এক অশ্রুতপূর্ব জাতীয় জাগরণ উপস্থিত হয়। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, বেদাশ্রিত হিন্দুধর্মের অসংখ্য মত ও পথের মধ্যে এক একটি মত ও পথ মাত্র গ্রহণ করিয়া উহাকেই একমাত্র যুগধর্ম বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু সর্বধর্ম-সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও উপদেশালোকে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ সকল ধর্মমত ও পথকেই ভগবান লাভের এক একটি উপায় বলিয়া ঘোষণা করেন। এইরূপে তিনিই সর্বপ্রথমে ভারতের পরস্পর বিবদমান ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যথার্থ ঐক্য স্থাপন এবং হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ সকল ধর্মাবলম্বিগণের সমবায়ে গণতান্ত্রিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পথ দেখান। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপন এবং উহাদের সমবায়ে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র উপায়। সুখের বিষয় যে, অধুনা রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ ভারতের নেতৃবৃন্দ ধর্মক্ষেত্রে সর্বধর্মসমন্বয়রূপ গণতান্ত্রিক জাতীয়তা জাতীয় জীবনে সংহতি স্থাপনের একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ধর্মজাগরণ কেবল ধর্মরাজ্যে গণতান্ত্রিক জাতীয়তা বা ঐক্য প্রতিষ্ঠায়ই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিস্বরূপ বেদান্ত-দর্শনের দৃঢ় ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আত্মার দিক দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষকে এক ও অভেদ এবং নরমাত্রকেই নারায়ণজ্ঞানে সম্মানপ্রদর্শন ও সেবা করিবার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত নর-নারায়ণ-বাদে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষে মানুষে যে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী প্রকটিত, মানব-কল্পনা ইহা অপেক্ষা উন্নত সাম্য-মৈত্রী ধারণা করিতে যথার্থই অসমর্থ। এই বেদান্তবেদ্য সাম্য-মৈত্রীকে কেবল ধর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া রাষ্ট্র সমাজ—এমন কি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উদাত্ত আহ্বানে এই মহান আদর্শ কার্যে

পরিণত করিবার জন্য দেশময় অসংখ্য সংঘ গড়িয়া উঠে এবং দিকে দিকে আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহার অনুপ্রেরণায় ভারতের সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমবায়ে জাতীয়তা-স্থাপন, রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা অর্জন, অর্থনীতিক মুক্তি-সাধন, সমাজের সংস্কারবিধান, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, অবনত ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন, শিক্ষা-বিস্তার, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, দরিদ্র রুগ্ন প্রভৃতিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা, দুর্ভিক্ষ বন্যা ও মহামারীতে সংঘবদ্ধ ভাবে জনসেবা প্রভৃতির জন্য ভারতব্যাপী শত শত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ কর্মী কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। প্রবুদ্ধ ভারতের সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সংগীত প্রভৃতি এক অপূর্ব জাগরণে সঞ্জীবিত হয়। নবজাগ্রত ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাই যে ভারতের সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণের মূলে বিদ্যমান, ইহা বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত। এ যুগে ভগবান লাভের জন্য বাংলার যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যে সকল বাঙ্গালী যুবক ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অশ্রুতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার ও উৎপীড়নভোগ করিয়াছেন এবং সমাজের সংস্কার ও দরিদ্র রুগ্ন অস্পৃশ্য প্রভৃতিকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবার জন্য জীবন বিলাইয়া দিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্য শিল্প চিত্রকলা সংগীত প্রভৃতির উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমের মর্মস্পর্শী বাণীই তাঁহাদের সকলের প্রেরণার উৎস। ভারতের জাতীয় জাগরণ-প্রভাতে তিনি যেরূপ জাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন, এরূপ আর কেহ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলী বক্তৃতাসমূহ পত্রাবলী এবং কথোপকথনগুলিতে যে জাতীয়তার ভাব দেখা যায়, এরূপ আর সেকালে ছিল না এবং অদ্যাবধিও এমনটি সৃষ্ট হয় নাই। ভারতের জাতীয় জাগরণের মূল-প্রস্রবণ স্বামীজীর গ্রন্থাদি 'উদ্বোধনে' প্রথমতঃ বাহির হয় এবং পরে ঐ সকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই জন্য 'উদ্বোধনে'র সহিত বাংলার জাতীয় জাগরণ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। এই কারণে 'উদ্বোধনে'র ইতিহাসকে বাংলার জাতীয় জাগরণের প্রথম ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলার জাতীয় আন্দোলন ক্রমে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া এক শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ইহারই প্রভাবে এক অভূতপূর্ব উপায়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। পরাধীন অবস্থায় ভারতবাসীর অনেক বিষয়ে উন্নতি লাভের একেবারেই সুযোগ ছিল না। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ করায় ভারতের সকল নরনারীর সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন তাহাদের কর্মশক্তির উপরই তাহাদের উন্নতি নির্ভর করে। দেশের সকল নরনারীকে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করা 'উদ্বোধনে'র জীবন-ব্রত। এ জন্য এই মাসিকপত্র একদিকে যেমন দেশের ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা সাহিত্য কৃষি শিল্প প্রমুখ সকল বিভাগে গঠনমূলক কার্য-পরিচালনের আবশ্যকতা প্রচার করে, অপর দিকে তেমন পৃথিবীর সকল দেশে ভারতের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির মাহাত্ম্য প্রচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

পরাধীন ভারতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম পরাধীনতার পরিপোষক, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন, অর্থহীন দেশাচার ও লোকাচার এবং কর্মকুণ্ঠ লোকদেখানো মুক্তিকামের প্রাবল্যে মহা-তামসিক আকার ধারণ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের ধর্মকে এই সকল অনর্থ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। দেশের জনগণের তামসিকতা নষ্ট করিয়া সৎকর্মাশ্রয়ে রাজসিকতা হইতে তাহাদিগকে ক্রমে যথার্থ সাত্ত্বিকতায় উপনীত করাই হইবে ইহার

লক্ষ্য। মানুষের আসুরিক ভাব বিনষ্ট করিয়া দেবভাবের বিকাশ—মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ ইহার একমাত্র আদর্শ। পৃথিবীতে অনেক স্বাধীন জাতির জীবন এইরূপ ধর্মাদর্শে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া আসুরিক ভাবমূলক উৎকট ভোগের আধিক্যে পরিচালিত হওয়ায় তাহাদের সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি নানাবিধ জটিল সমস্যা-সংকুল হইয়া তাহারা উৎসন্ন গিয়াছে। স্বাধীন ভারতবাসীর জাতীয় জীবন—বিশেষতঃ স্বাধীন ভারতের পরিচালকগণের জীবন যদি উন্নত ধর্মাদর্শে দেবভাবের প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত না হইয়া আসুরিক ভাবের আধিক্যে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর অবস্থাও যে ঐরূপ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এইজন্য 'উদ্বোধন' ব্যক্তি ও জাতির জীবন ধর্মের নির্দেশে পরিচালন করিতে সকল নরনারীকে প্রবুদ্ধ করে।

এই মহান আদর্শেই স্বাধীন ভারতের সমাজ এবং রাষ্ট্রকেও পরিচালিত করিতে হইবে। পরাধীন ভারতের সমাজ মানুষে মানুষে জন্মগত ভোগাধিকারভেদ, তৎপ্রসূত অনাচরণীয়তা অস্পৃশ্যতা এবং তৎ-উদ্ভূত ঈর্ষা দ্বেষ অনৈক্য ও অসামঞ্জস্যের লীলাস্থলে পরিণত হইয়াছে। মিথ্যা আভিজাত্যের অভিমান এবং তৎসঞ্জাত মানুষের প্রতি মানুষের অপমান ও অসম্মান ইহার অঙ্গের ভূষণ। স্বাধীন ভারতের সকল নরনারীকে এই সামাজিক দাসত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া স্বাধীন মানুষের উপযুক্ত সম্মান দিতে হইবে। সকল নরনারীকে সকল বিষয়ে উন্নতি সাধনে সমান অধিকার দান করিয়া তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন হইবে ইহার আদর্শ। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রকেও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক আকার প্রদান করা আবশ্যক। পরাধীন ভারতের রাষ্ট্র ছিল স্বেচ্ছাচার সাম্রাজ্যবাদ-মূলক। জনসাধারণকে শাসনে রাখিয়া শোষণ করাই ছিল ইহার লক্ষ্য। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসাধারণের অধিকাংশের অভিমতে পরিচালিত হইবে। জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই হইবে ইহার একমাত্র আদর্শ। পরাধীন ভারতে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সম্ভব হয় নাই। স্বাধীন ভারতকে পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের আদর্শে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বনে এই সকল বিষয়ে উন্নত হইতেই হইবে। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্য ভারতের ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র কৃষি শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নতি লাভের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই যে ঐ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভের একমাত্র পথ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বাধীন ভারতকে সকল বিষয়ে জয়যুক্ত করিতে হইলে এই পথ অবলম্বন করিতেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কেবল স্বগৃহের উন্নতি বিধানের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া পৃথিবীর সকল দেশে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রচার করিতে উদাত্ত কণ্ঠে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতবর্ষ এই সকল বিষয়ে যতটা উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে, এরূপ আর কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। সেই প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্বত্যাগী প্রচারকগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু জাতিকে ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি দান করিতেছে। পরাধীনতার গ্লানিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে এই অমূল্য সম্পদরাশি সমৃদ্ধি লাভ করিবার এবং বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইবার তেমন সুযোগ পায় নাই। তথাপি এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও ভারতে অনেক আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অগ্রগণ্য। ইতোমধ্যেই এই মহাপুরুষদ্বয়ের প্রচারিত সর্বধর্মসমন্বয় কেবল স্বদেশে নয় পরন্তু বিদেশেও বহু মনীষীর শ্রদ্ধাদৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-মিশনের বেদান্ত-প্রচারের ক্রম-বর্ধমান সাফল্য এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরাধীন ভারতে ইহার সূচনা হইয়াছে; স্বাধীন ভারতে ইহার পূর্ণ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীন ভারতের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি পূর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীর সকল সুশিক্ষিত নরনারীকে প্রভাবিত করিবে এবং ইহার ফলে বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "দেখিতেছি, ভারতভূমি, আমার এই জন্মভূমি বর্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় মন্থর পদবিক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন আপনার বিধাতৃনির্দেশিত মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য—পশু-ভাবাপন্ন মানবকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিবার জন্য। * * সমগ্র মানব জাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবন ব্রত, তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের সুর, তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা।"

এই মহান্ আদর্শসমূহ স্বাধীন ভারতে কার্যে পরিণত করিবার উপায় নির্দেশ 'উদ্বোধনে'র জাবনোদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনে 'উদ্বোধন' নববর্ষে পদার্পণ করিয়া তাহার লেখক গ্রাহক ও পাঠকগণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

কে বা আমার

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ

কে বা আমার, আমি কাহার,
জান্‌তে আমার গেল জনম,
অজানারই বোঝা বহি,
হেসে কেঁদে দিন কাটালাম।
কে বা পর, কে বা আপন
জানি না তো, কিন্তু কেমন।
'আপন' কে না চিনে আমি
'পর'কে নিয়ে ঘর বাঁধিলাম,
স্বপন ঘেরা সেই ঘরেতে
(কত) সুখের রাতে ঘুমাইলাম।
(আজ) ঘুমের শেষে দেখি উষায়,
বিদায় নিতে হবে আমায়,
দেশ যে আমার রহে দূরে,
বিদেশে ঘর বেঁধেছিলাম।

ছোট ঘর

শ্রী——

উন্মুক্ত আকাশ তলে বৎস তুমি
ভাবিতেছ তব ছোট ঘর,
ভাবিতেছ ফেলে এলে যেথা
কত কী যে সব,
কত ধন, কত কী বিভব,
কত প্রিয়জন, কত গান,
কত কলরব।
হেরিতেছ শূন্য ঘর,
অন্ধ তব আঁখি,
শ্রবণ নীরব,—
দেখেও দেখ না ঊর্দ্ধে
অসীম গৌরব,
দূরে, দূরে এ নীলাম্বর,
তুমি দেখিতেছো শুধু
তব ছোট ঘর।

দেহে ও বিদেহে

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিনের কথা। বোধ হয় সেটা ছিল ইংরাজি ১৮৮১ কি ১৮৮২। খুব সম্ভব রবিবার কি ছুটীর দিন। দক্ষিণেশ্বরে আমাদের বাড়ী ভাগীরথীর সন্নিকট—মিনিট পাঁচেকের পথ। তাই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে আমার সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবদের সমাগম ছিল প্রায় নিত্যই,—প্রাতে স্নানে যাবার সময়, সন্ধ্যার পর আনন্দ মিলনে,—চলিত কথায় আড্ডা দিতে। থাকতাম আমরা জন-সাতেক।

সেদিন ছিল ছুটীর দিন। দাবাবড়ে, তাসখেলা, নানাকথা ও গল্পাদি চলছিল। বাচস্পতি পাড়ার হরিদাস চট্টো, তিনি তখন বি-এ পড়েন—এসে বললেন—"তোমাকে আমার বড় দরকার, আমাদের বাড়ী একবার যেতে হবে। কলকেতা হ'তে আমার এক সহপাঠী বন্ধু এসেছেন—, তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দোব। তঁকে মুড়িগুড় খেতে দিয়ে, বসিয়ে এসেছি। উঠে পড়ো, বিলম্ব কোরো না।"

উঠতে হোল। পথে জিজ্ঞাসা করলুম—"ব্যাপার কি একটু বলো। আমাকে ডাকবার একটা কোন কারণ তো আছে, শুনে রাখি।"

হরিদাস হাসতে হাসতে বললেন—"বিশেষ কিছুই নয়,—এই তুমি যেমন আমাদের দলের প্রধান বক্তা ও রহস্য-পটু আনন্দদাতা, তিনিও কলেজে আমাদের গল্পে ও কথায় রসমুগ্ধ করে রাখেন। তাঁর সঙ্গ সকলেই খোঁজেন, তাঁর মত রসমধুর বক্তা বিরল," ইত্যাদি।

শুনে আমি চিন্তা-চঞ্চল হয়ে পড়লুম। এ যেন পরীক্ষা দিতে যাওয়া। ভাববার সময় নেই, সামনা সামনি এসে পড়েছি,—বেশ এক মুঠো মুড়ি মুখে ফেলে—"Welcome my mighty mate"—বলে, মুড়ির থালাখানি আমার দিকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন—"লেগে যান!"

বললুম—"মাজতে নাকি? সে কাজটা আর এখানে কেন! হরিদাস বড় সৌখীন লোক।"

"সেকি—ফুরিয়ে গেল নাকি, Haridas a damn thrift"—হাসি পড়ে গেল। আমাদের কথাও আরম্ভ হয়ে গেল।

হরিদাস আমাদের পরিচয় করে দিলেন—ইনি কলিকাতার সিমলা নিবাসী শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত, আমাদের সহপাঠী হলেও দুনিয়ার কি বা কোন্ বিষয় যে জানেন না সেইটি জানি না।

নরেন্দ্রনাথ বললেন—"কেনো—ম্যাথামেটিক্স? বিদ্যাসাগর মশাই এখনো বেঁচে আছেন—সদা সত্য কথা কহিবে।"

থাক,—নরেন্দ্রের কথার হাটে আর ঢুকবো না। আর (আমাকে দেখিয়ে) "ইনি হচ্ছেন আমাদের পল্লীবন্ধু শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"কি বললে—বন্দ্যোপাধ্যায়! আর বলতে হবে না, অর্থাৎ আত্মঘাতী, তানাতো আর তোমাদের স্থান দিয়ে নিজের আশ্রম পীড়া খুঁজেছেন। শাণ্ডিল্যেরা শিবের বংশ, তাঁর ঐশ্বর্য্যের দৌড় দেখেছ তো—শেষ বস্ত্রহীন উলঙ্গ হয়ে থাকা পর্য্যন্ত! সাবধান—"

থাক, আর নয়। আমি তাঁর কথাবার্ত্তার দু'একটা পরিচয় দিয়ে রাখলুম মাত্র। তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবক্তা। তাঁকে দেখলে ও তাঁর কথা শুনলে, মুগ্ধ না হয়ে কেউ পারতেন

না। পাছে কেউ ভুল বোঝেন তাই বলে রাখছি তাঁর রহস্যমাখা ভাষা ছিল শোনবার জিনিস, কিন্তু বস্তু থাকতো "ভাবে"। এমন কথা কইতেন না যাতে পাবার কিছু থাকতো না। সবই সদর্থপূর্ণ ও দয়কারি। শ্রোতা যদি নিবিষ্ট সমঝ্দার হন শুনে অবাক হয়ে ভাবতেন বয়সের অনুপাতে এতটা জ্ঞান হয় কি করে! এযে শাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদেরও চমকপ্রদ! তাঁর কাছে সে সব কিন্তু হাসি রহস্যচ্ছলেই প্রকাশ পেতো।

এমন অদ্ভুত যুবা দেখিনি। আমাপেক্ষা মাত্র মাস দেড়েকের বড় ছিলেন। আবশ্যক বোধে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বলে রাখতে বাধ্য হলুম। নরেন্দ্রনাথের সহিত সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

বৈকালে তাঁরই ইচ্ছামত রাণী রাসমণির ভাগীরথীতীরস্থ কালীবাড়ী দেখতে যাওয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ বললেন "না হয় ঠকাই যাবে, শুনেছি একটি নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, যিনি ইতিপূর্ব্বে মাকালীর পূজারী ছিলেন, এখন সহসা সিদ্ধপুরুষ! আমাদের দেশে যা সহজেই হওয়া যায়। তাঁকে দেখাও হবে। আমাদের দেশে লোক পয়সা দিয়েও ভেল্কি দেখে। শুনেছি এখানে পয়সাও লাগে না। নিরক্ষরের কাছে আমার শোনবার কিছু নেই, দেখবার থাকে তো দেখা যাবে হে। আমি একদিন ঘুরে ফিরে চলে গেছি।" কথাটা এই ভাবের হয়েছিল।

শুনে আমি চমকে উঠি। তিনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন—"ব্যানার্জির দেখা আছে বুঝি, ব্যানার্জিরা কি এমন মওকা ছাড়েন! ওসব যে ওঁদের জন্যেই।"

বললুম—"কেশববাবু কোন সময়ে তাঁর Sunday Mirrorএ দক্ষিণেশ্বরযোগী বলে যাঁর কথা লিখেছিলেন, ইনিই কি? সেই "হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বলতে হবে না—ইনিই সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ। তা'হলে জানা শোনা আছে?

"না। সেই 'না-থাকার' অপরাধটা স্মরণ হওয়াতেই চমকেই উঠেছিলুম। আমার অগ্রজ মীরাটে থাকেন—তিনি জানতে চেয়েছিলেন ও আমাকে সাধুর সঙ্গে দেখা করে কিছু লিখতেও বলেছিলেন। কোন কারণে তা হয়ে ওঠেনি, পরে ভুলেও গিয়েছিলুম। ভারী অপরাধ হয়ে গেছে।"

"ও—তাই। চলো, অপরাধ মিটিয়ে আসবে। ব্যানার্জি plus ব্যানার্জি তোমাদের শোনাই যথেষ্ট, তাঁকে না দেখেই দাদাকে লিখতে পারো 'সিদ্ধ মহাপুরুষ'। তোমরা যম বিশ্বাসী, চলো"

রাসমণির বাগানের পোস্তায় বসে নরেন্দ্রনাথের গান চলছিল। একজন এসে বললেন—"পরমহংসদেব ডাকছেন।" "চলো দেখে আসা যাক্" বলে নরেন্দ্রনাথ উঠলেন—আমরা সঙ্গ নিলুম।

উত্তর পশ্চিম প্রান্তের ছোট একটি কুটুরি। আমরা অভ্যাসমত কাজ সারা হাত তোলা নমস্কার করতে করতে ঢুকলুম। ছোট একটি তক্তপোষে, ছোট একখানি পাড়ীকাপড় পরা। যিনি বসেছিলেন তাঁর হাস্যমুখ—নীচে কয়েকটি আগন্তুক।

নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন—"আস না কেন, আমি যে তোমার অপেক্ষা করে রয়েছি। একদিন যেন এসেছিলে, এদিক ওদিক ঘুরে চলে গিয়েছিলে।" এইরূপ দুয়েক কথার পর একটা গান শুনতে চাইলেন।

আশ্চর্য্য যুবা, দ্বিধা নেই শঙ্কা নেই বলবা মাত্রই নরেন্দ্র গান আরম্ভ করে দিলেন। অন্তরাতেই সাধু সহসা সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই পড়ে যাচ্ছিলেন। দু'তিন জন তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলেন,—তিনি সমাধিস্থ। নরেন্দ্র নির্ব্বাক হয়ে

দেখতে লাগলেন। সকলেই দেখলুম। জীবনে সমাধি দেখা আমার ওই প্রথম।

একজন বললেন—"গান শুনতে ভালবাসেন, কিন্তু পুরো শোনা বড় ঘটেনা,—সমাধি হয়ে যায়।"

পরমহংসদেবকে আমার সেই প্রথম দেখা। বাড়ীতে গৃহদেবতা নারায়ণাদি থাকায় রাণী রাসমণির বাগানে প্রায়ই ফুল তুলতে যেতুম, কতবারই তাঁকে দেখে থাকবো। সে দেখায় কোন বিশেষত্ব ছিল না,—সাধারণ মানুষ, সাধারণ আটহাতী লাল পেড়ে কাপড় পরা, না গেরুয়া, না ফোঁটা তিলক। আজ যা দেখলুম, সে স্বতন্ত্র বস্তু; দেখা বললে ভুল হবে—পেলুম বলাই উচিত। নরেন্দ্রনাথের সহিত আমার চোখচোখি হতেই তিনি হাসিমুখে বললেন—"হয়েছে? এখন দাদাকে চারপৃষ্ঠা লেখগে!" তাঁর কথাগুলি আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—ভাবটাই জানাচ্ছি। থাক্।

ঠাকুর তাঁকে বললেন—"মাঝে মাঝে এসো।"—শুনে নরেন্দ্রনাথ বল্লেন "আমি পড়ছি, আমার কলেজ আছে।"—তিনি বলেন "এও থাকনা, ভাল কথা শুনতে ক্ষতি কি?"—তাতে নরেন্দ্র বলেন "আপনি যা বলবেন সে আপনার শোনা কথা, শুনেছি আপনি তো নিরক্ষর লোক। আপনি যা বলবেন সে সব আমার জানা আছে।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম, অনেকটা পালাই পালাই করছিলুম। —ঠাকুর হাসতে হাসতেই বললেন—"এতো খুব আনন্দের কথা—আমার বেশী বকতে হবে না, এক একবার এলে তোমার বিশেষ ক্ষতি হবে কি? ধরো আমিই তোমাকে চাই। ও কলেজ ফলেজ থাকবে বলে যে মনে হচ্ছে না। আচ্ছা—আজ যেতে পারো, আবার ইচ্ছা হলে এসো। কেমন, তাতে আপত্তি নেই তো?"—নরেন্দ্রনাথ বল্লেন, "না, বেড়াতে আসতে আর আপত্তি কি!"

সকলে উঠে যেন বাঁচলুম,—ভাল লাগছিল না। বাইরে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন—"আমার কথাগুলো বড় বিশ্রী লাগছিল, না বাঁড়ুয্যে?" বললুম—"সেটা নিজেই বুঝতে পারছেন।"

'না, আমি ভাল বুঝতে পারিনি, তাই দ্বিতীয় বারের জন্য একটু কড়া ভূমিকা ছেড়ে চললুম।—এইবার সাক্ষাতে খোলসা হতে পারে। এবার আর হরিদাসের মুড়ি নষ্ট করবো না, সোজা একাই চলে আসবো।" আর দাঁড়ালেন না।

ঠাকুরের কথা মনে রইল না, নরেন্দ্রনাথের কথাই ভাবতে ভাবতে ফিরলুল। সমবয়সী হলেও এরূপ ছেলে পূর্ব্বে দেখিনি,—যেমন নির্ভীক, কথা বার্ত্তাতেও তেমনি বহুদর্শী জ্ঞানীর মত। এ ছেলে কারো মুখ চেয়ে কথা কবার নয়, Leader বা নেতা হবার জন্যেই জন্মেছে—কোন মহাপুরুষের ধার ধারে না বা ধারবে না। একথা বা এ ধারণা সেই প্রথমদিনেই কে যেন আমাকে দিয়েছিল। দেখলুম ঠাকুরও এঁকে চান। এ ছেলে Commander-in-chief হবার ছেলে—সোলজার নয়।

সেটি আমার পরম সৌভাগ্যের দিন ছিল, এক ক্ষেত্রে উভয়কেই দেখা হয়ে যায়। তখন কিন্তু কে তা জেনেছিল!

জপ

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

শাস্ত্র "জপাৎ সিদ্ধিঃ" ইহার তিন সত্য দিয়া জপকার্য্যে সংশয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সন্ত মহাজনদের ঐ এক কথা—'নাম লও, নামেই সব হবে। নামই পরম সম্বল, নাম বই আর গতি নাই।' নাম লওয়াই ভজন; আর, ভজন বিধিপূর্ব্বক হইলে তাহাই সাধন। নাম বলিতে কার নাম, কোন্ নাম—এ প্রশ্ন যেমন আসে, নাম কোথা হইতে, কি ভাবে লইতে হইবে—এ প্রশ্নও তেমনি আসিয়া থাকে। আগের প্রশ্নটার উত্তর মিলে যখন "ইষ্ট নাম" বা "মন্ত্র" পাই। পরেরটার উত্তরের জন্য কোন "নামদাতা" এবং নাম দেওয়ার একটা "প্রণালী" বা পদ্ধতি ঠিক হওয়া চাই। সচরাচর নাম-দাতাকে "আচার্য্য", "গুরু", "ইষ্টদেব", আর নামদানের প্রণালীকে "দীক্ষা" বলা হয়। দীক্ষার সঙ্গে অথবা পরে আবশ্যক ভজনবিধির উপদেশকে "শিক্ষা" বলা হয়। দীক্ষায় একনিষ্ঠ হওয়া চাই; উপদেশের বেলা তাদৃশ বাঁধাবাঁধি নাই। তবে সে ক্ষেত্রেও অরিচ্ছন্দ মিত্রচ্ছন্দের বিচার করিতে হয়। এক কথায় উপদেশের উপযোগিতা ও উপাদেয়তা আছে।

এ সব কথা প্রায় সকলের শোনা আছে। যাঁহাদের মূলে সংশয় তাঁহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া সহজ নয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, সে বোঝাপড়া শেষ করিতে হইলে পরীক্ষা, তত্ত্ব এবং তথ্য দুই ক্ষেত্রেই নিষ্ঠাপূর্ব্বক চালাইতে হইবে, যেরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় করিতে হয়। থিওরি এবং একসপেরিমেণ্ট দুয়েরি প্রয়োজন আছে। তত্ত্ব এবং তথ্যের মধ্যে সন্ধি আবশ্যক। বিচ্ছেদ বা বিগ্রহ হইলে বুঝিতে হইবে যে সত্য সন্ধানটি এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। তত্ত্ব ও তথ্য পরস্পরের সম্বাদী হইবে, বিসম্বাদী নয়। সত্য বা যথার্থের জ্ঞানকে যদি বলি প্রমা, তবে এই সত্যসন্ধানকে বলিব প্রমাণ।

জপ একরূপ ক্রিয়া—কায়িক (অজপা), বাচিক, মানস, বিমিশ্র যে ভাবেই লই না কেন। এই ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। বিশ্বাস করিব, কি করিব না—এটি নির্ভর করে সত্যসন্ধান বা প্রমাণের উপর। প্রমাণের ব্যাপ্তি তত্ত্ব এবং তথ্য—principle and fact উভয়তঃ। শোনা যায় অঙ্গারও নাকি কর্ম্মযোগে হীরক হয়। শুনিয়াই বিশ্বাস হয় কি? প্রমাণ চাই। তত্ত্বের ক্ষেত্রে জানিলাম (১) দুয়েরই মূল বস্তু বা উপাদান একই, আর (২) সেই মূল বস্তুর দানাগুলি অঙ্গারে যে রীতিতে সাজানো, হীরাতে সে ভাবে নয়, অন্যভাবে; সুতরাং (৩) সাজানোর রীতিটি অঙ্গারানুরূপ না হইয়া হীরকানুরূপ হইলেই অঙ্গারের হীরকত্ব প্রাপ্তি। পদার্থবিজ্ঞান অধুনা আরও অগ্রসর হইয়াছে দেখিতেছি। সব কিছু পদার্থের মূলবস্তু Energy বা শক্তি (নাদ বা continuum, বিন্দু বা quantum) এবং শক্তির বিভিন্ন অবস্থিতি-পরিস্থিতি (সংস্থা বা ব্যূহ) হইতেই বিভিন্ন পদার্থ। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যাহা জানিলাম, তথ্যের ক্ষেত্রে সমীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারা সেটি যাচাই না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণাঙ্গসংস্থাপক (conclusive)

প্রমাণ মিলিল না, এবং বিশ্বাসও সুস্থির হইল না; স্থিরমতি স্থিতধীও হওয়া গেল না।

জপের মূলে যে principle বা তত্ত্ব আছে, তাহাকে বলা যাক্—রহস্য। 'উপনিষদ্' কথাটার একটা মানেও তাই। তত্ত্ব সর্বক্ষেত্রেই "গুহানিহিত" বা নিগূঢ়। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বটে। তবে সে গুহাভেদের কৌশল (বিদ্যা) বা technique অধুনা আমরা বেশ দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারিতেছি। জপের যেটি রহস্য ("সত্যস্য মুখং") সেটি "পিহিত" হইয়াই আছে "হিরণ্ময়-পাত্রেণ" কি "প্রস্তরস্তূপেন" তা বুঝিতেছি না। সেটিকে "গুহ্য", "গুহ্যাদপি গুহ্য", "রাজগুহ্য"—ইত্যাদিরূপে রহস্য করিয়াই রাখা হইয়াছে বরাবর। তার হেতু তখনও ছিল, এখনও আছে। তবে তখন হিরণ্ময় পাত্র জুটিত ব্রহ্মবর্চ্চের অধিকারী হিরণ্যরেতাদের যুগে। কিন্তু রহস্য হইলেও সেটি অত্যাধুনিক "বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতা" যুগে অজ্ঞাতব্য, অনধিগম্য তো নয়। বিষয়, সম্বন্ধ, অধিকার, প্রয়োজন—এই চারিটিকে অনুবন্ধ বলা হয়। অনুবন্ধ বিচার করিয়া সব কিছুর সুতরাং জপের অথবা অন্য যে কোনও রহস্যের অনুসন্ধান করিতে হয়। নচেৎ শ্রেয়ঃ নাই, চরিতার্থতা নাই। যেমন, বর্তমান যুগে আণবিক শক্তি ভাণ্ডারের চাবিকাঠি হাতে পাইয়া আমাদের সম্প্রতি শ্রেয়োলাভ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে সম্ভাবিত মহতী বিনষ্টি। জপ যে শক্তিভাণ্ডারের সন্ধান দেয়, সে শক্তি আরও "মৌলিক", আরও বিপুল, ব্যাপক শক্তি। সে শক্তিসাধনায় সংযত সাবধানতা এবং স্বচ্ছ গাম্ভীর্য্যের প্রয়োজন আরও বেশী। এই জন্য সিদ্ধ ও সাধকেরা সর্ব্বত্র রহস্য ভাঙ্গিতে নারাজ হইয়াছেন এবং বৈদ্যুতাগ্নি লইয়া তাঁহারা বিজলি বাতির বিপণি সাজান নাই। তথাপি সাধকের পক্ষে তত্ত্বজানার প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। "ইতর জনের" পক্ষেও সেরূপ সাক্ষাৎ প্রয়োজন না থাকিলেও পরোক্ষ প্রয়োজন কিছুটা থাকিতে পারে। যেমন, যে আণবিক শক্তি লইয়া কারবার করে না, তার পক্ষে আণবিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন। অনেকের পক্ষেই কারবারের জন্যই জানার প্রয়োজন; কিন্তু কাহারও বা জানার জন্যই জানার প্রয়োজন থাকিতে পারে। জানাতেই ইষ্টসফলতা। জানার পর করার প্রবৃত্তিও আসিতে পারে। ফলকথা, প্রয়োজনটা যে ভাবেই হোক্, সেটা যদি নেহাৎ সখ না হইয়া সত্যকার গরজ হয় তবে সেটা যে কোন উপায়ে নিজেকে মিটাইতে চাহিবে। এখন ভাবা যাক্ জপের যেটা রহস্য সেটা জানার জন্য গরজী, দরদী, মরমী অধিকারী কয়জন ?

তারপর জপ লইয়া কার্য্যতঃ পরীক্ষায় নামা। আগে যদি জপের তত্ত্ব বা রহস্যের কথা কিছু জানা থাকে তবে জপকর্ম্মে কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধা (working belief) সুতরাং প্রবৃত্তি আসা সহজ হয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে কোনও পরীক্ষায় নামাতেও তাই। প্রস্তাবিত পরীক্ষার theory বা যুক্তিটি জানা থাকিলে তো কথাই নাই; অন্ততঃ পক্ষে এই বিশ্বাসটি থাকা চাই যে মূলে যুক্তি আছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি (বিশেষজ্ঞ) সেটি জানেন, এবং অপরে ঠিক ঠিক "বিদ্যা" technique প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষার সফলতা প্রমাণিত করিয়াছেন। এইটি "আপ্ত" প্রমাণ। জপাদির ক্ষেত্রেও এটিকে আশ্রয় করিতে হয়। সকল ব্যবহারিক বিজ্ঞানেই এই দস্তুর। যে ব্যবহারী, তার আপন বুদ্ধির একটা "প্রাথমিক" অনুমতি পাইতে হয়। সেটাকে ঠিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বলে না। বুদ্ধি যদি কারবারে নামার আগে, তার মূলে যে যুক্তি আছে বা থাকিতে পারে, সেটিকে যথাসম্ভব যাচাই করিয়া লয়, তবে ঐ প্রাথমিক অনুমতি পত্রখানা আরও "পাকা" হইয়া গেল।

তখন সেটা আর শুধু অনুমতি নয়। সেটা তখন অনুমোদন permit নয়, approval. এতে কাজে গরজ বাড়ে, কিন্তু এতেই কাজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। যুক্তি, শাস্ত্র, মহাজন-বাক্য এবং আত্মপ্রত্যয়—এই চার পর্য্যায়ে পর্য্যাপ্তি শেষ। শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা পুরা হয় না। তবে, স্ববুদ্ধির একটা permit লইয়াই সবক্ষেত্রে, সমীক্ষাক্ষেত্রে বা পরীক্ষাগারে ঢুকিতে হয়। যুক্তি মিলিলে অনুমোদন; শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে সংস্কার ও সমর্থন; আত্মপ্রত্যয়ে সর্ব্বসংশয়-নিরসনে পাকা "স্বাক্ষর"টি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। তিনি "পর"ই হউন আর "অবর"ই হউন, যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ "দেখা"টি হইতেছে, ততক্ষণ সর্ব্বসংশয় কদাপি ছিন্ন হবার নয়। যতক্ষণ সমীহ ততক্ষণ সমীক্ষা, যতক্ষণ পরোক্ষ ততক্ষণ পরীক্ষা।

জপের কাজে যাহার আপন বুদ্ধির permit মিলে নাই, তার পক্ষে তত্ত্বই বা কি, তথ্যই বা কি, কোনও বোঝাপড়া করিয়া বিশেষ লাভ নাই। সে ক্ষেত্রেও কিন্তু permit এর জন্য আরজি করার মতো একটা মরজি আছে, অথবা হইতেছে কিনা সেটা অবশ্য বিবেচ্য। অগ্রে শুভেচ্ছা, পরে বিচারণা। আগে চাওয়া, তারপর পাওয়া। না চাইতেই যেখানে পাওয়া যায় সেখানে বুঝিতে হইবে পাওনাটা মালখানায় মালেকের নামে মজুদই ছিল।

ধরা গেল জপের কাজে permit মিলিয়াছে। এ permit সর্ব্বাগ্রে নিজের ভিতরেই মিলাইতে হয় দেখিয়াছি। কিন্তু "বাহিরে" সেটা endorse বা মঞ্জুরী করারও অপেক্ষা আছে। কেন আছে তাহার অবশ্য হেতুও আছে। ভিতর আর বাহির পরস্পরকে "সাক্ষী" করিয়া নিজ নিজ "সই"টি দিয়া থাকে। ধরা গেল, এই মঞ্জুরীটিও মিলিয়াছে। ভিতর থেকে কেহ বলিল—কাজটা করেই দেখনা কেন কি হয়। বাহির হইতে আর কেহ বলিল—করই না, ফল মিলিবে। তখন ভিতর বাহির দুইয়ে মিলিয়া ঠিক হইল—লাগিয়াই যাই। এই রকমধারা ভিতর বাহির মিলাইয়াও যে কাজে নামিল, তাহারও কিন্তু কাজটি সহজে হাসিল হইতে দেখি না।

"আমি এতদিন ধ'রে জপ ক'রলাম, কিন্তু পেলাম কি? অমুক ব্যক্তি তো ভিন্দেগিভর জপেই লেগে আছে, কিন্তু তারই বা হোল কি? কৈ, রংওতো ফিরলোনা, হাড়ের টকও ঘুচলো না!"

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, জপের সত্যকার যেটা কাজ সেটা হয় আসলে সূক্ষ্ম বা সংস্কারের ক্ষেত্রে, সুতরাং আমার এই বাজার চলতি কারবারী হিসাবের খাতায় তার ফলাফলের অঙ্কগুলো সরাসরি পড়িতে দেখি না। এমন কি, উল্টা ফলও কিছুটা ফলিতে দেখিতে পাই। তাতে ঘাবড়াইলে চলিবে না। হোমিওপ্যাথিক high potency ঔষধের মতো কাজটা আরম্ভ হয় গভীর স্তরে, এবং সেথায় "মন্থন আলোড়নের" ফলে অনেক সূক্ষ্ম, গূঢ় দৃঢ় অশুভ সংস্কার শিথিল হালকা হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ aggravation, কিনা, রোগের লক্ষণ-গুলির সাময়িক বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। তাতে রোগী অথবা বৈদ্য কাহারও ভয় পাইবার কারণ নাই। জপের "বুনোশূয়োরটি" আসলে মূষিকবুদ্ধি" নয়, "গজক্ষম"—বৃহৎ বলবৎ অশুভ সঙ্কীর্ণ অথচ উদগ্র হইয়া রুখিয়া তাড়া করিতেছে। বৈখরী জপের ক্রিয়া "অন্নময়" কোষে শুরু হয় বটে, কিন্তু "সমর্থ" জপ হইলে সেটি "প্রাণময়", "মনোময়" ইত্যাদি ক্রমে সত্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে নামিয়া কাজ করিতে থাকে। সমর্থ জপের আসল কাজটি এক

কথায় হইতেছে এই—এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ যন্ত্রটার ভিতর যেখানে সেখানে স্পষ্ট অথবা গোপন বিষম বা বিষচ্ছন্দের "দৌরাত্ম্য" আছে, অপক্রিয়া, বিক্রিয়া আছে, সেখানে সেখানে সুষম বা মধুচ্ছন্দ আনিয়া সৌষ্ঠব ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া দেওয়া। বিষমচ্ছন্দকেই (disharmony) বলে "অসুর" বা সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে পাপ্মা। সমর্থজপের ক্রিয়ার ফলে যেটি অসুর সেটি হয় "সুর"। জপে যন্ত্রশুদ্ধি হওয়া মানে অপহতপাপ্মা হওয়া। 'মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা শোধন করি ব'লে তারা।" "তারা" মায়ের তারক-ব্রহ্ম নামতো বটেই, তা ছাড়া তারা=তার =ওঁকার। জপে পাপ্মা অপগত হইবে। "অপগত" হওয়া মানে বেমালুম উধাও হওয়া নয় তো। আলাদা হইয়া তফাৎ হইয়া যাওয়া elimination. গোড়ায় এইটিই হয়—পাপ পুরুষ বাহির হয় এবং পরে সরিয়া যায়। পরে অবশ্য—বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধভূমিতে গিয়া "পরশ পাথরের" সন্ধান মিলিলে সব কিছুই "সোণা" হইয়া যায়—"বিষোঽপি অমৃতায়তে।" মধু-কৈটভ সংহার হইল, কিন্তু তাহাদের "মেদ" দিয়া রচিত হইল "মেদিনী"। এইটিই হইল transformation, sublimation. "ব্যাপ্তি-দেব্যৈ নমো নমঃ।" তখন "চিতিরূপেণ" ও ভ্রান্তিরূপেণ" দুই-ই একই বস্তু।

দ্বিতীয় এবং আসল কথাটা কিন্তু হইতেছে জপকে "সমর্থ" বা "বীর্য্যবান" করা। জপ-বীর্য্যে অমোঘ শক্তি। কিন্তু জপবীর্য্য হয় কি করিয়া? শ্রুতি বলেন—যে কাজই করা যাক্ না কেন, সেটা "বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" বৈষয়িক আধ্যাত্মিক সবতাতেই ঋদ্ধি সিদ্ধির নিমিত্ত অত্যাবশ্যক হইতেছে—ঐ তিনটি। "বিদ্যা" মানে এখানে প্রয়োগপদ্ধতি (মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র), ব্যবহারবিজ্ঞান বা আর্ট। যেমন প্রাচীন কালে "মধুবিদ্যা" "দহরবিদ্যা", "পঞ্চাগ্নিবিদ্যা", ইত্যাদি। বর্ত্তমানে যে কোনও কাজ সুষ্ঠু সফল ভাবে করার যে correct technique তাহাকেই তাহার আর্ট বলে। "শ্রদ্ধা" বলিতে মোটামুটি বুঝায় কাজটার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, কাজটায় "দরদ" —সত্যিকার interest. এই থেকে আসে অনুরাগ, আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা, বিশ্বাস। আর, "উপনিষদ" মানে রহস্য বা অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির জ্ঞান। এই শেষেরটা হইল science, mystic scienceও বটে। লক্ষ্য কর যে—শ্রুতি "বা" শব্দটার প্রয়োগ করিয়াছেন। "বা" মানে বিকল্পও বটে, সমুচ্চয়ও বটে। অর্থাৎ, তিনটিই চাই, কিন্তু তিনের অন্ততঃ একটায় বাঁধা, কিনা "জোর" থাকা চাই। আর, শ্রদ্ধাই যখন মূল, তখন মূলে জোর থাকিলেই ভাল হয়। মূলে জোর ধরিলে শাখাতেও ধরিবে। একটায় যদি জোর থাকে তবে কর্ম্মটি (জপ) "বীর্য্যবৎ" হইবে। অন্যথা বীর্য্যহীন, নির্বীর্য্য যেমন ঢোঁড়া সাপ। ঢোঁড়া সাপের মাথায় সাতরাজার ধন একটি মাণিক থাকে না তো? জপ "ঢোঁড়া" হইলে সে হয় মামুলি, ঢিমেতেতালা, এমন কি, morbid.

আরও লক্ষ্য কর—শ্রুতি "বীর্য্যবত্তর" বলিলেন, "বীর্য্যবত্তম" বলিলেন না। তার মানে, বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ সহকারে অনুষ্ঠিত সকল রকম ক্রিয়ারই বীর্য্যবত্তার, কিনা জোর ধরার, একটা তরতমতা, ক্রমোন্নত ধারা অথবা "অভ্যুদয়" আছে; সুতরাং একটা কাষ্ঠার বা পূর্ণতার বা নিঃশ্রেয়সের দিকে প্রবণতা আছে। সেই ধারাকে বলিতে পার—শঙ্করধারা। এটি শুক্লধারা, বিদ্যা শ্রদ্ধা উপনিষদের শৈথিল্য বৈকল্য ক্লৈব্যের নিমিত্ত এর বিপরীতটিও হইয়া থাকে। সেই উল্টা স্রোত এবং তজ্জন্য জাড়্য

আবিল উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে বলি ধূম্র মলিন সঙ্কর-ধারা। আগেরটা তালব্য শ, এটা দন্ত্য স। শঙ্করধারাই সেই শাশ্বতী গঙ্গাপ্রবাহ, ভগীরথ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে আদি বিধানের অভিশপ্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। আমাদের সকল ক্রমেই তাহাই করিতে হয়। অঙ্গার লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। অঙ্গার হইবে আঙ্গিরস। গীতা "তপ"কে তিন ভাবে বলিয়াছেন। প্রকারান্তরে। তাই হইল 'বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষদ্'। বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী। সরস্বতী বহুদিন থেকে বালুকায় লুকাইয়াছেন। জপের বা অপর কোন অধ্যাত্মসাধনের রহস্যের সন্ধানী আমরা অনেক দিন থেকেই নই। কিন্তু সন্ধান তো চাই। প্রচলিত, অনুসৃত বিদ্যাও খণ্ডিত, কুণ্ঠিত, কৃপণ। সিদ্ধ বিদ্যা—ঠিক ঠিক correct technique—কি মুখের কথায় আয়ত্ত করা যায়? আর, শ্রদ্ধা? প্রায় সবাই "অশ্রদ্দধানাঃ" হইয়াছি। বুদ্ধির যে permit-এর কথা বলিয়াছি, সেটাও অনেক ক্ষেত্রে জাল, নকল। সাচ্চার কারবার প্রায় বন্ধ। ঐ তিনেরই উন্মেষ-উৎকর্ষ হইতে থাকিবে—ঋদ্ধি-বিবৃদ্ধি হইবে, যতক্ষণ না পূর্ণতায়, পরাকাষ্ঠায় না পৌঁছিতেছি। অফুরান চড়াই-উতরাই-এর পথে অনন্তের যাত্রী তবে কি? তা নয়। কিছুটা চলার পর কৃপার সন্ধান মিলে, তখন পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। আগে প্রয়াস, পরে প্রসাদ; আগে race, পরে grace.

শ্রদ্ধাই মূল সন্দেহ নাই। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ।' কিন্তু শ্রদ্ধা তামস হইলে তা থেকে বিশেষ কিছু হয় না। শ্রদ্ধাবীর্য্য থাকা চাই। তা হইলে বিদ্যাও হইবে, উপনিষদ্‌ও হইবে। যে সাধক গরজী দরদী মরমী—তাঁহার কাছে সকল দরজাই খোলা। যার গরজ, সেই গরজী —ব্যস্তবাগীশ বা হঠকারী নন। যার বুকে ব্যথা সেই দরদী, যার মরমে বাজে, সেই মরমী। যাহাতে দুইয়ের মধ্যে ঠিক ঠিক একতানতা (unison) আনিয়া দেয় তাকেই বলে শ্রদ্ধা। নাম ও নামদাতার সত্তা-শক্তির সঙ্গে সাধকের সত্তা-শক্তির যখন এই সমচ্ছন্দতাটি (concordance) চালু হয়, তখনই বলিব নামে বা গুরুতে শ্রদ্ধা হইল। শ্রদ্ধার একটুখানি "ছোঁয়াচ" লইয়া সব কাজই সুরু করিতে হয়—অর্থাৎ, যথাসম্ভব অন্তরের যোগটি। কিন্তু শ্রদ্ধাবীর্য্য যে অনেক সাধনের ধন। শ্রদ্ধা যখন আসিল তখন "সমাধানের" আর বাকি রহিল কি? এই বিশ্বাস, এই ব্যাকুলতার কথাই তো শ্রীমুখে শুনিয়াছি! "শ্রীকর্ণের" শ্রদ্ধা হইয়াছে কি?

সব ব্যবহারক্ষেত্রেই ঐ তিন "বজ্রের" মিলনেই যে সিদ্ধি হয়, তা আমরা স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বীকার করিয়া থাকি। সব কিছু সিদ্ধির জন্য রহস্যবিৎ, প্রয়োগকুশলী এবং শ্রদ্ধালু সাধক চাই। কিন্তু আশ্চর্য্য, জপ বা অপর কোন আধ্যাত্মিক সাধনের বেলা এটি আর মনে থাকে না। তখন নিতান্ত নিরীহটি—যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রটি—সাজিয়া কৃপার দোহাই দেই, নির্ভর শরণাগতির দোঁহা শোনাই। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব কিনা? কৃপা বলে কাহাকে? নির্ভর শরণাগতি কি যখন তখন যত্র তত্র "পতন ও মূর্চ্ছার" ভাবটি আনিতে পারিলেই হয়?

কৃপা অহেতুক শাশ্বত এবং সর্ব্বত্রগ হইলেও তাহার সঙ্গে "সজীব সংযোগ"টি সংঘটিত হয় অনেক সাধ্যসাধনায়; আর, শরণাগতিও ঠাকুরের পায়ে আমার শ্রেষ্ঠ ও চরম অর্ঘ্যদানটি! যে অকৈতব কাতর কৃপাভিখারী তার কাছেই না কৃপাঘনমূর্ত্তি ঠাকুর "প্রকট"! সব ছাড়িতে ("সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য") না পারিলে একেক-শরণ হওয়া যায় না। কাজেই আত্মনিবেদন (বিশেষ করিয়া ভক্তের মতো কোন নিকৈতব ভাব বা রসাশ্রয়ে) হইতেছে "সাধ্যশিরোমণি"। তবে অবশ্য বিদ্যাবীর্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে "রোখের" সহিতই শরণাগতি ও কৃপাভিখারীর অনুকূল মনোভাবটি আনিবার সাধনও করিতে হয়। নহিলে, শ্রদ্ধার মূল কাঁচিয়া, পচিয়া, শুকাইয়া যাইবে। হয়তো বা জপাদিও করিব, আর দুই বেলা শিকড় শুদ্ধ চারাটি উঠাইয়া দেখিব শিকড় কতখানি "বড়" হইল না হইল। যেন মূলের হিসাব রাখার ভার যে শাখাপল্লবচারী তাঁহার! মূলের ভাবনা ভাবিবেন যিনি মূলের মালিক। "মনুয়ারে, তুই বেয়ে যারে দাঁড়। তোর হাইল্যা ব'স্যা আছে মাঝি ভাবনা কিরে আর।"

সংস্কৃত সাহিত্যের বিশালত্ব

ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্য যে কত সুবিশাল, তার প্রকৃত ধারণা করাও দুঃসাধ্য। কত সহস্র সহস্র সংস্কৃত পুঁথি যে এখনও ঘাটে, বাটে, মাঠে, মন্দিরে, পণ্ডিতমণ্ডলীর গৃহে বা স্থানান্তরে কীটদষ্ট, অর্ধদগ্ধ, বা বিক্ষত অবস্থায় লুক্কায়িত, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত হয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। তা' সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বুল্‌হার, আমাদের দেশীয় পণ্ডিত ভাণ্ডারকার, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের প্রচেষ্টায় যে সব পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে, তার সংখ্যা প্রায় সমগ্র ইউরোপভূখণ্ডের সাহিত্য-নিচয়ের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সমান। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সব পুঁথি এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে, তার সংখ্যা প্রকৃতকল্পে যথার্থ-সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। কোটি কোটি পুঁথি এখনও ভারতের সর্বত্র উদ্ধারের আশায় কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করছে। আর কত নষ্ট হয়ে গেছে এবং হচ্ছে, কে তার নির্ণয় করতে পারে? সংস্কৃত সাহিত্যের মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। ভারতের এ অধঃপতিত অবস্থাতেও, এত নির্যাতন দুঃখ যাতনা সত্ত্বেও, এ ভারতবর্ষেই অগণিত সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। বহু গ্রন্থ সরকারের দফ্‌তরের তালিকাভুক্ত (অর্থাৎ 'রেজেষ্ট্রী) হয়নি। জগতের অন্যত্র যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সে সমস্তও যে পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েছে, তাও নয়। এ সব সত্ত্বেও, কেবল ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে লক্ষাধিক সংস্কৃত গ্রন্থ সুরক্ষিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিষয়ে কত যে বিভাগ ও উপবিভাগ আছে, অনেক সময় তাও যেন চিন্তাতীত বলে মনে হয়। প্রথমে, ভারতীয় দর্শনের বিষয়ে ধরা যাক্। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও এমন নূতন কোনও দার্শনিক সত্য প্রচারিত হয়নি, যা একই রূপে বা পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে আমাদের দর্শন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। দর্শন-শাস্ত্রের বিভাগ উপবিভাগও যেন ধারণাতীত ব্যাপার। প্রথমতঃ—ষড়্‌দর্শন—পূর্বমীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক; বৌদ্ধ ও জৈন; চার্বাক প্রভৃতি জড়বাদ; স্ফোট প্রভৃতি ব্যাকরণসম্মত দর্শনবাদ; প্রত্যভিজ্ঞা, স্পন্দ, শাক্ত, শ্রীবিদ্যা, বীরশৈব, অন্যান্য বহু শৈবসম্প্রদায়; বহুবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়; ইত্যাদি।

ফলতঃ এক ব্রহ্মসূত্রেরই কত বিভিন্ন ব্যাখ্যান এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন দর্শনবাদ সৃষ্ট হয়েছে। যথা শঙ্করপ্রচারিত অদ্বৈতবাদ, রামানুজ-প্রপঞ্চিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ, শ্রীকণ্ঠের বিশিষ্ট-শৈবাদ্বৈতবাদ, ভাস্করের ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ, ইত্যাদি। এরূপে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রতি শাখায় কত শত শত গ্রন্থ রয়েছে এবং প্রত্যেকটী গ্রন্থই ভাবের গাম্ভীর্যে ও বিশ্লেষণের অপূর্ব-সৌকর্যে এত অনবদ্য যে প্রত্যেকটিরই পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে, কেবল ঐ গ্রন্থপাঠে

দর্শনশাস্ত্রের প্রায় সমস্তই অধিগত হয়ে আসে। আমাদের ঘরের থেকেই একটা উদাহরণ দিই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের উন্নতি মহাপ্রভুর ধর্ম-প্রচারের পরবর্তী। রূপ ও সনাতন গোস্বামীর পূত বারিসিঞ্চনে মহাপ্রভুর উপদেশবীজ থেকে আমাদের বৈষ্ণব দর্শন-অঙ্কুরের আত্মপ্রকাশ; তৎপর শ্রীজীব, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ভক্তমণ্ডলীর অপূর্ব সাধনপ্রভাবে বিশাল মহীরুহে তার পরিপূর্তি। অথচ অল্প কয়েক শত বৎসরে আমাদের গৌড়ীয় দর্শন শাস্ত্র এত সমুন্নতি লাভ করেছে যে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। মহাপ্রভুর অভীষ্ট ও গোস্বামিগণ কর্তৃক প্রপঞ্চিত গৌড়ীয়দর্শনবাদ এত প্রসার লাভ করেছে যে তা এমন কি সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়বিশেষকেও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ফলতঃ, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও নাটকচন্দ্রিকা নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি নাটক, গোপাল-বিরুদাবলী, হংসদূতাদি খণ্ডকাব্য, স্তবমালা প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থে রূপ গোস্বামী এই অপূর্ব দর্শনবাদই প্রপঞ্চিত করেছেন। একই পদ্ধতি কবিকর্ণপুর গোস্বামী প্রভৃতি অতি উচ্চদরের বৈষ্ণব কবিদের অলঙ্কার-কৌস্তুভ প্রমুখ অলঙ্কারগ্রন্থে, কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে, এমন কি—ছন্দঃশাস্ত্র ও ব্যাকরণশাস্ত্রেও অনুসৃত হয়েছে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রের দিক থেকে শ্রীজীবের হরিনামামৃত ব্যাকরণ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভক্তিবাদ অলঙ্কারের রসেও সর্বপ্রধান অধিকার লাভ করায় চিরাস্বাদ্য কাব্যশাস্ত্রও অপূর্ব ভক্তি-ভাবরসে আপ্লুত হয়ে উঠেছে এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে ছন্দঃশাস্ত্র, ব্যাকরণ-শাস্ত্র প্রভৃতিতেও অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ায় দার্শনিক তত্ত্ব বা গৌড়ীয় ভেদাভেদবাদ যেন জীবনের ধারার সঙ্গেই পরিপূর্ণভাবে সংমিশ্রিত হয়ে গেল।

এই যে জীবনের নিত্য গতির সঙ্গে, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক তথ্যের সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস অনুসরণ, এটা অংশতঃ ভারতের মাটির গুণ এবং তদধিক সংস্কৃত সাহিত্যের অশেষ প্রভাব হেতু সম্ভবপর হলো। ভাবপ্রকাশের এমন অপূর্ব ক্ষমতা, হৃদয় আলোড়নের এমন সুনিপুণ দক্ষতা, ভক্তি প্রীতি সংবর্ধনের এমন আশ্চর্য কৌশল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমিকতা অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বকীয় ধর্ম ও দর্শন-বাদ প্রচারের নিমিত্ত প্রথমে প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু অচিরেই তাঁরা স্বকীয় মারাত্মক ভুল সংশোধন নিমিত্ত পুনরায় সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদাহরণক্রমে বলা যায়—যে "বুদ্ধচরিত" ও "সৌন্দরনন্দ" কাব্যের রচয়িতা অশ্বঘোষ বৌদ্ধ কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পরিগ্রহ করেন, তিনি নিজেই সংস্কৃত ভাষার পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধঘোষের পদ্যচূড়ামণি এবং এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের নামও অবশ্য স্মর্তব্য। সমগ্র বৌদ্ধ অবদান সাহিত্য সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অবদানশতক, দিব্যাবদান, আর্যশূরের জাতকমালা, ব্রতাবদানমালা, ভদ্রকল্পাবদান, দ্বাবিংশত্যবদান, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, আর্যদেবের চতুঃশতিকা, চন্দ্রগোমীর শিষ্যলেখধর্মকাব্য, নাগার্জ্জুনের সুহৃল্লেখা, শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয়, মহাযানসূত্রালঙ্কার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। জৈন কবি ও অন্যান্য জৈন গ্রন্থকারেরা সংস্কৃত ভাষায় অগণিত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে স্থবিরাবলী, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত, পার্শ্বাভ্যুদয়কাব্য, মেঘবিজয়গণির দিগ্বিচার মহাকাব্য ও সপ্তসন্ধান কাব্য, নেমিদূত প্রভৃতি

গ্রন্থের নাম অবশ্য স্মর্তব্য। সমভাবে দ্রবিড়াচার্যেরা দ্রবিড়াম্নায়াদি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়াদি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু অচিরে তাঁদের সমস্ত দর্শনবাদ ও ধর্মনীতি তাঁরা সংস্কৃতে রূপান্তরিত করে স্বীয় অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার প্রচেষ্টা করলেন। উদাহরণ স্বরূপে তিরুবায়মোরি বা দ্রবিড়াম্নায়ের বেঙ্কট নাথ বেদান্তাচার্যকৃত দ্রবিড়োপনিষৎ তাৎপর্যরত্নাবলী এবং দ্রবিড়োপনিষৎসার প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। রহস্যত্রয়সার প্রভৃতি দ্রবিড় সংস্কৃত গ্রন্থও এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। এ জাতীয় গ্রন্থকে তামিলনাদের লোকেরা "মণিপ্রবালম্" গ্রন্থ বলে; এ জাতীয় গ্রন্থ সত্যি সংখ্যাতীত। ঈদৃশভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দৃষ্টিগোচর হবে যে সর্বত্রই ধর্ম, দর্শন প্রচারাদি উদ্দেশ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে—প্রকৃতপক্ষে সর্বস্থলে শুধু নয়, প্রায় সর্বযুগে। সংস্কৃতভাষার অনির্বচনীয় মাধুর্য অভাবনীয় পদলালিত্য, সাবলীল গতি, অনবদ্য, ঝঙ্কার—অপূর্ব বর্ণসাম্য ও অনুপ্রাস, উল্লসিত ভাবপ্রকাশসৌন্দর্য—এ সমস্ত বিষয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত ভারতীয়, এমন কি, অভারতীয় সকলকেই সংস্কৃতভাষার মুখাপেক্ষী হতেই হয়। সংস্কৃত কাব্যের ভাষার মাধুর্য সত্যি অনবদ্য। পুনরায় আমাদের ঘর থেকেই একটী উদাহরণ দিই। এই যে আমাদের চিরপরিচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থ, এর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তুলনামূলকভাবে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে দু একটী কথা বলি। ইংরাজী সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচকেরা স্বীকার করেছেন যে Gray's Elegyর "Casting longing lingering look" এই অনুপ্রাসসংবলিত পংক্তিটির তুলনা ইংরাজী সাহিত্যে নাই। ইহা এক অভিনব সৃষ্টি, এর তিন তিনটী "l" পরপর উচ্চারিত হ'য়ে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে, প্রাণ বিভোর করে দেয়। তা' যদি হয়, তিনটী এল্ বা ল'র পাশে আমাদের গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয় তুলনা করুন—

'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে নৃত্যতি সখি
বিরহিজনস্য দুরন্তে।

*　　*　　*　　*

ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥

*　　*　　*　　*

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্॥

*　　*　　*

দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিগলিতনালম্॥

*　　*　　*

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা॥

এমন অর্থের সঙ্গে সুসমঞ্জস নিরন্তর "ল" প্রয়োগ অন্য কোনও ভাষায় এর পরেও কি সম্ভবপর মনে করেন? এরূপ শুধু "ল"র মাধুর্য নয়—কোমলকান্ত পদাবলী যত প্রকারে সম্ভব, জগতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ বাঙ্গালী সংস্কৃত কবি জয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দে যে জিনিষের চরম, সংস্কৃতের অন্যান্য সর্বগ্রন্থেই এর কিছু না কিছু অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। রায় রামানন্দ রচিত জগন্নাথবল্লভ নাটক, ভানুদত্ত রচিত গীতগৌরীশ প্রভৃতি অগণিত গ্রন্থে ফলতঃ সমজাতীয় রচনাচাতুর্য দৃষ্ট হয়। এটী ভাষারই অন্তর্লীন দৈবশক্তি; তর্ক

করে মীমাংসা করার এতে কিছুই নাই। ভাষার ঈদৃশ উচ্ছলিত প্রবাহ, ভাবের উচ্ছ্বসিত আলোড়ন ও বিস্ফূরণ, ভাবে ও ভাষায় ঈদৃশ অনবদ্য মিলন— এক সংস্কৃতে ছাড়া অপর কোথায় সন্ধান পাবেন? এ সবের গুণে সংস্কৃত-কাব্যজগতে তুলনাহীন।

আমাদের কাব্য-শাস্ত্র অতি সুবিশাল। প্রথমতঃ, দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে আমাদের কাব্য দ্বিধা বিভক্ত। পুনরায় দৃশ্য কাব্য রূপক ও উপরূপক ভেদে দ্বি-প্রকার। রূপকের আবার দশ ভেদ ও উপরূপকের অষ্টাদশ। শ্রব্য কাব্য পদ্য, গদ্য ও সংমিশ্রিত গদ্য-পদ্য ভেদে মূলতঃ তিন প্রকার।

প্রথমতঃ, অর্থাৎ পদ্যে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য প্রভৃতি; গদ্যে কথা ও আখ্যায়িকা; সংমিশ্রিত গদ্য-পদ্যে চম্পূ, বিরুদ্ প্রভৃতি, মোটামুটি ভাগ করা চলে। কাব্যের উপরি-লিখিত ভেদরূপ বা আকৃতিগত বিষয়ভেদেও একে বহুধা বিভক্ত করা চলে—যেমন দার্শনিক কাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য প্রভৃতি, এর প্রত্যেক বিভাগে অজস্র বিশিষ্ট গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়। পরবর্তী যুগের দূতকাব্য বেশীর ভাগই দার্শনিক কাব্য; যেমন মহাপ্রভুর মাতুল বিষ্ণুদাস রচিত মনোদূত কাব্য; দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য কৃত বৈদান্তিক কাব্য হংসদূত ইত্যাদি। ঐতিহাসিক কাব্যের দিক থেকে বাণভট্টের হর্ষচরিত, শঙ্করের ভুবনাভ্যুদয় কাব্য, পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্ক-চরিত, বিল্হনের কর্ণ-সুন্দরী নাটিকা ও বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত-কাব্য, কল্হণের রাজতরঙ্গিণী, শম্ভুকৃত রাজেন্দ্রকর্ণপুর, হেম-চন্দ্রকৃত কুমারপাল চরিত, সোমেশ্বর দত্ত কৃত কীর্ত্তি-কৌমুদী ও সুরথোৎসব কাব্য, বঙ্গীয় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত রামচরিত, অরিসিংহ কৃত সুকৃতসঙ্কীর্তন কাব্য, জল্হণের সোমপালবিলাস, গৌড়কবি চন্দ্র-শেখর কৃত শূর্জন-চরিত, লক্ষ্মীধর কৃত আবদুল্লাচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাকরণ-প্রপঞ্চনাত্মক কাব্যভেদও আমাদের স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিভাগে ভূমক-কৃত রাবণার্জুনীয়, দিবাকর-কৃত লক্ষ্মণাদর্শ, কাশীনাথ কৃত যদুবংশ কাব্য পাণিনিসূত্রোদাহরণ কাব্য, নারায়ণকৃত সুভদ্রাহরণ, বাসুদেবকৃত বাসুদেব-বিজয়, নারায়ণকৃত ধাতুকাব্য, বাক্যাবলী, শ্রীচিহ্ন কাব্য ইত্যাদির নাম আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এভাবে সংস্কৃত কাব্যকে অজস্র ভাগে ভাগ করা চলে—এবং তা হ'লেও প্রত্যেক বিভাগেই অগণিত মূল্যবান গ্রন্থের যথেষ্ট সমাবেশ ঘটে।

আমাদের ব্যাকরণশাস্ত্রও সত্যি অতুলনীয়। পাণিনি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, জয়াদিত্য, বামন প্রভৃতির কঠোর সাধনার ফলে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের প্রাচুর্যে শব্দের ব্যুৎপত্তি আপনি যেন এসে তাঁদের কাছে ধরা দিয়েছে, শব্দবিশ্লেষণ তাঁদের দিব্যচক্ষে কিছুই যেন বাদ পড়েনি। ফলতঃ পাণিনির সমকক্ষ বৈয়াকরণ সমগ্র জগতে বিরল—তা' জগতের সকল পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করেছেন। আমাদের অলঙ্কার ও ছন্দঃ-শাস্ত্রেরও তুলনা কোথায়? বিজ্ঞান, শিল্পশাস্ত্র ও কলাবিদ্যার কথাই না হয় ধরুন। গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি কত প্রকারের বিজ্ঞান; কৃষিকার্য, গোপালন, স্থাপত্য, রন্ধন, আয়ুর্বেদ, পশুচিকিৎসা, বৃক্ষচিকিৎসা, যুদ্ধ, মৃগয়া, পত্র-লেখন প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্প; নৃত্য গীত, অভিনয়, সীবন, চিত্রণ প্রভৃতি ললিত কলা। সংস্কৃত ভাষা ঈদৃশ অগণিত বিষয়ের ধারয়িত্রী ও পালয়িত্রী। প্রত্যেকটী বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা,—যা' জগতে অদ্যাপি ধারণাতীত —আমাদের সংস্কৃতে নিবদ্ধ রয়েছে।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীভ্রামরী রায়

ভস্মমাঝে বহ্নি যথা, আপনার স্বরূপ তেমনি
লুকায়ে আসিলে, দেবী! বাহিরের দীন আবরণে;
অপরূপ-রূপা তুমি, তাই বুঝি হেলাভরে রূপেরে
করিলে বিসর্জ্জন। তুমি কি গো জন্ম নিয়েছিলে, যুগে
যুগে ধরণীর কোলে, কভু সীতা কভু সতী হয়ে!
তোমার তুলনা তুমি, অয়ি পতিব্রতে! পতি তব
যোগী তাই তুমিও যোগিনী; নীরবে সাধিয়া গেলে
পতিসেবাব্রত লোকচক্ষু-অগোচরে ক্লান্তিহীনা
বিরামবিহীনা। ভিখারী শঙ্করগৃহে অন্নপূর্ণা সম
অহরহ বিরাজিতে ক্ষুদ্র নহবতে, সেদিন কি জগতের
ভেবেছিল কেহ, ছদ্মবেশে সরস্বতী রয়েছেন হেথা?
তারপর যবে, জগদ্‌গুরু পতি তব তোমারে ছাড়িয়া
গেলেন আনন্দলোকে, কেমনে সহিয়াছিলে সে
দুঃসহ ব্যথা? বিয়োগ-বিধুরচিত্ত শিষ্যগণ তাঁর,
অদর্শনে হয়ে মর্ম্মাহত, গেল চলি দেশ দেশান্তরে
খুঁজিতে পরমা শান্তি অরণ্যে, পর্ব্বতে, ত্যজি গৃহবাস।
একাকিনী, অতল জলধিতলে কমলার মত
রহিলে বিস্মৃতি-সিন্ধু মাঝে, দীর্ঘ প্রতীক্ষায়;
অদ্ধাশনে, অনশনে কত যে কাটিল দিন, কে
বলিবে আজ? তবুও, হে নিরভিমানিনী!
পলাতক সন্তানেরা যবে, ফিরে এল তব ক্রোড়ে,
স্নেহহাস্যে প্রসন্ন আননে রাখিলে তোমার উদার
কল্যাণ পাণি তাহাদের শিরে নির্ব্বিচারে।
তোমার আশীষ লভি হল জগজ্জয়ী তব সন্তানেরা,
জয়মাল্য বহিয়া ললাটে প্রণমিল যবে আসি
তোমার চরণে, চন্দ্রলেখা সম তব স্নিগ্ধদৃষ্টি
দিয়ে, অভিষিক্ত করি নিলে বীর পুত্রগণে।
আজ তুমি হেথা নাই, গেছ চলি যে দুর্লভ লোকে
তব শাশ্বত আবাস; আজও কি ভাবিছ সেথা
সন্তানের সুখ-দুঃখ-কথা? শান্ত সকরুণ আঁখি,
আজও কি রয়েছ জাগি, নিপীড়িত এ বিশ্বের
ব্যথা মুছাবারে?

বৈজ্ঞানিক আরিনিয়াস

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণ কমল রায়, এম-এসসি

মনীষী সাভাণ্ট আরিনিয়াসের (Svante Arrhenius) সঙ্গে এদেশ পরিচিত নয়। ইনি সুইডেনের অধিবাসী ছিলেন। আরিনিয়াসের জন্ম হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, মালার (Malor) হ্রদের তীরবর্ত্তী উজিক্ (Wijk) নগরে। ইনি কৃষক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পর আরিনিয়াসের পিতা উপসলা (Upsala) নামক শহরের অধিবাসী হন এবং যথাসময়ে তাঁহাকে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। আরিনিয়াস নিম্নশ্রেণীতে সেরূপ কোন প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহার মধ্যে রাসায়নিক প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি উক্ত কলেজের আবহাওয়ায় সন্তুষ্ট না হইয়া ষ্টক্‌হলমে চলিয়া যান এবং কিছুদিন পর সেখানে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত হন। আরিনিয়াসের গবেষণার ক্ষেত্র ছিল দ্রবণ ও বিদ্যুৎ। তিনি ক্রমশঃ তাঁহার কাজে সুফল পাইতে থাকেন, কিন্তু উপসলার তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার উপর বিরূপ হওয়ায় তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রতি উঁহারা অবহেলা প্রদর্শন করেন। আরিনিয়াসকে অতিশয় দ্বিধার সহিত নিবন্ধ (Thesis) পেশ করিতে হয়। ফলেও তাহাই হইল, সকলে তাঁহাকে একটি বোকা সাব্যস্ত করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহাকে চতুর্থ শ্রেণীর ডিগ্রি দান করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রথিতযশাঃ বৈজ্ঞানিক ওয়াকার সাহেব সুন্দর লিখিয়াছেন, "ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্গম্যান্ (Bergman) ও বার্জিলিয়াস (Berzilius)এর মত মনীষীর অধিষ্ঠান ছিল সে বিশ্ববিদ্যালয় কি বলিয়া এরূপ অভিনব, চমৎকার উচ্চস্তরের নিবন্ধটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিলেন? অথচ বার্জিলিয়াস ও বার্গম্যান উভয়ে ঐ একই সূত্র ধরিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আরিনিয়াস্‌কে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হইয়াছে।...... ইত্যাদি।"

উপসলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারে আরিনিয়াস একদম হতাশ হইয়া পড়েন এবং রসায়ন হইতে চিরবিদায় নেওয়ার মনস্থ করেন। তাঁহার মনে ধিক্কার আসে; এমন কি প্রবন্ধের এতগুলি নকল কি করিবেন তাহাই ভাবিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাঁহার মনে হয় এগুলি বিভিন্ন দেশের মনীষী-দের কাছে পাঠাইলে মন্দ হয় না। যেমন মনে হইল অমনি সেরূপে কাজ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোথা হইতে সহানুভূতিসূচক একটি পত্রও তাঁহার হস্তগত হইল না। এদিকে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান রসায়নী অস্‌ওয়াল্ড (Oswald) যুব বৈজ্ঞানিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এক মন্দ দিনে এই প্রবন্ধটা তাঁহার হাতে পৌঁছে। সেইদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী একটি কন্যারত্ন প্রসব করেন। নানা অশুভ যোগাযোগে তিনি প্রবন্ধটিও অশুভের মধ্যে ফেলিয়া রাখেন। হঠাৎ একদিন ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার মন আরিনিয়াসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং চিঠিপত্রের ধার না ধারিয়া হঠাৎ এক দিন নিজেই উপসলা যাইয়া উপস্থিত হন। উপসলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ প্রবীণ দুর্দ্ধর্ষ অস্‌ওয়াল্ডের উপস্থিতির কারণ বুঝিতে না পারিয়া

সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে তিনি পাগ্‌লা আরিনিয়াসের সঙ্গে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে আসিয়াছেন তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আরিনিয়াস নিজে বলিয়াছেন, "অস্‌ওয়াল্ড আসায় আমার দিনগুলি বেশ কাটিয়াছিল। দুইজনে নিভৃতে দুই তিন দিন রসায়নের একটি গুরুতর সমস্যার আলোচনা করিয়াছি, ইত্যাদি।" অস্‌ওয়াল্ড ইহার পর রসায়নের স্থানীয় প্রধান অধ্যাপক ক্লিভের (Cleve) সঙ্গে দেখা করিয়া বাক্যালাপে রত হন। আরিনিয়াস দূর হইতে শুনিলেন, উহাদের মধ্যে বাক্যালাপ চলিতেছে। অধ্যাপক ক্লিভ বলিতেছেন, "তুমি কি বলিতে চাও এরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইতে পারে?" "হাঁ, এরূপ হওয়ায় কোন বাধা নাই"—দৃঢ়তার সহিত অস্‌ওয়াল্ড উত্তর করেন। এমন সময় আরিনিয়াস্ ঘরে প্রবেশ করায় হঠাৎ উহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য কথা বন্ধ হওয়ায় আরিনিয়াস খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরে উপসলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অস্‌ওয়াল্ডের মধ্যস্থতায় ক্লিভ্ আরিনিয়াসের জন্য একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হন। ইহার কিছুদিন পর তিনি এই যুব বৈজ্ঞানিককে তাঁহার নিজ বিশ্ববিদ্যালয় রিগা (Riga) তে ডাকাইয়া পাঠান। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় আরিনিয়াস্ তখন জার্ম্মাণীতে যাইতে পারেন নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি সুইডেন সরকার হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরিয়া নিজ জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন। এ সময় তিনি অসওয়াল্ড কোল্‌রাস্ (Kohlraush), প্ল্যাঙ্ক (Plank), ভ্যাণ্ট হপ্ (Vant .Hoff), প্রভৃতি তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গ পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ আওনিজেসন (Ionisation) সিদ্ধান্তটিকে (Theory) সম্পূর্ণ রূপ দান করিয়া গিয়াছেন।

এই বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রায় বহির্গত হইয়া আরিনিয়াস্ অস্‌ওয়াল্ড ও ভ্যাণ্ট-হপের বন্ধুত্বকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ভ্যাণ্ট-হপ তাঁহাকে সহোদরপ্রতিম স্নেহ করিতেন এবং দুইজনেই কিছুদিন পরস্পরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় একান্তভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গবেষণার মধ্যেও একটা যোগাযোগ ছিল। বহু সহানুভূতি ও সমর্থনের পর এখন আরিনিয়াস তাঁহার মতবাদটী সুধী-সমাজে দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিলেন।

তদানীন্তন একদল বৈজ্ঞানিক ভ্যাণ্টহপ, অস্‌ওয়াল্ড ও আরিনিয়াসের সমাধানকে অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করিতেন। ইঁহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য লিডস্ (Leeds) নগরে একটি বিজ্ঞান-সভা আহূত হইল। সেখানে উক্ত তিন ব্যক্তি আরিনিয়াসের দ্রবণ-সূত্রসম্বন্ধে আলোচনার জন্য নিমন্ত্রিত হন। এই পণ্ডিতগণ চক্রান্ত করিয়া আরিনিয়াসের সূত্রটী কর্ম্ম-তালিকার পেছন দিকে ফেলিয়া রাখেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ নিজ নিজ মতবাদগুলি সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিলে অস্‌ওয়াল্ড-গোষ্ঠী ঘাব্‌ড়াইয়া যাইবে এবং নিজেদের মতবাদ উত্থাপন করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু ফল দাঁড়াইল বিপরীত। পুরাতন মতবাদিগণ তাঁহাদের কর্ম্মসূচী অনুসারে বক্তৃতা আরম্ভ করিলে দেখা গেল যুব বৈজ্ঞানিকগণ বারন্দায় সরিয়া পড়িয়াছেন এবং সেখানে অস্‌ওয়াল্ড ও ভ্যাণ্টহপের কথা-বার্ত্তায় ডুবিয়া গিয়াছেন। সভাক্ষেত্র ক্রমশঃ শূন্য হইয়া গেল এবং সকলে আরিনিয়াসের মতবাদের যুক্তিযুক্ততায় মাতিয়া উঠিলেন। সেই

দিন সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই দেখা গেল যে সার উইলিয়াম র‍্যামজে (Sir William Ramsay) ও জোন্স ওয়াকারকে (Jones Walker) দলপতি করিয়া যুব-বৈজ্ঞানিকগণ আরিনিয়াসের আইওনিক (Ionic) মতবাদরূপ পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রক্ষণশীল ধুরন্ধরগণ তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্রমশঃ নিজ ভুল বুঝিতে পারিয়া আরিনিয়াসকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র হেনরি আর্মষ্ট্রং (Henry Armstrong) শেষ পর্য্যন্ত আরিনিয়াসের মতবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন।

আইওনিক মতবাদ প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মতবাদের কর্ণধারের তখনও কোথাও সুপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। জার্ম্মাণী হইতে তাঁহাকে একটি বড় পদ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশ-ভক্ত বৈজ্ঞানিক তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের দেশ তখনও রক্ষণশীল পণ্ডিতদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকায় তিনি যথার্থ সমাদর পাইতেছিলেন না। পরে অবশ্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ষ্টকহলম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হয়। এখানেও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ প্রথমতঃ বাধাদানে দ্বিধা করেন নাই। এমন কি আরিনিয়াসের যোগ্যতা অনুসন্ধানের জন্য লর্ড কেলভিন্ (Lord Kelvin) ও অপর দুইজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত হন। এই সংবাদ অসওয়াল্ডের কর্ণগোচর হইলে তিনি রাগান্বিত হইয়া লিখিয়া পাঠান—"এরূপ মহারথীর যোগ্যতা বিচার করিতে যাওয়া বড়ই ধৃষ্টতার কথা।" অসওয়াল্ডের উষ্মা ও আরিনিয়াসের যোগ্যতা উভয়ই নিষ্ফল হইল। বিচারকদের মধ্যে দুই জনই তাঁহার বিপক্ষে ভোট দিয়া চাকরীটী না হওয়ারই ব্যবস্থা করিলেন। অবশ্য উপযুক্ত আর একজন বৈজ্ঞানিক না মিলায় পরিশেষে আরিনিয়াসই সে চাকরীতে বহাল হন। এখন হইতে আরিনিয়াসের জয়-যাত্রার পথের সমস্ত বিপদ কাটিয়া যায়। পর বৎসর তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই রেকটার (Rector) বা প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হন এবং ছয় বৎসর পর ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটীর ডেভি পদক (Davy medal) এবং উহার এক বৎসর পর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

১৯০৫ খৃঃ তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র জয়মাল্য প্রাপ্ত হন এবং ফিরিবার পথে বার্লিন হইতে তাঁহাকে সাদর আহ্বান করা হয়; এমন কি প্রুসিয়ান একাডেমিতে যোগ দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়। এতদিনে সুইডেনবাসীদের চোখ খুলিল। এখন দেশবাসী তাঁহাকে ছাড়িতে অনিচ্ছুক; এমন কি বৃদ্ধ রাজা অস্কার (Oscar) বলিলেন, "আরিনিয়াসকে কিছুতেই যাইতে দেওয়া হইবেনা।" সুইডিস্ য়্যাকেডেমি অব সাইন্স (Swedish Academy of Science) তখন নোবেল ইনষ্টিটিউট্ নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া আরিনিয়াসকে তাঁহারা কর্ণধার নিযুক্ত করেন। এতদিনে মহান্ বৈজ্ঞানিকের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। নিজের সুন্দর গবেষণাগারে বসিয়া তিনি কয়েক জন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দিবারাত্রি গবেষণায় ডুবিয়া থাকিতেন। বিবিধ শাস্ত্রে তাঁহার দখল ছিল। উহাদের সবগুলি অবলম্বন করিয়াই তিনি এখানে গবেষণা করিয়াছেন। ওয়াকার সাহেব লিখিয়াছেন, "এতদিনে আরি-নিয়াস-জীবনের ঝঞ্ঝাবাত্যার অবসান হইল। নোবেল ইনষ্টিটিউটে নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁহার জীবন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়াছিল। সুইডিস্ বৈজ্ঞানিক এতদিন নির্ব্বাসিত বন্ধুহীন ছিলেন, এখন স্বদেশের বরণীয় পুরুষ হইলেন। তিনি সর্ব্বত্র সমান ভাবে উচ্চ-নীচ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র

হইলেন। এই মনীষী সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর ওয়াকার আর একটি সুন্দর কথা লিখিয়া গিয়াছেন, "একদিন আমি ও আরিনিয়াস ষ্টকহলমের একটি প্রধান রাস্তা দিয়া হাটিতে ছিলাম। রাস্তায় একটি ঝাড়ুদারের সঙ্গে দেখা হইল। ঝাড়ুদার টুপি তুলিয়া "গুড্ মর্ণিং, অধ্যাপক" বলিয়া অভিবাদন করিল। আরিনিয়াস স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার সহিত প্রতিনমস্কার জানাইলেন। কয়েক মিনিট পরে আমরা একজন সুসজ্জিত সুপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনিও বৈজ্ঞানিককে একই পদ্ধতিতে অভিবাদন জানাইলেন এবং একই প্রত্যুত্তর পাইলেন। আমার মনে হইল ভদ্রলোকটীকে কোথাও দেখিয়াছি। এবিষয়ে বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'ইনি রাজা গাস্টভ্' (Gustav)।"

আরিনিয়াস মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কোন বাহ্যিক আড়ম্বর দেখা যাইত না। চেহারায় তিনি ছিলেন স্থূল, গৌরবর্ণ ও নীলচক্ষু, ঠিক যেন সুইডেনের একজন গ্রাম্য লোক। তাঁহার প্রকৃতি ছিল সরল, উদার ও সহানুভূতি-সম্পন্ন। জীবনী-শক্তির পরিপূর্ণতা তাঁহার মধ্যে বিরাজ করিত। তাঁহার পছন্দ ও অপছন্দ ছিল বেশ। শান্তভাব ও ঐকান্তিকতার মধ্য দিয়া তিনি সত্য ও স্বাধীনতার একনিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সরলতা, মাধুর্য্য, রসিকতা ও অন্যান্য গৌরবময় ভাবধারায় এতদূর ভরপুর ছিলেন যে যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে আপন জন ও বন্ধু মনে করিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন।

আরিনিয়াসের আবিষ্কার—'আওনিজেসন্ সিদ্ধান্ত' শিল্পজগতে অপরিসীম কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ব্যাটারি সেল্, বিদ্যুৎ দ্বারা ধাতু-শোধন, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ শিল্প ইহারই পরিণতি।

আরিনিয়াসের সূত্রটা এই:—কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আছে যাহাদের দ্রবণ করিলে অণুগুলি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই দ্বিবিধ অংশ তখন একভাগ ধনাত্মক, অপর ভাগ ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত হয়। এই ভাবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তিযুক্ত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার নাম আওনিজেসন। ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে আয়ন বলা হয়।

গীতামৃত-পঞ্চদশ বিন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে মাত্র বিশটী শ্লোক আছে। ইহাতে পুরুষোত্তম যোগ ব্যাখ্যাত। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সাধুসম্প্রদায়ে আহারের পূর্বে ইহা সমস্বরে পঠিত হয়। অতীত অধ্যায়-সমূহে শ্রীভগবান্ যে সকল তত্ত্বকথা পরিব্যক্ত করিয়াছেন তাহার দ্বারা অর্জুনের নূতন তত্ত্ব জানিবার আগ্রহ নির্বাপিত হইয়াছে। এই জন্যই তিনি বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু করুণাময় প্রভু দুর্বোধ্য আত্মতত্ত্ব অন্য প্রকারে ব্যাখ্যানের জন্য এই অধ্যায়ে একটী মনোহর রূপক অবলম্বন করিয়াছেন। সংসারের অসারত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে ইহাকে তিনি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অশ্বত্থ উচ্চতায় ও বিস্তারে বনস্পতিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরূপে পরিগণিত। উহার মূল ভূগর্ভে বহুদূর পর্যন্ত প্রোথিত এবং উহার শাখাপ্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত। উহার মূল অতিশয় দীর্ঘ ও দৃঢ় হইলেও উহা ক্ষণবিধ্বংসী। অশ্বত্থ শব্দের ধাতুগত অর্থ এই—অ (না)+শ্বঃ (কল্য)+স্থ (থাকা)। অর্থ—ইহা কল্য প্রভাত পর্যন্ত স্থায়ী হইবে কিনা বলা যায় না। যাহা আপনাকে স্থাপন ও রক্ষণ করিতে অশক্ত তাহাই অশ্বত্থ। সংসার অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত হইলেও ইহা সান্ত এবং অশ্বত্থবৎ ক্ষণস্থায়ী।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন, "এই সংসার-রূপ মায়াময় বৃক্ষ ঊর্ধ্বমূল ও অধঃশাখ। কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ ইহার পত্রনিচয়, ইহার শাখাসমূহ গুণত্রয়দ্বারা বর্ধিত, বিষয়রূপ প্রবালবিশিষ্ট ও সর্বদিকে বিস্তৃত। ইহার ধর্মাধর্মরূপ মূলসমূহ অধোদেশে মনুষ্যলোকে প্রসারিত।" মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে সংসার ব্রহ্মবৃক্ষ এবং ব্রহ্মবন নামে অভিহিত। সংসারবৃক্ষ এরূপ বিপরীত ভাবে কেন সংস্থাপিত তাহার কারণ প্রদর্শনার্থ ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে, 'এই বৃক্ষ পরব্রহ্মের মায়াশক্তি-প্রভাবে সৃষ্ট এবং তদ্দ্বারাই ইহা পরিপুষ্ট ও সুরক্ষিত। পুরুষোত্তম-রূপ যে পরম ক্ষেত্রাবলম্বনে সংসারপাদপের উদ্ভব তিনি সর্বত্রগ ও সর্বব্যাপী হইলেও ঊর্ধ্বে তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই সংসারপাদপকে ঊর্ধ্বমূল বলা হইল। ইহা ঊর্ধ্বমূল হইলেও অধঃশাখ। এইরূপ বৃক্ষের উপমা প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হয়। ভাগীরথীর তরঙ্গাভিঘাতে তটমৃত্তিকা ক্ষয়িত হইলে তদুপরিস্থ বিশাল পাদপ শিথিলমূল হইয়া যায় এবং প্রভঞ্জন-প্রভাবে উৎপাটিত হইয়া জাহ্নবীর গর্ভে নিপতিত হয়। তখন সেই বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে তটোপরি এবং শাখা অধোদিকে গঙ্গাগর্ভে থাকে। গঙ্গাগর্ভে পতিত বৃক্ষের সহিত এই সংসার-বৃক্ষের অবস্থা তুলনীয়।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার টীকায় মহাভারতের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ যথা—"মায়োপাধিক ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে এই সংসারবৃক্ষ উৎপন্ন এবং সেই মূলীভূত অব্যক্তের অনুগ্রহেই সম্বর্ধিত। বৃক্ষের স্কন্ধদেশ হইতে যেমন শাখাসমূহ উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ এই সংসারবৃক্ষের বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ হইতে বিবিধ পরিণাম

দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের ছিদ্রই এই বৃক্ষের কোটর, আকাশাদি মহাভূত ইহার বিবিধ শাখা। পরমাত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত এই বৃক্ষকে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ছেদন করা যায় না। ইহাই জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ্যবস্তু। ব্রহ্ম স্বয়ং ইহাতে নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত। এই সংসাররূপ অরণ্যকে জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন পূর্বক আত্মগতি লাভ করা যায়। এইরূপে জীব পুনরাবর্তিত হয় না!" কঠোপনিষদে (২।৩) আছে—"এই অশ্বত্থরূপ সংসারবৃক্ষ ঊর্ধ্বমূল। ইহার শাখাসমূহ অধোগামী এবং ইহা চিরন্তন। যিনি ইহার মূল তিনি উজ্জ্বল ও অমৃতরূপী ব্রহ্ম।"

ভগবান শংকরাচার্য কঠোপনিষদের উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "এই সংসারবৃক্ষ অবিচ্ছিন্ন জন্ম-মরণ-শোকাদি অনন্ত দুঃখ সঙ্কুল, প্রতিক্ষণে বিকারস্বভাব; ভেল্কী, মরীচিকা ও গন্ধর্ব-নগরীর ন্যায় দৃষ্টনষ্টস্বভাব, পরিণামেও বৃক্ষবৎ অভাবাত্মক, কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার এবং শতশত পাষণ্ডগণের নানাবিধ কল্পনার বিষয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ধারণে অক্ষম, বেদান্তশাস্ত্রোক্ত পরব্রহ্মই ইহার সারভূত মূল; অবিদ্যা, বাসনা, কর্ম ও মায়ারূপ বীজ হইতে ইহা উৎপন্ন, মায়োপহিত ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত হিরণ্যগর্ভ ইহার অঙ্কুর, সমস্ত প্রাণিগণের সূক্ষ্মদেহের বিভাগাবস্থা ইহার স্কন্ধ, ভোগতৃষ্ণারূপ জলসেকে ইহার বৃদ্ধি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ইহার নবপল্লবের অঙ্কুর; শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় বিদ্যার উপদেশ ইহার পত্র; যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয় ইহার উৎকৃষ্ট পুষ্প; সুখদুঃখানুভব ইহার বিবিধ রস, প্রাণিগণের উপভোগ্য স্বর্গাদি ইহার ফল, ফল-তৃষ্ণাদি সলিলসেচনে সমুৎপন্ন ও দৃঢ়বদ্ধ ইহার মূল। ভূর্ভুবাদি সপ্তলোকস্থিত ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ ইহাতে নীড় নির্মিত করিয়াছেন; প্রাণিগণের সুখজাত হর্ষে এবং দুঃখজাত শোকে সমুদ্ভূত নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রীড়া, আস্ফোটন, হাস্য, রোদন, আকর্ষণ, 'হায়, হায়', 'ছাড়, ছাড়' ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ ইহার তুমুল কোলাহল; এবং বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মাত্মদর্শনরূপ অসঙ্গ শস্ত্র ব্যতীত ইহার অন্য ছেদক হয় নাই। অশ্বত্থের ন্যায় কামনা ও তদনুগত কর্মরূপ বায়ু দ্বারা ইহা সতত চঞ্চলস্বভাব; স্বর্গ, নরক, তির্যক ও প্রেতাদি দেহপ্রাপ্তিরূপ দেহ দ্বারা ইহা অধোগামী এবং ইহা প্রবাহরূপে অনন্ত বলিয়া সনাতন, এবং অনাদি বলিয়া চিরন্তন। ব্রহ্মই এই সংসার-বৃক্ষের মূল।"

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার টীকায় বলেন, "বৈরাগ্যরূপ কুঠারাঘাতে ছিন্ন করা যায় বলিয়াই সংসারকে বৃক্ষরূপে উল্লেখ করা সার্থক ও সুসঙ্গত হইয়াছে। এই সংসাররূপ বিশাল বিটপী কেবল বৈরাগ্যরূপ শাস্ত্রের আঘাতে বিনষ্ট হয়। এই বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বে সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার মূল প্রধান বীজ হইতে চতুর্মুখ মহত্তত্ত্ব অবলম্বনে অঙ্কুরিত। অতি মহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র জীব পর্যন্ত এবং অতি বিশাল পদার্থ হইতে অতি সামান্য পদার্থ পর্যন্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় জাগতিক বস্তু এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা-স্বরূপ। অশ্বত্থ বৃক্ষ বনস্পতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। এই সংসারে সাধনশীল মনুষ্য ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলের অধিকারী হন। সংসারই উক্ত চতুর্বর্গের আশ্রয়। অশ্বত্থ বহু শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত এবং অনেক পক্ষীর আশ্রয় স্বরূপ বলিয়া সংসারকে অশ্বত্থরূপে উল্লিখিত। শ্রুতিবাক্যাবলী এই বৃক্ষের পর্ণস্বরূপ। কারণ, সেইগুলি কাম্যকর্মবিধায়ক এবং বাসনা-সংবর্ধন দ্বারা বিষয়াসক্তির পরিপোষক। বৃক্ষের পত্রসমূহও মূল বৃক্ষের সংরক্ষক। একটী শ্রুতিবাক্যে আছে—

'ঐশ্বর্যকামী পুরুষ বায়ুদৈবত শ্বেতছাগ দ্বারা যজ্ঞ করিবেন। সন্ততিকামী ব্যক্তি ইন্দ্রদৈবত একাদশ কপালাত্মক যাগ করিবেন।' শ্রীমদ্বলদেব আরও বলেন, "বৈরাগ্য সংসার-বন্ধনের ছেদক, সনাতন জীব ঈশ্বরের অংশ এবং ঈশ্বরই সর্বোত্তম শ্রীমান্ পুরুষ—এই তত্ত্ব পঞ্চদশে নিরূপিত।" শ্রীধরস্বামীর মতে "বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় না। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বৈরাগ্যসংযুক্ত জ্ঞানের তত্ত্ব পরিস্ফুট রূপে পঞ্চদশে নির্দেশ করিতেছেন।" শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, "নিঃসঙ্গতাই সংসার-নাশক। জীব ভগবানের অংশ এবং ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষরাক্ষর উভয়েরই উৎকৃষ্ট পুরুষ। এই সকল তত্ত্ব পঞ্চদশে ব্যাখ্যাত।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "এই সৃষ্টিব্যাপার ইন্দ্রজালবৎ। ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বকীয় কৌশলবলে মায়াহস্তী প্রভৃতি প্রদর্শন করে তদ্রূপ পরমেশ্বর স্বকীয় অচিন্তনীয় শক্তিপ্রভাবে এই বিশ্বব্যাপারের সংঘটন করিয়াছেন।" যতদিন জগতে থাকা যায়, ততদিন এই মায়াময় সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, এবং ইহার আদি, অন্ত ও স্থিতিও স্থির করিতে কেহ সমর্থ নহে। দৃঢ়মূল এই সংসারাশ্বত্থকে সুশাণিত বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদনপূর্বক ব্রহ্মপদ লাভের সুগম উপায় অন্বেষণ করিবে। যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, যাঁহা হইতে এই অনাদি সংসার-বৃক্ষের প্রবৃত্তি, সেই আদিকারণ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের শরণ করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হয়। ভগবানের শরণাগতিই ব্রহ্মলাভের সহজ উপায়। অহঙ্কারহীন, অবিবেকশূন্য, আসক্তি-দোষজয়ী, পরমার্থনিষ্ঠ, বাসনা বর্জিত, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত অজ্ঞানরহিত সাধকগণই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

এই ব্রহ্মপদ লাভ করিলে আর সংসারে পুনর্জন্ম হয় না। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই জগৎ প্রকাশ করিতে পারিলেও ব্রহ্মপদ প্রকাশে অক্ষম। কারণ তাঁহার জ্যোতিতে ইহারা জ্যোতিষ্মান্। সংসারে কর্তা-ভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব ব্রহ্মের সনাতন অংশ। শংকরাচার্য এই প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষ্যে বলেন, "জলরূপ নিমিত্ত অপসৃত হইলে সূর্যাংশ জলসূর্য যেমন সূর্যে লীন হয়, অথবা মহাকাশের অভিন্ন অংশ ঘটস্থ আকাশ যেমন ঘট নষ্ট হইলে মহাকাশে মিলিত হয়, আর প্রত্যাগমন করে না সেইরূপ ব্রহ্মাংশ জীব অবিদ্যাকৃত দেহাদি উপাধি অপগমে ব্রহ্ম-প্রাপ্ত হইয়া আর পুনরাবৃত্ত হয় না। কারণ, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। জীবত্ব, জীবের সংসৃতি ও উৎক্রমণ মায়িক, কল্পিত মাত্র।" সত্যই "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"। ব্রহ্মই জীবরূপে সংসারে দেহাদি সংঘাতের স্বামী কর্তা ও ভোক্তা। উহা যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন কর্ণবিবরাদি স্থানে অবস্থিত শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে। বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি হইতে গন্ধ আহরণ করে জীব সেরূপ শরীরান্তর গ্রহণ কালে পূর্বদেহ হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংগে লইয়া যায়; অর্থাৎ পূর্বদেহের ইন্দ্রিয়াদি নূতন দেহে প্রবেশ করে।

দেহাবদ্ধ জীব চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা আশ্রয় করিয়া রূপ, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয়কে মনের সাহায্যে উপভোগ করেন, বা যিনি ত্রিগুণের পরিণামে সুখ, দুঃখ ও মোহ সংযুক্ত হন সেই আত্মাকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে পারে না। কারণ, তাহাদের মন বিষয়াকর্ষণের দ্বারা বহির্মুখী; কিন্তু অন্তর্মুখী জ্ঞানিগণই "শাস্ত্রপ্রমাণজনিত জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা সেই আত্মাকে অবগত হন।" সমাহিত-চিত্ত যোগিগণ এই আত্মাকে স্বীয় বুদ্ধির সাক্ষিরূপে

অবস্থিত দর্শন করেন। কিন্তু যাহাদের চিত্ত তপস্যা ও ইন্দ্রিয়জয় দ্বারা সংস্কৃত, শুদ্ধ হয় নাই সেই অবিবেকিগণ যত্নশীল হইলেও আত্মদর্শন পায় না। যে জ্যোতিঃ সূর্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে বর্তমান এবং যাহা সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে সেই জ্যোতিঃ ব্রহ্মের, অর্থাৎ পরমাত্মার। ব্রহ্ম-শক্তি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া চরাচর ভূতসকল ধারণ করেন এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ব্রীহি-যব-ধান্যাদি ওষধি পুষ্ট করেন। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত প্রাণিগণের দেহ আশ্রয়পূর্বক ব্রহ্মশক্তিই উদরাগ্নিরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়-এই চারি প্রকার খাদ্য পরিপাক করেন। ব্রহ্ম সকল প্রাণীর হৃদয়ে আত্মারূপে বিরাজিত। ব্রহ্ম হইতেই প্রাণী মাত্রের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলুপ্ত হয়, ব্রহ্মই চতুর্বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু। তিনিই আচার্যরূপে বেদান্ততত্ত্ব প্রচারের সম্প্রদায়প্রবর্তক ও বেদার্থবিৎ।

ইহলোকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অনুভূয়মান ক্ষর ও অক্ষর নামক দুই পুরুষ বিদ্যমান। ক্ষর পুরুষই জগতের সমস্ত বিনাশী বিকার এবং মায়াশক্তিই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মপুরুষের উপাধি বলিয়া ইহাদিগকে পুরুষ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের মায়াশক্তি ক্ষর নামক পুরুষের উৎপত্তিবীজ। সংসারবীজ অনন্ত বলিয়া মায়াশক্তিকে অক্ষর বলে। পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষর উপাধিদ্বয় হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহাদের দোষে অস্পৃষ্ট এবং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। বেদান্তশাস্ত্রোক্ত পরমাত্মাই পুরুষোত্তম নামে অভিহিত। পুরুষোত্তম নামক অব্যয় ব্রহ্ম চৈতন্যবল শক্তিরূপে সমগ্র বিশ্বে প্রবেশ করিয়া স্বরূপসত্তার দ্বারা তাহার পরিপালন করেন। অশ্বত্থ নামক মায়ারূপ সংসার-বৃক্ষকেই ক্ষর বলা হইয়াছে। ব্রহ্মপুরুষ ক্ষরাতীত এবং 'অক্ষরাদপি চোত্তমঃ'। কাব্যাদিতে, ভক্তজনে ও বেদে ব্রহ্মই পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। কাব্যে আছে, 'শ্রীহরিই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমরূপে শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত।' ভক্তগণ বলেন, 'যিনি করুণাবশতঃ নরলীলা করেন এবং যিনি অর্জুনকে পরমার্থ বিষয়সমূহ ও স্বীয় ঐশ্বর্য বুঝাইয়াছিলেন সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম 'পুরুষোত্তমের মহিমা অপার।' ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।৩) আছে, 'এই জীব যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপসম্পন্ন হন তখন তিনিই পুরুষোত্তম।'

যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহে 'আমি' বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক কথিত প্রকারে পুরুষোত্তম পরমব্রহ্মকে আত্মরূপে জ্ঞাত হন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই। মুণ্ডকোপনিষদে (২।১।২) আছে, "অমূর্ত দিব্য ব্রহ্ম পুরুষ অক্ষরের অতীত। কঠোপনিষদে (১।৩।১১) আছে, 'ক্ষরাতীত অক্ষরাৎ উত্তম ব্রহ্মের পর অন্য কিছু নাই। সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিঃ।' সেই ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে মানুষ সর্বজ্ঞ হয়। ব্রহ্মদর্শন হইলেই সকল "কর্তব্যের অবসান হয়। মনুসংহিতায় (১২।৯৩) আছে, 'বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই জন্মের সফলতা, সার্থকতা। এই ব্রহ্মজ্ঞানকে লাভ করিতে পারিলে দ্বিজাতি কৃতকৃত্য হয়। অন্য কোন প্রকারে তাহার কৃতকৃত্যতার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতিও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ। অর্জুন শ্রীভগবানের নিকট এই পরমার্থতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞানেই পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীতাশাস্ত্রের সার ও সমগ্র বেদার্থ নিহিত আছে বলিয়া এই অধ্যায়কে শাস্ত্র বলা হইয়াছে। শ্রীধর স্বামীর মতে অশ্বত্থরূপ সংসার-বৃক্ষ ভেদ করিয়া শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম যোগ নামক পরমপদ এই অধ্যায়ে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, 'যিনি বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীহরিই সেই পুরুষোত্তম—এই তত্ত্ব এই অধ্যায়ে নিরূপিত।' শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে 'জড় চৈতন্যবর্গের বিশ্লিষ্ট বিবরণ বিন্যস্ত করিয়া পঞ্চদশে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মহোৎকর্ষ-স্বরূপ।' যামুনমুনির মতে পঞ্চদশের তাৎপর্য এই—জড় চৈতন্য ও বিশুদ্ধ চৈতন্য এতদুভয় হইতে সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্বব্যাপকত্ব হেতু, সর্বপালকত্ব হেতু এবং সর্বস্বামিত্ব হেতু পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র।

মহামায়া

শ্রীমতী নীলিমা সরদার

আমাদের দেশে দ্বৈত ও অদ্বৈত দুইটি মত প্রধান ও প্রচলিত এবং এই দুই মতবাদের মধ্যে বিবাদও চিরসিদ্ধ। যাঁহারা মতবাদ লইয়া ব্যস্ত বিবাদ তাঁহাদের কোনদিনই মিটিবে না; কিন্তু যাঁহারা উভয় মত বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন এবং বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট মতবাদ বলিয়া কিছুই নাই। অদ্বৈতবাদী এক ব্রহ্মমাত্র স্বীকার করেন, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। দ্বৈতবাদী জীব এবং ব্রহ্ম এই দুই স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? দর্পণে মুখ-প্রতিবিম্বের মত অন্তঃকরণে চিচ্ছক্তির প্রতি-বিম্বই জীব। জল একমাত্র জলই। আধারভেদে যেরূপ কূপোদক গঙ্গোদক ভেদ সিদ্ধ সেইরূপ উপাধিভেদে বহু আত্মা স্বীকারেও দোষ নাই। ব্রহ্ম যদিও এক অসীম অনির্ব্বচনীয় তথাপি তাঁহার অবতাররূপে শরীর গ্রহণে আপত্তি নাই। বায়ু সর্ব্বব্যাপী সত্য, কিন্তু সকল সময় ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহাতে বায়ুর অস্তিত্বে সন্দেহের অবকাশ নাই। শাখা-প্রশাখার আন্দোলন বা তৃণাদির কম্পনের দ্বারাই মাত্র বায়ুর অস্তিত্ব নিরূপিত হইবে ইহা সম্ভব নহে। বায়ু সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বদা আমাদের অনুভব হয় না, উৎকট বায়ুই আমাদের অনুভবের গোচরীভূত হয়। অতএব অনুৎকট অবস্থায়ও বায়ুর অস্তিত্ব যেমন সুস্থির তেমনিই আত্মগুণের উৎকটানুৎকট অবস্থার জন্য সময় সময় অবতার গ্রহণ অসম্ভব নয়; আবার অবতার-গ্রহণ-হেতু আত্মার একত্বের ও ভঙ্গ হয় না। ইহা অতি সাধারণ কথা।

ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু, তদতিরিক্ত সমুদয় অসৎ ইহা সম্ভব কিরূপে? বেদ চারিটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, অতএব আমার চক্ষুর দ্বারা এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করি ইহাকে একান্ত-রূপে অসৎ বলি কি প্রকারে? বেদান্ত বলেন— রজ্জু অন্ধকার অথবা আলোক সর্ব্বত্রই রজ্জুত্ব ধর্ম লইয়া বিদ্যমান, কুত্রাপি সর্পত্ব ধর্ম গ্রহণ করে নাই। তথাপি স্বল্পান্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রমে আমরা শিহরিয়া উঠি এবং ত্রস্তে সে স্থান ত্যাগ করি। রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপ অসম্ভব নয় তো। যখন যে ব্যক্তি রজ্জু হইতে ভীত হয় সে তাহাতে সর্পই দর্শন করে, নতুবা যে রজ্জুকে রজ্জুরূপেই জানে সে কোনপ্রকারেই ভীত হইবে না।

আরও কামলা-ব্যাধিদুষ্ট ব্যক্তির শুভ্র শঙ্খেও পীতত্বের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা সম্ভব কিরূপে? অতএব চক্ষুদ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহাই অভ্রান্ত নহে। নেত্রদোষে প্রত্যক্ষের গোচরীভূত বস্তু বিকৃত হয়। এই যে ভ্রম—বস্তুতে অবস্তুর আরোপ—ইহাই অধ্যাস বা মায়া। এই মায়া কি তাহা নির্ব্বচন করা যায় না। ইহা সৎ নয়, আবার অসৎও নয়। কারণ যদি এই মায়াকে সৎ বলা হয় তাহা হইলে সৎ বস্তুর নাশ অসম্ভব বলিয়া মায়ার ধ্বংসাভাবে মোক্ষ অসিদ্ধ হয়। আবার যদি ইহাকে অসৎ বলা যায় তাহা হইলে বস্তুর অস্তিত্বাভাব বশতঃ নিষেধ অসম্ভব হয়। যাহা সৎ তাহার অভাব সৎ; কিন্তু যাহা অসৎ তাহার অভাব সৎ নহে। যাহা আছে বলিয়া আমরা জানি তাহারই অভাব আমরা অনুভব করি, যাহা নাই তাহার অনুভব না থাকায় তাহার অভাবেরও অনুভব নাই। জগতে কি যে নাই তাহা কেহ বলিতে পারে না। কারণ যাহা নাই তাহা আমরা জানি। এই মায়া

বা অজ্ঞান যে আছে ইহা সকলেই অনুভব করেন। "আমি কিছু জানি না", "আমি অজ্ঞ", এই অনুভব আমাদের আছে। "আমি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম, কিছুই জানিতে ছিলাম না।" এই না জানা বা অজ্ঞতা অস্বীকার করার উপায় নাই, এই অনুভব প্রত্যেকের আছে। অতএব ইহা অসৎ নহে, কিন্তু জ্ঞানী (ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন) ব্যক্তি যখন মায়াকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন, তখন ইহা অসৎ। সেই কারণে মায়াকে সদসদ্রূপে অনির্বাচ্য বলা হয়। বেদান্ত যাহাকে অধ্যাস বা মায়া আখ্যা দিয়াছেন, সাংখ্য তাহাকে বলিতেছেন—"প্রকৃতি"। এই প্রকৃতি জগৎপ্রসূতি। এই মায়া বিশ্বজননী হইলেও এই উভয় মতবাদের মধ্যে আমরা যে মায়াকে দেখি তিনি পুরুষের বা ব্রহ্মের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে কার্য্যক্ষম নন। প্রকৃতি বা মায়া জড় বস্তু। চৈতন্যের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে জড় বস্তু কার্য্যক্ষম হয় না। চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যতা ও ইষ্টসাধনতা আত্মার গুণ; উহার অস্তিত্ব জড়ে নাই। তাই ব্রহ্মের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে জড়া প্রকৃতি বিশ্বজননী নহে। ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারাই প্রকৃতি মধ্যে জগতের জন্ম। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রামিত হয়। কারণগুণাতিরিক্ত কার্য্যগুণ অসম্ভব। কিন্তু কার্য্যগুণাতিরিক্ত কারণগুণের অস্তিত্বে আপত্তি নাই। কারণ-গুণ ব্যাপক কার্য্যগুণ ব্যাপ্য। অতএব জড়া প্রকৃতি জগৎকারণ হইলে জীব চৈতন্যবিশিষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু চেতন মনুষ্যাদি জীব উক্ত সৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়, অতএব জগতের কারণ-শরীরে অবশ্য চৈতন্যধর্ম্ম বিদ্যমান। এই চৈতন্য-ধর্ম্ম অচেতনা প্রকৃতির নাই, অতএব প্রকৃত্যতিরিক্ত কোনও চেতন পদার্থ এই সৃষ্টিরহস্যের কারণ। চেতন পদার্থই ব্রহ্ম-আত্মা। আবার নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের কামাদির অভাব হেতু চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যতা ও ইষ্ট-সাধনার অভাব স্বীকার্য্য। সেই কারণে মায়াপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হয়। কেবল শুদ্ধ চৈতন্য জগতের উপাদান হইলে জগৎ কেবল চৈতন্যময় হইত; কিন্তু জগতে চেতনাচেতন উভয়বিধ ধর্ম্মই বিদ্যমান। তাই মায়াপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলা হয়—তিনিই জগৎকারণ। মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহাতে মায়ার গুণও কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই মায়াশক্তি চৈতন্যস্বরূপ মহামায়া শ্রীশ্রীচণ্ডিকার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-নিত্য চৈতন্যই জগৎ-প্রসূতি বিশ্বজননী মহামায়া। মহামায়া মায়াশক্তি-বিশিষ্ট হইলেও তাহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তাঁহাতে মায়াশক্তি বিদ্যমান। তদতিরিক্ত বস্তুর অভাব বশতঃ তাঁহাতেই মায়ার বিদ্যমানতা; কিন্তু মায়াতিরিক্ত বস্তুর অভাব নাই এবং তাহাতে সর্ব্বময়ী মহামায়ার বিদ্যমানতা যুক্তি-সিদ্ধ। ভ্রম আধারাত্মক। তাই মহামায়ায় জগৎ-ভ্রমও সুসম্ভব। তিনি সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বনিয়ন্ত্রী সর্ব্বময়ী। চৈতন্যস্বরূপের স্ত্রী বা পুং রূপে কোনও লিঙ্গ নাই। তাই ব্রহ্মজ্ঞেরও কোন লিঙ্গ নাই, বয়স নাই।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি,
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, কুমার হও কিংবা কুমারী হও তাহাতে কিছু যায় আসে না। তুমি সদ্যজাত হও কিম্বা জরাজীর্ণ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে বিচরণ কর তাহাতে ক্ষতি নাই, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান থাকিলেই তুমি মুক্ত। অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই।

চৈতন্যের লিঙ্গ না থাকিলেও এই যে আমরা তাঁহাকে মাতৃরূপে চিন্তা করি ইহা কেবল কল্পনা-মাত্র। মাতৃরূপে কল্পনা না করিয়া পিতৃরূপে কল্পনা করিলেও চৈতন্যস্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় না।

সন্তানের প্রতি মাতা অধিকতর স্নেহশালিনী হন বলিয়াই আমরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া তৃপ্তি পাই—আনন্দ পাই। ইহা হইতেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের বিক্ষোভ বশতঃ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব ক্রমে জগৎসৃষ্টি। ইনিই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই হিরণ্যগর্ভ প্রথম পুরুষ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় পরিচালনার জন্য তিন প্রধানশক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও কৈবল্যমুক্তির জন্য নিয়ত সাধনা করিতেছেন। অতএব দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় পরিচালনা করেন তাহা কামনাবান্ জীবের আত্মোন্নতির পুরস্কারস্বরূপ পদমর্য্যাদা মাত্র। জীব স্ব স্ব কার্য্যদ্বারা ধূম্রাদিমার্গে বা দেবযানাদি মার্গে সোপানে সোপানে উত্তরোত্তর উর্দ্ধগতি লাভ করে এবং তথায় হিরণ্যগর্ভের সহিত একত্রে দেবীর সাধনা করিয়া বিদেহ-কৈবল্য লাভ করে।

দেবীসূক্তে বাগ্‌দেবী মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্য-
হমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ......"

দেবী বলিয়াছেন :

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর।
ঈশ্বরোহহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাডাত্মাহমস্মি চ॥
ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী॥
সূর্য্যোহহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্।
পশুপক্ষিস্বরূপাহং চণ্ডালোহহং চ তস্করঃ॥
ব্যাধোহহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকাকারোহপ্যহমেব ন সংশয়ঃ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেহপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা॥
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচরাচরম্।
যদ্যস্তি চেত্তচ্ছূন্যং স্যাদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমং হি তৎ॥"

হে হিমালয়, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোত ভাবে আমাতেই রহিয়াছে। আমিই ঈশ্বর আমিই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, আমিই বিরাট। আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র। আমিই গৌরী সরস্বতী এবং লক্ষ্মী। আমিই সূর্য্য তারকা এবং চন্দ্র। পশুপক্ষিরূপে আমিই এবং আমিই চণ্ডাল ও তস্কর। আমিই নিষ্ঠুর-আচরণশীল ব্যাধ, আমিই সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী সাধু ব্যক্তি। আমি স্ত্রী—আমি পুরুষ এবং আমিই নপুংসক ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অন্তরে বাহিরে কোথাও যাহা কিছু বস্তু দেখা যায় কিম্বা শুনা যায় আমি সর্ব্বদা সেই সমুদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছি। মদতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই, যদি থাকে তাহা বন্ধ্যার পুত্রের মতই মিথ্যা।

সর্ব্বশক্তিশালিনী জননী মহামায়া কখনও একরূপে কখনও বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। কখনও দেখি ক্রোধে আরক্তনয়না লোলজিহ্বা—শাণিত-অসিধারিণী তাণ্ডবনৃত্যশীলা ভীষণা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। কখনও দেখি বরাভয়-হস্তে সন্তানের প্রতি একান্ত স্নেহময়ী মৃদুমধুর হাস্যময়ী জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী। এইরূপে যেন আপন মাকে চিনিতে পারি। আমরা যাহারা সাধারণ কামক্রোধাদিযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ আমাদের কল্পনায় তো আসেই না অধিকন্তু আমরা যেন বিব্রত বোধ করি। কিন্তু যখন আমরা চিন্তা করি সেই চিন্ময়ী মহাশক্তি আমার জননী, আমার মঙ্গলবিধায়িত্রী তখনই আপনার একান্ত প্রিয়জন বলিয়া চিনিতে পারি—অনুভব করিতে পারি। সন্তান বিপদাপন্ন হইয়া মাতার সামীপ্যকেই একমাত্র নির্ভয় স্থল জ্ঞানে মাতৃক্রোড় অভিমুখে ধাবিত হয়। তাই যাহার যখনই কোনও দুঃখ আসিয়াছে—কি দেবগণ কি মনুষ্যগণ—দেবীর শরণাপন্ন হইয়া অভয় চাহিয়াছে, বিজয় চাহিয়াছে। মা মহামায়া ভক্তের, সন্তানের

সেই ভয়বিহ্বলতা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই! সন্তানের আকুলতায় স্নেহার্দ্রচিত্তে বিরাট শক্তিতে প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা দণ্ডায়মানা।

রাজ্যহারা সুরথ হতমান হইয়া ঋষির উপদেশ ক্রমে বিজয় কামনা করিয়া মাতার চরণচিন্তায় বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিলেন। করুণাময়ী জননী কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া সুরথের অভীষ্ট দান করিলেন। সাধনপরায়ণ বৈশ্যের কামনানুরূপ ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়া তাঁহার মুক্তি-বাসনা পূর্ণ করিলেন। তদবধি দেবীপূজার বহুল প্রচার আরম্ভ হইল।

দেবী মহিষাসুর-বধকালে প্রত্যেক দেবতার অন্তঃস্থিত আপন চিৎশক্তিকে আহ্বান করিয়া অপরূপ তেজোময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

এই মহামায়াই লক্ষ্মী সরস্বতী এবং গৌরী রূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কার্য্যপরিচালনায় শক্তি সাহায্য করেন। তাই যেদিন আপনাদের ক্ষমতাগর্ব্বে ব্রহ্মাদি অহঙ্কারে আত্মশ্লাঘা করিলেন সেই মুহূর্ত্তে দেবী আপন শক্তি সংহরণ করিয়া আপনাতে অবরুদ্ধ রাখিলেন। শক্তিহীন তিনশক্তি আপনাদের ঔদ্ধত্যের জন্য লজ্জিত হইলেন। পুনরায় শক্তিলাভ করিয়া আপনাপন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলেন।

অত্যাচারী তারকাসুরের বধের নিমিত্ত মহেশ্বরের সন্তানসৃষ্টির বাসনায় তপস্বী হিমালয়ের কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীরূপে প্রকাশিতা হইলেন। ইহা কিছুই অসম্ভব নয়। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, কামাবসায়িতা এই অষ্ট যোগৈশ্বর্য্যের প্রভাবে সাধনতৎপর মনুষ্যও আপনাকে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে পারে। শ্রুতিতে দেবী বলিয়াছেন—"একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।" এক আমি বহু হইব। "অহম্ আত্মনা সংপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" আত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম এবং রূপে আপনি বিকৃত হইলেন। তাই তদতিরিক্ত বস্তু অসৎ। তাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" তাই "এতৎ সর্ব্বং আত্মৈবাভূৎ।" তাই ঊর্দ্ধে, অধে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, ঈশানাদি চতুষ্কোণে, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে, চতুর্দ্দশ লোকে সেই একেরই বিকাশ। আমাদের অণুপরমাণুতে মা। মা আপন স্নেহে আমাদিগকে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন, ক্ষণমাত্রও তাহা আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। মাতার সহিত এই নিরবচ্ছিন্ন সংযোগে তিনি অন্তরে, তিনি বাহিরে, তিনি জড়ে, তিনি চৈতন্যে। হিরণ্যকশিপুকে আপনার ব্যাপ্তি দেখাইতে তিনি স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাই দিকে দিকে আমার প্রণাম রাখিলাম। "ত্বং সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ"। তোমার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র বাহু, সহস্র পদ। তোমায় প্রণাম।

পরমহংসদেব আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন সকলে মিলিয়া ধূলা-খেলা করিলেও কাণ যেন আমাদের সজাগ থাকে। মা যেদিন ডাক দিবেন সেদিন ক্রীড়ারত শিশুর মত সকল ফেলিয়া তখনই যেন মায়ের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ি। কোনও দ্বিধা সঙ্কোচ যেন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বাধা সৃষ্টি না করে। তাঁর এই উপদেশ সফল হউক, সার্থক হউক, ধন্য হউক। আজ প্রার্থনা জানাই—দিকে দিকে যে ক্রুরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে, মাতার মঙ্গল হস্তের স্পর্শে তাহার অবসান হউক। আজ মহাশ্মশানে মাকে আহ্বান জানাই "এস মা"। আজ শৃঙ্খলমুক্ত ভারত আহ্বান জানায় "এস মা"। তোমার পদস্পর্শে বন্ধ্যাভূমি শস্যশালিনী হউক। বিশীর্ণা নদী নবযৌবনা হউক। মেঘ যথাকালে পরিমিত বর্ষণ করুক। বৃক্ষসকল ফলশালী হউক, লতিকা পুষ্পবতী হউক। অভাব দূরে পলায়ন করুক। দ্বেষ-হিংসা নিঃশেষে বিলুপ্ত হউক, প্রাণিগণের মঙ্গল হউক। প্রতি পদক্ষেপে তুমি শান্তির শতদল ফুটাইয়া এস মা। এহেহি ভগবত্যম্ব!

"নমঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠে চ নমস্তে পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
অধ ঊর্দ্ধং চতুর্দ্দিক্ষু মাতর্ভূয়ো নমো নমঃ॥"

কুমারিল ভট্টের কয়েকটি অভিনব সিদ্ধান্ত

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের শবরস্বামিকৃত ভাষ্যের উপর ভট্ট কুমারিল বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের (তর্কপাদ) বার্ত্তিক পদ্যে লিখিত; নাম—শ্লোকবার্ত্তিক। দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম পাদ পর্য্যন্ত পনর পাদের বার্ত্তিকগ্রন্থ গদ্যপদ্যমিশ্রিত; নাম—তন্ত্রবার্ত্তিক। অবশিষ্ট চুয়াল্লিশ পাদের বার্ত্তিকগ্রন্থ টুপ্‌টীকানামে খ্যাত। কুমারিল ভট্টকে কার্ত্তিকেয়ের অবতার বলা হয়। বৌদ্ধ প্রভাবে হতোদ্যম হিন্দুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে কুমারিল ভট্ট ও আচার্য্য শঙ্করের প্রয়াসই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া মনে হয়।

তন্ত্রবার্ত্তিকের সদাচারপ্রকরণে 'অপি বা কারণগ্রহণে প্রযুক্তানি প্রতীয়েরন্' (১৩।৭) এই জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যবার্ত্তিকে কুমারিল কতকগুলি অভিনব কথা বলিয়াছেন। অপর কোনও আচার্য্য কোথাও এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

কুমারিল বলিয়াছেন, সদাচারের অনুসন্ধান করিলেও অনেক মহাপুরুষের নানাবিধ স্খলন ও অবিমৃষ্যকারিতা দেখা যায়। প্রজাপতি, ইন্দ্র, নহুষ, বশিষ্ঠ, পুরূরবা, বিশ্বামিত্র, বেদব্যাস, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রমুখ সর্ব্বজনবরেণ্য মহাপুরুষগণ এবং আধুনিক অনেক বিশিষ্ট পুরুষের আচরণেও ধর্মের গ্লানি বা ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রজাপতি আপন দুহিতা উষার সহিত সঙ্গত হওয়ায় অগম্যাগমনরূপ অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন। (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।৬১।৫-৭, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৯।১৩)

ইন্দ্রের অহল্যা গমনও প্রজাপতিরই আচরণের অনুকূল। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৩।৪।১৮)

ইন্দ্রপদে সমাসীন নহুষ বাসবপত্নী শচীদেবীতে আসক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। (মহাঃ উদ্যোগ ১১অ)

বশিষ্ঠঋষি পুত্রশোকে কাতর হইয়া নানা উপায়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (মহাঃ আদি ১৭৬ অ)

বশিষ্ঠের ন্যায় পুরূরবাও তদীয় প্রেয়সী উর্বশীর বিরহে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (ঋগ্বেদ ১০।৯১।১৫, শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৫।১।৯)

বিশ্বামিত্র ঋষি চণ্ডালকে যাজন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ, আদি ৫৯,৬০ অ; মহাভারত, আদি ৭১ অ) মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কনিষ্ঠ ভাই বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদের এবং তাঁহাদের দাসীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন। (মহাঃ আদি ১০৬ অ) ভগবান্ রামচন্দ্র অপত্নীক অবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। (রামাঃ উত্তর ১০৪ অ)

দেবব্রত ভীষ্ম সর্ব্বপ্রকার আশ্রমধর্ম্মের বাহিরে থাকিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন এবং অপত্নীক হইয়াও যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন।

অপত্নীকের যজ্ঞাধিকার নাই। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৩।২৪, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৩।৩) ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াও যজ্ঞ করিয়াছেন। (মহাঃ আদি ১১৪ অ) অন্ধের যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। (শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।১৮) বিশেষতঃ ধৃতরাষ্ট্র স্বোপার্জ্জিত অর্থে যজ্ঞ সম্পাদন করেন

নাই, পাণ্ডুর অর্জ্জিত অর্থই তিনি খরচ করিয়াছেন। সেই অর্থে তাঁহার কোন অধিকার ছিল না।

যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুনের শৌর্য্যলব্ধ ভার্য্যা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। (মহাঃ আদি ১৯৯ অ) আচার্য্য দ্রোণের মৃত্যুর নিমিত্ত তাঁহাকে মিথ্যা কথাও বলিতে হইয়াছে। (মহাঃ দ্রোণ ১৮৯ অ)

শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন উভয়েই শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিবাহ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীপরিণয় (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫৩) এবং অর্জ্জুনের সুভদ্রা পরিণয় (মহাঃ আদি ২২০ অ) মাতুলসুতা পরিণয়ের অন্তর্গত।

উভয়েই সুরাপান করিয়া মত্ত হইতেন। (মহা উদ্যোগ ৫৯.৫)

প্রাচীন যুগের এই কয়টি উদাহরণের পরে কুমারিল তাঁহার সময়ের (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) আরও কয়েকটি অনাচারের উল্লেখ করিয়াছেন। অহিচ্ছত্র (বেরিলির পশ্চিম) ও মথুরানিবাসী ব্রাহ্মণীগণ সুরাপান করিয়া থাকেন। উত্তর ভারতের অধিবাসিগণ ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট প্রভৃতি প্রাণীর প্রতিগ্রহ, বিক্রয় প্রভৃতি করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। তাঁহারা ভার্য্যা, পুত্রকন্যা এবং বন্ধুবান্ধবাদির সহিত একই পাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও মামাতো বোনের পাণিগ্রহণ করাকে প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা চৌকি প্রভৃতি উচ্চ পীঠে বসিয়া ভোজন করাকে অনাচার মনে করেন না। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আরও কতকগুলি অনাচার দেখিতে পাওয়া যায়। বন্ধুবান্ধব ও পুত্রাদি স্বজনের উচ্ছিষ্টলিপ্ত বস্তুর ভোজন, সর্ব্ববর্ণের পরস্পরস্পৃষ্ট তাম্বূল চর্ব্বণ, তাম্বুল চর্ব্বণের পর আচমন না করা, রজকধৌত এবং গাধার স্পৃষ্ট কাপড় চোপড় ব্যবহার, ব্রহ্মহন্তা ব্যতীত অন্যান্য মহাপাতকীকে (সুরাপায়ী, সুবর্ণচোর, গুরুপত্নীধর্ষক এবং মহাপাতকীর সহিত চলা ফেরা করার দোষে দোষী) বর্জ্জন না করা ইত্যাদি।

অতি সাধারণ আরও কতকগুলি অশিষ্ট আচরণ আছে, যে সকল আচরণে জাতি এবং বংশে প্রতিষ্ঠিত পরম্পরাপ্রাপ্ত স্বধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটে। এই প্রকার অসদাচার ব্যক্তিবিশেষে সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

অতএব এইভাবের সৎ ও অসৎ মিশ্রিত আচারকে সদাচার বলা চলে না। এইগুলিকে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করাও সঙ্গত নহে। ভট্টাচার্য্য কুমারিল এই সকল উদাহরণের উল্লেখ করিয়া পরে স্বয়ং সমাধানও করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, প্রজার অর্থাৎ প্রাণিবর্গের জীবনধারণের হেতু বলিয়া সূর্য্যকেও প্রজাপতি বলা যাইতে পারে। অরুণোদয়কালে সূর্য্য উষার সহিত মিলিত হন। সূর্য্যের উদয়ে উষা প্রকাশ লাভ করে। এই কারণে শ্রুতিতে সূর্য্যের (প্রজাপতির) দুহিতৃরূপে উষাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অরুণ-কিরণ-রূপ তেজ উষাতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সেই তেজের সংস্পর্শে উষাকে প্রকাশ করে। এই হেতু কল্পিত পিতাপুত্রীর মিথুনীভাবের আরোপ করা হইয়াছে।

ইন্দ্র শব্দ পরম ঐশ্বর্য্যশালীকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ইন্দ্র শব্দও সূর্য্যবাচক হইতে পারে। অহন্ অর্থাৎ দিনের বেলায় লীয়মান হয় বলিয়া রাত্রিকে অহল্যা বলা যায়। অহল্যার জরণ অর্থাৎ ক্ষয়ের হেতুরূপে সূর্য্যকে অহল্যাজার বলা যাইতে পারে। অহল্যাজার শব্দ ইন্দ্রের পরস্ত্রীধর্ষণের কুৎসা প্রকাশ করে নাই।

ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত নহুষ শচীকে প্রার্থনা করায় শচী ও বৃহস্পতির বুদ্ধিকৌশলে অগস্ত্য ঋষির শাপে অজগরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার দুরাচারত্বই সপ্রমাণ হইয়াছে।

পুত্রশোকে কাতর হইয়া বশিষ্ঠ আত্মহত্যার

চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বশিষ্ঠ-চরিত্রের দুর্ব্বলতা বা মূঢ়তা। ধর্ম্মবুদ্ধিতে তিনি সেই চেষ্টা করেন নাই। যে সকল আচার ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, শুধু সেইগুলিই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। যে সকল আচারের মূলে ধর্ম্মবুদ্ধি নাই, পরন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি বর্ত্তমান, সেই সকল আচার সাধু ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও সদাচার নহে।

বিশ্বামিত্রের ব্যবহারকেও এই দৃষ্টিতেই বিচার করিতে হইবে। বলবানের পক্ষে সকলই সম্ভবপর, এই কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বামিত্রাদির চরিত্র সমালোচনা করিতে যাওয়া উচিত নহে। অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা পরে কঠোর তপস্যা করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। বটের শাখা খাইয়াও হজম করিবার মত শক্তি শুধু হাতীরই আছে, অন্য প্রাণী তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

এই স্থলে কুমারিল ভট্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিনব উক্তি নহে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "ভগবন্, যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের নাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কেন পরদারাভিমর্শনের মত নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।" উত্তরে শুকদেব বলিয়াছেন, মহৎ পুরুষের আচরণেও সময় সময় ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বভুক্ বহ্নির মত তেজস্বীদের আচরণ সর্ব্বসাধারণের সমালোচ্য নহে। রুদ্রদেবই সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিষ গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ আচরণ মনেরও অগোচর। মহাপুরুষদের উপদেশই গ্রাহ্য, তাঁহাদের আচরণ সকল সময় গ্রাহ্য নাও হইতে পারে। শুধু প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত তাঁহারা নানাবিধ আচরণ করিয়া থাকেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।২৬-৩১)

পুরুরবার আত্মহত্যার প্রয়াসও সদাচারের মধ্যে গণ্য হইবে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার জননী সত্যবতীর আদেশে ভ্রাতৃভার্য্যাগণের গর্ভে নিয়োগ-প্রথায় পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। বিদুরজননী দাসীও বিচিত্রবীর্য্যেরই আশ্রিতা ছিলেন। সুতরাং সেই কালে তাহাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় নাই। বিশেষতঃ মহাতপস্বী দ্বৈপায়ন তপস্যার তেজে সকল প্রকার পাপকেই ভস্ম করিতে পারেন।

রামচন্দ্র অপত্নীক অবস্থায় যজ্ঞ করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃ-ঋণ হইতেও মুক্ত হইয়াছিলেন। সীতার সতীত্ব ঘোষণার নিমিত্তই যজ্ঞের সময় আপনার বামপাশে হিরণ্ময়ী সীতার মূর্ত্তি রাখিয়াছিলেন।

বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্মের পর দেবব্রত পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কারণ একপিতৃক ভ্রাতাদের মধ্যে একজন পুত্রবান্ হইলেই সকলের পিতৃ-ঋণ শোধ হইয়া থাকে, ইহা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদের সিদ্ধান্ত। ভীষ্মের পিতৃ-ঋণ পরিশোধের আর কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অপত্নীকের যজ্ঞসম্পাদনের অধিকার না থাকায় যজ্ঞের নিমিত্ত তিনিও পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও কোন পুরাণ বা ইতিহাসে এই কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি অর্থাপত্তি প্রমাণের বলে ইহা জানা যাইতেছে। একদা গঙ্গায় শ্রাদ্ধ করিবার সময় জলের মধ্যে উত্থিত শান্তনুর হাত দেখিতে পাইয়াও শাস্ত্রমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে এই আশঙ্কায় পিতার হাতে পিণ্ড না দিয়া যিনি কুশের উপরে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, (মহাঃ, অনুশাসন—৮৪ অ) সেই শাস্ত্রবিশ্বাসী সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ দেবব্রত

অপত্নীক থাকিয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। ভট্টপাদের এই কল্পনা সম্পূর্ণ নূতন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পত্নীগ্রহণ হইতেও জানিতে পারা যায়, শুধু ধর্ম্মকৃত্য নির্ব্বাহের নিমিত্তও পত্নীর আবশ্যকতা আছে।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইলেও যজ্ঞের সময় কোনও মহর্ষির বরে সাময়িকভাবে অবশ্যই চক্ষুষ্মান্ হইয়াছিলেন। পূজা, দান, তপস্যা প্রভৃতি অর্থেও যজ্ ধাতুর প্রয়োগ হইতে পারে। অতএব যজ্ঞই করিয়াছিলেন, ইহাও ঠিক বলা চলে না, হয়ত পূজা বা তপস্যা করিয়াছিলেন।

দ্রৌপদী অযোনিসম্ভবা স্বয়ং লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে একই সময়ে অনেকে ভজনা করিতে পারেন। দ্রৌপদীর চরিত্র অতিমানুষিক, সুতরাং তাহাও সাধারণের সমালোচনার বাহিরে। অথবা দ্রৌপদী শুধু অর্জ্জুনেরই পত্নী। দ্রৌপদীর লক্ষ্মীত্ব প্রচারের নিমিত্ত পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নীরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে। অথবা পাঁচজন দ্রৌপদীকেই নামসাদৃশ্যে এক বলিয়া ধরা হইয়াছে।

আচার্য্য দ্রোণের বধের সময় যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা-ভাষণ অন্যায়ই হইয়াছে। এই সকল পাপের ক্ষয়ের নিমিত্তই যুধিষ্ঠির পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

বসুদেবদুহিতাই অর্জ্জুনের মাতুল-কন্যা। সুভদ্রা অর্জ্জুনের মাতুলবংশীয়া হইলেও মাতুল-কন্যা নহেন। রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের আপন মাতুল-দুহিতা নহেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের ন্যায় আদর্শ শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ কখনও শাস্ত্রগর্হিত আচারের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। বাসুদেব ও অর্জ্জুনের মদ্যপানে কোন দোষ হয় নাই। কারণ অন্নজাত পৈষ্টী সুরাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ, গৌড়ী ও মাধ্বী সুরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। (মনু ১১।৯৪-৯৫) বাসুদেব ও অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ের সন্তান। সুতরাং মদ্যপানে তাঁহাদের পাপ হয় নাই।

আধুনিক কু-আচারগুলি যদি শিষ্ট ও শাস্ত্র-বিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত সমাজে চলিতে থাকে, তবে সেইগুলিকে দেশাচার কিংবা পূর্ব্বপুরুষের প্রদর্শিত পন্থারূপে গ্রহণ করা চলিবে। একদেশের আচার অন্য দেশে চলিবে না। মনুও বলিয়াছেন, পিতৃপিতামহের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবে। সেই পথে চলিলে কোন দোষ হয় না। (মনু ৪।১৭৮)

উপর্যুক্ত সকল কথাই ভট্ট কুমারিলের। তাঁহার সময়ে তিনি যে সকল আচারকে গর্হিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, আজকাল অনেকের নিকটই তাহা গর্হিত নহে। কিন্তু পৌরাণিক যে কয়েকটি সিদ্ধান্তকে তিনি নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেইগুলি তৎকালেও সকলের পছন্দসই হয় নাই। প্রজাপতি, ইন্দ্র, ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের বিষয়ে ভট্টপাদ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে নূতন। এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতিকূলেও অনেক কিছু বলা যাইতে পারে।

দেশবিশেষে চিরদিনই আচারের পার্থক্য আছে। এই বিষয়ে যক্ষরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বোধ করি চরম সত্য। 'কঃ পন্থাঃ' (পথ কি?) যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, কেবল লৌকিক বুদ্ধির বলে বিচার করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছান শক্ত, যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ যাঁহার প্রতিভা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, তিনি অপরের যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে অনায়াসেই খণ্ডন করিতে পারেন। শ্রুতিকেও আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক বলিয়া মনে হয়। ঋষিদের মধ্যেও মতভেদ আছে। কোন্ ঋষির মত মানিয়া চলিব? ধর্ম্মের তত্ত্ব একান্ত দুরধিগম্য। অতএব মহাজন অর্থাৎ শিষ্ট পুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ। তাঁহাদের অনুসৃত আদর্শই আমাদের আদর্শ।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

(মহাঃ বন ৩১২।১১৭)

হিন্দু-মুসলমান

স্বামী সন্তোষানন্দ

হিন্দুরা এদেশের আদিম অধিবাসী, অথবা বাইরে থেকে এসেছিল, তা নিয়ে এখনো কিছু কিছু মতদ্বৈধ আছে। তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার অনেক আগে থেকেই যে হিন্দুরা এদেশে বাস করছে তা সকলেই স্বীকার করেন; তবে 'হিন্দু' এই কথাটি ঠিক অতো প্রাচীন নয়।

মুসলমানরা এদেশে আসে বিদেশী বিজেতা হিসাবে সাত আটশ' বছর আগে। সেই থেকে তারাও এদেশে আছে। খৃষ্টানদের মতো মুসলমানরাও অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা ক'রে থাকে। এবং এই চেষ্টার ফলে বহু হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করায় বর্তমানে এ দেশে মুসলমানের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। যে সব মুসলমানরা বাইরে থেকে এসে এ দেশে বাস করতে আরম্ভ করে তাদের সংখ্যা দুচার লাখের বেশী না হ'লেও এখন ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি।

সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে হিন্দু-মুসলমান বরাবরই একযোগে চলে আসছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের পরস্পরের ভেতর একটা বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ থেকে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। দেশকে স্বাধীন ক'রবার চেষ্টা হ'তে লাগল যতো নিবিড় ও ব্যাপক, হিন্দু-মুসলমানের ভেদও হ'তে লাগল ততো গভীর ও ভয়াবহ। এই অনৈক্যই ক্রমে মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে দেখা দিতে লাগল।

এই সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য ক'রবার বিষয় এই যে যখনই দেশবাসীর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে কোনো রাজনৈতিক অধিকার লাভের সম্ভাবনা ঘটে তখনই লেগে যায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই রকম অশুভ যোগাযোগ দেখে একথা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে ভারতের অহিতাকাঙ্ক্ষী কোনো অদৃশ্য শক্তির বিষময় প্রভাব এর পেছনে বর্তমান।

পক্ষান্তরে একথাও ঠিক যে এই সব দাঙ্গা হাঙ্গামার পরে আবার পূর্বের মত মিলে মিশেই উভয় সম্প্রদায়ই একত্রে বসবাস করে, পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে, সময়ে অসময়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যও করে। এই সব দেখে যাঁরা বলেন যে হিন্দু-মুসলমানে সত্যিকারের বিরোধ কিছুই নেই, দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলি চক্রান্তকারীদের দুর্নীতিরই ফল, তাঁদের কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলী জিন্না কিছুদিন যাবৎ বলতে আরম্ভ করেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি ('নেশন্'), তাদের একতা অসম্ভব। দুই জাতির মধ্যে যে রকম সন্ধি প্রভৃতি কূটনৈতিক সম্বন্ধ ঘটে হিন্দু-মুসলমানে তার বেশী কিছুই হ'তে পারে না।

হিন্দু-মুসলমানের মিল ও গরমিল সম্বন্ধে মতামত যাই থাক্ না কেন, এই সমস্যার সমাধান যে

খুবই জরুরী হ'য়ে পড়েছে, এবং তাতে যে আর মোটেই কালবিলম্ব করা চলে না সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ ক'রে গত ১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাস থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে যে নিদারুণ বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল ও এখনো ঘটছে তার পরে এই প্রশ্নকে শুধু স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারীদের অপচেষ্টার ফল ব'লে উপেক্ষা করা চলে না।

নানা কারণে বিভিন্ন দলের লোকদের ভেতর দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'তে পারে, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে, যেখানে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্নকষ্ট প্রভৃতি হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থার অঙ্গ। কিন্তু এ সকল দাঙ্গাহাঙ্গামা খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, বা তেমন ব্যাপকও হয় না। আর একবার থেমে গেলে কিছু কালের ভেতর আবার ঘটে না, কিংবা এক জায়গায় থেমে গেলে আর এক জায়গায় আরম্ভ হ'তেও দেখা যায় না। আরো এক কথা, উন্মত্ত জনতা ঘরে আগুন লাগানো, লুঠ-পাট, খুন-জখম সবই ক'রতে পারে সত্য, কিন্তু তাতে নৃশংসতার একটা সীমা থাকে। এবারে যা ঘটে গেছে তাতে কিন্তু এ সমস্ত অনুমানই মিথ্যে হয়ে গেছে। মানুষের উপর মানুষ যে কতখানি মর্মান্তিক অত্যাচার ক'রতে পারে এবার যেন তারই একটা হৃদয়বিদারক প্রকাণ্ড মহড়া দেওয়া হ'য়ে গেল।

গর্ভস্থ সন্তান, সদ্যজাত শিশু, স্ত্রী-পুরুষ-যুবা-বৃদ্ধ কেহই ঘাতকের হাতে রেহাই পায় নি। আর এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই অসহায় নরনারীদিগকে যতো রকমের যতো নির্মম শারীরিক এবং মানসিক পীড়া দেওয়া যায় তার কিছুই ত্রুটি হয় নি।

প্রথমে মুসলমানগণ হিন্দুদের আক্রমণ করে। পরে হিন্দুরাও মুসলমানদিগকে পাল্টা আক্রমণ করে। এই উপলক্ষ্যে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর যে সব অত্যাচার করে, হিন্দুরাও মুসলমানদের উপর প্রায় সে সবই করেছিল। কেবল নারী-নির্যাতন এবং নৃশংসতায় তারা মুসলমানদের ঠিক সমকক্ষ হ'তে পারে নি।

সে যাই হোক্, এই নিদারুণ অন্তর্বিবাদে যে ভয়াবহ পাশবিক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেল তা কি কেবল সাময়িক উত্তেজনার ফল, অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী কোনো গভীর মনোবেদনার স্বাভাবিক বিকাশ তা বিশেষ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখা দরকার।

হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণ করল আঘাতের পরিবর্তে, আত্মরক্ষার জন্যে এবং প্রতিহিংসার বশবর্তী হ'য়ে। কিন্তু এতো বড়ো বিরাট মুসলমানসমাজ এ রকম হিন্দুবিদ্বেষী হ'ল কী করে? মুসলমানদের ভেতর কেউ কেউ নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রেও প্রতিবেশী হিন্দুদের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন সত্য। কিন্তু তারা ক'জন? বরং দেখা গেছে যে প্রায় সকল মুসলমানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অত্যাচারী মুসলমানদেরই পক্ষ সমর্থন করেছেন। কাজেই একথা এক রকম নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সমস্ত মুসলমানসমাজই আজ ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী। ফলে হিন্দুর ভেতরও মুসলমানবিদ্বেষ বেশ সংক্রামিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মুসলমানগণ গরীব এবং অশিক্ষিত। অশিক্ষিতদের মতন ধর্মগোঁড়ামিও আছে তাদের যথেষ্ট। উপরন্তু হিন্দুদের কাছে তারা নীচ অস্পৃশ্য। এই সব কারণেই তাদের হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। ধূর্ত চক্রান্তকারীদের প্ররোচনায় এই স্বাভাবিক বিদ্বেষভাব সহজেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে প্রকাশ পায়। এই অনুমান যে কতক পরিমাণে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গত দাঙ্গায় যে মর্মান্তিক জিঘাংসা-বৃত্তি প্রকাশ পেল তাকে কেবল পূর্বোক্ত কারণ দিয়েই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না। এই

রকম দুর্দমনীয় জিঘাংসাবৃত্তি প্রকাশ পায় তখনই, যখন লোক নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হয় কোনো ন্যায়ানুমোদিত বিশেষ কাম্য বস্তু থেকে। বঞ্চিত এবং বঞ্চকের মধ্যে সম্পর্ক যতো নিকট তাদের সংঘর্ষে উৎপন্ন বৈরিভাবও হয় ততো ক্রূর, ততো স্থায়ী। এই জন্যই জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় অমন হলাহল-উদ্গারী কলহ আর দ্বিতীয় নেই।

আরো এক কথা। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষোভে যতগুলি কারণ বিদ্যমান, বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের বিক্ষোভের সে সবগুলি কারণই বর্তমান। বরং হিন্দু হয়েও নিম্নবর্ণীয়েরা যে উচ্চবর্ণীয়দের কাছে অস্পৃশ্য, দেবার্চনাদিতে সকল রকমেই অনধিকারী তাতে তাদের বর্ণহিন্দুবিদ্বেষ হওয়া উচিত ছিল আরো বিষময়। কিন্তু এবার হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যে রকম মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে বর্ণহিন্দুদের প্রতি ঐরূপ আচরণ নিম্নবর্ণীয়দের পক্ষে কল্পনারো অতীত। অথচ অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অন্য হিন্দুদের কাছে অবজ্ঞা প্রভৃতিতে তাহারা মুসলমানদের সহিত সমদুঃখভোগী। কাজেই মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষের কারণ যে আরো গভীরতর একথা মনে করবার হেতু আছে যথেষ্ট।

হিন্দু-মুসলমান একই দেশের সন্তান। আজ যারা মুসলমান তাদের অনেকেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত হিন্দুই ছিল। হিন্দুসমাজের দোষেই তারা বাধ্য হয়েছিল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে। কিন্তু যে সকল কীর্তিকলাপের জন্য ভারতবাসী আজ সমস্ত জগদ্বাসীর কাছে গৌরবান্বিত, মুসলমানরা তার কতোটুকু অংশ পায়? সম্রাট আকবরের মহিমোজ্জ্বল কীর্তি হিন্দু মুসলমান সমান ভাবেই ভোগ করে। কিন্তু অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিবাজী, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতির চিরভাস্বর প্রতিভার কোনো অংশ কি মুসলমানরা পেয়ে থাকে? বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জগদ্বরেণ্য বাণীপূজারীগণ হিন্দু। কিন্তু মুসলমানদের তাঁরা কেউ নন। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা ধর্মে ভারতকে জগতের গুরুর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই লোকোত্তর মহাপুরুষদ্বয়ের অপার্থিব মহিমায় ভারত আজ জগৎসভায় বরেণ্য। কিন্তু মুসলমানগণ? তারা কি এই অপূর্ব মহিমার কিছু অংশও পায়?

একই দেশের সন্তান হ'য়েও দেশের সকল গৌরব, সকল কীর্তি থেকে বঞ্চিত থাকায় যে বিষময় মনোবেদনার সৃষ্টি হয় তার প্রতিক্রিয়া-রোধের ধৈর্য মানুষের নেই। অথচ এ কথাও স্বীকার করতেই হবে যে নিজের দেশের, নিজের জাতির মহিমার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা সকল মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের তার কী আছে? আর এইখানেই নিম্নশ্রেণীয় হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের তফাৎ।

বর্ণহিন্দুরা যা-ই করুক না কেন, তারা যেমন কোনো হিন্দুকেই গঙ্গা, গোদাবরী, যমুনা, কাবেরীর পুণ্য স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনই হিন্দুর প্রাপ্য কোনো গৌরব থেকেই তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। অন্য দিকে ভারতের গর্ব করবার যা কিছু আছে, তার কোনো কিছুতেই আজকের ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ কোন অংশ বা অধিকার নাই। ভারততো নিঃস্ব নয়। মানব-সভ্যতায় ভারতের দান অন্য কোনো দেশের বা জাতির দানের চাইতে কম নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের দানই বেশী। এখনো জগৎকে দেবার মতন ভারতের অনেক কিছুই আছে। অথচ এই দেশের সন্তান হ'য়েও মুসলমানগণ কতো শ্রীহীন! কারণ তারা যে অহিন্দু। শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ধর্মে ভারত যতো রত্নরাজি সংগ্রহ করেছে, জগৎকে দান করেছে, তার বেশীর ভাগইতো হিন্দুদের!

কথা হ'তে পারে যে বাল্মীকি, ব্যাস, রবীন্দ্রনাথ,

বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ক্ষণজন্মা অতিমানবগণ কোনো দেশ বা জাতির নিজস্ব সম্পদ নন, কোনো সম্প্রদায় বিশেষের তো নন-ই। তাঁরা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন সমগ্র মানব-সমাজই তাঁদের সাধনফলের তুল্য অংশীদার। কাজেই ভারত তাঁদের জন্মভূমি বলেই যদি এদেশ-বাসীর গর্ব ক'রবার কিছু থাকে তাতো মুসলমানদেরও আছে। তবুও যদি তারা নিজেদেরকে এই সকল লোকোত্তর পুরুষগণের স্বদেশবাসী বলে হিন্দুদের সহিত সমভাগ্যবান্ বোধ করতে না পারে, তবে বলতেই হবে যে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে বঞ্চিত করছে; এতে হিন্দুর কি করবার থাক্‌তে পারে?

সত্যই কি তাই? অথবা হিন্দুরা মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখেছে বলেই তারা এইভাবে বঞ্চিত হ'য়ে আছে! কেবল একদেশবাসী হওয়া ভিন্ন আর কিসে তারা আপনাদিগকে হিন্দুদের সহিত এক ভাবতে পারে? কাজেই ভারতবাসী হ'য়েও হিন্দুর প্রতিভায় সমগ্র ভারত গৌরবান্বিত হ'লেও মুসলমানরা অপর সকলের সাথে তুল্য গৌরববোধ করে না।

সমাজ এবং ধর্ম, এই দুই শক্তিই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে। মুসলমানগণ ভিন্নধর্মাবলম্বী; হিন্দুর সমাজেও মুসলমানের কোনো স্থানই নেই। কাজেই একদেশবাসী হয়েও হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব বিভিন্ন দেশবাসী দুই জাতির মধ্যস্থিত দূরত্বের মতনই বিশাল। এই নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য হিন্দুরাই বিশেষভাবে দায়ী। কারণ মুসলমানের কাছে হিন্দু অস্পৃশ্য নয়, তার ছোঁওয়া জল খেলে মুসলমানের ধর্ম নষ্ট হয় না। হিন্দুর কিন্তু মুসলমানের প্রতি আচরণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম এবং সমাজ এই উভয় দিক দিয়েই হিন্দু তার দেশবাসী এক বিরাট অংশকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

হয়তো হিন্দুরা মুসলমানদিগকে ঠিক ঘৃণা করে না। কিন্তু ছুঁৎমার্গপরিচালিত হিন্দু-সমাজ কোনো অহিন্দুর প্রতিই মনুষ্যোচিত আচরণ করে না। ছুঁৎমার্গ যখন প্রথম সমাজে স্থান পায়, তখন হয়তো তার কিছু প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন মিটে গেছে অনেক দিন। আজ তার বিষময় ফল হিন্দুর সর্বনাশের কারণরূপেই দেখা দিয়েছে। ১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাসে এবং তার পরেও যা ঘটেছে তার জন্য মুসলমানদের দায়ী ক'রে ফল নেই। এই যে শত শত বৎসর ধরে নীচ অস্পৃশ্য ব'লে আমরা মানুষকে অবজ্ঞা ক'রে অপমান ক'রে এসেছি সেই মহাপাপের ফল আজ আমাদের ভোগ করতেই হবে। এখনো এর সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত না ক'রলে সমস্ত হিন্দুসমাজই ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে,—যে দিন 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' এই কথা দুটি ওরা সৃষ্টি করেছে সেদিন এই জাতির অদৃষ্ট ভেঙে গেছে। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই কথাই তাঁর ভাষায় বলেছেন,—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।"

কিন্তু উপায়? জাতিভেদ তুলে দিয়ে কি সমাজকে অনাচারে ভাসিয়ে দিতে হবে? কলির শেষে 'চারপো' পাপ পূর্ণ হ'লে সব যে একাকার হ'য়ে যাবে, ধর্মকর্ম লোপ পাবে ব'লে কথা আছে, তাই কি ঘটাতে হবে? ধর্মপ্রাণ হিন্দু সবই সইতে পারে, কিন্তু ধর্ম ছাড়তে'সে পারে না। তাতে যদি তার মরণও হয় তবুও সে তা পারে না। ধর্মের সঙ্গে বিরোধে কোনো আপোষ-রফাই তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মকে কোনোভাবে খর্ব করা বা ধর্মের সঙ্গে কোনো কিছুর রফা করা যে হিন্দুর পক্ষে আত্মঘাতী ব্যাপার হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি ধর্মের নামে অধর্ম সমাজে স্থান

পেয়ে থাকে তবে তাকে ত্যাগ করতেই হবে। এই জন্যই আজ সমাজে যে সমস্ত দেশাচার লোকাচারের প্রভাব দেখা যাচ্ছে, সে সব কতোখানি সনাতন ধর্মের অনুকূল তা বেশ করে ভেবে দেখা দরকার। অবশ্য দেশাচার লোকাচারের স্থান সমাজে খুবই আছে। কিন্তু সে সবই সনাতন ধর্মের অবিরোধী হওয়া চাই। যদি কোনো সামাজিক আচার ব্যবহার তার বিপরীত হয় তবে সে সকল প্রথাকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে। যে সমাজ বা যে জাতি তা পারে না তার আশু বিনাশ অনিবার্য।

'জীবনের লক্ষণ প্রসারণ, সঙ্কোচন মৃত্যুর পূর্বাভাস।' ধর্ম শাশ্বত আধ্যাত্মিক শক্তি। সম্প্রসারণই তার স্বভাব। সঙ্কোচন তার জীবন-শক্তির পরিপন্থী। বর্তমানে যে ভাবে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হচ্ছে তাতে হিন্দুর পক্ষে কোনো অহিন্দুকেই আপনার ক'রে নেবার উপায় নেই। তার পরিবর্তে আছে সমাজের ছোটোবড়ো নানা অংশ কেটে কেটে বাদ দেবার অসংখ্য সর্বনাশা বিধান। একে কি বলে ধর্ম? এ তো মৃত্যুরই অগ্রদূত। ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না। এই উৎকট লোকাচার-প্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ যে কঠোর কটাক্ষ করেছেন এই প্রসঙ্গে তার কিছু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:—

"আজকাল ব্রহ্ম হৃদ্‌গুহায় বাস করেন না। সর্বোচ্চ স্বর্গেও না। সর্বভূতের অন্তরেও তিনি থাকেন না—এখন তিনি বাস করেন ভাতের হাঁড়ির মধ্যে!"

তিনি আরো বলেন যে, 'আমরা গোঁড়া হিন্দু, কিন্তু অস্পৃশ্যতার সঙ্গে কোনো সংশ্রবই আমাদের নাই। ওটা হিন্দু ধর্ম না মোটেই। আমাদের কোনো শাস্ত্রেই একথা নাই। অস্পৃশ্যতা একটি গোঁড়া কুসংস্কার, যা বরাবর আমাদের জাতীয় উন্নতির বাধাদান করেই এসেছে।'

এই অস্পৃশ্যতা যে কেবল হিন্দুদের পৃথিবীর সমস্ত অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বা হিন্দুর বিভিন্ন শাখার ভেতর কম বেশী ব্যবধান সৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়। নানা ভাবে নানা আকারে এ হিন্দুসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে প'ড়ে সমাজকে একেবারে ধ্বংসের সীমানায় এনে হাজির করেছে।

হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণদের কথাই ধরা যাক্। বাঙালী, উড়িয়া, বিহারী, মাদ্রাজী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট একরকম অস্পৃশ্য। কারণ, একে অন্যের রান্না খাবেন না, বিবাহাদির তো কথাই নাই। প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্রাহ্মণদের ভিতর আবার অসংখ্য ভাগ। যেমন বাংলায় রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ইত্যাদি। এদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান অচল। এর উপর আবার কুলীন, বংশজ প্রভৃতি কতো বিভিন্ন বিভাগই না আছে। ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য সকল শ্রেণীর মধ্যেও এই গণ্ডীকাটা ঠিকই আছে। আর ভারতের সর্বত্র ঐ একই অবস্থা। ফলে সমাজ এতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে সবদিক বাঁচিয়ে ছেলেমেয়েদের বিবাহাদি দেওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অস্পৃশ্যতার গণ্ডী টেনে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটাবার যে অপচেষ্টা হিন্দুরা করেছে তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজে এতো অসংখ্য জাতি উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে। নিজের সৃষ্ট নাগপাশে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেঁধে আজ হিন্দুসমাজ একেবারে অচল ও পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে।

এই সমাজকে বাঁচাতে হ'লে নিজের নষ্টগৌরব ফিরিয়ে পেতে হ'লে, তার গন্তব্যপথে এগিয়ে যেতে হ'লে তার এই অসাড় পঙ্গু অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই-ই। যে অসংখ্য বন্ধনে সে নিজেকে আবদ্ধ করেছে, নিজ হাতেই সে সব কেটে মুক্ত করতে হবে তার সকল অবয়বকে। যে সব পরিখা কেটে

হিন্দু নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সমস্ত জগত থেকে সেইগুলিই করেছে তার চলার পথ বন্ধ। আজ যেমন ক'রেই হোক্ সে পরিখা বন্ধ ক'রে বাধাহীন করতে হবে তার এগিয়ে যাবার রাস্তা। মানুষকে শুধু মানুষ বলেই, তার প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভালোবাসা দিতেই হবে। এতে 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' এই মহাবাক্যের বিরোধী জাতিবর্ণের বাধা মানা চলবে না।

কী অদ্ভুত অবস্থা! আজ যদি ক্রাইষ্ট বা মহম্মদ আসেন, কোনো হিন্দু তাঁদের ছোঁওয়া জল খেলে কি তার ধর্ম নষ্ট হয়? অথচ সমাজের বর্তমান অবস্থায় হওয়া উচিত তাই-ই।

সমাজ ধর্মবিকাশের ক্ষেত্র। ধর্ম সমাজের রক্ষক। সমাজ না থাকলে ধর্ম প্রকাশ পায় না। ধর্মহীন সমাজ অবিলম্বে লোপ পায়। সমাজ ও ধর্ম খানিকটা দেহ ও প্রাণের মতো সম্বন্ধ। কাজেই ধর্মের সঙ্গে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে হিন্দুধর্মে এসেছে এক নবজাগরণ। কত্রপাতেই এর আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে জাতি ধর্মের সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম ক'রে সারা জগতে। কেউ জানে না কতো যুগ-যুগান্তর আগে উদাত্তকণ্ঠে ভারতের ঋষি ডেকেছিলেন,—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥'

বলে। আবার সেই ধ্বনিই শোনা গেল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে যে দিন পাশ্চাত্য সভ্যতার তুঙ্গশৃঙ্গ আমেরিকার শিকাগো শহরে দাঁড়িয়ে তিনি ডাক দিলেন—হে আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ব'লে।

এই তো সনাতন ভারতের মর্মবাণী। স্বামীজীর কণ্ঠে এই বাণী ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎময় কী বিপুল প্রতিধ্বনিই না সৃষ্টি হয়েছে! যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাঙ্ময়ী মূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বোক্ত প্রথম আহ্বান এবং জগদ্-বাসীকে প্রদত্ত তাঁর 'নরনারায়ণ' মন্ত্র থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে এই সদ্যজাগ্রত হিন্দুধর্মের চক্ষে মানুষমাত্রেই ভাই ভাই। ধর্মের গণ্ডী টেনে মানুষে মানুষে ভেদসৃষ্টি করবার দিন শেষ হ'য়ে গেছে চিরকালের মতো।

পরমহংসদেবের সাধকজীবনেই ফুটে উঠেছে ধর্মে ধর্মে এমন এক অপূর্ব মিলন যা জগতে আর কখনো ঘটে নাই। সাধনলব্ধ এই মহা-ঐক্যই এই নবযুগের বার্তা। তাই ধর্মজগতে ঘটেছে যে মহাসমন্বয় সামাজিক জীবনেও ঘটাতে হবে তাই। কারণ ধর্মভাবের পরিপন্থী সমাজ ধ্বংস হ'য়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'সত্য সমাজের অনুগামী হয় না। সমাজই সত্যের অনুগমন করে, অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্মমতের উপর যে আলোকসম্পাত করেছেন সেই আলোর সাহায্যেই করতে হবে আমাদের সমাজের গতিনিয়ন্ত্রণ। ধর্মে আজ সকল মতই একই লক্ষ্যে যাবার ভিন্ন ভিন্ন পথরূপে তুল্য আদরণীয়। সমাজেও তাই হওয়া উচিত জীবনযাত্রা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মানুষ বলেই সকল মানুষের তুল্য আদর তুল্য মান।

জগদ্বাসী আজ যে অমৃতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তা দিতে পারে হিন্দুরাই। কিন্তু হিন্দুসমাজ কি ছুঁৎমার্গের জীর্ণ প্রাচীরের আড়ালে আজো ব'সে থাকবে সেই অমৃত-ভাণ্ডটি বক্ষে ধারণ ক'রে? এতো হবে মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মতনই ধর্মবিগর্হিত কাজ। কারণ আলো বাতাস জলের মতনই পরা এবং অপরা বিদ্যাও মানবসাধারণেরই সম্পত্তি।

কালের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আজকাল সকল দেশেই কোনো না কোনো ভাবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টা চলেছে। হিন্দুসমাজের মধ্যেও ভিন্ন

ভিন্ন স্তরে এর লক্ষণ পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে। নিম্নবর্ণীয়েরা উচ্চবর্ণীয়দের প্রতি এখন আর শ্রদ্ধাসম্পন্ন নয়। বরং তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে বৈরিভাব। এ বৈরিভাব হিন্দুর সঙ্কোচনচেষ্টারই অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া।

ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুর জ্ঞাতি—তাদের রক্ত, তাদের মাংস, তাদের ভাই। কাজেই হিন্দুর যা বিশেষ সম্পদ্ তার জন্য তাদের কামনা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রবল। এই স্বাভাবিক কামনা প্রতিহত হওয়াতেই মুসলমান-হৃদয়ে জেগে উঠেছে প্রবল জিঘাংসাবৃত্তি। প্রেমই এর একমাত্র প্রতিষেধক।

স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টই বলেছেন, 'ছুঁৎমার্গ একটা মানসিক ব্যাধিবিশেষ।' তিনি হিন্দু-সমাজকে সতর্ক করেছেন এই বলে, 'দেখো, যেন অস্পৃশ্যতারূপ ঘোর অধর্মে জীবন হারায়ো না।' এই ছুঁৎমার্গ পরিহার ক'রে প্রেমভরে সকলকে গ্রহণ করতে হবে আপন হৃদয়ে। কারণ ইহাই হিন্দুর বাঁচবার উপায়। পরমহংসদেবের মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মসাধনা তো আর নিরর্থক হ'তে পারে না। স্বামীজীর ভাষায় বলা যায় 'প্রেমমাত্রই সম্প্রসারণশীল, সকল স্বার্থপরতাই সঙ্কোচাত্মক। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র ধর্ম।'

এই ছুঁৎমার্গ বর্জন করতে পারলেই হিন্দু-মুসলমান আর দুই জাতি (নেশন্) থাকবে না। তারা হবে এক ভারতবাসী, ভারতের সুখে দুঃখে গৌরবে অগৌরবে তুল্যাংশভাগী। ধর্মে তারা থাকবে এক পথের পথিক, হিন্দুরা থাকবে আর এক পথের পথিক। কিন্তু শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতির ন্যায়ই মুসলমানরাও হবে বিশাল ভারত-ধর্মের একটি শাখা, যা প্রকৃতপক্ষে এখনো আছে। আর এই উপায়েই হবে ভারতবাসীর সঙ্গে অন্যান্য দেশবাসীর ভাববিনিময়ের রাস্তা, সেই মহৎ কার্যের জন্য আজো ভারত বেঁচে আছে।

প্রত্যহের পটভূমিকা

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী

প্রত্যহের পটভূমিকায়
স্বার্থের উগ্রতা-তলে দেখি পিষ্ট মাটির সম্মান।
তৈমুর-নাদির কত, ভবানন্দ, কত মীর্জাফর
বাধাহীন সঞ্চয়ের অন্তহীন গৃধ্নুতায়, হায়!
লক্ষ লক্ষ স্বজাতির বক্ষোরক্ত সুখে করি পান,
অভ্রংলিহ লাল সৌধ দম্ভ ভরে গড়ে নিরন্তর।

আমি দেখি প্রভুত্বের রথে
বহুরূপী-নির্মোকেতে নির্মমেরা কত প্রাণবান্!
পরমান্ন পচে দুর্গে। বর্ষা, শীত, ঝাঁ ঝাঁ রোদে মিলে
বুভুক্ষু মুমূর্ষু গুলো ধোঁকে গন্ধে, পল্লী-পথে-পথে।
জীবনের পরিহাস মোর মনে রচে খতিয়ান।
বঞ্চনার কালো ধোঁয়া বাধা বোনে আকাশের নীলে।

বৃহন্নলা নিয়াছে বিদায়,
বৃত্রাসুর-বাসবেতে একপাত্রে মধুপানে রত,
মনুষ্যত্ব মরে গেছে; জীবনের অধিকার নেই।
সত্য-ন্যায়-নীতি আজ ছাপা মাত্র পুঁথির পাতায়।
উন্নত আদর্শ-রুচি ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত কাঁকরের মত।
ঘুণ-ধরা মজা-মন হিংসা-জটে হারা'য়েছে থেই।

বিশ্বাসের নির্বাসন কুমেরু-কিনারে,
আত্মঘাতী মত্ততায় মুছে গেছে জীবন-মহিমা।
সভ্যতার পরিচ্ছন্ন রূপ—সে হারাপ্পার নকল?
প্রগতির অজগর গতি নেছে আলস্ পাহাড়ে।
দিবালোকে নিভে গিয়ে ঘনায়েছে রাতের কালিমা!
রক্তে রক্তে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিজাতিক বিষের ফসল।

স'রে গেছে বহুদূর দস্যুর কবলে
প্রসন্ন শান্তির শান্ত অবারিত রম্য অবকাশ।
সম্মুখে ডাহিনে বামে বিনিঃশেষে সর্বস্ব লুণ্ঠিত,
সম্বলের স্বর্ণক্ষেত, লকলকি জ্বলিছে অনলে,
নিরুদ্দেশ গুহাগর্ভে কোথা' গুম্ ভরসা-আশ্বাস,
বিঘ্নিত জীবন শুধু দিকে দিকে কপিশ কম্পিত।

অন্তিম দেখি যে আজ শরতের চাঁদে,
ঝঞ্ঝার আভাসে ভাসে নিদ্রাহারা রাতের তারকা,
সৃষ্টির কুহেলি মোর জ্বালা ল'য়ে আঁখিতে ঘনায়,
নেশা জাগে নিশ্চিহ্নতে শত্রুর সে স্বৈর বনিয়াদে।
দ্বিধাগ্রস্ত ভীরু চিত্তে আর নয়, আর নয় সখা!
যবনিকা দাও টানি' অসহন পটভূমিকায়।

ভারতীয় ধর্ম্ম-ইতিহাসে নারীর প্রভাব

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী এম-এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে নারীর মহিমা তারস্বরে উদ্গীত হইয়াছে। পুরুষ ও নারী একই পরম পুরুষের দুই ভাগ, এককে বাদ দিয়া অন্য অসম্পূর্ণ। শ্রুতি বলেন, আদিতে একমাত্র পরম পুরুষ ছিলেন একাকী, একা একা তাঁহার ভাল লাগিল না। তখন সেই প্রজাপতি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে পুরুষ ও নারীর উৎপত্তি হইল। সেই পুরুষ ও প্রকৃতিই আদি পতি ও পত্নী। (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।৩)

পক্ষীর উড্ডয়ন ক্রিয়ার জন্য দুইটি পক্ষেরই যুগপৎ প্রয়োজন হয়। সেইরূপ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য নরনারী উভয়ের সম্মিলিত সাধনার একান্ত আবশ্যকতা আছে। যে দেশে ইহাদের একতর উপেক্ষিত সে দেশের অগ্রগতি সুদূরপরাহত। ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল হইতেই এই রহস্য অবগত আছে। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত পুরুষ ও নারী সম্মিলিত ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমুজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

মহাভারত নারীর মহিমা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন—

স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
অপূজিতাশ্চ যত্রৈতাঃ সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৬।৫

স্ত্রীগণ যেখানে পূজিত হন, সেখানে দেবতারা সুখে বিহার করেন। যেখানে নারীগণ অপূজিত সেখানে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল।

পূজনীয়া মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ো গৃহস্যোক্তাস্তস্মাদ্ রক্ষ্যা বিশেষতঃ॥

উদ্যোগ পর্ব্ব, ৩৮।১১

নারীগণ পূজনীয়া, সৌভাগ্যবতী, পুণ্যা ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। ইঁহাদিগকে গৃহের শ্রী বলা হইয়া থাকে। অতএব ইঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

মনু স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে গৃহে নারীগণ দুঃখ পান সেই বংশ শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যে গৃহে তাঁহারা কষ্ট পান না সেই বংশ সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে নারী জগদম্বা আদ্যাশক্তির অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছেন—"মদংশা যোষিতা মতাঃ"।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"ত্বৎস্বরূপা রমণী চ জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা"।

১০।৮০

স্ত্রীজাতি তোমারই স্বরূপ, তুমিই জগতে রমণীরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যে (চণ্ডী) ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবতীকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছেন "হে দেবি! এই জগতে যত প্রকার বিদ্যা এবং যত নারী আছে সবই আপনার অংশস্বরূপা।"

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু॥

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ—অধ্যাত্ম-সাধনার সকল মার্গেই নারী সাধিকাগণ উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম-ইতিহাসের ক্রমবিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। বৈদিক যুগ হইতে অর্ব্বাচীন যুগ পর্য্যন্ত এই সকল সাধিকার সাধনার ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে

প্রবহমান হইয়া চলিয়াছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিব্য আলোকে অনুরঞ্জিত যে সকল বাণী ইঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইঁহাদের পুণ্য চরিত্রের প্রভাবে ভারতবর্ষের ধর্মজীবন বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত।

বেদে আমরা বহু নারী ঋষির পরিচয় পাই। শৌনক তাঁহার "বৃহদ্দেবতা" গ্রন্থে বেদের অনেক নারী ঋষির নাম দিয়াছেন (২.৮২-৮৪) যথা,—(১) ঘোষা, (২) গোধা, (৩) বিশ্ববারা, (৪) অপালা, (৫) উপনিষৎ, (৬) নিষৎ, (৭) জুহূনাম্নী ব্রহ্মজায়া, (৮) অগস্ত্যের ভগিনী অদিতি, (৯) ইন্দ্রাণী, (১০) ইন্দ্রমাতা, (১১) সরমা, (১২) রোমশা, (১৩) উর্বশী, (১৪) লোপামুদ্রা, (১৫) নদী, (১৬) যমী, (১৭) নারী, (১৮) শাশ্বতী, (১৯) শ্রী, (২০) লাক্ষা, (২১) সার্পরাজ্ঞী, (২২) বাক্, (২৩) শ্রদ্ধা, (২৪) মেধা, (২৫) দক্ষিণা, (২৬) সূর্য্যা, (২৭) সাবিত্রী। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মবাদিনীরূপে পরিচিতা ছিলেন, "ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ"।

উপনিষদে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীদের নাম পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী স্বামী সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন জানিয়া তাঁহার সহিত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সুগভীর আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে মৈত্রেয়ী যে বাণীটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা মানবাত্মার শাশ্বত বাণীরূপে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্॥"

যদ্দ্বারা আমি অমৃত হইব না তাহা লইয়া কি করিব?

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ছিলেন অসাধারণ বিদুষী ও আজন্ম ব্রহ্মচারিণী। বিদেহপতি জনকের রাজসভাতে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তাঁহার যে শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল তাহার বিবরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়।

পৌরাণিক যুগে শাণ্ডিলী, অরুন্ধতী, সুলভা, মদালসা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীর পরিচয় পাই। তপস্বিনী শাণ্ডিলী ছিলেন মনস্বিনী, সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১২৩।২)। বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর নিকট ধর্ম্মের গুহ্যতম তত্ত্ব শুনিবার জন্য পিতৃগণ ও ঋষিগণ আগমন করিতেন। (ঐ, ১৩০)। তপস্বিনী সুলভার কাছে রাজর্ষি জনক মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহা শান্তিপর্ব্বের ৩২০তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ঋতধ্বজ-পত্নী ব্রহ্মবিদুষী রাজ্ঞী মদালসা তাঁহার পুত্রদিগকে কৈশোরেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেন—

শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি
সংসারমায়া-পরিবর্জিতোঽসি।
সংসার-স্বপ্নং ত্যজ মোহনিদ্রাং
মদালসা বাচমুবাচ পুত্রম্॥

তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক। তুমি সংসারমায়া হইতে মুক্ত। এই সংসাররূপ স্বপ্ন ও মোহরূপ নিদ্রা ত্যাগ কর। মদালসা তাঁহার পুত্রকে এই কথা বলিতেন।

জৈন ও বৌদ্ধসাধনাতেও বহু নারী তপস্যায় উচ্চ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহা ঘোষিত হইয়াছে যে, চিত্ত সুসমাহিত হইলে নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই নির্ব্বাণলাভ সম্ভবপর। স্ত্রীভাব নির্ব্বাণলাভের পরিপন্থী নহে—

ইত্থিভাবো নোকি কয়িরা চিত্তম্হি সুসমাহিতে।
ঞাণম্হি বত্তমানম্হি সম্মাধম্মং বিপস্সতো॥

(থেরীগাথা, ৬১)

"থেরীগাথা"-গ্রন্থে আমরা মহাপ্রজাপতী গোতমী, তিস্সা, মিত্তা, ভদ্দা, ধীরা, উপসমা, সুমেধা, সুভা, পটাচারা, খেমা, ইসিদাসী প্রভৃতি ৭৩ জন পুতশীলা থেরীর জীবন-চরিত এবং তাঁহাদের বাণীর সন্ধান পাই। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পরম বিদুষী ও গভীর সাধিকা ছিলেন। তিনি ভিক্ষুণীজীবন গ্রহণ করিয়া সদ্ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সুদূর সিংহল দ্বীপে গমন করেন এবং সেখানে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেন। দীপবংশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সঙ্ঘমিত্তা হেমা ও অগ্গিমিত্তা ছিলেন ত্রিবিধ বিজ্ঞানপারদর্শিনী। সীবলা ও মহারুহা বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম সমভাবে অধ্যাপনা করিতেন। অঞ্জলি ছিলেন শাস্ত্রে ও দৈবশক্তিতে তুল্যভাবে অধিকারিণী।

জৈন-ধর্ম্মের সাধনাতেও বহু নারী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সময় ব্রাহ্মী ও সুন্দরী দুই ভগ্নী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ইঁহারা উচ্চকোটির সাধিকা ছিলেন। চম্পার রাজা দধিবাহনের কন্যা ব্রহ্মচারিণী চন্দনা ছিলেন মহাবীরের প্রথম ও প্রধান শিষ্যা। তাঁহার পরিচালিত ভিক্ষুণী সঙ্ঘে ছত্রিশ হাজার ভিক্ষুণী অবস্থান করিতেন। অনেক রাজা ও রাণী চন্দনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আমরা তপস্বিনী রাজী সতীর আখ্যান দেখিতে পাই। ইনি রাজকন্যা হইয়াও বৈরাগ্য হেতু গৃহত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুণী-জীবন গ্রহণ করেন এবং কৈবল্য প্রাপ্ত হন। মহারাজ শ্রেণিকের পত্নী চেলনা ছিলেন মহাবীরের শিষ্যা। পতির মৃত্যুর পর ইনি গার্হস্থ্য সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসংযম ও ধ্যানের বলে মোক্ষ-লাভ করেন।

মধ্যযুগের সাধক সন্তদের মধ্যে আমরা বহু নারী সাধিকার পরিচয় পাইয়া থাকি। গিরিধর গোপালের প্রেমানুরাগিণী মীরা বাঈর নাম সর্ব্বজনবিদিত। ঐশ্বরিক প্রেমরস ও মাধুর্য্যে বিমণ্ডিত মীরার পদগুলি মধ্যযুগীয় সন্তসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভক্তিমতী করমা বাঈ বিবাহের পর স্বামি-গৃহে না যাইয়া কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে একাকিনী বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেখানে অরণ্যমধ্যে কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। চরণদাসের শিষ্যা সহজো বাঈ ও দয়া-বাঈ অধ্যাত্মসাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। সহজোবাঈ-রচিত "সহজপ্রকাশ" এবং দয়াবাঈ-রচিত "দয়াবোধ" ও "বিনয়মালিকা" উত্তর ভারতের সন্তেরা বিশেষ সমাদরের সহিত পাঠ করেন। কবীরের সমসাময়িক গোপকন্যা ক্ষেমা বা ক্ষেমশ্রী, কবীরের কন্যা কমালী এবং শিষ্যা গঙ্গাবাঈ—ইঁহারা সকলেই ছিলেন গভীর সাধিকা। দাদুর দুই কন্যা ব্রহ্মচারিণী নানীবাঈ ও মাতাবাঈ সাধনরাজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বাণীগুলি অনুভূতির অপূর্ব্ব রসে ভরপুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে হেমলতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত গুরু। কবি-কর্ণপুর তাঁহার শিষ্য। গঙ্গা ও জাহ্নবী দেবীর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বহুলোককে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-ভারতের আলোয়ার সন্তদের মধ্যে একজন ছিলেন নারী সাধিকা—তাঁহার নাম আণ্ডাল। ইনি ভগবান শ্রীরঙ্গনাথকে পতিরূপে সাধনা করিয়াছিলেন। তামিল দেশীয় ৬৪ জন শৈব সন্তের মধ্যে তিনজন ছিলেন নারী সাধিকা। ইঁহাদের মধ্যে অম্মইয়র ও অব্বঈ নাম্নী সাধিকাদ্বয়ের মধুর বাণী তামিল শৈব-সাহিত্যের গৌরবময় সম্পদ। বিখ্যাত মহারাষ্ট্র সন্ত জ্ঞানেশ্বরের ভগ্নী মুক্তাবাঈ যোগমার্গ ও অদ্বৈত বেদান্তের সাধনায় বিশেষ উন্নতি লাভ

করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ যোগী চাঙ্গদেব ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জনাবাঈ গোদাবরী-তীরে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সন্ত নামদেবের গৃহে পরিচারিকার কার্য্য করিতে করিতে ভক্তি-সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি পণ্ডরপুরের বিট্‌ঠলজীর উদ্দেশ্যে প্রায় ৩০০ অভঙ্গ রচনা করেন।

মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমান সাধিকাদের মধ্যে দিল্লীর সুফি সাধিকা বাউরী সাহিবার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এক সাধক-সম্প্রদায়ের ধারা প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহাতে বীরু, রুনী, বুল্লা, ভীখা প্রভৃতি বিখ্যাত সাধকমণ্ডলীর আবির্ভাব ঘটে।

ভারতীয় নারী সাধিকাদের অধ্যাত্মসাধনার ধারা আধুনিক যুগেও অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে যোধপুরে তপস্বিনী অজনেশ্বরী, বীকানীরে গৌরাঁজী, মহারাষ্ট্রদেশে কৃষ্ণানদী তটনিবাসিনী সখূবাঈ, পণ্ডরপুরে কানহূ পাত্রা, পুণাতে বাবাজান, মহীশূরে শান্তিবাঈ, মধ্যপ্রদেশে মায়াবাঈ প্রভৃতি সাধিকারা আবির্ভূত হইয়া ভারতীয় সাধনার ধারাকে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের মাহেশ্বরী দেবী উন্নত সাধিকা ছিলেন। ইনি কাশীতে বাস করিতেন; সকলে তাঁহাকে মহারাণী বৃন্দাজী (পিসিমা) নামে সম্বোধন করিতেন। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহ রক্ষা করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী সারদেশ্বরী দেবী অসাধারণ তপঃশক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার বহু সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্য আছেন। ২৭ বৎসর পূর্ব্বে ইনি মহাসমাধিপ্রাপ্ত হন।

তপস্বী ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ

স্বামী তেজসানন্দ

১৯৪৭ সনের ১৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দিবা ১০॥ ঘটিকায় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরম শ্রদ্ধাভাজন তপস্বী ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীভগবানের ধ্যান-চিন্তা ও নামোচ্চারণ করিতে করিতে মুক্তিক্ষেত্র পবিত্র বারাণসী ধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ দৈহিক পীড়ায় তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য গত ৪ঠা নভেম্বর তাঁহাকে আলমোড়া আশ্রম হইতে কাশীধামস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে অবস্থান করিয়া তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি সেবকসঙ্গে প্রায়ই ভাগীরথীর পবিত্র বারি স্পর্শ এবং বিশ্বনাথ ও দেবী অন্নপূর্ণার দর্শনাদি করিয়া আসিতেন। প্রতিদিন উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারী ও কাশীধামস্থ ভক্তদের সঙ্গে আশ্রমপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামগুণগানে ও সকলকে সদুপদেশদানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার বালকসুলভ সরলতা, সপ্রেম ব্যবহার ও সদা হাস্যময় সৌম্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি

প্রাচীন যুগের তেজোমণ্ডিত ঋষিগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দিত। বলা বাহুল্য, তাঁহার অন্তর্ধানে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একজন প্রবীণ তপস্বী ও উপলব্ধিমান সাধুর তিরোধান ঘটিল। এ অভাব সহজে পূরণ হইবার নয়।

১৯০৩ সনে রাম মহারাজ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানস-পুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যদর্শন ও তাঁহার সেবারও কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তজ্জন্য অনেকে অদ্যাপি রাম মহারাজকে স্বামীজির শিষ্যমধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। তিনি আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিরূপেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বামী শ্যামানন্দজী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এটর্নি চিরকুমার শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত এখনও জীবিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অধিককাল আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরে তপস্যা ও সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। আশ্রমটিও তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের শীর্ষ-স্থানীয় সন্ন্যাসিবৃন্দ আলমোড়ার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে কঠোর ধ্যান ও তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। পূজ্যপাদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) হিমালয়ের এই সৌম্যগম্ভীর অঞ্চলটিকে সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান বিবেচনা করিয়া উক্ত শহরের পশ্চিম প্রান্তে শহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পর্ব্বত-গাত্রে একটী আশ্রম নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ ১৯১৫ সনের ৮ই আগষ্ট প্রথম আলমোড়া আগমন করেন এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া মাধুকরী অবলম্বনে ধ্যান-ভজনে এবং অবসরমত চিন্তা-পীঠস্থ বদ্রীলাল সাহার বাগানবাড়ীতে তপস্যারত পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ও হরি মহারাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের সহায়তায় ১৯১৬ সালের ২২শে মে শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর প্রতিষ্ঠিত হইল। পূজনীয় হরি মহারাজই রাম মহারাজের সাহায্যে আশ্রম-কুটীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যথারীতি হোম, পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে পূজনীয় হরি মহারাজ ও রাম মহারাজ নবপ্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া তপস্যাদি করিতে থাকেন। অত্যধিক কঠোরতার ফলে পূজ্যপাদ হরি মহারাজের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ মায়াবতী হইতে আলমোড়া আগমন করিয়া ৮ই ডিসেম্বর তাঁহাকে কাশীধামে লইয়া যান। তদবধি রাম মহারাজই স্থায়ী ভাবে এই আশ্রমে বাস করিয়া ইহার তত্ত্বাবধানাদি করিতে লাগিলেন। তিনি এই আশ্রমের পরিবর্দ্ধন ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, কঠোর তপস্যা ও ভগবদ্ভক্তি-বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া স্থানীয় আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহু শান্তিপ্রিয় ও ভজনশীল সাধু ব্রহ্মচারী এই নির্জ্জন স্থানে তাঁহার পবিত্র সংসর্গে থাকিয়া সাধন-ভজনের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া আসিয়াছেন। প্রায় ৫৩০০ ফুট উচ্চ এক পর্ব্বত-শিখরে এই আশ্রমটী অবস্থিত। ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বতঃই সাধকের মনকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া তোলে। সম্মুখে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য কৌশী নদী আঁকিয়া

বাঁকিয়া ধীর মন্থর গতিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। উহারই পরপারে প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চ এক পর্ব্বতশীর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে শ্রীশ্রীস্যাহি (শ্রীশ্রীকালিকা) দেবীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। যে দিন উত্তরাকাশ মেঘমুক্ত থাকে সেদিন আশ্রম হইতে হিমাচলের নন্দাকোট, নন্দাদেবী, ত্রিশূল ও কেদার বদ্রীর শুভ্রতুষার-মণ্ডিত শিখরসমূহ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাতের কনককিরণে যখন হিমাদ্রির স্বর্গীয় শোভা ফুটিয়া উঠে, তখন মনপ্রাণ এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়। চাঁদিমা রাতে শুভ্র জ্যোৎস্নায় যখন সমগ্র পর্ব্বতদেশ পরি-প্লাবিত হয় তখন সত্যই মনে হয় যেন কোন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া প্রকৃতির রূপমাধুরী সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশে,—সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত ঘন-সন্নিবিষ্ট পাইন-দেবদারুবৃক্ষ-শোভিত পর্ব্বতমালা একের পর এক উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। এ রাজ্যের সকলই যেন এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। বিশ্বজগতের কোন কোলাহল এ বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহসী হয় না। ঘনকৃষ্ণ পর্ব্বতশ্রেণী ধীরে ধীরে নীলাকাশের অসীম নীলিমায় মিশিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনি যখন দিনের অবসানবার্ত্তা জানাইয়া দেয়, আঁধার যখন প্রকৃতির বুকের উপর নিজ আসন পাতিয়া বসে, তখন অদূরে পর্ব্বত-গাত্রে প্রতি পল্লীগৃহে ঘনপল্লবিত বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়া দীপালির অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠে। বলা বাহুল্য, আঁধার-আলোকের এবং শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর শুভ্র মেঘমালার বিচিত্র খেলার ভিতর প্রকৃতির বিচ্ছুরিত সুষমা আহরণ করিয়া আশ্রমস্থ সাধকের মন যে স্বতঃই অন্তর্ম্মুখী ও ধ্যানগম্ভীর হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ সাধনানুকূল এই স্বর্গীয় আবেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘকাল তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া যে আদর্শ-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়। প্রতিদিন পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া বেলা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং পুনঃ বেলা ১০॥টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত জপ, ধ্যান ও পূজায় নিযুক্ত থাকিতেন। তৎপর আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আশ্রমে যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইত তাহাতে যোগদান করিতেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে অধিকাংশ দিনই আশ্রমের বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন এবং তখন শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক ও ভক্তদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত। পুনঃ সন্ধ্যার পর হইতে নৈশাহারের সময় পর্য্যন্ত তিনি ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন। যতদিন শরীরে সামর্থ্য ছিল ততদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় রাম মহারাজ অপরের নিকট হইতে কখনও সেবা গ্রহণ করেন নাই। স্বহস্তে তিনি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ আনন্দে ও নির্ব্বিকারচিত্তে করিয়া যাইতেন। আহারান্তে রাত্রে তাঁহারই কুটীরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নিত্য পাঠ হইত। আশ্রমস্থ সকলে উহা শ্রবণ করিতেন এবং পাঠান্তে অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত সকলে তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি নিজে বেদ-বেদান্তাদি জটিল গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার সাধকজীবনের উপলব্ধিসকল এমন সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে সকলের নিকট ব্যক্ত করিতেন যে তাহাতে অনেকেই প্রবল বৈরাগ্য ও উদ্দীপনা অনুভব করিতেন এবং তাঁহাদের অনেক প্রশ্নেরও মীমাংসা খুঁজিয়া পাইতেন। এত শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াও মানুষের অন্তরের অজ্ঞানাবরণ কেন বিদূরিত হয় না তৎসম্বন্ধে

তিনি একটি সুন্দর শিক্ষাপ্রদ গল্প বলিতেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই :—

জনৈক রাজা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ-মানসে এক প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পাঠক প্রতিদিন রাজাকে ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। এই ভাবে কয়েক দিন অতীত হইল। একদিন রাজা পাঠককে বলিলেন, "রাজা পরীক্ষিৎ মাত্র ৭ দিবস ভাগবত শ্রবণ করিয়া কৈবল্য লাভ করিয়াছিলেন। আর আমি এতদিন যাবৎ ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিলাম না! ইহার কারণ আমাকে অবশ্য বলিতে হইবে।" পাঠক ইহার কোন সদুত্তর দিতে না পারায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যদি তিন দিবসের মধ্যে তিনি ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ না হন, তবে তিনি তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলের প্রাণবিনাশ করিবেন। ভয়-চিন্তাকুলিতচিত্তে পাঠক গৃহে ফিরিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণীর পরামর্শানুযায়ী তাঁহারা উভয়ে নদীতীরস্থ উন্মাদবৎ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট রাজার প্রশ্নের ও তাঁহাদের আসন্ন বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ইহার সদুত্তর প্রদান করিব যদি অন্ততঃ এক দিনের জন্য রাজা আমার উপর তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে সম্মত হন।" পাঠক রাজ-সকাশে সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। তচ্ছ্রবণে সন্ন্যাসী রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাও সসম্মানে সন্ন্যাসীকে রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া ভূমিতলে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজাসন অধিকার করিয়াই সন্ন্যাসী রাজা ও পাঠককে কঠিন শৃঙ্খলে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রহরীকে আদেশ করিলেন। প্রহরী সভয়ে উভয়ের হস্তপদ কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিল। রাজা ও পাঠক বন্ধন-জনিত অসহ্য ব্যথায় অধীর হইয়া লৌহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঘনঘন কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যন্ত্রণা ও তীব্র আকুলি-বিকুলি দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাদের বন্ধন মোচনের আদেশ দিলেন। সন্ন্যাসী তখন রাজার প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "রাজন্, শাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে সপ্তমদিবসেই তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রিয় আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সংসারমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, ভোগ্যবস্তুনিচয়ের নশ্বরতা তাঁহার অন্তরে প্রবল বৈরাগ্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বিষয়বিতৃষ্ণ মন স্বতঃই ভগবচ্চিন্তায় ডুবিয়া গেল। ভাগবতশ্রোতা,—বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু; আর ভাগবদ্বক্তা,—নিত্যমুক্ত ত্যাগিশিরোমণি বালসন্ন্যাসী স্বয়ং শুকদেব গোস্বামী। এইরূপ মণিকাঞ্চনযোগ জগতে দুর্ল্লভ। তাই সাত দিবস ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা পরীক্ষিতের বিষয়-বিতৃষ্ণ বৈরাগ্য-ব্যাকুল নির্ম্মল অন্তরে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রকটিত হইল। তিনি নিত্যানন্দপদ লাভে ধন্য হইলেন। হে রাজন্, আপনি আপনার মানসিক অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আপনি স্বয়ং রাজ্য-সম্পদ-ভোগলালসায় প্রমত্ত। পাঠক শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও ঘোর বিষয়াসক্ত। উভয়েই সংসার-বাসনা-জালে আবদ্ধ। কাহারও অন্তরে বৈরাগ্যের লেশ-মাত্রও উদয় হয় নাই। আজ যেরূপ কঠিন বন্ধনে পীড়িত হইয়া বন্ধনমুক্তির জন্য আমার নিকট সাশ্রুনয়নে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যখন সংসার-দাবদাহে জর্জ্জরিত হইয়া সংসারের ভোগ্যবস্তুর প্রতি বিগততৃষ্ণ হইবেন এবং

ভগবানের রাতুল চরণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন, তখন কোন তত্ত্বজ্ঞ পাঠকের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিলে আপনার হৃদয়েও প্রকৃত জ্ঞান স্ফুরিত হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।' সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ও সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাম মহারাজ গল্পচ্ছলে এইরূপ অনেক বৈরাগ্যো-দ্দীপক মূল্যবান কথা সকলকে বলিতেন এবং যাঁহারাই তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা ও উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের কোন পৃথগস্তিত্বই যেন অনুভব করিতেন না। সবই ভগবানের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ও নির্ভয়ে কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া যাইতেন। সবই "রামের ইচ্ছায়" হইতেছে,—এই দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীর অনুভূতি তাঁর প্রতি কার্য্যে ও কথায় সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। তিনি আলমোড়া হইতে শেষবার চলিয়া যাইবার প্রায় একমাস পূর্ব্বে একদিন দ্বিপ্রহরে আশ্রমস্থ সকলকে বলিতে লাগিলেন, "আর ভাবনা নেই; মা এসেছেন; তিনি আমার হাত ধরেছেন। তোমরা সকলে প্রাণভরে মার নাম কর।" এই বলিয়া তিনি নিজেই গাইতে লাগিলেন,

"মা আছেন আর আমি আছি,
ভাবনা কি আছে আমার।
মার হাতে খাই পরি
মা নিয়েছেন আমার ভার।"

তিনি এমন করুণস্বরে এই গানটী গাইতে লাগিলেন যে তচ্ছ্রবণে সকলের মনে হইতে লাগিল যেন মা সত্য সত্যই প্রকৃতির এই পবিত্র নগ্ন শিশুকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন। যেদিন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় বিশ্রামান্তে তিনি শয্যার উপর বসিয়া কেবলই মা মা বলিয়া উচ্চস্বরে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ অবস্থায় শিরোপাধান ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলেন,—যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। মধ্যে দুইএকবার অনুচ্চস্বরে "দাদুমণি, দাদুমণি,"—এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। এইভাবে প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না দেখিয়া এবং কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া সেবক ভীত হইয়া সকলকে ডাকিতে লাগিল। সকলে ঘরে উপস্থিত হইলে অপরাহ্ণ প্রায় ৬॥ টার সময় হঠাৎ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং সকলের সঙ্গে আনন্দে মাতৃপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে রাম মহারাজের নিদ্রা নাই,—তিনি কেবলই মায়ের গান গাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, "ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।" পরদিন তাঁহাকে এই গভীর তন্ময়তার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দেখিলাম স্বয়ং শ্রীশ্রীমা আমার নিকট এসেছেন। কি স্নেহ ও করুণামাখা মায়ের রূপ! পার্শ্বেই যোগীন মা এবং গোলাপ মা-ও উপবিষ্ট। মা স্বহস্তে সকলকে দুধ, মিষ্টান্ন খাওয়াচ্ছেন। আমি মার সঙ্গে কোঁদল করছিলাম আর কত আবদার করছিলাম।" ধ্যানাবস্থায় তিনি "দাদুমণি" বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আদর করিয়া ঐ নামে ডাকিতেছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে রাম মহারাজের নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল। নিকটস্থ সকলে সে দৃশ্য দর্শন করিয়া কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। জগজ্জননী মা বুঝি এমনি করিয়াই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন।

ক্রমে শারদীয় দেবীপক্ষ সমাগত। আশ্রমে সামান্যভাবে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে। আজ প্রকৃতি দেবী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন,—দিকে দিকে আনন্দের হিল্লোল ছুটিয়াছে। স্থাবর-জঙ্গম মায়ের আগমনপ্রতীক্ষায় বিপুল পুলকে স্পন্দিত ও উল্লসিত। প্রতিপদ তিথি,—রাম মহারাজ সেবককে বলিয়া পাঠাইলেন তিনি আজ সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া মধ্যাহ্নে আহার করিবেন। ত্রিশবৎসর যে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই সহসা তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন!—সকলে চমকিত ও বিস্মিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি সেই দিন হইতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহই সকলের সঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন। এইরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "সময় তো হয়ে এলো; এইবার বিদায়ের পালা, হয়তো এইভাবে একসঙ্গে বসে আহার করা আর হয়ে উঠবে না।" তাঁহার কথার ভাবে মনে হইল যেন তিনি চিরবিদায়ের আয়োজন করিতেছেন। ক্রমে আলমোড়া হইতে কাশীধামে যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি পরিচিত সকলকে একে একে ডাকিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, সব ভুল হয়ে যাচ্ছে, এ সব স্থানও যেন অপরিচিত বলে বোধ হচ্ছে। আমি যেন কোন এক নূতন দেশে রয়েছি। এ শরীরটা বিশ্রামের জন্য একটা স্থান খুঁজছে। তবে ঠাকুরকে ভুল হয় নি, তিনি সময়মত ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবেন।"

তাই বুঝি রাম মহারাজ মুক্তিক্ষেত্র পবিত্র বারাণসীধামে শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাধু-ভক্তসমাবৃত হইয়া জগজ্জননী মার মধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরকে আদর করিয়া "দাদুমণি, দাদুমণি" বলিয়া ডাকিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ আজ লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে ত্যাগ-বৈরাগ্য, আত্মনির্ভর, ভগবদ্বিশ্বাস, শিশুর সারল্য ও আদর্শ-নিষ্ঠা তাঁহার তপস্যা-পূত নির্ম্মল চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রত্যেক সাধকের জীবনেরই অমূল্য সম্পদ ও নিত্যনব প্রেরণার চির উৎস হইয়া থাকিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

অভয়

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

মরণ যদি আসে, তবে
ভয় কিরে তোর ভয় কি?
তুই চিরদিনের অক্ষয় ধন নয় কি?
ধনের স্বভাব দিনেরাতে
ফিরে বেড়ায় হাতে হাতে
ক্ষতি কিছু তাহার তাতে হয় কি?
মরণ যদি আসে, এল
ভয় কিরে তোর ভয় কি?
মরণ আসে আসুক, তাতে
ভয় কিরে তোর ভয় কি?
তুই নূতন হ'য়ে আসবি ফিরে নয় কি?
বাষ্প হ'য়ে বারি যে যায়
বৃষ্টিরূপে নামে ধরায়
তাহাতে সে মানে কভু ক্ষয় কি?
মরণ এলে যাবি, আবার
আসবি ওরে ভয় কি?

মরণ যদি আসে, তবে
ভয় কিরে তোর ভয় কি?
তুই নবজীবন ফিরে পাবি নয় কি?
শুক্‌নো পাতা যেমন ঝরে
নূতন এসে বৃক্ষে ভরে
বৃক্ষ কভু পত্রবিহীন রয় কি?
মরণ এলে যায় পুরাতন
আসে নূতন, ভয় কি?
মরণ যদি আসে, আসুক
ভয় কিরে তোর ভয় কি?
সে পারবে তোরে ক'রতে কভু জয় কি?
বন্ধু সে যে বন্ধু ওরে
ভালবেসে ডাকবে তোরে
বাঁধনখানি খুলে দিবে নয় কি?
মরণ যদি আসে, সে তো
সুখের কথা, ভয় কি?

সমালোচনা

India of My Dreams—মহাত্মা এম্ কে গান্ধী প্রণীত। মিঃ আর কে প্রভু কর্তৃক সংকলিত। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—হিন্দ্ কিটাবস্ লিমিটেড, হর্নবি রোড, বোম্বাই। ১২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

'বম্বে ক্রনিকল' নামক বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকের সহ-সম্পাদক মিঃ আর কে প্রভু 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'হরিজন' এবং মাহাত্মা গান্ধীর বিবিধ রচনা ও বক্তৃতা হইতে এই পুস্তক সংকলন করিয়াছেন। ছোট ছোট আটাশটী অধ্যায়ে পুস্তকটী বিভক্ত। বিশ্বশান্তি, গৃহযুদ্ধ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা, কৃষকের অধিকার, সমাজতন্ত্রবাদ, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, পানদোষ, স্বদেশীর বাণী, চরকার সংগীত, নাগরিকের দায়িত্ব, জাতীয় ভাষা, দরিদ্র নারায়ণ, পূর্ণ স্বরাজ এবং আমার স্বপ্নের ভারত সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মতাবলী অধ্যায়গুলিতে সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। কোন্ কোন্ পত্রিকা বা পুস্তক হইতে বাক্যগুলি উদ্ধৃত তাহাও পুস্তকের অন্তে প্রদত্ত হইয়াছে। যে অহিংসাব্রতী ত্যাগিবর মহাপুরুষের নেতৃত্বে আমাদের মাতৃভূমি শতাব্দীর দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে এই সকল বিষয়ে তাঁহার মতাবলী কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়? ভারত সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন, "ভারতের প্রত্যেক বস্তুই আমাকে আকৃষ্ট করে। সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত মানবের যাহা যাহা প্রয়োজন সেই সমুদায় এই ভারতে আছে। ভারত প্রধানতঃ কর্মভূমি, ভোগভূমি নহে। আমার স্বপ্নের ভারতে দরিদ্রতম মানুষেরাও মনে করিবে, ইহা তাহাদেরই দেশ এবং ইহার সংগঠনে তাহাদের হাত আছে। আমার কল্পনার ভারতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী থাকিবে না এবং সকল সম্প্রদায়ের লোক শান্তিতে বাস করিবে। সেই ভারতে অস্পৃশ্যতা বা মদ্যপান বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার বিলুপ্ত হইবে। নারীগণ পুরুষের মত সমান অধিকার ভোগ করিবে। অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে ভারতের মিত্রতা থাকিবে। আমাদের ভারত কোন দেশ হইতে কিছু অপহরণ করিবে না, বা কোন দেশ কর্তৃক অপহৃত হইবে না। জনসাধারণের ক্ষতিকারক কোন রাষ্ট্রনীতি চলিবে না। ইহাই আমার স্বপ্নের ভারত। যে ভারতে উপরোক্ত আদর্শ নাই তাহা আমার হৃদয় অধিকার করিবে না।' মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, 'স্বাধীন ভারত দুঃখ-কষ্টে মুহ্যমান জগতের প্রতি শান্তি ও শুভেচ্ছা প্রচার করিবে। স্বদেশপ্রেমের আলোকে যেমন ব্যক্তি পরিবারের জন্য, পরিবার গ্রামের জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা প্রদেশের জন্য এবং প্রদেশ সমগ্র দেশের জন্য, তেমনি স্বাধীন ভারত জগতের হিতার্থ বদ্ধপরিকর হইবে। ভারত ইউরোপকে অনুকরণ করিবে না। কারণ, জগতের প্রতি ভারতের অপূর্ব বাণী আছে। স্বাধীন ভারত দ্বারা সকল দেশ উপকৃত হইবে। আমার ধর্ম আমার স্বদেশপ্রীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। শিশু যেমন মাতৃবক্ষে আশ্রয় নেয়, আমি তেমনি ভারতকে ভক্তি করি। কারণ জীবনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে এই দেশেই পাই।'

মহাত্মার ভাষা যেমনি প্রাঞ্জল, ভাবও তেমনি প্রাণস্পর্শী। বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। তিনি স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহা পূর্ণ হউক।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভারতীয় সংস্কৃতি—স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ-ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ৩৯৭ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি টাকা।

এই পুস্তকে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় নিউইয়র্ক নগরীর 'ব্রুকলীন ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ আর্টস্ এণ্ড সায়েন্স" ভবনে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের ভারতীয় কৃষ্টি বিষয়ক অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত গভীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন তাহার সহিত পরিশিষ্টে ১৯০৬-১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "ভারতবর্ষের শিক্ষা ও রাজনীতি" নামক একটী প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ ও স্বামী শঙ্করানন্দজী লিখিত "প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতা" নামক একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রায় অধিকাংশই ভারতীয় নিজস্ব কৃষ্টি ও বহির্জগতে তাহার প্রভাব ও দান সম্বন্ধে কোনও খোঁজ খবরই রাখেন না। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশেষতঃ স্বাধীন ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই সজাগ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিশ্ব-সংস্কৃতির মূলীভূত ভারতীয় কৃষ্টির ধারা পূজ্যপাদ স্বামীজী এই সকল বক্তৃতায় সুনিপুণ ভাবে ঐতিহাসিক তথ্যসম্ভার দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। নিজস্ব কৃষ্টির গভীরতা, বিশালতা ও উপাদেয়তার প্রকৃত উপলব্ধিই মানুষকে স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠ ও শক্তিশালী করিতে পারে। আজ সমুন্নকৃষ্ট সমগ্র জগৎ কৃষ্টিদৈন্যে মুমূর্ষু ও ভারতীয় কৃষ্টির অমৃত ধারায় স্নান করিয়া শান্তিলাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাই এই সন্ধিক্ষণে প্রথমে ভারতীয় যুবক-যুবতীগণকে এই অমৃতে আকণ্ঠ পূর্ণ করিতে ও পরে তাহা দেশবিদেশে বহন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। এই হেতু আমরা পূজ্যপাদ স্বামীজীর অমূল্য বাণীগুলির বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক মনে করি। বর্তমানে এই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য তালিকা-ভুক্ত হওয়া উচিত এবং সুলভসংস্করণ-দ্বারা দাম কমাইয়া সর্বসাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের পক্ষে সহজলভ্য করা সঙ্গত।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ষড়শীতিতম জন্মোৎসব—আগামী ১৮ই মাঘ, ইং ১লা ফেব্রুয়ারী, রবিবার, পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৬ সনের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভারত-সেবক সমিতির প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, মালয়স্থ ভারত-সরকারের প্রতিনিধি মিঃ এস্ কে চেত্তুর, কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের ডিরেক্টর ডাঃ এম্ আর চোলকার প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি মিশন পরিদর্শন করিয়া তৎপরিচালিত দুঃস্থ-সেবা, শিক্ষা-বিস্তার, ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি-প্রচার প্রভৃতি কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সাধারণ ও শ্রমজীবিশ্রেণীর দুঃস্থ নর-নারী ও শিশুগণের সাহায্য ও সেবা, অনাথ বালকবালিকাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান, ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি-প্রচার, রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখ লোকোত্তর মহাপুরুষগণের জন্মোৎসব

উদ্‌যাপন ও তদুপলক্ষে তাঁহাদের জীবনী ও বাণী আলোচনা মিশনের প্রধান কর্মপ্রচেষ্টা। আলোচ্য বর্ষে ১১,৬৫৮ জন শ্রমজীবী নর-নারী ও শিশুকে বস্ত্র দান করা হইয়াছে। অনাথ-বালক-ভবন ও অনাথ-বালিকা-ভবনে ৫ হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে রাখা হয়। বিবেকানন্দ বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১১৯ এবং সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ১৩৬। বিদ্যালয় দুইটিতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত তামিল ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা, পাঠচক্র গঠন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশীয় অসংখ্য সদ্‌গ্রন্থ সম্বলিত পুস্তকাগার, বহুসংখ্যক মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্র প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রীতি, সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে।

মিশনের আয় ৩৭,৭১০,০৭ ডলার এবং ব্যয় ২৭,২১৯,৩১ ডলার। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য ২০,০০০ ডলার আশু প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত মিশনের অন্যান্য বিভাগের কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান নগর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির বহুল প্রচার ও প্রসার এবং নর-নারায়ণ সেবার জন্য মিশন কর্তৃপক্ষ অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

কোয়ম্বাটুর রামকৃষ্ণ মিশন—আমরা এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত বিদ্যালয়ের ১৯৪৬-৪৭ সনের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার আদর্শে স্থাপিত একটি আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বিদ্যার্থিগণের মধ্যে এমন শিক্ষার বিস্তার করা যদ্দ্বারা তাহাদের প্রকৃত ধর্ম-নীতি-জ্ঞান, সেবাপরায়ণতা ও আত্মবিশ্বাস উদ্দীপিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৪৯। শিল্পশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট একটি শিল্পবিভাগ আছে। উহাতে ইলেক্‌ট্রিক মটর গাড়ী প্রভৃতি মেরামতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। খেলাধূলারও বন্দোবস্ত আছে। মিশন-পরিচালিত সীতামণি মেমরিয়াল ডিসপেন্‌সরি হইতে মোট ২১৬৩ জন পুরুষ, ১৫১৬ জন স্ত্রীলোক এবং ১৬৭৪ জন শিশু বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়াছে।

বিদ্যালয়ের আয় ১,৩৩,৪৯৬৲১০ এবং ব্যয় ৬২৮৫১৸৶০। বিদ্যালয়-গৃহ, ছাত্রাবাস, ব্যায়াম-শালা, শিল্পাগার, শিক্ষক-ভবন এবং মন্দির নির্মাণের জন্য দুই লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠান সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়—১৯৪৩-১৯৪৬ সালের কার্য-বিবরণী—এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৪৩ সনে ছাত্রীসংখ্যা ৩৩৫ জন এবং ১৯৪৬ সনে ৫৭২ জন ছিল। গত বৎসর হইতে আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। বিদ্যালয়গৃহের সংস্কার অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। পবিত্র ও বলিষ্ঠ আবহাওয়ার মধ্যে স্কুল ও কলেজের ছাত্রীগণ যাহাতে বিদ্যার্জন করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি পরিচালিত।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় ধারণা ছিল যে দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নারীগণেরও যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন। তাঁহারই ইচ্ছায় ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদে এবং ভগিনী নিবেদিতার প্রযত্নে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সেবা করিয়া আসিতেছে।

বালিকাগণ যাহাতে কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়স্থ সারদা মন্দিরের অঙ্গ হিসাবে একটি পৃথক ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এজন্য অর্থের প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রয়াগ ধামে অর্ধকুম্ভ মেলা উপলক্ষে সেবাকার্য—প্রয়াগ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আবেদন—আগামী ১৯৪৮ সনের ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগ ত্রিবেণী সংগমে অর্ধকুম্ভের প্রথম স্নান, ৯ই ফেব্রুয়ারী অমাবস্যা তিথিতে দ্বিতীয় স্নান, ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাসন্তী পঞ্চমীতে তৃতীয় স্নান এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী শেষ স্নান হইবে। এই উপলক্ষে ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু যাত্রী আগমন করিবেন। তাঁহাদের সেবার জন্য প্রয়াগ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম মেলাক্ষেত্রে একটি দাতব্য ঔষধালয় খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ জন্য আনুমানিক দশ হাজার টাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বদান্য ব্যক্তিগণের দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে:—স্বামী ধীরাত্মানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ।

বিবিধ-সংবাদ

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলের উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্নে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী পুণ্যানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অসুস্থাবস্থায় অবস্থানকালে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি ভাবে 'কল্পতরু' হইয়া ভক্তদের কৃপা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন—সেই প্রসিদ্ধ বৃত্তান্তটি সভাপতি বর্ণনা করেন।

সভানুষ্ঠানের প্রারম্ভে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্ঘ দান করেন। পরে তিনি প্রধান অতিথিরূপে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সমবেত অগণন জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "কল্পতরু উৎসবের ন্যায় পবিত্র অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হইতে পারায় আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন জীবন্ত উপনিষদ্, রক্তমাংসের ভগবদ্গীতা। উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতার কোন টীকা টিপ্পনীরই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণীর সহিত তুলনা হয় না। পৃথিবী যতই রামকৃষ্ণদেবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবে, ততই এই মন্দির লোকের আকর্ষণের বস্তু হইবে এবং ইহা বৃহত্তর তীর্থস্থানে পরিণত হইবে। কোন সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবার পূর্বেই, আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এই মন্দির রক্ষণের ভার গ্রহণ করা দরকার। কলিকাতা যেমন পৃথিবীর বাণিজ্য-বন্দর, এই স্থানটিও তেমনি আধ্যাত্মিক আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে। সুতরাং এক শক্তিশালী পার্থিব রাষ্ট্রের ইহার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার লওয়া প্রয়োজন। শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে আমি ইহাও

স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমি গবর্ণমেণ্ট নই। এই মন্দিরের দায়িত্ব লইতে হইলে ব্যবস্থা পরিষদে এই সম্বন্ধে বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। যদি তাহা হয় তবে উহাকে সমগ্র পৃথিবীর যোগ্য তীর্থস্থানে পরিণত করা যাইবে। আধুনিক মানুষের ন্যায় আমার মনেও শত সংশয় ও দ্বিধা আছে; কিন্তু আমি বলিতে চাই, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে আমার মনে কোন সংশয় নাই। পরমহংসদেব ছিলেন নিষ্কলুষ, মহান্ ব্যক্তি ও আমাদের পক্ষে অভ্রান্ত গুরু। যাঁহারা পড়িতে জানেন তাঁহাদিগকে আমি রামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণী পাঠ করিতে বলি।

"পরমহংসদেব সর্বপ্রকারের ভগবৎ-উপাসনাকেই মানুষের চরম আদর্শলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। পূর্বগ ধর্মসংস্কারক ও দার্শনিকগণ কোন কোন মত ও পথকে অসত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, রামকৃষ্ণদেব কোন মত ও পথকেই অসত্য মনে করেন নাই—তিনি সকল মতকেই ভগবান লাভের উপায় বলিয়া সত্য মনে করিয়াছেন। এখানেই অন্যান্য ধর্মসংস্কারকের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্থক্য। আমি বাল্যকালে যে বাড়ীতে ছিলাম সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ অতিথিরূপে অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন এবং আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী সেখানে মঠ স্থাপন করেন। কারাজীবনে আমি অন্যান্য সঙ্গী সহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী পাঠ করিয়াছি। রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, আপনারা ১৯৪৮ সনের প্রথম দিবসে ভগবানের আশীর্বাদে সকল দুঃখ উৎকণ্ঠা এবং ভয় হইতে মুক্ত হউন এবং সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণকে আপনাদের ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া গণ্য করিতে শিখুন! ১১২ বৎসর পূর্বে রামকৃষ্ণদেব কেবল আপনাদের কল্যাণের জন্যই এখানে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনারা এই পৃথিবীকে অখণ্ড বলিয়া মনে করুন। রামকৃষ্ণদেব আপনাদিগকে সাধুজীবন যাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। যখন কাহারও মনে কোন ঘৃণার ভাব জাগিবে, কাহারও অনিষ্ট করার ইচ্ছা হইবে, তখন তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেখানে সাধনা করিয়াছিলেন সেই তীর্থস্থানে আসেন এবং এখানকার ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া ফিরিয়া যান। আমি এই অনুষ্ঠান-উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি, কারণ রামকৃষ্ণদেব যেখানে সাধনা করিয়াছিলেন সেখানে আসিলেও অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।"

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—পৌষ ও মাঘ এই দুই মাসে সোসাইটি ভবনে শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয় সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় নিয়মিতরূপে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ও স্বামী বিবেকানন্দের 'দেববাণী' আলোচনা করেন এবং "মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত", "স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের জীবন-কথা" ও "প্রভু যীশুর জন্ম ও বাণী" সম্বন্ধে ৩টি বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব মহাশয় সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা সভায় নিয়মিতরূপে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী "শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা" সম্বন্ধে চারটি ও "মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী "পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর জীবনী" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ভারতে সামরিক শিক্ষাদান ও স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ—ভারত-সরকারের দেশরক্ষা-বিভাগের অধীনে সমগ্র দেশে তিন প্রকার শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে

প্রাথমিক উদ্যোগ-আয়োজন করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিতেছেন। তিন প্রকার স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী গঠনের কথা হইয়াছে :—(১) উর্ধ্বতন বিভাগ, (২) নিম্নতন বিভাগ এবং (৩) ছাত্রী বিভাগ। উর্ধ্বতন বিভাগে প্রায় সম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষা এবং অপর ২টি বিভাগে এই বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

উর্ধ্বতন বাহিনীর তিনটি বিভাগ থাকিবে—স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী। এই বাহিনীর সকল স্বেচ্ছাসৈনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ হইতে সংগ্রহ করা হইবে। ইহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় রিজার্ভ অফিসার তৈয়ারী করা। এই উদ্দেশ্যে আণ্ডার গ্রাজুয়েটগণকেও সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এরূপভাবে করা হইবে যাহাতে ছাত্রদের পড়াশুনার কোন ক্ষতি না হয়। উর্ধ্বতন বাহিনীতে যাহারা অন্ততঃ ৩ বৎসর শিক্ষালাভ করিবে তাহাদের ডাইরেক্ট কমিশনে গ্রহণ করা হইবে। তবে এই সকল প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকা চাই এবং বয়স ২১ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। এই বাহিনীতে প্রথমে স্থল-বিভাগে ১৫ হাজার, নৌ-বিভাগে ১ হাজার এবং বিমান-বিভাগে ১৫০০ শিক্ষার্থী থাকিবে।

নিম্নতন বাহিনীতে উচ্চবিদ্যালয়গুলির দশম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রদের গ্রহণ করা হইবে। এই বাহিনীর শিক্ষা কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হইবে তাহা বিভিন্ন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ স্থির করিবেন। নিম্নতন বাহিনীতে প্রথমতঃ সমগ্র ভারতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ছাত্রকে গ্রহণ করা হইবে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলার ভাগে ধরা হইয়াছে ২০ হাজার। নিম্নতন বিভাগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য চরিত্র এবং শরীর গঠন ও ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা-বোধ জাগ্রত করা। এই বাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ জাতীয় সমর বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে পারিবে। সামরিক শিক্ষার প্রাথমিক বিষয়গুলি ইহাদিগকে শিখান হইবে। উহার মধ্যে অস্ত্র লইয়া ড্রিল করাও থাকিবে।

ছাত্রীবাহিনীতে নিম্নতন বাহিনীর ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে গ্রহণ করা হইবে। এই বাহিনীটি ভারত-সরকারের শিক্ষা দপ্তর পরিচালন করিবেন। এই বাহিনীর শিক্ষাকাল দুই বৎসর। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থিনীদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, শারীরিক শিক্ষা, ড্রিল, ধাত্রীবিদ্যা, বেতার ও টেলিফোনের কাজ শিখান হইবে। ছাত্রীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছাত্রীদের শরীর গঠন করা, তাহাদিগকে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী করিয়া তোলা এবং আপদকালে তাহারা যাহাতে পুরুষদের কয়েকটি কাজ করিতে পারে সেই জন্য তাহাদের উপযুক্ত করা।

ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা—ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের আগামী অধিবেশনে ছাত্রগণের সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। সিনেট সরকারের প্রস্তাব মানিয়া লইলে আগামী আগষ্ট মাস হইতেই সামরিক শিক্ষাদান আরম্ভ হওয়া সম্ভব। এই শিক্ষার্থিগণের মধ্যে ব্যাটালিয়ন, কোম্পানী ও পল্টন—এই তিন বিভাগ থাকিবে।

আমেরিকায় ইণ্ডিয়া লীগ—ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডি ৬ই জানুয়ারী আমেরিকায় ইণ্ডিয়া লীগের দশম বার্ষিক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সদিচ্ছাই জয়ী এবং ভারতের সুমহান ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন হইবে। বিশ্বের শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ভারত বিপুল প্রভাব বিস্তার করিবে।" মার্কিন নাগরিক স্বাধীনতা সঙ্ঘের পরিচালক ও ইণ্ডিয়া লীগের কোষাধ্যক্ষ মিঃ রোজার এন বল্ডুইন বলেন, "ভারতের নেতা অহিংসা শিক্ষা দিয়াছেন। ভারত স্বাধীনতা অপেক্ষা বড় দান জগৎকে দিয়াছে।" লীগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ রক্ষিত বলেন, "স্বাধীন ভারতের কর্তব্য—মনুষ্যত্ববোধের ও মানবীয় অনুকম্পার ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আবদ্ধ করা এবং এক শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিশ্ববিধান প্রণয়নের গঠনমূলক প্রয়াসে অংশীদার হইতে পরস্পরকে সাহায্য প্রদান।"

উদ্বোধন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব *

কুমার পরিব্রাজক শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ

এইবার (ইং ১৮৮৪ খৃঃ) ধর্ম্মপ্রচার-উদ্দেশে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন এবং পরমহংসদেবের অনুরক্ত ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। মহাত্মা রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "ধর্ম্ম-প্রচারকে" যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

গহন বনে কত সুগন্ধি পুষ্প ফুটিয়া থাকে, তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা 'বনজ', বনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন-কাননের একটী সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি আদি যে সকল উপায় লোক-সকলকে সাধারণতঃ পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল, বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধ্য লাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন।

এই মহাত্মা জিলা হুগলীর অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রামে (কামারপুকুর) জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় নাই। লোকে যে সময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দ লাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া আপনি বিগলিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় তানসানবৎ না হইলেও বর্দ্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার করিতেন বলিয়া দুরাদ্দূরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে সময় সময় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুলশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তথায় আসিয়াছিলেন; তিনি লোকের মুখেই রামকৃষ্ণের বিবরণ

* শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বরূপ স্বামী সংকলিত 'কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থমালা'র ৩৬নং সংখ্যা হইতে সংগৃহীত। উঃ সঃ

বিদিত হইয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না; সুতরাং ভক্তের ভাব, চেষ্টা ও চরিত্র সহজে বুঝিতেও অক্ষম। পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভাবে আপনার তালে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। করতালির পট্ পট্ শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিতের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুম্ ক্যা পট্ পট্ আওয়াজ করতে হো? যহ ক্যা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যায়? যহ তো রোটী বনানেকী খেল হ্যায়?" রামকৃষ্ণ চিরজীবনের জন্য যে খোরাক প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহা কঠোরহৃদয় তার্কিক কোথা হইতে বুঝিবেন? রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া আপনার আনন্দে তথা হইতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্নবেদিকা-দর্শনে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তিমতী রাণী রাসমণি জাহ্নবীতটে কলিকাতার সমীপবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার পূজা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। ভগবতী স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজনিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তিসহ এই অপূর্ব্ব চিন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না, কিন্তু মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন। রাঙ্গাচরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহামায়ার চরণ-স্পর্শে ভক্তের হৃদয় আর কি স্থির থাকিতে পারে? আর কি সাধক বাহ্য জগতের বাহ্য ব্যাপার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? রিপুমদ-মর্দ্দিনী রণ-রঙ্গিণী রুদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণ মন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সুস্বরই দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চবটীতে বসিয়া নির্জ্জনে ভাবময়ীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভক্ত নিজ মূলমন্ত্র-সাধনে শরীর, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ, বিপত্তি আদি সকলে একে একে সাধকের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, ভক্তকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কাল-নিবারিণী তরবারি দর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বসিয়া নিজ হৃৎপদ্মাসনে জগজ্জননীকে বসাইয়া মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া ভাবসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তিসোপানের স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাঁহার কার্য্য বিশৃঙ্খল হইল সত্য, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন স্তম্ভন, কখন উল্লম্ফন আদি পাগলের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্দ্ধও অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল হইলেন, অন্তরে অটল, অচল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে লোকে পাগল বলিয়া জানিল, বহুদিন ধরিয়া তাঁহার এই রোগের বাহ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল, শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার বাহ্য শরীর আবদ্ধ রহিল, সাধনার গুণে মহাত্মার সকল বন্ধন একে একে কাটিয়া গেল। মূঢ় জগৎ তাঁহাকে মায়ায়

বন্ধন করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে? আর কি কোন হেতু দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হয়? যাঁহার বাবা (শ্মশানবাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের হাটবাজার, পাগলের বাণিজ্য সেখানে যে কোন গ্রাহক যাউক্ না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল, তাঁহার পাগলামীতে অন্য জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি মা বলিয়া জগৎমাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির ভিখারী হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক একদিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটের বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন, আর বলিতেন—মা! আমাকে ভক্তি দেও! আমি ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। কখন কখন তিনি প্রস্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত! তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ ভক্তির মূল্য বুঝে না, জগতের চক্ষু এ ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে না। ভক্তির মাধুরী তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই তোমার নিকটে গেলে লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়, তোমার নিকটে বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এ দেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে, বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্য্যে পরমহংস। আশ্চর্য্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য্য ইঁহার প্রকৃতি, যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্তচলাচল শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনীকাঞ্চনকে বস্তুতঃই "কায়েন মনসা বাচা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্দ্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি যদি কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য সংবেগ উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখন শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায়, যে বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন, একখানি জীবন্ত গ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংস্রবে ও তাঁহার উপদেশগুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে। পরমহংস মহাশয়েরই উপদেশগুণে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশববাবুর শেষজীবনে হিন্দুধর্ম্মের রং ধরিয়াছিল। তাঁহার বিষয়ে অনেক বলিবার আছে। সময় সময় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।*

* কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় তৎপ্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত" গ্রন্থের 'অবতরণিকায়' লিখিয়াছেন যে, ঐ জীবন-বৃত্তান্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়া কাশী হইতে ছাপাইবার মানসে গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে সেই পাণ্ডুলিপি পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া ছাপান হয়। উল্লেখ বাহুল্য যে, উক্ত জীবন-বৃত্তান্তের সহিত এই প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা পরিব্রাজক স্বামীজীর নিজস্ব অভিমত।—উঃ সঃ

মহাত্মা গান্ধীর মহত্ত্ব

সম্পাদক

মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে কেবল ভারতের নয় পরন্তু এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকার কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় শোকে-দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কোন দেশের কোন মানুষের দেহত্যাগে বিশ্বময় এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত মর্মবেদনা এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা এই মহামানবের মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বমানবের সম্মান প্রদর্শনেরই জ্বলন্ত নিদর্শন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহাত্মাজীর জীবনী ও বাণী পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মনে যথার্থই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

জগতের কোটি কোটি মানুষের মনের উপর গান্ধীজীর এই অশ্রুতপূর্ব প্রভাবের একমাত্র কারণ তিনি রাজনীতিতে লিপ্ত থাকিয়াও ধর্ম সত্য অহিংসা ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সমদর্শন ত্যাগ ও সংযমকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। এরূপ মহত্ত্ব আধুনিক যুগের কোন রাষ্ট্রনায়কের জীবনে দেখা যায় না। পৃথিবীর বর্তমান রাজনীতিকে যথার্থই একটি অপরিহার্য নোংরা বিষয় (unavoidable nuisance) বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না! তথাপি এ যুগে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশসমূহের অধিবাসিগণের পক্ষে রাজনীতি অপরিহার্য। কারণ, ইহার উপর তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গল ও সুখ-দুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কেবল এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী ঋষিতুল্য হইয়াও ভারতের তথা জগতের সর্বসাধারণের হিতার্থে রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। আধুনিক রাজনীতি নোংরা বিষয় এই জন্য যে, অধর্ম অসত্য ধাপ্পা-বাজী দুর্নীতি হিংসা প্রতিহিংসা অসাম্য সাম্প্রদায়িকতা বিরোধ বিদ্বেষ প্রভুত্ব অসংযম লোভ পরস্বাপহরণ দলাদলি যুদ্ধ-বিগ্রহ অশান্তি প্রভৃতি ইহার অঙ্গের ভূষণ! আশ্চর্যের বিষয় যে, গান্ধীজী রাজনীতির মধ্যে থাকিয়াও এই সকল অনর্থের বহু উর্ধ্বে ছিলেন। পক্ষান্তরে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এ যুগে পৃথিবীতে সভ্য নামে গর্বিত শক্তিমান জাতিমাত্রেরই রাজনীতিতে ঐ কদর্য ভাবগুলির অপ্রতিহত প্রাধান্য চলিতেছে। এই সকল দেশের রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন বলিয়া প্রমাণ করিয়া পৃথিবীর সকল জাতিকে উৎসন্নের পথে পাঠাইয়াও আপন আপন জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর! ইঁহারা সকলের চক্ষের সম্মুখে জগতের অনুন্নত দুর্বল জাতিসমূহের হিতসাধনের নামে তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন এবং বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠার আবরণে আপন আপন জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন! এই শ্রেণী উচ্চকণ্ঠে ধর্ম ন্যায় নীতি প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য ঐ সকলের বিপরীত ভাবগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে কিছু-মাত্র দ্বিধাবোধ করেন না! এই মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক ধুরন্ধরের ষড়যন্ত্রে ক্রমে বিশ্বব্যাপী দুইটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। ইহার ফলে কয়েকটি দেশ ও অসংখ্য জনপদ উৎসন্ন গিয়াছে

এবং অনেক জাতি, হৃতসর্বস্ব হইয়াছে। বর্তমানেও পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই জনসাধারণ এই মহাযুদ্ধ-জনিত দুর্দশা কম-বেশি ভোগ করিতেছে। কিন্তু ইহাতেও এই রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের চৈতন্য উদয় হইতেছে না। ইঁহারা এখনও পঞ্চমুখে বিশ্বশান্তির মধুর বাণী প্রচার করিতেছেন, আবার আণবিক বোমার শক্তিবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা পূর্ণোদ্যমে চালাইতেছেন! ইঁহাদের কার্য-কলাপের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রলয়ঙ্কর তৃতীয়যুদ্ধের আশঙ্কায় পৃথিবীর সকল নরনারী প্রকৃতই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

বহু কাল পূর্বে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, "Politics without a religious backing is a dangerous pastime reacting in nothing but harms to the nations." —'ধর্মাশ্রয়হীন রাজনীতি এক সাংঘাতিক খেলা, ইহার প্রতিক্রিয়ায় জাতির অপকারই হইয়া থাকে।' পৃথিবীর বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহাত্মাজীর এই মহতী বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। জগতের সকল নরনারী প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, বর্তমান রাজনীতি ধর্ম-নীতিবিবর্জিত বলিয়াই ইহা তাহাদের মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা গান্ধীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে এই দুরবস্থা প্রতিকারের সন্ধান পাইয়াছে। এই মহাপুরুষ রাজনীতিতে লিপ্ত থাকিয়াও ধর্ম সত্য ও অহিংসার মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল নরনারীই তিক্ত অভিজ্ঞতা-মূলে মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন যে মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর অহিংস নীতির প্রয়োগই বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায়। এই জন্যই গান্ধীজীর দেহত্যাগে তাঁহার প্রভাব এত ব্যাপক এবং সুদূরসম্প্রসারী আকার ধারণ করিয়াছে।

বহুকালের পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভারত-বাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ ছিল। এ জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বহুবার দুঃখ বরণ করিয়াছিলেন—এমন কি প্রায়োপবেশনে জীবনদান করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলন যথার্থ জাতীয় আন্দোলন বা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। তাঁহার অনন্যসাধারণ ত্যাগ, আহার-বিহার-পোষাক-পরিচ্ছদে সংযম, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, অনাসক্তি, সমদর্শন, নির্ভীকতা, সত্য ও অহিংসায় নিষ্ঠা, কর্মশক্তি, নিয়মানুবর্তিতা, স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বমানবের সকল দুঃখ ও অশান্তি দূরীকরণের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ভারতের জনসাধারণ মুগ্ধান্তঃকরণে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে। এই গুণরাশির জন্য কেবল ভারতবর্ষে নয়, পরন্তু পৃথিবীর যে স্থানে তিনি গিয়াছেন সেই স্থানেই লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার জন্য অপরিসীম আগ্রহ দেখাইয়াছে। এই মহাপুরুষের জীবনে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য যথার্থই রূপায়িত হইয়াছিল। এই অলোকসামান্য মহত্ত্বই গণ-মনের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাবের কারণ। তাঁহার নির্দেশে ভারতের জনসাধারণ নির্বিচারে পরিচালিত হইত এবং দুঃখ বরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহারা 'কংগ্রেস' শব্দে মহাত্মা গান্ধীকেই বুঝিত। জনসাধারণের উপর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব প্রভাব বিস্তারের ফলেই গান্ধীজী তাহাদের সাহায্যে সম্পূর্ণ অহিংস

উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ অভূতপূর্ব উপায়ে পৃথিবীর কোন পরাধীন জাতি এ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহাই মহাত্মা গান্ধীর প্রধান মহত্ত্ব এবং ইহাই বিশ্বের সকল নরনারীর নিকট তাঁহাকে মহীয়ান করিয়াছে।

ভারতের অবনত ও অনুন্নত জাতিসমূহের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এবং তাহাদের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য মহাত্মা গান্ধীর অপরিসীম আগ্রহ ছিল। এ জন্য তিনি কেবল প্রবন্ধ-প্রকাশ এবং সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-দান ও মন্তব্য পাশ করিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে পদদলিত লাঞ্ছিত অপমানিত মূর্খ দরিদ্র অস্পৃশ্য 'জনগণের উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি জীবনের শেষ দিন' পর্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন। দিল্লী নগরীতে অবস্থানকালে মহাত্মা গান্ধী ভোগ-বিলাসপূর্ণ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া এই অবজ্ঞেয় নরনারীকুলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য তিনি মাসের পর মাস তাহাদের বস্তিতে বাস করিয়াছেন। সেখানেও কেবল ভারতের নয়, পরন্তু পৃথিবীর বহু দেশের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিজাত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এ দৃশ্য যথার্থই অপূর্ব। মহাত্মা গান্ধীর এই মহত্ত্ব প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক!

হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য-স্থাপন মহাত্মা গান্ধীর জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য তিনি অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিনই প্রার্থনা-সভায় তিনি উচ্চ কণ্ঠে সর্বধর্মসমন্বয়ের মাহাত্ম্য প্রচার তথা সকল ধর্মকে ভগবান লাভের এক একটি পথ মনে করিয়া উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ সকল ধর্মাবলম্বিগণকে যথার্থই সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। এই মহাপুরুষের নিকট মানুষে মানুষে কোন ভেদ-বৈষম্য ছিল না। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পার্শি মুসলমান খৃষ্টান শিখ সম্মিলিত এক অখণ্ড স্বাধীন ভারত তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু ইংরাজের ভেদনীতি এবং সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানদের দুর্বুদ্ধির জন্য ভারতবর্ষ দ্বিধা বিভক্ত এবং পাঞ্জাব ও বাংলা উভয়ই দ্বিখণ্ডিত হইলে মহাত্মাজী অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করিলেন। পাকিস্তানের সীমানা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ হাজার হাজার নিতান্ত নির্মম ভাবে নিহত এবং লক্ষ লক্ষ হৃতসর্বস্ব ও বিতাড়িত হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। অপর দিকে ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতীয় রাষ্ট্রের সমর্থন না থাকিলেও পূর্বপাঞ্জাবের বহুসংখ্যক মুসলমান স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই উভয় কারণে মহাত্মাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের উপর যতই উৎপীড়ন হউক না কেন, ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতীয় রাষ্ট্রের কোন স্থানে মুসলমানদের উপর কিছুমাত্র অত্যাচার হয় ইহা গান্ধীজীর অহিংস-নীতিবিরুদ্ধ এবং এই জন্য তিনি ইহার একান্ত বিরোধী ছিলেন। ইহাই মহাত্মাজীর অসামান্য মহত্ত্বের পরিচায়ক। কিন্তু মর্তলোকে দুর্লভ এরূপ মহত্ত্ব তাঁহার হত্যাকারী সহ্য করিতে পারিল না। সে গান্ধীজীর এই মহত্ত্বকে সম্ভবতঃ হিন্দুদের অনিষ্টের কারণ বলিয়া ভ্রম করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্য দিবালোকে রিভলবারের গুলিতে নিহত করিল। এইভাবে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের জন্য বর্তমান জগতের সর্বজনমান্য মহামানব জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পৃথিবীর সকল নরনারীর চক্ষে এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহাতে আততায়ীর উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। সে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করিয়া তাঁহার অহিংস-নীতিকে অমর করিয়াছে এবং ইহার মহত্ত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলে মহাত্মাজীর অনুষ্ঠিত অহিংস-নীতি যে অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বমানবের মনকে প্রভাবিত করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতোমধ্যেই ভারতীয় রাষ্ট্রের পরিচালকগণ সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর নীতি সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিতে সর্বপ্রযত্নে অবশ্য চেষ্টা করিবেন। কারণ, ইহাই এই মহামানবের মহত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

প্রশ্ন উঠিতেছে—স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে মহাত্মাজীর প্রচারিত অহিংস-নীতি পরিগৃহীত হইলেও পৃথিবীর শক্তিশালী দেশসমূহের রাষ্ট্রপতিগণ কি এই নীতি কার্যতঃ গ্রহণ করিবেন? অবশ্য এখন গান্ধীজীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে যাইয়া তাঁহারা সকলেই সমস্বরে বলিতেছেন যে, এই মহামানবের প্রচারিত অহিংস-নীতিই বিশ্বমানবের মধ্যে শান্তি স্থাপনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বময় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিরোধ-বিদ্বেষ ও হিংসা-প্রতিহিংসার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, তাঁহারা কি মহাত্মাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তৎপ্রচারিত নীতিসহায়ে ঐ সকল অনর্থ দূর করিতে চেষ্টা করিবেন? আমরা দেখিতেছি—পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কগণও গান্ধীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা তথাকার সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতিও বারংবার দিতেছেন। কিন্তু তথাপি সেখানে হিন্দু ও শিখদের আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া থাকা এবং জীবন-যাত্রানির্বাহ করিবার পথে যে সকল বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে, ঐ সকল দূর করিবার কোন চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন না। ইহার ফলে এখনও সিন্ধুদেশ হইতে হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ এবং পূর্বপাকিস্তান হইতে হাজার হাজার হিন্দু ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে। আমরা আরও দেখিতেছি যে, বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের পরিচালকগণ মহাত্মাজীর অহিংস-নীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াও কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান ব্যাপারে তাঁহাদের চিরাচরিত ন্যায়-নীতিবর্জিত রাজনীতির প্রশ্রয় দিতেছেন! এই সকল অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আমাদের বিশ্বাস—পৃথিবীর ছোট বড় রাষ্ট্রমাত্রেরই পরিচালকগণ মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত অহিংস-নীতির প্রতি মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিয়াও কার্যতঃ এই নীতি গ্রহণ করিবেন না এবং তাঁহাদের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থ সাধনের জন্য তাঁহারা চিরাভ্যস্ত হিংসা-প্রতিহংসা এবং বিরোধ-বিদ্বেষেই মত্ত থাকিবেন!

তবে কি মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণ-জনিত অভাবের যে স্বতোৎসারিত মর্মবেদনা পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ইহা বৃথা হইবে? এই মহামানবের জন্য সকল দেশের জনসাধারণের এই যে আন্তরিক অভাব-বোধ ইহা তাঁহার অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব তথা তৎপ্রচারিত সত্য ধর্ম ও অহিংস-নীতির প্রতিই বিশ্বমানব-মনের স্বাভাবিক আকর্ষণের পরিচায়ক। এই দিক দিয়া ইহা সকল নরনারীর অন্তর্নিহিত মহত্ত্বেরই অভিব্যক্তি। মহাত্মা গান্ধী মানুষমাত্রেরই আভ্যন্তর মহত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন। আমরাও ইহাতে বিশ্বাস করি। এই জন্য আমাদের ধারণা যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ তাহাদের জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হইলে তাহাদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বও কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করিবে। তখন জগতের এই গণশক্তির মতের চাপে সকল দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরগণও তাঁহাদের চিরাচরিত অধর্ম অসত্য ও হিংসা নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণে বিশ্বমানবের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সত্য ও অহিংসার প্রাধান্য বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব সূচনা এবং ইহাই এই দেবমানবের মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শরীরী গান্ধীজী অপেক্ষাও অশরীরী গান্ধীজীর মহত্ত্বরাশি অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া পৃথিবীর সকল দেশের সকল নরনারীর মনকে প্রভাবিত করুক এবং ইহার ফলে বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

যুগসন্ধি

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

সৃষ্টি আসে প্রলয়ের ভীতিপ্রদ অন্ধকার ফুঁড়ে
তীক্ষ্ণ বর্শা-ফলকের স্থিরলক্ষ্যে অমিত বিক্রম
তমসা বিদীর্ণ করে নভঃস্পর্শী গৌরীশৃঙ্গ চূড়ে
মুক্তির উদয় তীর্থে অগ্নিবর্ণ নিঃশঙ্ক নির্মম।
দ্বিখণ্ডিত ভারতের রক্তে রাঙা মানচিত্র জুড়ে
বিপন্ন সংসার মঞ্চে নৃত্য করে বৈবস্বত যম
অমৃত হরিয়া তবু বৈনতেয় আসে উড়ে উড়ে
রক্তপক্ষ আন্দোলিয়া অন্ধকারে মুক্তি-বিহঙ্গম।
আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে বিনতার দাসীত্ব মোচন
অন্তর্হিত সুধাভাণ্ড কুশাঘাতে বিদীর্ণ রসনা
কদ্রুর সন্তানদল পরস্পর চালায় দংশন
নারকীয় স্বার্থকূপে বৃথা করে আত্ম-প্রতারণা।
হরিষে বিষাদ তাই জন্মভূমি রক্তস্রোতে ভাসে
পলাশীর পাপগ্রহ কেটেও কাটেনা ভাগ্যাকাশে।

কে বলে বিষণ্ণ তুমি হে বিপ্লবী শঙ্খচক্রধারী,
আগ্নেয় শোণিতে তব সঙ্ঘবদ্ধ নারায়ণী সেনা
প্রলয় পয়োধি জলে জন্ম নেয় মুক্তির কাণ্ডারী
দারিদ্র্যের অন্ধকারে রুদ্ররূপ যায় নাকো চেনা।
চিনেছি তোমায় আজ হে মধুসূদন দর্পহারী
অপরাধী শোষকের দিব্যদৃষ্টি সহজে আসেনা
ভ্রান্তি মরীচিকা রাজ্যে জনশত্রু গগন-বিহারী
ভুলে যায় শেষলগ্নে শুধিতেই হবে তা'র দেনা।
হে বিষ্ণু, মনীষাদীপ্ত জ্বালো শিখা প্রাণের প্রদীপে
নরকে রোরুদ্যমান ভীরুতার মিথ্যা বিভীষিকা
লুপ্ত করো স্বার্থমগ্ন পৃথিবীর সপ্ত দ্বীপে দ্বীপে
ঋজুতম জীবনের দীপাধারে জ্বালো সাম্যশিখা।
জানি জানি তুমি মাতা তুমি পিতা অনন্ত আশ্রয়
সর্বহারা জনগণে ঐক্যমন্ত্রে করেছ দুর্জয়।

রাহুর উদর নেই, মুক্তিস্নান অনিবার্য তাই
সাময়িক অন্ধকারে আতঙ্ক জাগায় অকারণ
মৃত্তিকায় ফুল ফোটে উড়ে যায় শ্মশানের ছাই
মুক্তি চায় শত শত সর্বহারা উদ্বাস্তু জীবন।
মুক্তি তবু কলঙ্কিত মুষ্টিমেয় দুষ্টেরা সদাই
বিদ্বেষের অগ্নি জ্বালে পুঁজিবাদী ঘৃণ্য প্রহরণ,
শত্রু হাসে, দেশ কাঁদে, ভাই বলে ডাকে নাকো ভাই
বিভেদের পাপপঙ্কে খাবি খায় জন-সাধারণ।
চারিদিকে মহাপাপ চৌর্যবৃত্তি জঘন্য সঞ্চয়
ব্যক্তিস্বার্থে সমষ্টির খাদ্যপ্রাণ সুড়ঙ্গ সঞ্চারী
গোপন ভাণ্ডারে চলে ঐশ্বর্যের ঘৃণ্য অপচয়
পাশ্চাত্যের প্রেতশিষ্য লোভের আকাশে স্বপ্নচারী!
কোথা মুক্তি, সুদূরে, মুক্তি কি এসেছে ঘরে ঘরে
হে দরিদ্র নারায়ণ, মূক কেন বিষণ্ণ অন্তরে?

তাইতো ফাঁসির মঞ্চে দেখেছি তোমার রুদ্রবেশ
ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে বিপ্লবের অনির্বাণ শিখা
নরসিংহ বিদ্রোহীর উদাত্ত আহ্বানে সারাদেশ
মুক্তিপণে অচঞ্চল হোমাগ্নির নির্ধূম দাহিকা।
নাইতো কিশোর ছেলে হাসিমুখে উদ্ধত ললাট
শৃঙ্খল মুক্তির যজ্ঞে তোমার রক্তাক্ত বেদীতলে
মরণের মুখোমুখী করে গেছে অভীমন্ত্র পাঠ
কোটি বক্ষে স্মৃতি তার সহস্রশিখায় আজো জ্বলে।
সাধনার ক্ষুরধার নির্মম গৈরিক রাঙা পথে
শৌর্য-বীর্য-প্রজ্ঞা আর বিপ্লবের বলিষ্ঠ সাধনা
এবার সফল করো দেবতাত্মা বিশাল ভারতে
লুপ্ত করো সর্বপাপ, ভয়ে ভয়ে কালরাত্রি গোনা।
চূর্ণ আজ লৌহকারা ছিন্নভিন্ন দাসত্ব শৃঙ্খল
আনো নব সমন্বয়ে সমদর্শী প্রাণ অচঞ্চল।

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও অজাতবাদ *

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ

বেদান্ত দর্শন মতে জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতির আলোচনা 'জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট, তাই আমরা দেখি' এই সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ অবলম্বনে করা হইয়াছে। 'সৃষ্টি আছে বলিয়াই দেখি, সৃষ্টি না থাকিলে দেখিতাম না'—ইহাই এই মতবাদের মূলতত্ত্ব। এই মতে সৃষ্ট বস্তুতে 'আমি আমার' জ্ঞানই মানুষের আসক্তি বা বন্ধনের কারণ। এই আসক্তি বা বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদিগণ সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম, পূজা পাঠ জপাদি উপাসনা ও নিত্যানিত্যবস্তুবিচার করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা বলেন, ইহা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয় এবং 'আমি আমার' জ্ঞান বা আসক্তি নষ্ট হইয়া মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র অনুসারে এই সাধন-প্রণালী জ্ঞানযোগের অধম অধিকারীর উপযোগী।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ

এই মহান শাস্ত্র জ্ঞানযোগের মধ্যম অধিকারীকে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ আশ্রয়ে কেবল বিচার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'দেখি, তাই জগৎ আছে বোধ করি, না দেখিলে জগৎ নাই' সংক্ষেপতঃ ইহাই এই মতবাদের মূল কথা। এই বাদ অবলম্বনে যে বেদান্ত-বিচার করা হয়, তাহাতে এই জগৎ-সংসার বিজ্ঞানাতিরিক্ত কিছুই নহে, উহা বিজ্ঞানেরই আকার মাত্র, ইহাই প্রথমে প্রতিপাদন করা হয়। ইহার প্রক্রিয়া এইরূপ :

আমরা যাহা দেখি শুনি জানি বা বলি, তাহা আমাদের অন্তঃকরণ তত্তৎ আকার ধারণ করার ফল। আমাদের অন্তঃকরণ যাহার আকার ধারণ করে না, তাহার জ্ঞান হয় না। যেমন ঘটের দিকে চাহিয়া থাকিয়াও যদি আমরা অন্যমনস্ক হই, তাহা হইলে আর আমাদের অন্তঃকরণ ঘটাকার ধারণ করে না এবং এই জন্য ঘটজ্ঞানও হয় না। অতএব ঘটাদি অন্তঃকরণবৃত্তি বা বিজ্ঞানবিশেষ।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে ঘট না থাকিলে যখন অন্তঃকরণ উহার আকার ধারণ করে না, তখন অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করা কি আবশ্যক নহে? কিন্তু এই আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, স্বপ্নকালে বিষয় না থাকিলেও বিষয়ের জ্ঞান উপস্থিত হয়। অতএব জ্ঞানের কারণ বিষয় নহে; কোন অজ্ঞাত কারণে অন্তঃকরণ যাহার আকার কল্পনা করে তাহারই জ্ঞান হয়। এই অজ্ঞাত কারণটি অনাদি কালের সংস্কারসমষ্টি; ইহারই অপর নাম—অজ্ঞান মায়া অবিদ্যা প্রকৃতি ইত্যাদি। আর ইহার কারণ অনাদি পূর্বসংস্কার। ইহা ভ্রমবিশেষ। অধিষ্ঠানজ্ঞানে ইহার নাশ হয়, আর পুনরুদ্ভব হয় না। এই জন্য ইহাকে বেদান্তে অনির্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলা হইয়াছে। অনির্বচনীয় মানে—যাহা নির্বচন অর্থাৎ বর্ণনা বা প্রকাশ করা যায় না। এই মিথ্যার স্বভাব এই যে জ্ঞান হইলে উহা আর থাকে না। যেমন অন্ধকার দেখিবার

* মৎপ্রণীত "যোগচতুষ্টয়" নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে। এই গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।—উঃ সঃ

জন্য আলোক আনিলে আর অন্ধকার দেখা হয় না,—কেবল অন্ধকারেই অন্ধকার দেখা সম্ভব হয়, সেইরূপ কেবল অজ্ঞানকালেই অজ্ঞান আছে বলিয়া আমাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। সকল বিষয়ই জ্ঞান-আশ্রিত। জ্ঞান হয় বলিয়াই সকলের সত্তা সিদ্ধ হয়। জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তুরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। এই জ্ঞান অর্থ—অন্তঃকরণ-বৃত্তি ; ইহা স্বরূপজ্ঞান নহে।

পুনরায় প্রশ্ন উঠে—যে ঘট গৃহান্তরে রহিয়াছে উহাকেও আমরা 'আছে' বলি কি করিয়া? উহার তো জ্ঞান হইতেছে না? কাজেই সকল বস্তুর সত্তাই জ্ঞানাধীন, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? ইহার উত্তর এই যে, 'পরে যাহার জ্ঞান হয় বা হইবে, তাহা 'পরে হইবে' বলিয়া আমাদের জ্ঞান থাকে বা আছে, কিন্তু প্রাচীরাদি প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হইতেছে না,' এইরূপ জ্ঞান আমাদের থাকে বলিয়া ইহার সত্তা আমরা স্বীকার করি, অথবা কল্পনাসহায়ে উহার বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করি। সুতরাং উভয়তঃ উহার সত্তা জ্ঞানের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এই জন্য মূলতঃ সত্তা ও জ্ঞান অভিন্ন।

'যাহা জানিনা তাহাও আছে বা থাকিতে পারে,' এই বাক্যের দ্বারা অজ্ঞানকে দ্বার করিয়া বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়। এই জন্য যাহাকে না জানিলেও তাহার সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাকে অজ্ঞান-দ্বারক সত্তাসিদ্ধি, আর যাহাকে জানিলে তাহার সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাকে জ্ঞান-দ্বারক সত্তাসিদ্ধি বলে। এই জ্ঞান ও অজ্ঞান যে দ্বারদ্বয় উহারা উভয়েই কোন নিত্য জ্ঞান-সত্তার অধীন। এই জন্য যাহা আমরা জানি তাহাও যেমন জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হয় এবং তাহাও যেমন জ্ঞান-সত্তার অধীন, তদ্রূপ যাহা আমরা জানি না কিন্তু যাহা কোন কালে জ্ঞানের যোগ্য, তাহাও আমাদের জ্ঞানসত্তার অধীন। অতএব জ্ঞান ব্যতীত কাহারও সত্তা সিদ্ধ হয় না। এইজন্য সকল বস্তুই জ্ঞানের আকার। 'আমি জানি না', এইরূপ যখন জ্ঞান হয়, তখন অজ্ঞানের সত্তা সিদ্ধ হইয়া থাকে। নচেৎ অজ্ঞানের সত্তাই সিদ্ধ হয় না। অজ্ঞানের আশ্রয়ই জ্ঞান। অন্য কিছু অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

এইরূপ বহুবিধ বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, সকল বস্তুই—ঘট পট মঠ যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি বা জানি সকলই জ্ঞানের আকার। জ্ঞান ভিন্ন কিছু নাই এবং থাকিতে পারে না।

এক শ্রেণীর বৌদ্ধগণ জ্ঞানকে ক্ষণিক বলেন। বেদান্তমতে ক্ষণিক জ্ঞানের মূলে অক্ষণিক অর্থাৎ স্থির জ্ঞান বা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এই জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন, "বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম"।

এইরূপে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে, যাবতীয় দৃশ্য অদৃশ্য বা কল্পিত বস্তু সকলই জ্ঞানস্বরূপ যে 'আমি' সেই আমাতে অবস্থিত, সকলই মদাশ্রিত অজ্ঞানের সাহায্যে আমারই কল্পনা। আসল মূলজ্ঞান-স্বরূপ যে 'আমি', সেই 'আমি' ভিন্ন কিছুই নাই। দেশ কাল কার্য কারণ সবই বস্তুর সঙ্গে কল্পিত।

প্রশ্ন উঠে—জ্ঞানের আকারগুলি আসে কোথা হইতে? এই আকারগুলি ও জ্ঞান কি বিভিন্ন বস্তু নয়? সুতরাং সকলই বিজ্ঞান ইহা সিদ্ধ হয় না।

উত্তরে বলা যায়—আকারগুলি আসে কোথা হইতে তাহা আমাদের জানা নাই বলিয়াই সিদ্ধ হয় যে, আকার আসে অজ্ঞান হইতে। আমাদের 'না জানাই' এই অজ্ঞান। ইহা

অনাদি-অজ্ঞান-পরম্পরা-জাত, জ্ঞান হইলেই ইহা চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না। এই জন্য আকারকে বাদ দিয়া যাহা আকারী বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই 'আমি' এবং এই 'আমি' ভিন্ন কিছুই নাই। ইহাই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ। 'দেখিতেছি, তাই আছে বলি,' ইহাই এই মতবাদের মূলতত্ত্ব। এই মতে জীব জগৎ ঈশ্বর গুরু বেদ বেদান্ত যত কিছু সকলই আমার কল্পনা। অবশ্য এই 'আমি' 'জীব আমি' নহি।

ইহাই বেদান্তের মধ্যম অধিকারীর বিচারের সামান্য নিদর্শন। জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান-অভ্যাসই এই মতের সাধন-প্রণালী। নিম্নে জ্ঞানযোগের উত্তম অধিকারী অজাতবাদীর বিচার-পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল :

অজাতবাদ

অজাতবাদ-মতে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন আর কিছু নাই। 'দেখি, তাই আছে বলি' এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের উপর আর এক ধাপ উঠিয়া আমাদের 'দৃষ্ট বস্তুও নাই' বা 'দৃষ্ট বস্তুকেও দেখিতেছি না' বলা এই মতবাদের বিশেষত্ব। কিছু দেখিয়াও ঐ দেখাকে স্বীকার না করা এই মতবাদের মূল কথা। অজাত-বাদিগণ বলেন, 'আমরা দেখিতেছি' ইহাই স্বীকার করি কেন? 'আমরা দেখিতেছিও না' বলিলেই তো আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না? নচেৎ 'দেখিতেছি' বলিলেও 'কেন দেখিতেছি' এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ জন্য ব্রহ্ম ভিন্ন মিথ্যারূপ কিছু স্বীকার করিতে হয়। উহাকে 'মিথ্যা' বলিলেও অর্থাৎ 'নাই, তবু দেখা যায়' এইরূপ বলিলেও তাহাই বা কেন হয়, এই প্রশ্নের উদয় হয়। অজাতবাদিগণ এইরূপ প্রশ্নের সম্ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বলেন, 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই এবং দেখাও যায় না।' এইরূপ বিচারে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অবিকারী অদ্বৈত ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়।

আপত্তি হয় যে, ইহাতে তো প্রত্যক্ষ-বিরোধ হয়? প্রত্যক্ষ বস্তুকে অস্বীকার করি কি করিয়া? রজ্জুতে সর্প মিথ্যা হইলেও দেখা যায়, 'দেখি না' কেহ বলে না। অতএব মিথ্যাকে ভাবরূপ অনির্বচনীয় কিছু বলিব না কেন?

ইহার উত্তরে অজাতবাদিগণ বলেন, "যাহা আদিতেও নাই, অন্তেও নাই, তাহা বর্তমানেও নাই।' শ্রুতিতে আছে—'একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছুই নাই।' এই জন্য এই মতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ। কিন্তু এই বিচার দ্বারা প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। প্রত্যক্ষই সকল সংশয় ও ভ্রম দূর করিয়া থাকে। অতএব অজাতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে।

অজাতবাদীর মতে ইহা লৌকিক বিষয়ে সঙ্গত হইলেও অলৌকিক বিষয়ে সঙ্গত নহে। যোগিগণ অদৃষ্ট বস্তুকেও 'দেখিতেছি' বলেন। যোগবল অস্বীকার করা যায় না। অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ এক নহে। অজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ অজ্ঞানসম্ভূত, জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ যথার্থ। এই জন্য এক জন জ্ঞানীর কথা সাধারণ সহস্র ব্যক্তির কথা অপেক্ষাও মূল্যবান। অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞানিগণের বাক্য ও শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। জ্ঞানিগণ ও শ্রুতি ব্রহ্মকে অদ্বৈত নিষ্ক্রিয় অখণ্ড নির্গুণ শান্ত প্রভৃতি বলেন। কাজেই অজাতবাদ জ্ঞানিগণের বাক্য ও শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করা চলে না। লৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষবিরোধের সম্ভাবনা থাকিলেও অলৌকিক বিষয়ে সে বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ, সে স্থলে ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক প্রত্যক্ষের সহিত অপরের অলৌকিক প্রত্যক্ষের কোন সম্পর্ক নাই। কেননা সেখানে দেশ

কাল ও কার্য কারণের সম্বন্ধের অভাব বিদ্যমান।

এইরূপে বহু অকাট্য প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, জগৎকারণ বস্তু অলৌকিক। জ্ঞানিগণ বলেন, 'জগৎ তিনকালেই নাই।' সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে 'জগৎ দেখিতেছি' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তত্ত্ব ও বিচারের দৃষ্টিতে 'উহা বাস্তবিকই দেখিতেছি না' বলিতেই হইবে। বিচার করিলে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি যে, আমরা এই চলমান জগতের সতত পরিবর্তনশীল কোন বস্তুর প্রকৃত রূপ যথার্থই দেখিতে পাই না। সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্থূল দৃষ্টিতে উহা দেখাও সম্ভব নয়।

দ্বৈতজ্ঞান আমাদের মনে খুব দৃঢ়। এই ভাব ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শ্রুতি ও বিচার সাহায্যে প্রত্যক্ষ অস্বীকার করাই স্থূল দৃষ্টিতে অজাতবাদের সাধনা বলা যায়। মনে নিরন্তর অদ্বৈত ভাবস্রোত প্রবাহিত করাই এই মতের সাধন। ইহার আর অন্য সাধন নাই। যাহার সাধন থাকে তাহাই সাধ্যবস্তু, সুতরাং অনিত্য। উপনিষৎ বলেন, "যোগশাস্ত্রসম্মত বিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধন নাই, শাসন নাই, মুক্তির ইচ্ছা নাই, মুক্তিও নাই, ইহাই পরমার্থ দৃষ্টি।"[১] আচার্য শংকর বলিয়াছেন, "তুমি আমি এই সকল কিছুই নাই, তবে শোক করা কেন?"[২] এই উভয় বাক্যে সকলই অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা অতি স্পষ্ট অজাতবাদ। ইহাই বেদান্তের শেষ কথা। জ্ঞানযোগেরও ইহাই চরম আদর্শ। জ্ঞানযোগী আপনার অস্তিত্বও অস্বীকার করেন এবং বলেন, যদা নাহং তদা মোক্ষঃ—যখন অহং অর্থাৎ 'আমি আমার' জ্ঞানও থাকে না তখনই মোক্ষ লাভ হয়।

'জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা' এই ত্রিপুটী অস্বীকার করার অভ্যাসই অজাতবাদের সাধন। যখনই আমাদের জ্ঞানের উদয় হইবে, তখনই 'উহা নাই' মনে করিতে হইবে। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে 'উহা মিথ্যা, উহা আমারই কল্পনা' ইহাই অভ্যাস করিতে হয়। আর অজাতবাদে 'উহা নাই', এই অভ্যাস করা আবশ্যক।

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ-মতে জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট, তাহাতে 'আমি আমার' বোধই বন্ধনের কারণ। অতএব যাহাতে 'আমি আমার' বোধ না জন্মে—যাহাতে আসক্তি না হয়, তাহাই ব্রত নিয়ম পূজা তপ জপ পাঠ প্রভৃতি উপাসনা ও বিচার দ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। আর দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে যাবতীয় দৃশ্য বিষয় আমাতে কল্পিত, জীব জগৎ ঈশ্বর বন্ধন মোক্ষ সবই আমার কল্পনা, এই বিশ্বাস করা আবশ্যক। ইহাতে বন্ধনের কারণ নষ্ট হয়। অজাতবাদে 'এক ব্রহ্ম' বা 'শুদ্ধ আমি' ভিন্ন কিছুই নাই, এই বিশ্বাস দ্বারা অন্তঃকরণকে একেবারেই বৃত্তিশূন্য করিতে হয়। এইরূপ করিলে যাহা থাকে—যাহার আর জ্ঞান হয় না, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই বিশ্বাস জন্মান অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য এই পথ সর্বাপেক্ষা দুরূহ এবং সাধারণ সাধকের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। শাস্ত্র কেবল উত্তম অধিকারীর জন্য এই পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

সৃষ্টিসম্বন্ধে যত প্রকার মতবাদ দেখা যায়

১ ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ শাসনম্।
ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চেদিত্যেষা পরমার্থতা ॥
—ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ২১৫

২ অষ্টকুলাচলসপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥
—মোহমুদ্গর

সকলগুলিতেই ত্রুটি আছে। জীব-কর্মের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, অজ্ঞানজন্য সৃষ্টি, স্বভাববশে সৃষ্টি, সৃষ্টি এইরূপই, ইত্যাদি যত প্রকার মতবাদ আছে বা হইতে পারে, উহাদের দোষ দেখান যায়। কিন্তু ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ নির্বিকার বাক্যমনাতীত নির্গুণ নিষ্ক্রিয় এক অদ্বৈত এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত তত্ত্বে যদি পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে 'জগৎ নাই' ইহা অবশ্য স্বীকার্য। শ্রুতি না মানিয়া জগৎ মিথ্যা বা জগৎ সত্য অথবা সত্য-মিথ্যা উভয়ই ইত্যাদি যাহাই বলা হয়, তাহাতেই দোষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু জগৎ অতীত কালেও ছিল না, বর্তমানে নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, অর্থাৎ 'তিন কালেই জগৎ নাই' বলিলে সৃষ্টিসম্বন্ধীয় ঐ সব দোষ আর স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু বিচার করিয়া জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্য সাধারণ সাধক এই মতের আদর করেন না। তথাপি শ্রুতি মানিলে 'তিন কালেই জগৎ নাই' ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানীর বিচারেও ইহাই সিদ্ধ।

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে এই বলিয়া যে, 'আমি ব্রহ্ম, জগৎ মিথ্যা' ইহা যদি জ্ঞান-যোগের উত্তম সাধন হয় এবং অন্য সাধন না থাকে, তাহা হইলে আমাদের সুখ-দুঃখাদি বোধ কেন হয়? আমরা কেন অন্যরূপ ব্যবহার করি? অতএব জ্ঞানই জ্ঞানের সাধন নহে, ভগবৎকৃপাদি আবশ্যক।

ইহার উত্তরে বলা যায়—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি ভস্মদ্বারা আবৃত থাকিলে উহা আর দেখা যায় না, সেইরূপ 'আমি ব্রহ্ম', 'জগৎ মিথ্যা' এই অপরোক্ষ জ্ঞান 'আমি দেহ', 'জগৎ সত্য' এই পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া আছে বলিয়াই প্রকাশিত হইতেছে না। 'আমি ব্রহ্ম' এই অপরোক্ষ জ্ঞান প্রকাশিত হইলে 'আমি দেহ' এই পরোক্ষ জ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞানযোগী মুক্তিলাভ করেন।

অতএব 'আমি ব্রহ্ম', 'জগৎ মিথ্যা' এই কথা বারংবার শুনিয়াও যাহার পূর্ববৎ বন্ধন থাকে, তাহার জ্ঞানের অপরোক্ষতা-সাধন আবশ্যক। ইহাতে জ্ঞানই জ্ঞানের সাধন এ কথায় কোন বাধা ঘটিতেছে না। প্রথমাবস্থায় যেমন কর্ম ও উপাসনা জ্ঞানসাধনে আবশ্যক, শেষাবস্থায় তেমন উভয়ই বর্জনীয়। এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনে অধিকারিভেদে কর্মাদি অনুষ্ঠান ও ত্যাগ উভয়ই প্রয়োজন। অতএব জ্ঞানযোগের প্রকৃত সাধন জ্ঞানই। অন্যান্য সকল কেবল সহায়ক মাত্র। ঐগুলি অধিকারিভেদে কাহারও পক্ষে আবশ্যক এবং কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক।

এই জ্ঞানযোগ অভ্যাসের ফলে ইহার চরমাবস্থায় জ্ঞানীর প্রাণসকল প্রবিলীন হয়। তাঁহার প্রাণের আর উৎক্রমণ হয় না। তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরাদি সকলই সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। যতদিন তাহা না হয় অর্থাৎ প্রারব্ধ-চালিত দেহ থাকে, ততদিন তিনি জীবন্মুক্তরূপে বিচরণ করেন। প্রারব্ধক্ষয়ে দেহনাশে তাঁহার বিদেহ মুক্তি লাভ হয়।

দেহে ও বিদেহে*

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমহংসদেব সম্বন্ধে আমার দিক থেকে বলবার মত বিশেষ কিছুই পাই না। তাঁর সম্বন্ধে বলবে কে? মাঝে মাঝে কিছু শোনবার আশা করেই দক্ষিণেশ্বরে যেতুম। যখনই গিয়েছি প্রায়ই দেখেছি দু'একখানি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে,—কলকাতা হতে বাবুরা ঠাকুরের কাছে এসেছেন। সঙ্কোচে ঘরে ঢুকে দোরের কাছেই বসেছি। আগন্তুকেরা তাঁকে ঘিরে বা তাঁর সান্নিধ্যে বসে কথা শুনছেন। তার ছিন্ন অংশ আমারও কিছু কিছু লাভ হোত।

তাঁরা ছিলেন সকলেই সংসারী লোক, আমারও কয়েক মাস পূর্ব্বে বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। সংসারীদের অনুকূল—জ্ঞাতব্য কথাই থাকতো বেশী।—ভগবানকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য সেটা মনে রেখে তার পর সবই করতে পারো।—ভক্তি শুনলেই তোমরা ভেবরে যাও কেন, ভয় পাও কেন? ভক্তি—হাতী ঘোড়া নয়, ভালবাসারই নাম। ভালবাসলেই তাঁকে পাওয়া যায়,—ভালবাসার বশ সকলেই। মাগ ছেলের জন্যে লোক ঘটিবটি কাঁদে, ভগবানের জন্যে কাঁদে কে? একটু কেঁদে দেখো দিকি।

কেহ বলতেন—তাঁর কি আছে, কি দেখবো, শুনেছি তিনি নিরাকার। ঠাকুর—তিনি নিরাকার সাকার সবই। চারদিকে একবার চেয়ে দেখো। যা দেখছো সে সব কি ও কার? কোথা থেকে এলো? সবটাই তো তিনি বা তাঁর। এতেও দেখতে পাও না? ধরো জলটা—যা না পেলে একদণ্ড চলে না, কোথা থেকে কেন এলো, কে আনলে?

ও সব তো চিরদিনই আছে মশাই।—

কে তোমাকে বলেছে—বৃদ্ধ পিতামহ? চিরদিন মানে কি? তোমার চিরদিনটার আরম্ভ কোথায়?

সে সব জানি না, আমরা কেবল তাঁকে দেখতে চাচ্ছি।

বেশ, তোমরা যাঁকে বড়লোক বল, অর্থাৎ তোমাদের কাছে ধনী লোক যিনি, তাঁকে দেখতে গেলে কত ঘাট পেরুতে হয়? দারোয়ান যদি ছাড়ে তো আমলারা আছেন,—খরচও কিছু করতে হয়, তাতে সেটা সহজ হয় শুনেছি। তুমি কিছু না করেই দেখতে চাচ্ছ। তা সম্ভব কি? শুধু হাতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থেকে কেবল ফিরে আসতে হয়। নয় কি?

আপনি গোলমেলে কথা আনলেন!

দরকার যে। আমি তোমাদের ব্যবহারিক কথাই বলছি। একজন টাকাপয়সাওয়ালা লোককে দেখবার দুর্য্যোগ কত্তো,. আর তুমি জগৎওয়ালা ত্রিভুবনস্বামীকে বিনি খরচে দেখবে? এখন একটু খাটো। আগে তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসই আসুক, তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হও। ছেলের কান্না মা বুঝতে পারেন, ছুটে এসে মাই দেন। আগে বিশ্বাসই আসুক। এতবড় জগৎটায় তাঁকে দেখতে পেলে না?

* এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত কথাগুলি তাঁহার স্মরণ নাই। তিনি এ প্রবন্ধে উহাদের ভাবার্থ মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।—উঃ সঃ

মেঘ দেখে ঝড়ের আশঙ্কায় খুদে পিঁপড়েটা ডিম মুখে করে নিরাপদ স্থান খোঁজে। যাও, আগে বিশ্বাস আনো, পরে সব আপনি আসবে।

আমারি কমবয়সী দু'চারজন ছেলে ছোকরা বা যুবা থাকতেন। তাঁদের প্রফুল্লমুখে তখন হাসি দেখা দিত। তখন তাঁদের চিনতাম না। পরে তাঁরা নিজেদের বিশ্ববিদিত করে গেছেন। ঠাকুর সাধনায় সিদ্ধি লাভান্তে—এঁদেরি ডাক দিয়েছিলেন। শেষে এঁদেরই স্বামীজীর (তখনকার নরেন্দ্রনাথ দত্তের) হস্তে সমর্পণ করে তিনি মহাপ্রস্থান করেন।

যে সব ছেলেদের কথা বললুম এঁরা সংখ্যায় ক্রমে সতেরো আঠারটিতে পরিণত হন। আমি তাঁদের সবকে চিনতাম না, তাঁরা দল বেঁধে একসঙ্গে আসতেন না। তাঁরা বড়দের ভীড়ের মধ্যেও আসতেন না। সময় বুঝে অগ্রগামী কেহ তাঁদের পরিচয় করে দিতেন। ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে—ঠাট্টা তামাসার ভাষায় আলাপ করতেন, ট্যাঁকসই কি না দেখে নিতেন। সে আলাপ শোনবার মত ছিল। ঠাকুর কম রসিক ছিলেন না। কাকেও ফিরিয়ে দিতেন—বিয়ে থা করে সংসার করতেও বলতেন,—কোন গরীবের একটা মেয়ে পার হবে তো! তাতেও পুণ্যি আছে—ইত্যাদি। কিম্বা কিছুদিন পরে আসতেও বলতেন। এ কথাও বলতেন—আমাকে বাপ মার কাছে 'গাল' খাইও না।

ঠিক এই সময় একটি ভয়ানক দুর্ঘটনাও ঘটে গেল। যে সব যুবকেরা আসতেন তাঁদের মধ্যে আমার দুইটী মাত্র পরিচিতকে পেয়েছিলুম। একজন—যোগীন রায় চৌধুরী। তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ীর ছেলে। আমার (বোধকরি) এক ক্লাস ওপরে—বরাহনগরে ইংরাজী স্কুলে পড়তেন। আমাদের বাড়ী থেকে চৌধুরীপাড়া একটু তফাতে থাকায়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল না—আলাপ ছিল। ধীর, শান্ত, অল্পভাষী। তাঁকে দেখতুম।

দ্বিতীয়টি আরিয়াদহের। নাম—ব্রহ্মপদ (দাস), ঠিক স্মরণ নাই। পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বর বিদ্যালয়ে এক শ্রেণীতেই পড়তুম। তিনিও আসতেন। যোগীন ও ব্রহ্মপদ উভয়েরি ঠাকুরের আশ্রয়ে অন্তরঙ্গদের মধ্যে হবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাঁদের আসতে যেতেই দেখতুম, সে কথা জানতুম না। ঠাকুর বোধহয় ব্রহ্মপদকে বাপ মার সম্মতি নিতে বলে থাকবেন। তাঁরা রাজী হতেন না। আমাদের দেশে কোন্ বাপ মাই বা ও প্রস্তাবে সম্মতি দেন?

একদিন হঠাৎ শুনলুম ব্রহ্মপদ আত্মহত্যা করেছে! গ্রামে হুলুস্থূল পড়ে গেল। পড়বারই কথা। পরমহংসদেব তাতে খুবই মর্ম্মাহত হন, দুঃখও করেন।

যোগীন্ চৌধুরীর পিতামাতা, গ্রামের প্রবীণদের পরামর্শে সত্বর ছেলের বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারে আবদ্ধ করবার জন্য ব্যস্ত হন। আরিয়াদহে একটী বয়স্কা ও সুন্দরী কন্যাও পাওয়া যায়। যোগীন বহু অনুনয় বিনয়ে মা বাপকে নিষেধ করে ও জানায় এমন কাজ করবেন না, আমি কোনদিন সংসার করবো না, বৃথা একটী নির্দ্দোষ মেয়ের জীবনটি নষ্ট করে তার সর্ব্বনাশ করবেন না। মহাপাপ মাথায় করবেন না। কেহ শুনলেন না, ধরে বেঁধে সে কাজ হয়ে যায়। যোগীনও বাড়ী ছেড়ে বোধ হয় সেই দিনই বরাহনগর মঠে চলে যায় ও সেই থানেই গিয়ে থাকে আর ফেরেনি। জমিদার বাড়ীর ছেলে, কোন অভাব তো ছিলই না, তদ্ভিন্ন পরমা সুন্দরীর সহিত বিবাহ, যৌবনকাল,—কিন্তু কোনটাই তাঁর সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারেনি। ঠাকুরের প্রতি প্রেমই জয়ী হয়। তাঁর কষ্টকর রোগের সেবা নিয়েই থাকতো।

ঠাকুর তাঁর কুমার সন্ন্যাসী ভক্তদের সকল ভার নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে দেহরক্ষা করেন। তখন শ্রীশ্রীসারদা দেবীর সকল ভার স্বয়ং যোগীন গ্রহণ করেন ও নিজের ভিক্ষালব্ধ সম্বলে তাঁর সেবাদি ও তীর্থদর্শনাদি কাজে নিযুক্ত থাকেন। কাশী অবস্থান কালে অসামান্য শ্রম বিধায় নিজে কঠিন উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াও মাকে লইয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বাগবাজারে থাকেন। চিকিৎসায় কোন ফল হয় না, শেষে দেহত্যাগ করেন।

যোগীন দেহত্যাগ করায় মা (শ্রীশ্রীসারদা দেবী) বালিকার মত কেঁদেছিলেন ও বলেছিলেন —"এই ভাঙন ধরলো।" পরে যোগীনের কাজ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে মায়ের দারোয়ান বলতেন। যোগীন দলের সকলেরি পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। স্বামীজী তাঁর কথায় কখনও 'না' বলতেন না, বরং বলতেন—"অতবড় ত্যাগী দেখি নাই। 'বিরল' বললে তাঁকে ছোট করা হয়।" থাক, কথাটা বড় বেড়ে যাচ্ছে। তা হোক্—যোগীন মহারাজের কথা দু'কথায় সারা উচিত নয়।

যখনই ঠাকুরের কাছে গিয়েছি—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা," বা "ভগবানকে আগে লাভ করে, পরে যাহা ইচ্ছা হয় করতে পারো"— এই দুটী কথাকে অবলম্বন করে, আর সব কথার অবতারণা করতেই শুনতুম। কি ছোট কি বড়র কাছে। বুঝতেনও সকলে। সিদ্ধ-যোগী ভিন্ন সে সব কথা সহজ করে বলা অন্যের সম্ভব ছিল না।

রসিক (রস্‌কে হাড়ি) দক্ষিণেশ্বর গ্রামেরই লোক (মেথর) ছিল। ঠাকুরকে তার সঙ্গেও হেসে কথা কইতে শুনেছি—তারই খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে। যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন—"থাক্ বুঝেছি' মদটা একটু কম করে খাস।" সে লুটিয়ে পড়ে বলতো—"কে দেবে ঠাকুর, ভাগ্যে নটবর পাজার মা মরেছিল! কাদের মা আর রোজ মরছে? আমি মলে মরবে," ইত্যাদি--

ঠাকুরের তখন সাধনার প্রথম অবস্থা, প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন, বৈকালে বাবুদের কুটীর ছাতে উঠে লোক ডাকতেন—"ওরে তোরা আয় না, আমি কার সঙ্গে কথা কবো!" শুনেছি—তার পূর্ব্বেই কেশব বাবুর সঙ্গে বেল-ঘরের বাগানে দেখা হয় ও দু'একটী কথা হয়। কেশব বাবুর সঙ্গীরা—পাগল বলেছিলেন,—কেশব বাবু অবাক বিস্ময়ে নিবিষ্ট চিত্তে শুনেছিলেন। তখন সেটা কেশব বাবুর যুগ, ভদ্রেরা ও কলেজের ছেলেরা তাঁর সমাজেই যেতেন, তাঁর কথাই শুনতেন ও তাঁকেই অসাধারণ ধর্ম্মপ্রচারক বলে শ্রদ্ধাসম্মান করতেন। তাঁর মত অসাধারণ বাগ্মীও তখন কেউ ছিলেন না। শিক্ষিতদের চিত্ত তাঁর কাছেই বদ্ধ ছিল।

কিছুদিন পরে আমি স্বয়ং কেশব বাবুকেই ঠাকুরের খাটের নীচে, পা পেছন দিকে করে নিবিষ্ট চিত্তে বসে তাঁর কথা শুনতে দেখেছি। তাঁর সামনে কেশব বাবুকে একটী কথাও কইতে শুনি নি।

কলিকাতা হতে কলেজের উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা দল বেঁধে আসতেন, কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতেন। সে সব বিষয় তাঁদের জানবার ইচ্ছা থাকতে পারে; ভাবে কিন্তু বোধ হত--তিনি যাতে না উত্তর দিতে পারেন—ছেলে বয়সের স্বভাব! যেমন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত সম্বন্ধে শুনতে চাইতেন। ঠাকুর হাসতেন, বলতেন —ওসব সূক্ষ্ম ভেদ পরিষ্কার হয় আধ্যাত্মিক অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে। কতদূর এগিয়েছ? তাঁরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতেন, বলতেন— আমরা শুনতে এসেছি। তখন বলতেন—

শুনতে ওদের আলাদা আলাদা লাগে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ওরা পরস্পরবিরোধী নয়। যে বুঝতে চায়—বোঝাটা তার আধ্যাত্মিক অবস্থাসাপেক্ষ। শাস্ত্রে ঐ তিনটিকে বড় জটিল করে রেখেছে, না? সে কথার ওপর কাকেও আর কথা কইতে শুনতুম না। সে সব আমি নিজেও বুঝি নি, তাই সে সম্বন্ধে লেখবার আমার অধিকারও নেই। শ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দ তাঁর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে" লিখেছেন (সংক্ষেপে ঠাকুরের কথাই বলেছেন)—অদ্বৈত ভাব শেষ কথা, উহা বাক্য-মনাতীত, উপলব্ধির বিষয়। মন-বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্য্যন্ত বলা ও বোঝা যায়। সাধারণ বিষয়ী মানবের পক্ষে উচ্চ নাম-সংকীর্ত্তনাদিই ভালো। যাক্—আমার উদ্দেশ্য কেবল দেখানো, ওইরূপ সব যাঁরা আসতেন, শুনে প্রণাম করে চলে যেতেন। তাঁদেরো অনেকেরই যাতায়াত কেশব বাবুর সমাজেই ছিল। উচ্চশিক্ষিত চরিত্রবান্ যুবকদের অমন অনুকূল স্থানও তখন বেশী ছিল না।

তাই এখন ভাবি—দেশে এত লোক থাকতে পরমহংসদেব আর কোথাও না গিয়ে, দূরে বড় রাস্তার ধারে এক বাগানে, কেশব বাবুকেই পান কি করে? দু'চার কথা বা আলাপ তাঁর সঙ্গেই বা হয় কেন? সকলেই ঠাকুরকে পাগল বলেই জানতো। উপস্থিত হয়ে কথা কইলেন যাঁর সঙ্গে—তিনিই কেশব বাবু; কেশব বাবু জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বিদ্যায়, বাগ্মিতায় দেশমান্য ছিলেন। এক আশ্চর্য্য যোগাযোগ। কেশব বাবু তখনকার ভদ্র সন্তানদের প্রিয় ও মাননীয় ছিলেন এবং তাঁর সমাজে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু যুবকেরা যেতেন। তাঁরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে শোনবার ও জানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কেশব বাবুর কাছে নানা সভ্য দেশের ধর্ম্মকথা, আমাদের দেশের ধর্ম্মের মর্ম্মকথা শুনতে পেয়ে, আরো শোনবার জন্যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকতো। ঠাকুরের কাছে ধর্ম্মের শেষ কথাটি শোনবার জন্যে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। ঠাকুরই ছিলেন ধর্ম্মের Custodian. এই ভাবে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কেশব বাবুর সঙ্গে দেখা-শোনার পর, কেশব বাবু তাঁর Sunday Mirror পত্রিকায়, ঠাকুর সম্বন্ধে "দক্ষিণেশ্বরের যোগী" নামে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাতেই তাঁর প্রথম প্রচার। তার পর লোক-সমাগম আরম্ভ হয়। আমাদেরও জানা তাই থেকেই।

অনুসন্ধিৎসুদের কথা কিছু বলেছি, কিন্তু কলকাতা ও পারিপার্শ্বিকের বড়লোকদের গাড়ি জুড়ি দেখা দেয় তারপর থেকেই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে শুনতে ও জানতে আগ্রহ যে তাঁরা কতটা নিয়ে আসতেন তা তাঁরাই জানেন। আসতেনও অনেকে, বসেও থাকতেন অনেকক্ষণ, "অমুককে অমুক সাধু তিন লাখ টাকা পাইয়ে দেন, সে তাঁকে এক ছিলিম তামাক খাইয়েছিল বলে"—এই সব কথাই সুবিধামত তাঁদের নিজেদের মধ্যে হোত। সেটা আমাদের ও অন্যান্য সকলের বড় বিরক্তিকর লাগতো। ঠাকুর তখন উঠে দক্ষিণের বারান্দায় যেতেন। কখনো মায়ের মন্দিরেও যেতেন।

কলকাতা ছিল তখন ভারতের রাজধানী। শুনেছি রাজধানী-জয় হলেই দেশ-জয় সাব্যস্ত হয়—এও যেন তাই। দেশ তখন ইংরাজের কবলে বা গ্রাসে, ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ইংরাজিতে কথা কয়, ইংরাজিতে পত্রাদি লেখে। ইংরাজের মত পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়াতে, চলতে, বলতে শেখে। এক কথায় ইংরাজ বনতে চায়। আচারে বিচারে হয়েও আসছিল তাই,—নিজেদের সবই মন্দ হয়ে পড়ছিল। হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা লোপ পেতে বসেছিল।

মেকলে সাহেব যখন আমাদের ইংরাজি

শিক্ষা মঞ্জুর করে' দেন, তখন তা আমরা সানন্দে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলুম ও অল্প সময়েই তাতে উন্নতি দেখিয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠাও পেয়েছিলুম। বাঙালীর মেধা তাকে আপন করে নিচ্ছিলো। সেই সময় একজন বিশিষ্ট ইংরাজ (নাম মনে আসছে না) বলেছিলেন, "মেকলের মতো পলিটিসন্ ভারতে আসেনি। এই যা তিনি করলেন, এর পর যদি আমাদের কখনো এ দেশ ছেড়ে যেতে হয়, তখন ভারতে কেবল 'কালা-ইংরাজই' থাকবে, আমাদের কাজের ব্যবসা-বাণিজ্যাদির বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। তাদের ধাত আমাদেরি অনুকূল বা পৃষ্ঠ-পোষকই থাকবে।"

বোধহয় এখন হলও' তাই। যাক্ সে ভবিষ্যতের কথা। এই অবস্থার প্রতিকারার্থেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব। নচেৎ সে স্রোতে হিন্দুধর্ম্ম ভেসে যেতে বসেছিল। তাঁর যুক্তিসম্মত অক্ষয় অমৃতবাণী উচ্চ শিক্ষিতদের সত্যের সন্ধান দিয়ে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে বা আপন করে নিতে থাকে।

আশ্চর্য্য এই, এতবার দেখেও তাঁকে অসাধারণ মানুষ বলে' মনে হ'ত না। সেই লালপেড়ে একখানি আটহাতি ধুতি পরা সাধারণ মানুষ বলেই দেখতুম। যেন আমাদেরি একজন, খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। গিরীশ বাবু (ঘোষ) তখন তাঁকে অবতার বলেছেন, নরেন্দ্রনাথ সে কথায় কান দেননি। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বসে আছেন,—কথা কন্নি। পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন—"তোর কি মনে হয়?" শুনেছি তাতে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—আমি শিব বলেই জানি ও দেখি। তাতে ঠাকুর বলেন—অবতার ছোট কথা রে-এবার (নিজের বুকে হাত দিয়ে) স্বয়ং আসতে হয়েছে যে! সমন্বয়ের কথা, নিজে সব ঘাট না দেখে বলা চলে না। বড় খাটুনি ছিল। সব মতই পথ, ছোট বড় নেই ইত্যাদি। এ সব কথা আমার তাঁর মুখ থেকে শোনা নয়, বোধ হয় পরে মাষ্টার মশাই বলে থাকবেন। স্বামীজীর কাছে শোনবার বা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হোত না।

আজ ষাট পঁয়ষট্টি বছরের কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কত অবান্তর এসে যেতে পারে, কত ভুলচুক করে ফেলছি। তাঁদের ভাষা তো থাকবার কথা নয়ই, ভাবটা থাকলেই বাঁচি। যাক্—তখন সময়টা আমার ভাল যাচ্ছিল না। সাংসারিক সুখ একেবারেই ছিল না। অভাব আর অভাব। কিছুতেই কুলোয় না। বেশ মনে আছে—ঠাকুরের কাছে অনটন বা অভাবের কথা কোন দিন মাথায় বা মনে উদয় পর্য্যন্ত হয়নি। তাঁর কৃপা ভিন্ন তা সম্ভবই ছিল না। তাঁর কথা শুনতেই যেতুম, শুনে আসতুম।

ঐ কি আড়াই বছরের মধ্যে যে কয়দিন তাঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, একদিনও তাঁকে একলা পাইনি। সাংসারিক মনঃকষ্ট তো যাচ্ছিলই, একদিন আপিসে যাব বলে' বেরিয়ে ওপারে (বালীর পারে) পৌঁছে আর আপিসে গেলুম না, ইচ্ছা হ'ল না। গিয়ে কি ফল? তার চেয়ে ঠাকুরের কাছে যাই। কলকাতার ফিরতি পানসি ডেকে পূর্ব্বপারে রাণী রাসমণির ঘাটে গিয়ে নাবলুম। দেখতে পেলুম ঠাকুর তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছেন। নিকটে উপস্থিত হতেই—কিরে—আপিস পালালি! ওটা ভাল নয়। তোরা কুমীরের মতো, জলের মধ্যে বা সংসারে হাঁপিয়ে উঠলে—শ্বাস নেবার তরে জলের ওপর নাক বাড়িয়ে কিছুক্ষণ থাকিস, আবার সে কথা ভুলে গিয়ে ডুব মারিস—বেশীক্ষণ থাকতে পারিস না। দুঃখকষ্ট না থাকলে

কি কেউ এদিক মাড়াতো! দুঃখকষ্ট বড় দরকারি জিনিষ রে। সেই তো মানুষকে সৎপথ খোঁজায়। ভাগ্যবান পথ দেখতে পায়—ইত্যাদি।

পরে বলেন—"বিবাহ করেছিস, মা আছেন না?" "আজ্ঞে, হ্যাঁ, আছেন।" একটু চুপ করে রইলেন, যেন কি ভাবলেন। শেষে বললেন—"যা এখন সংসার কর, একটু দুঃখকষ্ট থাকা ভালো, এগিয়ে দেয়। দুঃখ না থাকলে কেউ ভুলেও ভগবানের নাম নিত না।" এই ভাবের কথা মাঝে মাঝে এক একটি বলছিলেন। হঠাৎ আমার মনে হ'ল তিনি কষ্টবোধ যেন করছেন। সত্যিই তো, তখন তাঁর রোগ বাড়ছে। না, আর নয়, বললুম—"আপনি একটু বিশ্রাম করুন, এই তো আহারের পর উঠেছেন, আমি বুঝিনি, জ্বালাতন করছি।"

"কষ্ট তো আছেই, কিছু জানবার থাকে তো বল্।" হাসতে হাসতে বললুম—"আমাদের তো সবই জানবার, জানলুম আর কি?"—"কেনো, ভগবানকে জানবি, চেষ্টা থাকলেই পাবি। তিনি যখন রয়েছেন, পাবিনি কেনো। ইচ্ছা প্রবল হলেই পাবি। সে ইচ্ছা আনা চাই!"—"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।" "ও সব আশীর্ব্বাদের বস্তু নয়, নিজের কাজ,—আকাঙ্ক্ষা বাড়া। বাড়ী যা।"

জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে তিনি তখনো বলতে প্রস্তুত। কি জিজ্ঞাসা করবো—তাই জানি না। তাঁকে ঘরে দিয়ে বাড়ী ফিরলুম।

ভগবান সম্বন্ধে আমাদের চেতনা জাগাতেই তিনি এসেছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পেলে, তাকে কিছু বলতে সদাই প্রস্তুত। রোগ্ টোগ্ তাঁর মনেও থাকতো না। ওতো শরীরের ধর্ম্ম, তার কাজ সে যা করছে করুক না—এই ভাব ছিল। তিনি যা করতে এসেছিলেন তাই করতেন। শুনেছি, শেষ সময়ের কথা। কয়েকটী জিজ্ঞাসু—তাঁর রোগের কথা জানতেন না, এসে পড়েছিলেন। কয়েকটী ভক্ত যাঁরা পরিচর্য্যায় ছিলেন তাঁদের উপর ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ ছিল—কাকেও ঘরে ঢুকতে বা কথা কইতে না দেওয়া। তাঁরা আগন্তুকদের ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। শুনতে পেয়ে তিনি ভক্তদের ডেকে বলেন—"এমন কাজ করো না, আসতে দাও, কতদূর থেকে এসে থাকবে, দুটো ভগবানের নাম (কথা) শুনতে। আমি আর এখন কোন্ কাজ করবো, যা পারি দু'য়েক কথা বলবো. তাতে কারো ক্ষতি হবে না। আসতে দাও, ক্ষুণ্ণ কোর না।"

কত ভাগ্যে এই দেবতাকে পেয়েছিলুম। মনে হচ্ছে আর প্রাণ হু হু করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে চাচ্ছে। এইখানেই থাক্। এ সব কথা শেষ হয়না, শেষ করবার নয়। কখনো যেন শেষ না হয়।

"বিদেহের" কথা একবার অনেকটা বিস্তারিত ভাবেই লিখেছি, আর পুনরুক্তির আবশ্যক দেখি না। সে সব "উদ্বোধনের" ৬ষ্ঠ সংখ্যা—আষাঢ়, ১৩৪৫এ আছে।

মনের সে অবস্থায়. একপ্রকার অসম্বিতেই মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—"তিনি যদি আজ থাক্‌তেন।" ঠাকুর থাকতে পারেন নি,—সঙ্গ নিয়েছিলেন ও দেখিয়ে দিয়েছিলেন বা জানিয়ে দিয়েছিলেন—"আমি আছি. আছি—আছি!" তাঁর সে দয়া লিখে প্রকাশের নয়,—তার ভাষা নাই, অন্ততঃ আমার কাছে।

মহাপ্রয়াণে

শ্রীসাহাজী

আরে উন্মাদ, আরে জল্লাদ, একী করিলি রে কাজ?
অজাতশত্রু বিশ্ববন্ধুরে হত্যা করিলি আজ!
হত্যা করিলি, সত্য ও প্রেমের মূর্তপ্রকাশ যিনি,
হত্যা করিলি, জাতির মুক্তি আনিল যেজন জিনি।
বিশ্বের আলো নিবায়ে দিলি রে, আঁধার ভারতভূমি,
বিশ্বের ভালো হরিয়া নিলিরে কীসের মোহেতে, শুনি?
নব ভারতের নব ইতিহাস আধাপথে যায় থামি,
বিজয়-নিশান না উড়িতেই আধাপথে যায় নামি।
জয়রথ তার যাত্রাপথের আজিও পায় নি দিশা,
এরি মাঝে হায়! ডাকিয়া আনিলি অমাবস্যারি নিশা!
হায়! আপ্‌শোষ্ বোধনেই আজি দিলিরে বিসর্জন,
সত্য, প্রেম আর আনন্দের সে বিজয়-নিকেতন!
আজ পিতামহ ভীষ্মের পতন শিখণ্ডীর শরাঘাতে,
ধর্ম-মীমাংসা কে আর করিবে কৌরবের সে সভাতে?
সত্য ও প্রেমের মূর্তপ্রতীক, তাঁহারে করিলি বধ,
হায়! জল্লাদ, বিধির কলম তুই কি করিলি রদ?

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ভারত বিচিত্র, তার শিল্পও বিচিত্র। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ও নানা কারুশিল্প বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু একটি চিরন্তন ভারতীয় রূপ এই বিভিন্ন রূপের ভিতর অপরিবর্ত্তিত। ভারতীয় সংস্কৃতি কখনো তার স্বকীয় রূপ হারাইয়া ফেলে নাই। বিভিন্ন কালে ভারত বিদেশীর সংস্রবে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের পরিপাক-শক্তি বাহিরের শক্তিকে আপন করিয়া লইয়াছে। আসিরিয়, পারসিক, গ্রীক, রোমক শিল্প ভারতে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তাহা স্থায়ী রূপ লাভ করিতে পারে নাই; তাহা স্বকীয় রূপ হারাইয়া ভারত-দেহে বিলীন হইয়াছে। ইহা যে শুধু শিল্প-সৃষ্টিতেই সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে, ইতিহাসও তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক-হুনদল পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

* * * *

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি' উন্মাদ কলরবে—
ভেদি মরুপথ গিরি-পর্ব্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিত তা'র বিচিত্র সুর।"

প্রাক্-বৈদিক যুগ

ভারতীয় সুমেরিয় সভ্যতা (খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ২০০০)

ভারতীয় সভ্যতা ও শিল্পের ইতিহাস বিরাট; তাহা ৫০০০ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া। বৈদিক যুগ হইতে হিন্দু সভ্যতা আরম্ভ হইলেও তাহার পূর্ব্বে ভারতে উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা তাম্রযুগের সভ্যতা। পাঞ্জাবের হারাপ্পা নামক স্থানে এবং সিন্ধুতে মহেঞ্জোদারোতে তাম্রযুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

মেসোপোটেমিয়ার সুমেরিয় সভ্যতার (খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ২০০০) সঙ্গে ইহার যোগাযোগ ছিল। সুসা এবং কিশে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সঙ্গে ভারতীয় নিদর্শনের সাদৃশ্য আছে। বাবিলন-এর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল, বাবিলনকে বেদে বাবিরুশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জাতকে বাভেরু বলিয়া উল্লেখ আছে। বাবিলন সে যুগের নিউইয়র্ক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাবিলনের বাণিজ্য ছিল।

মেসোপোটেমিয়ার কীলকাক্ষরে যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (খৃঃ পূঃ ১৫০০) তাহাতে কয়েকজন বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া গিয়াছে —ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য্য, মরুৎ। মেসোপোটেমিয়ায় এই সকল দেবতার পূজার প্রচলন ছিল।

ভূমধ্য সাগর হইতে ভারতের গঙ্গা পর্য্যন্ত তাম্রযুগের সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। সকল দেশেই ঐক্য দেখা যায় ম্যাট্রিয়ার্কি বা মাতৃপ্রাধান্যে ও মাদারগডেস বা ভূমিদেবীর পূজায়। সকল দেশেই ভূমিদেবীর নগ্নমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, সিন্ধু উপত্যকা হইতেই বাবিলন, আসিরিয় ও পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার গোড়াপত্তন হইয়াছে।

হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখা যায়। পাথর, ব্রোঞ্জ, ও টেরা-কোটার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; চুণপাথরের নির্ম্মিত দাড়িওয়ালা এক মানুষের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই মূর্ত্তিতে "যোগের" লক্ষণ পাওয়া যায়, মূর্ত্তির নাসাগ্রদৃষ্টি নাকের ডগার দিকে তাকাইয়া আছে। ব্রোঞ্জের রমণীমূর্ত্তি, টেরা-কোটার ষাঁড়, গণ্ডার ও মনুষ্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু উপত্যকায় গণ্ডার লুপ্ত হইয়াছে। ষাঁড়ের মূর্ত্তি নির্ম্মাণে শিল্পী খুব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। হাতীর দাঁতের কাজ পাওয়া গিয়াছে। শঙ্খ, সোনা, রূপা ও লালমণির (carnelian) অলঙ্কার হইত। মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানব, জন্তু, উদ্ভিদের চিত্রওয়ালা টেরাকোটার শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। টেরাকোটার শীলমোহর সিন্ধু-সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। চিত্রিত মাটীর পাত্র পাওয়া গিয়াছে। লোহার ব্যবহার জানা ছিল না, ঘোড়া অজ্ঞাত।

মহেন-জো-দারো শব্দের অর্থ mound of the dead অর্থাৎ মৃতের ঢিবি। এখানে দুটি ঢিবি আবিষ্কৃত হইয়াছে; বড়টি ১৩০০ গজ লম্বা, ৬৭০ গজ চওড়া; ছোটটি ৪৪০ গজ লম্বা, ৩৩০ গজ চওড়া। এশিয়া মাইনরের প্রাচীন ট্রয় নগরের যেমন ৯টি স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখানে তেমন ৭টি স্তরে নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মহেন-জো-দারোর প্রশস্ত রাস্তা, দ্বিতল অট্টালিকা, স্নানাগার, ঢাকা নর্দ্দমা হইতে মনে হয়, এখানে উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক জীবন ছিল। তাহাদের অক্ষর পরিচয় ছিল।

হারাপ্পার নিদর্শন কম; এখান হইতে ইট লইয়া গিয়া অন্যেরা ব্যবহার করিয়াছে।

সে সময়ে দেহ দাহ করা হইত; মৃৎপাত্রে অস্থি পাওয়া গিয়াছে।

ডাঃ ক্রেমরিশ মনে করেন, সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহার শিল্প লুপ্ত হয় নাই; অন্তর্বর্ত্তী জলধারার ন্যায় ইহা বর্ত্তমান ছিল। দেড়হাজার বৎসর পরেও ইহার ধারা দেখা যায়। মৌর্য্য ভাস্কর্য্যের (যক্ষ, যক্ষিণী) সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ দেখা যায়। মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে যেমন, নটরাজ ও নেপাল তিব্বতের মূর্ত্তির "প্রভামণ্ডল" দেখা যায়, তাহা মহেঞ্জোদারোর শীল মোহরে অঙ্কিত পত্রদ্বারা সজ্জিত এক তোরণ হইতে আসিয়াছে।

দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে সুমেরিয় সভ্যতার সংযোগ ছিল। তাহাদের ভিতর ম্যাট্রিয়ার্কি, ভূমিদেবীর পূজা ও নাগপূজা দেখা যায়।

বর্ত্তমানে বেলুচিস্থানে ব্রাহুই নামে একটি ভাষা প্রচলিত আছে; এই ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার সম্বন্ধ আছে; মনে হয়, পারস্য হইতে দ্রাবিড়েরা বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে; তাহাদেরই এক অংশ বেলুচি-স্থানে রহিয়া গিয়াছে।

পারস্যের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী প্রাচীন তুরাণী জাতির এক শাখা দ্রাবিড় জাতি। ইহারা জলপথে অথবা স্থলপথে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে বসবাস করিতেছে। এই তুরাণী জাতির সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার সুমেরু জাতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, সিন্ধু ও নর্ম্মদার মধ্যে দ্রাবিড় জাতির কোনো চিহ্ন নাই। দ্রাবিড়েরা আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতা হইতে একেবারে বিচ্যুত হয় নাই; এখনো তাহাদের মধ্যে অনেক দ্রাবিড়ি বৈশিষ্ট্য টিকিয়া আছে। দক্ষিণের মারিয়াম্মা কালিয়াম্মা, হুলিয়াম্মা, ঘণ্টালাম্মা, মামিলাম্মা প্রভৃতি দেবী প্রাচীন তাম্রযুগের মাদারগডেস বা ভূমিদেবীর সংস্করণ। মির্জ্জাপুরের কোরোয়া নামে অনার্য্য জাতি ধর্ত্তিমাতার

(ধরিত্রীমাতা) পূজা করিয়া থাকে, ইনি দক্ষিণের আম্মাদেবীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত।

আর্য্য ও দ্রাবিড়

ভারতে আর্য্যগণ আগমন করিলে, দ্রাবিড়-দের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিয়াছে। বেদে দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, তাহারা অনাস ও পুরে অর্থাৎ নগরে বাস করে; তাহাদের দাস ও দস্যু বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্রাবিড় জাতির মধ্যে লিঙ্গপূজা (Phallic Worship) প্রচলিত ছিল; বেদে শিশ্নপূজার নিন্দা আছে। আর্য্যেরা মূর্ত্তিপূজা দ্রাবিড়দের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; বেদে শুধু যজ্ঞের বিধি আছে। স্থাপত্যও তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছেন। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়দের জয় করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রাবিড় ও বৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি। আর্য্যশিল্প সিম্বলিক্যাল বা সাঙ্কেতিক, আলঙ্কারিক ও অ্যাবষ্ট্রাকট; দ্রাবিড়শিল্প সাদৃশ্যাত্মক (Representational).

"মধ্য এশিয়ায় যাযাবর শিল্পে" (Nomadic art) আর্য্যশিল্পের উৎপত্তি পাওয়া যাইবে। কার্পেট, পর্দ্দার পরিকল্পনায় এই যাযাবর শিল্পের অভিব্যক্তি, ইহা রৈখিক এবং এ্যাবষ্ট্রাক্ট (Linear and abstract); জ্যামিতিক পরি-কল্পনা ইহার মধ্যে দেখা যায়। আরবের যাযাবর জাতির শিল্পের মধ্যেও এরকম জ্যামিতিক পরিকল্পনা দেখা যায়। আরবদের পরিকল্পনা হইতে আরাবাস্ক (Arabasque) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্যভারতের ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে রৈখিক গতি (Linear movement) দেখা যায়। বারাণসীর ধামেক স্তূপে ও অজন্তায় শুদ্ধ জ্যামিতিক পরিকল্পনা আছে। দক্ষিণের অন্ধ্র ভাস্কর্য্যে (অমরাবতী, সাঞ্চি) দ্রাবিড়ের সাদৃশ্যাত্মক আদর্শ (Representational) পাওয়া যাইবে। এখানে রেখার গতি প্রধান নহে, রিলিফের অবয়ব (Volume) প্রস্তর-ফলক হইতে আগাইয়া আসিয়া, আলো-ছায়ায় সাদৃশ্যাত্মক আদর্শের পরিচয় দিতেছে।

একজন পণ্ডিত (Strzygowski) মনে করেন, আর্য্যশিল্পের মূলতত্ত্ব ইন্দো-ইরানিয়ান সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যাইবে। আবেস্তার উক্তি, "হবরেন (ভারতীয় বরুণ অথবা হিরণ্যগর্ভ) অহুরমজদার শক্তিঝরণা হইতে জল উৎপত্তি করে, মাটী হইতে ওষধি উদ্ভিন্ন করে, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকার যাত্রাপথ নিয়মিত করে।" এই তত্ত্বে একপ্রকার স্থানচিত্রের অবতারণা আছে। ইহাতে ব্যঞ্জনা আছে, ইহা আলঙ্কারিক, সাদৃশ্যাত্মক নহে। এই জরথুস্ত্র তত্ত্ব হইতে ম্যুরালপেন্টিং এর উৎপত্তি মনে করা হয়। পরবর্ত্তী যুগে, এই তত্ত্ব বারহুত অজন্তার স্থানচিত্রকে নিয়মিত করিয়াছে।

গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তিতে, এলিফেন্টার ত্রিমূর্ত্তির মূর্ত্তিতে, দক্ষিণের নটরাজের মূর্ত্তিতে আধ্যাত্মিকতা ও সাদৃশ্যাত্মকতা দুইই দেখি। মূর্ত্তি সার্থক হইয়াছে পরিকল্পনায়। ভক্তের কাছে ইহা প্রতীক, অথচ ইহা সাদৃশ্যাত্মক। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের আত্মার সম্মিলনে ভারতীয় শিল্পের চরম উৎকর্ষ হইয়াছে।

বৈদিক যুগ

ভারতীয় আর্য্যেরা খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১৫০০ এর ভিতরে আফগানিস্থান এবং হিন্দুকুশের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। প্রথম সিন্ধুতীরে, পরে গঙ্গাতীরে বিন্ধ্য,

নর্ম্মদা এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমশঃ দক্ষিণেও তাহাদের অভিযান হয়। প্রাচীন বৈদিক যুগে কাঠের কাজ জানা ছিল; কাঠের রথ, ধাতুর পাত্র (সম্ভবতঃ তামার), সোনার অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। তাঁতের প্রচলন ছিল, মাটীর পাত্রের, চামড়ার ব্যবহার (Tanning) ছিল। মূর্ত্তির নিদর্শন নাই।

আর্য্যদের পরিচ্ছদ ছিল তিনখানা বস্ত্র, নীবি (কটিবাস), পরিধান (পরিধেয় বস্ত্র), অধিবাস (উত্তরীয়); পশমের পোষাক হইত। এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের মৌর্য্য ও বারহুতের যক্ষ-যক্ষিণী মূর্ত্তির তুলনা করা চলে। সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে পুরুষ স্ত্রীর একই পরিচ্ছদ ছিল, মৌর্য্য ও বারহুত মূর্ত্তিতে যেমন দেখি। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে একমাত্র সিংহলে পুরুষ ও নারীর একই পোষাক।

শিশুনাগ—নন্দবংশ (খৃঃ পূঃ ৬৪২—৩২০)

মগধরাজ শিশুনাগ ও নন্দবংশ হইতে ভারতের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ। শিশুনাগ বংশের বিম্বিসার নূতন রাজগৃহ স্থাপন করেন, পুত্র অজাতশত্রু পাটলীপুত্র স্থাপন করেন। ইঁহারা মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট ডেরায়স সিন্ধু প্রদেশের কতক অংশ জয় করিয়াছিলেন। এ যুগের শিল্প বেদ ও জাতক আখ্যান হইতে জানা যায়। এ যুগের নিদর্শন— টিন, সীসক, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, কয়েক তলা যুক্ত গৃহ; বাটী, থালা, সোনা-রূপার চামচ, লোহার ছুরি, ছুঁচ, দর্পণ, সিংহাসন, খাট, বসবার আসন, পাগড়ি, মুকুট, অলঙ্কার, রত্ন, কার্পাস, রেশম, পশম, সঙ্গীতের যন্ত্র, যাঁতার উল্লেখ আছে।

জাতকে ১৮ প্রকার কারুশিল্পের উল্লেখ আছে। সূত্রধর (carpenter), চিত্রকর, ধাতুর কর্ম্মকার (smith), চর্ম্মকার প্রভৃতি ১৮ প্রকার কারুর নামে পরিচিত। ইহাদের লইয়া শ্রেণী বা কারু-গোষ্ঠী (Craftsmen's guild) সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রাক্-মৌর্য্য শিল্প—পুরাতন রাজগৃহের প্রাচীর; এখানে মহাভারতের জরাসন্ধের রাজধানী ছিল বলা হয়। এই প্রাচীরকে ইংরাজীতে বলা হয় সাইক্লোপিওন ওয়াল। প্রাচীন গ্রীসেও এই ধরণের প্রাচীর দেখা যায়, তাহারও এই নাম; দৈত্য এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই বিশ্বাস।

লৌরিয়া ও নন্দগড় নামক স্থানে বৈদিকস্তূপ (সমাধিস্থান) আবিষ্কৃত হইয়াছে; সোনার প্লাকে নগ্ন ভূমিদেবীর (মাদার গডেস) মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এসব খৃঃ পূঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীর নিদর্শন।

৮ম শতাব্দীতে ভারতের প্রাচীনতম অক্ষর ব্রাহ্মী অক্ষরের পরিচয় ছিল।

মৌর্য্যযুগ (খৃঃ পূঃ ৩২০—১৮৫)

আলেকজেণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে; তাঁর মৃত্যু হয় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২৩ অব্দে। মৌর্য্যবংশের স্থাপয়িতা চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২০ অব্দে নন্দবংশের শেষ নৃপতিকে পরাভূত করিয়া মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অধিপতি হন। তাঁর পৌত্র বিখ্যাত অশোক খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ২৭২ হইতে খৃঃ পূঃ ২৩২ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও ইহাকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মে পরিণত করেন। তিনি ধর্ম্ম প্রচারকদের নানা স্থানে সিংহলে, পশ্চিমে সিরিয়া ও মিশরে প্রেরণ করেন। স্তম্ভ (লাট, মোনোলিথিক পিলার) ও পর্ব্বতগাত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসন লিখিয়া দেন, তাহা সকলেরই জানা আছে। কথিত আছে তিনি ৮০,০০০ স্তূপ ও অসংখ্য বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পাটলীপুত্র খনন করিয়া অশোকের রাজপ্রাসাদের স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশাল স্থান জুড়িয়া জমকালো প্রাসাদ ছিল।

গ্রীক ও রোমান লেখকদের বর্ণনা হইতে ইহার কথা জানা যায়। সুসা এবং একবাটানার প্রাসাদকেও হার মানায়, মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন। ৫ম শতাব্দীতে অশোকের প্রাসাদ ছিল ফা হিয়ান ইহা দেখিয়াছেন; তিনি ইহা দৈত্যের তৈয়ারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে যখন হুয়েনশাঙ আসিয়াছিলেন, তখন ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিল। বর্ত্তমানে পাথরের স্তম্ভযুক্ত বিরাট হলের ভিত্তি খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে; ইহা পারসিপোলিসের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পাটলীপুত্র বিরাট নগর ছিল; নয় মাইল দীর্ঘ, ও দুই মাইল প্রশস্ত। প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত ছিল; ৫৭০টি স্তম্ভ ও ৬৪টি তোরণ নগর প্রাচীরে ছিল।

১৮৪ খৃষ্টাব্দে মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সুঙ্গ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। অশোকের মৃত্যুর পরই মৌর্য্য সাম্রাজ্য দুর্ব্বল ও পতনোন্মুখ; দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্ররা তখন মাথা তুলিতেছিল।

অশোকের রাজত্ব আফগানিস্থান ও কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত ছিল; দক্ষিণের সীমা দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত, সুদূর দক্ষিণ শুধু রাজত্বের বাহিরে ছিল।

এ যুগের ভারতীয় সভ্যতার বিবরণ গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ভারতভ্রমণ হইতে জানা যায়। ভারতে সাতশ্রেণীর লোকের বাস ছিল বলিয়া তাহার বিবরণ আছে। দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ), কৃষক, পশুপালক, শিকারী, শিল্পী, ব্যবসায়ী, পর্য্যবেক্ষক ও অমাত্য এই সাতশ্রেণী। জাতক এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রামে কারুশিল্পীরা বিভিন্ন "শ্রেণীতে" বিভক্ত ছিল। চিত্রকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি নিজেদের কৌলিক ব্যবসা চালাইত। উচ্চশ্রেণীর কারিগরেরা "কাম্মার" (কর্ম্মকার) নামে পরিচিত ছিল। উচ্চশ্রেণীর গৃহসকল কাঠের নির্ম্মিত হইত, বাড়ীতে একাধিক তলা ও ব্যালকনি ছিল। নগরের চারিদিকে পোড়া ইট বা কাঁচা ইটের দেওয়াল ছিল। অশোকের সময় হইতে পাথরের ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেই সময়কার বৈশিষ্ট্য পাথরের পালিশ বা মসৃণতা, স্তম্ভগুলিতে উচ্চশ্রেণীর মসৃণতা।

মৌর্য্যযুগের কয়েকটি বিখ্যাত নগর তক্ষশীলা, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, বিদিশা, পাটলীপুত্র।

মৌর্য্যযুগের ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত যক্ষিণীমূর্ত্তি, বেসনগরে (প্রাচীন বিদিসা) প্রাপ্ত, উচ্চতা ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি (খৃঃ পূঃ ৩য়-৪র্থ শতকে) ও মথুরা যাদুঘরে রক্ষিত যক্ষের মূর্ত্তি পারখামে প্রাপ্ত, উচ্চতা ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি (খৃঃ পূঃ ৩য়-৪র্থ শতকে)। দুটি মূর্ত্তিই সোজা দাঁড়াইয়া, সম্মুখের দিকে তাকাইয়া, ইহা Frontality বা সম্মুখবর্ত্তিতার পরিচায়ক। মূর্ত্তি দুটি স্বাভাবিক; নগ্ন চক্ষে যাহা দেখা যায় তাহাই। যক্ষের স্ফীতোদর। যক্ষ যক্ষিণী দুইই ধুতিপরা, সামনে কোঁচা আছে। কোমরবন্ধনী আছে, যক্ষের বুকের নীচে কোমরবন্ধনীর ন্যায় একটি বাঁধ আছে, উত্তরীয় নাই। কোমর ও বুকের বন্ধনী দুইই চাঁদর বা উত্তরীয়কে ভাঁজ করিয়া দড়ির মত করা হইয়াছে। দড়ির ফাঁস বুক হইতে ঝুলিতেছে। পরবর্ত্তী মথুরাযুগে ও গুপ্ত-ভাস্কর্য্যেও কোমরে পাকানো চাদরের কোমরবন্ধনী দেখা যায়। একদিকে দীর্ঘফাঁস ঝোলান, খুবই সৌখীন মনে হয়। মৌর্য্যযুগের মূর্ত্তির বস্ত্র শরীর হইতে পৃথক্, মথুরা ও গুপ্তযুগে শরীরের সঙ্গে লাগিয়া আছে, কোনো সময় একেবারে স্বচ্ছ। মৌর্য্য মূর্ত্তিতে গলায় প্রচুর গহনা আছে।

পরবর্ত্তী যুগে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছে, তাহা ভাবোদ্দীপক, শুধু নগ্নচক্ষে দেখার জিনিষ নহে। মৌর্য্য মূর্ত্তি দুটি মনুমেণ্টাল, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপূর্ণ, শক্তিশালী।

দিনারগঞ্জে প্রাপ্ত চামরধারিণীর মূর্ত্তি (পাটনা যাদুঘরে) মসৃণ, চূনার বেলে পাথরে তৈয়ারী, মৌর্য্য অথবা সুঙ্গ যুগ, মনুমেণ্টাল উচ্চতা ১২ ফুট। উল্লিখিত ২টি মূর্ত্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে।

মৌর্য্য-মূর্ত্তি মহেঞ্জোদারোর ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

বেসনগরে প্রাপ্ত কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত কল্পবৃক্ষ উল্লেখযোগ্য, উচ্চতা ৫´—৮´´। বোধি-বৃক্ষ (অশ্বত্থবৃক্ষ) কল্পবৃক্ষরূপে পরিকল্পিত, ইহা প্রাচুর্য্য দান করে। নীচে রেলিং দেওয়া আছে, চতুষ্কোণ বেদিকার উপর স্থাপিত।

অশোকের শিল্প বিশেষ করিয়া লাট বা স্তম্ভে প্রকটিত। দুটি স্তম্ভে খরোষ্টি অক্ষর খোদিত, বাকী সকলে আছে ব্রাহ্মী অক্ষর। সারনাথের স্তম্ভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধ বারাণসীতে যেখানে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন (ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন) অশোক সেখানে এই স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই স্তম্ভের উপর চারিটি সিংহ বসিয়া আছে; সিংহের নীচে চারিটি ধর্ম্মচক্র, হাতী, ঘোড়া এবং সিংহ রিলিফে খোদা আছে। ঘণ্টাকৃতি উল্টান পদ্মের উপর এসব স্থাপিত। পারসিপোলিস হইতে এই পরিকল্পনা আসিয়াছে। মূর্ত্তিতে উচ্চাঙ্গের পালিস। সিংহ স্তম্ভের ন্যায় অন্যত্র ষাঁড়, ঘোড়া ও চক্র দেখা যায়। ষাঁড় খুব স্বাভাবিক, তার আনাটমি নিপুণতার সঙ্গে দেখান হইয়াছে (কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত)।

ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ধৌলি নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে অশোকের লিপি আছে, সেখানে একটা হাতীর শুঁড় খোদিত আছে (২৫৭ খৃঃ পূঃ)।

সারনাথে কতগুলি ভগ্নমস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা মৌর্য্য অথবা প্রথমভাগের সুঙ্গমূর্ত্তি হইবে। ইহা দাতাদের প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমিত: মাথায় নানাপ্রকার উষ্ণীষ লক্ষণীয়।

অশোকের চৈত্য ধ্বংস পাইয়াছে, তার ভিত্তি স্থানে স্থানে দেখা যায়; সারনাথ ও কৃষ্ণা গোদাবরী অঞ্চলে এসব নিদর্শন আছে।

খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্যের সঙ্গে আর্য্য ভারতের যোগাযোগ হয়। অশোকের স্তম্ভশীর্ষ (ক্যাপিটাল), প্রাসাদ টেরাকোটা, শীলমোহর, এবং মুদ্রায় অগ্নির প্রতীক, ছুঁচল টুপী প্রভৃতি দেখিয়া মৌর্য্যযুগ হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসকে "জরথুস্ত্র যুগের ভারতের ইতিহাস" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধ, শিব এবং রাজার মূর্ত্তিতে কাঁধ হইতে আগুন বাহির হইতেছে দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার উপর অগ্নি-উপাসকদের প্রভাব বর্ত্তিয়াছে।

প্রেমাঞ্জলি

শ্রীস্নেহময় বিশ্বাস

আঁধার রজনী যদি ভোর হ'য়ে গেল,
অরুণের হাসি কৈ বিকাশে?
'ভারতী' জাগিয়ে যদি দোর খুলে দিল,
আরতি তাহার কৈ প্রকাশে?

মৈত্রী মিলন ধ্বজা উড়িতেছে যদি,
তবু কেন হিংসার বন্যা?—
রক্তের জবাফুলে অঞ্জলি যদি,
ভারতীরে কে করিবে ধন্যা?

শান্তির সেনা যদি ভারতী তনয়
ন্যায় আর সত্যের সঙ্গী,
তবে কেন পদে পদে পথ-ভোলা হয়
ভারতীর শৃঙ্খলা লঙ্ঘি'?

জাগ্রতা ভারতীর হোক্ বন্দনা
অপ্রিয় ভেদাভেদ ভুলি,'
হাসিবে ভারতী পুনঃ, যাবে গঞ্জনা
দিবে তারে 'প্রেম-অঞ্জলি'।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আজ দেশের সর্বত্র যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনল প্রজ্বলিত, আমাদের স্বতঃই মনে জাগে—সত্যিই কি হিন্দু-মুসলমান-মৈত্রী সুদূর-পরাহত ব্যাপার? ইতিহাস কি এর পক্ষে সত্যি কোনও সাক্ষ্য দেয়না? আমাদের জাতীয় সাহিত্য কি এর অনুকূলে কোনও মর্মস্পর্শিনী বার্তা বহন করে না? এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করতে চাই।

দেশের দূরদর্শী হিতৈষিমণ্ডলী আমাদের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন—তাঁদের হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। এ ক্ষেত্রে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে বঙ্গদেশে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভারতের অন্যত্র অন্যান্য মহাপুরুষগণ হিন্দু-মুসলমানের ভেদবুদ্ধি পরিহারপূর্বক অপূর্ব ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন এবং ফলে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেই পরম সত্যের সন্ধানে ব্রতী হন—মানবসৃষ্ট বৈষম্য সম্পূর্ণ পরিহার করেন। দেশে সুখশান্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করতো। সুদীর্ঘ কাল থেকে বঙ্গদেশ ভারতীয় জনসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করছে। ভারতীয় স্বাধীনতাগমের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বঙ্গদেশকেই পথপ্রদর্শক হিসাবে অগ্রসর হতে হবে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধির দাবদাহে ভারতের অন্যান্য অংশ আজ যখন প্রজ্বলিত, বঙ্গদেশকে শান্তিবারি হাতে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে—মহাপ্রভুর শান্ত্যুদক সেচনে দলে দলে নসীরমামুদ, ফকির হবিব, সৈয়দ মর্তুজা, ফতন, চাঁদ কাজি, অলিরাজা, আকবর শাহ কবীর, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, সেখ লাল প্রভৃতি সৃষ্টি করতে হবে—আবার বঙ্গদেশের আকাশে বাতাসে এমন একটী প্রেমের মলয়হিল্লোল প্রবাহিত করে দিতে হবে, যাহাতে সমগ্র ভারত প্রশান্ত ও ধন্য হয়ে উঠবে। একদিন এই বঙ্গদেশেই দরাফ খাঁর গঙ্গাস্তুতিতে শুধু বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ আলোড়িত হয়নি, মুসলমান সমাজও তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেছিলেন। জঙ্গনামার কবি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

"ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান্।
গঙ্গা যার ওজুর পানি করিত যোগান্॥"

আজকালকার দিনে এমন ঘটনাও আমাদের দেশে ঘটেছে যে কোনও মুসলমান কালীর মানত করে সে মানত দিলে স্বধর্মাবলম্বী অন্যেরা তাকে ধর্মদ্রোহী বলে নিধন করেছে, কিন্তু দরাফ খাঁর দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আগেকার দিনে সমাজ ঈদৃশ লোককে ধর্মাত্মা বলে বরণ করে নিত। সাহিত্যসেবী সমাজের নেতারাও তাঁদের যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করতে কোনও রূপ কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি মুসলমান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ তাঁর "গোরক্ষবিজয়" নামক অমর গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি কবীন্দ্র দাসের কাহিনীকে কাব্যে প্রাণদান করে গেছেন—

"কবীন্দ্র বচন শুনি ফয়জুল্লা এ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া॥"

ভীমদাস, শ্যামদাস প্রভৃতি হিন্দু তাঁর গায়েন ছিলেন। ভগবানের যে বাঁশীর বিষয় জালালুদ্দিন রুমী একদিন বলেছিলেন - দো

দহান্ দারীয় গূষ্মা হম্ চূণ নায়"—অর্থাৎ কবির প্রাণ বাঁশীমাত্র; উহার এক প্রান্ত সেই সনাতন মহাগায়কের অধরে এবং অন্য প্রান্ত বিশ্বমানবের কর্ণে অর্থাৎ কবি সেই অনাদি অনন্ত মহাকবির ভাবের দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে তাঁরি সেই মহা-সঙ্গীত মহামানব সমাজকে শোনান। চট্টগ্রামের ওসখাইন গ্রামের দার্শনিক কবি অলি রাজাও সেই একই বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে বিশ্বমানবকে বিমোহিত করেছিলেন। এ কবির প্রাণবাঁশী ভগবানের মুখে বেজেছিল, জগজ্জন তাতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কবি মহাপ্রভুকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

'শাস্ত্র সব ত্যাগ করি, ভাবে ডুব দিয়া।
প্রভু প্রেমে প্রেমে করি, রহিব ডুবিয়া॥"

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন; তিনি উন্মুক্ত কণ্ঠে গেয়েছেন—

"যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরুপদে অলিরাজা কয়॥"

এ সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রামপুর বোয়ালিয়ার অন্তর্গত সুন্দরকুসুমী গ্রামের কবি আব্দুস স্কুরও গেয়েছিলেন—

"নদীয়া নন্দনগরে জগন্নাথ মুনির ঘরে
নিজ নামে চৈতন্য সন্ন্যাসী।"

আজ এ দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশের অধিবাসীর নির্মল দৃষ্টি উপরিলিখিত কয়টি কবিতাংশের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই। ফলতঃ, মুসলমান-কবিদের লিখিত পদাবলী কোন কোন স্থলে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রচিত পদাবলীর মতই রসপ্রপূরিত ও ভাবোন্মাদনাময়। পূর্বোক্ত আলিরাজাই বৈষ্ণবভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা হয়েই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন—

"সতত বঁধুর লাগি জ্বলে অবলার চিত।
হায়! এ কি প্রেম রীত॥
দূর দেশী সঙ্গে প্রেম বাড়াইনু অতি।
সেই হৈতে হলো মোর অনল বসতি॥
প্রেমের ঔষধ খাই হলাম উদাস।
জগলোকে কলঙ্কিনী বলে বার মাস॥
শাশুড়ী ননদী বৈরী স্বামী হলো ভিন।
আর জ্বালা কালার সহিমু কত দিন॥
গুরু পদে অলিরাজা গাহিল কানাড়া।
চিত্ত হয়ে প্রেমানল না হউক ছাড়া॥"

সতী ময়নার উত্তরাংশ, পদ্মাবতী, সয়ফল মুল্লুক, বাদিঔজ্জামাল, সপ্তপয়কর, সেকন্দরনামা, তোহফা প্রভৃতি রচয়িতা চট্টগ্রামের অন্যতম কবি আলাওলের "ননদিনী রসবিনোদিনী" প্রভৃতি কবিতাও এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের রাউজানের অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রাম নিবাসী কাজী দৌলৎ তাঁর "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" গ্রন্থেও অপূর্ব প্রেমরস পরিবেশন করেছেন। শেখ মদন বাউলের "নিখিল গরজী তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে" প্রভৃতিও পদ-সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। হিন্দু মুসলমান সমভাবেই এ সব গানে আত্মহারা হতেন এবং রচয়িতাদের ধর্মনির্বিশেষেই পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতেন।

সংস্কৃত সাহিত্য থেকে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধ শেষ করছি। কবি মাধব রেওয়ার মহারাজ বীরভানুর জীবনচরিত অবলম্বন করে যে বীরভানূদয় কাব্য রচনা করেছেন, তাতে মোঘল সম্রাটদের সঙ্গে রেওয়ার রাজবংশের বংশপরম্পরাগত মৈত্রী বিষয়ে উল্লেখ করে কবি বলেছেন যে বীরসিংহের সঙ্গে ভাব ছিল বাবরের; তাঁদের পুত্রদ্বয় হুমায়ুন ও বীরভানু ছিলেন পরম বন্ধু; বীরভানুর পুত্র রামচন্দ্র ও

হুমায়ুনের পুত্র আকবরও প্রকৃষ্ট বন্ধু ছিলেন: বীরভানুর পৌত্র রামভদ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন সম্রাট হুমায়ুন নিজের পৌত্রের জন্ম-পরিগ্রহের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন এবং তাদৃশভাবে উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেছিলেন, স্বকীয় মন্ত্রীকে প্রেরণ করেছিলেন, রেওয়ার রাজকবি তা অকপটে স্বীকার করেছেন। বলা বাহুল্য, রাজবংশের এ মৈত্রী ভারতের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পরম সাম্প্রদায়িক প্রীতির গৌরবোজ্জ্বল হেতুস্বরূপ ছিল। ভ্রাতৃদ্বেষবিধ্বস্ত ভারতধামে এ মহৌষধিস্বরূপে গৃহীত হতে পারে—এ ভেবেই মাধবের এ পংক্তি কয়টী এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আকর্ণ্য দিল্লীশ্বরভূপমৌলিঃ শ্রীমান্ হুমায়ু-
র্যবনাধিনাথঃ
শ্রীবীরভানোস্তনয়স্য জাতং সুতং প্রমোদং বহুধা
প্রপেদে॥
স প্রেষয়ামাস নিজৈরমাত্যবরৈঃ শুভান্যাভরণানি
শুষ্ঠঃ।
অশ্বাংশ্চ বাসাংসি সুগন্ধবস্তু ভ্রাত্রীকৃতস্তেন হি
বীরভানুঃ॥
শ্রীবীরসিংহস্য যথা বভূব সুভ্রাতৃভাবঃ সহ বাবরেণ।
ক্ষৌণীশ্বরেণেহ তথৈব তেন শ্রীবীরভানোরপি
বন্ধুভাবঃ॥
"পৌত্রং তবেমং নৃপবীরভানো জাতং কিলাহং
নিজমেব মন্যে।
কো ভ্রাতৃপৌত্রেঽথ নিজে বিশেষ" ইত্যাহ লেখে
স চ মুদ্গলেশঃ॥"

অনুবাদ—যবননাথ দিল্লীশ্বরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হুমায়ুন বীরভানুর পুত্রের (রামচন্দ্রের) পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন জেনে বহুল প্রমোদ প্রাপ্ত হন। তিনি আনন্দিত হয়ে স্বকীয় অমাত্যবরদের সঙ্গে শুভ আভরণ, অশ্ব, বস্ত্র ও সুগন্ধ বস্তু প্রেরণ করেন; কারণ বীরভানুকে তিনি ভ্রাতৃরূপে পরিগণিত করেছিলেন। শ্রীবীরসিংহের সঙ্গে বাবরের যেমন ভ্রাতৃভাব ছিল, তদ্রূপ হুমায়ুনের সঙ্গেও বীরভানুর বন্ধুভাব ছিল। তাই সেই মোগল সম্রাট হুমায়ুন পত্রে লিখেছিলেন—হে নৃপ বীরভানু! তোমার এই যে পৌত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে আমি নিজের পৌত্র বলেই মনে করি। ভ্রাতৃপৌত্রে এবং নিজের পৌত্রে পার্থক্য কি?

ভারতের অন্যত্র যাই হোক না কেন, বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান কোনও দিন মৈত্রী-বিষয়ে শ্লথতা অবলম্বন করে নি। ফলতঃ, প্রদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান একত্রে অবাঙ্গালী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাঙ্গালী মুসলমানেরা হিন্দুদের মতই বঙ্গদেশকে স্বীয় জননীরূপে ভালবাসতে শিখেছিল এবং তজ্জন্য বাঙ্গালী হিন্দুভ্রাতৃবৃন্দের স্বার্থ তাদের কাছে পরার্থ বলে প্রতীয়মান হয়নি। বাঙ্গালীদের চিরকালের শিক্ষা আজ আবার সমগ্র ভারতের আদর্শস্থল হয়ে উঠুক এবং বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের জনজাগরণে আত্মনিয়োগ করুক—আজ কায়মনোবাক্যে বিভুপদে এ প্রার্থনা নিবেদন করি। বাঙ্গালীর এ বিজয়-অভিযান জয়যুক্ত হউক।

হলিউডের চিঠি

শ্রীসুশীলরঞ্জন গুহ

লস্ এঞ্জেলস্, কালিফোর্ণিয়া,

১৮ই জুন, ১৯৪৭

মা, আজ তোমাকে আমার লস্ এঞ্জেলসের দিনপঞ্জী সংক্ষেপে জানাবো। লস্ এঞ্জেলস্ তথা হলিউড্ বাণীচিত্রের তারকাদের মহাতীর্থ। এই শহরের ঘটনাবলী জান্‌বার জন্য আমাদের দেশের অনেকে ব্যাকুল! এই জন্য এখানকার সাধারণ লোক কিরূপ জীবনযাপন করে তাই হবে আমার বর্ত্তমান চিঠির বিষয়বস্তু।

পূর্ব্বেই জানিয়েছি এদেশে কত সমৃদ্ধি—কত ভোগবিলাসের সামগ্রী! ভোগবিলাসের সীমায় পৌঁছে আজ এরা অসীমের চিন্তা কর্‌ছে। আমাদের দেশের কতক লোক যে অমূল্য রত্ন হেলায় হারাতে চলেছে তা এদেশের সমৃদ্ধিসম্পন্নরা সাগ্রহে গ্রহণ করতে ব্যাকুল। সমৃদ্ধির মাঝে এদের মনে বৈরাগ্যের উদয় হচ্ছে—ইহা জাতির মহা উন্নতির লক্ষণ। এদের জীবনের সেইটাই আমি লক্ষ্য* কর্‌ছি—তাই আমার দিনপঞ্জী।

১২ই জুন রাত্রি ১০টায় লস্ এঞ্জেলস্ পৌঁছাই। সেই রাত্রে কোনরকমে হোটেলে সামান্য পানাহার করে শুয়ে পড়ি। পরদিন সকালে উঠে দুটো টেলিফোন করি। প্রথমে এখানকার রামকৃষ্ণ-মিশনের কেন্দ্র বেদান্ত সমিতির স্বামী প্রভবানন্দ মহারাজকে ও একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে। যেমন এদেশের অন্যান্য শহরে পৌঁছে করেছি—স্বামীজিকে বল্‌লাম—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি কি না? তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। এখানে তোমাকে জানানো উচিত যে এঁকে আমি পূর্ব্বে জান্‌তাম না। আমি বাঙ্গালী ছাত্র—এ ছাড়া আর কোন পরিচয় নেই। অবশ্য সব জায়গায়ই রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিরা যথেষ্ট স্নেহ করেছেন। কিন্তু এখানে কিছু অপ্রত্যাশিত হয়েছে। অন্যান্য শহরে স্বামীজিদের সঙ্গে দেখা করেছি—এদেশের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ পেয়েছি—বক্তৃতা শুনেছি—তাঁদের স্নেহের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ভূরিভোজন পেয়েছি। এখানেও তাই আশা করেছিলাম। যা অভাবনীয় তাই বিশেষ করে আজ জানাবো।

যখন বেদান্ত সমিতিতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল— ভারতবর্ষে কোন মন্দিরে এলাম নাকি। শহরের কোলাহল থেকে দূরে নির্জ্জন এক কোণে শুভ্র সুন্দর মন্দির। সাম্‌নের দিক্ থেকে প্রথমটা যেন্ কতকটা আগ্রার তাজমহল বলে ভ্রম হয়। ধীরে ধীরে এগুচ্ছি—একটী হাসিখুসী সুন্দর মেয়ে এগিয়ে এলো—জিজ্ঞাসা কর্‌লো—"স্বামীজির সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান্?" আমি বল্‌লাম, "হ্যাঁ—যদি সম্ভব হয়।" আমাকে স্বামীজির ঘরে নিয়ে গেলো। পরে জেনেছি—মেয়েটী আশ্রম-বালিকা—নাম রাধিকা। তুমি হয়তো ভাব্‌ছো—সে কি

* লেখকের মাতাঠাকুরাণীকে লিখিত। উঃ সঃ

ভারতীয় মেয়ে, না—এ দেশীয়া? আমি প্রথমে চমৎকৃত হয়েছিলাম। পরে বুঝেছি চমৎকৃত হওয়ার কারণ নেই। শেষ পর্য্যন্ত যদি আমার বাজে কথা পড়ার ধৈর্য্য থাকে তবে তোমারও সেই ভাব থাক্‌বে না।

সৌম্যশান্ত কান্তিমান পুরুষ স্বামী প্রভবানন্দ। নমস্কার জানাতে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আশ্রমের সংবাদ সামান্য দিলেন—যেন মজা দেখ্‌ছিলেন অর্থাৎ নিজে দেখে মজা বোঝ। বল্লেন—"এটা ভারতীয় আবাস—আমি ঘরের ছেলের মত ব্যবহার করতে পারি।" কিন্তু আমি এসব দেশের চাল-চলনের অভ্যস্ততা থেকে প্রথমে সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। স্বামীজি মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লিয়ড্—স্বামী বিবেকানন্দের একজন শিষ্যা—৯০ বৎসরের এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

আমি ঠাকুরের জন্য সামান্য ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম। মহারাজ তা মন্দিরে ঠাকুরের কাছে নিবেদন করতে পাঠিয়ে আমাকে বল্‌লেন—"তুমিও যাও ঠাকুরকে প্রণাম করে এসো।" তখনও ভাব্‌ছি—বক্তৃতার ঘর দেখ্‌বো—ঠাকুরের ফটোর সাম্‌নে প্রণাম করবো। মন্দিরের দরজা খুলতেই দেখি—১৪।১৫ জন ছেলেমেয়ে আমাদের দেশের মত আসন করে বসে ধ্যান করছে—সম্মুখে ঠাকুর—রীতিমত পূজার আয়োজন। ঠাকুরের উপস্থিতি, আশ্রমবাসীদের মৌনধ্যানরত মুখচ্ছবি, নিষ্ঠা ও ভক্তি, মন্দিরের শান্ত গাম্ভীর্য্য, পটভূমিকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, পাখীর সুমিষ্ট কলতান, সবকিছু আমাকে অভিভূত করে ফেললো। এক মিনিটে আমার মনে হলো আমি যেন দেশে ফিরে গেছি; বিদেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার জন্য এখানে আমায় হাস্যাস্পদ হতে হবে না। একটী মেয়ে ঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা করলো, ভোগ নিবেদন করলো। ঠিক আমাদের দেশে যেমন সব ভক্তরা দাঁড়িয়ে নাম জয়গান করে তেমনি।

পূজা ও ভোগ-আরতির পর সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম্। সেখানে স্বামীজিকে দেখলাম যেন আমাদের দেশের কোন আদর্শ গৃহকর্ত্তা। প্রথমে সকলে মিলে ঠাকুরের স্তবগান করলো—যেমন বেলুড়ে দেখেছো। এইসব বিদেশী ভক্ত ছেলেমেয়েরা মধুর সুরে সংস্কৃত স্তবগান কর্‌লো—শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম—কি সুন্দর জিহ্বার আড়ষ্টতাহীন উচ্চারণ। প্রসাদ পেতে পেতে গল্পের মধ্য দিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ হলো। এখানে ভগ্নী ললিতা, সারদা, বরদা, জ্ঞানদা, সরস্বতী, রাধিকা, ভক্তি ও সত্যকাম এদের সঙ্গে পরিচয় হলো। এরা সবাই এদেশীয়। কিন্তু কি এদের নিষ্ঠা ও ভক্তি! ঠাকুর এদের প্রাণ—স্বামীজি এদের গুরুদেব। এদের সকলের সামান্য সামান্য পরিচয় ক্রমে দিচ্ছি। কিন্তু একজনের কথা বিশেষ করে এখানেই না বলে থাক্‌তে পার্‌ছি না। তিনি হচ্ছেন সত্যকাম। বয়স হবে প্রায় ৪০ বৎসর—দেখে মনে হয় সংসারের অন্য সবকিছুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন-কেবল ঠাকুর—তাঁর আশ্রম ও নিজ গুরুদেবকেই জানে। সব সময় নীরবে বাসনমাজা থেকে আশ্রমের সব কাজ অক্লান্ত-ভাবে কর্‌ছেন—কোন কথাই নেই মুখে—নেই পরিশ্রমকাতরতা। আর অবসর পেলেই থাকেন স্বামীজির পিছন পিছন ছায়ার মতন গুরুদেবের প্রতি কি অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা! সব সময়ই পকেটে খাতা ও কলম আছে। এমন কি খাচ্ছেন যখন তখনও স্বামীজি কি বল্‌লেন তাও লিখে রাখছে—এসব তাঁর কাছে অমূল্য রত্ন। স্বামীজি বলেন—সত্যকাম বৈষ্ণব। আমার মনে হচ্ছিল যেন তোমার রামায়ণের প্রতিচ্ছবি। আমি এঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। এঁর

একটা ফটো সংগ্রহ করার ইচ্ছা ছিল। আমার ক্যামেরা নেই। অনুসন্ধানে জানলাম—উনি নীরবে সকলের ছবি তুলে নেন কিন্তু ওঁর ছবি জোগাড় করার উপায় নেই। এঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে না তো হবে কার?

এখানে তোমাকে আশ্রমের দৈনিক কর্ম্মসূচী দেই। আমি এখানে এসে সব দেখে শুনে এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি যে ৪।৫ দিন হয়ে গেলো তবুও এখান ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। তুমি হয়তো ভাবছো—তোমার ছেলে পড়াশুনার জায়গায় না গিয়ে পথে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু মা, আমি নিশ্চয় জানি তুমিও এখানে থাকতে চাইতে। কেন? সেজন্য আগে কর্ম্মসূচী শোনো। আশ্রমের সবাই সকাল ৬টায় উঠে ৭টার মধ্যে স্নানাদি করে তৈরী হয়ে নেয়। ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ধ্যান জপ পূজা। তারপর প্রাতরাশ। আশ্রমের রান্না, ঘর দরজা পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ মেয়েরা হাসিমুখে সব সময় সুচারুরূপে করে। সর্বত্র কল্যাণ ও শুচিতা বিরাজ করছে। আর একজনের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তিনি হচ্ছেন ভগ্নী ললিতা—স্বামী তুরীয়ানন্দের একজন শিষ্যা। এঁরই সাহায্যে ও স্বামী প্রভবানন্দের চেষ্টায় এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। এই বৃদ্ধা সদা প্রসন্না—সব সময়ই হয় আশ্রমের ফুলের বাগানে না হয় অন্য কোথাও ঘুরে ঘুরে কিছু না কিছু করছেন। অথচ নীরব—নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

প্রাতরাশের পর সবাই যে যার কাজে যায়। কেউ ভোগ রান্না করছে—রোজ অন্নভোগ হয় ভারতীয় প্রথায়। কেউ ঘর পরিষ্কার করছে—কেউ কাপড়জামা কাচছে—কেউ মাধ্যাহ্নিক পূজার আয়োজন করছে—কেউ বা আশ্রমের দপ্তরের লেখাপড়ার কাজ করছে। মনে রেখো এঁরা সকলেই যথেষ্ট শিক্ষিতা। ক্রমে বেলা হয় —১২টা থেকে ১॥০টা পর্য্যন্ত ধ্যান জপ পূজা ভোগ ইত্যাদির পর সকলে প্রসাদ পায়। পরে আবার সকলে যে যার কাজে যায়। কেউ কেউ পড়াশুনা করে—ধর্ম্মগ্রন্থ। দুপুর বেলায় তোমার বৌমাদের রামায়ণ পাঠ করে শোনানর জন্য হয়তো সময় পাওনা—আর এরা তা সাগ্রহে করে। কেউবা গান করে—সিনেমার গান নয়, ভগবানের নাম গান—বাংলা ও সংস্কৃতে। এর মধ্যে এদের সবদিকে আবার নজরও আছে। বেলা ৩।৩॥০ টার সময় কেবল স্বামীজির জন্য চা তৈরী করে দেওয়ায় কোন ভুল নেই—যেন বাড়ীতে বাবাকে তাঁর প্রয়োজনের সময় না বলতেই ঠিক জিনিষটী হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। এরা আর তখন কেউ চা খায় না—কিন্তু তোমার লোভী ছেলে যে কদিন আছে—সে একপাত্র করে না চাইতেই পেয়েছে। তাকে এই সব বোনেদের কাছে হ্যাংলাপনা করতে হয়নি; বুঝে দেখ—এদের কি আদর যত্ন। ক্রমে সূর্য্যদেব গড়িয়ে পড়েন। বেলা ৬॥০ টা। ধ্যান জপ—কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে সন্ধ্যারতি—ভোগ—ঠাকুরের শয়ন। আরতির সময় গৃহস্থ ভক্তরা আসেন। প্রায়ই ২৫।৩০ জন তখন সেই গম্ভীর মন্দিরে ঠাকুরের পাদপীঠে বসে নীরবে তাদের ব্যাকুলতা জানায়। এইসব শেষ হতে ৮ টা। তখন সকলে প্রসাদ পায়—রাত্রে ফলাহার। তখন থেকে রাত্রি প্রায় ১০।১০॥ টা পর্য্যন্ত সকলে স্বামীজিকে ঘিরে বসে গল্পগুজব করে। এই সময় স্বামীজি হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে এদের সকল প্রশ্নের সমাধান করে দেন। এরা শান্তমনে ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে শুতে যায়।

প্রতি পূর্ণিমায় অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন হয়। একাদশী ও শিবরাত্রি সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়। ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যীশুখৃষ্টের জন্মতিথিগুলি, দুর্গাপূজা, কালীপূজা যথারীতি পালিত হয়।

স্বামীজি আশ্রম-বালিকাদের নিয়ে ক্লাস করেন। তখন ধর্ম্মগ্রন্থ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী পাঠ হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি গীতা পাঠ করে ব্যাখ্যা করেন। প্রতি রবিবার তিনি এক এক বিষয়ে একঘণ্টা বক্তৃতা দেন। সেই সময় বর্ত্তমান আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক জোসেফ কাপলান, (Joseph Kaplan), ফ্রেডারিক (Frederick), ম্যানচেষ্টার, (Manchester) পার্সি হাউসটন্ (Percy Howston) প্রভৃতির ন্যায় শহরের বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত নরনারী সমবেত হন—প্রায় ২০০ জন গড়ে। এঁরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিটি কথা শ্রবণ করেন। আমাদের দেশের মত সভায় হট্টগোল নেই—যাকে ইংরেজীতে বলে 'সূচ ফেল্লে সেই শব্দ শোনা যায়'—এইরূপ নীরবতা। স্বামীজি গৈরিকবসনে ভূষিত হাসিমুখে এসে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়ান—বিমুগ্ধ জনতা মাথা অবনত করে। বক্তৃতার পরে স্বামীজি মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে একে একে অভিবাদন জানিয়ে কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করেন। তারাও যেন বিশেষ আত্মীয়তাবোধে নিজ নিজ সুখদুঃখের কথা জ্ঞাপন করে। আশা—তিনি সকল দুঃখ লাঘব করে দেবেন। তখন প্রসন্নমুখে সবাই ফিরে যায়। আবার ফিরে আসে আরও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। এদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—এইসব সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের দৌলতে ভারতীয়দের প্রতি এদের কি শ্রদ্ধা। আমি ভারতীয় হিসাবে সেই অবস্থায় কুণ্ঠাবোধ করি নিজ দারিদ্র্যের দিকে চেয়ে।

স্বামীজির প্রায় শতাধিক জন দীক্ষিত সন্তান। প্রায় প্রত্যেকের তিনি নূতন করে নাম দিয়েছেন যথা—যমুনা, শ্রদ্ধা, আশা, প্রভা, বীরেশ্বর, দুর্গাচরণ, বেন্ ইত্যাদি। এরা সবাই সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত ধ্যান-জপ-তপ করে শুদ্ধাচারে থাকে। স্বামীজির দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে আছেন জগদ্বিখ্যাত—জেরাল্ড হার্ড (Gerald Heard), ক্রীষ্টোফার ঈশারউড্(Christopher Isherwood), আলডুস্ হাক্সলি (Aldous Huxley)।

এখানে তোমায় এই কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানাই। অমিয়া নাম্নী একটি আশ্রম-বালিকা—জাতিতে ইংরেজ—লিখেছেন :

"সঠিকভাবে বল্‌তে হলে বলা চলে যে দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় প্রকৃতপক্ষে ১৯০০ সালে—যখন স্বামী বিবেকানন্দ অতিথি হিসাবে 'মেড্ ভগিনী'—মিসেস্ ওয়াইকফ্ এঁদের বাড়ীতে ছিলেন। মিসেস্ ওয়াইকফ্ই বর্ত্তমানে—ভগিনী ললিতা নামে অভিহিতা। এঁরা স্বামীজির উপস্থিতিতে বোধ করছিলেন যেন যীশুখৃষ্ট তাঁদের সঙ্গে আছেন। তাঁর উপস্থিতিতে যে আনন্দের উদয় হয়েছিল তা' এই বৃদ্ধার জীবন-স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। পরে এখানে আসেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। আগেই বলেছি ভগিনী ললিতা তাঁর কাছে দীক্ষা নেন্। তিনি ভগিনীকে বলেছিলেন—"তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—নীরব কর্ম্ম।" ভগিনী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিদিন সেই গুরুবাক্য পালন করে চলেছেন।

তখন থেকে ত্রিশ বৎসর পরে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পোর্টল্যাণ্ড থেকে এখানে আসেন স্বামী প্রভবানন্দ। তাঁর আগমন-সংবাদ শুনেই ভগিনী ললিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তখন থেকেই শুরু হয় এই কেন্দ্রের কাজ। এই সম্মিলনের মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে ভগিনী ললিতা তাঁর একমাত্র সন্তানের বিয়োগব্যথায় বিধুরা ছিলেন। এই সময় স্বামী প্রভবানন্দ এই ব্যথাতুরা জননীকে সঙ্গে করে পোর্টল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেন্। জননী তাঁর সন্তানস্নেহ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। ভগিনী সেখানে বৎসরাধিক কাটিয়ে লস্ এঞ্জেলসে ফিরে

আসার সময় স্বামী প্রভবানন্দের নিকট তাঁর বাড়ী ও যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কাজের জন্য অর্পণ করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। স্বামীজী সানন্দে গ্রহণ করেন। সামান্য আয়োজন কিন্তু স্বামীজী ঠাকুরের কাজে সামান্যকে সামান্য গণ্য না করে অকুতোভয়ে এগিয়ে আসেন এই কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠায়। ১৯২৯ সালে Vedanta Society of Southern California (1946 Ivar Avenue, Hollywood 28, California, U. S. A.) কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়। মিসেস্ ওয়াইকফ্—ভগিনী ললিতার গৃহের নামকরণ হয় 'বিবেকানন্দ আবাস'।

সেই থেকে নানা পরীক্ষা ও তিতিক্ষার মাঝ দিয়ে এগিয়ে আজ এই কেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষা জগৎজনকে বিতরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে এদেশীরা এর মারফৎ ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ। বর্তমানে কেন্দ্রের কাজ বহুবিস্তৃত হয়ে পড়েছে। স্বামীজীর পক্ষে একা সকল কাজ তত্ত্বাবধান করা কষ্টসাধ্য। অনেক সময় আর্থিক অভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঠাকুরের কাজ—ঠাকুরই তার বন্দোবস্ত করেছেন সময়ে।

১৯৪৪ সালে Spencer Kellogg নামে শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন ভক্ত হলিউড শহর থেকে ৮০ মাইল দূরে স্যান্টা বারবারা শহরের অদূরে এক গ্রামে তাঁর ৩০ একর জমি বাড়ী মন্দির সহ অর্থ এই কেন্দ্রের কাজের জন্য সমর্পণ করেন। এই সমুদায় সম্পত্তির মূল্য হবে প্রায় নয় লক্ষ টাকা।

১৫ই জুন মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাওয়ার পর স্বামীজী, ভগিনী ললিতা ও সত্যকামের সঙ্গে সেখানে গিয়ে একদিন কাটিয়ে আসি। একদিকে বিরাট সেণ্ট ইউঙ্গ পর্বতমালার অটল চিরস্থির গাম্ভীর্য, অন্যদিকে বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের উচ্ছলতা—এই পটপ্রেক্ষিতে নির্জন বনভূমির মধ্যে প্রকৃতির কোলে 'আনন্দ-ভবন' সত্যই আনন্দের ভবন—সেখানে সবাই সদা আনন্দময়। সেখানকার সৌন্দর্য আমি ভাষায় প্রকাশে অক্ষম। সাধনার পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান। বর্তমানে সেখানে যে বাসগৃহ আছে তা যথোপযুক্ত নয়—সেখানকার পুরুষ আশ্রমবাসী নিজেরা নূতন বাড়ী তৈরী করছে। বর্তমানে সেখানে আছেন তিন জন বয়স্থা মহিলা—যমুনা, যোগিনী ও লিওনারা এবং গঙ্গারাম, ওয়েইন্, হেন্‌রী ও কেম্প। এঁদের কয়েকজন দীক্ষিত। বাকী সকলে দীক্ষা পাওয়ার জন্য নবিশী করছেন। মনে রেখো—এঁরা সকলেই শিক্ষিত এবং সম্পন্ন ঘরের সন্তান। অথচ এই নির্জন বনে একমনে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করার জন্য শিক্ষা একান্তমনে গ্রহণ করছেন। কয়েক জনের বহু মাস কেটে গেছে—তবুও পরীক্ষা চলেছে—অদ্ভুত ধৈর্য ও চেষ্টা। মানুষ হিসাবে এঁরা যে কত সুন্দর তা এঁদের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না। আর স্বামীজীর কথায় এঁদের কি অগাধ বিশ্বাস, তাঁর উপস্থিতি এঁদের কাছে পরম সৌভাগ্য! এখানকার মন্দিরটী ছোট কিন্তু আমার মনে হয় স্থানোপযোগী ও সাধনার পক্ষে সহায়ক। এ ছাড়া বনের মধ্যে মুক্ত আকাশের নীচে আমাদের দেশের সাধুপুরুষদের সাধনার পক্ষে মনোরম স্থান। এখানেও হলিউডের মত দৈনিক কর্মসূচী পালন করা হয়। স্বামীজীর ইচ্ছা যত শীঘ্র সম্ভব হলিউড থেকে সব মেয়েদের এখানে এনে রাখবেন। আর সব পুরুষদের হলিউডে নিজের সঙ্গে রাখবেন। আমি পুরুষ হিসাবে তাঁদের মনোরম কিছু থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে দেখে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু পুরুষ আশ্রমবাসীদের কোন ক্ষোভ নেই।

আমার পত্র ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। সুতরাং আর দীর্ঘ করবো না। মোট কথা এখানকার বেদান্ত সমিতির কাজ কত বিরাট আকার ধারণ করেছে তা চিঠিতে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা যায় না। আমি মুগ্ধ দর্শক—সব কিছু দেখে হতবাক্ হয়ে গিয়েছি। স্বামীজী বলেন, বিস্মিত হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নেই - ঠাকুরের পাদপদ্মে সমস্ত পৃথিবী কল্যাণের জন্য মাথা অবনত করবে এইতো স্বাভাবিক। সেই জগৎগুরু যুগধর্মাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে আমার প্রণতি জানিয়ে এখান থেকে বিদায় নেবো।

পরিশেষে আমার আশা—আমাদের দেশের লোক যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মোহান্বিত হচ্ছে সেই পাশ্চাত্যবাসীদের উদাহরণ দেখে সঠিক পথে চলা সুরু করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

বিশ্বপ্রকৃতিতে অভাবপূরণের একটী সুনিয়ন্ত্রিত বিধান দেখা যায়। রাত্রির গাঢ় তিমিরের পরেই বিশ্বপ্রকাশক দিনের জ্যোতিঃ, কৃষ্ণপক্ষের পরেই শুক্লপক্ষ, নিদাঘের অসহ্য তাপের পরেই স্নিগ্ধ বর্ষার আবির্ভাব। বিশ্বপ্রকৃতির এই নিয়মকে অবলম্বন করিয়াই অবতারপুরুষগণেরও এই জগতে আবির্ভাব। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, দুষ্টের ও পাপের প্রভাববৃদ্ধি হয়, সাধু লোক নিগৃহীত হন, অকল্যাণ পুঞ্জীভূত হয়, শ্রেয়ের স্থানে প্রেয়ের অধিষ্ঠান হয়, তখন তখনই ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য, পাপ ও অকল্যাণ দূরীকরণের নিমিত্ত অবতার-পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইহা প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যবিজিত ভারত পাশ্চাত্যজাতির অন্ধ অনুকরণ করিতেছিল। তাহার নিজের শিক্ষা, দীক্ষা, জাতীয় আদর্শ সে বিস্মৃত হইতেছিল। তাহার সমাজ-জীবন ও জাতীয় ধারাকে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুরূপ গঠন করাই সে পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। ভারতীয় যুবক-যুবতী, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার খরস্রোতে ভাসমান। তাহার নিজস্ব যে একটী সভ্যতা ছিল বা আছে, সে বিষয়ে সে একেবারে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে সে অন্ধ। ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে সে সেকেলে অসভ্যতা, বর্ব্বরতা নামে আখ্যাত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ভারতের বেদ-বেদান্ত তাহার কাছে চাষার গান, ভারতের পুরাণ-তন্ত্রকে সে আবর্জ্জনারাশি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল! সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকে সে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিয়াছিল! ভারতীয় সভ্যতার কোন দৃঢ় ভিত্তিই সে আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না, যাহার উপর সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই প্রকার দুর্দ্দিনে যখন ভারত পতিত, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের জন্য একজন লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হইল। এই মহাপুরুষের নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

বর্ত্তমানে পরস্পর বিবদমান ধর্ম্মসংঘ-মধ্যে "সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়"-শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বিশিষ্ট দান। জগতে আজ পর্য্যন্ত যত অবতার, ঈশ্বরকোটি বা সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে এই প্রকার কামকাঞ্চনত্যাগের ও সর্ব্বমতের সাধনা দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে কিনা, তাহা সুধীবর্গের বিবেচ্য ও আলোচ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, যত মত, তত পথ। যেমন এই কালী বাড়ীতে আসতে হ'লে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। * * ছাদের উপর উঠ্‌তে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটী উপায়। * * ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাক্‌তে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাক্‌লে দেখা পাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত 'যত মত

তত পথ'—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান সকলকেই ধর্ম্মসূত্র অবলম্বনে একতাবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন জাতিকে এক মহামানব-জাতিতে পরিণত করিবে; সম্প্রদায়গত, জাতিগত দ্বেষ-হিংসা, যাহার ফলে আজ ভারত বিভক্ত ও বিপন্ন, ইউরোপখণ্ড ধ্বংসমুখে পতিত ও অশান্ত, তাহা চিরতরে বিলীন হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু-ইস্‌লাম-খ্রীষ্ট প্রভৃতি বিবিধ মতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তাঁহার ভাবরাশি প্রচার করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ধর্ম্মপরায়ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তদীয় অমৃতময়ী উপদেশবাণী ও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও তদীয় উদার দিব্য ভাবরাশি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যোগদৃষ্টি-সহায়ে পূর্ব্বেই তিনি দেখিয়াছিলেন যে দুই শ্রেণীর চিহ্নিত ভক্তগণ তাঁহার নিকট ধর্ম্মলাভের জন্য যথাকালে উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ভক্ত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিবেন এবং স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী ধর্ম্মের মহৎ, উদার ভাব সমাজে প্রচার করিবেন। এই শ্রেণীর ভক্তগণের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, কথামৃত-সঙ্কলয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বলরাম বসু, দুর্গাচরণ নাগ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি প্রধান। ইঁহারা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে নিজ নিজ ধর্ম্মজীবন গঠন করিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরুর আদেশে ও শিক্ষায় অনাসক্ত হইয়া সংসারাশ্রমে ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন— সংসারে বড় মানুষের বাড়ীর দাসীর মতো থেকো; সে যেমন মনিবের পুত্রকে, আমার হরি, আমার হরি বলে আদর যত্ন করে, এবং বাড়ীর যাবতীয় জিনিষকে আমার, আমার বলে কিন্তু মনে প্রাণে জানে যে ঐ পুত্র, জিনিষ পত্র সকলই মনিবের, তার নিজের কিছুই নয়: এই প্রকার তোমরাও সংসারে পুত্র, কন্যা সকলেরই যত্ন, সেবা করবে, কিন্তু মনে প্রাণে জানবে ওরা কেউ তোমার নয়, সকলই ভগবানের, তিনিই এই সংসারের কর্ত্তা ও মালিক, তুমি তাঁর দাস বা সন্তান। এই প্রকার 'পাকা' আমিকে অবলম্বন করে সংসারে থাকবে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর চিহ্নিত ভক্তগণ একে একে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন, তিনি ইঁহাদিগকে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের সাধনা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র, রাখাল, যোগেন, শরৎ, শশী, তারক, বাবুরাম প্রমুখ ভক্তগণ এই শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত। এই সকল ভক্তগণকে ত্যাগ ও সেবার পরিপূর্ণ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তদীয় ভাবরাশি-প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ করিলেন। কাশীপুরে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের পীড়াব্যপদেশে এই সকল বালকভক্ত শ্রীগুরুসেবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের লীলাসম্বরণের পর তদীয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ গুরুভ্রাতৃগণের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়, কামকাঞ্চন-ত্যাগাদর্শ, শিবজ্ঞানে জীবসেবা ইত্যাদি ভাবরাশি প্রচারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র-আলোচনা-প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে সিদ্ধপুরুষ না বলিয়া অবতার বলিব কেন? অবতার ও সিদ্ধপুরুষে প্রভেদ কি? এবিষয়ে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যিনি আমাদের ন্যায়ই জন্ম-জন্মান্তরের অবিদ্যাবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন-ভজন করিয়া মায়ামুক্ত হইয়াছেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ। তিনি ঈশ্বরের কোন একটী ভাব অবলম্বনে নিরন্তর সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করেন। রাম-

প্রসাদ, কমলাকান্ত, সর্ব্বানন্দ, রূপ, সনাতন, চণ্ডীদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষ; শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতার। অবতার কিন্তু কখনও আমাদের ন্যায় অবিদ্যাবন্ধনে বদ্ধ হন না। তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তাঁহার সাধনাদি চেষ্টা লোকশিক্ষার জন্যই। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। রাজা যেরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রজাদের কল্যাণ-কামনায় রাজ্যমধ্যে কখন কখন স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ জীবকুলকে শ্রেয়োমার্গ-নির্দ্দেশের জন্য মানবদেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মধ্যে আমরা দেব—মানব দুইটি ভাবই দেখিতে পাই, তাঁহার মধ্যে অলৌকিক ভাবরাশি কখনও কখনও প্রকটিত হইলেও, তিনি আদর্শমানব বলিয়া পূজিত হন। বহির্দৃষ্টিতে সিদ্ধপুরুষে ও অবতারে প্রভেদ কিরূপে লক্ষ্য করা যায়? সিদ্ধপুরুষের শিক্ষা, দীক্ষা, কার্য্য-কলাপ অল্পপরিসর ভূখণ্ডে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু অবতারের কার্য্য-কলাপ কোন দেশ বা মহা-দেশকে ছাইয়া ফেলে এবং কালক্রমে উহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়। সিদ্ধপুরুষ-বিশেষের প্রভাব তদীয় তিরোধানের দুই এক শতাব্দী মধ্যেই বিলীন হইতে দেখা যায় কিন্তু অবতারের আধ্যাত্মিক শক্তি যতই দিন যায় ততই জগতে ক্রিয়া করিতে থাকে। অবতার যখন আসেন, তখন কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহাকে সম্যক ধরিতে বুঝিতে পারেন কিন্তু যতই দিন যায় ততই তাঁহার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন—শাল প্রভৃতি বড় বড় সারবান্ গাছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দীর্ঘদিন লাগে কিন্তু সাধারণ বৃক্ষগুলি অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়।** গঙ্গায় যখন জাহাজ চলিয়া যায় তখন প্রথমে উহা টের পাওয়া যায় না কিন্তু জাহাজ যাওয়ার পরেই উহার জল তোলপাড় হইয়া বিষম তরঙ্গের সৃষ্টি করে। অবতারের ইহধাম হইতে চলিয়া যাওয়ার পরেই মানবসমাজের সাধারণ স্তরের লোকমণ্ডলী তাঁহার প্রভাব অনুভব করিতে থাকে।* *অবতারের জ্ঞান যেন সূর্য্যের আলো (স্বতঃপ্রকাশ), সিদ্ধপুরুষের জ্ঞান যেন চন্দ্রের আলো। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে আসে, তখন কত লোক তার উপরে চড়ে চলে যায়; তাতে সে ডোবে না। সামান্য একখানা কাঠে একটা কাক বসলে অমনি ডুবে যায়। তেমনি যখন অবতারাদি আসেন, কতশত লোক তাঁকে আশ্রয় করে তরে যায়। সিদ্ধ-পুরুষ নিজে কষ্টে সৃষ্টে যায় মাত্র। রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মাল বোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে যায়; অবতারেরাও সেই রকম সহস্র সহস্র লোককে ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধন-তপস্যাদি সকলই লোকশিক্ষার জন্য। তিনি বলিতেন—জগন্মাতা স্বয়ংই এই খোলটা (নিজের দেহ দেখাইয়া) আশ্রয় করিয়া আছেন। ঈশদূত যীশুখৃষ্টও অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন, "I and my Father are one." অর্থাৎ আমি এবং আমার পিতা ঈশ্বর একই সত্তা। "He that followeth me walketh not in darkness." অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে, সে অবিদ্যান্ধকারে ঘুরিয়া মরে না। অবতার-পুরুষ নিজের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও দিব্যশক্তি উপলব্ধি করিয়া যেভাবে ভক্তকে অভয় দিয়া থাকেন, সিদ্ধপুরুষ তেমনি করেন না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

তুমি সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। শোক করিওনা; আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবও ঐভাবেই বলিয়াছেন—এখানে (আমার উপর) ভক্তি থাকলেই হবে। যারা আমাকে ডাকবে, তাদের জন্য অন্তিমে আমাকে দাঁড়াতে হবে। * * কিছু যদি না পারিস্, আমাকে বকলমা দে (আমার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর)।

অবতার ও সিদ্ধপুরুষে শক্তির বিশেষ তারতম্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলাসংবরণ করিয়াছেন আজ মাত্র ষাট বৎসর। এই স্বল্প-কাল মধ্যেই তদীয় ভাবরাশি পৃথিবীর নানাস্থানে—ভারতে ও ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর নগণ্য পূজারী, যিনি একটী পাড়াগেঁয়ে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই ছিলনা, তাঁহাকে আজ কোটী কোটী লোক ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে—ইহা অপেক্ষা শক্তির খেলা আর কি হইতে পারে? অবতার ও সিদ্ধপুরুষ উভয়েই কামকাঞ্চনত্যাগী ও সর্ব্বোপরি লোকমান্য-স্পৃহা-বর্জিত। তর্কযুক্তি-সহায়ে অবতারকে বুঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অল্পেতেই গুলাইয়া যায়। অনন্ত ঈশ্বর কিরূপে সান্ত মানবরূপে আবির্ভূত হন, ইহা আমাদের মানুষবুদ্ধির অতীত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—একসের ঘটীতে কি চারসের দুধ ধরে? সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারজন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিলেন। সকলে ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে, কেউ সাধু ভাবে, দুচার জন অবতার বলে ধরতে পারে।

স্বীয় অবতারত্ব সম্পর্কে গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

অবিদ্যাগ্রস্ত মূঢ়গণ সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার পরম ভাব বিদিত হইতে না পারিয়া মানবদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। গীতার দশম অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু বিচারশীল-মনবুদ্ধি-বিশিষ্ট অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥"

অর্জ্জুন কহিলেন, "তুমি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম, এবং পরম পবিত্র। তুমি নিত্যপুরুষ, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদেবের আদি, জন্মহীন ও বিশ্বব্যাপী। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, এবং ব্যাস তোমাকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমিও স্বয়ং আমাকে এইরূপ বলিতেছ।" শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার অবতারত্ব নিজমুখে স্বীকার করিলেন, তখনই অর্জ্জুনের দৃঢ় প্রতীতি হইল। স্বীয় অবতারত্ব প্রতিপাদনকল্পে ভক্তদের উদ্দেশ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন বাণী আছে কিনা দেখা যাউক। কাশীপুর উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন ক্যান্সার রোগে কাতর হইয়াছেন, ভাতের তরল মণ্ড পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না, তখন একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট বসিয়া ভাবিতেছেন,—এই যন্ত্রণামধ্যে যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার, তা হ'লে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে অন্তর্য্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ। ভগবান নিজে ধরা না দিলে তাঁহাকে ধরা মানুষের সাধ্যাতীত। যখনই শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্বগ অবতারগণের যথা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্যদেব ও যীশুর দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছেন, তখনই দেখিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহার মধ্যে মিলিয়া গেলেন। ইহাতেও

তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তিনি এবং পূর্বগ অবতারগণ অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,--দেখলাম ঈশ্বর আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি। আর একদিন তিনি মাষ্টার মহাশয়কে (শ্রীম) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি মনে হয়? মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—আমার বোধ হয় তিন জনই এক বস্তু—যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি এক ব্যক্তি। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,—এক এক! এক বই কি! দেখছনা তিনি (ঈশ্বর) যেন এর উপর এমন করে রয়েছেন। তিনি নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন—যেন বলছেন ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে রয়েছেন। আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন,—দেখ্‌লাম খোলটা (দেহটা) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল। এসে বল্লে আমি যুগে যুগে অবতার * * দেখ্‌লাম পূর্ণ আবির্ভাব; তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য।

যাঁহার মধ্যে শ্রীবুদ্ধের বিশাল হৃদয়, শ্রীশঙ্করের পূর্ণ জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রেম, শ্রীঈশার আত্মবলিদান একাধারে বর্ত্তমান, যিনি পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত, অবিশ্বাসী, আত্ম-বিস্মৃত জনগণের পারমার্থিক সত্তা জাগ্রত করার জন্য দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন এবং জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগ, দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত মার্গের ও অন্যান্য ধর্ম্মমতের সমন্বয় সাধন করিয়া চিরবিবদমান ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে সাম্য-মৈত্রীর বীজ উপ্ত করিয়াছেন, জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতার কুফলদর্শনে যিনি ধর্ম্ম-ভিত্তিতে জাতি-গঠনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, নিজে নিরক্ষর হইলেও যাঁহার বাণী ইতোমধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচারিত হইয়া নবজাগরণ আনিয়া দিতেছে, যিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক জীবন বেদ-বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ, যিনি ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, সেই লোকগুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বতোমুখী ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া আমরা যেন ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন গঠনে সচেষ্ট হইতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুরথ নাথ সরকার, এম্‌-এস্‌সি

'অমৃতের পুত্র' মোরা কী আশ্চর্য কালের বিধান!
ভুলিয়াছি লক্ষ্য মোরা আনন্দের গান:
দুঃখদীর্ণ জরাজীর্ণ দৈন্য-হতমান্‌
কোনমতে চলিয়াছি বহিয়া পরাণ:
জড়ের সংঘর্ষে আজি দিকে দিকে তীব্র হলাহল,
ছেয়ে দিল ধরণীরে লুপ্ত করি প্রশান্ত মঙ্গল—
অভিমানী বুদ্ধি আজি স্বাধিকার-গর্ব কুতূহলে
হারায়েছে আপনারে মুহূর্তের ভুলে।
অকল্যাণ এলো নেমে, শিব হলো রুদ্র খরতর
অশান্তির কালো ছায়া, সংশয়ের ঝড়
নেমে এলো বিশ্বমাঝে মানুষের চেতনার পরে;
ক্লেদলিপ্ত মহাসত্য মিথ্যা দম্ভভারে।
ভাবিতেছি জীবনের গাঢ়তম মহা অন্ধকারে
তরঙ্গসঙ্কুল ক্ষুব্ধ অকূল পাথারে,
নাহি আলো নাহি আশা নবারুণ রেখা
তৃষাদীর্ণ বালুচরে মায়া-মরীচিকা!
সবার উপরে হেরি সুধাময় নাম,
'পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর—মহাপুণ্যধাম।'

হে ঠাকুর, হে লোকগুরু মহাজন,
তোমার স্মৃতিতে ঘেরা পুণ্য তপোবন;
শান্ত স্মিত পরিপূর্ণ হাসি
একদা উঠেছে হেথা আপনি বিকাশি,
নবরূপে নবরসে নবছন্দভারে
ভরে দিল মহামৃতে শূন্য ধরণীরে।
হেরি আজো মানস নয়নে,
ঋষিকণ্ঠ-মুখরিত মধু সামগানে
ভারতের চিরন্তনী বাণী,—
বহিয়া চলেছে সারা ধরিত্রীরে টানি'
মহামুক্তির মহাপথে,
পূর্ণতার সাধনায়, রিক্ততার জয়রথে।
আজো তার সাড়া পাই আকাশে বাতাসে,
প্রতি ধূলিকণামাঝে প্রতিটি নিঃশ্বাসে,
সেই বাণী আছে যুগে যুগে বাঁচি—
'হে পথিক! ভয় নাই আছি, আমি আছি।'

গীতায় কর্ম্মযোগ

অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ রায়, এম-এ

গীতার কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে প্রথমেই শঙ্কর, আনন্দগিরি, মধুসূদন, শ্রীধর প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের গীতাভাষ্য এবং আধুনিক মনীষিগণের ব্যাখ্যা দেখার প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি যে ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে গীতার কর্ম্মযোগ বুঝিবার যথেষ্ট সহায়তা হয়।

এখানে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, কোন সাধকের জন্য গীতোক্ত সাধনতত্ত্বও ব্যাখ্যা করি নাই। সরলভাবে ও নিরপেক্ষ হইয়া গীতার কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, এই কর্ম্মযোগের সহিত আমাদের মত সাধারণ জীবের দৈনন্দিন জীবনের কোন যোগসূত্র আছে কি না তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। অনেকের ধারণা গীতা ত্যাগশাস্ত্র, এবং কঠোর ভাবে ত্যাগ সাধন না করিলে গীতার কর্ম্মযোগ পাঠে বা ব্যাখ্যায় কোন ফল হয় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র ত্যাগী পুরুষের জন্যই গীতার উপদেশ, ইহাতে সাধারণের জীবনযাত্রার পথে কোন অবলম্বন দেওয়া হয় নাই। আমরা এই মত স্বীকার করিতে পারিলাম না। একথা সত্য যে গীতায় ত্যাগ ও সাধনপ্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং পরম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও ভক্তি অর্জ্জনের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে আপামর নর-নারীর কল্যাণের জন্য পথনির্দ্দেশ ও উপদেশ গীতায় আছে। আমরা এখানে যে ব্যাখ্যা দিতেছি তাহাতে সাধারণের জীবনের সহিত গীতোক্ত উপদেশের যে সম্বন্ধ তাহা দেখানই প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্ম্মযোগ কি ?

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে কর্ম্মযোগ কি? কর্ম্মযোগের সরল অর্থ নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, এবং পরিশেষে জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্তি হয়। এখন বুঝিতে হইবে নিষ্কাম কর্ম্ম কি এবং কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয় বিচার করিবার পূর্ব্বে 'কর্ম্ম' ও 'যোগ' এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কর্ম্মের অর্থ সকল প্রকার দৈহিক, মানসিক ও বাচিক কর্ম্ম। এমন কি ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মও কর্ম্ম। 'ভূত-ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।' (গীতা ৮।৩) অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে ভূতভাব বা জীবভাবের উদ্ভবকারী যে বিসর্গ বা বিশেষ সৃষ্টি তাহার নাম কর্ম্ম। অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম 'বহু হইব' এই কামনা করিয়া আপনার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ত্যাগ করিয়া সবিশেষ জগৎ রূপে প্রকাশিত হইলেন। প্রকৃতিরূপা যোনিতে ব্রহ্ম গর্ভস্থাপন করিলেন অর্থাৎ কর্ম্মশক্তির সঞ্চার করিলেন এবং তাহা হইতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব-ভূতের উদ্ভব হইল। এই কর্ম্মশক্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং কর্ম্মই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। কর্ম্ম সম্বন্ধে আর যে সব কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

'যোগ' এই শব্দের অর্থ পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া। মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে পরম পুরুষে স্থির রাখিয়া তাঁহার ধারণায় সতত নিযুক্ত থাকাই যোগ। অর্থাৎ পরমেশ্বরে চিত্তের অবিচ্ছিন্ন গতি ও তৎপ্রসাদে পরমপদ লাভ ইহাই যোগের অর্থ। গীতায় যোগের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে 'সমত্বং যোগ উচ্যতে' (২।৪৮) অর্থাৎ চিত্তের সাম্যাবস্থা অথবা সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় প্রভৃতিতে একত্ব-বোধই যোগ। এই যে চিত্তের বিক্ষেপশূন্য অবস্থা ইহা পাতঞ্জল যোগের লক্ষ্য, কিন্তু পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—'যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ', অর্থাৎ চিত্তের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির সম্পূর্ণ লয়, এবং এই যোগের লক্ষ্য আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি। গীতায় এই প্রকার যোগ স্বীকার করা হইলেও ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। গীতোক্ত যোগের উদ্দেশ্য পরমপদ-প্রাপ্তি এবং পুরষোত্তমের সাক্ষাৎকার। গীতায় কেবলমাত্র ধ্যানযোগ বা জ্ঞানযোগের কথা বলা হয় নাই; কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে, এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করা হইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে ভক্তির আবির্ভাব, এবং জ্ঞানভক্তি-যুক্ত কর্ম্ম-সাধন নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে।

কর্ম্মবন্ধন

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। উপনিষদ বা বেদান্ত এবং সমস্ত আস্তিক দর্শন শাস্ত্রেই কর্ম্মই বন্ধনের হেতু বলা হইয়াছে। অবশ্য আত্মার বন্ধন নাই, কারণ আত্মা চিৎস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ, এবং তিনি অকর্ত্তা, অতএব কর্ম্মের বন্ধন আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। অর্থাৎ মায়া বা অজ্ঞান বশতঃ আমরা মনে করি 'আমি কর্ত্তা', এবং প্রকৃতির বশে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হই। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন এইরূপ যথার্থ জ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ মুক্ত হন এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব অবিবেক বা অজ্ঞান নাশ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়। যতক্ষণ ঐ অবিবেক থাকিবে ততদিন জীব বদ্ধাবস্থায় থাকে এবং সুখ-দুঃখে বিচলিত হয়, কর্ম্মফল ভোগ করে। কিন্তু অজ্ঞান দূরীভূত হইলে জীব আত্মস্থ হয় এবং সেই অবস্থায় কর্ম্ম করিলেও বন্ধন হয় না।

কিন্তু গীতায় কেবলমাত্র আত্মস্থ হওয়াকে জীবনের সার্থকতা বলা হয় নাই। গীতার উপদেশ ভগবানে প্রাণ ও মন সমর্পণ করিয়া পরমপদ লাভ করা। পরমেশ্বর-প্রাপ্তিই গীতার চরম লক্ষ্য এবং পরমেশ্বর-তত্ত্ব বা পুরুষোত্তম-তত্ত্বই গূঢ়তম রহস্য এই কথা বলা হইয়াছে। পরাগতি লাভ করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে সমস্ত জগতের জন্য হিত কার্য্য সম্পাদন করা জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে। নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে কার্য করা কর্ত্তব্য এবং ইহাই জীবনের চরম পরিণতি।

কিন্তু সন্ন্যাসমার্গী জ্ঞানযোগিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম-দর্শন-অভিলাষে কর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দেন। কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, অতএব কর্ম্মত্যাগ মুক্তির উপায়। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইলে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। গীতা এই মত স্বীকার করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল—'কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ' (৩।৮)। কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব, কারণ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। আর এক কথা এই যে সমাজে অকর্ম্মের আদর্শ গড়িয়া তুলিলে সকলেই অকর্ম্মা হইয়া উঠিবে এবং ইহাতে সংসারের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। এমন কি ভগবান স্বয়ং সর্ব্বদা

কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন যদিও তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। অতএব কর্ম্ম করাই শ্রেয়, অকর্ম্ম আদর্শ হইতে পারে না।

কর্ম্মতত্ত্ব

কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় বিশেষভাবে আলোচনা আছে। কর্ম্মের কারণ, কর্ম্মসংগ্রহ, কর্ম্মচোদনা প্রভৃতির ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হইল।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ (১৮।১৪)

কর্ম্মের পাঁচটি কারণ—আশ্রয়, চিৎ-অচিৎ গ্রন্থি অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই বারোটি করণ, প্রাণাদির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য এবং দৈব বা ঐশী শক্তি। এই পাঁচটি কর্ম্মের কারণ অর্থাৎ এই পাঁচটির সাহায্যে কর্ম্মসাধন হয়। দৃষ্টান্ত দিতেছি—আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, এখানে আমার শরীরকে আশ্রয় করিয়া এই কর্ম্ম হইতেছে; আমি লিখিতেছি এই অহংজ্ঞান এখানে বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমি বিষয় গ্রহণ করিতেছি, মন ও বুদ্ধির দ্বারা তাহার বিচার করিতেছি, এবং হস্তের দ্বারা লিখিতেছি, এই কার্য্যের মূলে প্রাণাদি ক্রিয়া চলিতেছে নচেৎ আমি লিখিতে পারিতাম না, আমার চেষ্টা (mental & bodily effort) চলিতেছে, এবং ঐশী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি লিখিতেছি, ফলাফল কতকটা তাহার উপর নির্ভর করে—অনুকূল পরিবেশে সফলতা এবং প্রতিকূল অবস্থায় নিষ্ফলতা। সৎ ও অসৎ সমস্ত কার্য্যই এই পাঁচটির সাহায্যে হয় বলিয়া উহা কর্ম্মের পঞ্চ কারণ বলা হইয়াছে। এই পাঁচটি কারণের সাহায্যে সমস্ত কায়িক, মানসিক ও বাচিক কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে।

যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু বা প্রেরণা তিনটি—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। অর্থাৎ ইষ্ট বা অনিষ্ট এই বোধ, সেই ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় এবং যাহার আশ্রয়ে জ্ঞানের বিকাশ অর্থাৎ জ্ঞাতা, এই তিনটি কর্ম্মচোদনা বা কর্ম্মের প্রেরণা বলা হইয়াছে। যিনি জ্ঞাতা তিনি ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় বিচার করিয়া ইষ্ট ও অনিষ্টের জ্ঞান লাভ করেন, এবং ইষ্টের প্রতি রাগ ও অনিষ্টের প্রতি দ্বেষ বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। যেমন, যদি কেহ আহার্য্য বস্তু কোনটি ইষ্ট বা কোনটি অনিষ্ট জানিতে পারেন তাহা হইলে ইষ্টের প্রতি রাগ ও অনিষ্টের প্রতি দ্বেষ বশতঃ তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তির চেষ্টা এবং অনিষ্টবর্জ্জন করেন।

আরও বলা হইয়াছে যে করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি সমস্ত ক্রিয়ার আশ্রয়। "ক্রিয়াম্বয়ি কারকম্"—ক্রিয়ার সহিত অন্বয় বা সম্বন্ধযুক্ত কারক। করণ কারক, কর্ম্ম কারক, ও কর্তৃ কারক, অর্থাৎ যে কোন ক্রিয়ার সহিত ইহারা সম্বন্ধযুক্ত। এখানে করণ অর্থে ১০টি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। কর্ম্মের অর্থ কর্ত্তার অভিপ্রেত বিষয়, এবং কর্ত্তার অর্থ অহংবুদ্ধি। যে কোন কার্য্যে অভিপ্রেত বিষয় থাকে, অহংরূপ কর্ত্তার কর্তৃত্ব থাকে, এবং করণ দ্বারা ক্রিয়ার সাধন বুঝায়।

ত্রিগুণভেদে কর্ত্তা ও কর্ম্ম তিন প্রকার। সাত্ত্বিক কর্ত্তা সেই ব্যক্তি যিনি ফলে অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, উদ্যমযুক্ত, কর্ম্মের সিদ্ধিতে হর্ষ শূন্য বা অসিদ্ধিতে বিষাদশূন্য। রাজসিক কর্ত্তা বাসনাকুল-চিত্ত, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী, এবং হর্ষ-শোকান্বিত। তামসিক কর্ত্তা অসমাহিত, অসংস্কৃত-বুদ্ধি, অনম্র, বঞ্চক, স্বার্থবশতঃ পরবৃত্তি-ছেদনকারী, কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিহীন, অপ্রসন্নস্বভাব এবং দীর্ঘসূত্রী।

ত্রিগুণ ভেদে কর্ম্মও তিন প্রকার—ফলাভিলাষ-রহিত ব্যক্তির রাগ ও দ্বেষ বর্জ্জনপূর্ব্বক যে আসক্তিশূন্য নিত্যকর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম। ফলকামনাযুক্ত এবং অহংকারযুক্ত হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহা রাজসিক কর্ম্ম, এবং ভাবী শুভাশুভ ফল বিচার না করিয়া অন্যের

অপকার হেতু অবিবেক বশতঃ যে কর্ম্ম তাহা তামসিক কর্ম্ম।

অজ্ঞানীর 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান থাকে কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি বুঝেন যে প্রকৃতিবশে আমরা কর্ম্ম করিতেছি, আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী হত্যা করিলেও হত্যার অপরাধী হন না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কর্ম্মসাধন এবং লৌকিক দৃষ্টিতে কর্ম্মসাধন, এই দুয়ের পার্থক্য এখানে দেখান হইয়াছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা অক্রিয়, দ্রষ্টামাত্র।

যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে এক অবিভক্ত অক্ষর আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হয় সেইরূপ আত্মদর্শনকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হইয়াছে। এইরূপ জ্ঞানীর কার্য্য তাঁহার বন্ধনের কারণ হয় না। অতএব কর্ম্মত্যাগ করা মুক্তির উপায় নয়, কর্ম্মফলত্যাগই মুক্তির উপায়। মোহবশতঃ আমরা কর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি আসক্তি ও ফলত্যাগ করেন, এইরূপ ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান

এখন আমরা এই কর্ম্মতত্ত্ব আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখাইয়া দিয়াছে যে জীবের সমস্ত কার্য্যের মূলে প্রেরণা আছে, এই প্রেরণা বা হেতু (motive) ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। হৃৎপিণ্ডের কাজ, ফুসফুসের কাজ, পাকস্থলীর কাজ বা গ্রন্থির কাজের মূলে প্রেরণা বা impulse আছে। সমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার মূলে চোদনা আছে। এই প্রেরণা বা চোদনা নিছক nerve impulse হইতে পারে অথবা মানসিক ইচ্ছা সম্ভূত হইতে পারে। মনের ইচ্ছা (wish) সংজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে থাকিয়া শারীরিক ক্রিয়া প্রণোদিত করে। যেমন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্ত উত্তোলন করিতে পারি, অথবা কোন অজানা বাসনাপরিতৃপ্তির জন্য বার বার হস্ত প্রক্ষালন করিতে পারি।

এইরূপে সমস্ত কর্ম্মই প্রেরণাসম্ভূত। মানুষের প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে সে প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া সদা সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। এক অনিবার্য্য নিয়তির (determinism) বশবর্ত্তী মানুষ কাজ করিয়া যাইতেছে জীবনযাত্রার জন্য, সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষার জন্য, জীবনের পরিণতির জন্য। অতএব তাহার স্বাধীনতা কোথায়? প্রকৃতিকে স্বায়ত্তে আনা মানব-সভ্যতার পরিচায়ক এবং এইরূপে সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ জীবনের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে। সৌন্দর্য্য, সত্য এবং কল্যাণ মানব-জীবনের আদর্শ এবং এই আদর্শই মনুষ্যজাতির গর্ব্বের বিষয়। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে মানব-মনের কয়েকটি আদিম ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে। যে কোন এক সংস্কৃতির রূপ আমাদের মৌলিক বাসনার আধারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতএব একথা স্বীকার করিতে হইবে যে মানব বাহ্য প্রকৃতিকে বশে আনিয়াছে বটে কিন্তু সে তাহার নিজের প্রকৃতির দাস। তাহার মনের বাসনাগুলিকে সে সংযত করিতে অথবা তাহাদের গতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু তথাপি এই বাসনার গণ্ডির বাহিরে যাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

আমাদের মনের দুইটি মৌলিক গতি আছে—সুখে লিপ্সা এবং তাহা পাইবার চেষ্টা, এবং দুঃখবর্জ্জন ও দুঃখপূর্ণ অবস্থা হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা। মৌলিক বাসনা যৌন হউক অথবা লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা হউক, সুখে লিপ্সা ও দুঃখবর্জ্জন স্বাভাবিক মনের গতি। বিক্ষিপ্ত অথবা বিকারগ্রস্ত মন লইয়া মানুষ দুঃখেও সুখ পাইতে পারে, তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে

অবাধ সুখসম্ভোগেচ্ছা মানবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। পরিস্থিতির তাড়নায় তাহার অবাধ সুখসম্ভোগ সম্ভব নয়, এবং সেইজন্য মানব বিভিন্ন উপায়ে তাহার সুখলিপ্সা চরিতার্থ করিতেছে।

মানব-প্রকৃতির ও মানব-মনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রবৃত্তি এবং প্রেরণার বশীভূত হইয়া মানব সমস্ত কাজ করিতেছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করাই মানব-জীবনের মহত্ত্ব; এবং এই সংযম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের আদর্শের ভিত্তিস্বরূপ।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম

গীতায় প্রকৃতিবশে মানুষের কর্ম্ম অনুষ্ঠানের কথা বার বার বলা হইয়াছে। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। (৩।৫) প্রকৃতি-জাত গুণের দ্বারা চালিত হইয়া সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য। প্রত্যেকেই এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন। প্রকৃতির নিগ্রহ অর্থাৎ শাসন বা নিষেধ কে করিবে?— নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি (৩।৩৩)। অর্জ্জুনকে ভগবান বলিলেন, তুমি যুদ্ধ করিবে না বলিতেছ কিন্তু তোমার প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়স্বভাব তোমাকে যুদ্ধ করাইবে। অজ্ঞানবশতঃ যাহা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছ তাহা স্বভাবপ্রণোদিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিবে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে স্বীয় প্রকৃতির নিগ্রহ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবজ কর্ম্ম বা সহজ কর্ম্ম (১৮।৪৮) দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা উচিত নয়। একথা বলার অর্থ এই যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা অনুচিত। কারণ পূর্ব্বসংস্কার-প্রযুক্ত কর্ম্ম করিলে দোষ হয় না যদি এইরূপ জ্ঞান থাকে যে আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছি, রাগদ্বেষবশতঃ নহে। নিজ নিজ স্বভাব ত্যাগ করা কিংবা উহা ত্যাগ করিয়া অন্য স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম করা সর্ব্বনাশের কারণ হয়। অর্থাৎ এইরূপ মনের গতি কল্যাণকর হইতে পারে না। যে যেমন অবস্থায় আছে এবং যেরূপ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই অবস্থায় থাকিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারে যদি সে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য করে, ফলের আকাঙ্ক্ষায় নহে। সেইজন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর (৩।১৯)। আমরা সাধারণতঃ রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করি। সংযমের দ্বারা রাগ-দ্বেষশূন্য হওয়া যায়। অর্থাৎ সংযমী পুরুষ রাগ বা দ্বেষ দ্বারা বিচলিত হন না।

কাণ্টের মত

মহামতি কাণ্টও duty for duty's sake নৈতিক জীবনের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনিও নীচের প্রকৃতির (lower self) কামনা বা সুখলিপ্সা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (practical reason) দ্বারা চালিত হইয়া নৈতিক জীবন গঠিত করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি যে Kant নীচের প্রকৃতি এবং উচ্চস্তরের প্রকৃতি (rational self) এই দুয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র দেখাইতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহার নীতিবাদ অপ্রযোজ্য (unpractical) এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান এই দুয়ের যোগসূত্র দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যে অবস্থায় আছেন তিনি সেই অবস্থায় থাকিয়া কর্ত্তব্য পথে চলিতে পারেন। তাঁহার কর্ত্তব্য সংযম শিক্ষা করা এবং বিধিসঙ্গত কার্য্য করা। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঈশ্বরবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে না পারিলে সমস্ত কর্ম্ম ব্যর্থ হইবে।

বুদ্ধিযোগ

ঈশ্বরবুদ্ধি হওয়া সামান্য কথা নয়। সর্ব্বত্র বাসুদেব-দর্শন এই বুদ্ধির চরম পরিণতি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বাসুদেব এইরূপ জ্ঞানে যিনি কার্য্য করেন তিনি মুক্ত, তিনি জ্ঞানী। কিন্তু এইরূপ বাসুদেবজ্ঞান বা সমগ্রজ্ঞান কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে? সর্ব্বাত্মজ্ঞান যাঁহার আছে তিনি মহাত্মা এবং এইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ—স মহাত্মা সুদুর্লভঃ (৭।১৯)। সাধারণ মানুষ এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না। এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে একনিষ্ঠ বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্বদা পরমেশ্বরের আরাধনা ও তাঁহার শরণাগত হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু এই বুদ্ধির দুইটি দিক আছে—এক দিকে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া বহুধা বিভক্ত হয় এবং এইরূপ বুদ্ধিকে অব্যবসায়ী বুদ্ধি বলা হয়। অপর দিকে বুদ্ধি বাহ্য বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া অন্তর্মুখী হয় এবং একনিষ্ঠ হয় এবং এই বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হয়। এই একনিষ্ঠ বুদ্ধি সাত্ত্বিক বুদ্ধি, শান্ত স্থির বুদ্ধি। এই সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রবল হইলে ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হয় এবং নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। একনিষ্ঠ বুদ্ধি পরমেশ্বরে যুক্ত থাকিতে সহায়তা করে এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করা অন্য কাম্য কর্ম্ম করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ (২।৪৯), অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ পূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্ম নিকৃষ্ট। অতএব বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ—যোগবুদ্ধির আশ্রয় প্রার্থনা কর, যাহারা ফলের আশায় কর্ম্ম করে তাহারা দীনাশয়। যোগবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মোৎপন্ন পাপপুণ্যের ভাগী হন না। বুদ্ধি জড়তত্ত্ব বটে কিন্তু সাত্ত্বিক বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মক বা নিশ্চয়াত্মিকা এবং ইহার গুণ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য (অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্। সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামস-মস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্॥ (সাংখ্যকারিকা, ২৩)। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া চিত্ত পরমেশ্বরে যুক্ত রাখা এবং নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করাই বুদ্ধিযোগ।

যজ্ঞ

ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের অর্থ ত্যাগ, সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে ন্যস্ত করা যজ্ঞের অভিপ্রায়। কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্ম বিশুদ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ বন্ধনের কারণ হয় না, কিন্তু অন্যরূপ কর্ম্ম জীবের বন্ধনের কারণ হয় (৩।৯)। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি দ্রব্যযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া ভাবনাময় জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ধ্যাননিষ্ঠগণ জ্ঞানরূপ তৈলে প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম এবং প্রাণবায়ুর কর্ম্ম আহুতি দেন, অর্থাৎ মনঃসংযম দ্বারা উঁহাদের কর্ম্মপ্রবণতা নিবারণ করিয়া আত্মায় চিত্ত স্থির রাখেন। যিনি প্রকৃত সংযমী ব্যক্তি তিনি ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হওয়া সত্ত্বেও রাগ বা দ্বেষযুক্ত হন না।

সংযম

এই সংযমকে পাতঞ্জল যোগসূত্রে "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" (বিভূতিপাদ, ৪র্থ সূত্র)—ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একত্র সমাবেশ সংযম। এইরূপ সংযমের দ্বারা চিত্ত স্থির হয় এবং প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত হয়। ইহা কষ্টসাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিয়া যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

যে কোন মানুষ প্রকৃতির দাস কিন্তু তাহার

কর্ত্তব্য প্রকৃতিকে বশে আনা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রকৃতিকে বশে আনিয়া মানুষ সভ্য হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্য প্রকৃতিকে স্বায়ত্তে আনিলে চলিবে না। সভ্যতা বা সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, কিন্তু এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে হইলে মানুষের কর্ত্তব্য তাহার নিজের প্রকৃতিকে বশে আনা। ইন্দ্রিয়গণকে মনে মনে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাঁহারা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন তাঁহাদের জীবন সার্থক হয়। কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া যদি কেহ মনে মনে বিবিধ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কাল যাপন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন ব্যর্থ হয়। বাহিরে কর্ম্মত্যাগ ও অন্তরে বিষয়চিন্তা কপটাচার মাত্র।

স্বধর্ম্ম

এই বিচিত্র কর্ম্মময় জগতে যাহার অংশে যেটুকু কর্ম্মের ভার পড়িয়াছে তাহাকে সেই কাজ করিতেই হইবে—ইহাই তাহার স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্ম চর্চ্চা ভয়াবহ, কারণ তাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় না (৩.৩৫)। এই স্বধর্ম্ম-পালন প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম যজ্ঞার্থাং অথবা তদর্থং কর্ম্ম হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রীতির জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সংযত চিত্তে করিতে হইবে। কর্ম্মের ফলে যেন আসক্তি না থাকে। কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে বিচলিত না হইয়া, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মবন্ধন হয় না।

গীতার নির্দ্দেশ

পরমেশ্বরে যুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম করা গীতার মুখ্য নির্দ্দেশ। পূর্ব্বে এ কথা বলিয়াছি যে আমাদের দুইটি প্রবৃত্তি কর্ম্মে নিয়োজিত করে—সুখে রাগ বা রঞ্জনা এবং দুঃখে দ্বেষ বা বিরক্তি। যতদিন এই দুইটি প্রবৃত্তির বশে মানুষ কাজ করিবে ততদিন তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মবন্ধন এড়াইতে হইলে রাগ ও দ্বেষ বর্জ্জন আবশ্যক। রাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় যোগ—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্, কর্ম্মসমূহের মধ্যে যোগ একটি কৌশল, কারণ ইহা দ্বারা আমরা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি। মনের বা চিত্তের সমতাই যোগ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সমতা-লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরবুদ্ধি হওয়া দরকার। এইরূপে কর্ম্মফল-ত্যাগ সম্ভব হয় এবং পরমপদ প্রাপ্তি হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগের বিভিন্ন পন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এইগুলি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। প্রথমে কর্ম্মের সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং এই কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের উদয় হয়। আমি কর্ত্তা নই, প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমি কর্ম্ম করিতেছি বটে কিন্তু তাহার ফলে আমার অধিকার নাই। এই সাধনার ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়। আমি ও পরমাত্মা যে অভিন্ন এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়। যাহা কিছু দেখিতেছি বা যাহা কিছু করিতেছি সমস্তই তাঁহার শক্তির প্রকাশ। আমি কর্ত্তা নহি, আমার সত্তা আছে কিন্তু কর্ত্তৃত্ব নাই এবং আমার যিনি আসল 'আমি' তিনি পরমেশ্বর এই বোধ জন্মে। তিনি ইচ্ছা করায় তাঁহারই শক্তি এই জগৎ প্রকাশ করিয়াছে। তিনি প্রতি অণু পরমাণুতে অনুস্যূত হইয়াছেন। এই জগৎ লীলাময় ভগবানের প্রকাশ। ইহার অন্তরালে তিনি অধ্যাত্মতত্ত্ব।

এই জ্ঞান পরিপক্ক হইলে ভক্তির উদয় হয়। তখন ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন পরমার্থের জ্ঞান হয়। পুরুষোত্তমের স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাতে শরণাগতি আসে। তাঁহার রসাস্বাদন করিয়া তাঁহাতে সতত যুক্ত হইয়া থাকাই ভক্তিযোগ। এই ভক্তি নির্গুণ ভক্তি, ইহাই পরাভক্তি। পরাভক্তির লক্ষণ পুরুষোত্তমে অহৈতুকী ও অবিচ্ছিন্না চিত্তের গতি।

আমরা মূর্ত্তি পূজা করি কিন্তু এইরূপ পূজায় রাজসিক ভক্তির উদয় হয়। পরন্তু মূর্ত্তিকেই যদি ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করি তাহা হইলে পূজা ব্যর্থ হয়। অর্চ্চা পূজায় ভস্মে ঘি ঢালা হয়—যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বা অর্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ (ভাগবত, ৩।২৯।২২) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলিয়াছেন যে তাঁহাকে যে যে ভাবে পূজা করে তিনি তাহাকে সেই সেই ভাবে ভক্তি দিয়া থাকেন এবং তদ্রূপ ফল সে ভোগ করে। ফল জল পাতা যাহা কিছু ভক্তির সহিত প্রদান করা যায় তাহা ভগবান গ্রহণ করেন।

একথা ঠিক যে ভক্তিসাধন হিসাবে মূর্ত্তি-পূজা চলে এবং তাহাতে মনের একাগ্রতা জন্মে। কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে গীতার এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শিক্ষা নহে। পরমপুরুষে নিত্যযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই গীতার প্রধান শিক্ষা। ভক্তি লাভ হইলে ভক্তিতে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা প্রকট হয়, এবং ভক্ত সেই শক্তিকে সংসারের কল্যাণসাধনার্থ নিয়োজিত করেন। ভগবানে যাঁহার যথার্থ ভক্তি আছে তিনি ক্লীব কিংবা নিষ্ক্রিয় ভাবে চোখের জল বর্ষণ করেন না। তিনি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার স্বীয় শক্তি-প্রভাবে দমন করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

সম্বন্ধ-মতবাদ

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত, এম্-এস্‌সি (বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা)

সম্বন্ধতত্ত্ব

আপেক্ষিকতাবিদ্‌গণ মনে করেন যে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নিয়াই প্রতিভাত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান এবং সম্বন্ধ দ্বারাই সেই জ্ঞান লাভ হয়। এই সম্বন্ধতত্ত্বের সংবিদই জীবন। জগতের সঙ্গে আমরা যতই আত্মীয়তা বাড়াইয়া থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চেতনা যতই ইহার বিশাল 'পরিমাণ' প্রণালীতে ছড়াইয়া পরে (expand in vast system of dimensions) আমরা ততই স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করি এবং জীবনও ততই মহৎ হইতে থাকে। বৃদ্ধি, প্রসার, ব্যক্ততা, উপলব্ধি, ক্রমোন্নতি—এই সবের অর্থই জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়া।

সম্বন্ধতত্ত্বের দ্বারা পূর্ণতার পদ্ধতি নিম্নলিখিত বিষয় হইতে ভাল বুঝা যাইবে। ব্যক্ত বিশ্বকে একটি ঘূর্ণায়মান গোলক হিসাবে ধরা যাক্ এবং সেই গোলকের উপরিভাগে বিভিন্ন আকারের ও বর্ণের অসংখ্য বলকে বিভিন্ন জীবন মনে করা যাক্। সেই বলগুলির মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং সমগ্র সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে ব্যাহত না করিয়া কোনও বলকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে রাখা যায় না। কার্য্য ও কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ।

গোলকটি যেমন ঘুরিতে থাকিবে, বলগুলির পরস্পরের মধ্যকার সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া ঘর্ষণের দ্বারা তাহারা কিছু অংশ আদান প্রদান করে সেই হেতু তাহাদের বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্ত্তন হয়।

এই প্রকারে পরস্পরের মধ্যে অনবরত সংস্পর্শের ও পরিবর্ত্তিত সম্বন্ধের জন্য বলগুলি একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থাতে আসিয়া যায়। নৈসর্গিক নীহারিকাদলের মত তাহারা বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে সুব্যবস্থাতে আসিয়া পড়ে। তাহাদের রেখাগুলি পরস্পরের মধ্যে অসংখ্য

ভাবে জড়াইয়া যায় এবং বহুরূপদর্শক যন্ত্রের ছবির ন্যায় অসংখ্য ছবিতে ইহাদের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়।

এই ঘূর্ণায়মান গোলকের বলগুলিকে প্রাণহীন বস্তু হিসাবে মনে না করিয়া যদি সচেতন মনে করা হয় এবং যদি মনে করা যায় যে ইহাদের আকর্ষণী শক্তি আছে, বিচারবুদ্ধি আছে এবং পশ্চাতে কোনও উদ্দেশ্য ও পন্থা লইয়া পরস্পরের যোগাযোগ রাখে ও মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে তবে সহজেই বুঝা যাইবে যে বন্ধুত্ব কী ভাবে হয়, ব্যবসায় স্কুল ও পারিবারিক জীবনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়। যখন একে অন্যের সঙ্গে সজ্ঞানে মিশিতে থাকে, তখন কতই না আনন্দ হয়। শুধু তাহাই নয়: যে সমস্ত মেলামেশাতে এক এক জনের জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন হয়, সেই মেলামেশা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মনে করা যাক্ এই গোলকের কতকাংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অপরাংশ আলোকিত। যেমন জন্ম হইতে মৃত্যু ও মৃত্যু হইতে জন্ম, সেইরূপ তাহাদের ওজন ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিভিন্ন সময়ান্তরে বলগুলি আলো হইতে অন্ধকারে ও অন্ধকার হইতে আলোতে যাইতে লাগিল। যখনই তাহারা আলোকিত হয়, তখনই যেন তাহারা পরস্পরের সংস্পর্শে রূপান্তরিত হয় এবং অসংখ্য কালচক্রের পর তাহাদের বৈশিষ্ট্য এমন পরিবর্ত্তিত হয় যে তাহাদের পূর্ব্ব পরিচয় মনে করা যায় না। যতদিন না বলগুলি শুদ্ধ হয়, বর্ণহীন হইয়া একেবারে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরস্পরের মধ্যে একটি বৃহৎ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, ততদিন এমনিধারা চলিতে থাকে।

উপরোক্ত বল ও গোলকের উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত কি সম্বন্ধে আবদ্ধ, কি ভাবে নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহগুলি একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে; এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধই বা কি; কি প্রকারে বিদ্যালয়ে, অন্যের বৈষম্যের সহিত মীমাংসা করিয়া আমরা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং সমসুরে চলিতে পারি। ইহা সত্যি যে দাবার ঘুঁটির ন্যায় আমরা জীবনে কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক নিয়া আসিয়া থাকি কিন্তু এখানকার প্রতি চলাফেরার উপর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ভর করে।

আমাদের বয়স যতই বৃদ্ধি পায়, জগতের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ও আত্মীয়তা করিবার ক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পায়, অসংখ্য সুযোগ ও সম্ভাবনা আমাদের কাছে আসিয়া যায়, ফলে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিস্ময় সৃষ্টি হয়, বৃহত্তর জীবনের সচেতন কর্ম্মপন্থার জাগরণ হয় ও জগতের মহৎ বুদ্ধির সহায়ক হয়। কর্ম্ম-জগতের সঙ্গে যতই আমরা পরিচিত হই আমরা ততই তাহার নিয়মাবলী জানিতে পারি। আমাদের কাল্পনিক জগতের সংস্পর্শে যতই আসা যায়, আমরা ততই আমাদের অন্তর্জীবনের জ্ঞান লাভ করি এবং জীবনের সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধও জানিতে পারি। তাহা হইলেই বুঝা গেল আমরা যতই নিজদিগকে জানিতে পারি, বিশ্ব সম্বন্ধেও ততই বেশী জানিতে পারিব।

পরিমাণ সম্বন্ধে চিন্তাধারার নিয়মাবলী

(Laws of Dimensional Thinking)

মনই সম্বন্ধ সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়-সাহায্যে আমরা বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া থাকি এবং বস্তু উপলব্ধি করিয়া থাকি। মনই সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বস্তুগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।

আপেক্ষিকতা বলে মনের যন্ত্রই দেশ অর্থাৎ দেশ ও কালের বাহিরে মন কিছুই চিন্তা করিতে পারে না। চেতনা সার্ব্বভৌম। ইহাকে অন্তর্মুখী করিলে কল্পনাময় জগতের জ্ঞান লাভ করা যায় এবং বহির্মুখী করিলে বস্তুময় জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা সব কিছুতেই এক-কে দেখা যায়, সেখানে আত্মীয়তার সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সব কিছুকেই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায়, বহুগুণসম্পন্ন মানসিক জগৎকে দেখা যায়, বস্তুগুলির মধ্যে সম্বন্ধপূর্ণ রূপ-বিশিষ্ট জগৎকে দেখা যায়।

কাল্পনিক জগৎ অসীম; সেখানে গুণ ও ভাবকে বস্তু হইতে পৃথক রূপে চিন্তা করা হয়। বস্তুময় জগৎ মূর্ত্ত-বস্তুর জগৎ—দ্বৈত জগৎ; সেখানে বস্তু একটি ধ্রুব, অপর ধ্রুব শক্তি অথবা জীবন

এবং এই দুয়ের মিশ্রণে বস্তুময় জ্ঞানের প্রকাশ। মনই এই প্রকার জ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ এবং এই জ্ঞান রূপের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া দেয়; পদার্থও জীবনের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইয়া দেয়। এই যে বস্তুময় মানসিক জগৎ সেখানে সব কিছুই আপেক্ষিক। শুদ্ধ গুণ বলিয়া এখানে কিছুই নাই। বস্তুনিরপেক্ষ সংখ্যাগুলির ধারণাও নিরপেক্ষ নহে; কারণ সংখ্যাগুলি আত্মীয়তার পরিচায়ক। একমাত্র 'একক'ই শুদ্ধ, কারণ সাধারণ ধারণা হইতে ইহা মুক্ত। 'একক' দ্বারা প্রকাশিত নিরপেক্ষ 'কাল্পনিক' ও 'মূর্ত্ত' উভয়ই। ইহা জ্ঞান ও অজ্ঞান। ইহা দ্বারা সব কিছুই বুঝান যায়।

পরিমাণ-সাহায্যে মন রূপের ধারণা করে। আমাদের মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অধিকতর সম্বন্ধ দেখিতে পারি এবং অধিকতর পরিমাণের ধারণা করিতে পারি।

কাল্পনিক ও বাস্তব দুইগুণ বিশিষ্ট চেতনাকে দার্শনিক মতবাদের দিক হইতে পরিমাণবাচক (Dimensional) বলা যায় না। যেহেতু সংবিদ্ বহুধা প্রকাশিত; সুতরাং দেশ অথবা আকার হইতে পরিমাণ শব্দ গ্রহণ করা যায় এবং 'পরিমাণের সংবিদ্ অথবা চেতনা' এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে না যে সংবিদের পরিমাণ আছে কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণবাচক ক্ষেত্রে ইহার প্রকাশ। সংখ্যা ও পরিমাপের (magnitude) মধ্যে সম্বন্ধের পরিচায়ক বিজ্ঞানের নাম গণিতশাস্ত্র এবং বিন্দুগুলির মধ্যে সম্বন্ধের পরিচায়ক বিজ্ঞানের নাম জ্যামিতি। মানবের বিভিন্ন শ্রেণীর চেতনা, তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর চলাফেরা ও চিন্তাধারার ক্ষমতানুযায়ী মানবশ্রেণীকে বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন পরিমাণবাচক ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়।

অসংখ্য প্রকারের সমতল ক্ষেত্র আছে; তাহাদিগকে বর্ত্তমান কালের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিলে আমরা বলিতে পারি যে মানব তাহার চিন্তাধারার ও বসবাসের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার পরিমাণের সমতল (four dimensional plane) ক্ষেত্রের জীব।

তাই আমরা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিমাণের সংবিদ্‌সম্পন্ন মানব-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মানব, খনিজ-পদার্থ, গাছপালা ও জন্তু সমুদয় তৃতীয় পরিমাণের বস্তু কিন্তু তাহাদের সংবিদ বিভিন্ন পরিমাণের। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব তিন-পরিমাণ সমতল ক্ষেত্রের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। কিন্তু মানব বিশ্লেষণ-ক্ষমতা-দ্বারা অন্যান্য পরিমাণের সমতল ক্ষেত্র বাস্তবে পরিণত করিতে পারে। কাজেই যাহারা প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ পরিমাণের সংবিদ্‌সম্পন্ন তাহাদিগকে যথাক্রমে এক, দুই, তিন ও চার পরিমাণের সত্তাবান জীব বা বস্তু বলিয়া অভিহিত করিব।

অধিকন্তু সাদৃশ্য-গত উপমা দ্বারা গাছপালাগুলিকে প্রথম পরিমাণের; প্রাণীকে দ্বিতীয় পরিমাণের; মানবকে তৃতীয় পরিমাণের এবং অতি-মানবকে চতুর্থ পরিমাণের সংবিদ্‌সম্পন্ন বলিতে পারি। উপমাদ্বারা আরও অগ্রসর হইলে খনিজপদার্থের চেতনাকে শূন্য পরিমাণের বলা যায়। জ্যামিতির বিন্দুর মত শূন্যের কোনও পরিমাণ ও অবস্থান নাই। ইহা সর্ব্বত্রই আছে। যে প্রচ্ছন্ন শক্তি হইতে সমস্ত সংবিদ্-এর উদ্ভব ইহা তাহাকেই প্রকাশ করে। ইহার সহিত অন্য কোনও বিন্দুর সংস্পর্শ নাই। ইহা সম্বন্ধশূন্য। সুতরাং আত্মগত সংবিদ্ অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধে চেতনা ইহার আছে। ইহার কাছে বাহিরের কিছুর অস্তিত্ব নাই। ইহার কাছে রূপের কোনও অর্থ নাই। ইহা বস্তুহীন।

সমালোচনা

The Call of the East (প্রাচ্যের আহ্বান)—জাল কে ওয়াদিয়া প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং লিমিটেড্, ৩ এস্প্লেনেড্ ইষ্ট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১২১+১৪=১৩৫। মূল্য—আড়াই টাকা। মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

বক্ষ্যমাণ পুস্তকখানি শান্তির বার্তা, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ভাবধারা, ধর্মালোচনা, মানবের স্বরূপ, বর্বরতা হইতে সাধুতায় উন্নয়ন, ঈশ্বর লাভের পথ, ধর্মার্থীর জন্য আধ্যাত্মিক অনুশাসন, ধর্মসাধনার অপরিহার্য প্রয়োজন, প্রাচ্যের আহ্বান—এই নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থকার বিষয়বস্তুগুলি উদার ও সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত আলোচনা করিয়াছেন—ইহাতে সংকীর্ণ, একদেশী ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি স্থান পায় নাই। পুস্তকখানিতে জরাথুষ্ট্রের শিক্ষা ও বাণীর প্রচুর উল্লেখ থাকিলেও বুদ্ধ, খৃষ্ট, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও অন্যান্য ধর্মাচার্যের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তত্ত্বগুলি স্বচ্ছ, সহজবোধ্য ও উপভোগ্য হইয়াছে। 'ঈশ্বর লাভের পথ' নামীয় অধ্যায়ে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের মূলতত্ত্বগুলি আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি যোগই ভগবান্ লাভের উপায়—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'যত মত তত পথ,' ইহাই মূলতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই পুস্তকপাঠে পাঠক-পাঠিকামাত্রই মানসিক শক্তি, চরিত্র-বল, আধ্যাত্মিক জীবন, শান্তি-স্থৈর্য-প্রজ্ঞা-লাভের নির্দেশ ও সন্ধান পাইবেন। সমর-লিপ্সু জড়বাদী জাতিসমূহের নিকট পুস্তকখানি শান্তি, ঋদ্ধি, সৌভ্রাত্র, বিশ্বাস, শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির বাণী বহন করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যদৃষ্টির সহিত বলিয়াছিলেন, "পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে ভারত যে ধর্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছে উহার জন্য জগৎ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। জগতের সমগ্র জাতির নিকট, বিশেষরূপে জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতিসকলের নিকট আমাদের শাস্ত্রের সত্যসমূহ, জীবন-প্রদ রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে হইবে—প্রচার করিতে হইবে—ইহাই ভারতের সনাতন বৈদেশিক নীতি।" স্বামীজির এই উদাত্ত আহ্বানের স্পষ্ট ইঙ্গিত ও প্রতিধ্বনি এই পুস্তকখানিতে আছে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে পুস্তকখানির "প্রাচ্যের আহ্বান" নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল

শ্রীবিবেকানন্দ কাব্যগীতি — গ্রন্থকার স্বামী শ্যামানন্দ কর্তৃক ১নং উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৩১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি টাকা।

গ্রন্থকার ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-কাব্যলহরী প্রকাশ করিয়া অনেকের নিকট পরিচয় লাভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মকাল হইতে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তী প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ ধারাবাহিক ভাবে সহজ পদ্যচ্ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বামীজীর বিস্তৃত জীবনী পদ্যাকারে প্রথম প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব বোধ হয় বর্তমান গ্রন্থকারেরই প্রাপ্য। গ্রন্থকারের মতে সাধারণের জন্য বইখানি লিখিত হইলেও, সকলেই ইহা পাঠ করিয়া এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী স্মরণ ও অনুধ্যানের সুযোগ লাভ

করিতে-পারিবেন। বহু ক্ষেত্রে ঘটনানিচয়ের সন তারিখের নির্দেশ দেওয়া ভালই হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থখানি আমরা অধিকতর চিত্তাকর্ষকরূপে পাইতে ইচ্ছা করি। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, বাঁধাই, কাগজ ও ছাপা এই দুর্মূল্যের বাজারে প্রশংসনীয়। সর্বসাধারণ গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইবে।

অর্চ্চনা—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা। ২৯৩ পৃষ্ঠা, মূল্য—প্রতি সংখ্যা ৪৲।

পত্রিকাখানি ৩৬টী প্রবন্ধ ও কবিতা এবং ১১ খানি চিত্রে শোভিত, প্রচ্ছদপটও সুন্দর। এই পত্রিকায় বিভিন্ন প্রকারের আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ, বিশেষ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ-লিখন হইতে যোগ-সাধনার উপাদেয় উপদেশ আছে। ইহা সাধারণের অধ্যাত্মজীবন-পথের আলোক-বর্তিকারূপে সাদরে গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করি। বর্তমানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরম দুর্গতির দিনে এই পত্রিকার বহুল প্রচারে যথার্থই মানব-কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্বামী যুক্তাত্মানন্দ

Reflections and Reminiscences—৺নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত। ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের ভূমিকা-সম্বলিত। প্রকাশক, হিন্দ কিতাবস্ লিমিটেড, ২৬১-২৬৩ হর্ণবি রোড বোম্বাই। ২২০ পৃষ্ঠা, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাংবাদিকরূপে যে সকল বাঙ্গালী ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি নানা সংবাদপত্রের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। লাহোরের 'ট্রিবিউন' নামক ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক-রূপে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। 'ভারতীয় জাতীয়তা', 'গান্ধীবাদ', 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ', 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' প্রভৃতি ইংরেজি গ্রন্থ এবং কয়েক খানি বাংলা পুস্তক লিখিয়া তিনি অমর হইয়াছেন।

যুবক নগেন্দ্র নাথ কলিকাতা জেনারেল এসেমব্লি ইন্স্টিটিউটের ছাত্র। উক্ত কলেজে তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও স্যার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল। বাইশ বৎসর বয়সে করাচী যাইয়া সংবাদপত্রের সেবায় তিনি নিযুক্ত হন। সাংবাদিকরূপে তিনি ডবলিউ সি ব্যানার্জী, হিউম, দাদাভাই নওরোজী, তিলক, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, গোখেল, রানাডে, মদনমোহন মালবীয়, লালা লাজপৎরায় প্রমুখ দেশনায়কগণের সহিত পরিচিত হন। এই সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতিকথা এই গ্রন্থে আছে।

নগেন্দ্র নাথের কর্মময় জীবনের স্মৃতির সহিত দেশের ও দেশনায়কগণের ইতিবৃত্ত বিজড়িত। ভগ্নী নিবেদিতার সহিত তাঁহার শ্রীনগরে সাক্ষাৎ হয়। ১৯১১ খ্রীঃ যখন নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন তখন নগেন্দ্রনাথ 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় একটী সুন্দর স্মৃতি প্রকাশ করেন। উক্ত স্মৃতি-কথার মধ্যে নিবেদিতার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি আছেঃ নিবেদিতা যখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে অমরনাথ দর্শনে যাইতেছিলেন তখন তিনি দাণ্ডীতে ছিলেন। পার্বত্য পথে চড়াই, উৎরাই অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ছিল। দাণ্ডীতে পহেল গাঁও হইতে ছত্রকটী চটী পার হইতেই নিবেদিতা দেখিলেন, একটী বৃদ্ধা লাঠি ভর করিয়া অতিকষ্টে যাইতেছে। সম-বেদনায় অভিভূতা হইয়া নিবেদিতা দাণ্ডী হইতে নামিয়া বৃদ্ধাকে দাণ্ডীতে বসাইয়া নিজে হাঁটিয়া অমরনাথদর্শনে গেলেন ও ফিরিলেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন লাহোরে গমন করেন তখন নগেন্দ্রনাথ তথায় ছিলেন। স্বামীজির স্মৃতি নগেন্দ্রনাথ একখানি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। একজন পার্শী যুবক স্বামিজীর পূত সংস্পর্শে একবার মাত্র আসিয়া কিরূপে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন তাহা উক্ত স্মৃতি-কথাতে আছে। স্বামিজীর ইংরেজ শিষ্য গুডউইনের সঙ্গে লাহোরে তাঁহার পরিচয় হয়। গুডউইনের সম্বন্ধে নগেন্দ্র নাথ লিখিয়াছেন, তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন। তাঁহার সহিত যিনি পরিচিত হইবেন তিনি তৎপ্রতি প্রীতিযুক্ত হইবেনই। কেশবচন্দ্রের সমভিব্যাহারে নগেন্দ্রনাথ ১৮৮১ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন। ঠাকুরের স্মৃতিকথা তিনি 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করেন। তাহা পড়িয়া ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ মুগ্ধ হন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি ও উপদেশ সম্বলিত একটী ইংরাজী পুস্তক করাচী হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও মন্তব্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ এই বইখানি অতিশয় উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক। ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনীর কথা অতি অল্প; ঐতিহাসিক ও অভিনব তথ্যে পূর্ণ। নগেন্দ্রনাথ বঙ্গের বাহিরে বাংলার অন্যতম গৌরব ছিলেন। তিনি বঙ্গজননীর অমর সন্তান। তাঁহার কথা বাঙ্গালীর জানা উচিত।

বৈজয়ন্তী—শ্রীনিশিকান্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। ৭৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৸০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থ ৭৫টী কবিতার সমষ্টি। দুই চারিটী কবিতা ব্যতীত অন্যান্য কবিতার ভাব অবোধ্য। উদীয়মান কবি গদ্য ও পদ্যের ভেদ দূরীকরণার্থ বদ্ধপরিকর, মনে হইল। মাত্র কয়েকটী কবিতা সুপাঠ্য ও ভাবোদ্দীপক হইয়াছে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

Swami Vijnanananda (A direct disciple of Sri Ramakrishna)—By Swami Jagadiswarananda. Published by the Vivekananda Sangha, Budge Budge, 24 Parganas; pages 32, Price : Annas Eight only.

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবন ছিল নীরব অথচ তপঃসমৃদ্ধ। আলোচ্য পুস্তিকা তাঁহার বিস্তৃত জীবনী নহে; গ্রন্থকার বাংলাতে একখানি তথ্যবহুল জীবনচরিত প্রকাশ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এই পুস্তিকাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের অমানব ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। অনমনীয় দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় তিনি ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর, আবার অসাধারণ হৃদয়বত্তায়ও ছিলেন কুসুমাদপি মৃদু। দিব্য-অনুভূতি-ভূয়িষ্ঠ এই দেবজীবনের অপ্রকাশিত ঘটনাপুঞ্জকে জিজ্ঞাসু পাঠকের গোচরীভূত করিয়া শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

A Disciple of Sri Ramakrishha—By Swami Jagadiswarananda; Published by Vivekananda Sangha, Budge Budge, Dist: 24 Parganas, Pages 52, Price : Annas Six only.

আলোচ্য পুস্তিকা খানি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত মনোমোহন মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতাই ছিল মনোমোহন-জীবনের বিশিষ্ট সুর। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন —"What characterised Monomohan was his profound and fiery absorption in the words and thoughts of the Master". আলোচ্য জীবনীতে এই উক্তির যাথার্থ্যের পরিচয় পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরাশি দিগ্‌দিগন্তে, দেশদেশান্তরে বিস্তৃতি-লাভ করুক, কামকাঞ্চনের পূতিগন্ধ পল্বলে মজ্জমান মানব শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গায় বিধৌত হউক—পরিশুদ্ধ হউক, ইহাই ছিল ভক্তপ্রবরের ঐকান্তিক আকূতি। পুস্তিকার ভাষা সহজ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য। মনোমোহন-সঙ্কলিত কয়েকটি শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী বইখানির গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্-এ

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ

গত ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ন ৫-৫ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীস্থ বিড়লা-ভবন হইতে প্রার্থনা-সভা-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে সমবেত জনগণ দুই পার্শ্বে সরিয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দেন। এই সময়ে জনৈক ব্যক্তি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া মাত্র কয়েক হাত দূর হইতে মহাত্মাজীর প্রতি চারিবার রিভলবারের গুলি নিক্ষেপ করে। তাঁহার বুকে ও পেটে গুলি লাগায় তিনি রামনাম উচ্চারণ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যান। জনতার মধ্য হইতে কয়েক জন লোক অগ্রসর হইয়া 'আততায়ীকে তখনই ধরিয়া ফেলেন। হত্যাকারী মারাঠি-হিন্দু, তাহার নাম—নাথুরাম বিনায়ক গড়সে। গান্ধীজীকে তৎক্ষণাৎ বিড়লা-ভবনে আনয়ন করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু গুলিবিদ্ধ হইবার ৩৫ মিনিট পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

পরদিন বেলা ১১-৪৫ মিনিটের সময় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে একটি সুসজ্জিত গাড়ীতে মহাত্মা গান্ধীর নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর এক অতি বিরাট শোভাযাত্রা পাঁচ মাইল দূরবর্তী যমুনা-তটে উপনীত হয়। অপরাহ্ন ৪-৫৫ মিনিটের সময় ভারত-সরকারের পূর্ত-বিভাগের তত্ত্বাবধানে রচিত চন্দনকাষ্ঠের চিতায় মহাত্মাজীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী বৈদিক প্রথানুসারে অগ্নিসংযোগ করেন। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, লেডি মাউণ্টব্যাটেন এবং তদীয় কন্যা, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন।

বর্তমান জগতের সর্বজনমান্য মহামানব গান্ধীজীর আকস্মিক শোচনীয় দেহত্যাগের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের সকল নরনারী শোকে মুহ্যমান হইয়া সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে বিশ্বের সকল নরনারী যেরূপ বেদনা-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ আর দেখা যায় নাই। পৃথিবীর মনীষিমাত্রই এই অতি-মানবের অসাধারণ গুণাবলী কীর্তন করিয়া তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বময় মানুষের মনের উপর মহাত্মাজী কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা তাঁহার দেহত্যাগের পর বিশেষভাবে বুঝা যাইতেছে।

দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনে মহাত্মা গান্ধীর অবদান অপরিসীম। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে তিনিই গণ-আন্দোলনে পরিণত করেন এবং তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এরূপ অভূতপূর্ব উপায়ে পৃথিবীর কোন পরাধীন জাতি এ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। তিনি স্বদেশের জন্য প্রকৃতই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া নির্ভীক ভাবে শত নির্যাতন স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রেমের মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ বহুকাল পূর্বে বলিয়াছিলেন, "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত-বাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত

হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যান আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" স্বামীজীর উত্তরসাধক গান্ধীজী ছিলেন এই মহতী বাণীর যথার্থ জীবন্ত বিগ্রহ।

কেবল ভারতবর্ষে নয় পরন্তু বিশ্বময় মানুষে মানুষে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সাম্য ও মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা মহাত্মা গান্ধীর প্রধান আদর্শ ছিল। ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়-রূপে তিনি সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত "যত মত তত পথ" বাণী নূতন ভাবে প্রচার করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে—বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য যথার্থই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। এ জন্য তিনি কয়েকবার প্রায়োপবেশনে জীবনদান করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় সকল ধর্মের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জড়বাদের পূর্ণ প্লাবনের মধ্যে রাজনীতিতে লিপ্ত থাকিয়াও মহাত্মা গান্ধী ধর্ম তথা ঈশ্বর এবং সত্য অহিংসা ন্যায় ও নীতিকে যে ভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া ছিলেন, ইহা যথার্থই অতুলনীয়। জগৎময় অধর্ম হিংসা অসাম্য ও অশান্তির ঘনান্ধকারে এই মহামানব ছিলেন ধর্ম অহিংসা সাম্য ও শান্তির অত্যুজ্জ্বল আলোক-বর্তিকাস্বরূপ। তাঁহার এই দেববাঞ্ছিত ভাবরাশির উজ্জ্বল আলোক পৃথিবীর সকল নরনারীর অন্তর উদ্ভাসিত করুক এবং ইহার ফলে পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ক, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য। আমরা মর্ত্যজগতে দুর্লভ এই মহামানবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—আগামী ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রয়োদশাধিক-শততম জন্মতিথি-পূজা এবং ৩০শে ফাল্গুন রবিবার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

স্বামী গৌরবানন্দজীর দেহত্যাগ—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে স্বামী গৌরবানন্দজী প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে হাঁপানি রোগে বেলুড় মঠে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 'হরি-দা' নামে পরিচিত ছিলেন। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর নিকট হরি-দা মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯১৭ সনে কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া) আশ্রমে যোগদান করিয়া এই বৎসরই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। হরি-দা বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমে এবং বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল কার্য করিয়াছেন। তিনি সাধন-ভজনশীল এবং সরল ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চির-শান্তি লাভ করুক।

স্বামী অমরেশানন্দজীর দেহত্যাগ—গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রাতে স্বামী অমরেশানন্দজী

৪৯ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে কাশী অদ্বৈত আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নশ্বর দেহ মণিকর্ণিকা ঘাটে জল-সমাধি দেওয়া হইয়াছে। স্বামী অমরেশানন্দজী 'ভোলানাথ মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পরম-পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ভোলানাথ মহারাজ ১৯১৯ সনে বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া ১৯২৪ সনে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। তিনি দীর্ঘকাল কাশী অদ্বৈত আশ্রমের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী নির্ভরানন্দজীর সেবা যেরূপ একনিষ্ঠ ভাবে করিয়াছেন তাহা যথার্থই অতুলনীয়। তাঁহার সাধুত্ব, সেবাপরায়ণতা ও কর্মশক্তি প্রশংসনীয় ছিল। অমরেশানন্দজীর পরলোকগত আত্মা বিশ্বনাথের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

বেদান্ত সোসাইটি, উত্তর-ক্যালিফর্নিয়া—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী প্রতি রবিবার ও বুধবার দুইটি করিয়া বক্তৃতা দেন। তিনি গত জানুয়ারী মাসে সোসাইটির বক্তৃতা-গৃহে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন ঃ—(১) "নববর্ষে আমাদের সংকল্প," (২) "আত্মা ও মন—ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক," (৩) "ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণাবলী," (৪) "মানবের জন্য ভগবানের কি কোন পরিকল্পনা আছে?" (৫) "আমেরিকার নিকট ভারতের বাণী এবং ভারতের নিকট আমেরিকার বাণী", (৬) "বিচারশক্তি ও ভাবাবেগ হইতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান পর্যন্ত", (৭) "তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জীবনধারা", (৮) "দেব-মানবের আবির্ভাব"।

এতদ্ব্যতীত স্বামী অশোকানন্দজী প্রতি শুক্রবার সোসাইটির সদস্য ও ছাত্রগণের নিকট 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ' ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন। সোসাইটিতে বালক-বালিকাদের জন্য একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় আছে। ইহাতে তিনি সার্বভৌম বেদান্তের সাধারণ-তত্ত্ব এবং জগতের মহত্তম আচার্যগণের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম—এই আশ্রমে গত ২৪শে মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজে ছাত্র-সভায় বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দজী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সার্বজনীন বৈদান্তিক ধর্মের সারকথা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরদিন অপরাহ্নে গান্ধীপার্কে এক জনসভায় সভাপতি সুসাহিত্যিক জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রের সর্বত্র স্বামীজীর ভাবধারার প্রভাব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন। বিবেকানন্দ ব্যায়াম মন্দিরেও একটি সভায় উক্ত স্বামীজী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করিয়াছেন।

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৮ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পূজার্চনা হোম আরতি ভজন প্রসাদ-বিতরণ ও জনসভায় স্বামীজীর জীবনী ও ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। আশ্রম-প্রাঙ্গণে আহূত জন-সভায় সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার হোড়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী এ রহমান, ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের কর্মচারী দায়ুদ সাহেব, শ্রীযুক্ত জীবিত নাথ দাশ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১৮ই মাঘ এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনা হোম ভজন ও জনসভায় বক্তৃতা হয়। একটি সাধারণ সভায় সভাপতি অতিরিক্ত জেলাজজ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মাখন লাল শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার দাস ও স্বামী পরশিবানন্দজী স্বামীজীর বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্ব ও অমূল্য অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরদিবস স্বামী পরশিবানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব জীবন-চরিত কবিতায়, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ও সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। উভয় সভাতেই সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

For Seekers of God—'শিবানন্দ-বাণী' পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক স্বামী বিবিদিষানন্দ। অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত; মূল্য—২॥০ টাকা।

Ramakrishna: Prophet of New India--Gospel of Sri Ramakrishna পুস্তক হইতে স্বামী নিখিলানন্দ (নিউ ইয়র্ক) কর্তৃক সঙ্কলিত; প্রকাশক—Harpers and Brothers, New York. মূল্য—তিন ডলার পঞ্চাশ সেণ্টস।

বিবিধ সংবাদ

পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম—'হিন্দুস্থান' ও 'সারথি' পত্রিকায় প্রকাশ যে পাবনা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সৎসঙ্গ আশ্রমের কয়েকটি গৃহ দুর্বৃত্তগণ ধ্বংস করিয়াছে এবং অনেক গৃহের জানালা-দরজা পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান কলেজ, তপোবন বিদ্যালয়, কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, আর্ট ষ্টুডিও, পাবলিশিং হাউস, ওয়ার্কশপ, পাওয়ার হাউস, প্রেস প্রভৃতির লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস-পত্র লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট করা হইয়াছে এবং অনেক জিনিস আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই সঙ্ঘের হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল দুষ্কৃতগণ বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে। স্থানীয় মুসলিম ন্যাসন্যাল গার্ড আশ্রমের পাবলিশিং হাউস দখল করিয়া তথায় তাহাদের ক্যাম্প খুলিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের বহু অধিবাসীকে গৃহস্থালীর সামান্য জিনিস-মাত্র লইয়া স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই বিষয়ে এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষ পূর্বপাকিস্তান সরকারের পদস্থ ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াও কোন ফল পান নাই। ইহাতে এতদঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দুগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারকে অবিলম্বে ইহার যথাযোগ্য প্রতিকারের চেষ্টা করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বিলাসীপাড়া (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি—গত ১৮ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে পূজাপাঠ দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি এবং অপরাহ্ণে 'ভৌমিক প্রাঙ্গণে' শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এ, বি-টি মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। ইহাতে শ্রীযুক্ত মাধব কিংকর ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ধর, বি-এ প্রভৃতি স্বামীজীর সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ১৮ই মাঘ স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং মিউনিসিপ্যাল হলে ধর্মসভা হয়। ইহাতে কলিকাতা সেণ্টপল্‌স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সান্যাল, এম্-এ 'স্বামীজীর অবদান' সম্বন্ধে একটি সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বজবজ মনোরঞ্জন সঙ্গীত সমিতি কর্তৃক ঐকতান বাদ্য, বালকগণের আবৃত্তি এবং ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমবেত নরনারী ও বালক-বালিকাগণ কর্তৃক সমস্বরে রামনাম সংকীর্তনান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সোসাইটি ভবনে শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় "শিবানন্দ-বাণী" ও "স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের জীবন কথা" এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী "বর্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ" এবং স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দজী "স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবনকথা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে ইংরেজী শিক্ষার অবসান-পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আদেশে ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে প্রদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়-সমূহের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে আর ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না। পঞ্চম শ্রেণী হইতে ইংরেজী শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সরকারের আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করিবার জন্য বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষগণের নিকট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির প্রশ্নোত্তর বঙ্গভাষায় দেওয়ার নির্দেশ—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী আই-এ, আই-এস্‌সি, বি-এ, বি-এস্‌সি এবং বি-কম্ পরীক্ষাগুলির প্রশ্নোত্তর ছাত্র-ছাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে বাংলা ভাষায় দিতে পারিবে। ইংরেজী সংস্কৃত হিন্দী প্রভৃতি ভাষা-বিষয় (Language Subjects) সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র-গুলির উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

পুনর্বসতি ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন—ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট একটি পুনর্বসতি ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বোর্ডে তিন জন সদস্য থাকিবেন। ইঁহারা শহরবাসী আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটীরশিল্পের উন্নতি সম্পর্কেও বোর্ড হইতে ব্যবস্থা করা হইবে। ছোট ছোট শহরে অবিলম্বে বোর্ডের সভ্যগণ কায আরম্ভ করিবেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য দানের সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক ব্যবস্থা করিবার জন্যই পুনর্বসতি ও উন্নয়ন-বোর্ড গঠিত হইয়াছে। দেশের যে কোন স্থানে এই বোর্ড কাজ করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ বোর্ড প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের সহযোগিতায় কাজ করিবেন। যেখানে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের অর্থেই কাজ চলিবে, সেখানে কেন্দ্রীয় বোর্ড উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবেন। বোর্ডের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ হইবে।

উদ্বোধন

ইঙ্গ-ভারত সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সংঘ

সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মিশনের লণ্ডনস্থ 'বেদান্ত প্রচার কেন্দ্রে'র অধ্যক্ষ স্বামী অব্যক্তানন্দজীর নেতৃত্বে 'ইঙ্গ-ভারত সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সংঘে'র চারি জন ইংরেজ সভ্য গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারতে আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন—'ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি স্থাপন সমিতি'র অধ্যক্ষ মিস্ ভিভিয়েন জেনকিন্স্, পূর্বোক্ত 'বেদান্ত প্রচার কেন্দ্রে'র বিশিষ্ট সভ্য মিঃ রবার্ট হনিম্যান, 'বিশ্ব-মানব সংহতি সংঘে'র সহকারী সম্পাদিকা মিসেস্ মার্গারেট ফ্লিণ্ট এবং 'আন্তর্জাতিক পশু-সেবা সমিতি'র সভ্য মিঃ ডেরিক ব্রাইট্। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্য-স্থাপন এই সংঘের উদ্দেশ্য।

ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৪৭ সনের ২৯শে মার্চ লণ্ডনের কিংজ্ওয়ে হলে বিখ্যাত লেখক মিঃ বব্ ওয়াকারের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হইয়াছিল। ইহাতে পার্লামেন্টের সভ্য ভারত-হিতৈষী মিঃ রেজিন্যাল সোরেনসেন মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এই সভা হইতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম নির্ধারিত হয়:

(১) ভারতের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির এই শুভক্ষণে তথাকার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভাবের আদান-প্রদান।

(২) ভারতের আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক সংঘসমূহের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়া উভয় জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য-স্থাপন।

(৩) ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানমূলে উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতি দৃঢ়ীভূত করন।

এই কার্যক্রম-অনুসরণে 'ইঙ্গ-ভারত সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সংঘে'র সভ্যগণ ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শহর, কয়েকটি পল্লী, শিক্ষাকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক সংস্থা, মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছেন। সকল স্থানেই তাঁহারা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হইয়াছেন। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন পার্শি শিখ মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপন এই সংঘের অন্যতম আদর্শ। এই জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ যেখানে গিয়াছেন সেখানকার সকলসম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট

ব্যক্তিগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের পক্ষে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহারা সিংহল পরিভ্রমণ করিয়া আগামী এপ্রিল মাসে তথা হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত তের বৎসর যাবৎ স্বামী অব্যক্তানন্দজী লণ্ডন নগরীতে অবস্থান করিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়পূর্ণ প্রচারের ফলে তথাকার এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং ক্রমেই তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বেদান্তধর্ম ভবিষ্য সুশিক্ষিত নরনারী কর্তৃক পরিগৃহীত হইবে। কারণ, এই যুক্তিপূর্ণ বিশ্বজনীন সাম্য-মৈত্রীমূলক মতবাদই তাঁহাদের ধর্মতৃষ্ণা মিটাইতে এবং বিশ্বমানবের মধ্যে যথার্থ সাম্য মৈত্রী ও শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ। মনীষী রোঁমা রোঁলা লিখিয়াছেন, "রামকৃষ্ণের জীবনে ও উপদেশে ভারতের যে অদ্বৈত বেদান্ত মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই যুক্তিপূর্ণ ধর্মের উপরই ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করে।" এই নব-যুগপ্রবর্তক সমন্বয়াচার্যের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত বেদান্ত সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে পৃথিবীর সকল ধর্মমত ও পথেরই সম্মানিত স্থান আছে। ইহা দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল নরনারীকে আত্মার দিক দিয়া এক ও অভেদ মনে করিতে—নরমাত্রকেই নারায়ণ জীবমাত্রকেই শিবজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেয়। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের এই নির্দেশে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতি শিক্ষানীতি শিল্পনীতি প্রভৃতি—এমন কি মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন পরিচালন করিবার আবশ্যকতা উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি, প্রত্যেক সভ্য দেশের কোটি কোটি নরনারী ভারতবর্ষ হইতে এই অমৃত বাণী লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—যাহা ধন-দৈবতার অর্চনার অনিবার্য পরিণাম-স্বরূপ জড়বাদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ঐ সকল দেশে নূতন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকে ইতিমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তের আদর্শই তাঁহাদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করিতে সমর্থ হইবে।" এই সকল কারণে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশসমূহে বেদান্ত-প্রচারের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বামী অব্যক্তানন্দজী বিশ্ব-সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র লণ্ডন নগরীতে বেদান্ত-প্রচারে তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি তথাকার সামাজিক রাজনীতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহে যোগদান করিয়া ঐ সকলকে বেদান্ত-ভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করেন। এই কার্যে তিনি কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা 'ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সংঘে'র সমাগত চারিজন ইংরেজ-সভ্যের বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা সমূহে বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

স্বামী অব্যক্তানন্দজীর কার্যাবলী লণ্ডন নগরীতে কেবল বেদান্ত-প্রচারেই সীমাবদ্ধ নয়; তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডে জনমত সৃষ্টি করিতেও অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। "দি ইষ্টার্ন এক্সপ্রেস" নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক গত ১৯শে ডিসেম্বর "সম্প্রীতি মিশন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক-অনুসরণে স্বামী অব্যক্তানন্দ ইংলণ্ডে কেবল বেদান্ত-প্রচারই করিতেছেন না,

অধিকন্তু বর্তমান সামাজিক অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সমস্যা-সমাধানেরও চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৪২ সনে ভারতে আগষ্ট-আন্দোলনের সময়ে নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলে লণ্ডনের 'বেদান্ত সোসাইটি'র উদ্যোগে ভারতের হাই কমিশনার মিঃ ভি কে কৃষ্ণ মেনন পরিচালিত 'ইণ্ডিয়া লিগ' এবং 'স্বরাজ ভবন' ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় 'ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন' প্রবর্তিত হয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া যাহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতের নেতৃবৃন্দের হস্তে ভারতীয় রাষ্ট্র পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেন, ইহাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। ধীর স্থির আত্মবিশ্বাসী ও শক্তিমান স্বামী অব্যক্তানন্দ ভারতের জন্য যথার্থই অত্যন্ত প্রশংসনীয় কার্য করিতেছেন।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে ইংরেজদের সহিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিবে। ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করাই 'ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সংঘে'র প্রধান উদ্দেশ্য।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া বিশ্ব-মানবের একত্ব প্রচার করিতেছে। বেদান্তে এই একত্ব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত। আপাত-দৃষ্টিতে ভারতবাসীর জীবনের শত ভেদ এবং সহস্র বৈষম্যের অভ্যন্তর দিয়া এই একত্ব বিভিন্ন পুষ্পমধ্যস্থ এক সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত। এই জাতীয় ঐক্যের সম্প্রসারণ এবং শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া ইহাকে বিশ্বব্যাপী করাই ভারতের জীবন-ব্রত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "কেবল এই দেশেই মানব-হৃদয় এতদূর প্রশস্ত হইয়াছে যে তাহা শুধু মানুষকে নহে, সমস্ত পশু-পক্ষী, প্রাণি-জগৎ, উদ্ভিজ্জ-জগৎকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে। ** কেবল এই দেশেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বের একত্ব, অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্ব-চরাচরের হৃদয়-স্পন্দন আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলিয়া অনুভব করিয়াছে।"

ভরসা করি, 'ইঙ্গ-ভারত সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সংঘে'র ইংরেজ সভ্যগণ ভারত ভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীর এই মহান আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহারা স্বদেশে যাইয়া তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণকে ইহার সহিত পরিচিত করিবেন। এই কার্য ব্যাপক ভাবে করিতে পারিলে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর—তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃত মিলন—বিশ্বমানবের মধ্যে যথার্থ ভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে এবং এই সংঘের উদ্দেশ্যও সফল হইবে।

"ভারতভূমি, আমার এই জন্মভূমি বর্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব মহিমায় মন্থর পদক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন আপনার বিধাতৃ নির্দিষ্ট মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য—পশুভাবাপন্ন মানবকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিবার জন্য। ভূ লোকে কিম্বা সুরলোকে এমন কোনও শক্তি নাই যাহা ভারতের এই মহৎ কার্যে বাধা প্রদান করিতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভাব-সমাধি

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, সাহিত্য-বিশারদ, পুরাণরত্ন

সঙ্গোপনে --
মনেরো গোপনে
ধ্যান-কুঞ্জবনে
পাই তাঁরে।
পাই তাঁরে
পাই তাঁরে,
পাই যবে তাঁরে
বসন্ত-বাহারে
মন—
বৃন্দাবন
করে আস্বাদন।

নিশ্চুপ বসিয়া রহি,
মনোজয়ী
আমি মনোময়।
আমি-দেবে প্রাণময়
চঞ্চল সাগর মতো
প্রশান্ত প্রণত
ভক্ত হেন।
আছি যেন
বৈকুণ্ঠের কাছাকাছি,—
আছি আছি
আছি আছি,
শুধু নাহি ঢেউ--
চপল নাহিক কেউ,
দুই তীর
নিঃসীম সুস্থির।

ব্রহ্মাণ্ডের যতো নদী
নিরবধি
সাগরের খোঁজে ফিরি'
ধীরি ধীরি
প্রশান্ত অন্তরে—
শ্রদ্ধাভরে
অমর সাগরে
পশে,
পরম হরষে
ঢালে প্রাণ।
ঘুমায় কল্লোলতান
নিঃশব্দ ওঁকার গান
জাগে—
অপাবৃত অনুরাগে
প্রভাতে শর্বরী,
মরি মরি!

সাগরে নদীরা
ধীরা;
আমি-তে সাগর
শান্ত কর।
আমি—
দিন-যামি
আনন্দ-আমিতে।
চারিভিতে
নামে অন্ধকার,
জ্যোতির পাথার
দোলে,—
দোলে দোলে
স্থির হয়ে যায়।
অনন্ত আত্মায়
নামে রথ,
অরণ্য পর্বত
বন
উপবন
কান্ত কুঞ্জবন—
মিলায়, মিলায় দূরে।

নর্মপুরে
ঘুরে ঘুরে
অশ্রুত নূপুরে
জাগে
অনুরাগে
আনন্দ-নিক্কণ।
বৃন্দাবন---
বৃন্দাবন
জাগে,
অপাবৃত অনুরাগে
প্রভাতে শর্বরী,
মরি মরি।

শিব-দর্শনে

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, পি এইচ্-ডি

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। বক্সা পাহাড়ে চলিয়াছি। বক্সা ষ্টেশন হইতে পাহাড় পাঁচ মাইল পথ। তিন মাইল পার্বত্যবনপথ, বাকি দুই মাইল খাড়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। ষ্টেশন ছাড়িয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই মনে হয়, বহুদিনের অতি পরিচিত সংসারটাকে যেন পিছনে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আসিলাম। দুই পাশে একটানা পাহাড়ি গাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে, কিছুদূর পর্যন্ত ঘন-বিনস্ত গাছ, তারপরে অন্ধকার। চারিদিকে একটা নিবিড় স্তব্ধতা, তাহারই উপরে দুপুরের রোদ কেমন ঝিলমিল করিতেছে।

যতদূর চলি কদাচিৎ জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ, যে দু'এক জনের সঙ্গে দেখা হয় তাহারাও পার্বত্য ভুটিয়া। মাঝে মাঝে দু'একটি কাঠবিড়ালের দেখা মেলে, ফোলান পুচ্ছটি উচ্চে নাচাইয়া গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো চখে পড়ে দু'একটা পার্বত্য পাখী।

পাহাড়ের পথে আমি যখনই চলিয়াছি, ইহার একটা বিশেষ প্রভাব আমার সমগ্র সত্তার উপরে অনুভব করিয়াছি। পরিচিত জগতের দৈনন্দিন জীবনটিকে ঘিরিয়া দেহ-মনের উপর নিরন্তর আবরণ জমা হইতেছে, সে আবরণ ভালতে-মন্দতে সুন্দরে-কুৎসিতে মিলাইয়া আমাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই অজানা নির্জন পাহাড়ি পথে দেহ-মনের এই পুঞ্জীভূত আবরণটি কেমন যেন আপনা আপনিই খুলিয়া পড়িয়া যায়; এই আবরণের অন্তরাল হইতে আমার যে রূপটি বাহির হইয়া আসে, তাহাই যেন আমার বিশুদ্ধ সত্তা। সেই বিশুদ্ধ সত্তাটিকে এখানে অতি গভীর করিয়া পাওয়া যায়, চারিদিকে ছড়াইয়া-পড়া আমিটি ঘনসম্বদ্ধ হইয়া একান্ত কাছের এবং একান্ত আপনার হইয়া ওঠে। এখানে যে নিজেকে শুধু গভীর করিয়াই পাওয়া যায় তাহাই নহে, এখানে নিজেকে বড় করিয়া পাওয়া যায়। এখানে চারিদিকে যাহা কিছু সকলই বড়। বড় বড় গাছগুলি বড় বড় শাখা হইয়া একটানা আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিয়া গিয়াছে, ছোট ছোট গাছগুলির বড় দুর্দশা, কেমন প্রাণ-মরা এবং মন-মরা হইয়া শীর্ণ এবং রুক্ষ হইয়া গিয়াছে; এখানে লতা যে কটি দেখা যায় তাহারা মৃদু হাওয়ায় 'দোদুল দোলে'র লতা নয়,—বলিষ্ঠ প্রাণ-শক্তিতে তাহারা বনস্পতিগুলির শাখাবাহু বেষ্টন করিয়া আছে; ফুলগুলি বড় হইয়া ফোটে, বড় বড় পশু পাখী বড় করিয়া ডাকে—ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে ঝিল্লীর রবও অনেক বড় করিয়া কানে আসিয়া পৌঁছায়।

নিজের এই বিশুদ্ধ এবং বৃহৎ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে বিশ্ব-জীবনের সহিত একটা নিগূঢ় যোগ অতি সহজ হইয়া আসে। এখানে মনে হয়, এই গাছগুলি—এই পশুগুলি—এই পাখী-গুলি—এরা যেমন করিয়া পৃথিবীর বুকে এক প্রাণ-দেবতার নিত্যকালের প্রকাশ—আমিও তেমনই। পায়ের নীচে রহিয়াছে যে পৃথিবী তাহার অণুতে-পরমাণুতে লীন হইয়া রহিয়াছে কি অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি! এই অন্তরীক্ষের বাতাস—ঊর্ধ্বলোক হইতে ক্ষরিত এবং পৃথিবীর বুকে সপ্তরঙে বিচ্ছুরিত আলো-কণিকার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে কি এক মহাপ্রাণ! সেই পাগল প্রাণ-

দেবতার এক রুক্ষ ধূসর ক্ষ্যাপাটে মূর্তি এই পাহাড়—এই বনানী।

ধীরে ধীরে পথ চলিতেছি। কোন তাড়া নাই, কারণ পৌঁছনটাই আজ বড় নয়—পথ চলাটাও বেশ। ক্ষণে ক্ষণে প্রখর রোদে মাথা তাপিয়া উঠিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে আবার গাছের ছায়ার শীতল স্পর্শ লাভ করিতেছি। সঙ্গে কয়েকটি ভুটিয়া সঙ্গী জুটিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে অসুবিধা হইল না কিছুই, কারণ তাহারা চলিতে চলিতে বেশী কথা বলে না। আমাদের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিল, আমরা 'কলকাতা কা বাবু', এবং একান্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া দুইটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কলিকাতায় যথেষ্ট ভাত পাওয়া যায় কি না এবং কলিকাতায় 'স্বদেশী বাবু' আছে কি না। এই দুইটি প্রশ্নেরই গভীর অর্থ আছে। প্রথম প্রশ্নের তাৎপর্য এই—এই সকল ভুটিয়ারা এই সকল পাহাড়ি দেশে এখন পর্যন্তও আদিম বন্যজীবনই যাপন করিতেছে; এখনও এখানকার আশপাশের কোন বড় পাহাড়ের নিম্নদেশে বসিয়া থাকিলে মনে হইবে, পাহাড়ের ঐ উচ্চ-দেশে গাছপালা এবং পশুপাখী ব্যতীত আর কিছুই নাই; কিন্তু হঠাৎ হয়ত চোখে পড়িবে, অনেক উচ্চদেশে পাহাড়ের গায়ে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটি অস্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী জাগিয়া উঠিতেছে,—তখন বুঝিতে হইবে, ওখানে নিশ্চয়ই একটি ভুটিয়া পরিবারের আস্তানা আছে। এই সব পাহাড়ের দুর্গম জুলিপথে গাছপালার ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ যখন একটি অর্ধাবৃত বা পশুচর্মাবৃত ভুটিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন মনে কেমন একটা বিস্ময় জন্মে; মনে হয় এখানে এই সময়ে একটি ব্যাঘ্র ভাল্লুকের সহিতও দেখা হইতে পারিত বা অন্য কোন জীবজন্তুর সহিতও দেখা হইতে পারিত। এখনও শিকার-লব্ধ পশু-পাখীর কাঁচা-পোড়া মাংস তাহাদের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু বক্সা পাহাড়ে সরকারী এবং বে-সরকারী নানা প্রকারের জনবসতি স্থাপিত হইবার পর হইতে ইহাদের সংস্পর্শে ভুটিয়ারা ভাত খাইতে শিখিয়াছে। কিন্তু পাহাড়ে তাহারা চাউল সহজে পায় না; নিজেরাও পাহাড়ে জন্মাইয়া লইতে পারে না,—অতএব লোকালয় হইতে এই দুর্লভ বস্তুটিকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। তাহাদের আদিম অভাবহীন জীবনে এই নূতন অভাবটি বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং জীবন-ধারণের উপজীব্য হিসাবে এই বস্তুটি সম্বন্ধে তাহারাও বেশ সচেতন এবং কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির তাৎপর্য্য এই, ব্রিটিশ সরকারের ব্যবস্থায় কারাগারে নির্বাসিত 'স্বদেশী বাবু'র প্রাচুর্যই বক্সা পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য; অন্ততঃ একটি নবগঠিত শহরের এই বিশেষ ধর্মটিই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সমধিক, তাই এই নাগরিক বৈশিষ্ট্যটি সর্ব-নগরেই বিরাজমান কি না এসম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল অতি স্বাভাবিক।

এতক্ষণে দূরে পাহাড় চোখে পড়িল। কখনও গাছপালায় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে, কখনও স্পষ্ট চোখে পড়িতেছে। শুনিলাম, আর খানিক দূর আগাইয়া গেলেই 'সান্তারাবাড়ি'—সেখান হইতে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিতে হইবে। সহসা পাহাড়ের গায়ে এবং উপরে দু'একখানা মেঘ দেখা দিল, আরও কয়েক-খানি। চলিতে চলিতে পাহাড় আবার বনের আড়ালে ঢাকা পড়িল। কিন্তু আস্তে আস্তে চারিদিক কেমন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, দু'একবার যেন গুড় গুড় আওয়াজ কানে গেল। হাঁটিবার বেগ বাড়াইয়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বেগও যেন বাড়িয়া গেল।

সহসা যেন বজ্রগম্ভীর স্বর শুনিলাম; সে স্বর আকাশ হইতে মনে হইল না, মনে হইল এ-স্বর এই বনের। ছেলেবেলা শুনিয়াছি, পর্বতে পার্বত্য দেবতা শিবের বাস; তাঁহার বাসভূমির বহির্দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া ভূতগণকে বজ্রনির্ঘোষ রবে জানায় তাঁহার শাসন, সর্ববিধ চপলতা হইতে অরণ্যবাসিগণকে করে সাবধান। একি সেই নন্দীর নির্দেশ?

বজ্রধ্বনি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আকাশে বাতাসে এতক্ষণে একটা প্রকাণ্ড শোঁ শোঁ রবের আলোড়ন জাগিয়াছে। বনের ফাঁক দিয়া আবার পাহাড় চোখে পড়িল। এতক্ষণে কালো কালো মেঘগুলি জটার মতন পাহাড়ের উচ্চ শিখাটিকে জড়াইয়া ধরিতেছে, বাতাসের আলোড়নে সেগুলি যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত তরুরাজিতে কাহার যেন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে,—আরক্ত অপাঙ্গ হইতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে, শোঁ শোঁ বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে একটা ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস। সত্যই কি পাহাড়ে ভৈরব দেবতা মহাদেবের বাস?

এতক্ষণে বৃষ্টি নামিয়া গিয়াছে। দৌড়াইয়া গিয়া সান্তারাবাড়ি পৌছিলাম। সেখানে পাহাড়ে উঠিবার পথে একটি সশস্ত্র রক্ষীদের আড্ডা—আর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তিন চরিটি ভুটিয়া পরিবারের বাস। ঘরগুলি কাঠের, এবং নীচের মাটি হইতে বেশ খানিকটা উঁচুতে কাঠের পাটাতনের মেঝে। বন্য পশুর ভয়েতেই ঘরগুলি এইরূপ। বিশেষ করিয়া বন্য হাতীগুলি নাকি যখন তখন আসিয়া আগে বেশ উপদ্রব করিত। কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া পাটাতনে উঠিতে হয়।

আমরা দৌড়াইয়া যে ঘরখানির বারান্দায় গিয়া আশ্রয় লইলাম তাহার ভিতরে একটি মাত্র প্রৌঢ়া ভুটিয়া রমণীকে দেখিতে পাইলাম। কিছুদিন আগে তাহার স্বামী মরিয়া গিয়াছে; সন্তান নাই, তাই একাই আছে। আর কোথায় কে আছে জানিবার বা বুঝিবার সুযোগ পাইলাম না। সঙ্গের ভুটিয়ারা দু'এক-খানি ছাড়া ঘরে গিয়া দৌড়াইয়া আশ্রয় লইল।

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণ নাই। আকাশের অবস্থা ক্রমেই ভারী হইয়া উঠিতেছে,—এত কালো ভার আর বহন করিবার তাহার শক্তি নাই,—তাই প্রবলধারে অজস্রভাবে ভাঙিয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেখিতে দেখিতে বর্ষণমুখর সমস্ত নির্জন অন্ধকার দেহ-মনকে ঘিরিয়া ফেলিল, একটু একটু করিয়া পৃথিবীর অন্যসব রূপ যেন ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম, এই এক অজ্ঞেয় মূর্তিতেই যেন তাহাকে চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি—এই এক ভীষণা শ্যামা মূর্তিতে!

বর্ষা একেবারে আর থামিল না, তবে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাতাসের বেগটা যেন আস্তে আস্তে কমিয়া আসিল, ধারার বেগও কমিল। ঘর হইতে বাহিরে নামিলাম; দেখিলাম, ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভুটিয়ারা কোথা হইতে কলাপাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে এবং পাহাড়ে রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহসে ভর করিয়া তাহাদের সহিত বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রথমে ছোট্ট একটি পুল পার হইয়া খাড়া পাহাড়ের পথ ধরিলাম। খানিক দূর অগ্রসর হইবার ভিতরে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তবু ভুটিয়াদের সঙ্গে পথ চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। তবে একটা গভীর—একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা কেমন ছম ছম করিতেছে। চলিতে চলিতে দেখিলাম, মাঝে

মাঝে এক একটি শিলাখণ্ড শিখরের আকৃতিতে অনেক উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে; খানিকটা অংশ ধ্বসিয়া যাওয়ায় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; নীচে কতদূরে যে কি তাহা দেখিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। এগুলিকে এমন খাড়া খাড়া করিয়া এখানে সেখানে কে পুঁতিয়া রাখিয়াছে! উল্টিয়া পড়িয়া কখন কি সর্বনাশ ঘটাইবে কে জানে? ধূসর বিভূতি-ভূষণ ভৈরব দেবতার এইগুলিই কি ত্রিশূল? এক প্রহরের অবিরল বর্ষার ফলে পাহাড়ের গুহায় গুহায়—ফাঁকে ফাঁকে জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে—আর চারিদিক হইতে শতভঙ্গিতে তাহার পতনধ্বনি সমগ্র পর্বতটিকে গম্ভীর মন্দ্রে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও সঙ্কীর্ণ গুহাপথে বেগে ধাবিত উপল-ব্যাহত জলরাশির তাণ্ডব-নৃত্য—গম্ভীর ববম্‌-ধ্বনি,—কোথাও পর্বতপত্রে উচ্ছ্রিয়মান জলরাশির বিচিত্র ডমরুনাদ। ভৈরবের সন্ধ্যারতিতে কি পর্বতদেশ এমন করিয়াই শব্দায়মান হইয়া ওঠে?

সন্ধ্যার পরে পাহাড়ের লোকালয়ে পৌঁছিলাম। বিছানা-পত্র একটি ভুটিয়া কুলিদ্বারা পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, দেখিলাম সবই ভিজিয়া গিয়াছে, গায়ের কাপড় জামাও ভিজা। পাহাড়ে সেদিন শীত বেশ কন্‌কনে। কিন্তু সহৃদয় অতিথির দাক্ষিণ্যে সহজেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইলাম, একটা ঘন অন্ধকার এবং অজ্ঞাত রহস্যের আচ্ছন্নতার ভিতরেই রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। ‘স্বদেশীবাবু’দের বাসঘরগুলি পরিত্যক্ত রহিয়াছে। এই ‘স্বদেশীবাবু’দের জন্য পাহাড় কাটিয়াই একটা খেলার মাঠ তৈয়ারী করা হইয়াছে (ইহা ‘স্বদেশীবাবু’দের আমলের পূর্বের কিনা আমার সঠিক জানা নাই), সেই খেলার মাঠের পাশে বসিয়া আছি। কিছু দূরে উত্তরে একটি সমুন্নত গিরিশিখর। চারিদিক জুড়িয়া এই প্রভাতে কি গভীর প্রশান্তি—কি প্রসন্নতা! উত্তরের সেই সমুন্নতশির গিরিরাজ আজ ধ্যানস্থ যোগীবর। ধূসর-বিভূতি-ভূষণ যোগক্লিষ্ট কঠোর দেহখানি ঘিরিয়া কি গম্ভীর মহিমা! যোগাসনে বদ্ধদেহ স্থির অচঞ্চল,—‘অন্তশ্চরাণাং মরুতান্নিরোধাৎ নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্‌।’ অনেকক্ষণ বসিয়া দেখিলাম—অপলকভাবে নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া দেখিলাম—নিজের শ্বাসের শব্দকেও সংহত করিয়া লইলাম।

কতক্ষণ পরে চোখ ফিরাইলাম সেই গিরিশিখরের নিম্নদেশে; আশ্চর্য! নিম্নভাগে দক্ষিণপাশে রহিয়াছে কেমন শ্যামল মাঠ। তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই হঠাৎ দেখিলাম, পাহাড়ের কোন ফাঁক দিয়া প্রভাত-সূর্যের খানিকটা আলো আসিয়া পড়িয়াছে সেই মাঠের উপরে। এইবারে স্পষ্ট চিনিতে পাইলাম; যোগিবর ধ্যানস্থ মহাদেবের পাদদেশে মা পার্বতীর হাসি। পৌরুষ ধূসর শিবের সম্মুখে প্রাতঃস্নাতা গৌরবর্ণা পার্বতীর সেকি অপরূপ রূপ! যাহাকে কাল ঝড়ের অন্ধকার সন্ধ্যায় ভৈরবী কালী মূর্তিতে দেখিয়াছিলাম, এই ত সেই মায়ের কাঞ্চন-বিভা! একদিকে আত্মস্থ জ্ঞানমাত্রতনু নিশ্চল নির্বিকার মহাদেব—আর একদিকে জীবধাত্রী অন্নদা গৌরী। কতশক্তি অন্তর্লীন এই গৌরী দেহে - নিত্য তাহার প্রকাশ অন্নে ও প্রাণে!

আবার চোখ ফিরাইলাম গিরি-শিখরে। দেখিলাম, এতক্ষণে কোথা হইতে একখানি শুভ্র বঙ্কিম মেঘ ভাসিয়া আসিয়াছে, আস্তে আস্তে সে গিরির চূড়া-সংলগ্ন হইল। এইবারে বুঝিলাম, শিবের চূড়ায় চন্দ্রকলা! হ্যাঁ—এই দেবতাই ত ‘গিরিশ’—এই দেবতাই ত ‘চন্দ্রশেখর’,—এই দেবতাই ত বিভূতি-ভূষণ ‘যোগীশ্বর’!

সংস্কৃতির সংরক্ষণ

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারিপ্রকার পুরুষার্থের মূল স্বাস্থ্য—ইহা পুরাতন কথা। জাতির স্বাস্থ্য—স্বাধীনতা। জাতীয় জীবনের দুরন্ত ব্যাধি—পরাধীনতা। বহুযুগ পরে সভ্যতার আদি উৎস ও চিরন্তন আধার ভারতবর্ষ সেই পরাধীনতা হইতে যে কথঞ্চিৎ মুক্তি পাইয়াছে ইহা ইতিহাসের কীর্ত্তনীয় বার্ত্তা। ইহা শুধু যে এই বিস্তৃত দেশের কল্যাণ-বিধান করিবে তাহা নহে, পরন্তু এদেশের মৈত্রী ও শান্তির বাণী বিশ্ব-কল্যাণের প্রেরণা দিবে। জাতীয় চেতনার উন্মেষ হইতে গত শত বৎসর ধরিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, কবি ও সাধকগণ এই আশা ব্যক্ত ও প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতের জননায়কগণও উদাত্ত কণ্ঠে তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। এই আশা সার্থক হউক—এ প্রার্থনা স্বতঃই ভারতবাসীর এবং জগতের সকল নিগৃহীত জাতির অন্তর হইতে অন্তর্য্যামীর উদ্দেশে উৎসারিত হইবে।

কিন্তু মানব-প্রকৃতির বর্ত্তমান উপাদান এবং জগতের নৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতিতে সে আশা সফল হইতে পারে কিনা—তাহা প্রকৃতই আলোচনার বিষয়। মানব-পরিবারের যেরূপ সুবিন্যাস ঘটিলে বৈষম্য ও বিরোধের সম্ভাবনা নিরস্ত হয়, তাহার কতকগুলি স্থায়ী অন্তরায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অন্তরায়—ভোজ্যের অপ্রচুরতা। বিগত লোক-গণনায় পৃথিবীর অধিবাসি-সংখ্যা দুই শত কোটি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসরই এই জনসংখ্যা এক কোটি করিয়া বাড়িতেছে। এই বিপুল জনমণ্ডলীর দেহ-ধারণের উপযুক্ত খাদ্য-সম্পদ ধরিত্রীর বক্ষে আহৃত হইতে পারে না—গত মহাসংগ্রামে ও পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে এই বার্ত্তাই চারিদিকে ঘোষিত হইতেছে। বণ্টনের সুব্যবস্থার দ্বারা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর বিনিময়ের দ্বারা এই অপ্রাচুর্য্যের দুর্ভোগ যাহাতে হ্রাস করা যায় তাহার প্রবল চেষ্টা হইতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই অন্নোৎপাদন-শক্তি প্রসারিত হইতে পারে—এ আশ্বাস মাঝে মাঝে প্রচারিত হইয়া থাকে কিন্তু সে আশ্বাস অনুষ্ঠানের দ্বারা কবে সমর্থিত হইবে তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে। জীবের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তির সামঞ্জস্য কখনও সাধিত হইবে কিনা—তাহা কে জানে? বর্ত্তমানের দুঃখ ইহাই যে যত মুখ তত মুষ্টি অন্ন বসুন্ধরার ভাণ্ডারে নাই এবং অদূর ভবিষ্যতেও ইহার প্রতীকারের উপায় দেখা যাইতেছে না। প্রবল ও ধনবানের গৃধ্নুতায় এই দুঃখের মাত্রা আরও বাড়িতেছে—অপচয় ও বিসদৃশ বিভাগে একদিকে বিলাস স্ফীত হইতেছে—অন্যদিকে দরিদ্রের অভাব উত্তোরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। মানব-প্রকৃতির বদ্ধমূল বক্রতা বা ক্রূরতার জন্য নহে, পরন্তু এই বৈষম্য ও অভাবের তাড়নায় নিঃস্ব ও সম্পন্নের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এবং শক্তিমান জাতির সর্ব্বগ্রাসী লোলুপতায় উহা নিরন্তর পুষ্ট হইতেছে। দীনের বুভুক্ষু জঠর ও প্রসারিত শীর্ণ হস্তের দিকে প্রবল ও সম্পন্নের

বিমুখতা যতদিন থাকিবে ততদিন মনুষ্য-সমাজ সংগ্রামের আলোড়ন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ক্রমাগত সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে মেদিনীর ভার পাছে দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে এইজন্য প্রকৃতি হইতে তাহার কথঞ্চিৎ প্রতীকার হইয়া থাকে। আকস্মিক বিপর্য্যয় যথা—দেশবিদারী ভূকম্প, আগ্নেয়গিরি-স্রাব, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি জীব-সংখ্যা-হ্রাসের প্রাকৃতিক উপায়। এগুলি এক একটি খণ্ড প্রলয়ের মত জনপদ-ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও জীবের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যার নিয়ন্ত্রণের জন্য বলা হইয়া থাকে—যুদ্ধ জীবতত্ত্বসম্মত একটি প্রয়োজন। অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ধর্ম্মনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে এরূপ মতবাদ অবিসংবাদে গ্রাহ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহা মনুষ্য-সমাজে প্রসার লাভ করিলে আরণ্য শ্বাপদ-বৃত্তি ও মনুষ্য-চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এই পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য—মনুষ্যত্বে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সভ্যতার অসংখ্য উপকরণ, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান উত্তরোত্তর সঞ্চিত হইতেছে—সমৃদ্ধ হইতেছে। বিগত দশ হাজার বৎসরের ইতিবৃত্ত তাহারই কাহিনী। একদিকে মনুষ্য-প্রকৃতির সহজ অভিনিবেশ ও নিরন্তর উদ্যোগ রহিয়াছে—ইহা যেমন সত্য, তেমনি অপরদিকে যুযুৎসু মনোবৃত্তি যে উগ্র ও ব্যাপক হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম ইহাই প্রমাণিত করে। আমাদের মধ্যে যে নখ-দংষ্ট্রা-করাল জন্তু-সভ্যতা মসৃণ আবরণের অন্তরালে কথঞ্চিৎ মার্জিত ও দমিত হইয়া বাস করিতেছে, তাহার উচ্ছেদ এখনও হয় নাই এবং যতদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম লোভ ক্রোধ দম্ভ মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা দিবে তত দিন তাহা সম্ভব কিনা—ইহাই প্রশ্ন। সংগ্রামের প্রবৃত্তি নিরস্ত হওয়া দূরে থাকুক, ইহার ক্ষেত্র ও আয়তন ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে। মানুষের মধ্যে সংঘ-শক্তি যেমন বাড়িতেছে—সাথে সাথে সংগ্রামের পরিধিও তেমনি বিস্তৃত হইতেছে। ফলে বিগ্রহের আলোড়ন এখন আর দুইটি দেশ, দুইটি জাতি, দুই মহাদেশ বা দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না—বিরাট ঘূর্ণীর মত রণান্দোলন যখন একবার আরম্ভ হয় তখন বিশ্বের সকল জাতি ও সকল মহাদেশ অনিবার্য্য বেগে আকৃষ্ট হইয়া রসাতল-পথে নামিতে থাকে। এই নিরয়গামী পশু-স্বভাবের আনুকূল্য করিতেছে মানুষের মনীষা ও বিজ্ঞান। তাহারই পরিণতি আণবিক বোমা,—জিঘাংসা-প্রবৃত্তির প্রলয়ঙ্কর বিকাশ। বিপক্ষকে উৎসাদন এবং এবং প্রয়োজন হইলে নিশ্চিহ্ন করিয়া স্বপক্ষের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার, বিশ্বের ভোগ্য সামগ্রীর সিংহভাগ লুণ্ঠন ও গ্রাস করিবার এই যে দুরাগ্রহ—ইহার মূল জাতীয়তা-বোধ। জাতীয়তা-বোধ এক একটি বিপুল জন-সমাজকে ঐক্য ও সংহতি দিয়াছে—পরা-ধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছে—উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে—অবনত নির্য্যাতিত দেশে মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম-বুদ্ধি জাগাইয়াছে—এ সকল সুবিদিত তথ্য। যেদিন হইতে ইতালী, স্পেন ও পর্তুগালের ওলন্দাজ ও ইংরেজ জাতির নৌ-বীর-গণ দুস্তর পারাবার লঙ্ঘন করিয়া অজানা ভূখণ্ডের আবিষ্কারে দিকে দিকে অভিযানে নির্গত হইয়াছে, তদবধি প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া এই জাতীয় চেতনা ইতিহাসের ধারাকে এক নবীন খাতে প্রবাহিত করিতেছে। ফলে বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের অধিবাসিগণ পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছে, মিলিত হইয়াছে, প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং পরিশেষে প্রবলের প্রতাপে

অসহিষ্ণু হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যত হইয়াছে। জাতীয়তা হইতে জগতের প্রভূত হিত যেমন সাধিত হইয়াছে—তেমনি ইহার বর্ত্তমান চরম পর্য্যায়ে বিপুল অকল্যাণের নিদানও দেখা যাইতেছে। গরল কোথাও অমৃতে পরিণত হয়; অমৃতও অবস্থাবিশেষে বিষতুল্য হইয়া থাকে—ইহাই বিধাতার বিচিত্র বিধান। পৃথিবীময় যে জাতীয় ভাবের প্রবাহ বর্ত্তমানে তরঙ্গ-মুখর খরবেগে উচ্ছ্বলিত হইতেছে—ভারতবর্ষের পরাধীনতা-মুক্তি এবং সাথে সাথে দ্বিধা বিভাগ তাহারই দুইটী বিশাল লহরী মাত্র। ইহাকে জগদ্ব্যাপার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দৃষ্টিবিভ্রমের সম্ভাবনা।

জাতীয়তার প্রেরণায় যে উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিগ্রহের মনোভাব জন্মে তাহার পরিবর্ত্তে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বিনিময়ের প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মনুষ্য-সমাজের বিবেককে নূতন অনুভূতিতে অভিষিক্ত ও রূপায়িত করিবার জন্য বিরাট আয়োজন চলিয়াছে। জাতীয়তার স্থলে অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ইহার লক্ষ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইতে প্রায় পচিশ বৎসরব্যাপী প্রধানতঃ মার্কিনের চেষ্টার ফলে সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—আপোষ-আলোচনার দ্বারা সংগ্রামের কারণ দূর করিবার জন্য নিরন্তর প্রযত্ন হইতেছে। কিন্তু তথাপি অব্যাহত শান্তি-প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের সমক্ষে ও জ্ঞাতসারে ইন্দোনেশিয়া এবং প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠতাগর্বিত কয়েকটি রাষ্ট্র এশিয়ার অসিত-বর্ণ জাতিগুলিকে হীনজ্ঞানে এখনও পরাভূত ও দলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে যে বিগ্রহ চলিতেছে তাহা খণ্ডযুদ্ধ মাত্র, তথাপি এ সকলে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দৌর্ব্বল্য ও অসামর্থ্য প্রমাণিত হইতেছে। আন্তর্জাতীয়তা এখনও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় রহিয়াছে—স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই এবং মনুষ্য-প্রকৃতির বর্ত্তমান উপাদান ও গঠন যতদিন বজায় থাকিবে ততদিন নিজ দেশ, সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণের জন্য মানুষ আত্ম-নিয়োগ করিবে ইহা সম্ভব নহে এবং স্বাভাবিকও নহে। জাতীয়তা-বোধের অভ্যন্তরে প্রায়শঃ আত্মোৎকর্ষবুদ্ধি নিহিত থাকে। বীরত্বের অভিমান, উচ্চতর সভ্যতার অভিমান, মনীষা ও চরিত্রের উন্নতির অভিমান নাই এরূপ জাতি বিরল। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন বৈলক্ষণ্য আছে বিভিন্ন জাতির মধ্যেও তেমনই। ত্বকের বর্ণ, অঙ্গসৌষ্ঠব, শারীরিক পুষ্টি ও দৈর্ঘ্য, সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শিল্পকলার উৎকর্ষ, নিজ বাসভূমির সম্পদ ও শোভা,—প্রকৃতির পরিবেশন এমন বিচিত্র যে কেহই একেবারে বঞ্চিত নহে। কোন না কোন অংশে প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য ও গৌরব আছে। এগুলির মধ্যে শারীরিক বল, মানসিক শক্তি এবং সংহতি যখন মিলিত হয়, তখন স্বতঃই শ্রেষ্ঠতা-বুদ্ধি জন্মে। তখন প্রাকৃতিক সম্পদ আয়ত্ত করিয়া অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব এবং বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সাম্রাজ্য-লিপ্সা এবং সার্ব্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তির ইহাই মূল। এই মনোবৃত্তি সভ্যতার ঊষা হইতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতিকে চালিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদের ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইবার হয়ত সময় আসিয়াছে। কিন্তু বদ্ধমূল সংস্কার পরি-বর্ত্তিত আকারে এখনও সক্রিয়। প্রেতের ছায়া-মূর্ত্তি লইয়া সেগুলি এখনও মনোজগতে উৎপাত এবং বাহ্যজগতে নৃশংসতা করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকীয় প্রভুতা প্রকাশ্যে পরিহার করিলেও প্রকারান্তরে তাহা বজায় রাখিবার জন্য শক্তিমান

জাতিসমূহ আজও বদ্ধপরিকর। তাই নিকট প্রতিবাসীর মধ্যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদ-সৃষ্টি অতি সাধারণ কৌশলরূপে অবলম্বিত হইতেছে। ইহার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণ হইতে পারে তাহা পশ্চিম-এশিয়ার প্যালেষ্টাইনে এবং আমাদের নিজ বাসভূমিতে আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহে সামরিক ও বেসামরিক উভয় শ্রেণীই হতাহত হইয়া থাকিলেও যুধ্যমানেরই প্রাণহানি সমধিক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ক্ষমতার লালসায় শান্তিরক্ষা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের ভান করিয়া যে প্রতিবেশি-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, তাহাতে নির্লিপ্ত, নিরপরাধগণের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা অপরিসীম এবং নেতৃবর্গের ও অপ্রত্যক্ষ প্ররোচকগণের নিরাপদে সমূহ লাভ। সভ্যতার মুখোসের ভিতর হইতে এই নির্ম্মম শোণিত-প্লাবন ভূপৃষ্ঠকে কি ভাবে কলঙ্কিত করে তাহার নিদর্শন প্রত্যহ বেদনার করুণ ক্রন্দনরোলে আমাদিগের চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে মানব-পরিবার যে দুর্ভোগ সহ্য করিতেছে, বিশ্লেষণ করিলে তাহা দুইটী কারণ হইতে উদ্ভূত মনে হয়। প্রথম—জনবাহুল্য ও ভোগ্যের অপ্রাচুর্য্য। দ্বিতীয়—মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সংগ্রহণী বা গ্রসিষ্ণু মনোবৃত্তি। প্রাচীন সময়ে এগুলি এত প্রখর ও উগ্র ছিল না; কারণ মনুষ্য-সমাজ এত সংখ্যাবহুল ছিল না এবং অপরিহার্য্য ভোগ্য-সামগ্রী—গ্রাসাচ্ছাদন এত দুর্লভ হয় নাই। আকাঙ্ক্ষা তখনও সহজে নিবৃত্ত হইত না। ভোগে ভোগস্পৃহা শান্ত হয় না—ইহা তখনও সুবিদিত ছিল। কিন্তু ভোগ্য পদার্থের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বিস্তৃত হয় নাই। অভাবের মাত্রাবৃদ্ধিই সভ্যতার লক্ষণ—এ মতবাদ প্রচারিত হয় নাই এবং সভ্যসমাজের আচরণ দ্বারা সমর্থিতও হয় নাই। গত বিশ্বসংগ্রামের সময় হইতে বিলাস-দ্রব্য ছাড়িয়া অত্যাবশ্যক অপরিহার্য্য সামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সর্ব্বজাতির দৃষ্টি পড়ে এবং সহসা আবিষ্কৃত হয় যে বসুন্ধরার শস্যসম্পৎ একটি ঘাটতি কারবার—দুর্ভিক্ষ মানব-জাতির নিত্যকার ব্যাপার। এই নিত্য দুর্ভিক্ষের জ্বালা দূর করিবার জন্য সভ্যজগৎ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং ন্যায্য বিনিময় ও বিতরণের দ্বারা ইহার প্রতিবিধান করিবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। পূর্ব্বে বণিক্ সম্প্রদায়ের মারফৎ নিঃশব্দে ক্রয়-বিক্রয়দ্বারা যে বণ্টন ও সামঞ্জস্য হইত আজ ঢক্কানিনাদে আন্তর্জাতীয়তার জয় ঘোষণা করিয়া তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। ইহাতে মূল্যবিনিময় এবং মুদ্রার আদান-প্রদান বর্জিত হয় নাই; সুতরাং ইহা দাতব্য ব্যাপার নহে। তথাপি এক দেশ অন্য দেশের উপকারার্থ নিজেকে বঞ্চিত করিয়া আপন খাদ্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে—এই চিত্রই চারিদিকে প্রদর্শিত হইতেছে। অথচ শুনা যাইতেছে যে এই বিশ্বব্যাপী নিদারুণ অন্নকষ্টের বৎসরেও লক্ষ্মীর অনুগৃহীত মার্কিণ দেশে উৎপন্ন গোধূমের পরিমাণ এত অপর্য্যাপ্ত, যে সেখানে গৃহজন্তু ও শূকরের আহারেও তাহা নিঃশেষ না হওয়াতে এবং বিদেশে রপ্তানি করা লাভজনক নহে বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা নষ্ট করা হইতেছে। অতঃপর বিশ্বের শস্যসম্পদের হিসাব-নিকাশ একটি বিরাট দুর্ভেদ্য রহস্য বলিয়া যদি মনে হয় এবং শক্তিমান ভাগ্যদেবীর বরপুত্র জাতি-সমূহের আন্তর্জাতীয় আন্তরিকতায় যদি সন্দেহ জন্মে তাহা অস্বাভাবিক বা অমানুষিক মনোবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগে বিশ্বের বিরাট অঙ্গনে মানুষের মজ্জাগত মনোবৃত্তি, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী শক্তির মিলনে যে সভ্যতার বাহ্যাবরণ

রচিত হইতেছে, তাহাতে আবৃত হইয়া কালের শয্যায় পড়িয়া থাকা মনুষ্য-পরিবারের পক্ষে কল্যাণ ও সুখকর কিনা—এ প্রশ্ন আজকাল প্রায়ই উঠিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মনীষী ও চিন্তানায়কগণ—বিজ্ঞানের ধ্বংসকর কার্য্যকলাপ জাতীয় আত্মম্ভরিতার অনুকূলে এইভাবে চালিত হইলে অচিরে সভ্যতা ও মনুষ্যজাতির বিনাশের কারণ হইবে—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। মনুষ্য-সমাজ স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপে ব্যাপৃত হইবে—ইহা প্রত্যয়যোগ্য নহে। ব্যসন ও বিবেক দুই-ই মনুষ্য-প্রকৃতিতে নিহিত। ব্যসনে আত্মহারা হইয়া বিবেককে বিদায় দিয়া নিরয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে—এরূপ ব্যক্তি দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহ প্রলয়ের আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে নিজেকে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করিবে ইহা সম্ভব নহে। যুধ্যমান জাতিমাত্র জনক্ষয় ভোগ করে ইহা স্পষ্ট কিন্তু স্বজাতিক্ষয় অনীপ্সিত অপরিহার্য্য পরিণামমাত্র, আসলে অরাতি-নিধনই লক্ষ্য—স্বপক্ষের প্রাণহানি আনুষঙ্গিক ঘটনামাত্র। প্রকৃতপক্ষে যুযুৎসু মনোবৃত্তি আত্মরক্ষারই অন্যতর বিকাশ—উগ্র আত্মপর-ভেদ-বুদ্ধি ইহার মূল। এই ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার স্তরে আসিয়া জগতের দুঃখ-দুর্ভোগের মাত্রা কতদূর বাড়াইতে পারে তাহা গত বিশ্ব-সংগ্রামে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং তাহার উপশমের জন্য যুক্তরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান মনুষ্যজাতির বিবেক ও কল্যাণ-বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রতীচীর এই সকল চেষ্টার মূলে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান-সৃষ্টির উপর অবিচলিত আস্থা বর্ত্তমান। এই আস্থা অযৌক্তিক বলা সম্ভব নহে। কারণ এই প্রণালী অনুসরণ করিয়াই সভ্যতার উচ্চ শিখরে পাশ্চাত্য জগৎ আজ উপনীত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান-সৃষ্টির দ্বারা—সংগঠন দ্বারা মানুষের অন্তর-লোককে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন উত্তরোত্তর প্রবল হইতে বাধ্য। সংহতিদ্বারা শ্রেয়ঃ ও হেয়, কল্যাণ ও বিনাশ উভয়েরই উপায় হইতে পারে ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে সত্যদৃষ্টি, তাহাতে প্রত্যয় ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। এইগুলি পরীক্ষার দ্বারা শোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সঙ্কল্পশুদ্ধি সিদ্ধির নিদান। সেইজন্য পূর্ব্বে অসংখ্য বার এই প্রশ্ন উঠিলেও পুনরপি যাহা মনুষ্য-চেতনার সমক্ষে প্রকট হইতেছে—সে প্রশ্ন ইহাই—ভেদবুদ্ধি দূর করাই আন্তরিক কাম্য কি না? আমাদের পরম কল্যাণ শুধু ভোগ্য-সামগ্রীর ন্যায্য বণ্টনের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে কি না? যে সকল নৈতিক নিয়ম ও গুণ সমূহ এযাবৎ স্বীকৃত ও সমাদৃত হইয়াছে—সেগুলি একান্ত নির্ভরের সহিত অসঙ্কোচে মনুষ্যসমাজের অবলম্বনীয় কি না? নানা মতের, নানা ধর্ম্মের, নানা দর্শনের যে দ্বন্দ্ব মনোজগতে চলিয়াছে সে সকলের বিচার-বিশ্লেষণে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য সাধারণ ভূমিতে উপনীত হওয়া সম্ভব কি না? এ সকল প্রশ্নের উত্তর ভারতের মনীষিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবৃত করিয়াছেন। শাশ্বত বা সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপই সেই বিবৃতি। উহা জগতের সমক্ষে অকুণ্ঠ কণ্ঠে অবিচলিত প্রত্যয়ে প্রচার করিবার জন্য যে পরিস্থিতির প্রয়োজন তাহা শুধু ভারতের বাহিরে নয়, পরন্তু অভ্যন্তরেও এখনো সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজ হউক অথবা অদূর ভবিষ্যতে হউক উহা সৃষ্ট হইতে বাধ্য। শুধু আধিভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভে মানুষের সত্তা নির্ব্বৃত্তিলাভ করিতে পারে না। ইহা সুনির্ণীত তথ্য। সে স্বাচ্ছন্দ্য করায়ত্ত হইলেও মানুষকে মননকর্ম্মী ভাব-প্রণোদিত সমাজনির্ভর সহানুভূতিশীল জীব হইয়া থাকিতে হইবে। হৃদয় ও মনকে হিসাবের বাহিরে রাখিয়া শুধু ভোগের

পর্য্যাপ্তি এবং সমানভাবে বণ্টন দ্বারা মনুষ্য-সমাজে স্থির শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়—ইহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। অসমান বণ্টনের সুযোগে ভোগ-বিলাসের চরম গ্রহণ করিয়াও অভিজাতশ্রেণী ও শাসককুল যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই—ইহা যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেরূপ অতি প্রাচুর্য্য না হউক অন্ততঃ স্বচ্ছলতা লাভ করিলে বিরাট নর-সমাজ যে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইবে—ইহা স্বাভাবিক নিয়তি বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং অন্ন বস্ত্র আশ্রয় সমস্যার সমাধান হইলেই সকল সমস্যা অন্তর্হিত হইবে ইহা মনে করা একরূপ মানসিক মৃগতৃষ্ণিকা। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্ববিষয়ে সকল ভোগ-পদার্থে সমভাগকল্পনা সম্ভব হইলেও কার্য্যতঃ উহা সম্পাদন করা সাধ্যাতীত। প্রত্যেক ব্যক্তি বা গৃহস্থ যদি নিজ বিলাসোপকরণ, বিমান, বেতার যন্ত্র, বিচিত্র হর্ম্ম্য, ভোজ্যের ও বসনের বিলাস সমান অংশে দাবী করে এবং রাষ্ট্রকে যদি সে দাবী কার্য্যতঃ পূরণ করিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি, উপাদানসম্ভার ও মনুষ্যজাতির সম্মিলিত শ্রম ও দক্ষতা যে কত বৃদ্ধি করিতে হইবে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। ভারতের অধ্যাত্মদৃষ্টি এই বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সাম্য-স্থাপন প্রবহমান সমাজ-ব্যবস্থায় সৃষ্টি যতদিন বজায় থাকে ততদিন সম্ভব বলিয়া স্বীকার করে নাই। সৃষ্টির রহস্যই হইল অনন্ত জীব, অনন্ত বৈচিত্র্য। ইহার অন্যথা, নিরবিচ্ছিন্ন সাম্য প্রলয়েরই নামান্তর। সুযোগ ও সম্ভাব্যতার সমতা সম্ভব, কিন্তু দেহের সাম্যের মত অন্তরের সাম্য-সংঘটন মনুষ্যবুদ্ধি ও প্রযত্নের পরিধির বাহিরে। জনে জনে চিত্তবৃত্তি বিভিন্ন—অভিলাষ ও জীবনের লক্ষ্য, ধী ও স্মৃতি, কল্পনা ও হৃদয়াবেগ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক। শুধু তাহাই নহে, সমাজ-কলেবরে যে সকল বিচিত্র ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং যাহা পরিহার করিলে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-যাত্রা অসম্ভব, তন্মধ্যে নানাস্তর ও নানাপ্রকার থাকিবেই। শিল্পীর কর্ম্ম, কলাবিদের প্রযত্ন, বৈজ্ঞানিকের দিনচর্য্যা, কবি ও দার্শনিকের জীবন-প্রণালী, সৈনিকের ও শাসকের নিত্য ব্যবহার, ব্যবসায়ীর কালযাপন—এ সকল কখনও বিনিময়যোগ্য হইতে পারে না। এগুলির একটি অন্যটির তুল্যমূল্য হইতে পারে না। শ্রমিকের ও কৃষকের কর্ম্ম, আবিষ্কারক ও বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম সমপর্য্যায়ের বা একপ্রকার হইতে পারে না। অধিকন্তু কর্ম্মের মধ্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ, উচ্চ-নীচ, মলিন ও পরিচ্ছন্ন এ প্রভেদও দূর করা সম্ভব নহে। শ্রমের মর্য্যাদা ঘোষণা করা সহজ কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে এই সকল প্রকৃতিগত প্রভেদ তিরোহিত হইবার নহে; এবং বেতন, পারিশ্রমিক বা পুরস্কারের তারতম্যের দ্বারা ইহার পূরণ বা তুল্যমূল্যতা হইতে পারে না। এই সকল বস্তুগত বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়—ইহা সত্য। কিন্তু ভোগ-বস্তুর ন্যায্য বিভাগ ও বণ্টনের দ্বারা যতদূর পর্য্যন্ত সামঞ্জস্য সম্ভব তাহা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাতেও সকল সমাধানে উপনীত হওয়া যায় না। সেই জন্য ভারতের পুরাণী প্রজ্ঞা কতকগুলি মৌলিক ও অবিসংবাদিত সত্যের সন্ধান দিয়াছে এবং বিশ্ববাসী কর্ত্তৃক তাহার স্মরণ-মনন কামনা করিয়াছে। এখনও এরূপ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় আছে যাহাদের নিকট এগুলি যথাযথ স্বীকৃত হয় নাই। ভারত এগুলিকে প্রতিষ্ঠান ও প্রচারকৌশলের দ্বারা বিশ্বজনের মনে মুদ্রিত করিতে ব্যস্ত হয় নাই। তাহার বিশ্বাস—স্বচ্ছ অনুভূতি এবং জীবন্ত আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সমগ্র মনুষ্য-

সমাজ এগুলিকে স্বীকার করিবে এবং স্বীকার করিয়া প্রকৃত শান্তি ও মৈত্রীর সংস্থাপনের দ্বারা উপকৃত হইবে।

ভারতের বাণী সাম্যের বাণী নহে—ঐক্যের বাণী। এই ঐক্যের মূল সর্ব্বজীবে চৈতন্যের অনুভবে নিহিত। এই চৈতন্য সর্ব্বানুস্যূত, সর্ব্বান্তর্য্যামী। অসীম চৈতন্য ওতপ্রোত ভাবে জীবজন্তু পশুপক্ষী তরুলতায় পরিব্যাপ্ত। এই তত্ত্ব যেরূপ ঐকান্তিক উপলব্ধির সহিত উপনিষদে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে—বিশ্বসাহিত্যে তাহার তুলনা কোথায়? আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপরায়ণ মানুষ নিজ স্বার্থ স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা সুখ দুঃখে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া ক্বচিৎ অনুভব করে যে তাহারই মত সংজ্ঞা-বেদনায় ভরপুর জীবসত্ত্বে সে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। নিজ সঙ্কীর্ণ জগতের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া অন্য প্রাণীকে প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রের মতই সচল পুত্তলিকা মাত্র—নিজ প্রয়োজনের সঙ্গী ও উপকরণ বলিয়া মনে করে। মাতা, পত্নী, কন্যা, ভগিনীর যে আত্মা আছে তাহা অস্বীকার করে। নিজের রসনা পরিতৃপ্তির জন্য অসঙ্কোচে খেচর, জলচর, আকাশচর জীবসকলকে উদরসাৎ করে। যতদিন আমি ও তুমি—বিষয় ও বিষয়ী এই দুয়ের মধ্যে এই অসত্য ও অস্বীকৃতির ব্যবধান থাকে ততদিন যে নির্ম্মমতা পৃথিবী শোণিতাপ্লুত করিতেছে তাহার অবসান কিরূপে সম্ভব? ইহার বিপরীত কথা আর্য্য-প্রজ্ঞার শিক্ষা। তাই উপনিষৎ বলিতেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে ও জলে, যিনি নিখিল ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট, যিনি ওষধিসমূহে, যিনি বনস্পতিসকলে বর্ত্তমান, তাঁহাকে বারবার করি প্রণিপাত। মনুসংহিতায় আছে—

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥

কর্ম্মফলে বহুবিধ তমোদ্বারা বেষ্টিত ইহারা সুখদুঃখজড়িত—ইহারা অন্তঃসংজ্ঞ। এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের অধিষ্ঠানের ফলে নিখিল বিশ্বে সারূপ্য রহিয়াছে। মূলগত, আকরগত ঐক্যের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাই অন্যত্র উপনিষৎ বলিতেছেন—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী
সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা
কেবলো নির্গুণশ্চ॥

এক এবং অদ্বিতীয় সেই পরমেশ্বর সর্ব্বজীবে গোপনে বিরাজ করেন। নিখিল ব্যাপিয়া তিনি আছেন, সকল সৃষ্ট পদার্থের তিনি অন্তরাত্মা। তিনি কর্ম্মপ্রেরণার দাতা, সকল জীবে তাঁহার অধিষ্ঠান, তিনি চৈতন্যময় নিখিল প্রপঞ্চের সাক্ষী, নিঃসঙ্গ এবং মনুষ্যবুদ্ধির আরোপিত সকলগুণরহিত। ঐক্যের ইহাই প্রশস্ত ভিত্তি। ভিত্তি বাদ দিয়া সেতু নির্ম্মাণ—এই অনুভূতিনিরপেক্ষ হইয়া শুধু প্রতিষ্ঠান দ্বারা সাম্যস্থাপনের প্রয়াস। সেইজন্য প্রতিষ্ঠানের বিপুল আড়ম্বরের পরেও মানুষ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় অহিংসা ত্যাগ করে, নৃশংসতায় অবাধে লিপ্ত হয়। সুতরাং সকল মানব-কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে এবং ভিত্তিতে এই সত্য-প্রত্যয় আবশ্যক। শুধু ধী দ্বারা নহে পরন্তু হৃদয়ের নিবিড়তম অনুভবের দ্বারা এই প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ নহে। দেহ-মনের অসংখ্য গ্রন্থি ও বেষ্টনী ইহার অন্তরায়—রক্ত-মাংসের দেহ ইহার প্রতিরোধক। সেই জন্য ভারতের আর্য্যজ্ঞানে ইহা চরম সাধনার বস্তু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উক্তি—

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

সর্ব্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে সমবস্থিত যিনি দেখেন তিনি আত্মদ্বারা আত্মঘাত করেন না এবং পরে পরম প্রীতি লাভ করেন। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্ব্বভূতে আত্মা অবস্থিত এবং নিজ আত্মায় সর্ব্বভূত অবিষ্ঠিত যিনি দেখেন, তিনি যোগযুক্তাত্মা, তিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমান্।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

সুহৃৎ ও মিত্র, উদাসীন ও মধ্যস্থ, দ্বেষ্য বন্ধু, সাধু ও পাপাত্মা এ সকলে যিনি সমজ্ঞান করিয়া থাকেন তিনিই বিশিষ্ট পুরুষ।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

নিজের সহিত তুলনা করিয়া সর্ব্বত্র সুখ হউক বা দুঃখ হউক যিনি সম দর্শন করিয়া থাকেন —তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। এরূপ সাম্যবোধ সাধনার দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় প্রজ্ঞা অধ্যাত্মনৈতিক ভিত্তিকে ধর্ম্মের আধার ও মূল বলিয়া খ্যাপন করিয়াছি। ধর্ম্মের নানা অঙ্গ, নানা অনুষ্ঠান যুগে যুগে দেখা দিয়াছে এবং কালক্রমে বিলীন হইয়াছে—পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেগুলি কর্ম্মের শাশ্বত বা সনাতন উপাদান বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় নাই। কিন্তু যে সকল মানবীয় বৃত্তি ইতর জীব হইতে মানুষকে উচ্চতর ভূমি এবং এক বিলক্ষণ শ্রেণীতে উন্নয়ন করিয়াছে এবং যেগুলি নানা পরিবর্ত্তনের মাঝেও অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া মনুষ্য সমাজকে সংহত ও সুসংবদ্ধ রাখে সেগুলিই এদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে চিরন্তন আখ্যা লাভ করিয়াছে। নীতি ও ধর্ম্মের সম্বন্ধ বীজ ও বৃক্ষের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই। বীজ হইতে মূল, স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল জন্মে। কিন্তু কালক্রমে মহীরুহ জীর্ণ হয়, পরগাছায় আচ্ছন্ন হয়, ফল ফুল শূন্য হয়। শুধু নির্জীব নহে পরন্তু অনিষ্টের মূল হইয়া থাকে। তখন সেই বৃক্ষেরই যে বীজ মাটিতে পড়ে তাহা হইতেই নূতন কলেবরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইভাবে ধর্ম্মের গ্লানি নীতির নবজাত প্রবাহ দ্বারা শোধিত হয়। নীতি হইতে যাহার উৎপত্তি, নীতি দ্বারাই তাহার সঞ্জীবন ও সংস্কার ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে অলৌকিক প্রপঞ্চবিরহিত কেবল নীতিমূলক কতকগুলি ধর্ম্ম দেখা গিয়াছে এবং ইহাদের প্রকৃত সাফল্যের পরিচয়ও রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মানব-কল্যাণের জন্য বদ্ধপরিকর যে প্রচেষ্টা বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য তাহাতেও মৌলিক নীতি ও মানবীয় বৃত্তি সম্বন্ধে অতীতের এই ভিত্তি পরিহার করা সম্ভব হয় নাই। এই গুলিই সমাজের অদৃশ্য শৃঙ্খল। এগুলিকে অস্বীকার করিলে মনুষ্য-সত্তার মূল শিথিল হইয়া পড়ে। মনস্তত্ত্বের এগুলি আদিম ও চরম আবিষ্কার। মহাভারতকার লিখিয়াছেন—

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জবম্।
জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

সমাজ-ব্যবহারের জন্য হ্রী (অসদাচরণে সঙ্কোচ), আর্জব (সরলতা), ক্ষমা (পরদোষ-সহিষ্ণুতা) এবং দয়া (দুঃস্থের উপকার), আত্মশুদ্ধির জন্য দম (ইন্দ্রিয় নিরোধ), শৌচ (দেহমনের পরিচ্ছন্নতা), সত্যের অনুসরণ ও সন্তোষের অভ্যাস। আত্মোৎকর্ষের জন্য জ্ঞানের অনুশীলন, ধ্যানের অভ্যাস, শম (বৃত্তিস্থিরতা) এবং তপস্যা (লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য আয়াস-স্বীকার) —এগুলি ধর্ম্মের শাশ্বত উপাদান। এই গুণ-

গুলিই ইতর জীব হইতে মানবের বিশেষত্ব। বর্ত্তমান যুগে ইতিহাসের অনুশীলন ও তুলনামূলক সমালোচনার ফলে দেশ-কালের সহিত মানুষের সকল পদার্থ আপেক্ষিক, পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া গণ্য হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের শাশ্বত রূপ লইয়া মত-পরিবর্ত্তন হয় নাই। বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতি ভিন্ন, উপাস্য, উপকরণ এবং ইতিকর্ত্তব্যতা পৃথক্, কিন্তু লোক-ব্যবহারের, আত্মপদ্ধতির এবং আত্মোন্নতির জন্য এই সকলের প্রয়োজন সর্ব্বকালে সমভাবে স্বীকৃত। বিভিন্ন ভাবে পরিগণিত হইলেও এই গুলি অথবা অনুরূপ গুণসমষ্টি ধর্ম্মের মৌলিক ভিত্তির মর্য্যাদা চিরদিনই পাইয়াছে। বিপ্লবী মতবাদের উদ্ভবে যদি সমাজস্থিতির এই অপরিহার্য্য উপকরণ অস্বীকৃত ও পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের কি দশা হইবে তাহা কল্পনা করিতে স্বতঃই আতঙ্ক হয়।

স্বাধীনতা-লাভের ফলে বিশ্বময় যে সকল মনোবৃত্তি বন্যাস্রোতের মত প্রবহমাণ, ভারতও তাহাতে যদি ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সাধনা ও সংস্কৃতি অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হইবে ইহাই ভবিষ্য উদ্বেগের কারণ। গীতায় শ্রীভগবানের কথায় অর্জ্জুনের অবস্থা যেভাবে বর্ণিত আজ ভারতের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য :

কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

শক্তির স্পর্দ্ধা, অস্ত্রবলের দ্বন্দ্ব, সামগ্রীর কাড়াকাড়ি, পরস্বলোলুপতায় না হউক আত্মরক্ষার প্রযত্নেও ভারতকে প্রভাবিত করিতে পারে। ভারতের মৈত্রী ও করুণার, ঐক্য ও শান্তির আদর্শের পক্ষে তাহাই কঠিনতম পরীক্ষা। সেই সময়ে অবিচলিত প্রত্যয়ে এদেশের আত্মা মৈত্রেয়ীর বিশ্রুত উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিবে কি ?

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

এই অমৃতত্ব-লাভ দুর্ব্বল ও অক্ষম জাতির পক্ষে সম্ভব নহে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। মাত্র ঐহিক সম্পদে সম্পন্ন এবং দৈহিক বলে বলীয়ান্ হইলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। এ যাবৎ আমরা যে অধ্যাত্মসম্পদের গৌরব করিয়া আসিয়াছি, এবং যাহার ধারক ও বাহক রূপে অসংখ্য মঠ, আশ্রম, তীর্থ, তপোবন, অধ্যাত্মকেন্দ্র এখনও বিরাজমান এবং লক্ষণীয় সাধক-পুরুষের আচার-প্রচারে বিখ্যাত ও প্রোদ্ভাসিত, সে সকলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার পরিধির বাহিরে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এই কর্ম্মক্ষেত্রের জন্যও বিপুল শান্তিবাহিনীর প্রয়োজন। রাজনৈতিক মঞ্চে সমারূঢ় নহেন সুতরাং লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত যে সকল ভারতের চিরবিশ্রুত অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী পুরুষ এখনও মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার ভাবনায় নিরত, কিংবা শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতির অভ্যাসে নিবেদিতজীবন, তাঁহাদের আচার ও আদর্শ উত্তরোত্তর যাহাতে বিশ্ববাসীর সম্যক্ গোচর এবং জগৎ-কল্যাণে প্রযুক্ত হয় তাহার উপযুক্ত অবকাশ ভারতের স্বাধীনতালাভে উন্মুক্ত হইয়াছে। রক্তপ্লাবন ব্যতিরেকে দাসত্ব-শৃঙ্খলমুক্তি স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ঘটনা। ইহাতে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে মহাত্মা গান্ধীর অবদান সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের বিরাট ঐতিহ্য, তাহার মহাপ্রাণ সন্তানগণের উপদেশবাণী এবং প্রচারকাহিনী, জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এ সকল মিলিয়া ইহার ক্ষেত্র ও পটভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছে। আত্মনোমোক্ষায় যাহার প্রয়োগ হইয়াছে, জগদ্ধিতায় তাহার উৎসর্গ এখনও অপেক্ষিত ও অবশিষ্ট। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে 'উদ্বোধন' পত্রে যে সংস্কৃতি-সংরক্ষণের ব্রত শ্রীমৎ পরমহংসদেবের আশিষ-ধারায় ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় আরব্ধ হয়—নবীন উৎসাহ ও বিজয়োল্লাসে, উন্নত ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাহার উদ্‌যাপন করিবার জন্য মহাকালের আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে বৈদিক যুগের সেই প্রশান্ত গম্ভীর মন্ত্রে—

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে॥

সকল জীব যেন মিত্রের চক্ষুতে আমাকে দেখে, আমি যেন মিত্রের চক্ষুতে সকল জীবকে দেখি।

রাসায়নিক সিলে

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্সি

নব্য রসায়নের জীবন দুইশত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক। যে সকল মনীষী ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের নমস্য। মালা গাঁথিবার জন্য যে সকল জহরী অত্যুজ্জ্বল মণি-রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনগাথা আমাদের নিকট এক অমূল্য সম্পদ। এই মনীষি-গণের জীবন পাঠ করিলে দেখা যায় ইঁহারা প্রত্যেকে ঋষিতুল্য ছিলেন। সমগ্র জীবন এক ধ্যানে প্রাণপাত করিয়াছেন। শত বাধা-বিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত, ধিক্কার, অবহেলা ইঁহারা সহ্য করিয়াছেন; অনেকেই অতি নগণ্য ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের বলে দিগ্‌বিজয়ী হইয়াছেন। এক কথায় প্রত্যেকটি জীবন অতি চমৎকার ও আনন্দদায়ক। এরূপ স্বার্থদ্বেষহীন, সহজ, সরল, সত্যনিষ্ঠ জীবন পৃথিবীতে বেশী পাওয়া যায় না। এজন্যই সম্ভবতঃ সর্বশক্তিমান বিশ্বপুরুষ ইঁহাদের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন। জগৎস্রষ্টা যে গোপন সূত্রগুলি সন্নিবেশিত করিয়া এ বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, উহাদের সামান্য খেই যিনি ধরিতে পারেন তিনি যে কত বড়, মহান্, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। প্রত্যেকটি জীবন যেন তাঁহারই মহিমা ও অভিলাষ পুষ্ট ও পরিপূর্ণ করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "সাধনায় সিদ্ধি"—এ বাণীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের জীবন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে নব্য রসায়নের কাঠামো রচনা আরম্ভ হয়। তদানীন্তন ঘুমন্তপুরীতে যাঁহারা ক্রমশঃ সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আজ সিলের (Scheele) জীবনকথা স্মরণ করিব। সুইডেন বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ বার্জিলিয়াস্ (Berzilius) ও বিশ্ব-বিখ্যাত নোবেল (Nobel) সাহেবের জন্মভূমি। যে দেশ এরূপ অমূল্য রত্ন প্রসব করে সেই দেশ্ সত্যসত্যই তীর্থক্ষেত্র।

মহাত্মা সিলে ১৭৪২ খৃঃ সুইডেনের অন্তর্গত ষ্ট্রলসুণ্ড (Stralsund) নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সিলের যুগে যান-বাহনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। মুদ্রাযন্ত্র অপ্রতুল থাকায় সংবাদপত্রের তেমন প্রচলন ছিল না। ইহাতে সঙ্ঘবদ্ধ গবেষণা বা এক দেশের গবেষণার ফল অপর দেশে প্রচারিত হওয়ার উপায় ছিল কম। কেহ কোন বিষয় আবিষ্কার করিয়া যে পর্য্যন্ত পুস্তকে রূপান্তরিত করিতে না পারিতেন সে পর্য্যন্ত কেহই তাহার সাফল্যের বিষয় জানিতে পারিত না। এজন্য দেখা যাইত গরীবের অতি উচ্চ গবেষণার ফলও প্রায়শঃ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক সিলের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। সিলে ১৭৭৩ খৃঃ অক্সিজেন নামক প্রসিদ্ধ মৌলিক আবিষ্কার করেন, কিন্তু সুধীসমাজ ইহা জানিতে পারেন ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে। অপর দিকে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক প্রিষ্টলি (Priestley) সিলের এক বৎসর পরে ঐ অক্সিজেন আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রকাশ করিবার সুযোগ পাওয়ায় অক্সিজেন-আবিষ্কারকের কৃতিত্ব পাইয়াছেন।

সিলের পিতা ক্রিশ্চিয়ান্ সিলে (Christian Scheele) বংশ-মর্য্যাদায় উচ্চস্থান অধিকার

করিলেও কখনও জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা ভোগ করেন নাই। এজন্য ছেলের জীবন-প্রারম্ভেই নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হন। পিতা ব্যয়সাধ্য স্কুল-কলেজের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হওয়ায় সিলে গথার্বর্গ (Gotherborg) এর একটি ভৈষজ্যালয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ভৈষজ্যকারী (Apothecary) রূপে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিখ্যাত সিলে আজও 'এপথেকারী' বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। উক্ত ডাক্তারখানায় ঔষধ-পত্র এবং কিছু যন্ত্রপাতিও ছিল। চতুর সিলে ঐ সমস্ত জিনিষ পত্র ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইচ্ছা-মত রাসায়নিক প্রক্রিয়াসাধনে লাগিয়া গেলেন। বিদ্যা না থাকিলেও বুদ্ধি ছিল প্রখর, কাজেই জিনিষপত্র নাড়াচাড়ার ফলে সময় সময় অতি চমৎকার ফল তাঁহার করায়ত্ত হইত। সিলের কাজকর্ম্ম ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ডাক্তারখানার সত্ত্বাধি-কারী বক্ (Bauch) অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যাহাতে এই ক্ষুদ্র বালক তাহার প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয় সেইজন্য তিনি উহাকে সকল প্রকার সুবিধা দান করিতেন। ক্রমশঃ দেখা গেল সিলে ঐ ডাক্তারখানায় কয়েকটি পুস্তক ও ও বিবিধ ঔষধের মধ্যে দিবারাত্র নিমজ্জিত আছেন। বক্ এই ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং সিলের পিতাকে ছেলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া চিঠি দিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে বকের আশঙ্কা ছিল—তাঁহার ভয় হইত বালক এত পড়াশুনা করিলে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া মারা যাইবে। কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল।

কিছুদিন পরে বিপদে পড়িয়া বক্ তাঁহার প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং সিলে মালমোতে (Malmo) যাইয়া জেলষ্ট্রম (Kjellstrom) নামক অপর একজন এপথেকারী অধীনে সাহায্যকারীর পদগ্রহণ করেন। এ সময় রেট্জিয়াস (Retzius) নামক একটি সমবয়সী বালকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই রেট্জিয়াস কালে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বহু বৎসর পরে সিলের মৃত্যুর পর রেট্জিয়াস্ বন্ধুর সম্বন্ধে যে উচ্চ কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল মনুষ্য-সমাজ শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে স্মরণ করিবে। বিদ্যালয় বা ঐরূপ অপর কোন প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়ার সুবিধা না হওয়ায় সিলের কোন বিষয়ে কোন ধারাবাহিক জ্ঞান ছিল না। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল কম। একক নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা-শক্তির সাহায্যে তিনি যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ চালাইয়াছেন তাহা আমাদের মত নব্য বিজ্ঞানীদের কল্পনাতীত। সিলের মৃত্যুর পর রেট্জিয়াস, তাঁহার নোটবুকগুলি পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। নিরক্ষর, নিঃসহায়, সম্বলহীন একজন লোক এতগুলি অতি উচ্চতত্ত্বের গবেষণা করিয়া গিয়াছেন ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে?

১৭৬৮ খৃঃ সিলে রাজধানী ষ্টক্হলমে (Stockholm) যাইয়া অপর একটি ঔষধালয়ে কাজ গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় এখানে তিনি সকল সময় বেচা-কেনার ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকিতেন, গবেষণার অবসর পাইতেন কম এবং স্থানাভাবে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার কুটুরীতে বাস করিতেন। ভিতর যাহার আলোক-পরিপূর্ণ অন্ধকার তাহার কি করিবে? ইনি সামান্য অবসরে অন্ধকার ঘরের ক্ষুদ্র জানালা খুলিয়া কাজ চালাইতেন। সিলভার ক্লোরাইড (Silver Chloride) যে রৌদ্রে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা এখানেই ইনি নির্দ্ধারণ করেন। সিলের আসিবার কিছু দিন পরে রেট্জিয়াস আসিয়া

তাঁহার সঙ্গে রাজধানীতে মিলিত হন। এখানে দুইজনে একযোগে টারটারিক এসিড্ নামক বিখ্যাত জৈব অম্ল আবিষ্কার করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের 'ট্রান্জেক্সন অব দি সুইডিস্ একাডেমি অব সাইন্স'-এ (Transaction of the Swedish Academy of Science) এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। ইহাই সিলের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। পরবর্ত্তী কালে কাগজ-পত্রে জানা গিয়াছে যে সিলে ইহার পূর্ব্বে লৌহ, দস্তা ও শৈবালের (organic acid) যোগাযোগে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করেন। এ বিষয়েও তিনি একটি গবেষণা-পত্র উক্ত একাডেমিতে পেশ করেন, কিন্তু উপ্সলা (Upsala) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বার্গম্যান-এর (Bergman) ত্রুটিতে তাহা অগ্রাহ্য হয়। ষ্টক্হল্মে অবস্থানকালে সিলের সঙ্গে গন্ (Gahn) নামক একজন প্রসিদ্ধ খনিজ-তত্ত্ববিদ্ এর (Mineralogist) বন্ধুত্ব হয়। কিছুদিন পরে পণ্ডিতপ্রবর বার্গম্যানের সঙ্গে সিলের পরিচয় হয়। যে বার্গম্যান একদিন সিলের প্রবন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তিনিই আবার কিছুদিন পর ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই মণি-কাঞ্চন-যোগ বৈজ্ঞানিক সমাজের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক রসায়নশাস্ত্রে মহাজ্ঞানী, অপরটী নগণ্য ঔষধ-বিক্রেতা, পুথিগত বিদ্যায় গণ্ডমূর্খ অথচ পরীক্ষাত্মক বিজ্ঞানে সিদ্ধহস্ত। সিলের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের স্থান ছিল না। বড় বড় অধ্যাপক-গণও কেবলমাত্র বক্তৃতা ও পুস্তক লিখিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাপন করিতেন, উপযুক্ত পরীক্ষা সহায়ে কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতেন না। মহাত্মা সিলেকে পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানশাস্ত্রের পথপ্রদর্শক বলা যায়। সামান্য বিদ্যা পুঁজি নিয়া তিনি যে সমস্ত পরীক্ষা চালাইতেন বার্গম্যানের নিকট তাহা কল্পনাতীত মনে হইত. এজন্য বার্গম্যান সিলেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন এবং পণ্ডিতসমাজে তাঁহার অলৌকিক কৃতিত্ব প্রচার করিতেন। একজন জীবনলেখক বলেন—বার্গম্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ঐ সিলে, যেমন ডেভির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ফ্যারাডে।

সিলে বার্গম্যানের নিকট যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন এবং এই পণ্ডিতবরের সাহচর্য্যে ও উৎসাহে ক্রমশঃ অক্সিজেন (Oxygen) ও ক্লোরিন (Chlorine) নামক বিশ্ববিখ্যাত মৌলিকদ্বয় আবিষ্কার করেন। এই সময় তাঁহার কারখানার স্বত্বাধিকারী মিঃ লক্ (Lokk) ইঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। লকের কৃপায় সিলের সময় ও উৎসাহের অভাব ছিল না।

বার্গম্যানের সংসর্গ ও বিজ্ঞানের সাধনা ক্রমশঃ সিলেকে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে বাহিরে প্রকাশিত করে। ১৭৭৫ খৃঃ একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া 'রয়েল একাডেমী অব সাইন্স' (Royal Academy of Science) সিলেকে সভ্য করিয়া লন। শুনা যায়—সেই সভায় দেশের রাজাও উপস্থিত ছিলেন। একজন নগণ্য কম্পাউণ্ডারের পক্ষে এরূপ সম্মানলাভ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ইহার কিছুদিন পরে সিলে উপ্সলা হইতে ৬০ মাইল দূরে কোপিঙ্গ (Koping) নামক স্থানে একটী ভৈষজ্যালয়ের সর্ব্বময় কর্ণধার হন। এখানে কিছুদিন তাঁহার বেশ স্বাধীনভাবে দিন কাটিয়াছে এবং তিনি নিশ্চিন্তমনে গবেষণা চালাইয়াছেন। কিন্তু যাহার চিরদিনই কষ্টের জীবন তাহার সৌভাগ্য কতদিন থাকে?

অল্পদিন পরেই প্রতিষ্ঠানটা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। সুখের বিষয় এ সময় তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া বহু স্থান হইতে আমন্ত্রণ-লিপি আসিতে থাকে। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রিয়বন্ধু খনিজতত্ত্ববিদ্ তাঁহাকে নিজ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠান। এমন কি, সুইডেনের জনসাধারণ দাবী করেন যে সিলেকে স্টকহলমে আনিয়া বিশ্ববিত্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথোচিত সম্মান দেওয়া হউক। 'রয়েল একাডেমী অব সাইন্সে'র কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৭৭৬ খৃঃ জার্ম্মেণী হইতে সিলেকে একটি উচ্চপদ গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ-লিপি পাঠান হইয়াছিল। সিলে ঐ সকলের কোন আহ্বানই গ্রহণ করেন নাই। ঐকান্তিক দেশপ্রীতি ও স্বল্প-সন্তোষ তাঁহার অন্যত্র যাওয়ার পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি এ বিষয়ে এক সময় বার্গম্যানকে লিখিয়াছিলেন—"আমার বেশী পাওয়ার প্রয়োজন নাই, এবং যতদিন আমি আমার চাওয়ার অতিরিক্ত পাইতেছি, ততদিন আমি কোথাও যাইব না।" এ সময় আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে নিজদেশে রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং তাঁহার হাতে একটি প্রকাণ্ড ডাক্তারখানার কর্ম্মভার অর্পণ করেন।

সিলের লিখিত প্রধান পুস্তকের নাম 'কেমিকাল ট্রিটিজ্ অন্ এয়ার এণ্ড ফায়ার' (Chemical Treatise on Air and Fire)। ইহাতে ১৭৭০ খৃঃ হইতে ১৭৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত রাসায়নিক কার্য্যাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৭৭৫ খৃঃ শেষ ভাগে ইহা ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ছাপাখানার কর্ম্মচারীদের ত্রুটিতে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

সিলে ১৭৭৬ খৃঃ অক্টোবর হইতে উক্ত ভৈষজ্যালয়ে নির্ব্বিবাদে শেষদিন পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছেন। এ সময় হইতে তিনি দেশ ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। এমন কি 'একাডেমি অব সাইন্সে'র সভায় পর্য্যন্ত যোগদান করেন নাই। অবশ্য বহু বন্ধু-বান্ধব তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন এবং তিনিও অতি সমাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাত্মা সিলের কর্ম্মময় জীবনধারাকে একটি পূর্ণ গবেষণাময় জীবন বলা যায়। সমগ্র জীবন সুবিধা না অসুবিধার মধ্যে তিনি একই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন দিন স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেন নাই; কত ভয়ঙ্কর গ্যাস, বিষাক্ত পদার্থ তিনি সদা-সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিয়াছেন, এজন্য একদিনও ভীত হন নাই। প্রুসিক এসিড্ (Prussic acid) সায়ানোজেন (Cyanogen) প্রভৃতি দারুণ বিষাক্ত পদার্থ তিনিই আবিষ্কার করিয়াছেন। ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত সিলের স্বাস্থ্য বেশ স্বাভাবিক ছিল, ইহার পর হইতে তিনি ক্রমশঃ বাতরোগে আক্রান্ত হইতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন—ঐ সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস ও অল্পপরিসর অন্ধকারময় স্যাঁতসেঁতে গবেষণার স্থানই তাঁহার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কারণ। ১৭৮৫ খৃঃ উক্ত বাতব্যাধি ভীষণ ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু ইহাতে তিনি দমিত হন নাই। দারুণ শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক অবসাদের মধ্যেও তিনি রীতিমত কাজ চালাইতেছিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি গ্যালিক এসিড্ (Gallic acid) সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখিয়া সাইন্স একাডেমীতে পাঠাইয়াছিলেন। এমন কি, তিনি নাইট্রিক এসিড দিয়াও কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু একাজ সমাধান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা

ক্রমশঃ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে অসমাপ্ত কর্ম্ম রাখিয়া তিনি দেহরক্ষা করেন।

রসায়নশাস্ত্রে মহাত্মা সিলের দান অতুলনীয়। ইনি বহুবিধ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের জনক। তাঁহার কর্ম্মধারার মধ্যে জৈব অজৈব উভয়বিধ রসায়ন জড়িত। টার্টারিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, বেঞ্জোয়িক এসিড, অক্সেলিক এসিড, প্রভৃতি ১৬টী এসিড ছাড়াও ইনি চর্ব্বি, তৈল নিয়া কাজ করিতে যাইয়া গ্লিসারিন আবিষ্কার করেন। এমন কি ল্যাকটোজ চিনিটীও তাঁহার দান। সিলিকা, ম্যাগনেসিয়া মাইক্রোকস্‌মিক সল্ট প্রভৃতি আরও কয়েকটী পদার্থের রাসায়নিক চরিত্র নির্দ্ধারণ তাঁহার প্রচেষ্টায়ই হইয়াছিল। বিখ্যাত 'প্রুশিয়ান ব্লু' রং তিনিই প্রস্তুত করেন। সিলে আরসেনিক নিয়া যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। আর্‌সেনিক-ঘটিত দুইটী পদার্থে তাঁহার নাম জড়িত আছে—একটিকে বলা হয় 'সিলেজ গ্রিন' (Scheele's Green), অপরটীর নাম সিলেজ এসিড্' (Scheele's Acid)। টাঙ্গ্‌ষ্টিক এসিড (Tungstic Acid), মলিব্‌ডিক এসিড (Molybdic Acid) ও প্লাম্বাগো (Plumbago) এর যথাযথ রাসায়নিক চরিত্র ইনিই অনুধাবন করেন।

পন্থা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

পন্থা, প্রাচীন পন্থা—
কতদূর হতে আসিতেছ তুমি
চুমি জনপদ গিরি বনভূমি
আপনার মনে নীরবে একাকী
দিগ-দিগন্ত-গন্তা—
পন্থা, প্রাচীন পন্থা!

অনাদি অসীম কালরেখা ধরি
বক্ষে তোমার চলে নরনারী
দূর অজ্ঞাতে তুমি চিরসাথী
সংশয়-ভয়-হন্তা—
পন্থা, প্রাচীন পন্থা!

চলে সম্রাট রাজ্য-বিজয়ে
চলিছে প্রেমিক প্রিয়মুখ চেয়ে
গৃহসুখ-ত্যাগী চলে বৈরাগী
লয়ে করঙ্ককন্থা—
পন্থা,প্রাচীন পন্থা!

কত পথিকের হৃৎস্পন্দন
উল্লাস ব্যথা হাসি ক্রন্দন
করিছ সাক্ষ্য দিবারাতি তুমি
নির্লেপ-মোহ-চিন্তা—
পন্থা, প্রাচীন পন্থা!
হে মহাস্থবির পন্থা—

যুগে যুগে তোমা জ্ঞানী বুধজন
রেখে যান সঁপি সাধনার ধন
গহন সত্য পাবনশক্তি—
দুর্গম-সীমা-ক্রান্তা—
পন্থা, প্রাচীন পন্থা!
হে নিরবশেষ পন্থা—

আপনারে তুমি দিতেছ বিলায়ে
কুণ্ঠাবিহীন সদা নির্ভয়ে
এই তব ব্রত মহতী তৃপ্তি
বিমলা শুভ্রা শান্তা—
পন্থা, প্রাচীন পন্থা!

কোরাণে প্রার্থনা ও ইহার তাৎপর্য্য

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম্‌-এ

প্রার্থনা, নমাজ্ বা স্বলাত্ সকল ধর্ম্মেরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ এবং কোরাণেও ইহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ যে কোন ধর্ম্ম ভগবৎ-উপলব্ধির পন্থাসমূহের নামান্তর মাত্র। কোরাণেও প্রার্থনা ভগবৎ-উপলব্ধির প্রথম ও প্রধান সোপান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনার সাহায্যেই ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ভগবৎ-উপলব্ধির কথা কোরাণে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তশ্লোকবিশিষ্ট কোরাণের প্রথম অধ্যায়কে 'উম্মুল্ কোরাণ' (কোরাণের সারমর্ম্ম) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যদি আমরা ভগবান্‌কে সঠিক প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই ভগবৎ-জ্ঞান লাভ করিয়া ও তাঁহার সহিত আমাদের প্রকৃত সত্তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া ক্রমশঃ ভগবৎ-সত্তাতেই মিশিয়া যাইব। কোরাণ আমাদের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে বলিয়াছে,—আমরা ভগবান হইতে উদ্ভূত এবং আবার তাঁহার সহিতই মিলিত হইতেছি (ইন্না লিল্লাহি ব ইন্না ইলয়হি রাজিউন)।

প্রার্থনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে,—ভগবৎ-বিশ্বাসীদের জন্য এই কোরাণ নিশ্চিত পথ-প্রদর্শক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই........ এবং যাহারা প্রার্থনায় স্থিরচিত্ত (যুকীমূল অস্‌-স্বলবত্ব)···· তাহারা তাহাদের প্রভুর পথ-প্রদর্শনায় ঠিকপথেই চালিত হইবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিবে (উলয়ক 'অলা হুদ্দন্ ম্মিন্ রবিবহিম্ ব উলয়ক হুমুল্ মুফ্‌লিঃহূন)। যাহারা এই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহারা মানুষের মধ্যে ভগবৎ-সত্তা নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে, এবং সকল জীবকেই ভগবান মনে করিয়া তাহাদিগকে আন্তরিকভাবে ভালবাসিবে; কিন্তু যাহাদের ভগবৎ-সত্তায় বিশ্বাস নাই, তাহাদের প্রার্থনার কোন মূল্যই নাই, কারণ তাহাদের প্রার্থনা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ, তাহাদের সহৃদয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্যের লেশ মাত্রও নাই। কোরাণে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "সুতরাং সেইরূপ উপাসকদের ধিক্কার, যাহারা তাহাদের প্রতি উদাসীন, লোক দেখান সৎকাজ করে এবং কোন দয়াদাক্ষিণ্য করে না (১০৭; ৪-৭)। যাহাদের স্থির বিশ্বাস আছে যে ভগবৎ-সত্তা হইতেই তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং ভগবৎ-সত্তা হইতেই তাহারা উদ্ভূত এবং ভগবৎ-সত্তার সহিতই আবার তাহারা মিলিত হইবে, তাহারাই কেবল ধৈর্য্যের সহিত প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিতে পারে এবং অন্তিমে ভগবৎ-জ্ঞানলাভ করিয়া মানব-জীবন চরিতার্থ করিতে পারে। কোরাণে (২; ৪৫-৪৬) উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, "ধৈর্য্য সহকারে ও প্রার্থনার ভিতর দিয়া (ভগবৎ) সাহায্যের কামনা কর। বস্তুতঃ পবিত্রাত্মা ও স্থির-বিশ্বাসিগণই ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিবে, (কারণ) তাহাদের তাঁহার নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে। (এইরূপ বিশ্বাসী) ব্যতিরেকে অন্য কাহারো

পক্ষে (ধৈর্য্যশীল ও প্রার্থনায়) স্থিরচিত্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার।"

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মনের পবিত্রতা বিশেষ দরকার। কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "যে পবিত্রাত্মা সেই কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে (৯১; ৯)।" এই পবিত্রতা অর্জ্জন করিবার একটি বিশিষ্ট পন্থা—প্রার্থনা। পয়গম্বর্ হজরৎ মোহম্মদকে সম্বোধন করিয়া কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে "তুমি ধ্যান-যোগে (কোরাণের) যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার আবৃত্তি কর এবং প্রার্থনায় মনোনিবেশ কর। বস্তুতঃ প্রার্থনা লজ্জাকর ও ঘৃণ্য কাজকে নিবৃত্ত করে। ভগবৎ-চিন্তা নিশ্চিতরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য (২৯; ৪৫)।" বাস্তবিকপক্ষে মানুষ যাহা চিন্তা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। কাজেই সেই সর্ব্বগুণান্বিত পরমাত্মার মধ্যেই যখন কেহ তাঁহার সকল চিন্তাধারা নিহিত রাখিবেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যাইবেন। কোরাণে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "ভগবানই কেবল সকল শ্রেষ্ঠ গুণান্বিত। সুতরাং এই সকল (গুণে গুণান্বিত করিয়া) তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে থাক। যাহারা এই ভগবৎগুণে অবিশ্বাস পোষণ করে, তাহাদের সংসর্গ ত্যাগ কর। বস্তুতঃ লোকে যেরূপ আচরণ করিবে, সেইরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে (৭; ১৮০)।"

প্রার্থনামাত্রই ভগবৎপ্রশংসা ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহায্যের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। এই আকুল আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া ভগবৎ সাহায্যের দ্বারা নিজকে তাঁহার গুণে গুণান্বিত করা। কোরাণের কয়েকটি প্রার্থনার রূপ উদাহরণস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল: (১) "সকল বিশ্বজগতের প্রতিপালক ভগবানকে (আমাদের) সকল প্রশংসা অর্পিত হউক। (তিনি) অপরিসীম দয়ালু; (এবং) শেষ বিচারের দিনের সর্ব্বময় প্রভু। (হে ভগবান আমরা সকল সময় আপনাকেই উপাসনা করিতেছি, এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া (ধর্ম্মের) সরল পথ দেখান, যে পথে আপনি অন্যান্য (মহাত্মাদের) উপর দয়াবান হইয়াছেন; যাহাদের উপর আপনার অভিসম্পাত পতিত হইয়াছে, অথবা যাহারা বিপথগামী হইয়াছে, এইরূপ পথে আমাদের চালিত করিবেন না (১; ১-৭)।"

(২) "হে আমাদের প্রভু, আমাদের সকল পাপ এবং যাহা আমাদের কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিয়াছে (এইরূপ গর্হিত কাজের জন্য) আমাদের ক্ষমা কর; এবং যাহারা ভগবৎ-সত্তায় অবিশ্বাসী, এইরূপ লোকদের সংস্রব হইতে আমাদের রক্ষা কর (৩; ১৪৭)।" (৩) "হে আমার প্রভু, (জীবন-সংগ্রামে) সত্যকেই উপলব্ধির সুযোগ দাও, এবং সত্যপথে চালিত কর। (আমাকে) সাহায্য করিবার জন্য তোমার সত্তা হইতে উদ্ভূত একজন মহানপুরুষকে প্রেরণ কর (রব্বি আদখিল্নী মদখল স্বিদ্কিন্ ব অখ্রিজনী মুখ্রজ স্বিদ্কিন্ ব অজ্অল্ ল্লি মিন্ ল্লদুনক সুল্ত্বনন্ নস্বীরন্—১৭; ৮০)।"

উপরি লিখিত শ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রার্থনা ভগবৎ-পথে উন্নীত হইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা। যখন এই প্রার্থনা কাহারো জীবন-পথে সকল কাজের ভিতর দিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে, তখনই প্রার্থনা সফল ও জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু সেইরূপ সফল জীবন লাভ করিবার ভাগ্য কয় জনের হয়? তাই কোরাণ নানা উপদেশ ও বিধি-নিষেধের দ্বারা প্রার্থনাকে মানব-মনে দৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তবে মুসলমানদের মধ্যে চিরাচরিত ভাবে যে নমাজ

বা প্রার্থনার বিধি রহিয়াছে, তাহারও হুবহু মিল কোরাণে পাওয়া যায় না। নমাজ যে প্রত্যহ ৫ বারই করিতে হইবে এবং ভগবৎ-আনুগত্যের নিদর্শন-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গী সহকারে ও নির্দ্দিষ্ট শ্লোকাদি উচ্চারণ করিয়া করিতে হইবে, এইরূপ কোন আদেশ কোরাণে নাই। প্রার্থনার উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "সূর্য্যের অস্তাচল-গমনের সময় হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত নিয়মমত প্রার্থনায় লিপ্ত থাকিবে এবং ভোরের প্রার্থনা ও কোরাণ পাঠ করিবে; বস্তুতঃ ভোরের প্রার্থনা ও কোরাণ-পাঠ ভগবান প্রত্যক্ষ করেন। রাত্রির শেষভাগে প্রার্থনাদি করিবে,—ইহাতে তোমার পরম শান্তি হইবে এবং ভগবান তোমাকে নিশ্চয়ই পরম সুখ ও শান্তি দান করিবেন (১৭; ৭৮-৭৯)।"—এখানে উদ্ধৃত ১ম শ্লোক হইতে সাধারণতঃ মুসলমানদের প্রত্যহ ৫ বারের নমাজ—যথা, অতি প্রত্যূষের (ফজর্) নমাজ, দ্বিপ্রহরের (জুহর্) নমাজ, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের (আসর্) নমাজ, সূর্য্যাস্তের পর মুহূর্ত্তের (মঘ্‌রিব্) নমাজ, ও রাত্রির প্রথম প্রহরের (এশা) নমাজকে উল্লেখ করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ অনুমান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্লোকে তহজ্জুদ্ অর্থাৎ শেষরাত্রের নমাজের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা যদিও মুসলমানদের মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, তথাপি ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান সাধারণতঃ রাত্রে একবার নিদ্রা যাওয়ার পর শয্যাত্যাগপূর্ব্বক 'তহজ্জুদ্ প্রার্থনায় লিপ্ত থাকেন। কথিত আছে হজরৎ মোহাম্মদ নিজে সকল সময়ই এই শেষ রাত্রের নমাজ করিতেন এবং এই নমাজ সকল ধর্ম্মেই প্রার্থনার পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। তা ছাড়া অতি প্রত্যূষের প্রার্থনাও মনোনিবেশের পক্ষে অতি উপযুক্ত সময় এবং আমরা কোরাণে দেখিতে পাইতেছি যে ফজরের নমাজকে বেশ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই সময়ে নমাজের পূর্ব্বে বা পরে কোরাণ পাঠেরও আদেশ রহিয়াছে। কোরাণের অন্যত্র প্রার্থনার উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "তোমার প্রভুর (প্রার্থনা ও) প্রশংসাদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে করিবে। এবং রাত্রি ও দিনের বিভিন্নাংশে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে আনন্দ লাভ করিবে (২০; ১৩০)।" আবার, "দিনের দুই অন্তভাগে ও সন্ধ্যাগমের বিভিন্নাংশে প্রার্থনাকে স্থায়ী কর (১১; ১১৪)।" "..... (নির্দ্দিষ্ট সময়ে) প্রার্থনা করাকে কায়েম কর, কারণ বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করা ভগবৎ-বিশ্বাসীদের উপর নির্দ্দেশ রহিয়াছে (৪; ১০৩)।" প্রার্থনার সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই যে প্রার্থনার উপযোগী সময়ে প্রতিদিন নিয়মমত প্রার্থনা করা উচিত। ঠিক কয়বার নমাজ করিতে হইবে, তাহার কোন উল্লেখ কোরাণে নাই বরং এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে যতক্ষণ ভগবৎ-নাম ও প্রশংসা নিয়া শান্ত চিত্তে থাকা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে তাহাই মঙ্গলজনক।

শাস্ত্রকারদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নমাজ করিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি মুসলমানদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কোরাণে বিশ্লেষণপূর্ব্বক নমাজের কোন পদ্ধতির উল্লেখ নাই। আসন বা প্রণামের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "স্বর্গাদি ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য ও দিবারাত্রির নিত্য পরিবর্ত্তনাদি লক্ষ্য কর—জ্ঞানিগণ নিশ্চয়ই এই সকল হইতে (ভগবৎ-) রহস্য বুঝিতে পারেন। তাঁহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায় (কিয়মন্ ব ক'উদন্ ব অল্ জুনুবিহিম্) ভগবানের স্মরণ করেন, আর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা

করেন (৩ ; ১৯০-১৯১)।" মুসলমানদের চিরা-চরিত প্রার্থনার পদ্ধতির মধ্যে দাঁড়ান অবস্থা (কিয়াম্), নমিত অবস্থা (রুকূ'), শায়িত অবস্থা (সজুদ্), বসা (ক'দ) অবস্থা ও উভয় পাশে ফিরিয়া বিশেষ শ্লোকাদির উচ্চারণ সহ প্রার্থনার বিশেষ পদ্ধতি রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোরাণে এইরূপ কোন বিশেষ পদ্ধতি সহকারে প্রার্থনা করিবার নিয়মের উল্লেখ নাই। তবে কোরাণে এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে যে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য-প্রকাশক অঙ্গভঙ্গী সহকারে একান্ত বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করা উচিত।

প্রার্থনা বস্তুতঃ মনের পবিত্রতা-সাধন-উদ্দেশ্যে বিধি অনুযায়ী করা উচিত। এই মনের পবিত্রতার সহিত মনের বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যথেষ্ট সংযোগ রহিয়াছে। সেইজন্য কোরাণে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, "হে ভগবৎ-বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হইবে, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল, হস্ত ও বাহু কনুই পর্য্যন্ত ধৌত করিবে; মাথা জল দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে ও পদদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত ধৌত করিবে। কিন্তু যদি স্ত্রী-সঙ্গম বা প্রকৃতি-নিবন্ধন অপবিত্রতা হেতু সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ ধৌত করিবার দরকার মনে কর, তাহা হইলে স্নান করিবে। তবে তোমাদের যদি অসুখ থাকে, অথবা ভ্রমণে রত থাক বা তোমাদের কেহ যদি পায়খানা হইতে (মলমূত্র ত্যাগ করিয়া) আসিয়া থাক বা তোমরা যদি সহবাস করিয়া থাক, (কিন্তু পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য) জল না পাও, তাহা হইলে হস্তমুখাদির অপবিত্রতা বিশুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষ্কার মাটি বা বালি দ্বারা মর্দ্দন কর। (বস্তুতঃ) ভগবান কখনই তোমাদিগকে বিপদে ফেলিতে চাহেন না, বরং তোমাদিগকে বিশুদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহার প্রকাশ (বা অনুগ্রহকে) পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পার (৫ ; ৭)।" প্রার্থনার পূর্ব্বে যথা-বিহিত শরীরকে পরিষ্কার রাখার আদেশ কোরাণে রহিয়াছে। বস্তুতঃ শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অনুষ্ঠানাদির আবশ্যক, তাহাই কোরাণে সকল সময় ব্যক্ত হইয়াছে। কোরাণের অন্যত্র রহিয়াছে, "বস্তুতঃ ভগবান তাহাদিগকেই ভাল-বাসেন যাহারা তাঁহার প্রতি আগ্রহশীল ও যাহারা নিজেদের (সকল সময় দেহে ও মনে) পরিষ্কার ও পবিত্র রাখে (২ ; ২২২)।"

প্রত্যহ ৫ বার নমাজ ব্যতীত আরো কতক গুলি বিশেষ নমাজের বিধি মুসলমানদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা জুম্মার নমাজ এবং 'ইদুল-ফিত্‌র্ ও 'ইদ্-জুহ্। প্রত্যেক দিনকার নমাজ অন্যান্য লোকের সঙ্গে একত্র হইয়াও করা যাইতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে একাকীও করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ নমাজগুলি সকল সময়ই একত্র হইয়া করিবার বিধি ইসলামে রহিয়াছে। জুম্মার নমাজ শুক্র-বারে করিতে হয়; এবং এই শুক্রবারকে বলা হয় জুম্মা বা একত্র হওয়ার দিন। জুম্মার নমাজ সম্বন্ধে কোরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, "হে ভগবৎ-বিশ্বাসিগণ, যখন শুক্রবারে বা একত্র হওয়ার দিনে (য়ুমুল্ জুম্ম্'হ) তোমাদিগকে প্রার্থনার জন্য আহ্বান করা হয়; ভগবৎ-নাম-স্মরণের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও এবং অন্য কার্য্যব্যস্ততা পরিত্যাগ কর; (কারণ) ইহাই (ভগবৎ-চিন্তাই) তোমাদের জন্য প্রশস্ত, কিন্তু যদি তোমরা ইহা (প্রকৃতই) উপলব্ধি করিতে পারিতে।··যখন কোন (পার্থিব) লাভের ব্যাপার বা আমোদ-প্রমোদের বিষয় তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহারা (অর্থাৎ প্রার্থনায়

অমনোযোগী ব্যক্তিরা) তৎক্ষণাৎ তোমাকে (একাকী) প্রার্থনায় দাঁড় করাইয়া ইহাতে জড়িত হইয়া পড়ে। তাহাদের বল যে ভগবৎ-সান্নিধ্য কোন পার্থিব লাভ বা আমোদ-প্রমোদ হইতে উৎকৃষ্ট; এবং ভগবানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপজীবিকা (৬২; ৯, ১১)।" বস্তুতঃ ভক্তগণের নিকট ভগবৎ-নাম, চিন্তা ও ধ্যানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপজীবিকা। যাঁহারা ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন কিছুর দরকার নাই। তাহারা সর্ব্ব ব্যাপারে ও সর্ব্বজীবে ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া সকল সময়ই আনন্দানুভব করেন। তাঁহাদের কি জন্য আবার অর্থ-চিন্তা বা খাবার-চিন্তা করিতে হইবে? কিন্তু মানুষ যে সকল সময় ভগবৎ-প্রকাশের মধ্যেই অন্তর্নিহিত-ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে এবং ভগবৎ-চিন্তাই তাহার সত্যিকার প্রকাশ, ইহা কয়জন উপলব্ধি করিতে পারে? সেইজন্য কোরাণে এবং কোরাণের ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রার্থনার বিধি রহিয়াছে। প্রার্থনার দ্বারাই আমাদের ক্রমে ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে আমরা তাঁহার প্রকাশ। তিনি যে 'রবিবল্-আলমিয়ন' (বিশ্বজগতের নিয়ন্তা)। 'আলমিয়ন অর্থ উভয়-জগৎ, অর্থাৎ এই পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জগৎ। 'আলম্, ইলম্ (জানা) শব্দান্তর্ভুক্ত; এবং ইহার শব্দার্থ যাহা দ্বারা (ভগবানকে) জানা যায়। এই সৃষ্টিরহস্য আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াছে। কেবল আমাদের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা দ্বারা প্রার্থনার সাহায্যে ভগবৎ-উপলব্ধি করিলেই চলিবে না; সকলে একত্র হইয়া প্রার্থনার সাহায্যে আমাদের সকলের মধ্যেই যে তাঁহার প্রকাশ গভীরভাবে নিহিত হইয়া রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে সেইজন্য প্রার্থনার মধ্যে কোন উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, সকলই সমান এবং ভগবৎ-অংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতীক প্রত্যেক মানুষ ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারই সত্তা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতে যত্নবান হয়।

'ঈদুল্-ফিত্বরের নমাজ ও 'ঈদু-জ্জুহর নমাজ উভয়ই বাৎসরিক অনুষ্ঠান। এই উভয় অনুষ্ঠানেই সকল মুসলমান একত্র হইয়া ভগবৎ-সমীপে তাহাদের সকলের পৃথক্ সত্তা এক মহান্ সত্তা হইতে উদ্ভূত, ইহা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিবে। যাঁহারা সৎভাবে জীবন যাপন করিয়া, আত্মসংযম ও রিপুদমন দ্বারা পার্থিব কামনা ও বাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবৎ-সত্তা প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করিবার যোগ্য। এই উভয় অনুষ্ঠানই আনন্দোৎসব। এবং প্রকৃতই যিনি সর্ব্বজীবে ভগবৎ-অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহার মত ভাগ্যবান কে? ঈদুল্ ফিত্বরের শব্দার্থ আনন্দোৎসব এবং ইহা শওয়াল মাসের প্রথম দিনে করিতে হয়। শওয়াল মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী রমজান্ মাসে পূর্ণ এক মাসের উপবাস ও প্রার্থনা দ্বারা আত্মসংযম-শিক্ষা লাভ করিয়া সেই (পরম) আনন্দোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কোরাণে এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপবাস ও প্রার্থনাদির সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "হে (ভগবৎ-অস্তিত্বে) বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ন্যায় তোমাদের জন্যও উপবাস (অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট হইল, যাহাতে তোমরা (পবিত্রতা ও) আত্মসংযম শিক্ষা করিতে পার। ইহা নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য (স্থিরীকৃত হইল)।...... (উপবাস-পালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট) রমজান্ মাসেই কোরাণের ঐশ্বরিক বাণী সর্ব্বপ্রথমে পথপ্রদর্শকরূপে মানব-সমীপে অবতীর্ণ হইয়াছিল; ইহাতে (কোরাণে)

সদসৎ-বিচার ও জ্ঞানলাভের পন্থাদি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যাহারা (স্বগৃহে) এই মাসে উপস্থিত থাকে, তাহাদের উপবাস পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে তোমাদের মধ্যে কেহ যদি অসুস্থ হয়, অথবা ভ্রমণ-পথে থাকে, তাহা হইলে এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের (উপবাস) পরবর্ত্তী কোন সময়ে (পালন করিতে পারে)। (বস্তুতঃ) ভগবান তোমাদের সকল (বিষয়) সহজ করিয়া দিতে চাহেন, (এবং) তোমাদের বিপদে ফেলিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি চাহেন যে এই নির্দ্দিষ্ট সময় (উপবাস ও প্রার্থনা দ্বারা) পূরণ কর, এবং তাঁহার পথপ্রদর্শন হেতু তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর, যাহাতে তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পার (২ ; ১৮৩-৮৫)।" এই রমজান্ মাসের রাত্রিতে তহজ্জুদ্ প্রার্থনার বিধানকে কোরাণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

'ঈদু-জ্জুহর শব্দার্থ মহোৎসব এবং ইহার অন্য নাম 'ঈদ্-ই-কুরবাণী অর্থাৎ (আত্ম-) উৎসর্গ উৎসব। এই উৎসব কোরাণের (৩৭ অধ্যায়) নিম্নলিখিত ঘটনা স্মরণ করিয়া পালন করা হয়ঃ—ইব্রাহীম্ ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা ইসম'য়ল্ নামক একটি ধর্ম্মপ্রাণ ও সহিষ্ণু পুত্র লাভ করেন। পুত্র যৌবনত্ব লাভ করার পর ইব্রাহীম প্রিয়পুত্রকে ভগবানের নামে বলি প্রদান করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন; এবং এই আদেশ পুত্রের নিকট বলা মাত্র ইসম'য়ল্ আনন্দের সহিত ভগবৎ-উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন। "সুতরাং যখন তাহারা উভয়েই (তাঁহার নিকট) তাহাদের ইচ্ছা বিসর্জ্জন করিলেন, এবং (পুত্রকে উৎসর্গের জন্য) নতমস্তক হইলেন, আমরা (ভগবান) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "হে ইব্রাহীম্, তুমি ইতঃপূর্ব্বেই তোমার স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করিয়াছ; এইরূপেই আমরা সত্যবাদীদের পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি (১০৩-১০৫)।" রূপকভাবে ইব্রাহীম্ আদর্শ মানব ও ইসম'য়ল্ পার্থিব কামনা ও বাসনার প্রতীক। দমিত কামনাকেই কেবল স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করিয়া ভগবৎ-উপলব্ধি করা যায়।

কুরবাণীর বিধি সম্বন্ধে কোরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, "আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়েই (উৎসর্গের) বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছি, যে সকল জন্তু তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য প্রদান করিয়াছি, তাহারা যেন ভগবৎ-প্রশংসা উচ্চারণ করিয়া এই সকল বলি প্রদান করে। বস্তুতঃ ভগবান এক ও অদ্বিতীয়; সুতরাং তাঁহার নিকট তোমাদের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দাও। এবং যাহারা সত্যবাদী ও ভগবৎ-নামে কম্পমান, দুঃখে সহনশীল, রীতিমত প্রার্থনাদি করে এবং আমরা যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহাই (ভগবৎ-উদ্দেশ্যে) ব্যয় করিয়া (সন্তুষ্ট থাকে), তাহাদের (স্বর্গের) শুভ-সংবাদ দাও।······বস্তুতঃ (বলি-প্রদত্ত) মাংস বা রক্ত তাঁহার নিকট পৌঁছে না, তোমার আত্মসংযমই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। সেইজন্যই ভগবান ইহাদিগকে তোমার বাধ্য করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার পথ-প্রদর্শন-হেতু ভগবৎ-নাম স্মরণ করিতে পার। এবং সত্যান্বেষীদের শুভসংবাদ দাও (২২ ; ৩৪,৩৫ ও ৩৭)।"

মুসলমানদের প্রার্থনা সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত—দাঁড়ান (কিয়াম্), নতজানু (রকু), প্রণতি (সজুদ্) এবং ভগবৎ-অস্তিত্বে আস্থা আনয়ন (তশহুদ্)। এবং প্রার্থনা তক্বীর মন্ত্র (অর্থাৎ ভগবানই সর্ব্বশক্তিমান এইরূপ অর্থসূচক কোরাণের শ্লোক) উচ্চাচরণপূর্ব্বক আরম্ভ করিতে হয়। তৎপর কিয়াম্ অবস্থা,—ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে প্রার্থনাকারী তাহার পার্থিব সকল আকর্ষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সহজভাবে দাঁড়ান অবস্থায় ভগবৎ-

সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু প্রার্থনা-দ্বারা আমাদের এই মানুষোচিত দাঁড়ান অবস্থা (কিয়াম্-ই-ইন্সানী) পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ ইহা মানুষের গর্ব্ব ও অহঙ্কার সূচনা করে। তৎপর নিরহঙ্কার ও আত্মোৎসর্গরূপ নতজানু ও প্রণতি দ্বারা যাহাতে আমাদের জন্মের পূর্ব্বের সেই সত্যিকার আদিম অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারি তাহার জন্য যত্নবান হওয়া। কোরাণে (৭; ১৭২) উল্লেখ আছে যে মানুষ তাহার জন্মের পূর্ব্বে সেই আদিম অবস্থায় ভগবানের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে সে সকল সময় ভগবানকে মানিয়া চলিবে, কারণ ভগবান পরমশক্তিশালী, এবং তিনি ভিন্ন আর কোন শক্তিমান পুরুষ নাই। বস্তুতঃ ইহা খুবই স্বাভাবিক, কারণ সেই অবস্থায় মানুষ ছিল পরম পবিত্র ও শুদ্ধাত্মা; কিন্তু মানুষ তাহার জন্মের পরমুহূর্ত্তে অপবিত্রতা বশতঃ তাহার সেই আদিম সত্যিকার অবস্থা অনুভব করিতে পারে না।

প্রার্থনার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে সুফী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি মৌলানা রুমী তাঁহার মসনবী নামক কাব্যে গাহিয়াছেন—"হে ইমাম্, প্রার্থনার গূঢ় অর্থ এই যে, হে ভগবান, আমরা তোমার সম্মুখে বলি প্রদত্ত হইয়াছি।" কোন পশু, বলিদানের সময় বলিয়া থাক, 'ভগবানই সর্ব্বশক্তিমান।' সেইরূপ বলিদানের উপযুক্ত অপবিত্র আত্মাকে (বলিদান কর)। এই দেহ ইস্'মযল্ এবং আত্মা ইব্রাহীমের ন্যায়; আত্মা তাহার পবিত্র দেহের উপর (প্রার্থনার) তক্‌বীর্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে। লোভ বাসনা দ্বারা শরীর ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; (এখন) ভগবানই সর্ব্বশক্তিমান;—এই মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ইহা বলি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রার্থনার সময় তাহারা যেন কিয়ামতের দিনের ন্যায় সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং (নিজেদের দোষগুণ) বিচার করিতেছে এবং (ভগবৎ-সাহায্য) প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা ভগবৎ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে, ঠিক যেন মৃত্যুর পর কিয়ামতের সময় (আবার ভগবৎ-সম্মুখে) দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। (তখন) ভগবান জিজ্ঞাসা করেন, আমার জন্য আমার প্রদত্ত এই (পার্থিব) জীবন হইতে কি সংগ্রহ করিয়া নিয়া আসিয়াছ? কিভাবে তোমার জীবন অতিবাহিত করিয়াছ? এবং কিরূপে তোমার শক্তি ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করিয়াছ? কোথায় তোমার চক্ষের উজ্জ্বল দীপ্তি নষ্ট করিয়াছ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবমাননা করিয়াছ?...এইরূপে নানারকম দুঃখপূর্ণ প্রশ্ন প্রভুর নিকট হইতে উত্থিত হয়। (প্রার্থনায়) দাঁড়ান অবস্থায় (কিয়াম) এই সকল কথা ভগবান হইতে তাহার স্মরণ-পথে আসে এবং (ভক্ত দুঃখ ও) লজ্জায় অবনত মস্তকে নতজানু হইয়া (অর্থাৎ রকু' অবস্থায়) দাঁড়ায়। লজ্জায় তাহার দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না এবং অবনত মস্তকে ভগবৎ-প্রশংসা করে। পুনরায় (ভগবৎ-) আদেশ হয়, 'রকু' অবস্থা হইতে মাথা উত্তোলন কর এবং (ভগবৎ-প্রশ্নের উত্তর দাও। লজ্জিত ব্যক্তি নতজানু অবস্থা হইতে মাথা উত্তোলন করে, কিন্তু তাহার অন্যায় কার্য্য হেতু আবার প্রণতি-অবস্থায় আসে। পুনরায় ভগবৎ-আদেশ হয় যে প্রণতি-অবস্থা (সজ্‌দ্) হইতে মাথা উত্তোলন কর ও তোমার কার্য্যের বিবরণ দাও।...আত্মার অবমাননাকারী এই শঙ্কাসূচক প্রশ্নে তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি থাকে না তাই তাহার (পূর্ব্বকর্ম্মের) ভাবের চাপে, সে বসিয়া পড়ে (কুদ');—তখন তাহার প্রভু আবার তাহাকে বলেন, 'সরলভাবে বল; আমি তোমাকে মূলধনস্বরূপ অমূল্য সম্পত্তি (অর্থাৎ এই মানবজীবন) দান করিয়াছিলাম, ইহা

প্রতিদান আমাকে দাও।' তখন (ভক্ত) মহাত্মাদের আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ডান দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে ও তাহাদের ধন্যবাদ জানায়—ইহার অর্থ এই যে, হে সাহায্যকারী মহাত্মগণ, এই অধমের পা কাদায় জড়াইয়া গিয়াছে · (অনুগ্রহ করিয়া সাহায্য কর)। মহাত্মাগণ বলেন, "এখন আর কোন প্রতিকার নাই; প্রতিকার ও সাহায্যের ব্যবস্থা তথায় (অর্থাৎ মানবজীবনে) ছিল। হে ভাগ্যহীন, তুমি অসময়ে কূজনকারী পাখীর ন্যায়, এখন আর আমাদের বিরক্ত করিও না। তৎপর সে আত্মীয়-স্বজনকে লক্ষ্য করিয়া বামদিকে তাকায়, তাহারা উত্তর দেয়, 'চুপ কর; ভগবৎ-প্রশ্নের উত্তর দাও, আমরা আর কি করিতে পারি! আমাদের সাহায্যের চেষ্টা অনর্থক।' কোন দিক হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া, সেই অধমাত্মা দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া যায় এবং সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া উভয় হাত উত্তোলন করিয়া জোড় হাতে সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া বলে, 'হে ভগবান, তুমিই সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত ও অসীম; সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সাহায্যের অপেক্ষায়ই আছি।' প্রার্থনায় এই সকল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। নমাজরূপ ডিম হইতে ছানা-উৎপাদন-কারী তা দেওয়ার ব্যবস্থা কর—মোরগের ন্যায় অভক্তি ও অসহিষ্ণুতার সহিত এদিক ওদিক লক্ষ্য করিও না (৩য় ভাগ, ২১৪০-২১৭৫ পংক্তি)।"

'জন্ম নি'ক্ নব প্রাতে পৃথিবীর নূতন শৈশব'

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী

কালছায়া ঘনায়িত প্রগল্‌ভা-এ পৃথিবীর মুখে :
বন্যাব্যাপ্ত বীভৎসতা রুক্ষহাতে এঁকে দে'ছে ছোপ্;
প্রতিক্ষণে প্রতিবারে সেই ছায়া প্রকম্পিছে বুকে,
পৃথিবীর সব আলো, সব রূপ হয় বুঝি লোপ!

পৃথিবীর সব শান্তি, সব সুখ আজ বিড়ম্বিত :
কৌটিল্যের প্রতিফলে দণ্ড দিয়ে দিতে প্রতিশোধ
বিষবাষ্প বজ্র-বহ্নি উগারিয়া শতাব্দী-সঞ্চিত,
ঝঞ্ঝাবেগে গর্জি বুঝি নিখিলের করে কণ্ঠ রোধ।

ঈশানের ঊর্দ্ধ আঁখে রোষানল মৃত্যু-ভ্রূকুটির :
নগ্নপদে তাণ্ডবতা, রুদ্র কণ্ঠে ঘোর অট্টহাস;
ক্রান্তিকাল ক্রমাগত, অপরাধী তাই পৃথিবীর
প্রলয়ের চক্রতলে অন্ত্যেষ্টির হেরি পূর্বাভাস।

প্রাক্তন এ-পৃথিবীর হো'ক নাশ, হো'ক্ মৃত্যু হো'ক :
ধ্বংসতলে ভস্মলীন বৈজাতিক বীজের-বৈভব;
রাত্রিদিন ব'য়ে যা'ক্ নিষ্কলুষ উদার আলোক,
জন্ম নি'ক্ নব প্রাতে পৃথিবীর নূতন শৈশব।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত, (বঙ্গবাসী কলেজ)

সাধারণতঃ লোকের ধারণা বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে মানব ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বকাল হইতে মানবের কোনও না কোনও প্রকার ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল। বিজ্ঞান-আলোচনার ফলে সেই বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি-চালনার ফলে আমাদের চেতনার অথবা জ্ঞানের প্রসার হয়। পূর্ব্বে যাহা কেবলমাত্র বিশ্বাস ছিল বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে আজ তাহা হয় ভুল প্রমাণিত হইয়াছে, নতুবা সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াছে। তাই বলিয়া ধর্ম্মের ভিত্তি এতটুকুও শিথিল হয় নাই। তবে বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা সব কিছু চির সত্য নহে। বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি—

Like snow upon the desert's dusty face
Resting a little hour and two it's gone.

মরুর ধূলিমাখা মুখে তুষার যেমন দুই এক ঘণ্টা থাকিয়া পরে মিলাইয়া যায় কিন্তু তাহার প্রভাব থাকে, তেমনি বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি ভুল প্রমাণিত হইলেও, উহাকে ভিত্তি করিয়া নূতন মতবাদ গড়িয়া উঠে। তথাপি ইহা বলিতেই হইবে যে, বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি সত্যান্বেষী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রসায়ন শাস্ত্রের গোড়ার দিকে অণুকেই পদার্থের অবিভাজ্য সর্ব্বশেষ অংশ বলিয়া মনে করা হইত। বিজ্ঞানের সেই অবস্থায় তাহাই সত্য ছিল। তারপর পরমাণু, পরমাণু হইতে ইলেকট্রন্ ও প্রোটন ইত্যাদি শেষ অবিভাজ্য অংশ হিসাবে বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ইলেকট্রন্ ও প্রোটন একই শক্তির বিভিন্ন অবস্থা। ইহা যেন দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য!

প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার প্রকাশ। যেমন আমাদের চর্ম্মচক্ষের কাছে সূর্য্যের মত দীপ্ত পদার্থ দেখা যায় না। এখানে শক্তির ক্রিয়ার বিশেষ প্রকাশ। অদ্যাবধি মানব অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনও দেবতার প্রকাশ্য দর্শন পায় নাই। কেহ কেহ মনে করেন—ঝড় ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বিভিন্ন দেবতার কষ্টভোগের পরিচায়ক। নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা মানব ঐ সব দেবতার তুষ্টিবিধান করিবার প্রয়াস পায়। বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে মানব জানিতে পারিল যে, ঝড় ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় কোনও প্রকারে মানবের অধীন হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্য-কলাপ। ৯২টি মৌলিক পদার্থ গৃহীত হইলেও বৈজ্ঞানিক জানেন যে একই শক্তির বিভিন্ন অবস্থায় ঐরূপ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের উদ্ভব। এই তত্ত্ব না মানিয়া বিহারের ভূমিকম্পের ফলকে যদি মানবের অশেষ কুকার্য্যের ফল বলিয়া প্রচার করা হয়, টোকিওর আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে অসংখ্য প্রাণনাশকে যদি ঐ দেশের অধিবাসীদের দুষ্কার্য্যের ফল বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা হইলে বলিব ঐরূপ প্রচারকারী দল যত শীঘ্র এই অনিষ্টকর প্রচার বন্ধ করেন মানব-জাতির ততই মঙ্গল। বিজ্ঞানের সাধনলব্ধ সত্যকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া গীতার উক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।'

কাহারও কাহারও মতে ভয় হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যান যে, ধর্ম্মকে তাহারা বুঝিতে পারেন না। প্রকৃতির মধ্যে নিজের স্থান এবং প্রাকৃতিক কার্য্য-কলাপের মধ্যে একটি মাত্র সূত্র অথবা সুশৃঙ্খলা দেখা অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার ধারণাই ধর্ম্ম।

Galileo-র পর Newton-এর দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Motion) ইত্যাদি হইতে মানব খেয়ালী ভগবানের পরিবর্ত্তে নিয়ম-নিষ্ঠায় ভগবানের সন্ধান পাইল। ধর্ম্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান ইহাই সর্ব্বপ্রথম। কারণ মানবের মনোভাব ইহার ফলে আমূল পরিবর্ত্তিত হইল। ইহাতে শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল।

মানবের যাবতীয় জ্ঞান তাহার মনের উপর নির্ভর করে এবং সেই মন আবার পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া বিবর্ত্তিত হয়। কাজেই পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে মানব-মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে "প্রকৃতির পিছনে সত্যিকারের কোনও পরিচালক আছে কি না। যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি ?"

ইহার উত্তর একমাত্র বিজ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা জানা যায় না, দর্শনের সাহায্য প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ই উপলব্ধি করিয়াছিল যে, প্রকৃতির পিছনে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে বাস্তব সত্তা আছে এবং তাহারা ইহাও জানিত যে সেই সত্তা কোনও প্রকারে মানব-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অথচ সেই সত্তাসম্বন্ধে সরাসরি কোনও জ্ঞান আমরা লাভ করিতেছি না। বিজ্ঞান জানে যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করার পন্থা তাহার সীমাবদ্ধ। সেই হেতু অনুমানের দ্বারা দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে সেই বাস্তব সত্তার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু বৈজ্ঞানিক জড়বাদী ছিলেন। দার্শনিক জড়বাদের কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল। এই মতবাদের সাহায্যে প্রাণ ও মনকে জীবন্ত পদার্থের (living) গুণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইত। অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করিতেন যে জড়বাদের সাহায্যে মন অথবা প্রাণের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়না। সে সময়ে মনস্তত্ত্ব দর্শনের সহিত অভিন্ন ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের উৎপত্তি। এই মতে পদার্থ এবং তাহার শক্তিই চরম সত্য। এই মতবাদ জড়ের সংজ্ঞা দ্বারাই পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যাখ্যা করে। দার্শনিক জড়বাদ শেষ পর্য্যন্ত যান্ত্রিক মতবাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া অদ্যাবধি প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এই মতে বিশ্ব যেন সর্ব্বভাবে যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছে অথবা ইহা রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার নিয়ম অনুসরণ করিয়া কতকগুলি যন্ত্র দ্বারা গঠিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জড়বাদই বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে। দর্শনশাস্ত্র বিভিন্ন রূপে আদর্শবাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে যদিও অজ্ঞেয়বাদ প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, তথাপি একটা আসন্ন পরিবর্ত্তন এই সময়ে দেখা গিয়াছিল। কারণ, সে যন্ত্রবাদ এবং রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি প্রাকৃতিক বিষয়ের কার্য্য-কলাপ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। প্রাণের উৎপত্তি ও তাহার বিবর্ত্তন বিজ্ঞানের কাছে রহস্যময়। ইহা ক্রমে বুঝা যাইতেছে যে, পদার্থশক্তি ও রসায়নশক্তি এবং অন্য প্রকার শক্তির কার্য্য-কলাপের স্থান জগতে আছে।

পদার্থবিদ্‌গণ বিশ্বাস করেন যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া শক্তি অথবা বিদ্যুতে পরিণত

হয়; কিন্তু পরমাণুর যান্ত্রিক চিত্র অঙ্কন করা তাহাদের কাছে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ফলে পরিদৃশ্যমান জগতের যান্ত্রিক চিত্র অঙ্কন করা অসম্ভব মনে করিয়া বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ কল্পিত অস্তিত্বের ব্যবহার সম্বন্ধে গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দিবার দিকেই বেশী জোর দিতে আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে আইনষ্টাইনের মতবাদ বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহারা মনে করিলেন যে গণিতের সাহায্যে এমন কোনও জ্যামিতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাইবে যাহার ফলে ন্যায়ানুমোদিত ভাবে বিশ্বের নিয়মকানুন সমূহ ধরা পরিবে। কাজেই বুঝা যায় যে, গণিতশাস্ত্রের ভঙ্গী দার্শনিক আদর্শবাদের দিকেই ঝুকিয়া পরিতেছে।

বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ ফল হইতে অনুমানের সহায্যেই প্রকৃতির পশ্চাতের বাস্তব সত্তার জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু অনুমানের দ্বারা কাল্পনিক অস্তিত্বকে বিজ্ঞান এযাবৎ অস্বীকার করিয়াছে। যে সব ক্ষেত্রে সেই কাল্পনিক অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলে সেই সব ক্ষেত্রে অবশ্য ঐগুলি অস্বীকার করে নাই।

মূলকণা নিউট্রন ইলেকট্রন ও প্রোটনকে শক্তির কেন্দ্র হিসাবে বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে এই সব কণা কোথা হইতে আসিল? ইহা অনুমান করা হইতেছে যে প্রকৃতির পিছনে বাস্তব সত্তা হইতে ইহাদের উদ্ভব এবং সেই সত্তা বাস্তব শক্তি হিসাবে ঈশ্বরের সহিত একীভূত। এই শক্তিকেই বিশ্বশক্তি অথবা সার্ব্বভৌম শক্তি (cosmic energy) বলা যায়। এই বিশ্বশক্তি পার্থিব নয় এবং ইহার স্বরূপ বিজ্ঞান অদ্যাবধি জানিতে পারে নাই। বিশ্ব-রশ্মির উৎপত্তি স্থল যে এই বিশ্ব-শক্তি নয়, তাহা কে বলিবে?

১৮৯৬ খৃঃ বিকিরণের কার্য্যকলাপ (radio activity) আবিষ্কার-ফলে আমরা ক্রম-বিবর্ত্তিত জীবন্ত বিশ্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। দর্শনশাস্ত্রের উপরও ইহার প্রভাব দেখা যায়। এই দিকে বিজ্ঞানের দান ধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক। ইহার সঙ্গে আইনষ্টাইনের মতবাদ যোগ করিলে আমরা দেখিতে পাই বিশ্ব একবার সঙ্কুচিত, পুনরায় প্রসারিত হইতেছে, এইরূপ অনন্তকাল চলিবে। আইনষ্টাইনের মতবাদ হইতে প্রমাণ হয় যে পদার্থকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিলেও বিকিরণী শক্তি তাহার স্থান লাভ করে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বিপরীত সত্যও প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানে পদার্থ ও শক্তির মধ্যে তারতম্য করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকল প্রাণীর শরীর-বিদ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া এবং ফসিলের জীবনেতিহাস আলোচনা করিয়া ক্রমোন্নতি অর্থাৎ নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই ক্রমোন্নতি বিবর্ত্তনের পরিচয়, ধর্ম্মের প্রতি বিজ্ঞানের এই অবদান বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। হিন্দুদের দশাবতার-স্তোত্রে ভগবানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ইহা গভীর ভাবে সংযুক্ত কিনা তাহা প্রণিধানযোগ্য।

প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া একদল বিহেভিয়ারিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। কতকাংশে তাঁহাদের কার্য্য সফল হইলেও মূলতঃ তাঁহারা অকৃতকার্য্যই হইয়াছেন। এই বিষয়ে আচার্য্য জগদীশ বসুর আজীবন সাধনার ফল প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"All life is one". তাঁহার মত ও বর্ত্তমান পদার্থবিদদের আবিষ্কার—"All is energy" একত্র করিলে বলা যায় যে জগতে যাহা কিছু পদার্থ বলিয়া পরিচিত তাহাদের সমস্তই প্রাণবন্ত (living)। প্রাণশক্তি সকলের চালক স্বীকার না করিলে উহার সমস্ত কার্য্যকলাপ ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই বিশ্বপ্রাণ অথবা সার্ব্বভৌম প্রাণশক্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে। সেই শক্তির স্বরূপ বিজ্ঞান এখনও সন্ধান পায় নাই।

বিজ্ঞান পরীক্ষা লব্ধ ফল হইতে অনুমানের দ্বারা ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই। পরবর্ত্তী যাহা কিছু সবই দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই আলোচনা হইতে বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবার কিছু কারণ পাওয়া যায়।

বেদান্ত ও বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

মানব-সাধনার ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগ মুখ্যতঃ শক্তিসাধনার যুগ। সাধক-মনের তপস্যার প্রভাবে মানবীয় শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্বজগতে আপেক্ষিক ভাবে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ অনেক ক্ষেত্রে মানবীয় শক্তির আজ্ঞাবহ হইয়াছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানবীয় শক্তির প্রায় অবাধ গতি। শক্তিসাধনার ক্রমবর্দ্ধমান কৃতার্থতায় মানুষ এযুগে অভিমানে স্ফীত। তাহার ঊর্দ্ধে যে কোন মহাশক্তি আছে তাহা স্বীকার করিতে বর্ত্তমান যুগের মানুষ প্রায় অনিচ্ছুক হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে খুবই অস্বাভাবিক, তাহা বলা যায় না। তাহার শক্তি এখনো যে সব ক্ষেত্রে ব্যাহত হয় তাহার ভিতরে সে সাধনার অপূর্ণতাই অনুভব করে, তীব্রতর সাধনা দ্বারা সেই সব বাধা অপসারণ করিতে সে ব্যস্ত। সে ভরসা রাখে, তাহার শক্তির পূর্ণতম বিকাশে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিবে, সমস্ত জগতে মানবীয় শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই শক্তিসাধনায় পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় ইউরোপীয় জাতিসমূহ অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। অন্যান্য জাতিসমূহ তাহাদের সাধনা ও সিদ্ধিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের শিষ্যত্ব করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধির পথে এখনো তাহারা অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যেও সকলের কৃতিত্ব সমান নয়। অল্প কয়েকটী জাতি সিদ্ধির উন্নত সোপানে আরোহণ করিয়া মানবীয় শক্তির অসাধারণ গৌরবও ঘোষণা করিয়াছে, মানবজাতির ভাগ্যও অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

শক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম সেবা। শক্তির পরিচয় হয় কর্ম্মের মধ্যে এবং কর্ম্ম স্বভাবতঃই কোন না আদর্শের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। কর্ম্মের নিজের ভিতরে নিজের তৃপ্তি নাই, শক্তিরও নিজের ভিতরে নিজের কৃতার্থতা-বোধ নাই। মানবের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি সাধন-প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া যতই কর্ম্মজগতে বিকাশ লাভ করে, ততই সে কোন না কোন বৃহৎ ও সমুজ্জ্বল আদর্শের সেবায় আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে চায়। শক্তিসাধনার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধি যদি ক্রমশঃ উন্নত ও উন্নততর আদর্শের সন্ধান না পায়, বিকসিত শক্তিকে যদি মহান্ আদর্শের সেবায় নিয়োগ করিতে অসমর্থ হয়, তবে এই শক্তির বিকাশই মানব-সমাজে নানা প্রকার অনর্থের হেতু হয়। শক্তি যদি হয় বিশাল, আর তার সেব্য আদর্শ যদি হয় ক্ষুদ্র, তবে সেই শক্তি পরিণত হয় আসুরিক শক্তিতে এবং তার কর্ম্ম দ্বারা জগতে হয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। বর্ত্তমান যুগের শক্তিসাধনায় তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। যে সব জাতির ভিতরে শক্তির সাধনা বিপুল পরিমাণে হইয়াছে, তাহাদের আদর্শ তদনুরূপ বৃহৎ ও মহান্ হয় নাই। যেরূপ আদর্শের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া শক্তি শান্ত সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিতে পারে, যেরূপ আদর্শ

শক্তিকে সম্মোহিত ও বশীভূত রাখিয়া তাহার প্রশান্ততা ও মাধুর্য্য সম্পাদন করিতে পারে, এমন কোন আদর্শ সেই সব জাতির হৃদয় ও বুদ্ধিতে সমুদিত হয় নাই। অর্থ ও কামকে আদর্শ করিয়াই তাহাদের শক্তির সাধনা হইয়াছে, অর্থ ও কামের সেবায়ই তাহাদের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রভুত্বই তাহাদের জীবনের পুরুষার্থ।

সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রভুত্ব মানুষের পার্থিব জীবনের স্বাভাবিক কাম্য হইলেও, ইহারাই যখন মানব-সমাজে ব্যষ্টি জীবনের ও সমষ্টি জীবনের চরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়, মানবীয় শক্তি যখন মুখ্যতঃ এই আদর্শের সেবাতেই নিয়োজিত হয়, তখন শক্তিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জগতে ভেদ বৈষম্য ও বিরোধই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্যকে পরাভূত না করিয়া কাহারো প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না, অপরের দৈন্য ব্যতীত কাহারো আপন সমৃদ্ধির অনুভূতিই হয় না, অপরের চেয়ে ভোগোপকরণ বেশী না থাকিলে কেহ সুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। ইহা ব্যক্তিগত জীবনেও সত্য, সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় জীবনেও তেমনি সত্য। এই প্রকার আদর্শ গৃহীত হইলে, ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের, জাতির সহিত জাতির স্বার্থের বা পুরুষার্থের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। শক্তির বিকাশ যত বেশী হয়, সংঘর্ষও তত উৎকট হয়। শক্তিবিকাশের তারতম্যে কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, কেহ প্রবল, কেহ দুর্বল, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন হয়। কেহ প্রভু, কেহ দাস হয়। পরস্পরের বৈরভাবই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অর্থ ও কামকে আদর্শস্থানীয় করিয়া শক্তিসাধনা যতই সিদ্ধি লাভ করে, মানুষের সহিত মানুষের ভেদ, বৈষম্য, বৈরভাব, সংঘর্ষ, ঈর্ষ্যা, ঘৃণাভয়, বিদ্বেষ, ততই বীভৎস আকার ধারণ করিতে থাকে। বর্ত্তমান যুগের শক্তিসাধনার ফলে বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই। জাতির সহিত জাতির সংঘর্ষ, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর সংঘর্ষ, ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ বর্ত্তমান যুগের মানবীয় সভ্যতার স্বাভাবিক অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইতেছে। শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনিষ্টসাধনের ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। এই প্রকার আদর্শ লইয়া শক্তিসাধনা চলিতে থাকিলে মানবজাতি ধ্বংসের অভিমুখেই অগ্রসর হইবে।

পক্ষান্তরে, ভারত তথা এশিয়ার জাতিসমূহ শক্তিসাধনায় পশ্চাৎপদ থাকিয়া দুর্ব্বল ও সমৃদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দুর্ব্বলতা পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে আরও লুব্ধ ও হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচ্য জাতিসমূহের প্রতিভার অভাব নাই, কিন্তু শক্তিসাধনার ক্ষেত্র তাহার সমুচিত বিকাশ হয় নাই। তাহারা জগতে উচ্চ আদর্শ দিয়াছে, কিন্তু আদর্শের সেবায় বর্ত্তমান যুগোপযোগী আকারে শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই হেতু পাশ্চাত্য জাতি-সমূহ ইহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে এবং ইহাদের অর্থ শোষণ করিতেও সুবিধা পাইয়াছে; তৎসঙ্গে তাহাদের আদর্শ ইহাদের উপর চাপাইয়া দিয়া ইহাদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিভাও মলিন করিয়াছে। এই মলিনতা হেতু এই সব দেশেও ভেদ বৈষম্য ঈর্ষ্যা ঘৃণা কলহ বীভৎস আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সব জাতির মধ্যে কোটী কোটী নরনারী অন্নবস্ত্রের অভাবে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে বা মনুষ্যেতর জীবন যাপন করিতেছে। অট্টালিকা-বাসী ধনী লোকদের আশে পাশে অসংখ্য দীন হীন কাঙ্গাল গৃহহীন আশ্রয়হীন। জ্ঞানী ব্যক্তিদের অতি নিকটে তাঁহাদেরই মত মানুষ পুরুষপরম্পরা-ক্রমে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন দারিদ্র্যক্লিষ্ট মলিন

জীবন অতিবাহিত করিতেছে। দুর্বলদের সম্বন্ধে প্রবলদের যে দায়িত্ব আছে, অজ্ঞদের সম্বন্ধে জ্ঞানীদের যে দায়িত্ব আছে, অনুন্নতদের সম্বন্ধে উন্নতদের যে দায়িত্ব আছে, তৎসম্বন্ধে সমাজ ও জাতির প্রবলতর উন্নততর শ্রেণী সমূহের অমার্জ্জনীয় ঔদাসীন্য। সকলেই নিজেদের সুখ সমৃদ্ধি ও প্রভুত্ব লাভের জন্যই লালায়িত। প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রেণী ও জাতি স্বতন্ত্রভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই ক্ষুদ্র আদর্শের অনুসরণেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত। তাহাদের মনুষ্যত্ব ইহার মধ্যে পর্য্যবসিত। ফলে মানবসম্বন্ধে ঈর্ষ্যা ও ঘৃণা, হিংসা ও অত্যাচার, লোলুপতা ও ভীতিবিহ্বলতা, ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃহত্তর নানা রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বত্রই কখনও প্রলেপাবৃত রূপে কখনও নগ্ন কদর্য্যতা লইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

এই সমস্যার সমাধান কি? মানবসমাজের এই মহাব্যাধির প্রতীকার কি? কোন্ মহামন্ত্র বা মহৌষধ মানবজাতিকে ও মনুষ্যত্বকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃতের সন্ধান দিতে পারে? বর্ত্তমান যুগের মহাব্যাধির দ্বিবিধ রূপ। এক দিকে শক্তিসাধনার বাড়াবাড়ি, অপরদিকে শক্তিসাধনার বিমুখতা; একদিকে শক্তির সম্মুখে সমুন্নত আদর্শের অভাব, অপর-দিকে শক্তিরই সমুচিত বিকাশের অভাব। এমন কোন্ মহামন্ত্র আছে যাহা সকল ব্যক্তি সকল জাতি ও সকল শ্রেণীর অন্তরে শক্তির প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবে এবং যেখানে যে পরিমাণ শক্তির বিকাশ হইবে, সেখানেই সেই বিকশিত শক্তিকে সর্ব্বমানবকল্যাণকর সুমহান্ আদর্শের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

পঞ্চাশাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাংলারই এক অলোকসামান্য যুবক গুরুকৃপায় বর্ত্তমান যুগের মহাব্যাধির স্বরূপটী দিব্যদৃষ্টিতে নিরূপণ করিয়াছিলেন, এবং ইহার একটি মহৌষধও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহের শক্তিসাধনার গৌরব সম্যক্‌রূপে অনুভব ও স্বীকার করিয়াও, ইহার ভিতরে যে মৃত্যুর বীজও নিহিত আছে এবং আপাতসিদ্ধি-বিমোহিত সাধকদের দৃষ্টির অন্তরালে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবার, ভারত ও এশিয়ার জাতি-সমূহ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আপনাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা হারাইয়া, পাশ্চাত্য-জাতিসকলের অধীনতা ও শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রতিভানুসারে শক্তিসাধনায় আত্মনিয়োগ না করিয়া, ক্রমশঃ মৃত্যুর করাল গ্রাসের মধ্যেই যে নিপতিত হইতেছে, তাহাও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল জাতিকে মহামৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার যে মহামন্ত্র তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার নাম বেদান্ত। বাংলার এই যুবকটি বিশ্বের সর্ব্ববিদ্বজ্জন-পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় চিকাগো সহরে বিশ্বের সকল জাতির বিদ্বান্ প্রতিনিধিদের মহাসভায় তিনি এই মহামন্ত্র প্রথম প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল শ্রেণীর মানবের হৃদয়ে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনানুরূপ আকারে এই মহামন্ত্রের প্রেরণা জাগাইতে তিনি তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

বেদান্ত বস্তুতঃ বিশ্বমানবের প্রাণের বাণী, বিশ্বজগতের মর্ম্মবাণী। ভারতীয় প্রাণে ইহার প্রথম সমুজ্জ্বল প্রকাশ। ভারতের ঋষি আপনার প্রাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্বের প্রাণকে নিজের প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং বিশ্বপ্রাণের মর্ম্মবাণী নিজের প্রাণের ভিতরে প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের

প্রাণে এই বেদান্তবাণী প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাঁহারা ইহাকে আপনাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি-প্রসূত একটি উৎকৃষ্ট মতবাদ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই, তাঁহাদের প্রাণের শ্রুতিলব্ধ তত্ত্ব বলিয়াই ইহা লোকসমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতের ঋষি মুনি আচার্য্যগণ 'শ্রুতি'রূপেই এই বাণী গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্রুতি চিরন্তনী, সনাতনী। প্রাচীনতম ঋষি নিজের প্রাণে ইহা যেমন শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইদানীন্তন যে কোন ঋষিও ইহা নিজের প্রাণে শুনিতে পারেন। ব্যষ্টিপ্রাণ যখন বিশ্ব-প্রাণের সহিত সজ্ঞানে মিলিত হয়, তখনই বিশ্বপ্রাণ আপনার সনাতনী মর্ম্মবাণী সেই ব্যষ্টিপ্রাণের সমীপে প্রকাশ করেন। বিশ্বপ্রাণ ও ব্যষ্টিপ্রাণের মিলনেই বেদান্তের আত্মপ্রকাশ। ভারতের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, এই জাতির মনীষিগণ এবং জনসাধারণ নিজেদের হৃদয়-মন-বুদ্ধিতে এই বাণী গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতীয় জীবনের সকল বিভাগে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, মানব-জীবনের আদর্শ ও জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের একটি সুন্দর বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হইয়াছে, ভারতের সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, আর্থিক জীবন সবই বেদান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। এই হেতু বেদান্ত বিশেষভাবে ভারতের প্রাণের বাণীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

বেদান্তের মূল কথা এই,—বিশ্বের আত্মা ও প্রত্যেক ব্যষ্টির আত্মা এক, একই বিশ্বাত্মা অসংখ্য মানবাত্মা বা জীবাত্মারূপে প্রতীয়মান হইতেছে, একই বিশ্বপ্রাণ এই বিশ্বসংসারে নিত্য নূতন প্রাণরূপে বিকশিত হইতেছে। এই বিশাল জগৎ আপাততঃ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল উৎপত্তিস্থিতি-বিলয়াধীন অসংখ্য চেতন ও অচেতন পদার্থের সমষ্টি আকারে প্রতীয়মান হইলেও, বস্তুতঃ সমগ্র জগতের দেশকালাতীত একটি নিত্য আত্মা আছে। সকল দেশকালাধীন পদার্থের মধ্যে সেই এক অদ্বিতীয় আত্মারই বিচিত্র আত্ম-প্রকাশ। একই বহুরূপে, অনন্তই শান্তরূপে, অখণ্ডই খণ্ডরূপে, নিত্যই অনিত্যরূপে, চিৎই জড়রূপে এই বিশ্বজগতে লীলায়িত। বহুর ভিতরে একের দর্শন, সকল শক্তি ও খণ্ডের ভিতরে এক অনন্ত অখণ্ডের উপলব্ধি, সকল অনিত্য জড় দেহে এক নিত্য চৈতন্যময় আত্মার অনুভূতি, দেশকালাধীন বিচিত্র পদার্থের বিচিত্র আকার প্রকারের অন্তরালে দেশকালাতীত এক স্বপ্রকাশ সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎকার,—ইহারই নাম যথার্থ জ্ঞান, ইহাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের যথার্থ পরিচয় লাভ। অনিত্য সান্ত বহুর মধ্যে নিত্য অনন্ত এক আত্মা যতদিন আমাদের জ্ঞানে আবৃত, যতদিন এই জগতে আমরা শুধু অনিত্য সান্ত অসংখ্য পদার্থের ঘাত-প্রতিঘাতই দেখিতে থাকি, যতদিন আমাদের দৃষ্টিতে শুধু ভেদ ও বৈষম্যই সত্যরূপে ভাসিতে থাকে, ততদিন আমরা অজ্ঞ মূর্খ, ততদিন জাগতিক বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য সুবিকশিত হইলেও জগতের যথার্থ পরিচয় হইতে আমরা বঞ্চিত, জীব ও জগতের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা অন্ধ।

ভেদ-দর্শন অবলম্বনেই যখন আমরা জগতে চলিতে থাকি, ভেদকে চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া যখন আমরা দেহ মন বুদ্ধি হৃদয়ের অনুশীলন ও শক্তির সাধনা করিতে থাকি, তখন পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, তখন জগতে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, হিংসা ঘৃণা ভয় বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, তখন জীবন সংগ্রামময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মানুষের অন্তর এই সংগ্রাম চায় না, চায় শান্তি, সংঘর্ষ চায় না, চায় মিলন, হিংসা ঘৃণাদি দ্বারা সকলকে দূরে রাখিতে চায় না, প্রেমে সকলকে আপনার করিয়া লইতে চায়। মানুষ যতদিন

ভেদবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হয়, ততদিন যে তার অন্তরের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিয়া চলিতে থাকে। এই ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে তাহার অন্তর সর্ব্বদা লালায়িত। ইহার কারণ এই যে, অন্তরে অন্তরে বিশ্বপ্রাণের সহিত সে অভিন্ন, তাহার অন্তরাত্মা বিশ্বাত্মার সহিত এই নিত্য অভেদ অনুভব করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক। মানুষের জ্ঞানাধিকারের সার্থকতাই এই যে, সমুচিত সাধনা দ্বারা সে সকলের সহিত আপনার আত্মিক ঐক্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ, আপনার আত্মাকে সকলের ভিতরে এবং সকলের আত্মাকে আপনার ভিতরে প্রত্যক্ষ করিতে তাহার যোগ্যতা আছে। মন বুদ্ধি ও হৃদয়ের সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভিতরে এবং সকলের ভিতরে একই অসীম অনন্ত নিত্য সত্য চিদানন্দময় আত্মার দর্শন লাভ করিতে পারে। এবং একই আত্মার বিচিত্র লীলায়িত প্রকাশরূপে যখন যে সকল ব্যক্তি ও বস্তুকে দর্শন করে, তখনই তার দর্শন যথার্থ হয়। এই একত্ব-দর্শন হইতে জাগতিক খণ্ড জীবনে যে ব্যবহার প্রসূত হয়, তাহাই সম্যক্ ব্যবহার, তাহাই ব্যবহারিক নীতির আদর্শ। এই বার্ত্তা যে শাস্ত্র মানবসমাজে বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহারই নাম বেদান্ত শাস্ত্র।

বেদান্ত বিশ্বাত্মার নাম দিয়াছেন 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহত্তম। দেশকালানবচ্ছিন্ন অসীম অনন্ত স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দময় তত্ত্বই ব্রহ্ম, এবং এই বিশ্বজগৎ তাঁহারই সত্তায় সদ্রূপে প্রতীয়মান, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত, বিচিত্র নামে, বিচিত্ররূপে, বিচিত্র উপাধিতে তাঁহারই বিলাস। ব্যষ্টি আত্মাকে 'আত্মা' নাম দিয়া বেদান্ত ঘোষণা করিয়াছে,—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মার মধ্যে, প্রত্যেক খণ্ড প্রকাশের মধ্যে, বেদান্ত বিশ্বাত্মার দর্শন শিক্ষা দিয়াছে। বৈদান্তিক ঋষি নিজের মধ্যে বিশ্বাত্মাকে দর্শন লাভ করিয়া দ্বিধাবিহীন স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'; এবং সকলের ভিতরে তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যেককেই ডাকিয়া বলিয়াছেন,—'তৎ ত্বমসি'—তুমিও সেই ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে ছোট-বড় নাই, আপন-পর ভেদ নাই, হিংসা ঘৃণা ভয়ের পাত্র কেহ নাই, প্রভুত্বের উল্লাস বা দৈন্যের অবসাদ বা সমৃদ্ধির দম্ভ কিংবা দাসত্বের লাঞ্ছনার কোন অবকাশ নাই। 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'।

বেদান্ত সর্ব্বপ্রকার ভেদবোধকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ব্যবহারিক জনিত ভেদবোধ আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু পরমার্থতঃ ইহা সত্য নয়। তত্ত্বদৃষ্টির অভাব হইতেই এই ভেদবোধ প্রসূত, আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত পরিচয়ের অভাবেই এই সব ভেদবৈষম্য আমাদের জ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। নিজের স্বরূপ, সকলের স্বরূপ, বিশ্বের স্বরূপ যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইলে, এই সব ভেদ আর সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, বস্তুর সহিত বস্তুর, চেতনার সহিত জড়ের, বিরাটের সহিত ক্ষুদ্রের, উচ্চের সহিত নীচের যে সব ভেদ তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। বাহ্যদৃষ্টিতে ভেদ প্রতীতিগোচর হইলেও তখন অন্তর্দৃষ্টিতে ভেদ তিরোহিত হইয়া যায়। আপনার ভিতরে যে মহান্ আত্মার অনুভূতি হয়, অপর সকলের ভিতরেও সেই মহান্ আত্মারই বিচিত্র প্রকাশ উপলব্ধি-গোচর হয়। নামে, রূপে, গুণে, শক্তিতে, প্রকৃতিতে যতই বিভিন্নতা দেখা যাক না কেন, সকলেই যে স্বরূপতঃ এক, এই সত্য তখন সম্যক্‌ভাবে সমস্ত অন্তরকে অধিকার করিয়া থাকে। উপাধিগত সব ভেদকে মিথ্যা ও সকলের মধ্যে বিকশিত আত্মাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা

করিয়া, বেদান্ত সকলকেই বড় (ব্রহ্ম) করিয়া তুলিয়াছে'।

ঋষি-মানবের পূর্ণবিকশিত জাগ্রত চেতনায় যাহা নিত্য সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, সাধারণ মানবের ব্যবহারিক জীবনে তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণীয়। সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্যই মানুষের সাধনার আবশ্যকতা। এই সাধনাতেই মানুষের স্বাধীনতা বোধের সার্থকতা, মানুষের স্বাধীন জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সার্থকতা। মানুষের বিকশিত শক্তি পরম সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইলেই মনুষ্যত্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়। ঋষিদৃষ্ট পরম সত্যকে জানিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে, ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহাকে নামাইয়া আনিতে হইবে, ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য ও কর্ম্মক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেই সত্যকে এক একটি বিশিষ্ট আকারে রূপায়িত করিতে হইবে,—ব্যষ্টি মানব-চেতনার নিকট ইহাই পরম সত্যের দাবী, ইহাই মানব-জীবনের চিরন্তন আদর্শ। বিশ্বাত্মার সহিত ব্যষ্টি-আত্মার একত্ব—আপাত বিভিন্ন সকল ব্যষ্টি-আত্মার মধ্যে একই বিশ্বাত্মার বিচিত্র বিলাস,—বহুর মধ্যে একেরই সত্যতা—জড়ের মধ্যে ও চেতনারই সত্যতা,—ভেদের মধ্যে অভেদেরই সত্যতা,—ইহাই পরম সত্য, মানব-জীবন এই সত্যই ; এই সত্যই সকল জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেমের পরম আদর্শ, এই সত্যের সেবাতেই শক্তির কৃতার্থতা। বিশ্বের সকল জীব ও জড়ের সর্ব্বপ্রকার আপাত-বৈষম্যের অন্তরালে থাকিয়া, দৈনিক ও কালিক সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছিন্নতা ও পরিণামের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া, এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমাত্মা চিরকাল সকল মানবকে এই সাধনার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ জগতের সকল শ্রেণীর নরনারীকে বিশ্বাত্মার এই চিরন্তন আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য ডাক দিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবল ও দুর্ব্বল, ধনী ও নির্ধন, বিদ্বান ও মূর্খ, সুখী ও দুঃখী প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীকে উপনিষদের ভাষায় ডাকিয়া বলিয়াছেন,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। ওঠ তোমরা সকলে,—তোমাদের সকল আলস্য ও অবসাদ, সকল দৌর্ব্বল্য ও নৈরাশ্য, সকল দম্ভ ও অভিমান, সকল ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ও হিংসা, ঘৃণা, ভয়, বিদ্বেষ ঝাড়িয়া ফেলিয়া খাটী মানুষের মত উঠিয়া দাঁড়াও,—জাগিয়া ওঠ তোমাদের মোহনিদ্রা হইতে,—আত্ম চেতনায় সম্বুদ্ধ হও,—বিশ্বাত্মার আহ্বানে সাড়া দেও,—বিশ্ব-জীবনের সহিত তোমার সাধন-জীবনকে সার্থকামণ্ডিত করিবার জন্য অগ্রসর হও। যাও শ্রেষ্ঠ মহাজনদের নিকট, যাঁহাদের চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহাদের জীবন জগতের অন্তর্নিহিত পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের বাণী হইতে ও জীবন-সাধনা হইতে নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া লও,—তোমার স্বরূপ কি, তোমার জীবনের আদর্শ কি, তোমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত এই বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সত্য কি, এই বিশ্বের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? বুঝিয়া লও,—তুমি এই সংসারে যে শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছ এবং সাধনা দ্বারা এই শক্তি ও সম্পদকে যতখানি বাড়াইয়া তুলিতে পার, তার চরম সার্থকতা কোথায়? এই সব মহাপুরুষদের জীবন ও উপদেশ অবলম্বনে বিচার করিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে, তোমার অধিকার কত বড়, তোমার ভিতরে কত বড় উচ্চ আদর্শ আপনাকে বাস্তবে অভিব্যক্ত করিবার জন্য তোমার সাধনার প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

এক মহতী শক্তির বিলাসভূমি এই সংসারে সমুচিত শক্তিসাধনার অভাবহেতু যাহারা দারিদ্র্যজীর্ণ অবসাদগ্রস্ত অবজ্ঞেয় ও আত্মশ্রদ্ধাবিহীন হইয়া আছে, বেদান্ত তাহাদের প্রাণে আত্মমর্য্যাদাবোধ আত্মপ্রত্যয় ও শক্তি জাগাইবার মহামন্ত্র লইয়া তাহাদের দ্বারে সমুপস্থিত। বেদান্ত তাহাদিগকে বলিতেছে, তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি শক্তিহীন নও, তুমি বস্তুতঃ নিজেরও অবজ্ঞার পাত্র নও এবং জগতের কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নও; তোমার অন্য কিছুরই অভাব নাই। শক্তির অভাব নাই, অভাব শুধু সাধনার, শক্তির সমুচিত প্রয়োগের। তুমি 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে নিজে জান, নিজের আত্মা ও নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হও। তুমি বুঝিয়া লও যে, জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে যে আত্মার প্রকাশ, তোমার ভিতর সেই একই আত্মা বিরাজমান, সমগ্র বিশ্বের অসীম অনন্ত আত্মাপুরুষই তাঁহার, তোমার ও সকলের আত্মারূপে লীলায়মান। তুমি অবহিত হও যে, বিশ্বের সকলেই তোমার আপন জন, সকলই তোমার প্রেমাস্পদ, সকলের সহিত তুমি সমান, কেহই তোমার ভয় ঈর্ষ্যা হিংসা বা ঘৃণার পাত্র নয়। তুমি তোমার তত্ত্ববুদ্ধি ও সাধনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, মেরুদণ্ড সোজা করিয়া, মস্তক উন্নত করিয়া, সকলের সহিত সমান ভূমিতে দাঁড়াও, আপনার সাধনা দ্বারা আপনার অধিকারে আপনি প্রতিষ্ঠিত হও। জ্ঞানে শক্তিতে ও প্রেমে নীজের জীবন সার্থক কর।

শক্তি-সাধনায় আপেক্ষিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া যাহারা অভিমানে স্ফীত হইয়াছে, এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দী অভিমান দ্বারা চালিত হইয়া আপনাদিগকে এবং মানবসমাজকে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া চলিয়াছে, তাহাদিগকেও আহ্বান করিয়া বেদান্ত উপদেশ দিতেছে 'আত্মানং বিদ্ধি'। আত্মদৃষ্টি লাভ হইলে তাহারাও বুঝিবে যে, তাহাদের এই অভিমান ও দ্বন্দ্ব মিথ্যা জ্ঞান হইতে প্রসূত, জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত মহাসত্যের সহিত পরিচয়ের অভাব হইতে সঞ্জাত। মানব-জীবনের চরম আদর্শের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে না পারিয়াই তাহাদের সাধনলব্ধ শক্তি পাগলের মত ছুটাছুটী করিতেছে ও ধ্বংসলীলায় প্রবৃত্ত হইতেছে। তাহারা যদি অনুভব করে যে, একই মহান্ আত্মা তাহাদের ভিতর ও বিশ্বের সকলের ভিতরে লীলায়মান এবং সেই মহান্ আত্মাকে সকলের ভিতরে উপলব্ধি করা ও সকলের ভিতরে তাঁহাকে সেবা করাতেই তাহাদের শক্তিসাধনার সার্থকতা, তবে তাহাদের স্পর্দ্ধা ও দ্বন্দ্বস্পৃহাও আপনা আপনি তিরোহিত হয়, ঈর্ষা ঘৃণা ভয় বিদ্বেষও অন্তর হইতে বিদূরিত হয়, আপনাদের পার্থিব সুখ ও ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব আর পুরুষার্থ বলিয়া বোধ হয় না, সর্ব্বপ্রকার কলহের বীজ নষ্ট হইয়া যায়। তখন বিশ্বপ্রাণের সহিত আপন প্রাণের ঐক্য উপলব্ধি করিয়া প্রেমে সব বিশ্ববাসীর সহিত মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হইয়া উঠে, বিশ্বের সেবায় আপনার ব্যষ্টি-জীবনের সকল শক্তি ও সম্পদ উৎসর্গ করিয়া দিয়া, আপনার সব ক্ষুদ্র উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া, আপনার আত্মিক পূর্ণ স্বরূপটী আস্বাদন করাই তখন মানব-জীবনের সার্থকতা বলিয়া অনুভূত হয়।

বর্ত্তমান জগতে বেদান্তের মহামন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক শ্রেণী আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, শক্তিসাধনা প্রেমসাধনায় পরিণত হইয়া কল্যাণময়ী ও মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিবে, প্রত্যেক ব্যষ্টিই সমষ্টির সেবায় আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়া আপনার মনুষ্যত্বের সার্থকতা সম্পাদনে ব্রতী হইবে, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্ত্তে মানব-সমাজে ঐক্য শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা হইবে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা দুর্ব্বলতা সংকীর্ণতা হইতে আপনার মুক্তিসাধন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল জীবের মধ্যে আপনারই আত্মার বিচিত্র বিলাস দেখিয়া সকলেরই কল্যাণ-সাধন হইবে মানুষ মাত্রেরই কর্ম্ম-নীতি।

নাগার্জ্জুন ও তাঁহার দার্শনিক মত

অধ্যাপক শ্রীঅযোধ্যানাথ ব্যাকরণাচার্য্য,

বিদর্ভদেশে (বর্ত্তমান বেরার) জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে নাগার্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষু হওয়ার পর তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থও অসামান্য অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং তাহাতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরে শ্রীপর্ব্বত (নাগার্জ্জুনী কোণ্ডা, গুন্টুর) তাঁহার আবাসভূমি হইল এবং তথা হইতেই অতুলনীয় যশঃশ্রী চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল। এক সময়ে এই স্থানটি একটী সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

নাগার্জ্জুন কেবল দার্শনিক পণ্ডিতই ছিলেন না, পরন্তু আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন শাস্ত্রেরও প্রবীণ আচার্য্য ছিলেন। ইঁহার রচিত "অষ্টাঙ্গহৃদয়" তিব্বতে আজ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটী প্রামাণিক গ্রন্থ।

পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে যে তান্ত্রিক মত দৃষ্ট হয়, নাগার্জ্জুনকেই এই বৌদ্ধ তন্ত্রেরও প্রবর্ত্তক বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইঁহার সিদ্ধি সম্বন্ধেও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

উইণ্টরনিজ 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে'[১] লিখিয়াছেন যে, ইঁনি অন্ধ্ররাজ গৌতমী-পুত্র যজ্ঞশ্রীর সমকালীন, অর্থাৎ ১৬৬-১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

নাগার্জ্জুনের নামে অনেক গ্রন্থই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু নিম্নোক্ত পাঁচটী গ্রন্থকেই মুখ্য বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন—(১) মাধ্যমিককারিকা, (২) যুক্তিষষ্টিকা, (৩) প্রমাণবিধ্বংসন, (৪) উপায়কৌশল্য, (৫) বিগ্রহব্যাবর্ত্তনী। ইহাদের মধ্যে কেবল বিগ্রহ-ব্যাবর্ত্তনী ও মাধ্যমিক-কারিকা—এই দুইটী গ্রন্থই মূল সংস্কৃত ভাষায় উপলব্ধ হইয়াছে।

বিগ্রহব্যাবর্ত্তনী গ্রন্থে নাগার্জ্জুন বিরোধী তর্কের নিরাকরণপূর্ব্বক কাণ্টের বস্তুসারের প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তুশূন্যতা—কোনও কোনও বস্তুর মধ্যে স্থির তত্ত্ব নাই, সমস্ত বস্তুই কেবল বিচ্ছিন্ন প্রবাহমাত্র—স্থাপন করিয়াছেন।

নাগার্জ্জুনকে কারিকাশৈলীরও প্রবর্ত্তক বলা হয়। কারিকাতে সূত্রেরই মত অল্প শব্দে অনেক কথা বলিবার সুবিধা থাকে। ইহা পদ্যময় হওয়ায় মুখস্থ করিবারও অনেক সুবিধা। বিগ্রহব্যাবর্ত্তনী পুস্তকে ৭২টী কারিকা আছে। মাহাত্ম্য ও মঙ্গলশ্লোক বাদ দিলে, মূল কারিকা ৭০টীই দাঁড়ায়। সমস্ত কারিকাগুলিই শূন্যতার প্রতিপাদক, সেইজন্য ইহাকে "শূন্যতাসপ্ততি" বলা হয়। আচার্য্য নিজেই কারিকাগুলির ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। একসপ্ততিতম কারিকায় আচার্য্য শূন্যতার মাহাত্ম্য এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন—[২] "যে ব্যক্তি এই শূন্যতাকে বুঝিতে সক্ষম, সে ব্যক্তিই সমস্ত অর্থ বুঝিতেও সক্ষম হইবে, আর যাহার শূন্যতা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

আচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শূন্যতা বুঝিতে সক্ষম হইলেই প্রতীত্যসমুৎপাদ

১ History of Indian Literature, Vol. II. pp. 346-48.

২ প্রভবতি চ শূন্যতেয়ং যস্য প্রভবন্তি তস্য সর্ব্বার্থাঃ।
প্রভবতি ন তস্য কিঞ্চিৎ ন ভবতি শূন্যতা যস্য ॥

—বিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে উৎপত্তিও বুঝিতে পারা যায় এবং ইহা বুঝিতে পারিলেই বুদ্ধ-উপদিষ্ট চারি আর্য্য সত্যের (দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখনিরোধক মার্গের) অধিগম করিতে পারা যায়। এইরূপ চারিটী আর্য্য সত্যেকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তৃষ্ণার নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। যিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদ বুঝিয়াছেন তিনি ধর্ম্ম, ধর্ম্মের হেতু ও ধর্ম্মের ফল কি তাহাও জানিতে পারিবেন। এইরূপ অধর্ম্ম, অধর্ম্মের হেতু ও অধর্ম্মের ফল যে কি তাহাও তিনি জানিতে পারিবেন। তাহা হইলে হেয়বস্তুর ত্যাগ ও উপাদেয় বস্তুর গ্রহণ করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইবেন না। অবশেষে নির্ব্বাণ লাভ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন।

আচার্য্য নাগার্জ্জুন শূন্যতা অর্থে প্রতীত্য সমুৎপাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ব ও ইহার সমস্ত জড়-চেতন পদার্থসমুদয় একটী কোনও অচল স্থির তত্ত্ব হইতে শূন্য, অর্থাৎ নিত্য আত্মা বলিয়া কোনও বস্তু নাই। যাহা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা একটী বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মাত্র।

প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের দুইটী অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছেঃ (১) প্রত্যয় হইতে ভাবের উৎপত্তি—কোনও প্রত্যয়ের দ্বারা ভাবের ভাবত্ব-সিদ্ধি। কার্য্যের কার্য্যত্ব-সিদ্ধি করিতে কারণের অপেক্ষা হয়, এবং কারণের কারণত্ব-সিদ্ধি করিতে কার্য্যত্বের অপেক্ষা হইয়া থাকে। ঘড়া একটী কার্য্য, কেননা উহা চক্র, দণ্ড, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণসমুদয়-উৎপাদ্য। চক্র, দণ্ড, মৃত্তিকা প্রভৃতি ঘটের কারণ, কেননা উহারা ঘটকার্য্যের জনক। এইরূপ ঘটরূপ কার্য্যে চক্রাদি কারণবৃত্তি জনকতানিরূপিত জন্যতা রহিয়াছে এবং ঘটরূপ কার্য্য-বৃত্তি জন্যতা-নিরূপিত জনকতা চক্রাদি কারণসমুদায়ে রহিয়াছে। ইহাই হইল প্রতীত্যসমুৎপাদ। কারণ কার্য্যপ্রত্যয়ের অপেক্ষা করে এবং কার্য্য কারণপ্রত্যয়ের অপেক্ষা করে। প্রত্যেক বস্তুই এইভাবে পরস্পরাশ্রিত।

যে প্রমাণ দ্বারা বস্তুর বাস্তবিকতা নির্ণয় করিতে হইবে, সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নির্ণয় করিতে হইলেই, ইহা প্রমেয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। যে প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ নয়, তাহা প্রমেয় নির্ণয় করিতে কিরূপে সক্ষম হইতে পারে? আর যদি প্রমাণের প্রামাণ্য-সিদ্ধি করিতে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার প্রামাণ্য থাকিবে না, প্রত্যুত প্রমেয়-কোটীতেই নিবিষ্ট হইবে। যদি কোনও বস্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অচল স্থির পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু তদ্রূপ পদার্থের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। এই জন্য বস্তুর শূন্যতাই সত্য।[৩]

(২) প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থে ক্ষণিক-বাদকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রতীত্য—নাশের পর সমুৎপাদ—উৎপত্তি। প্রত্যেক বস্তুই নষ্ট ও উৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত বিশ্বটাই যেন নাশ ও উৎপত্তির প্রবাহ। প্রত্যেক ক্ষণে প্রত্যেক বস্তুটীর নাশ ও উৎপত্তি হয়। সেই জন্য কোন বস্তুরই স্থিররূপতা স্বভাব হইতে পারে না। এই অর্থেও অচল স্থির বলিয়া কোনরূপ বস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে না।

আচার্য্য নাগার্জ্জুন মাধ্যমিককারিকায় উপর্য্যুক্ত শূন্যবাদের ভিত্তি বিশেষভাবে দৃঢ় করিয়াছেন। মাধ্যমিককারিকার রচনা বিগ্রহ-ব্যাবর্ত্তনীর রচনা অপেক্ষা সাতিশয় পৌঢ়। গৌতমবুদ্ধ আত্মবাদীও ছিলেন না এবং ভৌতিকবাদীও ছিলেন না। উভয়ে মধ্যম পথ—বিচ্ছিন্ন প্রবাহ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই মধ্যম পথের প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া, এই দর্শনের নামও মাধ্যমিক দর্শন।

৩ ইহ হি যঃ প্রতীত্য ভাবানাং ভাবঃ সা শূন্যতা। কস্মাৎ? নিঃস্বভাবত্বাৎ। যে হি প্রতীত্যসমুৎপন্না ভাবাস্তে ন সস্বভাবা ভবন্তি স্বভাবাভাবাৎ। কস্মাৎ? হেতু তয়াপেক্ষত্বাৎ। যদিতি স্বভাবতো ভাবাভবেয়ুঃ। প্রত্যাখ্যায়ামপি হেতুপ্রত্যয়ং ভবেৎ।

ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গত ১০ই সেপ্টেম্বর বুধবার ডক্টর আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী সত্তর বৎসর বয়সে আমেরিকার বোষ্টন শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ২২শে আগষ্ট শুক্রবার তাঁহার সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলম্বো, লণ্ডন, নিউইয়র্ক এবং আমেরিকার কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রে সভা হইয়াছিল। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর তিনি বোষ্টন সহরের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসের সহিত সংযুক্ত ছিলেন—প্রথমে প্রাচ্য শিল্পের গবেষকরূপে এবং পরে ভারতীয় ও সুদূর প্রাচ্য শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর রূপে। তাঁহার দেহাবসানের পরে মিউজিয়ামের অফিসার-গণ ডাঃ কুমারস্বামীকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষিরূপে বর্ণনা করেন। ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রায় ষাট খানি পুস্তক ও পুস্তিকার প্রণেতা।

১৮৭৭ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট আনন্দ কেন্টিশ কলম্বো সহরের কলুপিটিয়া নামক অংশে 'রাইনল্যাণ্ড' ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্যার মুথু কুমারস্বামী সিংহলের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছিলেন। স্যার মুথু ছিলেন এশিয়ার সর্ব্বপ্রথম স্যার উপাধিকারী এবং লণ্ডনের প্রথম হিন্দু ব্যারিষ্টার। তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'দাতবংশ' নামক পালি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ভগবান্ বুদ্ধের একটী দন্তের ইতিবৃত্ত এই পুস্তকে বর্ণিত। ইংরেজীতে অনূদিত ইহাই প্রথম পালি পুস্তক। রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে স্যার মুথু লণ্ডনের শিক্ষিত সমাজের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ডিসরেলী প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজ মনীষিগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ডিসরেলী তাঁহার একখানি উপন্যাসে স্যার মুথুকে 'কুশীনর' নামে অভিহিত করেন। উপন্যাস খানি ১৯০৫ খ্রীঃ ডিসরেলীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। স্যার মুথুর পত্নী ছিলেন এলিজাবেথ ক্লে বীবাই নাম্নী ইংরেজ মহিলা। শ্রীমতী বীবাই শিক্ষিতা ও শিল্পতত্ত্বজ্ঞা রমণী ছিলেন। পুত্র আনন্দ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেই মাতা তাঁহাকে লইয়া সিংহল হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইহার কয়েক মাস পরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্যার মুথু কলম্বোতে দেহত্যাগ করেন। যে দিন তাঁহার ইংলণ্ড যাইবার কথা ছিল সেইদিনেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী বীবাই ১৯৪২ খ্রীঃ বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে গমন করেন।

বালক আনন্দ প্রথমে ইংলণ্ডে গ্লাউসেষ্টার-সায়ারের অন্তঃপাতী ষ্টোনহাউস নামক স্থানের ওয়াইক্লিফ কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্বে বি-এ পাশ করিবার পর ভূতত্ত্বে ডি-এসসি উপাধি লাভ করেন। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি নানা প্রসিদ্ধ পত্রিকায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়সে সম্ভবতঃ ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি সিংহলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তরুণ হইয়াও উক্ত দ্বীপের 'ডিরেক্টর অব মিনারোলজিকাল সার্ভে' নিযুক্ত হন। ডক্টর আনন্দ এই উচ্চ পদে তিন বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই তিন বৎসর উক্ত বিভাগে কাজ করিবার সময় তিনি যে বিভাগীয় সরকারী বিবৃতি লিখিতেন তাহাতে সিংহলের প্রাচীন পর্ব্বতাদির

ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে যে তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা এখনও অনতিক্রান্ত। এই সময় সিংহলে সকল পুরাতন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শিল্পসম্বন্ধীয় যে মূল্যবান গবেষণা করেন তাহাই পরে ইংরেজি পুস্তকে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নাম 'মধ্যযুগীয় সিংহলীয় শিল্প' (Medieval Singalese Art)। ইহাই ডাঃ কুমারস্বামীর প্রথম বিখ্যাত গ্রন্থ। উক্ত বিষয়ে এখনও এই পুস্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুস্তক-প্রকাশের পরে ভগ্নী নিবেদিতা ইহার পরিচয় এইভাবে দিয়াছিলেন, "ইহা একটী উচ্চ শ্রেণীর শিল্পশাস্ত্র এবং প্রাচ্য মতে লিখিত। লেখক এমন সুযোগ্য পণ্ডিত যে, তিনি পাশ্চাত্য শিল্পেও সমান ভাবে বিশেষজ্ঞ।" ভারতীয় শিল্পতত্ত্ব ডাঃ কুমারস্বামীর পুস্তকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। বহুর মধ্যে এক অদ্বিতীয় পরমার্থ সত্তার দর্শন, সর্ব্বপ্রকার জীবনের মধ্যে এক অবিভক্ত অখণ্ড জীবনের অনুভূতিই কুমারস্বামীর মতে ভারতীয় শিল্পের উদ্দেশ্য। ভগ্নী নিবেদিতা বলেন, "এই চরম সত্য প্রকাশ করিয়া ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মের ন্যায়, বিজ্ঞানের ন্যায় চারুকলার দৃষ্টিও দৃশ্য জগতের অতীত অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর উপর নিবদ্ধ। ভারতের শিল্প, কলা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বিদ্যা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং পরিচালিত যে, ভাবরাজ্যই সত্য এবং জড়জগৎ ভৌতিক বিশ্ব মায়িক।"

সিংহলে অবস্থান-কালে ডাঃ আনন্দ পাশ্চাত্য আচার, ব্যবহার ও প্রথার অনুকরণে দ্বীপবাসিগণের প্রমত্ত স্পৃহা দর্শন করিয়া মর্ম্মাহত হন এবং বিশিষ্ট সিংহলীগণের সাহায্যে 'সিংহল সংস্কার সমিতি' স্থাপন করেন। এই সমিতির অধ্যক্ষরূপে তিনি সিংহলের শিক্ষা, শিল্প ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনে যত্নপর ছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি ডন লুইসা রুনষ্টাইন নাম্নী উচ্চশিক্ষিতা এবং শিল্পশাস্ত্র ও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শিনী আর্জেন্টাইন দেশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ আনন্দ রাজকুমারতুল্য সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহ ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ও কিঞ্চিৎ কৃশ, গৌরবর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, সামান্য শ্মশ্রু এবং হাস্যময় মুখ ছিল। লোকে সহজে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। যিনি তাঁহার সহিত মিশিতেন তিনিই তাঁহার মিষ্ট বাক্য, ভদ্র ব্যবহার এবং অমায়িক ভাবে মুগ্ধ হইতেন। ডাঃ আনন্দের একটী পুত্র আছে। সিংহলের সরকারী কর্ম হইতে ১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সমগ্র ভারত ও ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। সুদীর্ঘ ভ্রমণ-সমাপনান্তে তিনি ইংলণ্ডে কিছুকাল বাস করেন। ঐ সময় তিনি ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশ্বের সুধীসমাজে সুপরিচিত হন। তাঁহার উদ্যোগে লণ্ডনে 'রয়্যাল ইণ্ডিয়া সোসাইটী' স্থাপিত হয়। ১৯০৭ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন মিউজিয়ামে যোগদানের পর তাঁহার গবেষণা ও রচনা বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৭ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত ত্রিশবৎসর তিনি পাশ্চাত্যে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাবধারা প্রচারে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার পঞ্চ-ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় তৎরচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাবলীর বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেন। উক্ত তালিকা হইতে জানা যায়, তিনি তখন পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ শত নিবন্ধের রচয়িতা। জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি আরও অনেক নিবন্ধ রচনা করেন। ভারত, সিংহল, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মেনী, ফিনল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইত।

ভারতীয় শিল্পের ভাবধারা-প্রচারে তাঁহার লেখনী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল।

প্রসিদ্ধ শিল্পী উইলিয়াম রথেনষ্টাইন সত্যই বলিয়াছেন যে, ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী এবং হ্যাভেল পাশ্চাত্যে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল তৎসমুদয় অনেক পরিমাণে দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে একমাত্র গ্রীসদেশীয় শিল্পই পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে এবং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রকৃত শিল্পরূপে পরিগণিত হইত। ভারতীয় বা প্রাচ্য শিল্পের যেখানে যেখানে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হইত কেবল সেইগুলিই পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ভাবস্রোত ডাঃ কুমারস্বামী পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ১৯০৭ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাস করিয়া এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাজপুতনা এবং কাংড়া উপত্যকার চিত্রাবলীর বিশেষত্ব ও মহিমা তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন এবং ভারতীয় শিল্পের অলৌকিকত্ব এবং অনুপমত্ব সভ্য জগতের সম্মুখে ধরেন। মোগল শিল্পিগণ অপেক্ষা হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পিগণ কত অধিক প্রতিভাশালী এবং পরমার্থদৃষ্টিসম্পন্ন তাহা হ্যাভেলের ন্যায় কুমারস্বামী পাশ্চাত্য জগতে সমগ্র জীবন প্রচার করেন। উইলিয়াম রথেনষ্টাইন বলেন, ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ভারতীয় শিল্পের যথার্থ আবিষ্কারক এবং ভারতীয় সঙ্গীত ও সাহিত্যের দরদী প্রচারক।

ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী বহুভাষাবিৎ ছিলেন। সর্ব্বদেশের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি বলেন, "এমন দিন যায় না, যে দিন আমি সর্ব্বকালের দার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী এবং সর্ব্বদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠ না করি। তৎসমুদয় লাটিন, গ্রীক ও সংস্কৃত এই তিন মৃত ভাষায় এবং বহু আধুনিক ভাষায় নিত্য পাঠ করি।"* এস চন্দ্রশেখর নামক জনৈক ভারতীয় কুমারস্বামীর সহিত বোষ্টনে ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে সাক্ষাৎ করেন।† কুমারস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিয়াছিলেন, 'তিনি আগামী বৎসর মিউজিয়াম হইতে অবসর-গ্রহণান্তে ভারতে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, হিমালয়ের পাদদেশে বা তিব্বতের কোন নির্জ্জন স্থানে বাকী জীবন অধ্যয়নে ও ধ্যানে কাটাইবেন।' সমগ্র জীবন ভারতীয় ভাবধারায় অবগাহন করিতে করিতে তিনি ত্যাগাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর বোষ্টনের নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়া এখন হিমালয়ের নির্জ্জন কান্তারে কিরূপে থাকিবেন।' ডাঃ আনন্দ উত্তর দিলেন, "শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শান্তির তুলনায় তুচ্ছ। আমার গৃহের মধ্যে লক্ষ্য কর। আমি একটী 'রেডিও' রাখি নাই; কারণ এই সকল আমার ভাল লাগে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আমি যতই বাস করিয়াছি ততই আমি ভারতীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছি। সুতরাং ভারতে বাস করিলে আমি সুখী হইব, শান্তি পাইব।" শ্রীমতী ডন লুইসা কুমারস্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিয়াছিলেন, 'ডক্টর আনন্দ প্রায় দ্বাদশটী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সপ্তাহের সাতদিন, এমন কি রবিবার পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন অধ্যাপনা আলোচনা ও রচনায় কাটিত।"

* The Times of Ceylon নামক ইংরেজি দৈনিকে ২২শে আগষ্ট (১৯৪৭) তারিখে লিখিত ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী সম্বন্ধে ডক্টর জি, পি মালালশেখরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† উক্ত সাক্ষাতের বিবরণ ও কথোপকথন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত Aryan Path নামক ইংরেজি মাসিকের ১৯৪৭ আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত।

আনন্দ কুমারস্বামীর পরিচালনায় বোষ্টন মিউজিয়মে ভারতীয় প্রাচ্য ও পারস্তদেশীয় শিল্প-সংগ্রহ আশাতীত ভাবে বাড়িয়াছে। সেই জন্ম বোষ্টন মিউজিয়মটি আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পভাণ্ডার। শেষ বয়সে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার 'ভারতীয় এবং ইন্দোনেশিয়ান শিল্পের ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ। ভগিনী নিবেদিতার সহযোগে তিনি 'বৌদ্ধধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল। তাঁহার 'শিবের নৃত্য' (Dance of Shiva) নামক বইখানিও সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি নানা দেশের শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের ফেলো, লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ভারতের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরামর্শদাতা, হেগব্রিন্দেন দার এজিয়াটিক কুন্স্তের সভ্য, বার্লিণ কইস্রা ইনিস্টিটিউটের সভ্য এবং পুণা ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনিস্টিটিউটের সভ্য। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে যে বিরাট প্রদর্শনী হয় উহার শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ কুমারস্বামী। তিনি যে শুধু গবেষক ও রচয়িতা ছিলেন তাহা নহে, তিনি সুবক্তাও ছিলেন। সিংহল, ভারত, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষাকেন্দ্রে ভারতীয় শিল্প ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিতেন। সিংহলে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্ম তিনি ১৯০৫—৬ সালে যে আন্দোলন করিয়াছিলেন এতদিনে তাহার সুফল ফলিয়াছে।

ডাঃ কুমারস্বামী অতি সদাশয় ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। উপর্য্যুক্ত চন্দ্রশেখর বোষ্টনে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্ম যখন ফোন্ করেন তখন কুমারস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যায় মোটরে একত্র বেড়াইতে যাইব এবং আলাপাদি করিব, যদি আপনি আমার জীবনী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করেন।' কুমারস্বামী এত নম্র ও নিরভিমান ছিলেন যে, তিনি আত্মগোপন ভালবাসিতেন এবং আত্মপ্রকাশ ঘৃণা করিতেন। তিনি সিংহলী হইলেও ভারতকে জন্মভূমির মত শ্রদ্ধা করিতেন। ভারতের সর্ব্বপ্রকার সমস্যা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিত। চন্দ্রশেখরকে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় মুসলমান-সমস্যার প্রতি বাস্তব দৃষ্টিতে চাহিলে আমার মনে হয় তাহাদের চাহিদা স্থায্য নহে। ঐগুলি প্রধানতঃ ইংরেজের সৃষ্টি এবং মুসলমানগণ দূরদৃষ্টির অভাবে সেগুলি স্বীকার করিয়াছে। ভারত-বিভাগ রোধ করা এখন আর সম্ভব নহে; ইহা ভারতের পক্ষে পশ্চাদপসরণ মাত্র, অগ্রগতি নহে। যদি মিঃ জিন্না প্রকৃত মুসলমান হইতেন তাহা হইলে তিনি দারাশিকোর সময় স্মরণ করিয়া দেখিতেন, তখন কিরূপে হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্র শান্তিতে বাস করিত। মুসলমান সংস্কৃতি অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব মিঃ জিন্নার উপর অধিক বলিয়া তিনি ভারত-বিভাগের পক্ষপাতী। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দিকে লক্ষ্য কর। তিনি প্রকৃত মুসলমান এবং মুসলমান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাই তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী নহেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে অনিষ্টকর অনৈক্য উপস্থিত, তাহার মূলে আছে রাজনীতি, ধর্ম্ম নহে।" ডাঃ কুমারস্বামী আশা করিতেন, দ্বিখণ্ডিত ভারত অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় একীভূত হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, পারস্যের মুসলমানগণের ন্যায় ভারতের মুসলমান-গণ যতই শিক্ষিত হইবে ততই তাহাদের হিন্দু-বিদ্বেষ কমিবে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দর্শনবিভাগ উঠিয়া যাওয়ায় কুমারস্বামী দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারত-সরকারের বৃত্তি লইয়া যে সকল ছাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অধ্যয়ন করিতে আসে তাহাদের মধ্যে শতকরা দশজনও দর্শন বা সাহিত্য অধ্যয়ন করে না। আমি অনেক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহই ভারতীয় সংস্কৃতির এক কণাও এদেশে আনে না। তাহারা স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। এদেশে আসিয়া তাহাদের চোখ খোলে। কিন্তু তখন দেশীয় সংস্কৃতি পড়িবার বা বুঝিবার অবকাশ তাহাদের থাকে না। এই সকল ছাত্র কিরূপে ভারতকে বুঝিবে? কিরূপেই বা তাহারা স্বদেশের সেবা করিবে? এদেশে শিক্ষালাভ ও প্রবাসের ফলে তাহাদের মনে বিদেশীয় প্রভাব গভীর রেখাপাত করে। আরামপ্রিয় ও ব্যয়সাধ্য জীবনের পক্ষপাতী আমি নই। এইরূপ জীবনে সন্তোষের সম্ভাবনা থাকে না। আমার মতে বাথ্‌টব, রেডিও এবং রেফ্রিজারেটার অপেক্ষা জীবন অনেক বড়। জীবনে ভোগস্পৃহা যত বাড়ে মানসিক শান্তি তত কমে। যদিও আমেরিকানগণ যে কোন দেশবাসী অপেক্ষা ধনী, তাহাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন জীবনে একখানিও পুস্তক ক্রয় করে নাই! নিরক্ষরতা-বর্জনই শিক্ষা নহে, শিক্ষাও সংস্কৃতি নহে।" ডাঃ কুমারস্বামী পাশ্চাত্য প্রবাসে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন, যন্ত্র-প্রভাবের নিমিত্ত আধুনিক জীবনে কৃত্রিমতা বাড়িয়াছে ও স্বাভাবিকতা কমিয়াছে।

সমালোচনা

তন্ত্রের আলো—শ্রীমহেন্দ্র নাথ সরকার প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১২ হইতে প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ ১৩৫৪ সন; মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তন্ত্র-সাধনার ভূমিকা, শিব-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, সদ্বিদ্যা, সম্ভূতি, জীব ও ঈশ্বর, মানস ও অতিমানস জ্ঞান, কাল ও দেশ, দর্শন ও রহস্যবাদ, বিদেহ ও জ্যোতির্দেহ, অধ্যাত্ম যজ্ঞ, শব্দছন্দ ও জ্যোতিশ্ছন্দ, তন্ত্র, বেদান্ত, পাতঞ্জল, শক্তি ও কলা, তন্ত্রের সাধনা ও সিদ্ধি, তন্ত্র ও জীবন—এই কয়টি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্ত্রের সাধনা ও সিদ্ধি নামীয় অধ্যায়ে কুণ্ডলিনী যোগ, কুণ্ডলিনীর কূজন, কুণ্ডলিনী ও জীবনীশক্তি, দীক্ষা ও শক্তিপাত সম্বন্ধে আলোক-সম্পাতী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। মনীষী লেখক ডক্টর মহেন্দ্র নাথ সরকার এই গ্রন্থে তন্ত্রের মর্ম, সাধনা, সিদ্ধি এবং জীবনে উহার প্রয়োগ-কৌশল বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের অশেষ উপকার করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় তন্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ খুবই বিরল। তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রসাহিত্য-ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক উইন্টারনিজ প্রমুখ মনীষীদের মতে তন্ত্রের জন্মস্থান বাংলাদেশ। বাংলাদেশ হইতে উহা আসাম, নেপাল, এবং বৌদ্ধধর্মের আনুকূল্যে ভারতের বাহিরে তিব্বত ও চীনে বিস্তৃত হইয়াছে। তন্ত্রসাহিত্যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইতেছে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তন্ত্র-

নিবন্ধাবলী। এই সকল নিবন্ধ সমগ্র ভারতে অতিশয় গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলার চিন্তাশীল পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় তন্ত্রসার, তন্ত্রদীপিকা, শাক্তানন্দতরঙ্গিনী, আগমতত্ত্ববিলাস, তন্ত্রদীপনী প্রভৃতি সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থ-অবলম্বনে তন্ত্র সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পুস্তক রচিত হইলে বাংলাসাহিত্য বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশ শক্তি-সাধনার মহাপীঠস্থান। ভারতবর্ষের সাধনায় তন্ত্রের একটী বিশেষত্ব আছে। তন্ত্রের সাধনার শেষ ভূমিকা শিব-উপলব্ধি ব্রহ্মানুভূতিরই স্বরূপ। তন্ত্রের পূর্ণ দীক্ষায় বেদান্তের অদ্বৈত জ্ঞানের উন্মেষ। এই তন্ত্রের আলোচনা, শিক্ষা ও সাধনা যত অধিক হয় ততই ভাল।

গ্রন্থকার বাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধক জগদ্গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের শ্রীচরণকমলে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার বিষয়বস্তুর কিয়দংশ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় নিবন্ধাকারে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। সর্ব-সাধারণের পাঠের সুবিধার জন্য পুস্তকখানির মূল্য আরও কম এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী অধিকতর সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন,—সরলতা, স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য্য। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ-গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়নের অন্য উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞান-বৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই। অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে তত অধিক ব্যক্তি উপকৃত, ততই গ্রন্থের সফলতা।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপদেশ অনুসারে বক্ষ্যমাণগ্রন্থখানি রচিত হইলে তন্ত্রসম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক পণ্ডিত-মণ্ডলীর বোধ্য না হইয়া সাধারণ পাঠকগণেরও আয়ত্তাধীন হইবে।

শ্রীরমণী কুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল, সাহিত্যরত্ন

India Through the Ages—By Swami Avyaktananda. Published from the Society for Cultural Fellowship with India : 52 Lancaster Gate, London, W. 2. p. p. 95. Price – 6½s.

গ্রন্থকার বেলুড়মঠের জনৈক চিন্তাশীল সন্ন্যাসী। তিনি গত ১৩।১৪ বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে বেদান্তপ্রচারে ব্রতী। ভারতে অবস্থানকালে তিনি 'জাতিগঠনকারী বিবেকানন্দ' নামে একখানি সারগর্ভ ইংরেজী পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ইন্দো-বৃটিশ সম্প্রীতি মিশনের কার্য্যব্যপদেশে কয়েকজন ইংরেজ নরনারীর সহিত সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতেছেন।

আলোচ্য পুস্তক দশটী নাটিকার সমষ্টি। 'আশ্রম', 'মানবের অন্তর্দ্বন্দ্ব', 'বুদ্ধত্বের দিকে', 'ইস্রায়েলের সন্তানগণ', ভারতে ক্রুশ', ফকিরের গিরগিটী', 'জীবনের দিব্যাগ্নি', 'কৃষ্ণের বংশী', 'শিষ্যমণ্ডলী' এবং 'সবাচার্য্য দিবস'—এই দশটী নাটিকা এই পুস্তকে আছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশূন্য প্রগতি বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে; আবার সামাজিক জীবন ব্যতীত আধ্যাত্মিক সাধনা সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতায় বিজড়িত হয়। এই ভাবটী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অধিকাংশ নাটিকায় প্রদর্শিত। উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগবত, গীতা, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইহুদীধর্ম্ম, খ্রীষ্টানধর্ম্ম, ইস্লাম, পার্শীধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং শিখধর্ম্মের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা

বিকশিত তাহাদের মৌলিক ভাবটি দশটি নাটিকাতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল ভাবধারা বর্ত্তমান ভারতে মিলিত হইয়াছে। ইহাদের সমন্বয়-সাধন দ্বারা কিরূপে ভারতভূমিতে একটী বিশ্বজনীন সংস্কৃতির উদ্ভব হইতে পারে বহুদর্শী স্বামীজি নাটিকাসমূহে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয়ের মতে নাটক সৃষ্টির জন্য তিনটী মূলসূত্র আবশ্যক—(১) পুস্তকের প্রাণস্বরূপ নূতন ভাবটী মানব-জাতির উপকারী হইবে, (২) ভাবটী এমন সরলভাবে প্রকাশিত হইবে যাহাতে সকলের বোধগম্য হয়, (৩) নাট্যকার কোন বাহ্য প্রলোভনের বশবর্ত্তী না হইয়া আন্তরিক প্রেরণায় নাটক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবেন। এই পুস্তকের প্রণেতা বলেন, তিনি টলষ্টয়ের উপরোক্ত মূল সূত্রত্রয় অবলম্বনে নাটিকা দশটী রচনা করিয়াছেন।

'আশ্রম' শীর্ষক নাটিকাতে বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ বর্ণিত। দ্বিতীয় নাটিকাতে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ ব্যাখ্যাত। তাঁহার মতে কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ মানবের অন্তরে সংগ্রাম। ইহাকে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ঐতিহাসিকতাও স্বীকার্য। তৃতীয় নাটিকাতে বুদ্ধ-জীবন চিত্রিত। উহাতে (২ পৃষ্ঠা) সিদ্ধার্থের মুখে গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'ছন্দক-এমন সময় আসিবে যখন সমাজে রাজা, ধর্ম-যাজক, জাতি বা শ্রেণী থাকিবে না।' ইহা বুদ্ধবাক্য নহে, সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদের ভাবগুলি প্রচারোদ্দেশ্যে নাটিকাগুলি লিখিত। ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, জাতিশূন্য শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাব অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। সমাজতন্ত্রবাদের আলোকে বেদান্তের ব্যাখ্যা আধুনিক ভারতের মুখরোচক হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভাবসমূহ বেদান্তের আলোকে ব্যাখ্যা করিলে ইউরোপের অধিক কল্যাণ হইবে।

— স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

আমার ভ্রমণ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। প্রকাশক—রমাপ্রসাদ মিত্র, দি বুক হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৩৫৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

এই গ্রন্থে সিংহল, ব্রহ্ম, মোহেঞ্জোদর, হারাপ্পা, তক্ষশীলা, রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, সিন্ধু প্রমুখ ২৬ স্থানের ইতিবৃত্ত মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু লেখক এই সকল স্থানের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতির তথ্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। এরূপ ভ্রমণ-কাহিনী বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। যাঁহারা ঐ সকল স্থান দর্শন করিতে এবং ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই উপাদেয় গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আর্ট পেপারে মুদ্রিত অনেকগুলি ছবি পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রচ্ছদ-পট, বাঁধাই, কাগজ ও ছাপা উত্তম। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রয়োদশাধিকশততম জন্মোৎসব—গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রয়োদশাধিক-শততম জন্মতিথিপূজাদি বিশেষ আড়ম্বর-সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় সমগ্র দিবস ও রাত্রিব্যাপী বিশেষ পূজা পাঠ হোম ও ভজনাদির আয়োজন করা হইয়াছিল এবং ইহাতে বহুভক্ত নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

এই দিন অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে মঠ-প্রাঙ্গণে এক মহতী জন-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় তিনি বলেন:

"যাঁহাদের ধারণা—আধুনিক জগতে ধর্মালোচনার কোন স্থান নাই তাঁহাদের ভ্রান্ত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সর্ব্ববিষয়ে আজ কেবল অবিশ্বাস ও সন্দেহ দেখা যাইতেছে। কোন দিকে এমন কিছু দেখা যায় না যাহাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ চলিতে পারে। তাই আজিকার দিনে বিশ্বজনীন ধর্মের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই বিশ্বজনীন ধর্মেরই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার যে অপূর্ব আধ্যাত্মিকশক্তি ছিল, যে শক্তি তিনি স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই একদিন পৃথিবীতে শান্তি আনিবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের লোক—অতীন্দ্রিয় লোকের সাধক। প্রাচীন-কালের আধ্যাত্মিক সাধনা ভারতকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় আছে। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা উহার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই সর্বপ্রথমে নিজের জীবনে সেই অধ্যাত্ম-সাধনার সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভারতের অতীত অধ্যাত্মসাধনার মূর্ত প্রতীক।

"তিনি ছিলেন যুগাবতার। গীতাকার বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় তখনই ঈশ্বর অবতাররূপে অবির্ভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এমন এক সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন যখন ধর্মের গ্লানি বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবে গীতার বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

"তিনি কেবল সাধনাই করেন নাই, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন। নানা ধর্মমত ও পথ নিজে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ধর্মসমন্বয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল. তিনি নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সেই আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছেন।

"স্বাধীন ভারত নানাদিক দিয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকিলে আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি আসিবে না। ইহার উপর না দাঁড়াইলে প্রকৃত শক্তি আমরা লাভ করিতে পারিব না। প্রকৃত উন্নতির জন্য সকলকে স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে, বৈরাগ্য-ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।"

বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দজী বলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের তপস্যাকে অবলম্বন করিয়া ভারতের আজিকার জীবন গঠিত হইতেছে। আজ চারিদিকে যে অসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাই তাহা দূর করিতে পারে।"

বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন দৃষ্টি আনিয়া দিয়াছেন।

কি ভাবে উহার সাধন করিতে হইবে তাহারও পরিচয় দিয়াছেন, এবং সমাজক্ষেত্রে উহার প্রয়োগের পথ দেখাইয়াছেন। এখন আমাদের কর্তব্য হইল—তাঁহার বাণী উপলব্ধি করিয়া উহা কার্যে পরিণত করা।"

এই দিন রাত্রে "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ" ২৭ জন ব্রহ্মচর্য ও ২২ জন সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন।

গত ১লা চৈত্র রবিবার বেলুড়মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে নির্বাহিত হইয়াছে। এই উৎসবে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের সমাগম হয় এবং প্রায় ৭০ হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিন অতি প্রত্যূষ হইতে সায়াহ্ন পর্যন্ত মাইক্রোফোনযোগে বক্তৃতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন, চণ্ডী ও কালীকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিস সর্ব-সাধারণের দর্শনের জন্য সংরক্ষণ করা হইয়াছিল। অত্যধিক ভিড়ে অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়েন। আই এন এ সি ও সেণ্ট জন এ্যাম্বুল্যান্স কোর তাঁহাদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। উৎসব উপলক্ষে ই আই রেলওয়ে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেন এবং হাওড়া হইতে বেলুড় মঠ ও বালিখাল পর্যন্ত বহুসংখ্যক বাস চলাচল করে। নৌকা-যোগেও বহু নরনারী আগমন করেন।

উৎসবক্ষেত্রে পুস্তক ছবি খেলনা এবং খাদ্য প্রভৃতির বহু দোকান বসিয়াছিল। প্রায় ৬০টি প্রতিষ্ঠানের ১৬০০ স্বেচ্ছাসেবক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও উৎসবকার্য সুশৃঙ্খলভাবে নির্বাহ করিয়াছেন। সন্ধ্যায় বাজী পোড়ানের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সুবর্ণ জয়ন্তী—দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব গত ২রা ফাল্গুন মায়লাপুর মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বিশেষ আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঐ দিন বিশেষ পূজা পাঠ ও হোমাদির আয়োজন করা হইয়াছিল।

পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ দক্ষিণ ভারতে ও অন্যান্য স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের প্রবর্তক এবং মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থাপয়িতা ও প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের বৃহৎ তৈল-চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। ইহার প্রারম্ভে তিনি একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন।

এই মঠের প্রকাশন-বিভাগ হইতে এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে:

(১) ইংরেজী তামিল ও তেলেগু ভাষায় মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মৃতি।

(২) শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবনী (ইংরেজী)।

(৩) ঈশ্বর এবং অবতারগণ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত (ইংরেজী)।

(৪) প্রাচীন অনুসন্ধিৎসা—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত (ইংরেজী)।

জয়ন্তী উপলক্ষে এই কেন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থই গত ১৬ই পৌষ হইতে কম মূল্যে দেওয়া হইতেছে।

জয়ন্তী উৎসবের দিন অপরাহ্নে হায়দরাবাদের ভারতীয় এজেণ্ট-জেনারেল মিঃ কে এম্ মুন্সীর সভাপতিত্বে এক সভায় অধিবেশন হয়। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক রাও বাহাদুর সি রামানুজাচারী দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চাশ বৎসরের কার্য-বিবরণী প্রদান করেন। পরে স্থানীয় বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যাপক মিঃ আর এস মণি, ইঙ্গ-ভারত সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সংঘের প্রচারক স্বামী অব্যক্তানন্দজী এবং সভাপতি মহাশয় মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

অতঃপর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কলেজ-সমূহের ছাত্রগণের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা এবং স্কুলসমূহের ছাত্রগণের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রগণকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

আরাত্রিক ও প্রসাদ বিতরণের পর উৎসব-কার্য শেষ হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের নিজস্ব ভবনে প্রীতি-উৎসব—গত ৫ই ফাল্গুন রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা ১১১নং রসা রোডস্থিত নিজস্ব ভবনে (দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী স্মৃতি-ভবনে) একটি নূতন শাখাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই উপলক্ষে তথায় গত ১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে একটি প্রীতি-উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহাতে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রধান অতিথি ছিলেন।

এই ভবনটি কর্ণেল দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ও তাঁহার পত্নী ইনষ্টিটিউটকে দান করিয়াছেন।

এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী নিবৃত্তিচৈতন্য সমবেত অতিথিবৃন্দকে সম্বর্ধনা এবং ইনষ্টিটিউট ভবনের দাতা কর্ণেল ভাদুড়ী ও তাঁহার পত্নীকে এই বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব আবাসিক ভবনের অভাব অনেক দিন যাবৎ অনুভূত হইতেছিল। আশা করা যাইতেছে যে এখন নিজস্ব বাড়ী পাওয়ায় ইহার বহুমুখী কৃষ্টিমূলক কার্য-প্রসারের সুবিধা হইবে।

এই উপলক্ষে আহূত সভায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ইনষ্টিটিউটের অতীত কার্যাবলী ও ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া উহার ভবিষ্যৎ বহুমুখী বিশাল কার্যাবলী ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—সাহিত্য বিজ্ঞান ললিতকলা সঙ্গীত প্রমুখ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়ে ইনষ্টিটিউট গবেষণা বক্তৃতা আলোচনা এবং পুস্তিকা-প্রকাশ প্রভৃতি দ্বারা চিন্তা-জগতে অনেক কিছু দান করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেক কিছু দান করিবেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ কলিকাতাবাসী নাগরিকদের ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে এইরূপ কৃষ্টিমূলক একটি প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ-কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল নাগরিকদেরই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহার কার্যাবলী-প্রসারের সহায়তা করা উচিত।

ডাঃ জে কে বিশ্বাস বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সকলকে স্বামী বিবেকানন্দের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমৈত্রীর কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি বলেন—রামকৃষ্ণ মিশন এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করিতেছেন।

ডাঃ বিনয়কুমার সরকার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মমত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম হইল সার্ব-জনীন মানবধর্ম, মানবের অন্তর্নিহিত মানবীয় সত্তার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে। যেদিন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী শিকাগোর ধর্ম-সভায় পদার্পণ করিলেন সেইদিন হইতে ভারতবর্ষের বিশ্বজয়ের যাত্রা আরম্ভ। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত এবং তদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণানুপ্রাণিত ধর্ম-সাম্রাজ্য এখন জাতীয় সামাজিক এবং ভৌগোলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে প্রসারলাভ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের মহান্ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই ইনষ্টিটিউটের কর্মধারা সকল শ্রেণীর নরনারীর ভিতর অনুপ্রেরণা জোগাইবে সকল স্তরের মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করবে।

উপসংহারে বিচারপতি বিশ্বাস বলেন—বর্তমান জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর প্রয়োজনীয়তা বিচারের অপেক্ষা রাখে না। যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আদর্শে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারি তবে আধুনিক সমস্যাজড়িত জীবনের অনেক সমস্যাই সমাধান হইবে। দক্ষিণ কলিকাতায় ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধনীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া তিনি সকলকে দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রসার করিতে আহ্বান করেন।

সভান্তে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র কুমার দে প্রধান অতিথি এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও সুধীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা—গত ১৬ ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বিহারের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা মহাশয় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন।

এই উপলক্ষে বালকগণের আবৃত্তি, ঐক্যতান-বাদন, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ড্রিল প্রদর্শনী প্রভৃতি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

সভাপতি মহাশয় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন এবং বলেন মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণের পরেই বাস্তবিক তাঁহার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ছাত্রগণকে মহাপুরুষগণের আদর্শানুসারে জীবন যাপন করিতে উৎসাহিত করেন এবং বলেন যে স্বাধীন ভারতের উত্তম নাগরিক হইবার ইহাই উপায়।

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১৬ই ফাল্গুন এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে আশ্রম-সম্পাদক স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দজী মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও সমাগত সকলকে সাদর আহ্বান জানান। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে স্কটিস চার্চ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার দাশগুপ্ত স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দজী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর ভাবধারা কিরূপে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধীর ভিতর দিয়া উহা শ্রেষ্ঠরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সেই সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দান করেন। ছাত্রগণ কর্তৃক স্বামীজীর স্তুতি গীত হইলে সভার কার্য শেষ হয়।

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিম বঙ্গের সরকারী দপ্তরখানায় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্নে সরকারী দপ্তরখানায় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে পশ্চিম বঙ্গের গবর্নর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলেন—"মহাত্মা গান্ধী যাহা প্রচার করিতেন তাহার সব কিছুই স্বামীজী প্রচার করিয়াছেন। স্বামীজী সেকালে লোক-দিগকে অস্পৃশ্যতা পালনের জন্য নিন্দা করিয়া-ছেন, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক জড়তার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন এবং সর্বোপরি মহাত্মাজীর মত তিনি সকল ধর্মের মৌলিক ঐক্যের কথা বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন।"

পশ্চিম বঙ্গের সেক্রেটেরিয়েট ও ডিরেক্টরেট

এসোসিয়েসনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয় এবং পূর্ত ও সেচ সচিব শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং গবর্নর রাজাজী প্রধান অতিথিরূপে বক্তৃতা দেন। সরকারী দপ্তরখানায় এরূপ অনুষ্ঠান ইহাই প্রথম।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী যখন মাদ্রাজে বক্তৃতা দেন তখন রাজাজীর বয়স ১৮ বৎসর। রাজাজী সেই কালের কথা স্মরণ করিয়া বলেন, "আপনারা সাম্প্রতিক ইতিহাসে যেসব রাজনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিয়াছেন উহাদের মূলসূত্র স্বামীজীর শিক্ষা। তিনি জাতির জীবন-ধারায় ধর্মের তুষার গলাইয়া দিয়াছেন।

"স্বামীজী ও মহাত্মাজীর অনুসরণে আপনারা যদি সকল ধর্মের প্রতি সমান সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং মনে করেন যে ইহা আপনা-দিগকে ভগবানের সামীপ্য ঘটাইয়া দিবে তবে আপনাদের দেশে কোন হাঙ্গামা দেখা দিবে না। মহাত্মাজী কেবল যে এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, উহা প্রচার করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন।"

বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী বলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ দেশের প্রাণকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহাবসানের দুই এক বৎসর পরই দেশে যে রাজনৈতিক সামাজিক ও অন্যান্য আন্দোলন দেখা দেয় তাহার প্রত্যেকটিতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল অতুলনীয়। চরমপন্থীদের ন্যায় তিনি বলিতেন—দেশের জন্য সহস্র বলি চাই, পশু নয়—মানুষের বলি। তিনি বার বার অন্যান্য দেবতার অর্চনা ছাড়িয়া একমাত্র জন্মভূমিকে উপাসনা করিতে বলিতেন।"

কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রদর্শনী—গত ২রা ফাল্গুন ইডেন গার্ডেনে পশ্চিম বঙ্গের গবর্নর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী নিখিল ভারত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশ কতটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির কি সম্ভাবনা আছে প্রদর্শনীতে তাহা দেখান হইতেছে। ইহাতে প্রায় ৮০০ ষ্টল ও প্যাভেলিয়ন আছে। সংবাদ-সরবরাহ ও শিক্ষার দিক হইতে প্রদর্শনীকে উপযোগী করিবার জন্য বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ভারত ও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এক-যোগে কাজ করিতেছেন। দেশ ও বিদেশের নানা স্থান হইতে যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। প্রদর্শনী হইতে যে আয় হইবে উহার শতকরা ৭৫ ভাগ জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিবার জন্য গবর্নরের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রদর্শনীর বিবরণ-দান-প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ও প্রদর্শনীর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন—"ভারত সরকারের ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের শ্রম পুনর্বসতি নিয়োগ কৃষি মৎস্য স্বাস্থ্য শিল্প ও সেচ বিভাগ প্রদর্শনীতে তাঁহাদের দ্রব্য-সামগ্রী ও উহাদের প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে পেটেণ্ট অফিস সোসাইটিরও একটি ষ্টল আছে। ভারত সরকারের দেশরক্ষা সচিব তাঁহাদের কার্য-কলাপ প্রদর্শনের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। চারুশিল্প, জাতীয় সংগ্রাম, সংবাদপত্র বিজ্ঞান মহিলা শিশু সিনেমা থিয়েটার খেলা-ধূলা ও বক্তৃতাদি সংক্রান্ত বহু প্যাভেলিয়ন নির্মাণ করিয়া জনসাধারণকে এখানে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করা হইয়াছে।

অর্থসচিব প্রদর্শনীর কার্যকরী কমিটির

প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে মাঝে মাঝে এইরূপ প্রদর্শনীর সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সম্ভাবনার নিদর্শন যদি জনসাধারণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করা হয় তবে তাহা নব নব প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের প্রেরণা যোগাইবে। এখানে প্রদর্শিত দ্রব্যের বৈচিত্র্য ও নমুনা হইতে জনসাধারণ জানিতে পারিবে—শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এবিষয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি আছে তাহাও লোকে বুঝিতে পারিবে। দেশ আজ অভাব ও অনটনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে; প্রদর্শনী হইতে জনসাধারণ যদি উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির প্রেরণা লাভ করে, তবে ইহার আয়োজন সার্থক হইবে। আশা করা যায় যে জনসাধারণ প্রদর্শনীর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলেন যে, স্বাধীনতা নূতন দিকে মানুষের কর্মপ্রেরণা জাগায়। স্বাধীনতার অন্য অর্থ কিছু নাই। নবীন প্রভাতের মত ইহা মানুষকে জানাইয়া দেয়—কাজ আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে। প্রদর্শনী হইতে জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে—স্বাধীনতা লাভ করিয়াই তাহাদের কাজ শেষ হয় নাই, সবে মাত্র সুরু হইয়াছে। প্রদর্শনী হইতে বিশেষ আর্থিক লাভ হয় না, কিন্তু শিক্ষা হয়। দেশে কোন্ জিনিসের প্রয়োজন আছে, তাহা জানা যায়। স্বাধীনতা-লাভের পরেও যদি আমরা বিদেশ হইতে জিনিস কিনি—বিশেষ ভাবে যদি খাদ্যসামগ্রী কিনি, তবে তাহা বিশেষ অবিবেচনার কাজ হইবে। যুদ্ধে উদ্বৃত্ত খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা আমরা আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছি। এই ভাবে চলিলে দেউলিয়া হইতে বেশী দিন লাগিবে না। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া আমাদিগকে কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল দেশেই প্রদর্শনী সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর গবর্নরকে ধন্যবাদ দান করিলে সভার কার্য শেষ হয়।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়—ইহা দ্বারা উচ্চ-শিক্ষার পথে আসামের অগ্রগতি নূতন করিয়া সূচিত হইল। কিছুদিন পূর্বে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান চ্যান্সেলর স্যার আকবর হায়দরীর সভাপতিত্বে এবং প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা-মন্ত্রীসহ কোর্টের অপরাপর সদস্যগণের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। কাকা কালেলকারও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঐ দিবস ছুটির দিন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার-পদে জোড়হাট জগন্নাথ বড়ুয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ কে কে হাণ্ডি নিযুক্ত হইয়াছেন।

গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্টবোর্ড সংগৃহীত ৬০০,০০০ টাকা গোহাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্পণ করা হয়। গবর্নমেণ্ট ১৬,০০,০০০ টাকা এই বৎসর অর্থ সাহায্য করিবেন। মোট ২২,০০,০০০ টাকা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবে।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর স্যার আকবর হায়দরী তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় পরলোকগত নবীনচন্দ্র বরদলৈ, মিঃ টি আর ফুকন, মিঃ বেজবরুয়া প্রভৃতির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং বলেন, ইঁহারাই আসামে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টে সকল স্বার্থের এবং সকল সম্প্রদায়ের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। এখনও তিনটি আসন শূন্য রহিয়াছে। ঐগুলি পরে পূরণ করা হইবে। কাকা কালেলকর ও ডাঃ জাকির হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ লাভের জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আসামে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন এবং বলেন যে আসামের দরিদ্রতম ব্যক্তিও এই প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কৃষ্টির অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইবে; বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞানই বিতরণ করিবে না, মনুষ্য-জাতির সেবায় কিভাবে জ্ঞানকে নিয়োজিত করা যায় তাহাও শিক্ষা দিবে। কাকা কালেলকার বলেন যে, আসামের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন

কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থীদের সেবাকার্য

আবেদন

১৯৪৭ সনের অক্টোবর হইতে **রামকৃষ্ণ মিশন** কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থী বালক-বালিকা, প্রসূতি ও অসুস্থগণকে দুগ্ধ, রুগ্ন ব্যক্তিগণকে ঔষধ, দুঃস্থগণকে প্রয়োজন অনুসারে কম্বল, লেপ ও বস্ত্র দান করিতেছেন। কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছেন।

১৯৪৮ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২৫টি কেন্দ্র হইতে মিশন মোট ১১৯৬।২ তাজা দুগ্ধ এবং ৫৮৩৭ মণ গুড়া দুগ্ধ ৭,৪৩,৫৩৫ জনের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। দুইটি দাতব্য হোমিও-প্যাথিক ডিস্পেনসারী হইতে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৪৯৫ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মিশন বোম্বাই জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৩১ গাঁইট পশমী ও সূতার কম্বল ৫০০০ জন আশ্রয়প্রার্থীকে এবং কুরুক্ষেত্র হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী কৈথল ক্যাম্পের ১০০০ আশ্রয়-প্রার্থীকে ৬৯০ খানা কম্বল এবং ২০০০ শীত-বস্ত্র দান করিয়াছেন।

মিশনের কর্মিগণ বহু তাবু পরিদর্শন করিয়া ১৯০০০ জন আশ্রয়প্রার্থীকে টিকেট দিয়াছেন। এই টিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে গবর্নমেণ্ট কম্বল ও লেপ বিতরণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মিশন কর্তৃক ১০,০০০ খানা পশমী ও সূতার শীতবস্ত্র বিতরিত হইয়াছে।

বর্তমানে মিশন ৪টি শহরে ২৫টি দুগ্ধ বিতরণ-কেন্দ্র পরিচালন করিতেছেন। তিন বৎসরের নিম্নবয়স্ক ও রুগ্ন বালক-বালিকা এবং প্রসূতি গণকে চিকিৎসকদের অনুমতি অনুসারে এবং ৩,৭১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে একপোয়া এবং বয়স্কগণকে দৈনিক আধসের হিসাবে দুগ্ধ দেওয়া হইতেছে। এই ভাবে দৈনিক ২৫,৭৯৯ জন দুঃস্থ নরনারীকে মোট ৩০ মণ তাজা দুগ্ধ এবং ২০৪ মণ গুড়া দুগ্ধ দান করা হইতেছে।

গবর্নমেণ্ট দুগ্ধ ও ফলের রস বিতরণের সম্পূর্ণ ভার মিশনের উপর অর্পণ করিয়াছেন। সরকার প্রদত্ত এই দুইটি জিনিস বিতরণ শেষ করিতে আরও দুই মাস লাগিবে।

সম্প্রতি পরছিনার বাহালপুর এবং বান্নু হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন তাঁহাদের জন্য বাসনের প্রয়োজন। মিশন নিজব্যয়ে ২৫০০ এনামেল থালা এবং ১০০০ মগ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন মিশন ১২,০৫১ জন বালক-বালিকাকে সময়ে সময়ে মিষ্টি দিয়াছেন এবং ৬০৫টি পরিবারকে ১০৩½ পাউণ্ড শুষ্ক শয়াবিন ও ১২০ জন অনাথ বালক-বালিকা, ১০০ দুঃস্থ, ২০ জন রোগীকে স্বাস্থ্যবিভাগ-প্রদত্ত ৫১,০০০ ভাইটামিন ট্যাবলেট বিতরণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি মিশনের সকল বিভাগে ১৪১ জন স্বেচ্ছাসেবক কার্য করিতেছেন।

এই উদ্দেশ্যে বদান্য ব্যক্তিগণের দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে:

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,
বেলুড় মঠ পোঃ
(জেলা হাওড়া)
৭-৩-৪৮

উদ্বোধন
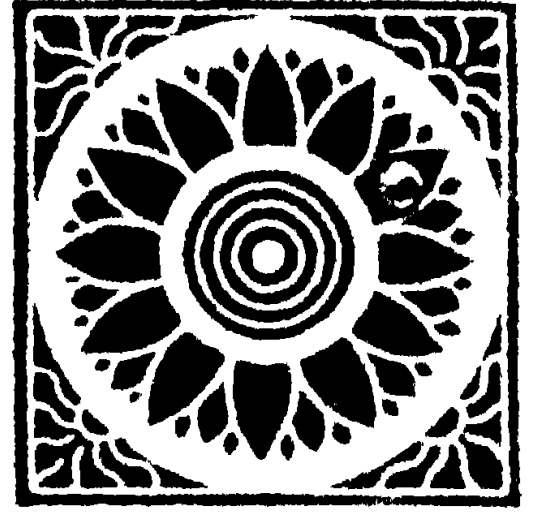
ঈশ্বরসম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা

সম্পাদক

গোল টেবিল বৈঠকের কার্যের জন্য মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডনে অবস্থান-কালে কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁহাকে একটি রেকর্ড দিতে অনুরোধ করেন। তিনি কোন রাজনীতিক বিষয়ে রেকর্ড দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, তাঁহার কণ্ঠস্বর সকল কালে যাহাতে সকলে শোনে এরূপ একটিমাত্র প্রথম ও শেষ রেকর্ড আবশ্যক হইলে তিনি দিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজী রাজনীতিক ব্যাপার-গুলিকে অস্থায়ী এবং আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহকে গভীর ও চিরস্থায়ী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। উক্ত কোম্পানীকে ১৯৩১ সনের ২০শে অক্টোবর একটি রেকর্ড দেন।

ইহাতে তিনি বলেন: সেই অদৃশ্য শক্তি ঈশ্বর আপনাকে অনুভবগম্য করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অস্তিত্বের সকল বিরুদ্ধ প্রমাণকে খণ্ডন করে। আমার ইন্দ্রিয়সমূহ-সহায়ে আমি যে সকল বিষয় দেখি সে সকল হইতে এই অনুভূতি স্বতন্ত্র। ইহা ইন্দ্রিয়াতীত; কেননা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়সহায়ে কেবল সীমাবদ্ধ ভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব।

আমরা জানি—সাধারণ ব্যাপারেও মানুষ জানে না যে, কে কেন এবং কি ভাবে তাহাকে পরিচালন করিতেছেন। ঈশ্বরই পরিচালক; মানুষও মনে করে যে এক শক্তি অবশ্যই পরিচালন করেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে মহীশূর ভ্রমণকালে অনেক গরীব গ্রামবাসীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, কে মহীশূর শাসন করেন তাহা তাহারা জানে না। তাহারা কেবল বলিল যে, কোন শাসক শাসন করেন। নিজেদের শাসক-সম্বন্ধে এই সকল লোকের জ্ঞান যদি এত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বরের তুলনায় তাহাদের শাসক অপেক্ষাও অতি সামান্য বলিয়া আমি যদি রাজার রাজা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানিতে না পারি, ইহা আশ্চর্য নহে। পরন্তু মহীশূর-সম্বন্ধে গ্রামবাসিগণের যেরূপ ধারণা, আমিও সেইরূপ দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে, এই জগতে শৃঙ্খলা আছে, একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম অস্তিত্ববান প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীকে পরিচালন করিতেছে।

এই নিয়ম অন্ধ নহে। কারণ কোন অন্ধ নিয়ম জীবের জীবন পরিচালন করিতে পারে না। স্যার জে সি বসুর চমৎকার গবেষণাকে ধন্যবাদ,—এখন প্রমাণ করা যাইতে পারে যে জড়েরও জীবন আছে। যে নিয়ম সকল জীবনকে পরিচালন করে তাহাই ঈশ্বর।

নিয়ম এবং নিয়মস্রষ্টা এক। নিয়ম এবং

নিয়মস্রষ্টাকে আমি অস্বীকার করিতে পারি না, কারণ আমি নিয়ম বা নিয়মস্রষ্টার সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানি। যেমন কোন জাগতিক শক্তি সম্বন্ধে আমার অস্বীকারে বা অজ্ঞতায় আমার কোন লাভ নাই, ঠিক তেমন ঈশ্বর এবং তাঁহার নিয়ম অস্বীকার করিলেও আমি উহা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিব না, পক্ষান্তরে জাগতিক শাসন স্বীকার করিলে ইহার অধীনে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা যেরূপ সহজ হয়, বিনাপ্রতিবাদে ও বিনীতভাবে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমি স্পষ্ট দেখি যে আমার চারিদিকে সকল বস্তুই সতত পরিবর্তিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল পরিবর্তনের পশ্চাতে যে একটি অপরিবর্তনীয় জীবন্ত সত্তা বিদ্যমান, তাহাই সকলকে ধারণ করিয়া আছে; তাহাই সৃষ্টি, বিনাশ এবং পুনঃসৃষ্টি করে। সেই সজীব শক্তি বা চৈতন্যই ঈশ্বর। আমি ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা যাহা কিছু দেখি উহা স্থায়ী হইতে পারে না, হইবেও না। একমাত্র তিনিই নিত্য।

এই শক্তি কি দয়াশীল বা নির্দয়? আমি দেখি ইহা পরম দয়াশীল; কারণ মৃত্যুর মধ্যে জীবন, অসত্যের মধ্যে সত্য এবং অন্ধকারের মধ্যে আলোক বিরাজিত। ইহা হইতে আমার ধারণা যে ঈশ্বরই জীবন, সত্য ও আলোক। তিনি প্রেমময় এবং পরম মঙ্গলময়।

তিনি যদি কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকেই চরিতার্থ করিতেন তাহা হইলে আমাদের কোন উপকারে আসিতেন না। ঈশ্বর হইতে হইলে ঈশ্বরকে অন্তরের উপর রাজত্ব করিতে এবং ইহাকে পরিবর্তন করিতেই হইবে। তাঁহার উপাসকের সামান্যতম কাজের মধ্যেও তিনি অবশ্যই প্রকাশিত হইবেন। একমাত্র যথার্থ অনুভূতি সহায়ে ইহা বুঝা যাইতে পারে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অপেক্ষাও ইহা বাস্তব। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বাস্তব বলিয়া আমাদের মনে হইলেও ইহা প্রায়ই মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিই অভ্রান্ত। ইহা বাহ্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না, পরন্তু যাঁহারা আপনাদের অভ্যন্তরে ঈশ্বরকে যথার্থই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছেন তাঁহাদের পরিবর্তিত আচরণ ও চরিত্র দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়।

সকল দেশে সকল যুগে নিয়ত যে অবতার ও ধর্মাচার্যগণের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সাক্ষ্য উপেক্ষা করিলে নিজকেই অস্বীকার করা হয়। অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস হইতেই এই অনুভূতি হইয়া থাকে। যিনি তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রূপ সত্য পরীক্ষা করিতে চান, তিনি জীবন্ত বিশ্বাস সহায়ে ইহা করিতে পারেন। যেহেতু বাহ্য প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাস প্রমাণিত হইতে পরে না, সেইজন্য পৃথিবীর নৈতিক শাসন, নৈতিক আইন—সত্য ও প্রেমের আইনের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস করিয়া চলাই নিরাপদ।

যাহা কিছু সত্য ও প্রেম-বিরোধী তাহাকেই সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার দৃঢ় সংকল্পই এই বিশ্বাস জন্মাইবার নিরাপদ উপায়।

আমি স্বীকার করি যে যুক্তি দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন করিবার তর্কপ্রণালী আমার জানা নাই। বিশ্বাস যুক্তিকে অতিক্রম করে। আমি অসম্ভব চেষ্টা করিতে উপদেশ দেই না।

আমি অসতের অস্তিত্ব কোন যুক্তিপূর্ণ উপায় দ্বারা নির্ণয় করিতে পারি না। ইহা করিতে চাহিলে ঈশ্বরের তুল্য হইতে হয়। এজন্য আমি অসংকে অসৎ বলিয়াই বিনীতভাবে গ্রহণ করি। আমি জানি যে ঈশ্বরের কোন অসৎ ভাব নাই, তথাপি যদি অসৎ ভাব থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তিনিই উহার স্রষ্টা, কিন্তু উহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আমি আরও জানি যে, আমি যদি জীবন পণ করিয়া অসতের সঙ্গে সংগ্রাম না করি এবং উহার বিরুদ্ধে না চলি, তাহা হইলে কখনও ঈশ্বরকে জানিতে পারিব না। আমার সামান্য ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এই বিশ্বাসে সুরক্ষিত। আমি যতই পবিত্র হইতে চেষ্টা করি, ততই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইতেছি বলিয়া বোধ করি। বর্তমানে আমার বিশ্বাস যেরূপ শুধু পক্ষসমর্থনমাত্র, এরূপ না হইয়া যদি হিমালয় পর্বতের ন্যায় অটল এবং ইহার শীর্ষস্থ শুভ্র তুষারের ন্যায় হইত, তাহা হইলে আমি আরও কত অধিকতর ঈশ্বরের সমীপবর্তী হইতাম!

সিংহলে বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য্য

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, এম-এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

(১)

বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতী খৃষ্টোত্তর ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে গৌড়-দেশের অন্তর্গত বীরবতী গ্রামে কাত্যায়ন গোত্রীয় এক উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তরুণ বয়সেই ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। শ্রুতি, স্মৃতি, কাব্য, নাটক, তর্ক, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া রামচন্দ্র বৌদ্ধশাস্ত্র অধিগত করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হন। তৎকালে সিংহলদ্বীপই হীনযানী বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রামচন্দ্র পালি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গৌড় হইতে সিংহল যাত্রা করেন।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে রামচন্দ্র সিংহল দ্বীপে উপস্থিত হন। ঐ সময় দ্বিতীয় পরাক্রম-বাহু সিংহলে রাজত্ব করিতেছিলেন (১২২৫-৬০ খৃঃ)। সিংহলের বৌদ্ধসঙ্ঘের অধিনায়ক ছিলেন সঙ্ঘরাজ ত্রিপিটকাচার্য্য শ্রীমদ্ রাহুলপাদ। রামচন্দ্র কবিভারতী তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জয়বর্দ্ধনপুর পরিবেণে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিপিটক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে এবং সংঘরাজ রাহুলের ধর্ম্মজীবনের প্রভাব হেতু রামচন্দ্র ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ করেন।

রামচন্দ্র সিংহলে থাকিয়া তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন,—(১) ভক্তিশতকম্ বা বুদ্ধ-শতকম্, (২) বৃত্তমালা ও (৩) কেদারভট্ট-বিরচিত বৃত্তরত্নাকরের টীকা "বৃত্তরত্নাকর-পঞ্চিকা"। শেষোক্ত গ্রন্থ ১৭৮৯ বুদ্ধাব্দ অর্থাৎ ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতী-কৃত "ভক্তি-শতকম্" ভক্তিরসে অভিষিঞ্চিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত একখানি অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। ভগবান্ তথাগতের প্রতি ভক্তি নিবেদন প্রসঙ্গে ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সারতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। "শতকম্" নাম হইলেও ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ১০৭টি শ্লোক রহিয়াছে এবং তাহা ১২টি বিভিন্ন ছন্দে গ্রথিত। কথিত আছে, সিংহলরাজ দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু "ভক্তিশতকম্" পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন এবং পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতীকে "বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী" উপাধিতে ভূষিত করিয়া তদীয় প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ প্রদান করেন।

(২)

"বৃত্তরত্নাকর-পঞ্চিকা"তে রামচন্দ্র কবিভারতী এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"শ্রীমদ্রাহুলপাদতস্ত্রিপিটকাচার্য্যাদ্ গুরোর্নির্ম্মলং
বৌদ্ধশাস্ত্রমধীত্য যস্য শরণং রত্নত্রয়ং শিশ্রিয়ে।
যো বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তি-পদবীং লঙ্কেশ্বরাল্লব্ধবান্
স শ্রীমানিহ সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণো ব্যাখ্যামিমাং
ব্যাতনোৎ॥"

ত্রিপিটকাচার্য্য শ্রীমদ্ রাহুলপাদ গুরুর নিকট নির্ম্মল বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যিনি ত্রিরত্নের

(বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের) শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি লঙ্কেশ্বর হইতে "বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী" পদবী লাভ করিয়াছেন সেই সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ শ্রীমান্ (রামচন্দ্র কবিভারতী) এই ব্যাখ্যা রচনা করিলেন।

"বৃত্তরত্নাকর-পঞ্চিকাতে" রামচন্দ্র তদীয় গুরু রাহুলের মহিমা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন ;—

"রাহুলনামা মুনিরতিবিদ্বান্
ষড়্‌গুণভারী ত্রিপিটকধারী।
মৌর্য্যকুলাব্ধি-প্রভব-সুধাংশু-
র্জন্মনি জন্মন্যপি মম মিত্রম্॥"

অতিশয় বিদ্বান্, ষড়্‌গুণবিভূষিত, ত্রিপিটকাচার্য্য, মৌর্য্যকুল-সমুদ্র-সম্ভূত চন্দ্রতুল্য রাহুল মুনি প্রতি জন্মেই যেন আমার মিত্র হন। মৌর্য্যকুল শাক্যবংশের শাখাবিশেষ।

"ভক্তিশতকম্" গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোকে পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতী আত্মপরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"ভাস্বদ্-ভানুকুলাম্বুজন্ম-মিহিরে রাজাধিরাজেশ্বরে শ্রীলঙ্কাধিপতৌ পরাক্রমভুজে নীত্যা মহীং শাসতি। সদ্-গৌড়ঃ কবিভারতী ক্ষিতিসুরঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ সুধীঃ শ্রোতৃণামকরোৎ স ভক্তিশতকং ধর্ম্মার্থমোক্ষপ্রদম্॥"

কীর্ত্তিসমুজ্জ্বল সূর্য্যবংশরূপ পদ্মের রবিস্বরূপ রাজাধিরাজ পরাক্রমবাহু যে সময়ে রাজধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন সেই সময়ে গৌড়দেশ-জাত সুধী ব্রাহ্মণ শ্রীরামচন্দ্র কবিভারতী শ্রোতৃ-বর্গের ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষপ্রদ "ভক্তিশতক" গ্রন্থ রচনা করেন।

'পুষ্পিকা'তে লিখিত আছে,—

"ইতি শ্রীশাক্যমুনের্ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য পরমোপাসকেন গৌড়দেশীয়েন শ্রীবৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তিনা ভূসুরাচার্য্যেণ মহাপণ্ডিতেন বিরচিতং ভক্তিশতকং সমাপ্তম্।"

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীশাক্যমুনির পরম উপাসক গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণাচার্য্য মহাপণ্ডিত শ্রীবৌদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক রচিত "ভক্তিশতক" গ্রন্থ সমাপ্ত।

লঙ্কার শৈলবিম্বারামবিহার-নিবাসী আচার্য্য শীলস্কন্ধ স্থবির প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "ভক্তি-শতকের" উপর "রত্নমালা" নামে একটি সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করেন। উক্ত টীকাসমেত "ভক্তিশতকম্" তাঁহারই সম্পাদনায় ১৮৯৬ সনে Buddhist Text Society of India হইতে প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে "বুদ্ধশতকম্" (ভক্তিশতকম্) এর আর একটি সংস্করণ মূল ও হিন্দী অনুবাদসহ ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন কর্ত্তৃক সারনাথ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (২০০১ বিক্রমাব্দ)।

ভুল

শ্রীবলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, বি-এসসি

তোমার ঘরে বসিয়া আছি
তোমায় করি দূর,
মত্ত শত বাসনা মাঝে
মানস ভরপুর।
আলোর মাঝে বসিয়া তবু
হয়েছি যেন অন্ধ,

কুঞ্জতলে কাটিল দিবা
বিহীন ফুলগন্ধ।
ভুলিয়া তোমা নিখিল মাঝে
ভুলিনু সবাকারে,
অন্ধসম রহিনু বসি
আলোর পারাবারে।

মৌলানা রূমীর প্রেমধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম-এ

মৌলানা রূমী নামে প্রসিদ্ধ জলালুদ্দিন্ মহম্মদ্ বল্‌খী ফারসী সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঈরানের অন্তর্গত বল্‌খ শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি তুর্কীস্থানের অন্তর্গত 'কোনিয়'তে অতিবাহিত করেন। তিনি ৬ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রায় ২৬০০০ বয়ৎ (বা দ্বি-পংক্তি)-সমন্বিত প্রসিদ্ধ 'মস্‌নবীই-ম'নবী' (বা আধ্যাত্মিক কাব্য) লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে নানা গল্পের সাহায্যে সুফী (বা সূ ফী) মতবাদ বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার আরো দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে—'দীৱান্‌ই-শম্‌স্‌ই তিব্ রীজ্' ও 'ফীহি মা ফীহি'। দীৱান্‌ই-শম্‌স্‌ই-তিব্ রীজ্ কতকগুলি গজল্ (বা ঘজল্= প্রেমকবিতা) কবিতার সমাবেশ, এবং ইহাতে কবি তাঁহার গুরু (বা পীর) শম্‌সুদ্দীন্ মহম্মদ্ তিব্ রীজীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি প্রেম-কবিতার ভক্তি-অর্ঘ্য দ্বারা পবিত্র প্রেমের গূঢ় রহস্য বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'ফীহি মা ফীহি' গদ্যে লিখিত, এবং ইহাতে তাঁহার প্রিয় শিষ্য মঈমুদ্দীন্ পরৱানা তাঁহাদের প্রভুর (মৌলানা=আমাদের প্রভু) ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে আলোচনাদির কথোপকথন-সমূহ একত্র সমাবেশ করিয়াছেন।

রূমী যেমন সাহিত্যজগতে কবি ও দার্শনিক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মজগতেও সুফী-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত 'মেব্ লবিয়' বা 'মৌলভীয়'-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুফী ধর্ম্মের অনেকাংশে উপনিষদের ধর্ম্মের সহিত তুলনা চলে। ইহাতে ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ভগবৎতত্ত্ব আলোচনাকালে ইহার প্রত্যেকটি চিন্তা-ধারার সহিত উপনিষদের 'পরমাত্মার' যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বৈষ্ণবদের প্রেম-ধর্ম্মের সহিতও সুফী ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুফীধর্ম্মের মতে পবিত্র প্রেমই ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। যদিও এই ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে, তথাপি সুফী-ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম ইসলাম ধর্ম্মেরই মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে বলিয়া দাবী করেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেকটি চিন্তাধারা কোরাণের শ্লোক (বা আয়াৎ) ও হজরৎ মহম্মদের কিংবদন্তীসমূহের (হদীস্) ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন।

রূমীর মস্‌নবীকে সুফীদের পরবর্ত্তী কবি জামী 'ফারসী ভাষার কোরাণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতই ইহাকে কোরাণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। রূমী নিজেও তাঁহার মস্‌নবীর প্রথম খণ্ডের সূচনায় লিখিয়াছেন, "এই মস্‌নবী গ্রন্থ (কিতাবুল্-মস্‌নবী) সেই প্রকৃষ্ট স্থায়ী সত্তার গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে (ইসলাম)-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ। .. ইহা কোরাণের ব্যাখ্যা (কশ্ শাফুল্—কোরাণ) এবং কবি কোরাণকে সদ্‌গুরুর সঙ্গে তুলনা করিতে যাইয়া তাঁহার মস্‌নবীর ৩য় খণ্ডের একস্থানে লিখিয়াছেন, '(এইরূপ ব্যক্তি) কোরাণের তুল্য,

যাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সাধারণ মানুষের (চিন্তাধারার) খাহ্যানুযায়ী সাত রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে।'

হম্‌চ‌ুন্ কোরান্ কি বর্‌'নী হফ্‌ৎ তূ অস্‌ৎ ;
খাস্‌ব্ ব 'আম্ রা মত্ব্ 'অম্ দর্ উ অসৎ।

প্রত্যেক ধর্ম্মই ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিবার এক একটি নির্দ্দিষ্ট পথমাত্র। জগতের সকল ধর্ম্মই সেই সত্তাকে জানিবার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইয়া গিয়াছে। রূমী তাঁহার কাব্যে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'প্রত্যেক নবী (অবতার) ও বলী (ভক্ত বা শ্রেষ্ঠপুরুষ) বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন ; কিন্তু গন্তব্যস্থল একই, যেখানে সেই সত্য বা ভগবান বিরাজমান।'

হর্ নবী ব হর্ বলী রা মস্‌লকীস্‌ৎ ;
লিক ব ঃহক্ মী বুরদ্ জুম্‌ল ইয়কীস্‌ৎ।

সকল ধর্ম্মের সার ভগবৎ-উপলব্ধি। ধর্ম্মের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। মুসা ও মেষ-পালক (মস্‌নবী, ২য় খণ্ড) নামক গল্পে এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ : একদা এক মেষপালক ভগবানকে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, 'হে ভগবান, তুমি কোথায়? তুমি এস, যাহাতে তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে সেবা করিতে পারি, এবং পদযুগল ধৌত করিয়া দিতে পারি ও চরণে পাদুকা পরিধান করাইয়া দিতে পারি, ইত্যাদি।' মুসা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুমি কাহার সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছ? তিনি যে নির্গুণ ও জন্মরহিত। কোন গুণ বিশেষ মানুষ-সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইতে পারে। তোমার এই কলুষিত আখ্যাদি যে এই পৃথিবীকে পাপে পরিপূর্ণ করিয়া দিবে, ইত্যাদি।' তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, 'হে মুসা, আমি তোমাদের সকলকে পুনরায় আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য পাঠাইয়াছি, আমা হইতে দূরে রাখিবার জন্য পাঠাই নাই। মানুষের চিন্তাধারানুযায়ীই তাহারা আমাকে প্রার্থনা করিয়া থাকে ; কিন্তু আমি এই সকল প্রার্থনা বা প্রশংসার কাঙ্গাল নহি। আমি তাহাদের ভাষা বা কথার প্রতি লক্ষ্য করি না ; আমি তাহাদের হৃদয়ের প্রতি খেয়াল করি।...(প্রকৃতপক্ষে) প্রেমধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক, ইহার লক্ষ্য কেবল এক ভগবান।'

মা জবান্ রা ননিগরীম্ ব কাল্ রা ;
মা দরূন্ রা বনিগরীম্ ব ঃহাল রা।

... ...

মিল্লতি-'ইশ্‌ক্ অজ্ হম দীন্‌হা জুদাস্ত্ ;
'আশিকান্ রা মিল্লৎ ব মজ্‌হব্ জুদাস্ত্।

সুফীদের মতে প্রেমই ভগবৎ-উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সেই পরমাত্মা যে প্রেমময়। এই পৃথিবীর যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তাহার সকলই সেই পরমাত্মার বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। কবি গাহিয়াছেন, 'তাঁহার প্রেম প্রকাশমান, কিন্তু সেই প্রেমাস্পদ লুক্কায়িত রহিয়াছেন ; (সেই পরম) বন্ধু যে বাহিরে, তাঁহার বাহ্যিক প্রকাশ কেবল এই পৃথিবীতে রহিয়াছে।'

'ইশ্‌ক্বি-উ পয়দা ব ম'অশূক্বশ নিহান্ ;
ইয়ার্ বীরূন্ ফিৎর্নায়-উ দর্ জহান্।

হজরৎ মহম্মদের প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী (হদীসি-কুদ্‌সী)—'তোমার (অর্থাৎ হজরৎ মহম্মদ) জন্যই (লওলক...) আমি (ভগবান) এই জগৎসমূহের সৃষ্টি করিয়াছি'—ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রূমী তাঁহার মস্‌নবীর ৫ম খণ্ডে লিখিয়াছেন, "পবিত্র প্রেম মহম্মদের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল ; প্রেমের নিমিত্তই ভগবান তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার জন্যই'।... যদি প্রেমের নিমিত্তই না হইত, তাহা হইলে আমি কি করিয়া এই জগৎসমূহের সৃষ্টি করিতে পারিতাম। আমি এই জন্যই স্বর্গের

ন্যায় মনোরম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি প্রেমের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পার। ···আমি পৃথিবীকে এত নিকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তুমি প্রেমিকদের নীচতা সম্বন্ধেও কতকটা ধারণা করিতে পার। আমি পৃথিবীকেই (আবার) সজীবতা ও সতেজতা দান করিয়াছি, যাহাতে তুমি সাধুদের (আধ্যাত্মিক) উন্নতির কতকট আভাস পাইতে পার। (এবং) প্রশান্ত পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতহৃদয় সাধুগণ প্রেমিকদের মনের অবিচলিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যদিও সেই অবস্থাই প্রকৃত সত্তা ও ইহার বর্ণনা কেবল রূপক মাত্র; (কিন্তু এই বর্ণনা এই জন্য করা হয়), যাহাতে (প্রকৃত সত্তার) কতকটা তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়।”

বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমের অবস্থা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না—ইহা কেবল উপলব্ধি দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ‘প্রেম কি?’ এই প্রশ্নের উত্তরে কবি তাঁহার মস্নবীর ২য় খণ্ডের সূচনাতে লিখিয়াছেন, ‘আমাদের মত হও; (এবং) তখন জানিতে পারিবে যে প্রেম অর্থে গভীর ভালবাসা বুঝায়,—ইহার কোন কূল কিনারা নাই; এবং এই অর্থেই প্রেমকে ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—মানুষের ভালবাসার সহিত ইহার কোন তুলনা হয় না। (কোরাণের শ্লোকাংশ) ‘তিনি (অর্থাৎ ভগবান) তাহাদিগকে (অর্থাৎ সৃষ্টজীবদিগকে) ভালবাসেন। (ইয়ুহিব্বুহুম্) তিনি নিজেই পূর্ণ; ইহার সহিত তাহারা তাঁহাকে ভালবাসেন (ইয়ুহিব্বুনহু) জড়িত করার কি দরকার?··· (কাজে কাজেই) সকল প্রশংসা ভগবানের উপরই বর্ষিত হউক, যিনি উভয় জগতের সর্ব্বময় প্রভু (অল্‌হমুলিল্লা রব্বুল্ ‘আলমিন)।’ —এখানে ‘আলমিন্ (উভয় জগৎ) ‘আলম্ শব্দের দ্বিবচন, এবং ইহার প্রকৃত অর্থ ‘যাহার সাহায্যে (ভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে) জানা যায়’ (‘ইল্‌ম্ হইতে)। অর্থাৎ এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানুষ তাহার সেই প্রকৃত সত্তাকে সঠিক উপলব্ধি করিতে পারে।

কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, ‘তাঁহার হাতেই সকল জিনিষের প্রভুত্ব এবং তাঁহার নিকটই তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।’ অর্থাৎ ভগবানের নিকট হইতেই আমরা আসিয়াছি এবং তাঁহার নিকটই আবার সকলে ফিরিয়া যাইব। তিনিই কেবল আছেন; আমরা যতদিন তাঁহার সেই প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারি, ততদিন তাঁহার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছি এবং যখন তাঁহাকে সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিব, তখন প্রকৃত পক্ষে জানিতে পারিব যে কেবল এক সত্তাই চির বিরাজমান। ভগবান ছাড়া আর কেহ শক্তিমান নাই (লা আল্লা ইল্লাল্লাহ)। যখন মানুষ সেই পরম সত্তায় পৌছিবে, তখন দেখিতে পাইবে যে কেবল একই রহিয়াছেন। ‘তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন,’ এবং ‘তাহারা তাঁহাকে ভালবাসেন,’—এই দুই শ্লোকাংশের কোন পার্থক্য তখন আর করা যাইবে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সেই পরমাত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ‘তিনি রসস্বরূপ, (রসো বৈ সঃ)। সেই প্রেমময় রসস্বরূপই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত। রুমী এই সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, ‘ভগবান আবহমান কাল হইতে আমাদের সকলকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন—এবং সেই পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুযায়ীই পৃথিবীর সকল অণু-পরমাণু চুম্বক-পাথর ও তৃণের ন্যায় একে অন্যের প্রতি সঙ্ঘবদ্ধ ও তাহাদের সাথীদের প্রতি প্রেমাকৃষ্ট।···ক্ষিতি শরীরের ক্ষিতি বা মাটিকে সম্বোধন করিয়া

বলিতেছে, 'আত্মা হইতে বিদায় নিয়া বালু-কণার ন্যায় আবার আমার নিকট ফিরিয়া আস।'··· ইহার উত্তরে মাটি বলিতেছে, 'কিন্তু আমি যে নিগড়বদ্ধ, যদিও আমি বিরহজনিত বিষাদ-যুক্ত।' অপ্ শরীরের অপ্ বা জলকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং বলিতেছে, 'নির্ব্বাসন হইতে আবার আমাদের নিকট ফিরিয়া আস।' আকাশ পদার্থ শরীরের উত্তাপকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'তুমি তেজ হইতে উদ্ভূত, আবার তোমার মূলের সহিত মিশিয়া যাও।' পঞ্চভূতের রজ্জুহীন আকর্ষণজনিত রোগসকল সকল সময়ই শরীরকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে এই পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে এক অন্য হইতে পৃথক হইয়া যাইতে পারে। এই ভূতসকল শৃঙ্খলাবদ্ধ চারিটি পাখীর ন্যায়; মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি, এই বন্ধনকে শিথিল করিয়া দিতেছে।···যখন (শরীরের) প্রত্যেক অংশই তাহার মূলের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন এই বিচ্ছিন্ন আগন্তুক আত্মার কি দশা হইবে? ইহা বলিতেছে, "হে আমার কলুষিত পার্থিব অংশসমূহ, আমার নির্ব্বাসন আরো কঠোর, কারণ আমি স্বর্গীয়। শরীরের কামনা সবুজ তৃণাদি ও প্রবহমাণ ঝরণার প্রতি, কারণ এই সকল হইতেই ইহার উৎপত্তি; আত্মার কামনা সেই চিরযৌবন পরমপুরুষের প্রতি, কারণ পরমাত্মা হইতেই ইহার উৎপত্তি। (মসনবী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫১-৫৩)।" সকল জীবই অবশেষে শরীর বা পার্থিব ভূতসমূহের আধিপত্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সেই পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিবে।

প্রেমকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, পার্থিব প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেম। পার্থিব প্রেম অতি সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর, কিন্তু স্বর্গীয় প্রেম অতি উদার ও মহৎ; ইহাতে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। কবি গাহিয়াছেন, 'যাহা মানুষকে অন্ধ ও বধির করিয়া দেয়, এবং দেহের প্রতি আকৃষ্ট করে, তাহা প্রকৃত সত্য বা প্রেম নহে।'

ম'নী আন্ নবুরদ্ কি কূর্ র কর্ কুনদ্;
মরদ্ রা বর্ নক্‌শ্ 'আশিক্ তর্ কুনদ্।

এই প্রকার ভালবাসার আধিপত্যেই মানুষ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করে। মানুষ যাহা চিরস্থায়ী ও চিরন্তন তাহা ভালবাসিতে শিখে নাই বলিয়াই এই সকল দুঃখ ভোগ করে এবং ক্রমে ক্রমে সেই প্রকৃত ভালবাসার প্রতি ধাবিত হয়, যেখানে কেবল অনন্ত সুখ, দুঃখের লেশমাত্রও নাই। সেই পরমানন্দের সহিত এই ক্ষণিক পার্থিব আনন্দের তুলনাই হয় না। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, ইহাই আদর্শ প্রেম। মানুষ যখন সেই প্রেমের আভাস পাইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে এই পার্থিব প্রেম সেই আদর্শ প্রেমের ছায়া মাত্র এবং সেই প্রেমময় ভগবানই কেবল (সকল জীবে) বিরাজ করিতেছেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই। কবি গাহিয়াছেন, 'সেই প্রেমময় ভগবানই কেবল আছেন, তাহা ছাড়া সকলই তাঁহার ছায়া মাত্র; সেই প্রেমময়ই কেবল জীবন্ত ও চিরস্থায়ী, প্রেমিক তো মরণশীল।'

জুম্‌ল ম'অশূকস্ত্ 'আশিক্ পর্‌দায়ি;
জিন্দ ম'অশূকস্ত্ 'আশিক্ মুর্‌দায়ি।

সেই 'এক এবং অদ্বিতীয়' (একমেবা-দ্বিতীয়ম্) ও চিরস্থায়ী অনন্ত পরমসত্তাই যদি চির বিরাজমান, আর কোন কিছুই যদি প্রকৃতপক্ষে না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এই পৃথিবী ও সৃষ্ট জীবের তাৎপর্য্যই বা কি? কবি কোরাণের আদমের পতনকে ভিত্তি করিয়াই সৃষ্টির রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'আদম পশুবৃত্তির দিকে একপদ অগ্রসর হইলেন এবং এই প্রবৃত্তির শাস্তি স্বরূপ স্বর্গধাম হইতে তাঁহার বিচ্যুতি হইল। যদিও তাহা হইতে উদ্ভূত এই পাপ

একটি চুলের ন্যায় ছিল, কিন্তু এই পাপ তাঁহার চোখের মধ্যে জন্মলাভ করিল। আদম্ সেই চিরস্থায়ী স্বর্গীয় আলোর চক্ষু স্বরূপ, এবং তাঁহার চোখের সেই চুলটি একটি পাহাড়ের মত বোধ হইল। যদি সেই অবস্থায় আদম্ স্বর্গীয় দেবদূতদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর পাপজনিত অপরাধের অনুতাপ স্বীকার করিতে হইত না। কারণ, যখন সৎ মন অন্য সৎ মনের সহিত সম্মিলিত হয়, ইহা খারাপ কাজকে বাঁধা দিতে পারে; কিন্তু যখন দুষ্ট প্রবৃত্তি অন্য দুষ্ট প্রবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হয়, ইহা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়।' (মস্‌নবী, ২য় খণ্ড ১ম কবিতা)। সুফীগণ পাপকেই সৃষ্টির কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষ যখনই তাহার চিরস্থায়ী পরম পবিত্র ও আনন্দময় সত্তা হইতে বিচ্যুত হয় তখন হইতেই তাহার পার্থিব জীবন আরম্ভ হয়; এবং যখনই সে তাহার এই পার্থিব পঙ্কিলতা হইতে মুক্তিলাভ করে, তখনই সে তাহার সেই পূর্ব্ব স্থানে অধিষ্ঠান লাভ করে। উপনিষদও এইরূপই সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মতে পাপ, অজ্ঞান বা মায়াই এই সৃষ্টির মূল কারণ।

এই পার্থিব পঙ্কিলতা বা অজ্ঞান ও মায়া-বন্ধন হইতে মুক্তি সম্বন্ধে সকল ধর্ম্মগুরুই নানা পথ দেখাইয়াছেন রূমী ইহার উপায় সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, 'যাও; মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া ভগবৎ-বন্ধুর অনুসন্ধান কর। যদি তুমি এইরূপ করিয়া থাক, তাহা হইলে ভগবানই তোমার বন্ধু হইবেন, এবং আলোর পথ তোমার নিকট আবার প্রকাশিত হইবে।' সুফীদের মতে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলেরই গুরু (বা পীর) গ্রহণ করা দরকার, এবং ক্রমে ক্রমে সেই আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিকি-রাহ্) ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করে। রূমী এই ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, '...তুমি ক্রমে ক্রমে সূর্য্য ও সাগরে পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং কাফ পর্ব্বত বা 'অঙ্কা পাখীতে রূপান্তরিত হইবে; কিন্তু তোমার সেই পরমসত্তা এই সকলের কিছুই নহে; হে (পরম-পুরুষ), তুমি যে সকল ধারণা ও চিন্তার বাহিরে।'

তু নিহ ঈন্ বাশী নিহ্ আন্ দর্ জাতি খীশ;
অয় ফজ্ন্ অজ বহম্ বজ বীশ্ বীশ্।

হদীসে বর্ণিত হইয়াছে, 'আমি (ভগবান) প্রচ্ছন্ন মণি ছিলাম; আমি ইচ্ছা করিলাম যে প্রকাশিত হই, সেইজন্যই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলাম।' ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রূমী বলিয়াছেন, 'এই ঘরের অর্থাৎ দেহের মধ্যেই সেই অমূল্য ধন লুক্কায়িত রহিয়াছে; ইহার (ধ্বংস ছাড়া) উপায় নাই,—কাজে কাজেই এই ঘরের ধ্বংসের জন্য চিন্তিত হইও না এবং ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইও না।' আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করিতে হইবে, তাহা হইলেই সেই লুক্কায়িত ধনের খোঁজ পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা আমাদের সেই পরমাত্মার কোন খোঁজ না করিয়া, (রূমীর কথায়) 'এই দোকানের (দেহের) মধ্যে তালির কাজেই লিপ্ত আছি'। 'তালির কাজ' বলিতে কবি পানাহারকে বুঝাইতেছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, 'অসংখ্য তালিযুক্ত শরীরের উপর তুমি আবার তালি যোগ করিতেছ। যখনই তোমার শরীরের তালিযুক্ত কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, তুমি তোমার আহার দ্বারা ইহার উপর তালি দিতেছ।' আমরা এই পৃথিবীতে সেই পরম সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া অবহেলায় জীবন অতিবাহিত করিতেছি। এই অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিবার জন্য অবশেষে

আমাদের অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে। রূমী ও তাহাই বলিতেছেন, 'হায়, এই দোকান ছিল আমার (পরম) সম্পত্তি; আমি ছিলাম অন্ধ, এবং এইজন্যই এই ঘর হইতে কোন সুবিধা পাইতে ইচ্ছা করি নাই। হায়, এই (অমূল্য) ধনকে বৃথাই নষ্ট করিলাম; এবং জীবনামৃত ধূলায় বিলাইয়া দিলাম।'

যতক্ষণ আমরা এই দেহের প্রতি আকৃষ্ট ততক্ষণ সেই প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ কিছুই জানিতে পারি না; এবং আমাদের দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। কিন্তু যখন মানুষ সেই পবিত্র প্রেমের স্বাদ পায়, তখন আর সে কিছুই চায় না। ভালবাসাতেই তার আনন্দ। প্রকৃত প্রেমিক জানে যে সে তাহার প্রেমিকার ছায়ামাত্র। কবি মজনূর ভাষায় বলিতেছেন, 'কিন্তু আমার অস্তিত্ব যে লায়লাময়; এই খোল সেই মুক্তার গুণে পরিপূর্ণ। ··সেই জ্ঞানী পুরুষ যাঁহার হৃদয় প্রেমের আলোতে উদ্ভাসিত, জানেন যে লায়লা ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।···যদি ভালবাসাই না থাকিত, তাহা হইলে এই অস্তিত্বই বা কি করিয়া প্রকাশ পাইত? কি করিয়া খাদ্য তোমার সহিত যুক্ত হইত এবং তোমার সহিত মিশিয়া যাইত? খাদ্য কি করিয়া তোমাতে রূপান্তরিত হইল? তোমার ভালবাসা ও খাইবার প্রবৃত্তির জন্য; তাহা না হইলে খাদ্য আবার কি করিয়া জীবনীশক্তির সংস্পর্শে আসিতে পারে? ভালবাসাই জড় খাদ্যকে চৈতন্যে পরিবর্তিত করে; যেমন, ক্ষণস্থায়ী জীবন (ভালবাসার সাহায্যে) চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্ত হয়।' (৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮)

মানুষ সেই পরম সত্তা হইতে উদ্ভূত এবং অন্তিমকালে তাঁহার সহিতই মিলিত হইবে। আমাদের কবি কোরাণের 'তুমি ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাপূর্বক (আমার নিকটই) আসিতেছ (ইতিয়া ত্বৌ'আন্ অব্ কর্‌হান্)' আয়াংটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, '(ভগবানের আদেশ) 'তুমি অনিচ্ছাসত্ত্বে আসিতেছ' তাহার জন্যই প্রযোজ্য যে অন্ধ-বিশ্বাসী; (এবং) 'তুমি ইচ্ছা পূর্বক আসিতেছ' তাহার জন্যই প্রযোজ্য যে পবিত্রতার ছাঁচে গঠিত—এই প্রথম ব্যক্তি কোন কারণবশতঃ ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন লাভ বা স্বার্থ ব্যতিরেকেই ভগবানকে ভালবাসে।' (৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ) মানুষ যাহার প্রতিই আকৃষ্ট হউক না কেন, সে প্রকৃত পক্ষে ভগবানকেই ভালবাসিতেছে, কারণ যে যাহাই ভালবাসে না কেন, সেই পরমসত্তার অংশ ইহার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়াই মানুষ ইহাকে ভালবাসিতেছে। রূমী বলিতেছেন, '"ভালবাসার উদ্দেশ্য কোন দেহ নহে—সেই ভালবাসা জাগতিকই হউক বা পারমার্থিকই হউক। যদি দেহই তোমার ভালবাসার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে কেন আর এই দেহকে ভালবাস না? (আবার) তুমি বুদ্ধি, জ্ঞান বা মেধার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মনে করিতেছ যে ইহাদের অপেক্ষা তুমি মহৎ, কারণ ইহারা কেবল দেহকেই ভালবাসিতেছে। (কিন্তু) মনে রাখিও যে ইহা তামার উপর গিল্টি করা সোনা; এবং এই জ্ঞানও কেবল তোমার প্রবৃত্তির উপর প্রতিফলিত পরমসত্তার আলোকপাত মাত্র। (প্রকৃত পক্ষে) মানুষের সৌন্দর্য্য গিল্টিকরা সোনার ন্যায়। কারণ মনের সৌন্দর্য্যই চিরস্থায়ী; ইহার ওষ্ঠদ্বয় আমাদের জীবনামৃত প্রদান করিয়া থাকে।" (২য় খণ্ড, ২৮৫-৬ পৃঃ)। উপনিষদেও এইরূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। 'বাস্তবিক স্বামীর জন্যই স্বামী

প্রিয় নহে,' সেই পরম সত্তার জন্যই স্বামী প্রিয়'। (বৃহদারণ্যক)

মস্‌নবীর প্রথম কবিতা 'বাঁশীর কান্না'কে অনেক সময় রুমীর ধর্ম্ম বা দর্শনের সার বলা 'হইয়া থাকে। কবি গাহিয়াছেন, 'শুন, কেমন করিয়া বাঁশী তাহার কাহিনী বলিতেছে,—ইহা তাহার বিরহজনিত হৃদয়ের ব্যথা গাহিতেছে, 'তাহারা আমাকে নলক্ষেত হইতে কাটিয়া লইয়া আসার পর হইতেই, আমার ক্রন্দনের সুর স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই কাঁদাইতেছে।' এই বাঁশীকে মানুষের বিবেকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং ইহা সকল সময়ই ভগবৎপ্রেম উপলব্ধি করিবার জন্য উৎসুক। (ইহা গাহিতেছে) 'দেহ আত্মা হইতে পৃথক নহে, এবং আত্মাও দেহ হইতে পৃথক নহে, তথাপি মানুষ আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না। এই বাঁশীর ক্রন্দন সাধারণ ভাষা নহে, ইহা অগ্নিশিখার ন্যায়; যাহার এই অগ্নির তেজ (ভালবাসা) নাই, তাহার মরণই ভাল।' এই ভালবাসার আগুনই বাঁশীকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। এই ভালবাসা কি? এই ভালবাসাই সকল মানুষকে তাহার পরম সত্তার সহিত পুনরায় মিলিত হইবার জন্য কেবল আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং, আমাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে সেই পরম সত্তাকেই উপলব্ধি করিতে হইবে এবং ইহা উপলব্ধি করিয়া মানুষ ক্রমে ক্রমে সেই পরম সত্তাতেই মিশিয়া যাইবে। এইরূপ পবিত্র প্রেমই আদর্শ ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্ম আমাদের ইহাই শিক্ষা দিতেছে; কিন্তু আমরা সেই প্রকৃত ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা না করিয়া বাহ্যিক আচার ও নিয়মনিষ্ঠা নিয়াই কেবল লিপ্ত থাকি; ধর্ম্মের মূল নীতিকে অনুধাবন করিতে মোটেই চেষ্টা করি না। প্রেমের প্রসার দ্বারা সেই পরম সত্তার উপলব্ধিকেই আমাদের ধর্ম্মের সার করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিব, ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কবি বলিতেছেন, 'প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই, ধর্ম্ম-প্রচার করিতে থাকে, এবং এই কারণেই বিপথগামী হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মই পরস্পর হইতে পৃথক—তাহারা কি করিয়া এক হইতে পারে? বিষ ও চিনি কি এক? ঐক্য ও সমতার স্বাদ কি করিয়া পাইবে, যে পর্য্যন্ত না বিষ ও চিনির উপরে উঠিতে পারিয়াছ (অর্থাৎ ভাল মন্দকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছ)? (১ খণ্ড ৩১-৩২পৃঃ)। পরম সত্তার ঐক্য কেবল সেই জানিতে পারে, যে সেই ঐক্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ইহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেক ধর্ম্মই নানা তুলনা ও উপমাদ্বারা সেই পরম সত্তার কতকটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণে

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিশ্বশান্তি তরে দেব যে জীবন করে গেলে দান,
অমৃতের মাঝে তাহা হয়ে থাক চিরমহীয়ান।
জীবনে বোঝিনি তোমা ক্ষুদ্র হয়ে ছিলে দূরে দূরে,
মৃত্যু তাই বড় করি রেখে গেল বিশ্ববুক জুড়ে।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১ নং মুখার্জ্জি লেন বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২২

শ্রীযুত চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী—

তোমার ২৫।২ তাঃ পত্র পাইলাম। তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান। তোমার স্মরণ থাকা উচিত—প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা করিবার কালে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন এবং বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই মাছ মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। অতএব উহাতেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, প্রাণায়াম সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছ তাহা ঐরূপ অল্প স্বল্প প্রাণায়াম অভ্যাস করা সম্বন্ধে নহে। ঐরূপ প্রাণায়াম অভ্যাস সিদ্ধ গুরুর নিকটে বাস করিয়া করিতে হয় এবং কোন গৃহী ব্যক্তিই করিতে পারে না।

তোমার একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রাণায়াম অভ্যাস করাই জীবনোদ্দেশ্য নহে। শ্রীস্বামী বিবেকানন্দও ঐরূপ বলেন নাই। উদ্দেশ্য,—ঈশ্বরলাভ; উপায়,—তাঁহাকে অকপট ভালবাসা ও তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া। ঐ উদ্দেশ্যের সহায়ক—অল্প স্বল্প প্রাণায়াম অভ্যাস এবং বিশেষ করিয়া ধ্যানাভ্যাস করা। আশা করি উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিবে না। অধিক কি আর লিখিব। ইতি—

শুঃ
শ্রীসারদানন্দ

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

Belur Math P. O., Dt. Howrah,
২রা চৈত্র, ১৩৩৯

শ্রীমান সুরেন,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতি এবং দীনসেবার ভাব থাকিলে তোমার ব্যবসা কোন ক্ষতি করিবে না। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া নিজ কর্ম্ম করিয়া যাও—তিনি তোমাকে ঠিক করিয়া নিবেন। তোমার একবার দীক্ষা হইয়াছে, ভগবানই গুরু। 'মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কাণে—জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।' কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়াছ, বারবার মন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কি হইবে? দীক্ষাগুরু একজন, শিক্ষাগুরু একাধিক হইতে পারেন। আমার মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভক্তিবিশ্বাসের সহিত ভালবাসিয়া তোমার কুলগুরু-প্রদত্ত মন্ত্র নিষ্ঠার সহিত জপ করাই ভাল, স্বয়ং ভগবান দয়া করিলেই মানুষ মোহমুক্ত হইতে পারে। অধিক কি লিখিব। তোমার কল্যাণ হউক। আমার শরীর মন্দ নয়। তোমার ইচ্ছা হয় ত একবার এখানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে পার। কলিকাতা কোথায়ও থাকিবার ব্যবস্থা করে এস, কারণ মঠে অত্যন্ত স্থানাভাব। তুমি বেশী ভাবিও না। খুব কাতরভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাপন্ন হও। সাধন-ভজন করিবার সময় তাঁহার নিকট ভক্তি-বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিও। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—
শিবানন্দ

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন, এম-এ, বি-এল্

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে বা লিখতে সংকোচ আসে। স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর-চরিত আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—এমন একটা যন্ত্র যদি থাকতো যা দিয়ে বড়কে ছোট করে দেখা যায়, যেমন বৈজ্ঞানিকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছোটকে বড় করে দেখে, তবে আমাদের বিদ্যাসাগরকে বোঝা সহজ হোতো; কারণ আমরা যে তাঁর তুলনায় অতি ছোট। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। এ অলোকসামান্য সর্বতোমুখী প্রতিভায় দীপ্ত জীবনকে বুঝতে গেলে আমাদের সত্যই এমন একটি যন্ত্র থাকা দরকার যা বড়কে ছোট করে দেখাতে পারে। তা নেই বলেই আমাদের তাঁকে সম্যক্‌ভাবে জানতে মুশ্‌কিল হয়েছে। সূর্যের আলোয় ধরণী কত সমৃদ্ধ ও শোভিত হয় ফলে ফুলে। সেই ধরণীকে উপভোগ করি আমরা—এটা আমাদের প্রকৃতি-গত হয়ে গেছে।' আজ যদি সূর্যের পানে তাকিয়ে তার স্বরূপ জানতে চাই, তাকি আমরা পারবো? আমাদের চোখ ঝল্‌সে যাবে যে! আকাশের রবির সংগে মর্ত্যের রবির এখানে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। বর্তমান বাংলার সংস্কৃতি-জগতে যা কিছু ঐশ্বর্য আমরা ভোগ কচ্ছি, তাতো মর্ত্যের রবিরই দান। তিনি দিয়েছেন আমাদের ভাষা, আমাদের ভাব, আমাদের গান; যে চিন্তাধারা আমরা অনুসরণ করি তাতো তাঁরই দান। কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ অজস্রধারায় দান করে তিনি আমাদের সাহিত্যকে যা করে তুলেছেন, আমাদের শতদুর্গতিপূর্ণ বিষাদমলিন জীবনে তাইতো একমাত্র গর্ব। তদুপরি আমাদের জাতীয় জীবন সমগ্রভাবে তাঁর কাছে যত ঋণী, একজন ব্যক্তির কাছে ততটা ঋণী কোন জাতি কোন কালে ছিল কিনা, জানি না। শিক্ষা-বিস্তারে, পল্লী-সংগঠনে, কুটিরশিল্প-উন্নয়নে, জাতির মুক্তি-আন্দোলনে তিনি তাঁর অসামান্য মনীষা ও কর্মশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। "আধো আলো আধো ছায়ায়" ঘেরা জগতের শ্রেষ্ঠ কবি কল্পনার মনোরম স্থান ছেড়ে এসে যেমন করে এদেশের রূঢ় বাস্তব দুঃখ-দুর্দশাসমূহ বুক পেতে নিয়ে অনুভব করেছিলেন. জনগণের সেবায় পথের ধূলায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমন করে অন্য কোথাও কোন কবি দাঁড়িয়েছিলেন কিনা জানি না। জাতীয় আন্দোলনের পুরো-ভাগে দাঁড়িয়ে "জনগণ-মন অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতার" আবাহন করে তিনিই স্বদেশব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন দেশবাসীকে। এদেশের সর্বহারা অগণিত জনসাধারণ—যারা উদয়াস্ত খাটে, তবুও নিঃস্ব, আর এ না পাওয়ার নালিশও জানায় না—তাদের মুখে ভাষা দেবার জন্য তিনি প্রাণের রঙে রাঙিয়ে লিখলেন, 'এবার ফিরাও মোরে', মন্ত্রোচ্চারণ করলেন গণদেবতার—"রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে, ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।"

এমন পরিপূর্ণ জীবন আলোচনা করা সত্যই অতি কঠিন কাজ! বিশেষতঃ আজিও আমরা রবীন্দ্রযুগে বাস কচ্ছি। তাঁরই আলোতে উদ্ভাসিত

বাংলার মাটির বুকে দাঁড়িয়ে হয়তো তাঁর জয়গান করতে পারি, তাঁর প্রশস্তি রচনা করতে পারি, তাঁরই দেওয়া ভাষায় ও ভাবে, গংগা-জলে গংগা-পূজা করার মত, কিন্তু তাঁর দানের পরিমাপ, তাঁর ঐশ্বর্যের হিসাব-নিকাশ করবার সময় আজিও কি এসেছে—বিশেষ করে আমাদের মত অনধিকারী অসাহিত্যিকদের পক্ষে? আমার সংকোচ এখানেই। কিছু লিখে রবীন্দ্রসমালোচনা-সাহিত্যকে কিছুমাত্র সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা আমার নেই—তাই সে চেষ্টাও আমি করবো না। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কবিপ্রতিভার অনন্যসাধারণ প্রকাশ সমগ্র বিশ্বজোড়া বিদগ্ধসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংখ্যাতীত সমালোচনা ও স্তুতিগান একে কেন্দ্র করে অপ্রতিহত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন সাহিত্যে। কিন্তু এ অনুপাতে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বা তাঁর শিক্ষার আদর্শের গ্রহণীয়তা-বিচার ততটা হয় নি। আজ ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই প্রধান স্থান অধিকার করেছে—আমাদের দেশে সত্যিকারের জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য দেশপ্রেমিক নেতাগণ আর সময় নষ্ট করতে প্রস্তুত নন। আজ তাঁরা এ রাষ্ট্রের কর্ণধার। অনতিবিলম্বে তাঁরা নব নব পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হবেন—এ আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। সার্জেণ্ট সাহেবের রচিত শিক্ষাপ্রণালীকে কার্যকরী কতদূর করা যায়—এ নিয়ে তাঁরা ভাবতে শুরু করেছেন। এ সন্ধিক্ষণে উক্ত প্রণালীর ভিত্তি ও পরিপূরক হিসাবে তাঁদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েছে বা হওয়া উচিত আমাদের দেশের তিনজন মহাপুরুষ-প্রণীত শিক্ষাবিধির দিকে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার পরিকল্পনা, গান্ধীজীর ওয়ার্ধা বিধি এবং রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা'—যাতে তাঁর এ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে—এ তিনটি পরিকল্পনার খুঁটিনাটিতে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, মূলতঃ এরা এক; সমগ্র দেশের হিতকল্পে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী দিয়ে এগুলি রচিত—মূল সূত্রগুলি তাই এঁদের অভিন্ন। এ তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে আমাদের সেই শিক্ষা যা জনসাধারণের সত্যিকারের মানুষ হবার পথ খুলে দেবে। এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিদেশীর হাতে থাকা সত্ত্বেও, ওই তিন জন মহামানবের শিক্ষাদানের কল্পনা কার্যকরী হবার সুযোগ পেয়েছিল যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে। এদেরই ব্যাপক করে তুলবার দায়িত্ব আজ আমাদের উপর পড়েছে।

প্রয়োজনের এ পটভূমিকায় আজ তাই শিক্ষা-ব্রতী রবীন্দ্রনাথকে একটু দেখতে চেষ্টা করবো। এ সম্পর্কে আমার ঋণ স্বীকার করে রাখি অধুনা লোকান্তরিত শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর কাছে, যাঁর এ সম্বন্ধে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'জয়ন্তী উৎসর্গে' প্রকাশিত হয়েছে। গোড়াতে আরোও বলে রাখা ভাল, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিধির অথবা আদর্শের পূর্ণাংগ বিবরণ এটি নয়—দুচারটি ইংগিত মাত্র এতে আছে।

রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় শিক্ষার অভাব কি ভাবে বেদনা দিয়েছিল, তা আমরা তাঁর অনেক লেখাতেই দেখতে পাই। আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষার অবিশ্বাস্য সীমাবদ্ধতা ও অসম্ভব কৃত্রিমতা তাঁকে সদাই পীড়িত করেছে। সমগ্র জাতিকে সুশিক্ষিত করে তোলার একটা পরিকল্পনা তাই তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল। এ পরিকল্পনা তাঁর শুধু কথাতেই পর্যবসিত নয়, বিরাট কর্মক্ষেত্রে নেমে এসে তিনি একে রূপদান করতে প্রাণপণ করে গেছেন। বলিষ্ঠ পাদক্ষেপে তিনি আমাদের জাতীয় শিক্ষার পথ সৃষ্টি করে গেছেন। এ পথের সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের নবাগত ভাব-

ধারার সংগে সংঘর্ষে আমাদের দেশে ঘোর সংস্কৃতি-সংকট উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা এ দেশের বর্তমান শাসকদের আমলাতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করে চালু রাখবার সংকল্প সম্যক্ সিদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু এর সংগে সংগে আমরা হারিয়েছিলাম আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছিলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে। এ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য যে সকল শক্তিধর পুরুষ আমাদের মাঝে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন। জাতীয় সংস্কৃতির উপর ভালবাসা তাঁর মজ্জাগত—এ তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে সবাই ছিলেন উচ্চ ইংরাজি শিক্ষিত ও বিলাত-ফেরত। কিন্তু বাড়ীর ভেতরটা তিনি রেখেছিলেন খাঁটি বাংগালী। 'জীবন-স্মৃতিতে' পড়েছি, কোন এক আত্মীয় তাঁকে এলাহাবাদ থেকে ইংরাজিতে চিঠি দিয়েছিলেন। মহর্ষি তাতে এত রেগে গিয়েছিলেন যে চিঠিখানা না পড়েই তিনি তা পত্রলেখককে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বালক মাত্র; তাঁর মনে এ ছোট্ট ঘটনাটি গভীর রেখাপাত করেছিল। ক্ষুদ্র বীজ থেকেই জন্ম হয় মহীরুহের। পিতার শিক্ষার ও আদর্শের বীজ পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। অমন উর্বর-ক্ষেত্রে পড়েই উত্তরকালে তা পরিণত হয়েছিল মহামহীরুহে। জাতীয় সংস্কৃতি ও মাতৃভাষার উপর আন্তরিক অনুরাগ আর তাদের ভিত্তি করে পাশ্চাত্য-শিক্ষার যা কিছু গ্রহণীয়, তার প্রতিষ্ঠা—এই হল তাঁর শিক্ষাবিধির গোড়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ রূপায়িত হয়েছে তাঁরই হাতে গড়া শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে। এ কথা কিন্তু মনে রাখা দরকার, শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে তাঁর শিক্ষার আদর্শ সমগ্র ভাগে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয় নি। তাঁর পরিকল্পনা সমগ্র দেশ জুড়ে। ওদুটি তাঁর আদর্শের ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার মাত্র।

আবার তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে করতে হল। আমাদের দেশের গতানুগতিক স্কুল কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে অসীম ভীতি তাঁর অস্তিত্বের সংগে মেশানো। জেলখানার মত মনে হয়েছ তাঁর স্কুল কলেজকে; ছেলেবেলায় স্কুলে যাওয়াকে তিনি মনে করতেন মানুষের মুক্তজীবনকে কারারুদ্ধ করার মত, যা মানুষকে একেবারে পংগু করে ফেলবে। উত্তরকালে তিনি লিখেছিলেন, "এইরূপ শিক্ষা-প্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।" এ কথা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? যে বিদ্যা আমরা স্কুল কলেজে অর্জন করি, তাতো মুখস্থ বিদ্যা, আমাদের অন্তরের সংগে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সংগে তার কোন সংযোগ নেই। আমাদের বুদ্ধি মোটেই কম নয়; কিন্তু আমাদের মন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিদেশী বিদ্যাশিক্ষার মোটা মোটা বইয়ের চাপে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষার এ গলদকে শুধরে নিয়ে দেশবাসীকে শিক্ষার ভেতর দিয়ে মানুষ করে তুলবার জন্য, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি তাঁর বলিষ্ঠ মন দিয়ে রচনা করলেন লোক-শিক্ষার আদর্শ। সে আদর্শকে আংশিকভাবে রূপ দেবার জন্য তিনি বীরভূমের খোলামাঠের মাঝখানে স্থাপন করলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির কোলে বসে শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি এদেশে প্রাচীনকালে ছিল, তাকেই তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। আবার পৃথিবীর এগিয়ে যাওয়ার সংগে যাতে আমরা পা মিলিয়ে চলতে পারি, বর্তমান যুগের চাহিদা যাতে আমরা সর্বতোভাবে মেটাতে পারি, সেদিকে চোখ রেখে তিনি গড়লেন বিশ্বভারতীর আদর্শ।

আমরা ভারতবাসী, কত বড় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী—এ যেন আমরা না ভুলি। ওদিকে পশ্চিম জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে কত বড় হয়েছে, সে দেশের পণ্ডিতেরা কত সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানভাণ্ডারকে—এও যেন আমরা অস্বীকার না করি। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমের এ মিলন বা সামঞ্জস্যস্থাপন—এই তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শের প্রাণস্বরূপ। নরনারী ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকল দেশবাসী যখন এ শিক্ষা পাবে, তখনই হবে দেশের যথার্থ কল্যাণ। তাঁর সংখ্যাতীত প্রবন্ধে ও অগণিত চিঠিপত্রে তিনি এ কথাটাই নানাভাবে বলে গেছেন। তাঁর গড়া শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীরা শুধু বই পড়ে শেখে না, বিশ্বপ্রকৃতির খোলা-পাতায়ও তারা পাঠ নেয়। প্রকৃতির খেয়ালের খুশীতে শক্তির বিচিত্র প্রকাশ তারা দেখবে, নিজেদের জীবনে তারা করবে শক্তির আহ্বান, বলিষ্ঠ মন ও বলিষ্ঠ দেহ গড়ে উঠবে তাদের। সংস্কৃতির আশীর্বাদে পুষ্ট হবে তাদের জীবন; পড়বে তারা বেদ উপনিষদ পুরাণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান; নাচবে তারা প্রকৃতির ছন্দে, গাইবে তারা বিশ্বপ্রকৃতির ঐক্যতানে গলা মিলিয়ে। এ স্বাভাবিক পরিবেশের মাঝে যখন তাদের চেনা হবে নিজের দেশকে, জানা হবে দেশের ঐতিহ্য আর শেখা হবে পশ্চিমের বিজ্ঞান, তখনই তারা চলবে এগিয়ে, আরো এগিয়ে তাদের ব্যবহারিক জীবনে, তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে। এইতো প্রকৃত শিক্ষা—এইতো সুস্থ মানুষ হবার পথ। শুধু মুখ গুঁজে বসে বসে ইংরাজি বইগুলি কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে আসা আর চাকুরি-জীবনে ওই বিদ্যার সাহায্যে ও আনুসংগীক কতগুলি ক্রিয়া-কলাপের দৌলতে পদোন্নতি করা—এতো দেশবাসীর সুস্থ মনোভাবের ইংগিত করে না, সমগ্রভাবে দেশও তাতে এগোয় না। ইংরাজি-শিক্ষিত সাহেবী-ভাবাপন্ন লোকেরা দেশের প্রাণস্বরূপ অগণিত জনসাধারণের কাছ থেকে কোথায় সরে গেছে, এতো আর চোখে আংগুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই।

আমাদের দেশে প্রচলিত বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর গলদের আর অন্ত নেই। সরসতার অভাব তার মধ্যে একটি। ছেলেবেলা থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি শাসনের ভয়ে, বাড়ীতে অভিভাবকদের শাসন, স্কুলে শিক্ষকদের। ভালবেসে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে আমাদের শিক্ষালাভ করার সুযোগ নেই। তা নেই বলেই আমরা না বুঝে বা অর্ধেক বুঝে মুখস্থের পথ ধরে যা শিখি, তাতে আমাদের আর যাই বাড়ুক, হৃদয়ের সৌন্দর্য্যবোধ ও অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিগুলি একেবারে চাপা পড়ে যায়। ললিতকলা, যন্ত্রসংগীত, গান, অভিনয়, নৃত্য—এ যদি আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অংগীভূত করা হয়, তবে একদিকে হবে আমাদের শিক্ষা সরস ও প্রাণবন্ত, আর একদিকে হবে আমাদের সর্ব্বাংগীন বিকাশ ও উন্নতি। শিক্ষাকে এপথে চালিত করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে এত কিছু আয়োজন করেছেন। শুধু শিক্ষাজীবনে নয়, সমগ্র মানব-জীবনে ললিতকলার প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি "রাশিয়ার চিঠিতে" লিখেছেন—"আমাদের দেশে যখন দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে, তখনই আমরা বলতে শুরু করি এই একটিমাত্র লাল মশাল জ্বালিয়ে তুলে দেশের অন্যসকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। বিশেষতঃ ললিতকলা সকল প্রকার কঠোর সংকল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি করবার জন্য কেবলই তালঠুকে পাঁয়তারা করাতে হবে, সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে লাঠি বানানো সম্ভব হয়, তবেই সেটা চলবে, নতুবা নৈব চ নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতখানি মেকি পৌরুষের কথা, তা এখানে

(রাশিয়ায়) এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশজুড়ে কারখানা চালাতে যেসব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায়, তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্য এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয়, তারা বর্বর; যারা বর্বর তারা অন্তরে রুক্ষ, বাইরে দুর্বল!...এদের ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সংগে সংগেই ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের সংগে তার কোন বিরোধ ঘটে নি।

"মরুভূমিতে শক্তি নেই! শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপ-হিল্লোলে হিমাচলের গাম্ভীর্য্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদূত লিখতে!......যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্‌খট্‌ আওয়াজে অহংকার করে বল্‌তে থাকে আমার রসের দরকার নেই, সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি—সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিস্ফল। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদের সাবধান করে দিচ্ছি যে দেশে যখন ফিরে যাবো, পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণ-বর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।"

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন মানুষকে মানুষরূপে শিক্ষিত করে তোলবার সংগে সত্যিকারের কোন বিরোধই নেই নাচগানের। একমাত্র ললিতকলাই শিক্ষার শুষ্কতাকে দূর করে দিতে পারে। পাঠ্যপুস্তক পড়া, কারিগরী শিক্ষালাভ, কুস্তির আখড়ায় পালোয়ানির কসরৎ,—এ গুলির সঙ্গে তাই তিনি জুড়ে দিয়েছেন সংগীত, অভিনয়, ললিতকলা। মহাভারতে পড়েছি বিরাট রাজার দুহিতা উত্তরার নৃত্যশিক্ষক ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশে, ক্লীব শিখণ্ডী নয়। গত মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে রাশিয়া আজ পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে বিরাজমান, সে রাশিয়াই আবার অভিনয়, শিল্প-কলাতেও সমগ্র জাতিপুঞ্জের মাঝে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। প্রাণধর্মী মানুষকে রসই পরিপূর্ণতা দান করতে পারে। আমাদের উপনিষদ্‌ও বল্‌ছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, কো হ্যন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ।"

আমাদের শিক্ষাদানের আর একটি মারাত্মক গলদ, ইংরাজি আমাদের শিক্ষার বাহন। এ শিক্ষা কুশিক্ষা হয়ে আমাদের জীবনে অনেক দুর্গতি বয়ে এনেছে। আমাদের শিক্ষার সংগে জীবনধারার কোন সামঞ্জস্য নেই। ছেলেবেলা আমাদের বিএলএ—ব্লে, সিএলএ—ক্লে মুখস্থ করতে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা ভাষা শিখতে আমাদের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেল। অথচ পরিণত বয়সে দেখি না শেখা হয়েছে ওই ভাষাটা ভাল করে, না শিখেছি আর কিছু। জমার ঘরে পড়ে গেল শূন্য। কেরাণীগিরির যোগ্যতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা তক্‌মা এঁটে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি গড্ডলিকার প্রবাহে, পড়ি কর্ম্মক্ষেত্রে। আর গোটা দেশটা পড়ে থাকে ঘোর অশিক্ষার তিমিরে। এ কুশিক্ষা ও অশিক্ষা সমানভাবে ভাবিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। তাই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার জন্য তাঁর কী অক্লান্ত প্রয়াস! বংগীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ পত্রিকার পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি উল্টালে (সম্ভবত ১৩০০ সালের) আমরা দেখতে পাবো কি ভাবে তিনি এ কাজ শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সংগে পত্রালাপ করে তিনি

তাঁদের এ সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করেছেন, প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে এর নানাদিক আলোচনা করেছেন, কত আন্দোলন করেছেন এ নিয়ে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর সকল প্রবন্ধেই তিনি এই কথাটিরই পুনরুক্তি করেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় আজ আংশিকভাবে বাংলা ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হয়েচে—প্রবেশিকা পরীক্ষা এখন বাংলাতেই হয়। কিন্তু আমরা বোধ হয় অনেকেই জানি না এর পেছনে সবচাইতে বড় কর্ম্মপ্রচেষ্টা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের। বাংলা ভাষাকে তাঁর লেখার ঐশ্বর্যে বিভূষিত করে সারা বিশ্বের দরবারে তিনি একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এ আমরা জানি। কিন্তু তিনি কি লিখতেন শুধু তাঁর এ সামান্ত কবি-প্রতিভাকে ও অনন্ত-সাধারণ দার্শনিক মনকে অপূর্ব ভংগীতে প্রকাশ করবার জন্য? আমাদের ভাষাকে সর্বতোভাবে শিক্ষার যোগ্য বাহন করবার জন্যও তিনি একে এত ফলে ফুলে সাজিয়েছেন। তিনি কবি, তিনি শিক্ষক—এ দুটো কথাই তিনি মনে রেখেছিলেন সাহিত্য-সেবা করতে গিয়ে। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার যোগ্য বাহন করবার চেষ্টা তাঁর পরোক্ষ কাজ নয়, প্রত্যক্ষ কাজ।

কিন্তু তবু আমাদের দিক দিয়ে আজও বলতে হবে আমরা এ পথে এগোই নি মোটেই। ইংরাজি এখনও আমাদের শিক্ষার বাহন—তাই আমাদের মনোজগতে পূর্ব-পশ্চিমের যে মিলন রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তা হয় নি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ বরং দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে মাতৃভাষাকে সমগ্রভাবে শিক্ষার বাহন করবার কাজে। বাংলার দুর্ভাগ্য সে আজিও পেছনে পড়ে, যদিও ওদের তুলনায় বাংলার সুবিধা অনেক বেশী, কারণ এখানে রবীন্দ্রনাথ আছেন। কৃত্রিম জীবনের মোহ আমাদের ছেড়েও ছাড়ছে না। ইংরাজিকে মাতৃভাষার উপরে স্থাপন করাটা আজিও আমাদের শিক্ষার মিলনের পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে আছে।

মিলন হয় সমানে সমানে। নিজেদের ঐতিহ্যকে ছোট ভেবে অবহেলা করে আমরা শিক্ষা লাভ করি তাই পশ্চিম আমাদের গ্রাস করেছে। বাংলাকে অগ্রাহ্য করে ভাল করে ইংরাজি শিখতে গিয়ে আমাদের অবস্থা হয়েছে ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ। হালে অবশ্য বাংলাভাষা ধুতি চাদরের সংগে সংগে অভিজাত-মহলেও একটু স্থান করে নিয়েছে. কিন্তু সেটা স্বাভাবিক ভাবে হয় নি। একঘেয়ে সাহেবিয়ানার মাঝে একটু বৈচিত্র্যের মোহ, তদুপরি জনসাধারণের কাছে সহজে একটু প্রিয় হবার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে তথাকথিত বাংগালীত্ব আমদানী করেছে। সাধারণ শিক্ষিত আমরাও মনের ভাব প্রকাশ করি বাংলার সংগে ইংরাজি বুলি মিশিয়ে, কারণ কোনটাতেই আমাদের সম্যক্ অধিকার নেই। এ আমাদের এক অভিনব কৃত্রিমতা যার আজন্মবিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তা বলে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মোটেই অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি মনে করতেন মাতৃভাষার উপর সম্যক অধিকার না জন্মালে মানুষ একটি বিদেশী ভাষাকে সম্যক্ আয়ত্ত করতে পারে না। এখানেই আমাদের দুর্গতির মূল। অথচ আমরা তো জানি মাতৃভাষা-মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষাতেও যা লিখে গেছেন, তা ইংলণ্ডে সাহিত্য বলে গ্রাহ্য হয়েছে, কত আদর পেয়েছে!

শিক্ষার মিলনের সেতু বাঁধবার জন্যই যেন রবীন্দ্র-প্রতিভার জন্ম। আমাদের সংস্কৃতির সংকট দূর করবার জন্যই বুঝি এই মহাকবির আবির্ভাব। সুদীর্ঘ জীবন ভরে বাংলাভাষা ও

সাহিত্যের অনলস সেবা দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন কত বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এ ভাষার গর্ভে; দেখালেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা যায় এ ভাষায়। আজ, বাংগালী শত বিপত্তি সত্ত্বেও বিশ্বের সংস্কৃতির দরবারে উচ্চাসনে বসে আছে—কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের পুরোভাগে। বাংলাকে তার যোগ্য আসনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, কবি লিখলেন সংখ্যাতীত প্রবন্ধ ও চিঠি—যাদের মাঝে ছড়িয়ে আছে তাঁর শিক্ষাদানের ব্যাপক পরিকল্পনা। এগুলো উল্লেখ করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আজ আমরা এ সত্যটি জেনেছি যে পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস আমরা গ্রহণ করবো মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে। তবেই হবে আমাদের সুশিক্ষা; তবেই আসবে পশ্চিমের বিজ্ঞান আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, আর ব্যবহারিক মূল্যও তার অনেক বেড়ে যাবে আমাদের কাছে। জাপান এমনি করেই শিখেছে আর পশ্চিমের সংগে সর্বক্ষেত্রে পাল্লা দিতে পেরেছে, আজ তার সাময়িক ভাবে যত দুর্গতিই হোক না কেন। নিজেদের জীবন-ধারার সংগে সংগতি রেখে শিক্ষার পথ বেয়ে এভাবেই শুধু আমরা এগিয়ে যেতে পারি। যখন শিক্ষিত দরদী মন নিয়ে ভাবতে পারব গোটা দেশটার কথা, দেশের সেবা করা আমাদের তখনই সার্থক হবে। শিক্ষাকে করতে হবে নিজস্ব, করতে হবে ব্যাপক, দোরে দোরে পৌঁছে দিতে হবে এ শিক্ষাকে। এ জাতিকে জাগাতে উচ্চ রাজনীতির প্রয়োজন আছে স্বীকার করি; কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন কুশিক্ষা ও অশিক্ষাকে বনবাসে পাঠানো। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এ নিয়ে ভেবেছেন, এ পথে কাজ করেছেন। শিক্ষায় সামঞ্জস্য স্থাপনের মন্ত্রটি, এ সহজ সত্যটি তিনি আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে পৌঁছে দিয়েছেন। আবার আমাদের ভাষাকে সব কিছু গ্রহণ করে নেবার ক্ষমতাও দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাইতো তিনি আমাদের সবচাইতে বড় শিক্ষা-গুরু। শান্তিনিকেতনের 'গুরুদেব' সত্যসত্যই সমগ্র জাতির গুরুদেব।

পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিধি ব্যাপক, নর নারী ধনী নির্ধন নির্বিশেষে তা প্রযোজ্য। আমরা জানি বর্ত্তমানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাও অতি অল্প লোকেই পেতে পারে—প্রায় দুশ বৎসর ধরে সুসভ্য ইংরেজ জাতি আমাদের শাসন করেছে, আর এদেশে শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষার অভিশাপ শিরে বহন কচ্ছে! তাই সমগ্র ভারতের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তিনি লোকশিক্ষার নব ভাবধারা ভগীরথের গংগার ধারার মত বয়ে এনেছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী ঘুরেছেন, সমগ্র বিশ্ব তাঁকে বিশ্বকবি বলে বরণ করেছে, এযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মান পাবার জন্য তিনি ভূ-পর্যটককের বেশ ধারণ করেন নি। তিনি ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার নানা দেশে গিয়েছেন সে সব দেশ কি করে বড় হয়েছে তা দেখবার জন্য। বিশেষ করে নবজাগ্রত দেশসমূহের বড় হবার মূলমন্ত্রটি তিনি হৃদয় দিয়ে জেনেছেন—সেটি সে সব দেশের শিক্ষাবিধি। ওসব দেশের শাসনকর্তারা সবচাইতে বেশী লক্ষ্য রেখেছেন সমগ্র বালক বালিকা তরুণ তরুণীর শিক্ষার দিকে। ও সম্বন্ধে তাঁদের কত পরিকল্পনা, কত অর্থব্যয়! সংগে সংগে তাঁর মনে পড়েছে স্বদেশের কথা —তুলনায় যার দৈন্য তাঁর চোখে আরোও বেশী করে ধরা পড়েছে আর ব্যথিত করেছে তাঁর হৃদয়। তাই বিদেশ থেকে লেখা তাঁর সকল চিঠিতে এ কথাটাই তিনি আলোচনা করেছেন। ওসব দেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, অভিনবত্ব আর ঐতিহ্য

যেমন জুটিয়েছে তাঁর ভাবুক মনের খোরাক তেমনই তাঁকে মুগ্ধ করেছে তাদের শিক্ষাদান-প্রণালী। এবিষয়ে সব চাইতে বেশী উল্লেখযোগ্য তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"। এ বই খানার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "রাশিয়া গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষা-বিধি দেখবার জন্য।" তাই তিনি দেখেছেন আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। তিনি লিখছেন, "আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গিয়েছে। যারা মূক ছিল, তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সংগে সমান আসন পাবার অধিকারী।—এদের এককালের মরাগাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। —এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত; সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণ মাত্রায়।"

আর ভারতবর্ষের লোকেরা মূঢ়ম্লান ভগ্নোত্তম ও আশাহীন। তাই তিনি তীব্র আক্ষেপ করেছেন স্বদেশের জন্য। তিনি লিখছেন আর এক জায়গায় "আমার মত এই যে ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য —সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।" রাশিয়ার অন্ধতা, মূঢ়তা, কদাচার, নিষ্ঠুর বর্বরতা সবই আজ দূর হয়েছে ব্যাপক লোকশিক্ষার যাদুমন্ত্রে; তাই তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে রাশিয়ার বর্তমান শাসনতন্ত্রকে প্রশংসা করেছেন।

তা ব'লে আমরা যেন একথা মনে না করি যে আমাদের দেশকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলবার জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি রাশিয়ায় গিয়ে। আমরা জানি, রাশিয়াতে গিয়ে কিম্বা রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ পুস্তক-পাঠে জেনে, এমন কি অনেক সময়ে সে বিষয়ে অর্ধেক জেনেই কেউ কেউ আমাদের দেশে তথাকথিত সাম্যবাদী হয়ে পড়েছেন। এঁদের কাছে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অকেজো ও অন্তঃসার-শূন্য, রাশিয়ার যা কিছু সব অবিমিশ্র ভাল। আমাদের দেশটাকে তাই তারা রাশিয়া করে তুলতে চান, এদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমস্যার বিশেষত্বকে অগ্রাহ্য করে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এঁদের মত রাশিয়ার অন্ধ স্তাবক নন। তাঁর শিক্ষার আদর্শের জন্ম ও পুষ্টি এদেশেরই মাটিতে। এদেশের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর কর্মসূচী রচিত হয়েছে। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের দেশের লোকের অজ্ঞতা দূর করা, তার প্রাণের সাথে ভাবের মিলন সাধন করা। রাশিয়া তাই করেছে, তাই তাঁর ভাল লেগেছে রাশিয়াকে! তিনি লিখেছেন, "গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি এতকাল যা ভেবেছি এখানে তার বেশী কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উত্তম, আছে কর্মকর্তাদের ব্যবস্থা-বুদ্ধি।"

সংগে সংগে আমাদের দেশের কর্মকর্তাদের ঔদাসীন্য ও গলদগুলিকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে তিনি তীব্র আঘাত হেনেছেন। এদেশের টাকা আমাদের শাসকসম্প্রদায় অকাতরে ব্যয় কচ্ছেন "ল এ্যাণ্ড অর্ডারের" জন্য আর শিক্ষার কথা উঠলেই তারা দোহাই দেন টমসন সাহেবের ভাষায় 'এনোরমাস্ ডিফিকাল্টিজের'। সুতরাং থাক্ পড়ে ভারতবর্ষ অশিক্ষার অন্ধকারে, থাক্ তার অবনতি জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে, আমাদের হয়ে সব কাজ তারাই তো করে দেবেন; মন্বন্তর মহামারী অশিক্ষা কুশিক্ষা ও

চরম দারিদ্র্য নিয়ে আমরা 'প্যাক্স বৃটেনিকার' স্বর্গরাজ্যে যেমন সুখে বাস কচ্ছি তেমনই করতে থাকি। শাসকসম্প্রদায়ের এ মারাত্মক মনোভাব রবীন্দ্রনাথ কখনও ক্ষমা করেন নি। জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে তিনি তাই বড় দুঃখে বলেছিলেন, "আফগানিস্তানের ভাগ্য ভাল। সেখানে ইংরেজ যায়নি।"

আমাদের দেশ দরিদ্রতম—এর কারণও কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়? প্রাক্‌বৃটিশ যুগে এদেশের অর্থ ও সম্পদ তো কিংবদন্তীর মত সারা পৃথিবীতে প্রচারিত ছিল। অথচ এ দারিদ্র্যই আমাদের ব্যাপক শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়। দরিদ্র বলে কি আমরা আজ মানুষের সব অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবো? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া জন্মায় না। ধনীর ছেলে ও দরিদ্রের ছেলে কোন প্রভেদ লইয়া আসে না। রাশিয়ায় আজ এই দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরাই দেশের হর্তা কর্তা হয়ে বসেছে; একটা বড় আদর্শকে তারাই রূপ দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসারে এ দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি কবে গড়ে উঠবে জানি না। এই লোক-শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার অনুকূল আবহাওয়া আমাদের দেশে সবেমাত্র সৃষ্টি হয়েছে; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আজ এ দেশবাসীর হাতে এসেছে। আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের দায়িত্ব এখন খুব বেড়ে গেছে। আমাদের ত্রুটি ও দৈন্যের জন্য ভবিষ্যতে আর ইংরেজকে দায়ী করা যাবে না। আজ তাই খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। বাধাবিপত্তি আজও অনেক; কিন্তু আমাদের আদর্শের তো অভাব নেই। এগিয়ে যেতে হবে আমাদের দৃঢ় পাদক্ষেপে। আমাদের মন্ত্র যেন হয়—

এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

একদা এক শুভলগ্নে কবির হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এ বাণী উৎসারিত হয়েছিল। রংগময়ী কল্পনার সাহায্যে লীলাময়ী প্রকৃতির কোলে বসে তাঁর অপূর্ব কাব্য রচনার সংগে সংগে তিনি তাই এ আদর্শকে কাজে ফুটিয়ে তুলতেও প্রাণপণ করেছেন। উত্তরকালের আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে শুধু নয়, শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিধিকেও যেন ভালবেসে গ্রহণ করতে পারি। তবেই তাঁর স্মৃতি-পূজা সার্থক হবে।

বিবেকানন্দ-স্তুতি

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, বেদান্তশাস্ত্রী, জ্যোতিবিনোদ

চির-বরেণ্য সুন্দর তুমি
নমি তোমা বারে বার,
ত্যাগের প্রতীক হে মহাপুরুষ!
করুণার পারাবার।

জীবে প্রেম তব জীবনের ব্রত,
সেবাতে জিনিলে বিশ্বপ্রাণ যত,
মরণ নাশিয়া অমৃত-উৎস,
বহাইলে সবাকার;
নমি তোমা বারে বার।

সমাধি-সিদ্ধি

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সপ্ততীর্থ, তর্কাচার্য্য

জীবমাত্রের চরম ও পরম কাম্য ফল-সিদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সুখ ও দুঃখাভাব সাধারণ ফল, উহা জানিলেই এই সিদ্ধি আমার হউক এইরূপ ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখাভাবের উপায় গৌণ ফল যে শতভাগে বিভক্ত তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইলেও প্রধানতঃ জন্ম, আয়ু ও ভোগ এই তিনটী নামে ত্রিধা বিভক্ত। অবান্তর অগণিতভাগ উক্ত ভাগত্রয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট। কোনও প্রাণীর কোনও চেষ্টাই উক্ত কারণসমূহ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। পরন্তু অনির্ব্বাচ্য অনাদি অজ্ঞান দোষে দুঃখের উপায়কে সুখের উপায় ভাবিয়া সুখভ্রমে দুঃখকেই আহরণ করিতে প্রবৃত্ত অগণিত জীব দেহেন্দ্রিয়াদি অনিত্য বস্তুতে আমি ও আমার এই মিথ্যা অভিমান বশতঃ কেবল দুঃখ ও দুঃখের উপায়কেই আয়ুর্ভোগাদি ফলাকারে প্রাপ্ত হইতেছে। যতকাল অজ্ঞানদোষ থাকিবে তাবৎকাল তাহাই প্রাপ্ত হইবে।

অজ্ঞানতিমিরাবৃত সংসার ও সাংসারিক বস্তুসমূহ শারদ জলদের মত অত্যন্ত অস্থির, অত্যল্পকাল স্থায়ী এবং আপাতরম্য ক্ষণমাত্র প্রীতি রচনা করিয়া পরিণামে অতি নিদারুণ সন্তাপ প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ বিশুদ্ধ বিচার লাভের জন্য যে পুণ্য আবশ্যক, তাহা যিনি সংগ্রহ করিয়াছেন তিনি সমস্ত জড় ভাগকে দুঃখমাত্র ভাবিয়া দুঃখলেশশূন্য মোক্ষ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। দুঃখাভিজ্ঞ পুণ্যবান পুরুষ জন্ম মরণাদি দুঃখ ও স্বর্গান্ত বিষয়সমূহকে বিচার দ্বারা দুঃখমাত্র ভাবিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি স্বর্গান্ত বিষয় মাত্রে যে সহজ প্রবল তৃষ্ণা তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতঃ বিষয়াপেক্ষা মুক্ত বিরক্ত হইয়া থাকেন। বৈরাগ্যবান্ পুরুষ এই সংসারে দুঃখমাত্রের অত্যন্ত নিবৃত্তির নিশ্চিত উপায় না পাইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকে অনুসরণ করিয়া থাকেন। সেই গুরু পরম করুণা বশতঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের অনন্তর উপলভ্য যে আত্মজ্ঞান তাহা উক্ত শিষ্যকে উপদেশ দান করেন, নিত্য আনন্দাত্মক প্রত্যক্‌জ্ঞান ব্রহ্মাখ্যতত্ত্ব। এই তত্ত্ব প্রাপ্তির উপায়—শ্রৌত মহাবাক্যপরিশীলনজন্য ব্রহ্মবিষয়িণী অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান নামে অভিহিত। মোক্ষদশায় এই চিত্তবৃত্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইলে ব্রহ্মমাত্রাবসানে ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যা ব্রহ্মই বিদ্যা এইরূপ অভেদার্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ উপায় ব্রহ্মবিদ্যা উপেয়মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জ্ঞানবহ্নি দ্বারা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নাশোত্তর চিত্তবৃত্তির সহিত তদাশ্রয় চিত্ত পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই মোক্ষার্থী স্বরূপ তাহাই আত্মাখ্য ব্রহ্ম।

বস্ত্রের কারণীভূত তন্তুসমূহ ভস্ম হইলে বস্ত্রের দাহ যেমন নিশ্চিত, সেইরূপ সংসারকারণ অজ্ঞান জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে অজ্ঞানকার্য্য সংসারের উচ্ছেদ সুনিশ্চিত। যে পাপপুণ্য হইতে এই শরীরের আরম্ভ সেই পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম প্রারব্ধ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কেবল ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয়। এই জন্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর জীবন্মুক্ত আত্মা প্রারব্ধ স্থিতিদশায় দেহবান বলিয়াই যেন প্রতীত হন। ফলতঃ অবশিষ্ট প্রারব্ধ তদুচিত সুখদুঃখাদি রচনা করিয়া বিনষ্ট হইতেছে। পরন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার

হইতে পূর্ব্ববৎ পাপপুণ্যাদি উৎপন্ন হইতেছে না এবং অনাদিকাল প্রচলিত যে 'আমি ও আমার' এই মিথ্যাভিমান বিলুপ্ত হওয়ায় প্রারব্ধকার্য্য সুখাদির সহিত অনুমাত্র সম্বন্ধও ঘটিতেছে না। মিথ্যাজ্ঞান ও তৎকার্য্য সংসার থাকিয়াও নাই —ইহাই জীবন্মুক্ত-লক্ষণ। মরুমরীচিকায় জলভ্রমে প্রধাবিত তৃষ্ণাতুর মরুভূমি প্রাপ্ত হইয়াও নেত্রদ্বয়দ্বারা যেমন জল দেখিতে পায়, কিন্তু ঐ জলে দেহাদির সহিত সম্বন্ধ না হওয়ায় মিথ্যাত্ববোধ যেমন সুস্থির হয়, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ এই সংসার প্রত্যক্ষ করিলেও তাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হওয়ায় ইহাতে মিথ্যাত্ববোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তৎফলে এই সংসার থাকিলেও সেই মুক্ত আত্মার পক্ষে নাই।

জীবন্মুক্তির অসাধারণ উপায় নিদিধ্যাসননামা সমাধি। শ্রবণের পরে মনন এবং তদুত্তরভাবী সমাধি আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু। কেহ ঐ তিনটীকে যুগপৎ কেহ বা মনন সমাধি সহিত শ্রবণ অপর কেহ ঐ তিনটী দ্বারা সংস্কৃত চিত্তকে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সকল বিরুদ্ধ নহে, কেননা শ্রবণাদি যে মুক্তিরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু, এই বিষয়ে সকল আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ নাই। সমাধিলাভের জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগসূত্রে চিত্তবৃত্তিনিরোধের অষ্টবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা মোক্ষার্থীর প্রধান সম্বল। মুক্তিপথে যাত্রা করিয়া যে সকল বিরক্ত বিদ্বান্ সমাধিলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের পরিচয় সাধারণ সংসারী জানিতে পারে না—কথঞ্চিৎ জানিলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

বঙ্গের তথা বিশ্বের মহাসৌভাগ্য শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে—ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বারংবার সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থির ঘটগত জলের মত মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াশূন্য পরমাত্মাপন্ন হইয়া পুনরায় লোকবৃত্তি স্বীকার করতঃ সমাগত দর্শক ভক্তবৃন্দকে উপদেশ দান করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ নিজ জীবনে সমাধি-সিদ্ধির উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিকাশ

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

মানুষে মানুষে যেথা রেষারেষি
সেইখানে তুমি নাই,
সকল জাতির মিলন-ভূমিতে
তোমারে দেখিতে পাই।
অহঙ্কার যেথা ওঠে তুঙ্গ হ'য়ে
তুমি তায় পড় ঢাকা.

সকল ছাড়িয়া ভক্তের দুয়ারে
পাই যে তোমার দেখা
বিশ্বাস যেথা নিঃসার হয়েছে
সেথা তব নাহি স্থান,
বিশ্বাসীর চোখে, সর্ব্বভূত মাঝে
কর তুমি দেখা দান।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস

শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

সুঙ্গশিল্প

ইতিহাস (২০০ খৃঃ পূঃ—২০ খৃষ্টাব্দ)

১৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর পুষ্যমিত্র সুঙ্গ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বৌদ্ধদের উপর তিনি অত্যাচার করিয়াছেন ও বিহার ধ্বংস করিয়াছেন। ১৭৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে গ্রীক্ আক্রমণকারী মেনানডারকে (মিলিন্দ, পালি ভাষায়) তিনি তাড়াইয়া দেন। গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন; বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও মহাভাষ্যরচয়িতা পতঞ্জলি যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র কালিদাসের একখানি নাটকের নায়ক।

মেনানডার বা মিলিন্দ বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

সুঙ্গদের পরে কাণ্ববংশ রাজত্ব করেন ৪৫ বৎসর (৭৫—২৮ খৃঃ পূঃ)। মথুরা এবং পাঞ্জাবে এ সময়ে শকেরা পরাক্রমশালী; ইহাদের উপাধি ছিল ক্ষত্রপ এবং মহাক্ষত্রপ।

দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্ররা (সাতবাহন সাম্রাজ্য) পরাক্রমশালী ছিলেন, কৃষ্ণাগোদাবরী প্রদেশে ৩০টি দেয়ালঘেরা নগর তাঁহাদের ছিল। নাসিক এবং উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত তাহাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। ৪½ শতাব্দী তাহাদের রাজত্ব; ৩য় খৃষ্টাব্দে ইহাদের রাজত্বের অবসান হয়, এবং পল্লব রাজত্ব সুরু হয়।

অন্ধ্ররাজাদের উপাধি হইতে মনে হয়, তাঁহারা হিন্দুব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা। বহু বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার তাঁহারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পশ্চিমঘাটের অধিকাংশ গুহা মন্দির ও বিহার তাঁহারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বিখ্যাত অমরাবতীর স্তূপ ও সাঞ্চির তোরণ অন্ধ্ররা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতের কলিঙ্গরা স্বাধীন ছিল, অশোকের সময় তাহারা পরাধীন হয়। জৈনধর্ম্মাবলম্বী খারবেল ১৬১ খৃঃ পূঃ সুঙ্গ রাজধানী পাটলীপুত্র জয় করেন। ২৫৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ব্যাক্‌ট্রিয়া, ও পার্থিয়া সেলিউকসের রাজত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। যবনরাজারা ব্যাক্‌ট্রিয়া, কাবুল ও পাঞ্জাবে রাজত্ব করিত। বাহ্লিকের (ব্যাক্‌ট্রিয়া) রাজা ডেমেট্রিয়াস পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমের বহু নগর জয় করিয়া ছিলেন। কাবুলের নৃপতি মেনাণ্ডার অযোধ্যা অধিকার করিয়া পাটলীপুত্রের দিকে আসিয়াছিলেন। তক্ষশীলার রাজা ছিলেন এন্টিয়ালকাস (১৪০—১৩০ খৃঃ পূঃ) বিদিশার রাজসভায় তাঁর দূত হেলিওদোর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বেসনগরে হেলিওদোরের বাসুদেবের নামে উৎসর্গীকৃত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে—

ত্রীনি অমুতপদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগং দম চাগ অপ্রমাদ।

তিনটি অমৃতপদ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গে লইয়া যায়—দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ।

শকেরা ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়ার গ্রীক রাজত্ব আক্রমণ করে ১৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে। তক্ষশীলা, মথুরা, উজ্জয়িনী এবং পশ্চিম ভারতে তাহারা রাজত্ব করিয়াছে চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত (৩৯০ খৃঃ পূঃ), ইহারা ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী ছিল।

প্রাচীন সুঙ্গ গুহামন্দির

ভাজা বিহার (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী)—পুণার নিকটে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের গুহা। ভাজার গুহাগাত্রের ভাস্কর্য্য প্রাচীনতম। রাজা চারি-অশ্বযুক্ত রথে চড়িয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে দুটি রমণী আছে; একজনের হাতে ছত্র, অপরের হাতে চামর। অশ্বারোহীর মূর্ত্তি আছে, পায়ে পা-দান আছে, ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম পা-দানের নমুনা। বিরাট আকার কুৎসিত নগ্ন রমণীমূর্ত্তি এই রথকে পিঠে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। অনুমান করা হয়, সূর্য্য দুই স্ত্রী সঙ্গে লইয়া অন্ধকার দূর করিয়া চলিয়াছেন।

আর একটি বৃহৎ মূর্ত্তি আছে ভাজা গুহায়,—রাজা পতাকাবাহী এক সঙ্গীর সহিত হাতীতে চড়িয়া চলিয়াছেন। হাতীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। সম্ভবতঃ ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া চলিয়াছেন। পশ্চাৎভাগে দৃশ্যচিত্র আছে; হাতী শুঁড়ে এক ওপড়ানো গাছ ধরিয়া আছে। পশ্চাৎভাগের তুলনায় হাতী ও তাহার চালককে খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা, হাতে বজ্র রহিয়াছে। বেদের বর্ণনা অনুসারে এ মূর্ত্তি গড়া হইয়াছে। একালে এসকল বৈদিক বর্ণনা লোকদের নিশ্চয়ই জানা ছিল—"তিনি স্বর্গ, পৃথিবী এবং বায়ুকে বিরাটত্বে অতিক্রম করেন, পৃথিবী যদি দশগুণ বড় হয়, তবুও তিনি তার সমকক্ষ হইবেন।" তিনি পরাক্রমশালী যোদ্ধা। ইন্দ্রের বাহন মেঘ, অনেক সময় প্রাচীনকালে মেঘ ও হাতী একই অর্থে ব্যবহার করা হইত।

নীচে ও পিছনে চৈত্যবৃক্ষ ও অনেক মানুষ আছে। ইহা ভারতের প্রাচীনতম দৃশ্যচিত্রের নমুনা। ইহা কোনো আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের নিদর্শন নহে; চাক্ষুস পার্সপেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষণ ইহাতে নাই। হোরাইজন বা দিগ্বলয় ইহাতে নাই।

এই চিত্র পরবর্ত্তী কালের হিন্দুদেবতার চিত্র নহে; ইহা বৈদিক দেবতা, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা,—যিনি প্রাচুর্য্য দান করেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৌদ্ধ বিহারে অবৌদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

ভাজার ভাস্কর্য্য হইতে সাঞ্চির ভাস্কর্য্যের পরিণতি হইয়াছে। সাঞ্চির রিয়ালিজম্‌ও মডেলিংএর দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং নরনারীর গঠন-পারিপাট্যের দিকে নজর দেখা যায়।

বিহারের নিকট ভাজার চৈত্য খোদিত আছে।

প্রাচীন স্তূপ (সুঙ্গ, আদি অন্ধ্র)
বারহুত ও সাঞ্চি

স্তূপ বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ। স্তূপকে টোপ, দাগোবা (সিংহল) ও প্যাগোডা (ব্রহ্মদেশ) নামে অভিহিত করা হয়। প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে স্তূপের উৎপত্তি; বৈদিক যুগে স্তূপ ছিল সমাধিস্থান এবং মাটীর তৈরী। বৌদ্ধরা বুদ্ধের কোন চিহ্নকে (যেমন দন্ত, অস্থি, কেশ, নখ) রক্ষা করার জন্য স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সোনা অথবা স্ফটিকপেটিকায় চিহ্ন রক্ষা করিয়া স্তূপের ভিতরে রাখা হইত। ভারতে ও এশিয়ার নানাস্থানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম গমন করিয়াছে, সেখানে স্তূপের নিদর্শন আছে। সাধারণতঃ বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে স্তূপ দেখা যায়। প্রথম হইতে ইটের, পরে পাথরের এবং মনোলিথিক। গুহাচৈত্যের ভিতর মনোলিথিক স্তূপ দেখা যায়।

সাধারণতঃ চতুষ্কোণ বেদিকার উপর স্তূপ স্থাপিত হয়। স্তূপের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার

জন্ম স্থান। স্তূপের প্রধান অংশকে বলে অন্ত বা গর্ভ (dome); অণ্ডের উপরে চতুষ্কোণ কুঠরী থাকে, নাম "হর্ম্মিকা", সিংহলীদের দেব কোটুওয়া (দেবতা কুঠরী)। ইহা হইতে একটি ধাতুর দণ্ড (যষ্টি) উঠিয়াছে। দণ্ডে থাকে কতকগুলি ছত্র, সকলের উপরে বৃষ্টির পাত্র (বর্ষ-স্থল)। হিন্দু মন্দিরে ইহা হইল কলস।

স্তূপের চারদিক ঘেরা থাকে রেলিং দ্বারা; প্রবেশপথে রেলিংএ আছে চারিটি তোরণ। পাথরের রেলিং অনুকরণ করিয়াছে কাঠের কাজকে।

স্তূপের মধ্যে বারহুত, সাঞ্চি, অমরাবতী সমধিক প্রসিদ্ধ; স্তূপের রেলিং এর ভাস্কর্য্য প্রাক্‌গুপ্ত-যুগের ভাস্কর্য্যের নিদর্শন।

বারহুত স্তূপ মধ্যভারতে এলাহাবাদ এবং জব্বল-পুরের মধ্যে অবস্থিত (সুঙ্গ খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী)। স্তূপ ইটের তৈয়ারী, বারহুত রেলিং কলিকাতার যাদু-ঘরে রক্ষিত আছে। রেলিং ও তোরণে খোদিত মূর্ত্তি—যক্ষ যক্ষিণী, নাগরাজ দেবতা। জাতক ও বুদ্ধের জীবনের ঘটনা; বেসসান্তর জাতকপ্রধান। ফুল, লতা, পাতা, জন্তু জানোয়ারের আলঙ্কারিক পরিকল্পনা আছে। লক্ষ্য করার বিষয় কোথাও বুদ্ধের মূর্তি নাই; বুদ্ধকে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। চৈত্যবৃক্ষ (বোধিবৃক্ষ), ছত্র, ধর্ম্মচক্র, পদদ্বারা বুদ্ধ সূচিত হইতেছে। জনগণ নতজানু হইয়া বোধিবৃক্ষ বা পদকে পূজা করিতেছে; বুঝিতে হইবে বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত আছেন। বারহুতের একটি রিলিফের বিষয়, একটি মইয়ের চুদিকে এবং নীচে প্রার্থনারত জনতা। মইয়ের সর্ব্বোচ্চ ধাপে একটি পায়ের ছাপ এবং সর্ব্বনিম্ন ধাপে একটি পায়ের ছাপ। ইহার অর্থ বুদ্ধ তেত্রিশ দেবতার স্বর্গ হইতে নীচে নামিতেছেন। বারহুতে বোধিবৃক্ষের প্রাচুর্য্য। ইহা লক্ষ্য করার বিষয়, বুদ্ধ উপস্থিত নাই, কিন্তু বোধিসত্ত্বকে (ভবিষ্যৎ বুদ্ধ) সশরীরে উপস্থিত করা হইয়াছে।

বুদ্ধের জন্ম সূচিত হইতেছে মায়াদেবীর চিত্রের দ্বারা। মায়াদেবী পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, হাতী শুঁড়ে কলসী দিয়া জল ঢালিতেছে। পরবর্ত্তী যুগে ইহা বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য হইতে লোপ পায়, কিন্তু ইহা হিন্দুশিল্পে শ্রী অথবা লক্ষ্মীরূপে উদিত হয়।

সব মূর্ত্তির চেহারা প্রায় এক রকম, কোনটা হয়ত গোল, কোনটা ডিম্বাকৃতি, কোনটা একটু চেপ্টা। সকলেই চক্ষু সম্পূর্ণ খুলিয়া তাকাইয়া আছে; কিন্তু চক্ষুর তারকা নাই। গুপ্তযুগের চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত।

বারহুতের পরিকল্পনায় পার্সপেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষণ বিশেষ করিয়া অনুধাবনীয়। বারহুতের পার্সপেকটিভ নগ্ন চক্ষে দেখার জিনিষ নহে, ইহা মানসিক পরিপ্রেক্ষণ। কোনো কাহিনীকে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে মানুষগুলিকে ক্ষেত্রের মধ্যে সাজাইয়াছে, ইহার মধ্যে আলঙ্কারিক পরিকল্পনা আছে; একটা মানুষকে আর একটা মানুষের উপর স্থান দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। ইহাতে কাহিনী ব্যক্ত করার চেষ্টা যেমন সুস্পষ্ট হইতে পারে, সত্যকার পার্সপেকটিভ ব্যবহার করিলে হয়ত তেমন সুস্পষ্ট না হইতে পারে; আর পাথরের ভাস্কর্য্যে চিত্রের মত পার্সপেকটিভ দেখান মনে হয় যুক্তিযুক্ত নহে। পরবর্ত্তী যুগে যবদ্বীপের বর-ভূধরের রিলিফের কম্পোজিসনে আলঙ্কারিক পরি-প্রেক্ষণ আরো সুনিয়ন্ত্রিত ও বলশালী। ইহার সঙ্গে ইটালীর শিল্পী ঘিবার্টির নির্ম্মিত ব্রোঞ্জের দুয়ারের তুলনা করিলে তাহাকে দুর্ব্বল মনে হইবে। বারহুত ও যবদ্বীপের কাজ হইল ভাস্কর্য্যবৎ, আর ঘিবার্টির কাজ হইল চিত্রবৎ।

বারহুতের ভাস্কর্য্য হইতে সেই যুগের ঘরবাড়ী, বেশ, অলঙ্কার প্রভৃতির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য কোনো ভাস্কর্য্যে বা চিত্রে (অজন্তা) প্রাচীন কালের জীবনের ছাপ এমন পাওয়া যায়

না। ইহাকে জান্‌রে চিত্র (genre painting) বা দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বলা যায়। ভারতে সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইহা প্রাচীনতম জান্‌রে চিত্র। লক্ষ্য করার বিষয়, সে যুগের পুরুষ নারীর পোষাক একই। দুইই কোঁচা দিয়া কাপড় পড়ে এবং কাছা আছে; গায়ে কোনো আবরণ নাই উত্তরীয় ছাড়া। মেয়েদের বেণী এবং খোপা দুইই আছে, বক্ষ অনাবৃত। যক্ষিণীর মূর্ত্তিতে মাথার উপর হইতে একখানা চাদর পিঠে ঝুলিতেছে। গলায়, গায়ে, হাতে গহনার আধিক্য। গহনাগুলি খুব মোটা মোটা ও ভারী। পরবর্ত্তী গুপ্ত ও পালশিল্পের গহনা সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে।

লক্ষ্য করার বিষয়, যক্ষের (কুবের) মূর্ত্তিতে চাদর ভাঁজ করিয়া বাম কাঁধের উপর দিয়া ডান হাতের তলা দিয়া নেওয়া হইয়াছে, যেমন বাঙ্গালীরা অনেক সময় পরে। মৌর্য্য ও মথুরা মূর্ত্তিতে চাদরকে মোচড়াইয়া দড়ির মত করা হইয়াছে, এখনো বাঙ্গালীদের চাদরকে দড়ির মত পাকাইয়া গলায় ঝুলাইতে বা কোমরে বাঁধ দিতে দেখা যায়।

দেবতা, রাজা, জনসাধারণ সকলের মাথায়ই পাগড়ি আছে। পরবর্ত্তী দেবতা ও রাজার মাথায় মুকুট দেখা যায়, এখানে মুকুটের অভাব। পাগড়ীর আকার বড়; কারণ পুরুষের মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল থাকিত। তাহা বিরাট পাগড়ীতে ঢাকা থাকিত, এখন যেমন শিখদের। অনেক সময় দেখা যায় পাগড়ির কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে চুলের ঝুঁটি বাহির হইয়া রহিয়াছে।

স্থাপত্যে দেখা যায়, ব্যারেল বা পিপার আকারে ছাদ (Barrel-shaped roof), চৈত্য, জানালা। একাধিক তলা, নরনারী বারান্দা হইতে তাকাইয়া দেখিতেছে।

জন্তু-জানোয়ারের চিত্রে বারহুতের শিল্পী খুব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ফার্গুসন এ বিষয়ে লিখিয়াছেন:

"Some animals, such as, elephants, deer, monkeys are better represented there than in any sculpture known in any part of the world; so too are some trees and the architectural details are cut with an elegance and precision that are very admirable. The human figures too though very different from our standard of beauty and grace, are truthful to nature and where grouped together, combine to express the action intended with singular felicity. For an honest purpose—like pre-Raphaelite kind of art, there is probably nothing much better to be found elsewhere."

নরনারী, স্থাপত্য সব মিলিয়া এমন একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে যে, একটি আলঙ্কারিক রূপের উদ্ভব হইয়াছে। পরিমাপ, অ্যানাটমি, পার্সপেকটিভ প্রভৃতির কথা আমাদের মনে উদয় হয় না।

বুদ্ধগয়া। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধগয়া রেলিংএর (খৃঃ পূঃ ২) উল্লেখ করা দরকার; কারণ বুদ্ধগয়ার রেলিংএর ভাস্কর্য্য বারহুতের ভাস্কর্য্যের অনুরূপ। এই রেলিংএর সংলগ্ন স্তূপ ছিল না। ইহা বুদ্ধের চংক্রম অথবা ভ্রমণের পথে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নীচে সিদ্ধিলাভ করার পর যেখানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেখানে এই রেলিং স্থাপিত হইয়াছে। রেলিংএর উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য্য (১) ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র (২) চারিঅশ্বযুক্ত রথে উপবিষ্ট সূর্য্য।

রেলিংএর গাত্রে একপ্রকার মন্দির দেখা যায়, ইহা বোধিবৃক্ষ ঘেরিয়া আছে; বারহুতের রেলিংএ আছে এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সাঞ্চি, মথুরা এবং অমরাবতীতেও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। স্তম্ভের উপরে মন্দির, মন্দিরে চৈত্য জানালা, মন্দিরের উপরে বোধিবৃক্ষ দেখা যাইতেছে। এইরূপ মন্তব্য করা হয় যে, বুদ্ধগয়ায় অশোক এই ধরণের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বারহুতের ভাস্কর্য্যকে এক কথায় প্রকাশ করা যায় primitive naive simplicity—আদিম অকপট সরলতা।

সাঞ্চি স্তূপ

সাঞ্চি স্তূপ ভূপাল রাজ্যে অবস্থিত; ইহা বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি প্রধান বস্তু। প্রাচীন মালব রাজ্যের রাজধানী বিদিশার (বেসনগর) নিকটে ইহা ছিল। সাঞ্চি স্তূপ ভিলসা স্তূপের অন্যতম।

সুঙ্গযুগে (খৃঃ পূঃ ২) স্তূপ ও রেলিং হইয়াছে; তোরণ অন্ধ্রযুগে (খৃঃ পূঃ ১)। সাঞ্চির তোরণের অনুকরণে চীনে ও জাপানে তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে; চীনে এই প্রকার তোরণকে বলে পাইলু, আর জাপানে বলে টোরি। পাথরে অথবা কাঠে নির্ম্মিত হাজার হাজার নিদর্শন চীনে ও জাপানে মিলিবে।

সাঞ্চির ভাস্কর্য্য বারহুতের সমপর্য্যায়ভুক্ত। এখানেও বুদ্ধের উপস্থিতি নাই; প্রতীক দ্বারা বুঝান হইয়াছে। তোরণের জাতকের কাহিনীতে story-telling quality বা কাহিনী ব্যক্ত করার অপূর্ব্ব চেষ্টা দেখা যায়। এই শিল্পের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কাহিনীকে ব্যক্ত করিলেও ইহাকে চার্চ্চ আর্ট বা বৌদ্ধ শিল্প বলা চলে না; বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ ইহাকে সৃষ্টি করে নাই, ইহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বা sensuous. এই sensuousness বিশেষ করিয়া লক্ষণীয় তোরণের উপরে পার্শ্বে বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়ান নগ্ন রমণীমূর্ত্তিতে। এই রমণীমূর্ত্তি যক্ষিণী অথবা "বৃক্ষকা" (বৃক্ষের দেবতা, গ্রীকদের Dryad)। রমণীর লীলায়িত ভঙ্গিতে অপূর্ব্ব দেহসুষমা, মোহিনীমূর্ত্তি। ইহাকে বৌদ্ধ মূর্ত্তি বলা চলে না, ভূমিদেবীর পূজার আদর্শ হইতে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। জনসাধারণের বিশ্বাস অনুসারে ইহা উর্ব্বরতার প্রতীক। "বৃক্ষকা" শব্দটি মহাভারতে পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে "তুমি কে কদম্ববৃক্ষের শাখা ধরিয়া আছ? দেবতা, যক্ষিণী, দানবী, অপ্সরা, দৈত্য, রাক্ষসী?" "বৃক্ষকা সন্তানকামীদের পূজ্যা।"

পূর্ব্বে ইহাকে নর্ত্তকী মনে করা হইত, তাহা ভুল। বারহুত, বোধগয়া ও সাঞ্চির যক্ষিণী ও বৃক্ষকার সঙ্গে বৃক্ষের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সকল নগ্ন অথবা অর্দ্ধ-নগ্ন মূর্ত্তির আদর্শে আরো মূর্ত্তি সৃষ্ট হইয়াছে। বাদামি গুহায় (বৈষ্ণব) এবং এলোরার রামেশ্বরম্ মন্দিরের বারান্দার ব্রাকেটে নগ্ন রমণীমূর্ত্তি আছে।

মায়াদেবী শালবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকাকালীন বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে তাহাও এই সংস্কার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

কবিদের একটা ধারণা আছে রমণীর পদাঘাতে অশোকফুল ফুটিয়া ওঠে; কালিদাসের কাব্যে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে; "অশোককুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে" (রবীন্দ্রনাথ)। ইহা উর্ব্বরতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে।

এমন কি বর্ত্তমানকালে বৃক্ষের যে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা প্রাচীনকালের এই উর্ব্বরতার আদর্শকেই সূচিত করে। লক্ষ্য করার বিষয়, সাঞ্চিতে নগ্নমূর্ত্তি আছে, বারহুতে নাই।

সাঞ্চির স্তম্ভগাত্রে লতা পাতা ফুল প্রভৃতির পরিকল্পনা আছে (২য় খৃঃ পূঃ); ইহাকে ইংরাজিতে floriated design বলে।

এসব উদ্ভিজ্জের অলঙ্করণ ছন্দ ও সজীবতার প্রতীক। শিল্পী মডেলিং এর দিকে দৃষ্টি না দিয়া linear scheme বা রৈখিক নক্সার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। শুধু পদ্মের মৃণালের প্রবাহই যে জলধারার মত স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে, তাহা নহে, ইহার মধ্যে প্রাণীও রহিয়াছে, পশু মানুষ উদ্ভিজ্জের জীবনধারার সঙ্গে নিজের প্রাণকেও মিশাইয়াছে। ফুলের প্রাচুর্য্যে প্রচুর উর্ব্বরতা ও ঐশ্বর্য্য সূচিত হইতেছে। ডাঃ ক্রেমরিস মনে করেন এই লতাপাতার অলঙ্করণের সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর শীলমোহরের উদ্ভিজ্জের চিত্রের সম্বন্ধ আছে।

বারহুতের কম্পোজিসন হইতে সাঞ্চির তোরণের কম্পোজিসনের পার্থক্য আছে। বারহুত সম্পূর্ণ ভাবে আলঙ্কারিক, সাঞ্চি ঝুঁকিয়াছে স্বাভাবিকতার দিকে, তার কারণ প্রথমটা আর্য্য-ভারতের (সুঙ্গ) শিল্প, দ্বিতীয়টা দ্রাবিড় (অন্ধ্র)। ক্ষেত্র হইতে মূর্ত্তির অবয়ব সম্মুখে আগাইয়া আসিয়াছে, গভীরভাবে কর্ত্তিত মডেলিং দ্বারা আলোছায়ার খেলা সুস্পষ্ট হইয়াছে। ঘনক্ষেত্র (three dimensions) দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহাতে কম্পোজিসন খুব massive বা ভারী এবং সতেজ হইয়াছে। শিল্পী যেন স্থুলস্থুলভাবে দেবগণকে পাথর হইতে বাহির করিতে চাহিয়াছেন, এবং তাহার ভিতর একটা জীবনের সাড়া পাইয়াছেন।

বারহুতের সাঞ্চির শিল্পীরা কোনো আদর্শবাদ বা শিল্পশাস্ত্র দ্বারা চালিত হন নাই; ইহার ভিতরে কোনো তত্ত্ব নাই, কোনো আধ্যাত্মিক বার্ত্তা নাই। শিল্পী যাহা অনুভব করিয়াছে এবং যাহা নগ্ন চক্ষে দেখিয়াছে, তাহাই অকপটভাবে করিয়াছে, ইহা কোনো রাজার দরবার বা পুরোহিতের অনুশাসনে চালিত হয় নাই। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় যে প্রভেদ, ইহার সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের গুপ্ত শিল্পের সেই প্রভেদ। ইহা জনগণের শিল্প। ইহা ফোক আর্টের উচ্চতম সংস্করণ।

উপেক্ষিত

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম-এ, বি-এল্

জীবনের নব নব প্রাণের উৎসবে,
আমারো কি নিমন্ত্রণ হবে?
হবে না, হবে না জানি, হে মহা ভৈরব,
আমার সকল সজ্জা লণ্ডভণ্ড সব:
কর্ণে মোর ক্ষুধার্ত্তের 'নাই' 'নাই' ধ্বনি,
কেন্দ্রে মোর বিরাজিত মহাকাল শনি।
দৃষ্টিতে সাহারা মোর, স্বপ্ন নাই চোখে,
হতাশার ক্লান্তি শুধু ফুটে ওঠে মুখে।
হাসিতে নেইকো মোর প্রেমের কাজল,
আমার বিরহে কভু হয়নি সজল,
বরষামেদুর মেঘ হেমন্ত-কণিকা
আমার ফাগুনে কভু আসেনি ক্ষণিকা।
বাজেনি নূপুর কোন চঞ্চল চরণে,
নামেনি আশার আলো আমার নয়নে।
প্রেমের ফুল কভু ওঠেনিকো ফুটে,
নম্রমায়া নেয়নিক' কম্প্র পক্ষ্মপুটে।
বিচিত্র ধরণীতে যা-আছে সঞ্চিত,
অকিঞ্চন, আমি কেন সে-সবে বঞ্চিত।
তোমারে বলিতে হবে কেন আমি মৃত,
সৌন্দর্য্যের দ্বারে দ্বারে শুধু উপেক্ষিত?

শুধু কর্ম্মজগতের ব্যস্ত পদতলে
বক্ষরক্ত কেন দিনু প্রতি পলে পলে,
বলিতে পারিবে তুমি, হে চির-আনমনা
(শুধু) বাঁচিবার আয়োজনে প্রতি রক্তকণা
যৌবনে কাঙাল করি করিলেম দান,
তুমি কি হয়েছ সখা, হয়েছ মহান,
এখনো আমার চোখে বিনিদ্র রজনী
দেখায় না সোনাভরা স্বপনের খনি,
নীরন্ধ্র আঁধার শুধু ব্যাপ্ত চারিদিকে,
হে প্রিয়, এই কি তুমি দিয়েছিলে লিখে?
তৈলহীন দীপশিখা, গন্ধহীন ধূপ,
গান নাই, শব্দ নাই ধরিত্রী নিশ্চুপ।
উত্তর দেবে না জানি, হে মহাভৈরব,
আমার জীবনে জানি তোমার এ খেলা সব
(তাই) অসমাপ্ত জীবনের এলোমেলো গান,
যৌবনের প্রান্তে এসে করিলেম দান।
(দিনু) অগোছাল জীবনের একগাছি ধূপ,
সুরভিত ক'রে নিও, দিও তারে রূপ,
হেথা হ'তে আমি আজি লইনু বিদায়,
পূর্ণ করে নিয়ো তারে সে তোমারি দায়।

হিন্দুসমাজের দায়াধিকার

অধ্যাপক শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য

মনুষ্য-সমাজ চিরদিনই গতিশীল। সামাজিক এবং পারিবারিক অনেক ব্যাপারে মানুষকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সমস্যা-সমাধানের নিমিত্ত সমাজের গতিবিধির সহিত তাল রাখিয়া কতকগুলি নিয়ম-প্রণালী মানিতে মানুষ সকল অবস্থায়ই বাধ্য হইয়া থাকে। গতির পরিবর্ত্তনে সমাজের অনুশাসনও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

হিন্দু সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধান করিতে শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণ শাস্ত্রকে প্রধান ভাবে অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শিলা-লিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতির তুলনায় নিতান্তই নাবালক। প্রাচীন কালের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিধি-নিষেধ এবং অপরাপর নিয়ম-প্রণালী জানিতে হইলে স্মৃতিশাস্ত্র আমাদিগকে সমধিক সাহায্য করিয়া থাকে। সকল গবেষকই সম্ভবতঃ একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন।

ধর্ম্মসূত্র, স্মৃতিসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে তিনটী অংশ দেখিতে পাওয়া যায়; আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত। বিচারপদ্ধতি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি সামাজিক অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি ব্যবহার-প্রকরণের অন্তর্গত। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভারতীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুস্মৃতির বর্ত্তমান বয়স প্রায় সাত হাজার বৎসর। স্মৃতিশাস্ত্রে মনুসংহিতার প্রামাণ্যই সর্ব্বোপরি।

সামাজিক আইন-কানুন জানিতে স্মৃতির পরেই অর্থশাস্ত্রের স্থান। অর্থশাস্ত্রের মধ্যে কৌটিল্যের গ্রন্থই বিশেষ তথ্যপূর্ণ। কৌটিল্যের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে। ধর্ম্মশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বহু নিবন্ধ এবং টীকা রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতার অনেকগুলি টীকার মধ্যে মেধাতিথির ভাষ্য এবং কুল্লূকভট্টের টীকা সমধিক প্রসিদ্ধ। পরাশর সংহিতার মাধবাচার্য্যকৃত ভাষ্য এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার বিজ্ঞানেশ্বর কৃত মিতাক্ষরা—(ঋজুমিতাক্ষরা, প্রমিতাক্ষরা) টীকা পণ্ডিতসমাজে মূল গ্রন্থের মতই আদর পাইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য দায়াধিকার সম্বন্ধেও মনে রাখিতে হইবে, সমাজনীতির নানাবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, কাল ও সামাজিক অবস্থাভেদে ঋষিবচনের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া নিবন্ধকারগণ আপন আপন বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দেশভেদে বিচিত্র আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্তও তাঁহারা কম চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র সফলতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ে "আর্ষ গ্রন্থগুলির পরেই পরিব্রাজকাচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা এবং বঙ্গদেশীয় পরিভদ্রবংশোদ্ভব পণ্ডিত জীমূতবাহনের লিখিত ধর্ম্মরত্নগ্রন্থের অন্তর্গত দায়ভাগের নাম করিতে হয়। উভয় গ্রন্থই প্রায় সমসাময়িক। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশ, আসাম ও নেপালের কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে উত্তরাধিকার বিষয়ে মিতাক্ষরার সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে দায়ভাগের বিধানই আদৃত হয়।

বঙ্গদেশে বৃটিশ-প্রবর্ত্তিত আদালতে দায়াধিকার

সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহা জীমূতবাহন, রঘুনন্দন ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এই তিনজন বাঙ্গালী গ্রন্থকারের অভিমতের সংমিশ্রণে রচিত। আইন-প্রণয়নে মূল সংস্কৃতের ইংরাজি তর্জ্জমা সর্ব্বত্র নির্ভুল হয় নাই। ইহার ফলে স্থানে স্থানে এক গ্রন্থের নাম করিয়া অন্য গ্রন্থের সিদ্ধান্তকে অথবা কোনও কল্পিত অভিমতকে আইনরূপে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তাঁহার 'হিন্দু স্ত্রী-ধনাধিকার' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিগণের যে স্বত্ব জন্মে, দায়ভাগ মতে তাহা 'প্রাদেশিক' অর্থাৎ বিভাগের পরে যে অংশে বা প্রদেশে যাহার স্বত্ব স্থির হয়, সেই অংশে বা প্রদেশেই বিভাগের পূর্ব্বেও তাহার স্বত্ব ছিল, অবিভক্ত অখণ্ড সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বলেন, পূর্ব্বাধিকারীর স্বত্ব নাশ হইলেই সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে সকল উত্তরাধিকারীর স্বত্ব উৎপন্ন হয়। অবিভক্ত সম্পত্তিতে সকল উত্তরাধিকারীরই সমান অধিকার থাকিবে। এই অভিমতের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'সামুদায়িক স্বত্ববাদ'। স্মৃতি সংহিতায় এই মতই বেশী পাওয়া যায়। মিতাক্ষরাতেও সামুদায়িক স্বত্ববাদই গৃহীত হইয়াছে।

মিতাক্ষরাকার জন্মস্বত্ব-বাদ স্বীকার করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতৃসম্পত্তিতে অধিকার লাভ করিবে; পিতার মৃত্যু বা অন্য কোন কারণ হইতে স্বত্ব জন্মে না। পুত্রের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াও পিতা ভূম্যাদি স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অপর সম্পত্তির দান, বিক্রয় প্রভৃতি করিতে পারিবেন, কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পুত্রের অনুমোদন আবশ্যক। জীমূতবাহন যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পাতিত্য প্রভৃতি স্বত্বনাশক হেতু না থাকিলে পিতার জীবদ্দশায় পুত্রদের কিছুমাত্র অধিকার জন্মিতে পারে না। পুত্রগণ পিতার অনুমোদন ব্যতীত কোন ধন ব্যবহার করিতে পারিবে না। মিতাক্ষরার মত মানিলে বলিতে হইবে, আপন ধনের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পিতারও স্বাধীনতা নাই; কারণ পুত্রও সেই ধনের অংশীদার।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বত্বের সামুদায়িকতা স্বীকার করিলেও জন্মস্বত্ববাদ স্বীকার করেন নাই। কারণ পিতা যদি স্বাধীনভাবে আপন সম্পত্তির দান-বিক্রয়াদি করিতে না পারেন, তবে সেরূপ নিষ্ফল সম্পত্তি থাকা না থাকা সমান কথা। এই কারণে জন্মস্বত্ববাদ রঘুনন্দন-মতে অযৌক্তিক। প্রাদেশিক ও সামুদায়িক স্বত্ব-বাদে মতভেদের কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, জীমূতবাহন লোকপ্রচলিত যুক্তিরই বেশী আদর করিয়াছেন।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার-বিচারে মিতাক্ষরাকার রক্তসম্পর্ককে কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহার শরীরে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্পর্কে ধনস্বামীর শরীরের ভাগ বেশী, তিনিই সম্পত্তির প্রাথমিক উত্তরাধিকারী। পুরুষের শুক্রের আধিক্যে পুত্র-সন্তান এবং স্ত্রীর আর্ত্তবাধিক্যে কন্যা সন্তান জন্মে—ইহা আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্ত। এই কারণে পিতৃসম্পত্তিতে প্রথমতঃ পুত্রের এবং মাতৃসম্পত্তিতে প্রথমতঃ কন্যার অধিকার হইয়া থাকে। মিতাক্ষরাকার সাধারণতঃ এই নিয়মকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তরাধিকার-বিধান স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের প্রতিকূলে শাস্ত্রবচন পাওয়া গেলে শাস্ত্রকেই উপরে স্থান দিয়াছেন। অপুত্রক পুরুষের ধনে প্রথমতঃ পত্নীই অধিকারিণী হইয়া থাকেন, কন্যা নহে। আরও অনেক স্থলেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

জীমূতবাহনের মতে শ্রাদ্ধাধিকারীর পৌর্ব্বা-পর্য্যক্রমে দায়াধিকার বিহিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাহার শ্রাদ্ধের অধিকারী, সেই ব্যক্তি তাহার

ধনেরও অধিকারী হইবে। শ্রাদ্ধ এবং পারলৌকিক সদ্‌গতি-কামনায় দানাদি করিলে মৃত ব্যক্তির উপকার করা যাইতে পারে। যাহার হাতে সম্পত্তি ন্যস্ত হইলে মৃত ধনস্বামীর পারলৌকিক উপকার হইবে, তিনিই ধনাধিকারী হইবেন। এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রমের অভাব নাই। পুত্রই জননীর শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু জননীর স্ত্রীধনে কন্যার প্রাথমিক অধিকার। সেই স্থলে শ্রাদ্ধকর্তৃত্ব থাকায় পুত্রকে প্রাথমিক অধিকার দেওয়া হয় নাই।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও জীমূতবাহনেরই সমর্থক। মিতাক্ষরার প্রাগুক্ত যুক্তিকে তিনি সমর্থন করেন নাই। মৃত ধনস্বামীর পারলৌকিক কৃত্যকেই তিনি বড় করিয়া দেখাইয়াছেন।

সমাজস্থিতির দৃষ্টিতে বিচার করিলে জীমূত-বাহনের যুক্তিকেই উপরে স্থান দিতে হয়। কারণ হিন্দু সমাজে শ্রাদ্ধ শান্তির অবশ্যকর্তব্যতা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের মনে হয়, শ্রাদ্ধাধিকার এবং রক্তসম্পর্ক উভয়কেই একযোগে দায়াধি-কারের কারণরূপে স্বীকার করিলে অধিকতর সঙ্গত হইত।

সম্পত্তি-বিভাগের কোন সময় নির্দ্দেশ করা চলে না। যেহেতু উত্তরাধিকারিগণ ইচ্ছা করিলে যৌথ সম্পত্তি ভোগ করিয়া এক পরিবারেও বাস করিতে পারেন, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ পরিবারে বাস করিলে দৈব এবং পৈত্র্য কৃত্য পৃথক পৃথক-রূপে সম্পাদিত হয় বলিয়া পৃথক্ পরিবারে বাস করাই সঙ্গত। জীমূতবাহন এই অভিমতকে সমর্থন করিয়াছেন। রঘুনন্দনও এই বিষয়ে জীমূতবাহনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালী গৃহস্থের পারিবারিক ব্যবস্থার একটু ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মার জীবদ্দশায় ভাইগণ পিতৃসম্পত্তি বিভাগ করিবেন না—জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও সেই যুগে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের এক বিশেষ কথা।

পুত্রদের ন্যায় কন্যাগণ পিতৃসম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে অধিকারিণী হইত কিনা, এই বিষয়ে আজকাল নানা মতবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। দায়ভাগকার কন্যাদিগকে পুত্রদের ন্যায় অধিকার দেন নাই, ইহা অতি স্পষ্ট। অনেকে বলিয়া থাকেন, মিতাক্ষরাতে নাকি কন্যাদের অধিকারের কথা লিখা আছে, কিন্তু ইহাও ঠিক নহে। মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন, পিতা যদি স্বয়ং কন্যাকে যৎকিঞ্চিৎ ধন দিয়া যান, তবে সেই ধনে কন্যাই অধিকারিণী হইবে, আর পিতা কিছুই না দিলে পিতৃবিয়োগের পর কন্যাও পিতৃসম্পত্তির অংশভাগিনী হইবে; পরন্তু কন্যা কোন অবস্থাতেই পুত্রের সমান অংশ পাইবে না। কন্যাকেও পুত্রস্থানীয় মনে করিয়া তাহার অংশে যাহা পড়িবে, সেই সম্পত্তিকে চারিভাগ করিয়া কন্যা এক ভাগ পাইবে এবং অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ এবং অপর অখণ্ড অংশে পুত্রেরই অধিকার হইবে। কাহারও এক পুত্র ও এক কন্যা থাকিলে সম্পত্তিকে আট অংশে বিভাগ করিতে হইবে। আট ভাগের সাতভাগ পুত্র পাইবে এবং একভাগে কন্যার অধিকার হইবে।

যদি পুত্রের ন্যায় কন্যারও প্রাথমিক অধিকার মিতাক্ষরাকারের অভিপ্রেত হইত, তবে 'পিতা স্বহস্তে কন্যাকে কিছুই না দিলে কন্যাও পিতার মৃত্যুর পর অংশভাগিনী হইবে' এই কথার কোন মূল্য থাকে না। ইহাতে বুঝা যায়, পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার কোন দাবী চলে না। পুত্রকে স্নেহবশতঃ পিতা কিছু দান করিলে পিতার মৃত্যুর পরে সেই পুত্রের অধিকার ত কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, তবে কন্যার বেলা অন্যরূপ বিধান কেন করা হইল? অপর নিবন্ধকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কন্যাদের অধিকার না থাকিলেও বিবাহের

ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযোগী সম্পত্তি পাইতে তাহারাও অধিকারী'।

এই প্রসঙ্গে মিতাক্ষরার লিপিভঙ্গিও লক্ষ্য করিবার মত। পুত্রদের অধিকারের বেলায় গ্রন্থকার 'দায়' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কন্যাদের অধিকারের কথা বলিতে 'অংশ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অংশ ও দায় এই দুই শব্দ সমানার্থক নহে। অংশ শব্দ যৎকিঞ্চিৎ অনির্দ্দিষ্ট ভাগের এবং দায় শব্দ নির্দ্দিষ্ট ভাগের বোধক। স্মৃতিচন্দ্রিকাকার যাজ্ঞিক দেবণভট এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও দায় এবং অংশ শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

শুধু কন্যার কেন, সমাজে এক সময়ে পত্নীর দায়াধিকারও স্বীকার করা হইত না। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায়, অমাত্য প্রতিহারীর হাতে একখানি পত্র দিয়া মহারাজ দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়াছেন। পত্রে লেখা আছে, "ধনবৃদ্ধিনামে একজন জলবণিক্ নৌকা ডুবিয়া মারা গিয়াছে। সেই বণিক্ নিঃসন্তান। তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি আছে। সেই সম্পত্তিতে রাজারই অধিকার। এখন যাহা কর্ত্তব্য হয়, মহারাজ আজ্ঞা করুন।" অমাত্যপ্রেরিত এই পত্রখানি পড়িয়া মহারাজ প্রতিহারীকে বলিলেন, "মৃত বণিক্ একজন বড় ধনী ছিলেন। তাঁহার অনেক ভার্য্যা থাকা সম্ভবপর। তাঁহাদের মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা কিনা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।"

এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালে (খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী) নিঃসন্তান পুরুষের পত্নী থাকিলেও পত্নী পতির ধনের উত্তরাধিকারিণী হইতেন না, রাজাই সেরূপ স্থলে অধিকারী হইতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পত্নীকে অধিকার দেওয়া হয় নাই।

খৃঃ একাদশ শতকের গ্রন্থ মিতাক্ষরাতেও দেখিতে পাই, অপুত্রক পুরুষের একান্নবর্ত্তী ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিলে সেই পুরুষের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী দায়াধিকারিণী হন না, পরন্তু ভ্রাতাই অধিকারী হইয়া থাকেন। বঙ্গীয় পণ্ডিত জীমূত-বাহন এরূপ স্থলে পত্নীকেই অধিকারিণী স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে পত্নীর অধিকার স্বীকার না করার কারণ নিশ্চিতরূপে বলা না গেলেও ইহা সম্ভবতঃ সত্য যে, তখনকার সমাজে বিধবা নারীকে সমধিক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হইত এবং যৌথ পরিবার বেশী থাকায় পরিবারে সর্ব্বত্রই পুরুষলোক চালক থাকিতেন। এই কারণে বোধ করি নিঃসন্তান বিধবারা পতির সম্পত্তি না পাইয়াও দেবরাদির পরিবারে সুখে-সম্মানেই থাকিতে পারিতেন।

বাঙ্গালী সমাজপতিগণ পূর্ব্বেই বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পারিবারিক সম্পর্ক ও ব্যবহারশাস্ত্রে একই রকমের গতানুগতিকতা চলিতে পারে না। বাঙ্গালী ব্যবহারবিৎ জীমূত-বাহনই প্রথমতঃ দায়াধিকারের বেলা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রবর্ত্তন করেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় দায়ভাগশাসিত প্রদেশগুলিতে দায়াধিকারবিধানে এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ পত্নীর ধনাধিকার-বিষয়ে। নিবন্ধকারগণের মধ্যেও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পর্য্যন্ত আসিয়াই এই বিষয়ে মননের ধারা সম্পূর্ণ থামিয়া যায় নাই, কিন্তু শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া আলোচনা করিবার পদ্ধতি অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়াছে। অতঃপর সমাজ-ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, তাহা অধিকাংশই বোধ করি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে।

সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে আংশিক পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সকল সময়েই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্রমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিধান পরিবর্ত্তন করা হিন্দুচিন্তার চলিষ্ণুতার পরিচায়ক। এই প্রকার পরিবর্ত্তনে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

নাথ গীতি-কাব্য

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

এমন একদিন গিয়াছে যখন ভারত ও ভারতের বাহিরের জনসাধারণ জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে নাথধর্মের পূতকাহিনী শ্রবণের জন্য সর্বদা লালায়িত ছিলেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা-কারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে বাঙ্গালা, আসামী, মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, নেপালী, তিব্বতীয় এবং ভোটীয়[১] প্রভৃতি ভাষায় মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাড়িপা নাথ, কানুপা নাথ, ভর্তৃহরি নাথ, রাণী ময়নামতী, রাজা গোপীচাঁদ প্রভৃতি নাথ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান চরিত্রও গীত হইয়া জনসাধারণের চিত্ত বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাহিত্যাচার্য্য রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর এগুলিকে নাথ-গীতিকা আখ্যা দিয়াছেন।[২] আমরা এখন যে সকল দেশীয় গীতিকাব্যের আলোচনা করিতেছি সেগুলির প্রতি আমাদের দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর আদৌ দৃষ্টি ছিল না। বিদেশীয় পণ্ডিত গ্রীয়ার্সন সর্বপ্রথম উত্তর বঙ্গ হইতে এজাতীয় গীতি-কাব্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করিলে এবিষয়ে আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন স্থানের হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য কবির রচিত বাঙ্গালা নাথ-গীতিকাগুলির মধ্যে শ্যামদাস সেন প্রণীত এবং ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'মীন চেতন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'গোরক্ষবিজয়', ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান' ও 'ময়নামতীর পুঁথি', বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের 'ময়নামতীর গাথা', ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রীয়ার্সন কর্তৃক উত্তর বঙ্গ হইতে সংগৃহীত এবং ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', দুর্ল্লভ মল্লিক নামক গ্রাম্য-কবি-রচিত এবং শিবচন্দ্র শীল প্রকাশিত 'গোবিন্দ চন্দ্রের গান', আব্দুল স্কুর মোহম্মদ রচিত এবং ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপী চন্দ্র', প্রভৃতি এবং হিন্দি অন্যান্য ভাষার নাথ গীতিগুলির মধ্যে 'সঙ্গীত গোপীচাঁদ ভারতী' ভক্তবালক রামের 'সঙ্গীত পুরাণ', রামসাহে কর্তৃক উর্দু ভাষার পদ্যছন্দে লিখিত 'কৌকভ অল হিদায়েত', ব্রজভাষার পদ্যছন্দে লিখিত 'দশম গ্রন্থ' জাওলাদাস জৌকি ও ব্রহ্মদাশকৃত 'পুঁথিরত্ন-স্থান' (ইহার এক কপি লণ্ডন ব্রিটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে), চন্দ্রনাথ যোগী কৃত 'যোগী সম্প্রদায়াবিষ্কৃতি' (ইহার উর্দু গদ্যের অমুদ্রিত সংস্করণ লণ্ডন ব্রিটীশ মিউজিয়ামে ও পাঞ্জাবী পদ্য সংস্করণ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে)। পারস্য ভাষার পদ্যছন্দে লিখিত 'দবিস্থান-ই-মজাহিব', গোপালচন্দ্র হালদার কর্তৃক ইহা ইংরাজিতে অনূদিত। ১৮৯১ অব্দের পাঞ্জাব লোকগণনার রিপোর্টের ৫৭ পরিচ্ছেদে Legends of the Punjab (By Sir

১ J. A. S. B. 1898, Part I. Pp 22 & 23

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

Richard Temple), Glossary of the Punjab Tribes and Castes Vol. II (By Mr Rose and Mr Emaclagan), হইতে অনেক ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণ রাম সুপিরিকৃত এবং লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রভরথরী', গঙ্গারামকৃত 'সিহরফী গোপীচন্দ', কবি কাশীরামকৃত এবং লাহোর হইতে প্রকাশিত 'বারামাহ গোপীচন্দ্র' বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'সঙ্গীত গোপীচন্দকা', প্রহ্লাদীরাম পুরোহিতকৃত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্ররাজা কোথ্যাল', খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রণীত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'সঙ্গীত গোবিন্দচন্দ্র ভরথরী' কটক হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দচন্দ গীত' লোভী রামকৃত এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্র কাথ্যাল, 'গোরক্ষ গণেশ গোষ্ঠী', 'গোরক্ষ সংবাদ', 'কম্বড়বোধ' প্রভৃতি নাথগীতিকা ও গ্রন্থাদির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে নাথ আচার্যদের সাধনমাহাত্ম্য, ধর্মমত ও চরিত্রাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেশের সাহিত্য ও বিভিন্ন সাহিত্য-ইতিহাসের তাগিদে এগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সাহিত্যসেবিগণ কর্তৃক প্রকশিত হইয়াছে। ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"নাথসিদ্ধাগণের সময় নির্ণয় করা বাঙ্গালা-দেশের সাহিত্যের এবং ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৬০ পৃঃ)।

দেশবিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী এই সকল আলোচনা করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে দেশবাসী নাথসম্প্রদায়ের নিকট হইতে একটী মাহাত্ম্য-দীপ্ত সাহিত্য উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছেন। সমগ্র এশিয়াব্যাপী বিশেষ করিয়া ভারতব্যাপী নাথধর্মের ও নাথসম্প্রদায়ের যে প্রতাপ ছিল এসব কথা হয়ত বর্তমানকালে কেহ বিশ্বাসই করিতেন না, যদি বাঙ্গালা, হিন্দী, তিব্বতীয় প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য ইহার সাক্ষী হইয়া না দাঁড়াইত। যাহা হউক বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন সাহিত্যের খাতিরে দেশবিদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলী যে ভাবে নাথসাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন—তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অচিরকাল মধ্যে নাথসাহিত্য এদেশের বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার বাণীভাণ্ডারে সমাদৃত হইবে।

নাথগীতিকাগুলির রচনাকাল আজও নিঃসন্দেহ-রূপে স্থির হয় নাই। সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন 'গোরক্ষবিজয়ের' মত অপূর্ব গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষার আদিযুগে রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ মীন নাথ গোরক্ষ নাথের গুরু। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী বলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে মুসলমান আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যতখানি পুষ্টি বা বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বোধ হয় বৈদেশিক প্রভাব একেবারেই ছিল না, কিন্তু তাহার উপাদানবিভাগে সহজ ধর্মমত, নাথ-পন্থীদিগের ধর্মমত ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকমত বিশেষভাবে বিবৃত রহিয়াছে। এ সময় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ নাই, পুরাণসমূহের উল্লেখ নাই। আছে কেবল বৌদ্ধ সন্ন্যাসের মত, নাথপন্থী যোগীদের মত এবং সহজ ধর্মমূলক সাধারণনীতিকথার আবৃত্তি। পূর্বগামী সিদ্ধাচার্যগণ, নাথপন্থার যোগিগণ এবং সহজিয়াগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের ধর্মমত বাঙ্গালার লোক-সমাজে প্রচার করিতেন, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ তখন সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে মনসার গান, মঙ্গলচণ্ডীর গান, শিবায়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণমতের অনুগামী লিখিত হইতে লাগিল" (সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ ৯৬ পৃঃ)। সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষ নাথের শিষ্যসম্প্রদায় বর্তমান।

এই নাথসম্প্রদায়ের চেষ্টায়ই—গোরক্ষ নাথের কীর্তি-বিজ্ঞাপক সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। ময়নামতীর গান এই সাহিত্যের অন্তর্গত। * * * ধর্মমঙ্গলের পুঁথিগুলির কোন কোনটীতে আমরা মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি নাথগুরুগণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাইয়াছি। * * * এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী। সাধারণ সমাজে তখনও রামায়ণ মহাভারতের অনুশীলন এদেশে আরম্ভ হয় নাই" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।

ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব। এসব গান গাহিবার জন্য এক নূতন বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছিল। ইহার নাম গোপী যন্ত্র। ইহা বাউলদের একতারা নামে সাধারণতঃ পরিচিত। গোপী-চন্দ্র নামের সহিত রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের স্মৃতি বিজড়িত (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস)। মাণিকচন্দ্র রাজার গান, ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান প্রভৃতি ইঁহাদের জীবিতকালে না হইলেও ইঁহাদের মৃত্যুর পর রচিত ও গীত হইতেছে। ইঁহাদের সময় ১১শ বা ১২শ খৃঃ অব্দ। তাহা হইলে এই জাতীয় গান ১১শ বা ১২শ খৃঃ অব্দ হইতে রচিত ও গীত হইয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। ইঁহারা যে বাঙ্গালী সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। তাহা হইলে ইঁহাদের সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা ভাষার গানই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বাঙ্গালা দেশ হইতে এগুলি অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিতে হইবে। মারাঠী ভাষায় ময়নামতী ও গোপী-চাঁদের গান প্রচলিত। কবি মহীপতি সুললিত ভাষায় ময়নামতীর গান গাহিয়াছেন। ইনি ১৭শ খৃঃ অব্দের লোক। ডাঃ নলিনী-কান্ত ভট্টশালী বলেন—"ময়নামতীর গাথাগুলি এক সময়ে দেশময় গীত হইত। আজিও রঙ্গপুর জেলায় এই গাথাগুলি গাহিবার দল আছে এবং রাত্রির পর রাত্রি জনসমূহ আনন্দে এই যুগীযাত্রা শুনিয়া জাগিয়া কাটায়। কুড়িগ্রাম মহকুমার সম্পন্ন বাজার বন্দরে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই যুগীযাত্রার গীতাভিনয় হয়" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—১৪ পৃঃ)। জলন্দর (হাড়িপা) নাথ, কানুপা নাথ, রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধীয় গান তিব্বতীয় আখ্যানেও আছে (A note on the Antiquity of Chittagong. Compiled from the Tibetan Works Pag Samjon Zan of Sumpa Khanpo and Kahbab Dum Dan of Lama Taranath By Roy Sarat Ch. Das, C. I. E. Bahadur. J. A. S. B. 1898, Part I. pp 22 & 23)

সমস্তদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় 'মীনচেতন' ও 'গোরক্ষবিজয়'এর গানগুলি ৮ম, ৯ম খৃঃ অব্দ এবং মাণিকচন্দ্র ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গান ১২শ ১৩শ খৃঃ অব্দ হইতে রচিত গীত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে এবং সমাজে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ সব গানকে নবভাষায় ক্রমশঃ সজ্জিত করা হইয়াছে। যাহা হউক এজাতীয় গান যে ৮ম হইতে ১৩শ খৃঃ অব্দ মধ্যে রচিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে কি ৮ম খৃঃ অব্দের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় গান ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। সেটি হইতেছে এই—

> "কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
> কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিক পাট।
> কমল বিকসিল কহিহণ জমরা
> কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা।"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—এইটি সত্যই মীন নাথের লেখা, খৃঃ ৮০০ বৎসরের

লেখা, খাস বাঙ্গলা এখনও বুঝিতে কষ্ট হয় না" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার ৫ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)। শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গানকে ৮ম খৃঃ অব্দের বলিয়াছেন। কিন্তু এখন নাথগুরু মীন নাথের সময় নিঃসন্দেহে ৫২২ খৃঃ অব্দ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। তাহা হইলে উক্ত বাঙ্গালা গানকে ৬ষ্ঠ খৃঃ অব্দের বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন—

"* * * যতদূর দলিল প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাতে বলিতে হয় যে মীন নাথই বাংলা ভাষার আদিম লেখক—" (শনিবারের চিঠি—আশ্বিন ১৩৫১ বাং, ৩৭৯—৩৮৪ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন—"* * * নাথপন্থার আদি প্রচারক এই মীন নাথ। বাঙ্গালীর এটা একটা গৌরবের বিষয় যে একজন বাঙ্গালী গোটা ভারতবর্ষকে একটা ধর্মমত দিয়েছিলেন" (শনিবারের চিঠি—আশ্বিন ১৩৫১ বাং, ৩৭৯-৩৮০ পৃঃ)।

খোস্‌বাগ

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

চুপে চুপে চল পান্থ, শান্ত কর ক্ষিপ্ত পাদক্ষেপ,
স্তব্ধতায় ভরা দিশি ; দিদৃক্ষা-উল্লাস করহ সংক্ষেপ !
স্রোতহীন বায়ুস্তর, স্পন্দহীন, আবদ্ধ নিঃশ্বাস ;
বিষণ্ণ নভস্থলে নাহি উঠে কাকলী উচ্ছ্বাস।
মন্দস্রোতা ভাগীরথী—ভুলিয়াছে যৌবনাহঙ্কার ;
লহরীতে সুরের লহরী মিশে আর উঠে না ঝঙ্কার।
বেলোয়ারী রোশনাতে নর্ত্তকীর বসন চিক্কণ ;
সায়াহ্ন সানা'য়ে মেশে নর্ত্তনের নূপুর নিক্কণ।
তারি সাথে রঙ্গে লয়ে গঙ্গা করে তরঙ্গ সংঘাত ;
মৌনতায় সুপ্ত স্মৃতি,—রুদ্ধ কণ্ঠ সে সব সংবাদ।
চুপে চল, হেথা খোসবাগ,—আজি আর নাহি জমকাল্ ;
ফুল সাথে বাগিচাও ঝ'রে গেছে, আছে কঙ্কাল।
মধুপ গুঞ্জন গান লভিয়াছে শ্বাপদ-চীৎকার ;
কণ্টকী আরণ্যবৃক্ষ সেদিনেরে দিতেছে ধিক্কার।
জ্বলিতেছে চিতা হেথা শ্মশানের উলঙ্গ প্রান্তর ;
বঙ্গ তথা ভারতের স্বাধীনতা ভস্মে রূপান্তর।
হোথা ঐ মৃৎকক্ষে ধূলিতলে বিস্মৃত সন্তাপ ;
অতি ক্ষীণ রেখা টানি দেখাতেছে প্রাগ্-মনস্তাপ।
ধূলায়িত রাজদেহ সিরাজের জ্বলে অহর্নিশ ;
তাহার দাহন ছুঁয়ে হেথা থাক্ হ'ল দশদিশ।
কি যে ব্যথা ভাসে হেথা, আকাশে বাতাসে উঠে ক্রন্দন ;
অশ্রু ফেল পান্থ তুমি মুক্তি হেথা হ'য়েছে বন্ধন।
তীর্থ হেথা ভারতের সিরাজের সমাধি-সজ্জায় ;
সুপ্ত আছে স্বাধীনতা আজিও উঠে না লজ্জায়।
সে দিনের ইতিহাসে শূরতায় গ্লানি অলঙ্কার ;
সূচিমুখে স্তব্ধ হ'ল বিশ্বগ্রাসী ধানুক টঙ্কার।
পসারি কিনিয়া লয় চৌর্য্যমূল্যে বীর্য্য পরাক্রম ;
জীর্ণতরী স্বর্ণ হ'য়ে দ্বীপান্তরে জাগাল সম্ভ্রম !
ফেলে দাও পাঠ্য তব ইতিহাস মিথ্যার জঞ্জাল ;
শাসনের বরাভয়ে সত্যরে তা' করেছে সঞ্চাল।
বৃদ্ধ অশ্বত্থ ঐ জরাগ্রস্ত প্রাচীন মসজিদ্
আমি শুনিয়াছি কথা কয় সত্য যাহা কহিবে নিশ্চিত।
পূজাহীন শিবালয়ে ইতিহাস রয়েছে অঙ্কিত ;
মৌন মুখর গগন বণিকের শাসনে শঙ্কিত।
রশনি বাগের আলো নিভিয়াছে নাহি নহবৎ ;
ঝিল্লিকা শুনায় গীতি, দ্যুতিকার সন্ধ্যায় খদ্যোৎ।
আপনারে জ্বেলে দিয়ে জ্বালো দীপ কর প্রাণপাত ;
মুক্ত বাঙ্গালীর হেথা রাখা আছে অভিসম্পাত।
একদিন এই পথে উঠেছিল অসির ঝনৎকার ;
পিতামহদের দল এ ধূলির পর লাগায় চমৎকার।
এই ধূলি পদধূলি—মুক্ত জাতির মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ ;
এই ধূলি মেখে উঠাও আজিকে নূতন মুক্তিবাদ।

বৈজ্ঞানিক কেভেনডিস

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্সি

কেম্বি্রজের রসায়ন ল্যাবরেটরী যাঁহার নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে সেই বৈজ্ঞানিক সাধক কেভেনডিস্কে (Cavendish) আজ আমরা স্মরণ করিব। ইনি ১৭৩১ খৃঃ ইটালীর নাইস্ (Nice) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হেনরি কেভেন্ডিসের পিতার নাম—লর্ড চার্লস কেভেন্ডিস্। ইঁহার মাতা ছিলেন ডিউক অব্ কেণ্টের কন্যা। কাজেই দেখা যায় কেভেন্ডিস্ বিলাতের অতি উচ্চ বংশে জন্মলাভ করেন। ইঁহার বাল্যকালের পরিচয় বেশী পাওয়া যায় না। শুনা যায়, ১৭৪২ খৃঃ ইনি হ্যাক্নির (Hackney) একটি স্কুলে পড়িতেন। এর পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশুনা করিয়াছেন। কিন্তু সেখান হইতে তিনি কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই। পরবর্ত্তী দশ বৎসর আবার তিনি কি করিয়াছেন তাহারও কোন ইতিবৃত্ত নাই। কেহ কেহ বলেন এ সময় তিনি ভ্রাতার সঙ্গে একবার প্যারীতে গিয়াছিলেন এবং এই সময়েই সম্ভবতঃ কিছু অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা নিয়া আলোচনা করেন। কেভেন্ডিসের লিখিত কাগজপত্রে কোনদিন তিনি তারিখ দিতেন না। এজন্যও তাঁহার সম্বন্ধে সকল খবর জানা কঠিন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাহির হয় ১৭৬৬ খৃঃ। ইহাতে কয়েকটি রাসায়নিক বিষয় আলোচিত হয়। ১৭৬৬ খৃঃ এর ট্রান্জাক্সন্ অব দি রয়েল সোসাইটিতে (Transaction of the Royal Society) দেখা যায় তিনি কার্ব্বনিক এসিড্, হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ইন্ফ্লামেব্ল্ এয়ার (Inflammable air) বা হাইড্রোজেন সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। বস্তুটি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদেরও জানা ছিল, কিন্তু তাঁহারা ইহার যথাযথ গুণসমষ্টি পর্য্যালোচনা করেন নাই। কেভেনডিস্ ইহাকে পরিশুদ্ধ অবস্থায় তৈয়ার করেন এবং বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষণের মধ্য দিয়া ইহার স্বরূপ বৈজ্ঞানিকসমাজে উপস্থিত করেন। পণ্ডিতবরের প্রতিভা এখানেই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার পর জলের আণবিক গঠন নির্দ্ধারণ করিয়া ইহার মৌলিকত্ব ঘুচাইয়াছেন। তদানীন্তন কালে এইটি একটা অতি উচ্চস্তরের গবেষণা। ১৭৮১-১৭৮৫ খৃঃ এর ফিলসফিক্যাল ট্রানজাক্সনে (Philosophical Transaction) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত পরীক্ষণপদ্ধতি সন্নিবিষ্ট আছে। কেভেনডিসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি পরিস্কৃত হাইড্রোজেন ও বায়ুর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (১ : ২$\frac{১}{২}$) গ্রহণ করিয়া প্রজ্বলিত করেন—ফলে যেখানে কোন জলকণিকা ছিল না সেখানে জলকণিকা দেখা দেয়। ইহা হইতে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন যে জল একটি যৌগিক পদার্থ—ইহাতে ইন্ফ্লামেব্ল্ এয়ার ও কমন এয়ার (Common air) বা বায়ু থাকে। পরে উক্ত গ্যাস দুইটিকে নলে পুরিয়া বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গসহায়ে তাহার পরীক্ষণপদ্ধতিটি স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করেন। আজও বৈজ্ঞানিকসমাজ কেভেনডিসের প্রণালী নকল করিয়া সর্ব্বসমক্ষে পরীক্ষণ দেখাইয়া থাকেন।

বায়ু বা কমন এয়ার (Common air)

ব্যতীতও তিনি প্রিষ্ট্‌লী, (Priestley) আবিষ্কৃত ডিফ্লজিষ্টিকেটেড্‌ এয়ার (Dephlogisticated air) বা অক্সিজেন্‌ নিয়া কাজ করিয়াছেন। ইন্‌ফ্লামেব্‌ল্‌ এয়ার ও ডিফ্লজিষ্টিকেটেড, অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র প্রজ্বলিত করিয়া তিনি ৩০ গ্রেণ জল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেভেনডিস বায়ু নিয়াও যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন সাধারণ বায়ুতে দুইটি নির্দ্দিষ্ট গ্যাস আছে - ডিফ্লজিষ্টিকেটেড্‌ এয়ার বা অক্সিজেন উহাদের মধ্যে একটি। এই এয়ার পারদের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে সম্বদ্ধ হইলে মার্কিউরিয়াস্‌ ক্যালসিনাস্‌ (Mercurius Calcinus) হয়, যাহাকে আমরা বর্ত্তমানে মার্কিউরিক অক্সাইড বলি। বায়ু সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষক ছিলেন লেভোসিঁও। ইনি অনেকটা কেভেনডিসের নিকট ঋণী। কেভেনডিস্‌ নাইট্রিক এসিড সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছেন। ইনিই এই প্রসিদ্ধ অম্লটির রাসায়নিক গঠন স্থিরীকৃত করেন। ১৭৮৫ খৃঃ এর রয়েল সোসাইটির কাগজে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। পণ্ডিতবরের গবেষণালিপিতে বায়ু সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর একটি ইঙ্গিত আছে যাহাতে পরবর্ত্তীকালে আরগণ নামক মৌলিকটী উদ্ধার করা অতি সহজ হইয়াছে।

কেভেনডিস্‌ অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তাঁহার বেশীর ভাগ পরীক্ষণে পরিমাণিক দিকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। ইনি নানাস্থান হইতে বায়ু সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে বায়ুতে যে দুইটি পদার্থ আছে তাহারা পরিমাণে প্রায় নির্দ্দিষ্ট। তাঁহার গবেষণার অঙ্কগুলি আজও আমরা নির্ভুল বলিয়া মনে করি।

কেভেনডিস ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। রসায়ন নিয়া কাজ করিবার অবসরে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য অনেক বিদ্যারও চর্চা করিয়াছেন। তাপবিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি তাপমান যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং ইহাকে বৈজ্ঞানিক জগতের অমূল্য সম্পদরূপে উপস্থিত করিয়া বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন। এমন কি কেভেনডিস্‌ পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণে মনোযোগী হইয়া যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। কার্ব্বন ডায়ক্সাইড (carbon dioxide) যে বায়ু হইতে বেশী ভারী এবং হাইড্রোজেন যে অনেক হাল্‌কা তাহা তিনিই প্রমাণ করেন।

যে সকল পণ্ডিত রসায়নের সূচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেভেনডিস্‌ অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডের বয়েল, ব্লাক, কেভেনডিস্‌ ও প্রিষ্ট্‌লি পৃথিবীতে নব্য রসায়নের সূচনা করেন। এই জন্য ইংলণ্ডের নিকট রাসায়নিকগণ চিরঋণী। বয়েল, ব্লাক ও প্রিষ্ট্‌লী সকলেই পৃথিবীতে একটা দাগ রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, এবং সেই ভাব নিয়াই সমাজে আনাগোনা করিয়াছেন। কিন্তু কেভেনডিস্‌ ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। এরূপ নির্ব্বিকার, আপনভোলা লোক বেশী দেখা যায় না। এইজন্য তাঁহার দুর্নামও ছিল, যশ ও প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশমর্য্যাদা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্যে বিশ্বজয়ী ছিলেন তবুও তিনি চিরদিন দীনহীন কাঙ্গালের মত সঙ্গোপনে দিনাতিপাত করিয়াছেন। জীবনীলেখকদের মতে তিনি ছিলেন কিম্ভূত পাগ্‌লা গোছের লোক। তিনি নিয়ত একাকী থাকিতেন, লোকদৃষ্টি সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিশ্বের এক নিভৃত কোণে পাগল সাধক দিবারাত্র মসগুল থাকিতেন। দুনিয়ার মতামতের তিনি কোন ধার ধারিতেন না। ফলাকাঙ্ক্ষা তাঁহার কোন দিন ছিল না।

তাঁহার লিপিগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় সাধক স্বীয় সাধনায়ই মগ্ন ছিলেন, পৃথিবীর উপর নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করা বা যশ মান অর্জ্জন করা তাঁহার মোটেই অভিপ্রায় ছিল না। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁহার চরিত্রাঙ্কন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন কেভেনডিস্ ছিলেন লাজুক, স্বার্থপর, কৃপণ ইত্যাদি। আমার মনে হয় পাশ্চাত্য স্বার্থান্বেষী পণ্ডিতগণ এ সাধককে চিনিতে পারেন নাই - ইনি ছিলেন একজন প্রকৃতপক্ষে ঋষিতুল্য সাধক।

পণ্ডিতবর কেভেনডিসের লাজুক ভাব বা অদ্ভুত স্বভাবের কতকগুলি গল্প আছে। একবার একজন বিদেশী বিখ্যাত পণ্ডিত রয়েল সোশাইটির আমন্ত্রণে বিলাতে আসেন। সেখানে সোসাইটির সভাপতি তাঁহাকে একটি জনসভায় আপ্যায়িত করেন। কেভেনডিসকে বিশেষ করিয়া সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। কারণ বিদেশী পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। কেভেনডিস্ সভায় উপস্থিত হইয়া যখন জানিতে পারিলেন যে পণ্ডিতবর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত তখন তিনি মহা বিপদে পড়িলেন, অতিথি তাঁহাকে খুঁজিতেছেন জানিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে জনতার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং কোন ক্রমে একটু রাস্তা করিয়া দ্রুত নিজ গাড়িতে যাইয়া উঠিলেন এবং গাড়োয়ানকে বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন।

কেভেনডিস্ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন এবং তাঁহার চেহারায় কোন লালিত্য ছিল না। তাঁহার পোষাকে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি চিরদিন পূর্ব্বপুরুষদের পুরাণো কোট প্যান্ট ও ও ত্রিকোণাকার টুপি পরিধান করিতেন। তিনি থামিয়া থামিয়া কথা বলিতেন এবং তাঁহার গলার স্বর একটু কর্কশ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না এবং কদাচিৎ কোন ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইতেন। একবার তিনি চারিজন রয়েল সোসাইটির সভ্য তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হন। এ সংবাদ পাইয়া ভৃত্য জিজ্ঞাসা করে "হুজুর, আজ কি খাবার তৈয়ার করিব?" উত্তর হইল "কেন? বরাবরের মত একটি ভেড়ার পা।" ভৃত্য বলিল "ইহা দ্বারা পাঁচ জনের হবে না।" কেভেনডিস্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "আচ্ছা! যদি না হয় দুইখানা পা লও।" এই গল্প হইতে পণ্ডিত মহাশয়কে কৃপণ বলা ভুল। মনে হয় তিনি এ পৃথিবীর লোক ছিলেন না, একজন লোকের পক্ষে কতটুকু খাবার প্রয়োজন হয় তাহা পর্য্যন্ত তিনি জানিতেন না। একমাত্র গবেষণার বিষয় বস্তু ছাড়া তাঁহার মন কিছুতেই অপর বিষয়ে প্রবেশ করিত না।

উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার নিকট হইতে খুব বেশী অর্থ তিনি পান নাই। কিন্তু তিনি জীবনে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কোন্ সূত্র হইতে এত অর্থ আসিল কেহই বলিতে পারেন না। শুনা যায় মৃত্যুর সময় ব্যাঙ্কে তাঁহার ১,৫০০,৩০০ পাউণ্ড গচ্ছিত ছিল এবং সে সময় ব্যাঙ্কে এত অধিক অর্থ কাহারও ছিল না। কেভেনডিস্ কোন দিন নিজ অর্থ ব্যবহার করেন নাই এবং গচ্ছিত অর্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ছিলেন। একবার ব্যাঙ্ক-মালিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনার বহু অর্থ আমাদের ব্যাঙ্কে অকেজো পড়িয়া আছে, তৎসম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা করিতে চান জানাইলে সুখী হইব।" কেভেনডিস্ উত্তর করিলেন "আমাকে বিরক্ত করিবেন না, আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। বেশী বিরক্ত করিলে সমস্ত টাকা আপনার ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া আনিব।" ব্যাঙ্কার ত অবাক্!

তিনি ভাবিলেন এ আবার কিরূপ অদ্ভুত মানুষ, নিজ অর্থ সম্বন্ধে খেয়াল নাই! তিনি ভয়ে ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিলেন। এ ঘটনা হইতেও কেভেনডিসকে কৃপণ সাব্যস্ত করা অনুচিত। বরং তাঁহার অদ্ভুত নির্লিপ্ততার প্রশংসা করাই বিধেয়।

কেভেনডিসের তিনখানা বাড়ী ছিল। গাওয়ার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বর্ত্তমানে একটি স্মৃতি-ফলক লাগান হইয়াছে। ডিন্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে একটি প্রকাণ্ড গবেষণাগার আছে। এ দুইটি ছাড়াও ক্লাপহামে তাঁহার একটি বাড়ী ছিল। ইহা ছিল তাঁহার প্রিয়তম আশ্রয়। এ বাড়ী তাঁহার ভূরি ভূরি গবেষণার ভার বহন করিয়া ধন্য হইয়াছে।' সম্পূর্ণ বাড়ীই যেন একটি যজ্ঞক্ষেত্র ছিল। যাঁহারা এ বাড়ীতে গিয়াছেন তাঁহারা বলেন এ বাড়ীতে প্রবেশ করিলে দেখা যায় সমস্ত বাড়ীটি যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ, কোথাও এমন স্থান নাই যেখানে একটী লোক নিরালা বিশ্রাম করিতে পারে। কেভেনডিস কোথায় বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, কোথায় শয়ন করিতেন বুঝিয়া উঠা ভার।

১৭৬০ খৃঃ কেভেনডিস রয়াল সোসাইটীর ক্লাবের সভ্য হন। ক্লাবটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কদাচিৎ তিনি সেখানে যাওয়া বন্ধ করিতেন। দেখা যাইত দৈব-দুর্বিপাকে যখন বহু সভ্য অনুপস্থিত তখনও ইনি উপস্থিত আছেন। এমন কি যেদিন দুইজন উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও তিনি একজন। ক্লাবের পুরাতন বইগুলি হইতে এ সমস্ত খবর পাওয়া গিয়াছে। তিনি সেখানে রোজ রোজ উপস্থিত হইতেন বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তিনি বন্ধুত্বে মজিয়াছিলেন। তিনি সেখানে যাইতেন, আহার করিতেন, চুপচাপ নিজ মনে বসিয়া থাকিতেন।

কেভেনডিস-জীবনে কদাচিৎ বিদেশে গিয়াছেন। মোটামুটি তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। তিনি বাঁধাবাঁধি কয়েকটি অভ্যাসের দাস ছিলেন। চিরদিন একই স্থানে তাঁহার টুপিটী ঝুলিত। বুট জুতা খাওয়ার ঘরের দরজায় হেলান থাকিত, যষ্টিটি ঠিক জুতাজোড়ার উপরে রক্ষিত হইত; কোন দিন ইহার ব্যত্যয় দেখা যায় নাই। অনেকের ধারণা তিনি খুব সুখী ছিলেন না। কিন্তু একথা সত্য কিনা জানি না। তিনি নিয়ত একই ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, সম্ভবতঃ ইহাতেই তাঁহার সুখ ছিল। দুনিয়ার গতানুগতিক স্ফূর্ত্তির কথা কোন দিন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। গান, বাজনা, থিয়েটার প্রভৃতির আয়োজন কোন দিন তাঁহার প্রাণে সাড়া দেয় নাই, তাঁহার মন এক অজানিত রাজ্যে বিচরণ করিত। কেভেনডিসের মধ্যে কোনদিন হিংসাদ্বেষ স্থান পায় নাই। তিনি কোনদিন নিজ গবেষণার বিষয় নিয়া অপরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক বা তুলনামূলক আলোচনায় অবতীর্ণ হন নাই। অপরের দোষত্রুটি দেখিবার তাঁহার অবকাশ কোথায়? আপনভোলা মানুষ—নিজ কর্ম্মে সদা মগ্ন।

চিরকুমার আত্মভোলা কেভেনডিস কোনদিন নিজ ছবি তুলিবার আগ্রহ দেখান নাই। এমন কি বহু চিত্রকর তাঁহাকে একান্ত অনুরোধ করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তাঁহার একটি প্রতিকৃতি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (British Museum) আছে। তদানীন্তন রয়েল সোসাইটীর সভাপতি মিঃ জোসেপ্ ব্যাঙ্কের (Joseph Bank) চেষ্টায় ইহা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছিল। সেদিন ব্যাঙ্ক সাহেব কেভেনডিসকে অনেকক্ষণ ভোজসভায় বসাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং গোপনে চিত্রকর আলেকজাণ্ডারের দ্বারা কাজ করাইয়াছিলেন।

কেভেনডিস-জীবনের শেষ দিনটী অতীব

চমৎকার। শুনা যায়, সেইদিন তিনি নিজের মৃত্যুদিন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি চাকরটিকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি আমার নিকট আসিও না, আমি একটী বিশেষ চিন্তায় মগ্ন আছি।" বুদ্ধিমান চাকর কিন্তু প্রভুর অন্তিমকাল যে আসন্ন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে অনতি-বিলম্বে ডাক্তার হোমকে প্রভুর অবস্থা জানাইয়া আসিল। হোম সাহেব সেদিন সমস্ত রাত্রি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত কেভেনডিসের নিকট অতিবাহিত করেন। ভোরবেলা তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

কেভেনডিস মনুষ্যসঙ্গ পরিহার করিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে পাগল বা কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যে ব্যক্তি দিবারাত্র একধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার কি কখনও দ্বিতীয় সঙ্গ ভাল লাগে? জীবনের সাধনাই তাঁহার একমাত্র সঙ্গী; লাজুক ভাব বা লোকসঙ্গবিমুখতা ঐ একান্ত সাধনারই অঙ্গ। বরং ইহা না থাকিলে তিনি অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেন। আমাদের দেশের উচ্চ সাধকগণ অনেকটা এই পাগলা বৈজ্ঞানিকের মত জীবন যাপন করিতেন। নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত অথচ কর্ম্মময় তাঁহাদের জীবন। পাশ্চাত্য অর্থকরী জড়বিদ্যা দ্বারা এ মহান্ আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

কেভেনডিসের গবেষণার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তিনি যেন কোন এক অজ্ঞাত শক্তির আজ্ঞাধীন ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুতের সঙ্গে কারবার করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর ঘনত্ব, জলের যৌগিকত্ব ও গঠন, তেজের মাপকাঠি, ও মরুতের উপাদান ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের চারিটী মৌলিক তাঁহার হাতের ক্রীড়নক হইয়া বিশ্বমাঝে গবেষণার তরঙ্গ-সৃষ্টি করিল। আজও তাহা ক্রিয়াশীল আছে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপ্রতিমা রায়, বি-এ

জাগিলে হে জ্যোতির্ময় শতবর্ষ আগে,
ভারতের পূর্বাচলে নবরশ্মি-রাগে।
সে দেবশিশুরে হেরি উদয়ের পথে
ধন্য হোল বসুন্ধরা। পুণ্য-মহাব্রতে
জাগিল ভারত-ভূমি আর একবার
মহাঘুম-ঘোর হতে। ধ্বনিল ওঁঙ্কার-
ধ্বনি শঙ্খধ্বনি মাঝে। জয় জয় রবে
ভরিল আকাশ, অবতীর্ণ রামকৃষ্ণ যবে
নরদেহে। অনন্তের অঙ্কসীমা কাটি
ভূমিষ্ঠ ভূমার স্বামী। অঙ্গে ধূলামাটি
মাখি গৌরতনু খেলিতে সবার সনে।
গৈরিক ভূষণ তব কে জানিত মনে?
কে জানিত শিশুরূপে নারায়ণ আসি
ঘোষিবে মুক্তির বাণী? অন্ধকার নাশি
উন্মুক্ত হইবে বিশ্বে আর এক জগৎ,
সেথায় সুন্দর যাহা, যা কিছু মহৎ।
মহান পুরুষ সেথা প্রভু মহাপ্রাণ
জাগিবেন, করিবেন জ্ঞান-রশ্মি দান
অজ্ঞান মানবকুলে। নিরক্ষর ভাবী,
তবু সেই পদ-প্রান্তে বিজ্ঞজন আসি
দিলো ভক্তি হৃদয়ের অনুরাগে ভরি।
বিজ্ঞান ও বিদ্বানের দর্প চূর্ণ করি
প্রচারিলে শুদ্ধা ভক্তি নিষ্কাম সাধন
বিবেক বৈরাগ্য-রাগে পূর্ণ অনুক্ষণ।
তব মহিমার দ্যুতি জ্বলন্ত ভাস্বর
জ্বলিছে অনন্ত লোকে। যা কিছু নশ্বর,
তাই শুধু মুছে গেছে, মিশে গেছে শেষে
দেহমুক্ত আত্মা যেথা ধ্রুব-অঙ্গে মেশে!
হে যুগ-দেবতা, লহ প্রণাম আমার
ভক্তি-উৎসে হৃদয়ের খুলে দাও দ্বার,
মুছে গিয়ে কলুষিত জগতের গ্লানি
প্রচারিত হোক বিশ্বে রামকৃষ্ণ-বাণী।

ভারতের রাজনীতি

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

সৃষ্টি ও স্থিতি পরস্পরসাপেক্ষ - একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই জগৎ-সৃষ্টির সঙ্গেই উহার রক্ষার ব্যবস্থার জন্য রাজা বা রাজশক্তির সৃষ্টি হইল এবং রাজশক্তিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রয়োজন হইল রাজনীতির।

রাজা লোকরক্ষক। সৃষ্টিরক্ষার জন্য রাজশক্তির উৎপত্তি। রাজার কর্ত্তব্য দুইটি – দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। দুষ্ট-দমনের জন্য ভেদ ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ এবং শিষ্টের পালনের জন্য সাম ও দানের ব্যবস্থা মনীষীরা করিয়াছেন।

কিন্তু চারিটি নীতির মধ্যে দণ্ডেরই প্রশংসা ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বেশী দেখা যায়। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—'দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা', 'রাজা শত্রুকে যুদ্ধে হত্যা করিবেন', 'দুষ্টকে নিগ্রহ করিবেন' ইত্যাদি।

কৌটিল্য বলিয়াছেন—"দণ্ডনীতির অভাব হইলেই ত্রিবর্গের অভাব হয়, আর দণ্ডনীতির প্রয়োগকৌশল জানা থাকিলে সকল সম্পদ লাভ করা যায়।" কামন্দকও তাঁহার নীতিসারে বলিয়াছেন—"একমাত্র রাজার দণ্ডই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যথানিয়মে প্রদান করিতে পারে। দণ্ডের অভাবে লোকগুলি মারামারি করিয়া মৎস্য-নীতি অনুসরণ করে। দণ্ডের ভয় আছে বলিয়াই বিষয়াসক্ত এবং স্ত্রী ও ধনলোভী মানুষ সাবধানে চলে।" মনু বলিয়াছেন—"রাজা যদি দণ্ড-বিধান না করেন, বলবানেরা দুর্ব্বলকে অতিশয় যাতনা দিয়া থাকে।" শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—"হিংসাকারীকে হিংসা করিবে, আততায়ীকে বধ করিবে যদি তিনি গুরুও হন।"

কিন্তু দণ্ডনীতির অযথা প্রয়োগে ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হয়। মনু বলিয়াছেন—"অন্যায়ভাবে দণ্ডনীতির ব্যবহারে রাষ্ট্রের পীড়া জন্মে ও প্রজাবিদ্রোহাদি নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন-"রাজকার্য্যে নিযুক্ত পাপবুদ্ধি ভৃত্যবর্গ লোভবশতঃ অন্যায়ভাবে প্রজার ধন অপহরণ করিলে রাজা তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবেন।" চাণক্যসূত্রে বলা হইয়াছে—"প্রজাবিদ্রোহের মত বিপদ নাই।" কামন্দকীয় নীতিসারেও উক্ত হইয়াছে—"প্রজার উৎপীড়নে অধর্ম্মের উৎপত্তি এবং তাহা হইতে রাজার ধ্বংস অনিবার্য্য।" অতএব বুঝা গেল, দণ্ডনীতির সুষ্ঠু পরিচালনা অত্যাবশ্যক।

অযথা দণ্ডনীতির ব্যবস্থা হইলে প্রজাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও নীতিশাস্ত্রের উপদেশ রহিয়াছে। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন "যে দেশে রাজা অত্যাচারী, অবিচারক, উৎপীড়ক, মূর্খ, অনাচারী এবং পক্ষপাতদুষ্ট-মন্ত্রি-বেষ্টিত, যেখানে বিদ্বানেরা সৎপথভ্রষ্ট, সাক্ষীরা মিথ্যাবাদী, দুরাত্মা ও নীচাশয় ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্যে যেখানে ধন, মান, প্রাণ কিছুই নিরাপদ নয়, সে দেশ পরিত্যাগ করিবে, অথবা প্রজাবর্গ প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ছলে, বলে, কৌশলে এজাতীয় রাজশক্তির অবসান ঘটাইবে।" মনে হয় এতন্মধ্যে দ্বিতীয় ব্যবস্থাই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ অবলম্বনীয়।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসন-কাল অতিক্রান্ত হইবার পর বিরাটগৃহে রাজন্যবর্গের সভার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে সাত্যকি বলিয়াছিলেন—"যাহারা অন্যায়ভাবে অপরের

সম্পত্তি হরণ করে, সে সম্পত্তি তাহাদের হইতে পারে না। দুর্য্যোধন প্রতারণা ও শঠতা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের যে পৈতৃক রাজ্য হরণ করিয়াছে, এখনও তাহা স্বতঃই যুধিষ্ঠিরেরই আছে। দুর্য্যোধন যদি আপসে তাহা ফিরাইয়া দিতে না চায়, তাহাকে বধ করিয়া তাহা কাড়িয়া লইতে হইবে। আততায়ি-বধে অধর্ম্মের লেশ ত নাই-ই, বরং বাক্ষ্যাতে পাপ আছে।" মগধরাজ দ্রুপদ এই উক্তির সমর্থনে বলিয়াছেন—"দুর্জ্জনদিগের প্রতি মৃদু ব্যবহার করিলে তাহারা সব সময়ই আরও নির্য্যাতন করে। দুর্জ্জনের সঙ্গে সমুচিত ব্যবহারই সঙ্গত। এমন কি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বলে পরাজিত করিতে না পারিলে ছলের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।" শ্রীকৃষ্ণও এই উক্তির সমর্থনে বলিলেন—"যে রাজা শঠতাপূর্ব্বক অন্যের রাজ্য হরণ করে, তাহাকে চোর বলা চলে। কাজেই যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন (করিয়াও) পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধারে কৃতনিশ্চয় হওয়া একমাত্র ধর্ম্ম।"

উদ্যোগপর্ব্বের অন্যত্র বিদুর এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যে যেমন ব্যবহার করে, তাহার প্রতি ঠিক অনুরূপ ব্যবহার করাই উচিত। শঠের সঙ্গে শঠতা এবং সাধুর সঙ্গে সাধু ব্যবহার করিবে। বধার্হ ব্যক্তি বশীভূত হইলেও ক্ষমা করিবে না।" ঐ পর্ব্বেই ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—"যাহারা অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মের বিনাশক, তাহাদের অবিলম্বে বধ করা উচিত। একটি লোক বিনষ্ট হইলে যদি একটি কুল রক্ষা পায়, কিংবা একটি কুলের ধ্বংস হইলে যদি দেশে শান্তি স্থাপিত হয়, তবে তাহাই করা উচিত।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় স্পষ্টতঃ বুঝাইয়াছেন যে, দেশ ও লোক রক্ষার্থ গুরুজনবধেও পাপ নাই। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২০৮শ অধ্যায়ে ধর্ম্মব্যাধ কৌশিককে বলিয়াছেন—"মিথ্যাই কি, আর সত্যই কি, হিংসাই কি, আর অহিংসাই কি—যাহা জনসাধারণের হিতকর, তাহাই সত্য ও ধর্ম্ম।" মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্বে দ্রৌপদী-হরণকালে যখন ভীম ও অর্জ্জুনের হস্তে জয়দ্রথ বন্দী হন, তখন যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিতে বলায় দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"যাহারা ভার্য্যা বা রাজ্য হরণ করে তাহারা শরণাগত হইলেও বধার্হ।" যখন যুধিষ্ঠির সন্ধির প্রস্তাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দুর্য্যোধনের নিকট যাইতে বলিলেন, তখন দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—"মধুসূদন, ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা করায় আমার মনে হইতেছে—আমার পতি, পুত্র, ভাই কেউ নাই, এমন কি তুমিও নাই।" বনপর্ব্বের ২৮শ অধ্যায়ে দ্রৌপদী প্রহ্লাদের একটি নীতি-উপদেশের কথা স্মরণ করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"নিরন্তর ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তির কখনও মঙ্গল নাই। আবার সব সময় অক্ষমা করিলে চলে না।" শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল—এসব রাজ্যসম্পর্কীয় অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন, আর মিত্রই হউন, তাঁহার বিনাশ-সাধন একান্ত কর্ত্তব্য।"

কামন্দক তদীয় নীতিসারে বলিয়াছেন—"যাহারা স্বভাবতঃ অধার্ম্মিক, লুব্ধ ও সত্যের অপলাপকারী, তাহারা অনার্য্য। অতএব এসব অনার্য্যকে অগোণে বধ করা উচিত।" মনু বলিয়াছেন—"শত্রু-বিনাশের জন্য বকের ন্যায় উপায় চিন্তা করিবে, সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ করিবে, নেকড়ে বাঘের মত ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবে এবং শশকের মত দ্রুত পলায়ন করিবে।" শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—"ততক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুকে মাথায় করিয়া রাখিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যায় সে আমাপেক্ষা বলবান;

কিন্তু যখনই মনে করিবে, সে হীনবল হইয়া পড়িতেছে,' তখনই পাষাণে মাটির কলসী ভাঙ্গার মত তাহাকে বিনষ্ট করিবে।"

এই সব গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল ভারতীয় রাজনীতিতে মার খাইয়া হজম করিবার উপদেশ কোথাও নাই। পৃথিবীর কোন ইতিহাসেই বোধ হয় নাই যে আঘাত ব্যতীত শত্রুর হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাপুরুষই প্রথমে চাহিয়াছিলেন দুর্য্যোধনের সহিত মৈত্রীর মধ্য দিয়া শত আঘাত সহ্য করিয়া ও আপস-নিষ্পত্তি দ্বারা শান্তি বজায় রাখিতে। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন, বামদেব ঋষি তদীয় অশ্বহরণের জন্য *শালরাজকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পরশুরাম পিতৃ-বধের* প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ হিংসার আশ্রয় লইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, জমদগ্নি গোহরণে উদ্যত কার্ত্তবীর্য্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অতএব শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনেও মানুষের পক্ষে যে কোন অবস্থাতেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া পাপ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় কঠোরহস্তে দণ্ডধারণই মানুষের ধর্ম্ম। এই মনুষ্য-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মৃত্যুবরণও শ্রেয়ঃ। ইহাই সর্ব্বকালে ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও গার্হস্থ্যধর্ম। ইহার ব্যত্যয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাদিতে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

৺স্বামী অচলানন্দ

বিবেকানন্দ সঙ্ঘের কর্ম্মীদের উদ্যোগে আজ যে যুগাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের একাশীতিতম শুভ জন্মতিথি উৎসবের আয়োজন হয়েছে তা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্বামীজীর জীবন-কথা কিছু বলবার জন্য তোমরা আমায় অনুরোধ করেছিলে, কিন্তু আমার বলা-কওয়ার তেমন অভ্যাস নেই, তাছাড়া আমার শরীরও অপটু; তাই আমার সামান্য বক্তব্য দুচার কথায় লিখে পাঠালুম।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ছেলেদের বড় ভালবাসতেন, তাই তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত আমরাও ছেলেদেরখুব ভালবাসি এবং তাদের কোন সদনুষ্ঠানের চেষ্টা উদ্যোগ দেখলে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হয়। সে কারণেও তাঁহার অনন্ত উপদেশ ও উৎসাহবাণীর দুচারটী তোমাদের বলতে ইচ্ছা হয়েছে। অবশ্য তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও প্রচণ্ড কর্ম্মময় জীবনের বিস্তারিত আলোচনা এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। সেই জন্য তাঁর উপদেশ থেকে তোমাদের উপযোগী কয়েকটী কথা বলবো।

তিনি বলতেন—"Purity is the place of mercy". অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পবিত্র হতে পারলে তবে ভগবানের কৃপা লাভ হয়। কায় অর্থাৎ শরীরের দ্বারা সৎ বা পবিত্র কাজ করা, মনের দ্বারা সৎ চিন্তা করা এবং মুখে সত্য কথা বলা। ইহাই চরিত্র-গঠনের মূলমন্ত্র জানবে। এই চরিত্র গঠন করতে হলে তার মধ্যে মনটীও সুদৃঢ় ও সতেজ হবে। ইংরাজীতে একটী কথা

আছে—"Sound mind in a sound body" অর্থাৎ সুস্থ ও সবল শরীরে সতেজ ও সুদৃঢ় মন বাস করে। তোমরা তোমাদের এই সঙ্ঘের মধ্য দিয়া খেলা-ধূলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে শরীরচর্চ্চা করছো, খুব ভাল কথা। কিন্তু এই শরীরচর্চ্চার দ্বারা সেই পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করে পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র হতে হবে এইটী যেন মনে থাকে।

স্বামীজী বল্‌তেন, "Heaven will be nearer to you through the football than through the Geeta." অর্থাৎ গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেল্‌লে শীঘ্র ভগবানের কাছে যেতে পারবে। একথার মানে এই নয় যে, গীতা পড়বার দরকার নেই, কেবল ফুটবল খেললেই চলবে। একথার ভাব হচ্ছে যে, খেলা-ধূলা ব্যায়ামাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট করে তারপর ধর্ম্মচর্চ্চা করলে ফল ভাল হয়। দেখছো তো ভারতবাসী কিরূপ কর্ম্মবিমুখ ও অলস হয়ে পড়েছে। সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে মহাতমে সকলে ডুবে গেছে। অবশ্য যুবকদলের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া এসেছে বটে; কিন্তু সে নিতান্ত কম। জাগরণ আরো শত সহস্র গুণে বেশী প্রয়োজন। তাই স্বামীজী এই দেশের মধ্যে রজোগুণের প্রবল প্রেরণা আনতে চেয়েছিলেন এবং সেই কঠিন দায়িত্ব তোমাদের মত তরুণ দলের উপর দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর পত্রাবলী পড়ে দেখবে কি কঠিন দায়িত্ব তিনি তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করে গিয়েছেন। তাঁর উপদেশের একটাও যদি কাজ করে দেখাতে পারো তো তোমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে এবং তোমাদের এই উৎসব করাও সার্থক হবে। Theory, lecture, আলোচনা, চর্চ্চা এসব যথেষ্ট হয়েছে —এখন ওসবের দিকে ততটা নজর না দিয়ে যাতে তোমরা কাজে কিছু করে দেখাতে পারো তার চেষ্টা করো। স্বামীজীও বল্‌তেন—"মুখকে বিরাম দাও, কাজ কথা বলুক।"

স্বামীজী ত্যাগ ও সেবার মহিমা শতমুখে বর্ণনা করতেন। এই ত্যাগ মানে, মাত্র এই জাগতিক ভোগ-সুখ বা ধনসম্পদ ত্যাগ করা নয়। এতো বটেই। এ ছাড়া দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, অভিমান এসব ত্যাগ করতে হবে। অহঙ্কার, অভিমান, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অন্তঃকরণের নীচ বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়ে তোমাদের সঙ্ঘের সকলকে অকপটে ভালবাসতে হবে। তারপর এই ভালবাসার গণ্ডী বাড়াতে বাড়াতে নিজ নিজ পল্লী, শহর, ক্রমশঃ সমগ্র দেশকে ছেয়ে ফেল। সকলকে আপনার করে নাও। কেউ পর না থাকে। তবেই তোমাদের ভেতর থেকে দেশ-সেবার ও জন-সেবার প্রকৃত প্রেরণা আসবে। সকলকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারলেই স্বামীজীর "শিব-জ্ঞানে জীব-সেবার" অর্থ ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে। ঐ শোন তিনি তোমাদের ন্যায় তরুণদের আহ্বান করে বলছেন—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ কর সখে এসবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামীজীর আর একটী কথা "Education is the manifestation of the perfection already in man." অর্থাৎ মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা রয়েছে তার বিকাশ করাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। তোমরা সব বিদ্যার্থী, তাই তোমাদের বলছি যে তোমাদের সকল-প্রকার শিক্ষা, দীক্ষা ও কার্য্যকলাপ যেন সেই পূর্ণতা বিকাশের সহায়ক হয়। আমাদের সকলের

ভিতরই সেই অনন্তশক্তিশালী চৈতন্য রয়েছেন। তোমাদের অন্তরে সেই চৈতন্য-শক্তি উদ্বুদ্ধ হ'ক। সেই সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হ'ক। তোমাদের সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা চিরতরে অন্তর্হিত হ'ক।

উপসংহারে ভগবান্ যীশুর একটী কথা তোমাদের বল্‌ছি, তিনি বলেছেন, "Blessed are those who have not seen me but believe me." অর্থাৎ যারা ভগবান্ যীশুকে দেখেনি অথচ তাঁকে বিশ্বাস করে তারা ধন্য। তোমরাও শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ-জীকে দেখ নাই বটে কিন্তু তাঁর প্রতি তোমাদের যে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়েছে ইহা অতি ভাগ্যের কথা জানবে। তোমাদের এই ভক্তি বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হ'ক। তোমাদের আর কি বেশী কথা বলবো! আজ এই পুণ্য তিথিতে পুণ্য দিনে আমি সেই মহামানবের শ্রীচরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন তাঁর অপার কৃপায়, অমোঘ আশীর্ব্বাদে এই সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে তোমাদের প্রত্যেকে তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ জীবন গঠন করতে পারো। তোমরা ধন্য হও এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও দশের কল্যাণ করো।

ওঁ তৎ সৎ

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

প্রাচীন পাটলীপুত্র শহর এক সময় ছিল এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইহার চতুর্দ্দিকে—পূর্ব্বে দক্ষিণে উত্তরে পশ্চিমে বিশেষ করিয়া পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নগরীর পচিশ ক্রোশের মধ্যে ভগবান তথাগতের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি একটির পর একটি দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার রবিসদৃশ প্রখর জ্যোতিঃ অমিততেজা সম্রাটগণকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। কেই বা তাঁদের স্মরণ করে? তাঁহাদের অনেকেই আজ হয় বিস্মৃত, নয় অর্দ্ধবিস্মৃত। ইহাই হইল এ দেশের বৈশিষ্ট্য। গগনস্পর্শী প্রাসাদ ও অতি মনোরম শহরের ধ্বংস স্তূপ একের ওপরে আর এক দণ্ডায়মান থাকিয়া সহস্র বৎসরের ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে—তাহার মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখা যায় একস্থানে অতি সযত্নে রক্ষিত নগরবাসীদের প্রাণের জিনিষের ন্যায় একটি শিলালিপি—সম্রাট ধর্ম্মাশোকের এই লিপি ভগবান তথাগতের জীবন ও বাণীকে সমগ্র দেশবাসীর সামনে রাখিয়া সকলকে তাহা অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। আবার দেখা যায় দূর দূরান্তরবর্ত্তী গ্রামে কোন প্রতিবেশীর চালায় অথবা বৃক্ষতলে সমবেত দলে দলে লোক ভগবান রামচন্দ্রের ও জনকনন্দিনী সীতার তুলসীদাসী রামায়ণে লিখিত অমর গাথা শ্রবণ করিতেছে, আর রাজা রামচন্দ্রের ও নারীজাতির আদর্শ জনকনন্দিনী সীতার জয়ধ্বনি করিতেছে। কখনও দেখা যায় ভাগীরথীর বা শোণ-গণ্ডকের তীরে অথবা নিবিড় বনানীর ক্রোড়ে কোনও সাধু চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানে বিভোর হইয়া পারিপার্শ্বিক জগৎ ভুলিয়া বিশ্বনাথের ভাবে ডুবিয়া আছেন। সে ভাব অচিন্ত্য ও অব্যক্ত —মলিন মন দিয়ে বোঝান যায় না, তাই

অচিন্ত্য, মলিন বুদ্ধির অগোচর, তাই অব্যক্ত।

কখনও একখানি পুঁথি বা পুস্তক হাতে আসে—পড়িলে দেখা যায় উহা এক উচ্চতম দার্শনিক গ্রন্থ—পূর্ব্বমীমাংসা বলিয়া পরিচিত—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, যজন, যাজন ইত্যাদি বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার। ভাগীরথীর উত্তর পারে কিঞ্চিৎ দূরে যেখানে মা জানকীর পিতা মহারাজা জনক রাজত্ব করিতেন—সেই মিথিলা এ সকল পণ্ডিতদিগের বাসভূমি ছিল, তাই তাহা ভারতের বিদ্বান্‌গণের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের স্থান। এই পূর্ব্বমীমাংসাকে ভিত্তি করিয়াই 'ন্যায়' ও 'বেদান্তের' উদ্ভব। বাঙ্গলার পণ্ডিতমণ্ডলী করিয়াছিলেন ন্যায়ের প্রসার, আর উত্তরখণ্ডের সাধুমণ্ডলী প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত করিতেছেন বেদান্তের প্রচার। গয়া ও পাটনার মধ্যবর্ত্তী স্থান যাহা প্রাচীনকালে মগধ বলিয়া পরিচিত হইত এবং গভীর অরণ্যসমাচ্ছন্ন ছিল তাহার নিবিড়তম প্রদেশে কোনও গিরি-গুহার অথবা কোনও পর্ণকুটীরে তখনও দেখা যাইত কোনও যোগী—যোগিরাজ অবতারকল্প পতঞ্জলিনির্দ্দিষ্ট সাধন অবলম্বনে অন্তর্জ্যোতি পরমেশ্বরের সাযুজ্য লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় রত। মহর্ষি কপিল-প্রচলিত সাংখ্যমতকে ভগবান পতঞ্জলি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুভূতিসহায়ে সাধনার আকার দান করেন। যাবতীয় দর্শন মিলিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বেদান্তে।

এই সকল অবতার, ঋষি ও পণ্ডিতের দেশের পরিচয় আজও পাওয়া যায় তাহার সরল চিন্তাশীল ও সর্ব্ব বিষয়ে সাবধান লোকদের মধ্যে। একদিকে ব্যাস, জৈমিনি, পতঞ্জলি, কপিল ও কণাদ, আর এক দিকে শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে মহান করিয়া তুলিয়াছেন, আর ইঁহারা সকলেই তাঁহাদের অনুপ্রেরণা অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার মহান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এই বেদের উপরই ভারতের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দণ্ডায়মান। বেদ কোনও যুগে কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় নাই। এই বেদ হৃদয়ের গ্রন্থিকে মুক্ত করিয়া মনকে বিশাল ও উদার করিয়া কেবল সত্যকেই তাহাদের মধ্য দিয়া ঘোষণা করে। এই কারণে যখন প্রাচীনকালে খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও জরথুস্ত্রের মতাবলম্বিগণ এই দেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন তখন বেদ তাঁহাদের মতের কোনরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় নাই। বেদ-মতাবলম্বিগণ তাঁহাদিগকে ভ্রাতার ন্যায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবাগতগণ এই দেশের জনগণের সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা ইঁহাদের সহিত একজাতি হইয়া গিয়াছিলেন। বেদ-মতাবলম্বী সরল ধর্ম্মপ্রাণ জনগণের আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আর বেদ তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সচেতন করিয়াছিল।

কয়েক শতাব্দী যাবৎ মনে হইতেছিল যেন তাঁহাদের সে শক্তি ক্ষীণ ও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আবার দেখা যাইতেছে তাহা আবির্ভূত হইতেছে, ইহা এদেশের নরনারীর মধ্যে পুনঃ জাগ্রত। তাঁহারা এখন জাগিতেছেন যাবতীয় সঙ্কীর্ণতা দৈন্যদশা পরিহার করিয়া জাগিতেছেন। এই জাগরণের মুখে তাঁহারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য হারান নাই। ভক্তিপ্রবণতা সরলতা উদারতার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত। কোনও কোনও স্থলে কোন বিশেষ ক্রিয়ার জন্য বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে কিন্তু ভারতের বিশাল গণ-শরীরকে তাহা বিশেষ স্পর্শ করিতেছে না। অতীতের ভারত বর্ত্তমানে নাই, বর্ত্তমানের ভারত ভবিষ্যতে থাকিবে না।

আজ যাহা দেখা যাইতেছে কাল তাহা থাকিবে না। ভবিষ্যতে দেখা যাইবে এই জনগণ কন্যাকুমারী হইতে পেশোয়ার ও করাচী হইতে চট্টগ্রাম অবধি এক অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে; যেন একই সংসারে সকলে মিলিত ভাবে বাস করিতেছে। সেই গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতের সৌহার্দ্দ্য লাভ করিবার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাবতীয় দেশ হস্ত প্রসারিত করিবে। এই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু পূর্ব্বে ইহা সম্ভব করিয়াছিল, আবার তাহাই সম্ভব করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রম—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের (সন ১৯৪৪-৪৬) কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-ক্ষেত্র বোম্বাই নগরী সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বভৌম উদার বাণী-প্রচারের উপযোগী স্থান। রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখা-কেন্দ্রটি গত ২৪ বৎসর যাবৎ পশ্চিম-ভারতের এই সমৃদ্ধ নগরী, উহার উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং সমগ্র প্রদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করিয়া আসিতেছে। আলোচ্য বর্ষ-ত্রয়ে এই কেন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টা ধর্মপ্রচার, শিক্ষা-বিস্তার ও দাতব্য-চিকিৎসা—এই তিনটি বিষয়ে প্রধানতঃ নিয়োজিত ছিল। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী এবং তাঁহার সহকারী স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী বোম্বাই নগরী ও ইহার উপকণ্ঠের বিভিন্ন স্থানে মোট ৬১১টি ধর্মালোচনা-সভায় শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন। আলোচনার বিষয় ছিল প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বেদান্ত-দর্শন, উপনিষৎ, শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র, পঞ্চদশী, সনাতন ধর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম ও দর্শন। এতদ্ব্যতীত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন শহরে, মাদ্রাজ, কলম্বো, কলিকাতা, শিলং এবং পূর্ববাঙ্গালার অনেক স্থানে মোট ১৪৬টি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। বেলুড় মঠের স্বামী শর্বানন্দজী, স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দজী, স্বামী কৈলাসানন্দজী, স্বামী শাশ্বতানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, প্যারিস বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী প্রভৃতিও জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও বিভিন্ন ধর্মের মহত্তম আচার্যগণের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের জীবন-বেদ ও বাণী আলোচিত হইয়াছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রসারকল্পে আশ্রমে একটি গ্রন্থাগার ও সাধারণ পাঠাগার পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারটিতে ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস সমাজনীতি সম্বন্ধীয় ৩৭৮৪ খানা পুস্তক আছে। সাধারণ পাঠাগারে ইংরাজী সংস্কৃত বাংলা হিন্দি মারাঠী গুজরাটী তামিল মালয়ালম্ প্রভৃতি ভাষার বহু দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদসংহিতা, বুক্ অব্ নলেজ্ এবং এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা গ্রন্থাগারের মূল্যবান্ সম্পদ। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে মোট ৪২৮৩ খানা পুস্তক পাঠকগণকে পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। আশ্রমে একটি বিদ্যার্থি-ভবন আছে। ইহাতে তিন বৎসরে মোট ৫৭জন ছাত্রকে গ্রহণ করা হইয়াছিল। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রণীত 'বৈদিক প্রার্থনা' ও 'হিমালয়ের বাণী' এবং ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিন বৎসর মোট ২,৪২,১৩৭ জন রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৬ সনে আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের মোট আয় ছিল ১,৭৯,১৩০৸৫২ পাই এবং ব্যয় ১,১০,৫৯৭৲২ পাই। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যার্থি-ভবন, সাধারণ গ্রন্থাগার

এবং পাঠাগারের প্রসারের জন্য সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট অর্থ-সাহায্যের আবেদন করিতেছেন।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ— এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৮শে ফাল্গুন হইতে ১লা চৈত্র পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রয়োদশাধিক-শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে পূজা ভজন পাঠ ও হোমাদি এবং অপরাহ্ণে বিক্রমপুরের একটি কীর্তনীয়া-দল কর্তৃক রামায়ণের "মেঘনাদ" পালা গীত হয়। মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সরলভাবে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনসঙ্গীত হইলে এই দিনকার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিন সকালে পাঠ ও ভজনসঙ্গীত, মধ্যাহ্নে উক্ত কীর্তনীয়া-দলের রামায়ণের "অশ্বমেধ যজ্ঞ" পালাকীর্তন গীত হয়। বিকালে রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকা কেন্দ্রের বাৎসরিক সভা ও মিশন-বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কারবিতরণ হয়। এই সভায় এই কেন্দ্রের ১৯৪৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী সহকারী সম্পাদক পাঠ করেন। সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখাইয়া সম্পাদক মহাশয় এই সালের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন এবং বর্তমান এই দুর্যোগময় পরিস্থিতির ভিতরে সকলকেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই সর্বসাধারণের অনুষ্ঠানটীকে সাহায্য করিতে আবেদন জানান।

অতঃপর মিশন-পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের পুরস্কার-বিতরণান্তে ধর্মসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এই ধর্মত্রয়ের প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা করেন। ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা মিস্ এ জি ষ্টক ভগবান যীশুর জীবনী ও বাণী, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষা ভগিনী চারুশীলা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রীও বক্তৃতা করেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী অতঃপর সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমতী রাধার ভাবে সাধনা বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

এই আনন্দোৎসবে তিন দিনই শহরের শত শত নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্রয়োদশাধিকশততম জন্মোৎসব উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে ২৮শে ফাল্গুন পূজা হোম ও ভোগাদি হইলে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিন বালকবালিকাগণ কর্তৃক রামনাম-সঙ্কীর্তন হইলে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন। ১লা চৈত্র মিশন-প্রাঙ্গণে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় স্বামী দেবানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীযুত হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত অবনীনাথ ঘোষ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ৩রা ফাল্গুন পদাবলীকীর্তন এবং পরদিবস সমাগত

দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে চাল বিতরিত হয়। ৫ই চৈত্র কালীকীর্তনান্তে উৎসবকার্য সমাপ্ত হয়।

কিষণপুর (দেরাদুন) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৮শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজাদি অন্তে প্রায় তিনশত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১লা চৈত্র এক জনসভায় দয়ানন্দ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনন্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেলুড় মঠের স্বামী সংস্বরূপানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছেন।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ৭ই ও ৮ই চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন অপরাহ্ণে স্থানীয় ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার উকিল মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দে ও আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরদিন ভজন ও বিশেষ পূজাদি অন্তে পাঁচ হাজার নরনারী প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২৮শে ফাল্গুন পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোমাদি এবং সন্ধ্যায় ঠাকুরের পুণ্য জীবনালোচনা হয়। ১২ই চৈত্র হইতে ১৬ই চৈত্র পর্যন্ত পাঁচদিবস ব্যাপী সাধারণ উৎসবে মালদহ জেলার বিভিন্ন পল্লী এবং শহর হইতে শতশত নরনারী যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে চার দিন বাঁকুড়ার রামরসায়ন কীর্তন হয়। ২৭শে মার্চ স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী "ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়" সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৮শে মার্চ পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি হইলে মধ্যাহ্নে প্রায় দেড়হাজার নরনারী প্রসাদ-গ্রহণে তৃপ্ত হন। সন্ধ্যায় এক জনসভায় প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও স্বামী সুন্দরানন্দজী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

কাঁকুড়গাছি (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান—গত ২৮শে ফাল্গুন এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজাদি, ভজন, বৈদিক আবৃত্তি, গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ পাঠ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। ভক্তপ্রবর মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত এই জন্মতিথি-দিবসে ১০৮ প্রকার ভোগ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজভোগ-উৎসব প্রবর্তন করেন; এবারও ভোগের এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সমিতি (চোরবাগান) সমস্ত দিন কালীকীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গান করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ধাম কামারপুকুর (হুগলি) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থানে তদীয় ত্রয়োদশাধিকশততম জন্মতিথি-উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে অতি প্রত্যূষে শ্রীভগবানের শুভাবির্ভাব পল্লীরমণীগণের সানন্দ উলুধ্বনি ও শঙ্খঘণ্টানিনাদ দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছিল। নহবতের মাঙ্গলিক বাদন, শাস্ত্রপাঠ ও ষোড়শোপচারে পূজার্চনাদি উৎসবাঙ্গ ছিল। পূর্বাহ্ণ হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত সমাগত ভক্ত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রহড়া (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—৫ই চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্যন্ত পাঁচ দিন এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী

বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রথম দিবস স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ছায়াচিত্র-সহযোগে বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিবস আশ্রম-বালকগণের ব্রতচারী নৃত্য, বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, প্রফেসার কে ডি মুখার্জির ম্যাজিক এবং শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ কুণ্ডু ও রহড়া হরিসভা কর্তৃক পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তৃতীয় দিবস নগরসংকীর্তন, পূজা, হোম ও ধর্মসভার অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি মাননীয় আইন-সচিব শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার, বার্-এট্-ল, বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চটোপাধ্যায় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর প্রফেসার বিষ্ণু ঘোষ সদলবলে নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবস শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ও অন্যান্য বিখ্যাত গায়কগণের ভজনসঙ্গীত, বেলুড় মঠের বহু বিশিষ্ট সাধু এবং কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের ভক্তগণের সমাগম এবং ছাত্রগণের বাৎসরিক পুরস্কারবিতরণী সভা হয়। এই সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সভাপতি রাজস্ব বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, বালকাশ্রমের সন্তোষজনক ও ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। সমাগত সাধু ও ভক্তগণ প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। বালকাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দজীর সাদর সম্ভাষণ ও আন্তরিক আপ্যায়নে সকলেই পরম প্রীতি লাভ করেন। সন্ধ্যার পর আশ্রম-বালকগণ কর্তৃক 'ছত্রপতি শিবাজী' কৃতিত্ব-সহকারে অভিনীত হয়। পঞ্চম দিবস দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, প্রফেসর মনোরঞ্জন সরকারের হাস্যকৌতুক এবং বালকগণের সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-টি; ডি-ইডি (লীড্স্)। শ্রীমান্ বরুণেশ্বর চন্দ, কমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও জ্যোতিবিকাশ সেনগুপ্ত বক্তৃতা দেয় এবং শ্রীমান্ অজিতকুমার দাস প্রবন্ধ পাঠ করে। রাত্রিতে রহড়া শ্রীদুর্গা সম্প্রদায়ের "সরমা" যাত্রাভিনয় হইলে উৎসবকার্য শেষ হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া গত ১৮ই চৈত্র প্রাতে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৮৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পাহাড়তলী গ্রামে ডক্টর বড়ুয়ার জন্ম হয়। তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে পালিতে অনার্স সহ বি-এ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন।

চট্টগ্রামের মহামুনি এ্যাংলো-পালি ইন্‌ষ্টিটিউশনের অস্থায়ী হেডমাষ্টাররূপে এই মনীষীর কর্ম-জীবন আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সালে তিনি ভারত সরকারের নিকট হইতে সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহিত্যে ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়া ১৯১৭ সালে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১৯১৮ সালে তিনি অধ্যাপকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ সালে পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

প্রাচ্য বিষয়ে তাঁহার অসংখ্য মূল্যবান রচনাদি আছে। তিনি কিছুকাল 'ইণ্ডিয়ান কালচার', 'বিশ্ববাণী', 'বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া', 'জগজ্জ্যোতি' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছেন।

কয়েক মাস পূর্বে ডক্টর বড়ুয়া বাঙ্গালার রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য এবং সিংহলের বিদ্যালঙ্কার পরিবেন কর্তৃক ত্রিপিটকাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি সিংহলে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

ডক্টর বড়ুয়া স্বীয় রচিত "দি ফিলোসফি অব লাইফ" নামক পুস্তিকায় তাঁহার চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি নিরভিমান ও অমায়িক ছিলেন। অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। 'উদ্বোধনে' এই মনীষীর অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমরা এই বহুগুণান্বিত প্রতিভাবান্ পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত চৈত্র মাসে এই সোসাইটি-ভবনে (২১ নং বৃন্দাবন বসু লেন) শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা সভায় ধারাবাহিকভাবে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" এবং "শিবানন্দবাণী" আলোচনা করেন; এতদ্ব্যতীত তিনি দোলপূর্ণিমা দিবসে "শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার প্রেমধর্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব ধারাবাহিকভাবে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" ব্যাখ্যা এবং বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দজী "পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের জীবনকথা" সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই আশ্রমের উদ্যোগে গত চারি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ২৮শে ফাল্গুন পূর্বাহ্ণে আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হোম ও চণ্ডীপাঠ এবং সন্ধ্যায় মহিলাগণ কর্তৃক ভজন ও কীর্তনান্তে একটি সভা হয়। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুতপূর্ব জীবনী ও অমৃতময়ী বাণী সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা দান করেন। পরে আরাত্রিক, কালীকীর্তন, রামনামসংকীর্তন এবং প্রসাদবিতরণ হইলে উৎসবকার্য শেষ হয়।

বজবজ বিবেকানন্দ সংঘ—এই সংঘের উদ্যোগে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ৮ই চৈত্র প্রাতে নগর-কীর্তন, পূর্বাহ্ণে ঠাকুরের পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে ধর্মসভা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অবনী ভূষণ রুদ্র, এম-এ, পিএইচ-ডি। প্রথমে বজবজ মনোরঞ্জন সমিতি কর্তৃক ঐকতান বাদ্য, গীটার ও সেতার বাদ্য ও ভজন এবং উপনিষদ আবৃত্তি হয়। সভাতে প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকার সমবেত জন-মণ্ডলীকে হাস্যরসে আপ্যায়িত করেন।

বার্নপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও ভারত-বরেণ্য মনীষী স্যার যদুনাথ সরকারের পৌরোহিত্যে গত ২৮শে ফাল্গুন বার্নপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু মথুরানাথ সিংহের নিকট শ্রুত শ্রীরামকৃষ্ণ ও

স্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ক কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দজী ও বার্নপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির সংগঠক শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী এই সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু ও পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা এই উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

উৎসবদিবসে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা হয় ও সহস্রাধিক নর-নারী প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধর্মমূলক পুস্তিকা বিতরিত হয়।

রাড়ীখাল (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—গত ২৮শে ফাল্গুন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব এই আশ্রমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনালোচনা ও কীর্তন হয়। উপস্থিত ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শনিবারের সাপ্তাহিক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হয়। পরে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কালীকীর্তন হইলে উৎসব-কার্য শেষ হয়।

রঘুনাথপুর (দমদম) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৫ই চৈত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজা, কীর্তন, ভজন, দ্বিপ্রহরে প্রায় ৭০০ ভক্তকে প্রসাদ-বিতরণ ও অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত প্রভাসরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি সভা আহূত হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, স্বামী আপ্তকামানন্দজী ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত জীবনী সম্বন্ধে সহজ ও সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। এই উপলক্ষে মিশন মন্দিরের ও আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং রাজার হাট সম্মিলনীর সভ্যগণ নানারূপ চমকপ্রদ ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভজন ও রাত্রে আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'ভক্তের ঠাকুর' ও 'গুরুদক্ষিণা' অভিনীত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব—গত ৭ই চৈত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে হায়দরাবাদে ভারতের এজেন্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত কানাইলাল মানিকলাল মুন্সী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি এবং ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন, "ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সৃষ্টিমূলক, শিক্ষার্থী গুরুগৃহে যাইয়া আত্মানুশীলন করিত। গুরু তাহাকে শুধু জ্ঞানদানই করিতেন না, তাহাকে সাহস, সংযম এবং সম্মান অর্জনের শিক্ষাও দিতেন। অপর পক্ষে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-পদ্ধতি বস্তুতান্ত্রিকতার উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থী উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলাকে স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে। নীতিবোধ তাহার নিকট অবজ্ঞাত। স্বাধীনতা-লাভের পর আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইবে ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র। আমাদের নবরাষ্ট্রের বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক জীবনকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার যে কঠিন দায়িত্ব, তাহা একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই পূর্ণ করিতে পারে। নূতন আদর্শে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে মানুষ সৃষ্টি করিবে সেই মানুষই ভারতকে গরীয়ান করিয়া তুলিবে এবং সেই ভারতই কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃত্ব করিতে পারিবে।

"এই বৎসরটি অতিশয় ঘটনাবহুল। এই বৎসরেই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবসান হইয়াছে। আমাদের দেশের উপর দিয়া এই বৎসর ঝড় বহিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ দ্বিধা

বিভক্ত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের পিতৃপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অসংখ্য নরহত্যা হইয়াছে। আমাদের চোখের সম্মুখে দেখিলাম একটা গভীর মর্মান্তিক বিয়োগান্ত নাটকের পট উঠিয়া গেল, ইহার তুলনা শুধু ১৯৪৭ বৎসর আগে কালভেরীর ঘটনাবলীর সহিতই করা যাইতে পারে। আজ আমরা দেখিতেছি ইউরোপের ভাগ্যাকাশে যুদ্ধের কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে. আজ মানব-জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

"একটি যুগের অবসান হইয়া গিয়াছে, আর একটি যুগের সূচনা হইয়াছে। জবচার্ণকের সৃষ্টি এই মহানগরী—এইখানেই ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথমে আমাদের পরবশতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

* * *

"পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের সংগ্রাম অপূর্ব। ইংরেজ আমাদের দেশে পদার্পণ করিয়া বাহুবলে আমাদের উপর একটা বোঝা চাপাইয়া দিল এবং আমাদের আত্মাকে ক্রয় করিয়া লইল। নূতন করিয়া মর্যাদা-সন্ধানে আমরা বিদেশী কথায় বিদেশী পদ্ধতি অনুকরণ করিতে লাগিলাম। আমাদের অতীতের স্বকীয় যে মর্যাদা তাহা আমরা ভুলিয়া গেলাম। আমাদের কৃষ্টির অবিনশ্বর শক্তিই শুধু আমাদিগকে রক্ষা করিল। রামমোহন রায় নূতন ঊষার আলোকে গাত্রোত্থান করিলেন। অনাবিল দৃষ্টি লইয়া তিনি সেই আলোক নিরীক্ষণ করিলেন। সেই আলোক নির্গত হইতেছিল উপনিষদের অনির্বাণ দীপশিখা হইতে। ১৮৫৭ সালে জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের সময় দয়ানন্দ আমাদের কৃষ্টির পুনরভ্যুত্থানের বাণী ঘোষণা করিলেন। সেই বাণী বেদের বাণী—সেই বেদ যুগ যুগ ধরিয়া সু-উচ্চ পর্বতের স্থায় আমাদের কৃষ্টির বাহনরূপে দাঁড়াইয়া আছে। আধুনিক যুগের মহত্তম ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ গীতার বাণী নূতন করিয়া শুনাইলেন। আমি ঔপন্যাসিক। আমার সৃজনী শক্তিতে যিনি উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি কি করিয়া ভুলিতে পারি? ভগীরথের ন্যায় তিনি মানুষের কমে নব চেতনা সঞ্চার করার জন্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির প্রাণে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস জাগ্রত করেন। আমাদের কৃষ্টির উপরে যে অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তাহার অবসান করিয়া আমাদের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিলেন। সুরেন্দ্র-নাথ বজ্রনির্ঘোষে আমাদের জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের রূপ দিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের বিজয়ে এশিয়ার প্রাণে নব চেতনার সঞ্চার হইল। ঋষি অরবিন্দ ভারতের কৃষ্টিকে নব-জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করিলেন। তিনি মাকে মাতৃভূমিতে দেখাইলেন। ইহার পর আসিলেন গান্ধীজী। নিপুণ হস্তে তিনি আমাদের স্বাধীনতার দুর্গ রচনা করিলেন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং চতুর সাম্রাজ্য ২৫ বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে এই দুর্গের উপর আঘাত হানিয়াছে কিন্তু জয়ী হইয়াছি আমরা. আমরা পরবশতা হইতে মুক্তি পাইয়াছি, এক নূতন জীবনের বিরাট প্রান্তরে আমরা পদক্ষেপ করিয়াছি।

"* * * শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে ভারত একটা অখণ্ড জাতি হিসাবে যে আধ্যাত্মিক মহাজীবনের অধিকারী হইয়াছিল, আজ আমরা যেন তাহা হারাইয়া বসিয়াছি (ইহা সাময়িক বলিয়া আমার ধারণা)। ভারতভূমিতে পার্থিব বস্তুর উপর আত্মার শ্রেষ্ঠত্বই ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। আমাদের ঋষিরা যে বাণী দিয়া গিয়াছেন, সেই বাণী অনুসরণ করিয়া আমরা

'সৎসঙ্গ' হইতে 'সদাচার'—'সদাচার' হইতে 'সত্য'—'সত্য' হইতে 'সংসিদ্ধি' লাভ করিয়াছি।

"নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে নবশিক্ষার প্রশ্নও আসে। সুতরাং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ আমাদের নবজীবনের আদর্শের অনুবর্তী হইবে। শুধু ইহাই নয়, শিক্ষা আর্টও বটে। আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা, আমাদের রাজনীতিক, সামাজিক, বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিষয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচীন যুগের আশ্রম হইতে হইবে। প্রাচীন কৃষ্টিকেন্দ্রে শিক্ষা ছিল আধ্যাত্মিক অভিযান। সেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিত। গুরু তাহাদিগকে শুধু জ্ঞানই নয়, সাহস, সংযম ও সম্মান শিক্ষাও দিতেন। এই শিক্ষা শুধু উপদেশ দ্বারা নয়, উদাহরণের দ্বারাও দেওয়া হইত, শিক্ষার্থী সেখানে শুধু উপস্থিতি জ্ঞাপন করিবার জন্য অথবা কোনও রকমে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার জন্য কিংবা ছুটি ভোগ করার উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করার জন্য যাইত না। শিক্ষার্থী সেখানে নিজের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আত্মানুশীলনের জন্য যাইত। তাহার শিক্ষার পদ্ধতি ছিল পরিশ্রম এবং সেবা।

"আমাদের নূতন শিক্ষা অবশ্যই আমাদের কৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া চলিবে। এই শিক্ষা যেমন তাহার মধ্যে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধের চেতনা জোগাইবে, তেমনি তাহাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং তাহার স্বকীয় সত্তায় পূর্ণ রূপ দিবে। এই শিক্ষার দুইটি বিশেষ আদর্শ রহিয়াছে: প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি ব্যক্তিগত স্বভাব আছে। তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা বড় নীতি হইতেছে কর্মে এবং চিন্তায় সেই স্বভাবকে প্রকাশ করা। তাহার স্বকীয় সত্তার পরিপূর্তির জন্য তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতেও শিখাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিমূলক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী ক্রমশঃই নিজেকে গড়িয়া তুলিবে, নিজকে উপলব্ধি করিবে এবং নিজকে পূর্ণ করিবে। এই পথে তাহার ব্যক্তিত্ব ক্রমেই শক্তিসম্পন্ন হইতে থাকিবে এবং সমাজজীবনের সহিত তাহার যে সম্পর্ক এই শক্তির মধ্য দিয়া তাহা আরও শক্তিসম্পন্ন হইবে।

"কোন লোক খারাপ হইয়াও যদি ভাল বৈজ্ঞানিক কিম্বা সাহিত্যিক হয়, খারাপ নাগরিক হইয়াও যদি ভাল আইনজ্ঞ হয়, কুচরিত্র হইয়াও যদি ভাল দেশপ্রেমিক হয়, তবে তাহাকে শিক্ষিত মনে করা ভুল। মানুষের জীবন অখণ্ড। ইহাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। জীবনের কোন বিশেষ খণ্ডের প্রতি আসক্ত বলিয়া সে জীবনের দায়িত্বকে এড়াইতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যদি শুধু শিক্ষার্থীকেই নয়, তাহার পরিবেশকেও গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইবে। জীবনশক্তি জলধারার মত। ইহার গতিবেগ বৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

"তরুণদের প্রতি আমার একমাত্র বাণী—তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হউক—শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।"

উদ্বোধন
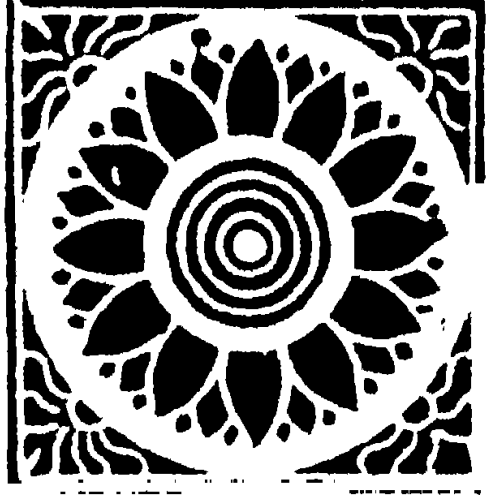
'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামীয় দেহ'

সম্পাদক

যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ও মুসলমানে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় ধর্মের সমন্বয়-সাধনের আবশ্যকতা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়-রূপে তিনি 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামীয় দেহ'-নীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্মরূপ দুইটি মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমার মাতৃভূমি যেন ইস্‌লামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।"

উদ্ধৃত 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক বা হৃদয়' কথার ভাবার্থ—যাঁহার মস্তিষ্ক বা হৃদয় বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ এরূপ ব্যক্তি। বেদান্ত বলেন—এক নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ আত্মা সকল নরনারীর মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। নরমাত্রই নারায়ণ—জীবমাত্রই শিব। আত্মার দিক দিয়া মানুষে মানুষে কোন ভেদ ও পার্থক্য নাই। জগতের সকল নরনারী একই আত্মার বহুরূপ এবং সকল জ্ঞান শক্তি মহত্ত্ব পবিত্রতা ও পূর্ণত্বের আধার। মানুষে মানুষে, জীবে জীবে যে ভেদ ও পার্থক্য দেখা যায়, ইহা জীবাত্মার ব্রহ্মভাব-প্রকাশের তারতম্য-জনিত। যে কোন মানুষ—তা সে যতই হীন বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, আভ্যন্তর আত্মজ্ঞান ও শক্তির উদ্বোধন করিয়া সকল বিষয়ে জ্ঞানবান ও শক্তিমান হইতে—এমন কি জীবত্ব নাশ করিয়া শিবত্বও লাভ করিতে পারে। যাঁহার মস্তিষ্ক বা হৃদয় এই বেদান্ত-ভাবে অনুপ্রাণিত, তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষ কেবল ভাই নয়, পরন্তু আত্মার দিক দিয়া এক ও অভেদ। তিনি পৃথিবীর কোন মানুষকে হিংসা বা অবজ্ঞা করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার পক্ষে অপরকে হিংসা বা অবজ্ঞা করা, আর আপনি আপনাকে হিংসা বা অবজ্ঞা করা একই কথা। বৈদান্তিক বা অদ্বৈতবাদীর পক্ষে এই ভাব-অবলম্বন অপরিহার্য। ইহাই সকল ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "উহাকে আমরা বেদান্তই বলি, আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানব সাধারণের ধর্ম্ম।" অদ্বৈত-ভূমিতে উপনীত হইয়া অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর-দর্শন সকল ধর্মের শেষ পরিণতি। পৃথিবীর সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন ইষ্ট-দর্শন বা সমদর্শনকে ধর্মসাধনার চরম আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

বেদান্তে এই মহান আদর্শ বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত। ইহাতে যে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী প্রকটিত, উহা অপেক্ষা উন্নততর সাম্য-মৈত্রী মানুষ কল্পনা করিতেও অসমর্থ। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্ত-বেদ্য সাম্য-মৈত্রীর নির্দেশে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি এমন কি মানুষমাত্রেরই দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন পর্যন্ত পরিচালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ কার্যে পরিণত করাই, কেবল ভারতের হিন্দু-মুসলমানে নয়, পরন্তু বিশ্ব-মানবের মধ্যে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

বেদান্ত সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। ইহাতে পৃথিবীর সকল ধর্মেরই সম্মানিত স্থান আছে। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ই মুক্তকণ্ঠে বেদান্তের প্রামাণ্য স্বীকার করে। এইজন্য হিন্দুধর্ম 'বেদান্ত' এবং হিন্দু 'বৈদান্তিক' নামে অভিহিত। হিন্দুধর্ম তথা বেদান্তের পরিধি এত বিস্তৃত যে ইহা অহিন্দু ধর্মসমূহ ও অহিন্দু নরনারীর প্রতিও যথার্থই আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে। এই জন্য বেদান্তের ন্যায় পরধর্ম ও পরধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অত্যুদার গণতান্ত্রিক ধর্ম পৃথিবীতে আর দেখা যায় না।

কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার্য যে, বেদান্তের নামে প্রচলিত অনেক সম্প্রদায়ের অনেক অনুষ্ঠান ও কার্য-কলাপ বৈদান্তিক সাম্য-নীতি ও গণতন্ত্র-বিরোধী। হিন্দুরা পারমার্থিকতার দিক দিয়া বেদান্তের সাম্য-মৈত্রীকে অতি উচ্চ স্থান দিলেও সমাজ-জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণ করাকে ধর্মরক্ষার অঙ্গ বলিয়া মনে করে! বেদান্তবেদ্য পরমার্থকে কাজে লাগাইতে হইলে ইহার নির্দেশে সমাজ-জীবন—ব্যবহারিক জীবন পরিচালন করিতেই হইবে। মস্তিষ্ক বা হৃদয়কে বেদান্তভাবে পরিপূর্ণ রাখিয়া দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কার্যতঃ উহার অনুষ্ঠান করাই বেদান্তকে কাজে লাগাইবার উপায়।

'ইস্লামীয় দেহ' কথার ভাবার্থ—ইস্লামীয় সমাজ-দেহ বা সমাজ-শরীর। মুসলমান-সমাজ সাম্য-মৈত্রীপূর্ণ। তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সংহতি-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। মুসলমান-সমাজে সকল মুসলমানের সকল বিষয়ে সমান অধিকার এবং উন্নতি-লাভের সমান সুযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দ মুসলমান-সমাজের এই অসাধারণ গুণগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "মহম্মদ দেখাইয়া গিয়াছেন—মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদ না রাখিয়া ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় সংবদ্ধতা। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে ক্রয় করিলেন, কিন্তু ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যোগ্যতা, গুণ ও সামর্থ্য থাকিলে সে সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, আর আমরা হিন্দুরা?" হিন্দুরা আধ্যাত্মিক আদর্শের দিক দিয়া বেদান্তের কল্পনাতীত অদ্বৈত, আত্মার একত্ব ও অভেদত্ব, সর্বভূতে সাম্য-মৈত্রী প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করে বটে, কিন্তু সমাজ-জীবনে বেদান্তের এই মহান্ ভাবগুলিকে কর্মে পরিণত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে হাজার হাজার মুসলমান কোন স্থানে সমবেত হইলে তাহাদের মধ্যে আহার ও বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ-স্থাপনে এবং ভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা হয় না। তাহারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল নরনারীকে তাহাদের ধর্ম ও সমাজে সম্মানিত স্থান দিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে। এই জন্য তাহারা অত্যন্ত সংবদ্ধ ও শক্তিশালী এবং তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের দশটি প্রদেশ হইতে দশজন হিন্দু কোন স্থানে সমবেত হইলে তাহাদের মধ্যে

আহার ও বিবাহাদি কোন প্রকার সামাজিক সম্প্রীতি-স্থাপন সম্ভব হয় না। তাহারা পৃথিবীর কোন অহিন্দু নর বা নারীকে তাহাদের সমাজে সম্মানিত স্থান দিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে না। হিন্দুসমাজে শত ভেদ সহস্র বৈষম্যের জন্য হিন্দুজাতি স্ব-গৃহে শতধা বিচ্ছিন্ন, সংঘশক্তিহীন ও অত্যন্ত দুর্বল এবং তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে। এই সকল কারণে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানগণ অশিক্ষিত দরিদ্র এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও শিক্ষিত ধনবান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণের সমবেত প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এখনও প্রত্যেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহারা জয়লাভ করিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় —হিন্দুরা স্মরণাতীত কাল হইতে বেদান্তের কল্পনাতীত সাম্য-মৈত্রী অদ্বৈত ও অভেদত্বের গুণগান করিয়াও উহাকে সমাজে প্রয়োগ করিতে —ব্যবহারিক জীবনে একেবারেই কাজে লাগাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বেদান্তসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াও তাহাদের ধর্মক্ষেত্রে না হইলেও সমাজ-জীবনে উহাকে অতি বিস্ময়কর ভাবে কাজে লাগাইয়াছে। মুসলমান-সমাজের সাম্য-মৈত্রী ও সংহতি-শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই (বৈদান্তিক) সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন. তবে একমাত্র ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পরে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে সকল তত্ত্ব আছে, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইস্‌লামপন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না, এইমাত্র প্রভেদ। এই হেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইস্‌লাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।" বেদান্তের সাম্য ও সমদর্শন কেবল মস্তিষ্কে বা হৃদয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া ব্যবহারিক জীবনে কর্মে পরিণত করাতেই উহার সার্থকতা নিহিত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দুগণ ধর্মক্ষেত্রে বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্য ও সমদর্শন সমর্থন করিয়াও সমাজক্ষেত্রে — দৈনন্দিন জীবনে বর্ণে বর্ণে ভোগাধিকার-বৈষম্য অনৈক্য ও ভেদবিরোধকেই এখনও আঁকড়াইয়া আছে। ইহাই যে হিন্দুজাতির রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক দুর্গতি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ দুর্দশার একমাত্র কারণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি মুসলমানদের ন্যায় হিন্দুরা সমাজ-জীবনে সাম্য-মৈত্রী ও সংহতি স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিত, তাহা হইলে তাহাদের এরূপ দুর্দশা হইত না। ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, হিন্দুসমাজের উচ্চনীচ-ভেদ-জ্ঞান ও সংকীর্ণতা এখনও হিন্দুতে হিন্দুতে এবং হিন্দু-মুসলমানে মিলনের প্রধান অন্তরায়। হিন্দুরা সমাজক্ষেত্রে এই মহা অনর্থকর ভেদ-জ্ঞান ও সংকীর্ণতা ত্যাগ না করিলে তাহাদের গৃহ-বিবাদ কখনও দূর হইবে না এবং তাহাদের সহিত অহিন্দু কোন জাতির সম্প্রীতি-স্থাপন একেবারেই সম্ভব হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ মুসলমানদের সামাজিক সাম্য ও সংহতির যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, অধিকাংশ মুসলমানের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার তেমন নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তাহাদের মূলমন্ত্র হইতেছে—ঈশ্বর এক এবং একমাত্র মহম্মদই তাঁহার দূত, এইজন্য বাহিরের যাহা কিছু তাহা যে কেবল মন্দ তাহা নহে, উহাকে ধ্বংস করা চাই-ই তৎক্ষণাৎ। * * অবশ্য ইহা

সত্ত্বেও মুসলমানের মধ্যে সময়ে সময়ে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ।” উল্লেখ বাহুল্য যে, মুসলমানদের পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা কোরানের উপদেশ-বিরোধী। হজরৎ মহম্মদ যে পরধর্মের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—অধিকাংশ মুসলমান হজরৎ মহম্মদ ও কোরানের এই উপদেশ মান্য করে না। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, ইস্‌লামপন্থিগণের মধ্যে অনেক উদারভাবাপন্ন নরনারী ব্যক্তিগত ভাবে অমুসলমান ধর্মসমূহের প্রতি উদারতা দেখাইলেও সমষ্টিগত ভাবে কোন কালেও মুসলমানগণ উদারতা দেখায় নাই। ভারতীয় মুসলমানগণ যদি তাহাদের প্রতিবেশী অমুসলমান ধর্মাবলম্বিগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে বাস করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা ও অনৌদার্য ত্যাগ করিয়া (বেদান্ত গ্রহণ না করিলেও) বেদান্তের সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শনের আদর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। অন্যথা তাহাদের সহিত অমুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মিলন কখনও সম্ভব হইবে না।

আধুনিক পরিস্থিতির আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন ভারতের সাম্য-মৈত্রীমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রচলিত মুসলমানধর্ম ও হিন্দুসমাজের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে উভয়টিকে অতি শীঘ্র সাম্য-মৈত্রীপূর্ণ গণতান্ত্রিক আকার প্রদান করা অপরিহার্য। একদিকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণ ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রমুখ সকল বিষয়ে জাতি-ধর্ম-শ্রেণি-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া তাহাদের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী ও গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন, অপর দিকে মুসলমানগণ ধর্মক্ষেত্রে পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধে ইন্ধন যোগাইবে এবং হিন্দুরা সমাজ-ক্ষেত্রে বহু বর্ণ ও শ্রেণীর জন্মগত অধিকার অস্বীকার করিয়া তাহাদের প্রতি অপমান ও অসম্মানজনক ব্যবহার করিতে থাকিবে, এই সকল পরস্পরবিরোধী কার্য সমকালে চলিতে পারে না। তথাপি ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি ইহা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলমানধর্ম ও হিন্দু-সমাজের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। এবং ইহাও সত্য যে, এ যুগে সাম্য-মৈত্রীমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্য-মৈত্রীবিরোধী স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ধর্ম ও সমাজের সংঘর্ষে শেষোক্ত দুইটিরই পরাজয় সুনিশ্চিত। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই সকল বিষয়ে মানুষে মানুষে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। জগতের এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের—এক জাতির সহিত অপর জাতির—এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের—এক সমাজের সহিত অপর সমাজের সম্বন্ধ ক্রমেই অধিকতর ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করিতেছে। এরূপাবস্থায় বিশ্বের এই পরিস্থিতি ও স্বাধীন ভারতের সাম্য-মৈত্রীমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ যদি তাহাদের ধর্মকে এবং হিন্দুগণ যদি তাহাদের সমাজকে রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে অতি সত্বর এতদুভয়ের সংস্কার করিতেই হইবে। যুগধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত ‘বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামীয় দেহ’-নীতিই এই সংস্কারসাধনের একমাত্র উপায়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর-লীলা

স্বামী তেজসানন্দ (অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়)

"বন্দি কামারপুকুর পুণ্যলীলাভূমি।
যেথা নরলীলা তরে জনমিলা তুমি॥"

প্রথম পর্ব্ব

পৃথিবীর ধর্মেতিহাস মানব-কৃষ্টির উত্থান-পতনের এক প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শন। ইহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণ জগতের যে যে স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন তাহা উত্তরকালে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়াই যুগে যুগে প্রতি জাতির ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিসৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। মানব এই পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত তীর্থক্ষেত্র-সমূহকে কালের তথা বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত ভাবেই না প্রযত্ন করিয়া আসিতেছে। অদ্যাবধি অযুতকণ্ঠে ও সহস্রগ্রন্থে লোকপাবন ঋষি-মুনি-অধ্যুষিত ভূমিখণ্ড-সকলের ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য বিভিন্ন ছন্দে কীর্ত্তিত হইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ম্লানায়মান স্মৃতিসমূহ উজ্জ্বল বিভায় প্রদীপ্ত ও জীবন্ত হইয়া মানবহৃদয়ে নিত্যনব আলোকের সন্ধান দিতেছে; এক দুর্জ্জয় আকর্ষণে অগণিত ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের রসমাধুর্য্যমণ্ডিত লীলাস্থানসমূহ দর্শনের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে যুগ যুগ ধরিয়া আজও ছুটিয়া আসিতেছে। প্রেমাবতার ভগবান যিশুর পুণ্য জন্মভূমি বেথেলহাম,—তাঁহার লীলা-কীর্ত্তি-বিজড়িত জেরুজালেম, ইসলাম-ধর্ম্মাচার্য্য কোরেশকুলতিলক মহম্মদের জন্ম-কর্ম্মভূমি মক্কা মদিনা, আজও কোটি কোটি নরনারীর তৃষ্ণাকাতর হৃদয়ে শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চন করিতেছে। আজও সরযূতীরে শ্রীরামচন্দ্রমহিমোজ্জ্বল অযোধ্যাপুরী ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনে অহর্নিশ মুখরিত: আজও বৃন্দাবন মথুরা দ্বারকাধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতুলিত প্রেম-বীর্য্যগাথা কোটি-কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। এখনও বুদ্ধ ও শঙ্কর, নানক ও রামানুজ, মধ্ব ও চৈতন্যাদি লোকোত্তর পুরুষবৃন্দের জন্ম-লীলাভূমি স্বর্গীয় সুধাসিঞ্চনে ভক্তহৃদয়ে অপার তৃপ্তি ও শান্তি প্রদান করিতেছে, যুগের পর যুগ অতীতের গর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী কত জাতির প্রতিভোজ্জ্বল কীর্ত্তিকাহিনী বিস্মৃতির অতলসলিলে নিমজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি প্রেমভাবপূরিত মানব-হৃদয়নিঃসৃত শ্রদ্ধাভক্তির মন্দাকিনীধারা শতধারে উৎসারিত হইয়া পুণ্য তীর্থভূমি-সমূহকে আনন্দ ও শান্তির নিত্য নিকেতন করিয়া রাখিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে যুগবিপ্লব-কারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মলীলাভূমি শান্ত স্নিগ্ধ কামারপুকুর পল্লীর নির্ম্মল ছবি আজ স্বাধীন ভারতের পবিত্র রক্তিম ঊষায় অতীতের গৌরব-স্মৃতি বক্ষে লইয়া মানসনয়নে স্বতঃই ফুটিয়া উঠিতেছে। এখনও সে অমৃতধামে অভ্রংলিহ মন্দির গড়িয়া উঠে নাই; কোলাহলমুখর জন-সমাকুল নগরীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের বিপুল স্পন্দন সেখানে আজও অনুভূত হয় না। এখনও ঋত্বিক্-কণ্ঠোচ্চারিত সামগানে এই তীর্থভূমি মুখরিত হইয়া উঠে নাই,—অগণিত ভক্তমণ্ডলী তীর্থরজঃ শিরে ধারণ করিবার জন্য হৃদয়ের উন্মাদনা লইয়া সে পুণ্যতীর্থে আজও অভিযান আরম্ভ করে

নাই ! কুটিল কাল বিস্মৃতির কাল যবনিকা টানিয়া দিয়া এই লীলাভূমিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার প্রবল প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু যিনি ভগবান বুদ্ধের বিশাল হৃদয়, শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করের অদ্বিতীয় প্রতিভা ও প্রেমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অগাধ প্রেম লইয়া বর্ত্তমান যুগকল্যাণ-কামনায় শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ভক্তজ্ঞানি-শিরোমণি সেই বেদমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অধুনাবিস্মৃতপ্রায় বিচিত্র-লীলামণ্ডিত রম্য জন্মভূমি কামারপুকুর যে অদূর-ভবিষ্যতে ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত নামগুণ-কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠিবে,—ভক্তজনস্রোতের অফুরন্ত প্রবাহে অযোধ্যা ও বৃন্দাবন, বেথেলহাম ও জেরুজালেম, মক্কা ও মদিনার ন্যায় বিরাট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। ভক্তহৃদয়ই ভগবানের নিত্য সিংহাসন। ভক্তকণ্ঠে শ্রীভগবানের নরলীলা-কাহিনী যতই কীর্ত্তিত হইবে, মাধুর্য্যরসবিলসিত তাঁহার অপূর্ব্ব লীলাগাথা ততই সকলকে সেই লীলাস্থানে আকর্ষণ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে মানব-হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র হইয়া স্বর্গীয় প্রেমানন্দের অধিকারী হইয়া উঠিবে।

সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন মাধুর্য্যের রঙ্গভূমি কামারপুকুর পল্লীখানি দিগন্তবিস্তৃত বিশাল হরিৎসাগরে ভাসমান দ্বীপের ন্যায় বঙ্গজননীর ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া হাসিতেছে। ষড় ঋতুর বিবর্ত্তনে প্রকৃতি কখনও ঘন বরষার অশ্রুধারে ভাসিতেছে, কখনও নবনীরদজাল অনন্ত নীলাকাশে বিচিত্র কুহেলী সৃজন করিয়া ভাবুক-চিত্তকে অসীমে ডুবাইয়া দিতেছে ; আবার শিশিরসমাগমে বৈধব্যের বসন পড়িয়া প্রকৃতি ধ্যানগম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। এমনি করিয়া প্রকৃতিরাণী দিনের পর দিন অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যসম্ভার উন্মুক্ত করিয়া সকলের অন্তরে আনন্দসুধা ঢালিয়া দিতেছে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়ার শুভ্র প্রভাতে বিটপিবল্লরীবহুল স্নিগ্ধচ্ছায়া-নিবিড় কামারপুকুর পল্লীভবন পিককণ্ঠের মধুর কাকলী-রবে মুখরিত হইয়া উঠিল,—বুঝি স্থাবর-জঙ্গম কোন আকাঙ্ক্ষিতের আগমনপ্রতীক্ষায় আজ বিপুল পুলকে স্পন্দিত ও উল্লসিত। পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সুমঙ্গল শঙ্খরোলে তপস্বী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পর্ণকুটীর কম্পিত হইয়া উঠিল ;—প্রেমঘনমূর্ত্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বহৃদয় নন্দিত করিয়া যুগকল্যাণ-কামনায় ক্ষুদিরামগৃহে ভূমিষ্ঠ হইলেন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বিহগকুল কূজন করিয়া উঠিল ; উদয়াচলে অরুণদেব শিশুরূপী নারায়ণের দিব্যোজ্জ্বল মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া রক্তিম অধরে হাসির হিল্লোল তুলিয়া দিকে দিকে এ শুভ বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিলেন। নিখিল ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—

"তুমি এলে ফাল্গুনে।
ফুল্লকানন মলয়ানিল কম্পনে।
কোকিলকুলকূজিত মুখরিত অলি গুঞ্জনে॥
(তব) কুসুম কোমল অঙ্গ, (তাহে)
উথলে রূপতরঙ্গ,
মন্মথ শত নিমেষে নিহত বঙ্কিমায়ত নয়নে
সাকেতপুরীভূষণ, কৃষ্ণ নন্দনন্দন,
বিধিহরিহর সদাই বিভোর চরণপদ্মধেয়ানে॥"

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ! ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রজত-শুভ্র ভস্মরাশি-পূর্ণ চুল্লীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবশিশু বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ দেবাদিদেব মহেশ্বরের ন্যায় বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অনন্ত ভাবঘন-মূর্ত্তি যে দিব্যপুরুষ উত্তরকালে অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা-প্রভাবে ভোগমদিরামত্ত মানবকে ত্যাগের অমৃতপন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, পার্থিব ভোগ্যবস্তু-নিচয়ের ভস্মবৎ অসারত্ব ও তুচ্ছত্ব শ্রীঅঙ্গে সূচিত করিয়া তিনি যে জগতে তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা জানাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ! লোকোত্তর মহাপুরুষগণের জন্ম হইতে মহাপ্রয়াণাবধি

প্রত্যেকটি কার্য্য গভীর অর্থপূর্ণ। ধন্য কামারপুকুর! নবযুগের প্রথম প্রভাতে এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিবার প্রথম সৌভাগ্য তোমারই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। পুত্রমুখ-দর্শনে জনক-জননী আনন্দে উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বদৃষ্ট দেব-স্বপ্ন ও দিব্যানুভূতি স্মরণ করিয়া ক্ষুদিরাম বালকের নাম রাখিলেন—গদাধর।

বালকের চারুচম্পকসদৃশ দিব্য অঙ্গকান্তি, ললিতমধুর শুভ্রহাসি, মনোরম গঠন ও বঙ্কিম নয়নের অপার্থিব মাধুরী-দর্শনে স্ত্রীপুরুষ সকলে বিমোহিত। তাহার প্রস্ফুটিত কমলতুল্য মুখখানি দিনের মধ্যে একবার নিরীক্ষণ করিতে না পারিলে পল্লীর কামিনীকুল আকুল হইয়া উঠিত। বালকের অলৌকিক আকর্ষণগুণে সমস্ত গ্রামখানি ক্রমে যেন এক পরিবারে পরিণত হইল। গদাধরের বালচেষ্টাসমূহ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া জননীর স্নেহভরা হৃদয়কে আনন্দ ও ভয়ের পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিল। চঞ্চল বালক কখনও গৃহপ্রাঙ্গণে ধূলিধূসরিত অঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে; কখনও ক্ষুধায় কাতর হইয়া ডাগর চক্ষু সাগর করিয়া মা মা বলিয়া উচ্চরোলে কাঁদিতেছে। গৃহকর্ম্মরতা জননী সন্তানের আকুল আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া রোদনরত বালককে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া বালকের রক্তিম গণ্ডদ্বয়ে শত চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন। মাতৃকণ্ঠলগ্ন বালক স্তন্যপীযূষপানে মত্ত হইয়া অলক্ষিতে মাতৃক্রোড়ে নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িল। সন্তানের নির্ম্মল মুখখানি দেখিতে দেখিতে চন্দ্রাদেবীর অন্তরের পুঞ্জীভূত স্নেহরাশি অশ্রুধারায় উথলিয়া উঠিল। এমনি করিয়াই না বৃন্দাবনের গোপগৃহে লীলাচঞ্চল বালগোপাল কতবার মাতৃস্তন্য-পীযূষ-পানে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরসাপ্লুতা জননী যশোদার স্নেহময় অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কামারপুকুর পল্লীগৃহে বুঝি বৃন্দাবনের সেই মাধুর্য্যলীলার পুনরভিনয় গদাধরের বালচেষ্টা-সমূহের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইল!

পিতা ক্ষুদিরাম শুচিশুদ্ধ হইয়া ৺রঘুবীরের মালা গাঁথিতে তন্ময়। পুষ্পপার্শ্বে সুদর্শন বালক গদাধর ক্রীড়ারত। মালাগাঁথা শেষ করিয়া কার্য্যব্যপদেশে ক্ষুদিরাম গৃহান্তরে গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ৺রঘুবীরের জন্য গ্রথিত মালা বালক স্বীয় শিরে ধারণ করিয়া এক অপরূপ সাজে সাজিয়াছে। নবনীতকোমল ললিত অঙ্গে শ্বেতশুভ্র পুষ্পমালা দোদুল্যমান, আর বালকের অর্দ্ধস্ফুট ওষ্ঠপ্রান্তে ও পঙ্কজ-আঁখিযুগলে মৃদুমন্দ হাসির হিল্লোল। পিতাকে দেখিয়াই বালক এক দৃষ্টিভঙ্গীতে পিতার অপলক নেত্রের উপর স্বীয় আয়ত নয়নযুগল স্থাপিত করিল। স্বর্গেও বোধ হয় এ দৃশ্য বিরল। ক্ষুদিরামের অন্তরের স্নেহামৃতসিন্ধু আজ শতধারে উথলিয়া উঠিল। চক্ষে আনন্দের যমুনা বহিল। দুই বাহু বিস্তার করিয়া ক্ষুদিরাম প্রাণপ্রিয় বালককে বক্ষে ধারণ করিলেন। রামভক্ত ক্ষুদিরামের জীবনব্যাপী সাধনা আজ সাফল্যে ভরিয়া উঠিল। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, কৌশল্যার অঞ্চল-নিধি, প্রেমঘনতনু বালরামচন্দ্র আজ স্বীয় সন্তানরূপে তাঁহার যত্নে গাঁথা ফুলের হার শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ব্বভাবে পূরণ করিলেন। ধন্য তাঁহারাই যাঁহারা ভগবানের নরলীলার এই প্রেমমধুর নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়া প্রকৃত রসের সন্ধান পাইয়াছেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্যপাঠশালায় বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। জগদ্গুরু আজ বিদ্যার্থী সাজিয়াছেন। যে বিদ্যাবলে এই বিপদসঙ্কুল সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়, যাহা মানুষকে চিরতরে শাশ্বত শান্তি ও অমৃতত্বের অধিকারী করিয়া তোলে, সেই ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন জগতের অর্থকরী বিদ্যা তাহার হৃদয়ে কোন সাড়া জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ

হইল না। তাই বালক আজ বিদ্যাভ্যাসে উদাসীন কিন্তু বালকের অলৌকিক মেধা ও প্রতিভা, ঈশ্বরীয় কথায় ও লীলাকীর্ত্তনে অপূর্ব্ব উল্লাস, অসাধারণ অনুকরণপ্রিয়তা ও উদ্ভাবনী শক্তি পল্লীস্থ সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিল। কোথাও পুরাণকথা বা যাত্রাভিনয় হইয়াছে,—বালক তাহাই অনুকরণ করিয়া অভিনয় করিতেছে। সে অতুলনীয় নৃত্য চিত্তহর ভাবভঙ্গী, সে ভাব-তন্ময়তা দর্শনে কামারপুকুরের বালবৃদ্ধ সকলে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে ডুবিয়া যাইত। তাহাদের নির্নিমেষ নয়নে অবিরল আনন্দাশ্রু বিগলিত হইত। পল্লীর স্নিগ্ধচ্ছায়াযুক্ত অপরাহ্নে যেদিন এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকাব্যের অভিনয় না হইত, বৈচিত্র্য-বিরল পল্লী-জীবন সেদিন নিতান্তই নীরস বোধ হইত।

পাঠাভ্যাসে উদাসীন সুস্থ সবল বালক গদাধর গগনচারী বিহঙ্গের ন্যায় অপূর্ব্ব স্বাধীনতা ও চিত্তপ্রসাদে দিন যাপন করিত। বিশুদ্ধ বায়ু-সন্দোলিত শস্যশ্যামল প্রান্তরের হরিৎসুন্দর ছবি, নদীর অবিশ্রান্ত গতি, কলকণ্ঠ বিহগের সুমধুর গীতি, সুনীলাম্বরে প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল অভ্রপুঞ্জের প্রহেলিকাময় বিচিত্র শোভা বালকের স্বাভাবিক ভাবপ্রবণ চিত্তকে কখন কখন তন্ময় করিয়া তুলিত। সপ্তমবর্ষীয় গদাধর স্নিগ্ধ সমীরে প্রান্তর মধ্যে যথেচ্ছ পরিভ্রমণকালে একদিন দেখিতে পাইল ঊর্দ্ধে সুনীল নভোমণ্ডলে একখণ্ড নিবিড় কাল মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তন্মুহূর্ত্তে সঙ্গে সঙ্গে নবজলধর-ক্রোড়ে একদল ধবলা বলাকা শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সৃজন করিল,—যেন শ্যামাঙ্গে শ্বেত শতদল-মালিকা দুলিতেছে! তদ্দর্শনে বালকের চিত্ত উধাও হইয়া সহসা সসীম ছাড়িয়া অসীমে ডুবিয়া গেল। সংজ্ঞাহীন বালকের মুখমণ্ডল এক দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত,—স্তিমিত লোচন, যেন কি এক স্বর্গীয় অমৃতরসপানে বালক আজ বিশ্বচরাচর-বিস্মৃত। বালবয়সে বালকের স্ব-স্বরূপস্মৃতিজনিত ভাব-সমাধির এই প্রথম প্রকাশ পল্লীবাসী ও জনক-জননীকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া তুলিল। কিন্তু সমাধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া যিনি ভোগচঞ্চল মানব-মনকে পরমার্থ বস্তুতে সমাহিত ও আত্মস্থ করিবার জন্য বাংলার এই নিভৃত পল্লী-গৃহে নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রথম প্রভাতে ভাবসমাধির এই সাবলীল বিকাশ-দর্শনে বিস্মিত হইবার কিছু নাই; কারণ ইহাই নবযুগের সাধনা ও সিদ্ধি।

আনুড় গ্রামের জাগ্রতা দেবী বিশালাক্ষী-দর্শনার্থ কামারপুকুর-রমণীগণ যাত্রা করিয়াছেন। মাতৃভক্ত গদাধরও তাঁহাদের সঙ্গী। রৌদ্রতপ্ত আশ্রয়বিরল বিস্তৃত প্রান্তর হরিৎ-মরুর ন্যায় ধূ-ধূ করিতেছে। মস্তকোপরি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব অগ্নি-বর্ষণে রত। পদতলে উত্তপ্তা ধরণী। সুধাকণ্ঠ বালক মধুর মাতৃসঙ্গীতে সঙ্গিনীগণের পথক্লান্তি-অপনোদনে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট। অকস্মাৎ বালকের কণ্ঠস্বর থামিয়া গেল। শরীর স্পন্দনহীন, নয়ন নির্নিমেষ; কোমল কপোল বাহিয়া শ্রাবণের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। রমণীকুল শঙ্কিতা হইলেন। বালকের চৈতন্যসম্পাদনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সহসা তাঁহাদের সরল চিত্তে বোধ জন্মিল বুঝি মাতৃ-নামগানে বিভোর গদাধরের উপর দেবী বিশালাক্ষীর আবেশ হইয়াছে। রমণীমণ্ডলী ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে অশ্রুসিক্তনয়নে দেবী-বিশালাক্ষীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! দেবীর পবিত্রনাম-শ্রবণমাত্র বালকের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। দেহ মৃদুমন্দ স্পন্দিত হইতে লাগিল। আনন্দপুলকে পল্লীরমণীগণ দেবী বিশালাক্ষীর জয়-গানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং কেহ কেহ দেবীজ্ঞানে বালককে পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া পূজার্থ আনীত ফলমিষ্টাদি ভক্তিভরে বালককেই

খাওয়াইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। উত্তরকালে' যিনি পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকূলে দক্ষিণেশ্বর শক্তিপীঠে অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত বেদনার অর্ঘ্য মাতৃচরণে উপহার দিয়া চিন্ময়ী মায়ের জ্যোতির্ম্ময় রূপদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন, ঘোর অমানিশার নিস্তব্ধ নিশীথে গিরিশাদি ভক্তবৃন্দ দক্ষিণেশ্বর তপোবনে বরাভয়করা জগজ্জননীরূপে প্রকাশিত দেখিয়া যাঁহার রাতুল চরণ পুষ্প-চন্দনে পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারই স্ফুটনোন্মুখ শুদ্ধ নির্ম্মল জীবনের এই শুভ সন্ধিক্ষণে সেই মাতৃভাবেরই দিব্যানুভূতি যে উপস্থিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অনন্তভাবসিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে উত্তরকালে যাঁহার লীলাবৈচিত্র্যের নিত্য বিকাশ, জীবনের এই মধুর কৈশোরে মাতৃভাবের আবির্ভাব, বলা বাহুল্য, তাহারই এক সহজ সরল নৈসর্গিক স্ফুরণ মাত্র।

কামারপুকুরে শিবমহিমসূচক যাত্রাভিনয় হইবে। শিবের ভূমিকায় যে অভিনয় করিবে সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। স্থির হইল অভিনয়পটু বালক গদাধর শিবভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে। শিবসাজে সজ্জিত বালক গদাধর উন্মনাভাবে ধীর মন্থর গতিতে সভামণ্ডপে উপস্থিত। কি অপূর্ব্ব শোভা! ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত তরুণ তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, ধীর ললিত পদক্ষেপ, অপার্থিব অন্তর্ম্মুখী নিষ্পলক দৃষ্টি, অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা ও নয়নপ্রান্তে প্রেমাশ্রুধারা! নির্ব্বাক জনমণ্ডলী আনন্দ ও বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খরোল ও নারীকণ্ঠনিঃসৃত উলুধ্বনিতে সে যাত্রার আসর নিমিষে দেবাসরে পরিণত হইয়া গেল। মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"চিরসুন্দর শিব-শোভন।
ওগো প্রেমময় হৃদি-রঞ্জন।
তুমি ভকতহৃদয় রাজাধিরাজ নিরঞ্জন প্রেমঘন॥
ঢল ঢল ঢল কিবা সুকোমল চিন্ময় বর দেহ,
আ মরি মরি কিরূপ মাধুরী অতুলন রূপ গেহ॥"

যাঁহার দিব্যদেহে একদিন বিভূতিভূষিতাঙ্গ চন্দ্রমৌলি মহেশ্বরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া সেবক ভক্তবীর মথুরামোহন আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, কোটিকল্প সাধনায় যাঁহার দর্শন সম্ভব হয় না, আজ কামারপুকুরবাসী ভগবানের কামারপুকুর-লীলায় কৈলাসপতি দেবাদিদেবের সেই প্রদীপ্ত প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর সৌম্য মূর্ত্তি গদাধর-অঙ্গে প্রকাশিত দেখিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। ধন্য কামারপুকুর! তুমি শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারই ভাগবতী লীলার কত পুণ্য স্মৃতি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল-গাথা শুনাইতে বিশ্ববাসীকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছ। তোমার এ স্বর্গীয় দানের তুলনা নাই। এ পুণ্য কাহিনী যত শুনাইবে তোমার দানের গরিমা ততই বৃদ্ধি পাইবে, জগদ্বাসীর হৃদয় মন নির্ম্মল আনন্দে পুলকে ভরিয়া উঠিবে! জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যাসদেব তাই গাহিয়াছেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা
জনাঃ॥"

পিতা ক্ষুদিরাম পরলোক গমন করিয়াছেন। পিতৃবিয়োগবিধুর গদাধর এখন নির্জ্জনতাপ্রিয় ও চিন্তাশীল। গ্রামের প্রান্তভাগে ভূতিরখালের মহাশ্মশান, মানিকরাজার জনশূন্য নিবিড় আম্রকানন উদাসী বালকের অতীব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে রথযাত্রার দিন সমাগত: গ্রাম্য পান্থশালায় বিশ্রামরত শ্রীক্ষেত্রযাত্রী সন্ন্যাসিগণের শঙ্খ-ঘণ্টারোলে, তাঁহাদের কণ্ঠনিঃসৃত বম্ বম্ ধ্বনি ও ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তনে, বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে প্রতিবৎসরের ন্যায় গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও প্রজ্জ্বলিত ধুনিপার্শ্বে জটাজুটধারী

দিগম্বর নাগা সন্ন্যাসী ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট, কোথাও হরিভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব-বৈরাগী ব্রজনন্দন শ্যামসুন্দরের পূজায় নিমগ্ন, কোথাও বিচিত্র নৃত্য সহকারে উদাসী বাউলের গীতি-মূর্চ্ছনায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে, আবার কোথাও প্রসাদপদাবলীর সুললিত লহরী ভক্ত-হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে; কোন স্থানে প্রমত্ত হরিসঙ্কীর্ত্তনে তদ্‌গতচিত্ত শ্রোতার নয়নে প্রেমযমুনা বহিতেছে,—গ্রামখানি পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই স্বর্গীয় দৃশ্য ভাবপ্রবণ বালক গদাধরের অর্দ্ধবিকশিত প্রসূনসদৃশ নির্ম্মল চিত্তের কোমল দলে যে সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! সাধুসঙ্গ—সাধুসেবা বালকের দৈনন্দিন জীবনের এক অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। সন্তানের সাধুপ্রীতি-সন্দর্শনে জননী চন্দ্রাদেবীর হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইল। জননী তখনও জানেন না বালকের এই সং-সঙ্গতা তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের সুমঙ্গল সূচনা কি না। কিন্তু যেদিন বালক পরমহংস নাগা সন্ন্যাসিগণেরই ন্যায় কৌপীনমাত্র পরিহিত হইয়া চারুকুন্তলদাম-শোভিত ললাটফলকে শিশু-শশিসদৃশ সমুজ্জ্বল তিলকরাগ ধারণ করিয়া "মা, সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন, দেখ"—বলিয়া তাহার স্নেহময়ী জননীর সম্মুখে ভস্মবিভূষিত কলেবরে আসিয়া দাঁড়াইল,—সেদিন বালকের সেই সন্ন্যাসিবেশ-দর্শনে এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় জননীর অন্তস্তল সহসা কাঁপিয়া উঠিল। চন্দ্রা ভাবিলেন সাধুরা তাঁহার প্রাণের দুলালকে কোন দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না ত? সূক্ষ্মবুদ্ধি বালক মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ, আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া নানাভাবে তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্ত করিল। হায়, স্নেহান্ধ জননী! যিনি অদূর ভবিষ্যতে ভাগীরথীকূলে অদ্বৈত ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল মহিমা ঘোষণা করিবেন, সেই নররূপী নারায়ণের অনির্ব্বচনীয় যোগমায়া-প্রভাবে তাঁহার মহিমমণ্ডিত জীবনের এ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে?

উপনয়নের দিন সমাগত। সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ-বালক গদাধর পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি-অনুসারে শূদ্রাণী ধাত্রীমাতা ধনীর দীন ভবনে প্রথম ভিক্ষা-গ্রহণে কৃতসংকল্প। গতানুগতিক অন্ধ সমাজ সহস্রফণা বিস্তার করিয়া বালকের পন্থা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণকুলতিলক আজ শূদ্রাণীর অন্ন গ্রহণ করিবে! তাও কি সম্ভব? নির্ভীক, দৃঢ়ব্রত বালক বাল্য-কৈশোরের এই যৌনসন্ধিক্ষণে সুমেরুবৎ অটল, অচল। জ্ঞাতি-বন্ধুর রক্তিম চক্ষু, সমাজের ক্রুদ্ধ আস্ফালন, ভ্রাতার সকরুণ নিবেদন আজ ব্যর্থতায় পর্য্য-বসিত। বালকের সত্যানুরাগ ও ধাত্রীমাতার অকৃত্রিম প্রেমের সম্মুখে প্রবল স্রোতোমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় যুগযুগান্তের প্রাণহীন পঙ্কিল প্রথা কোথায় নিমিষে ভাসিয়া গেল! শূদ্রাণী আজ ব্রাহ্মণ-বালককে ভিক্ষাদানে কৃতার্থ হইল। নবীন প্রভাতের স্নিগ্ধালোকে সমগ্র গ্রামখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রতি গৃহে আহ্বান জাগিল—

"কে আছরে অন্ধকালা, কালের ডাকে করি হেলা।
দে খুলে দে বুকের বাঁধন লাগুক হাওয়া অন্তরে॥"

কামারপুকুরের এই নিভৃত শান্তিনিকেতনে অপূর্ব্বপ্রতিভাসম্পন্ন বালকের ঐশী শক্তি অনুভব করিয়া ভাগ্যবান কেহ কেহ ধন্য হইয়া-ছিলেন। বালকের নয়নাভিরাম দিব্য মুখকান্তি, স্বচ্ছ সরলতা, গভীর ভাবোন্মত্ততা,—সর্ব্বোপরি তাহার দুর্জ্জয় আকর্ষণী শক্তি গদাধরকে অনেকের হৃদয়মন্দিরে অজ্ঞাতসারে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল। ধর্ম্মদাস লাহার বর্ষীয়সী

বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী বালকের সুধাকণ্ঠে দেবতার পুণ্যকথা ও ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধা হইয়া তাহাকে বলিতেন, "হ্যারে গদাই, তোকে সময় সময় ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল দেখি? হ্যারে সত্যি সত্যি ঠাকুর বলে মনে হয়।" বাৎসল্যরসে আপ্লুতা প্রসন্নময়ী সোহাগভরে বালককে ফল মিষ্টি খাওয়াইয়া আনন্দে ভরপুর হইতেন।

গ্রামের বৃদ্ধ শ্রীনিবাস আপন মনে দেবতার উদ্দেশে মালা গাঁথিতে বসিয়াছে। কোথা হইতে সহাস্যবদন বালক গদাধর অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া শ্রীনিবাসের সম্মুখে উপস্থিত! প্রেমভরে ডগমগ সরলচিত্ত শ্রীনিবাস সাধ মিটাইয়া বালককে পুষ্পমালায় ভূষিত করিল;—তাহার শ্রীমুখে পূজার নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিল। বালক দিব্যভাবে আত্মহারা,—শ্রীনিবাস-নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা। ভক্তশিরোমণি বৃদ্ধ শ্রীনিবাস বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, "বাবা গদাই, আমি ভজনহীন দীন হীন কাঙ্গাল। এ সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া যাইবার দিনও সন্নিকট। তুমি জগতের হিতের জন্য ভবিষ্যতে কত কি কার্য্য করিবে তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইবে না। বাবা, তোমার নিকট এ দীনের এই মিনতি, তুমি এ দীন কাঙ্গালকে কখনও ভুলিও না।" —বলিতে বলিতে শ্রীনিবাস ভাবাবেগে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। এ স্বর্গীয় করুণ দৃশ্য দেখিলে কাহার না হৃদয় বিগলিত হয়! শ্রীনিবাস, তুমিই ধন্য! তোমার মত ভাগ্যবান এ পৃথিবীতে দুর্লভ। মুনিঋষিগণ কোটিকল্প সাধনায় যাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ নহেন, তুমি তোমার অকৃত্রিম সরল বিশ্বাস ও শুদ্ধ প্রেমের বলে নররূপী নারায়ণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তোমার জীবন সার্থক করিলে!

একদিন যাঁহার অবতারত্ব প্রতিপাদনকল্পে বিদুষী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিতে হইয়াছিল, নরেন্দ্রপ্রমুখ পাশ্চাত্যশিক্ষাদৃপ্ত বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গ অক্লান্ত দীর্ঘ সাধনার পর যাঁহার অবতারত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজ নিরক্ষর পল্লীবাসী বৃদ্ধ শ্রীনিবাস তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ জ্ঞানে অর্চনা করিয়া অমৃতের অধিকারী হইল। কালাকালনিরপেক্ষ অপারকরুণাসিন্ধু ভগবান এমনি করিয়াই ভক্ত-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। জয়তু কামারপুকুর! তোমারই পবিত্র অঙ্কে শ্রীভগবানের করুণার উৎসধারা প্রথম উৎসারিত হইয়া জগৎকে এবার প্রেমরসে অভিষিক্ত করিয়াছে।

"জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ, জয় ভবভয়হারী।
জয়তু জয়তু পরমব্রহ্ম, জয় নররূপধারী॥"

পল্লীর জীবনস্বরূপ গদাধরের আদর ঘরে ঘরে। তাহার মনোহর কণ্ঠস্বর, লাবণ্যবিলসিত মুখ-কমল ও অভিনয়চাতুর্য্য গ্রামখানিকে সদানন্দে ভরিয়া রাখিত। কখনও বালকগলে বনফুল-মালা, পরিধানে পীতাম্বর, শিরে শিখিপাখা অধরে মুরলী, কখনও তাহার নটন-চঞ্চল সুমধুর নূপুর-ধ্বনিতে পল্লীপবন তরঙ্গায়িত। আবার কখনও কৃষ্ণবিরহবিধুরা উন্মাদিনী রাধার ভাবে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া বালক আত্মহারা। অপূর্ব্ব অভিনয়-দর্শনে রমণীমণ্ডলী কখনও বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিতা, কখনও করুণরসে বিগলিতা। এমনি ভাবে ক্ষণিকের জন্য বাস্তব জগতের সুখদুঃখ হাসি-কান্নার রাজ্য ছাড়িয়া তাহাদের সরল শুদ্ধ মন অপ্রাকৃত নিত্য বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে বিহার করিত। আজও সে লীলালহরী আড়ম্বরবিহীন পল্লী-জীবনটিকে এক স্নিগ্ধ সরসতায় ডুবাইয়া রাখিয়াছে,—আকাশ-বাতাস মধুময় করিয়া তুলিতেছে। আজও বিরহিণী পল্লীবালা-কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতেছে,—

"মিনতি রাখ হে গিরিধারীলাল।
(মম) আঁখির আগে রহ শ্যাম গোপাল॥
(তব) চরণ-তলে মোর এই তনু মন,
প্রণয়ী ফুলের মত লহ নিবেদন,
(আমি) জনমে জনমে তব প্রেমের কাঙাল॥
মিনতি রাখ হে গিরিধারীলাল॥"

দ্বিতীয় পর্ব্ব

কামারপুকুরে বাল্য ও কৈশোরলীলা সমাপন করিয়া আজ গদাধর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মাতৃ-পূজার পূজারী। যুবক দিব্যোন্মাদনায় পাগল-পারা। অহর্নিশ মাতৃনাম-গানে বিভোর। শরীর শীর্ণ, হৃদয় দীর্ণ—আঁখিতে শ্রাবণের ধারা। যুগযুগান্তের সঞ্চিত বিরহবেদনা আজ যেন যুবকের প্রাণে একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই;—তাঁহার হৃদয়-যমুনা উন্মদ তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া দুই কূল প্লাবিয়া মাতৃ-সন্ধানে ছুটিয়াছে। ভক্তহৃদয়ের সে মৌন বেদনা ভাগীরথীবক্ষেও কম্পন তুলিয়া আজ অস্থিরতরঙ্গে দুলিতেছে; বৃক্ষের প্রতি মর্ম্মরে সে করুণ সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে; পাগলা হাওয়া দিকে দিকে সে বিলাপ-বার্ত্তা বহন করিয়া ছুটিয়াছে। আজ কামারপুকুরেও স্নেহময়ী জননীর হৃদয়দ্বারে সে তরঙ্গ প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে। প্রাণের দুলালকে জননী স্বগৃহে আহ্বান করিলেন। ভাবিলেন, শ্যামশষ্পাস্তীর্ণ স্নিগ্ধচ্ছায়াশীতল এই স্বাস্থ্যমন্দিরের শান্ত আবহাওয়ায় প্রাণপ্রতিম প্রিয় পুত্রের উন্মাদনার উপশম হইবে। মাতৃভক্ত যুবক মাতৃ-আহ্বানে সাড়া দিলেন। কামারপুকুরে আবার আনন্দের হাট বসিল।

স্নেহময়ী মাতা মনে মনে স্থির করিলেন গদাধরকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবেন ও নব-বধূকে অন্তরের স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া লইবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে *নববধূর নিবিড় প্রেমের স্নিগ্ধ স্পর্শে* উন্মনা যুবকের সর্ব্ব ব্যাধির চির উপশান্তি ঘটিবে। পরিণয়-প্রস্তাবে আপনভোলা সাধকের সাগ্রহ সম্মতি-শ্রবণে মাতৃহৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল; কল্পনাপটে চন্দ্রাদেবী কত সোনার রঙ্গিন ছবিই না ফুটাইয়া তুলিলেন,—কত সুখস্বপ্ন দেখিলেন। সুযোগ্যা পাত্রীর সন্ধানে দিকে দিকে লোক ছুটিল। ব্যর্থপ্রয়াস! কোথাও পাত্রীর সন্ধান মিলিল না। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন আজন্মসিদ্ধ সাধক গদাধর অন্তরে অন্তরে সব বুঝিলেন। নৈরাশ্য-ব্যথিত জননীহৃদয়ে সান্ত্বনা দিয়া গদাধর সার্দ্ধক্রোশদূর জয়রামবাটী পল্লীভবনে "কুটাবাঁধা" বালিকার সন্ধান বলিয়া দিলেন,—সকলের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাইলেন। চতুর্ব্বিংশবর্ষীয় সিদ্ধ সাধক পঞ্চমবর্ষীয়া শুদ্ধসত্ত্বা বালিকা সারদামণিকে স্বেচ্ছায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীরূপে বরণ করিয়া লইলেন। কামারপুকুরবাসী শঙ্কর-উমার দিব্যমিলন-দর্শনে আনন্দে পুলকিত হইল; জননী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

এই অপ্রত্যাশিত পরিণয়ের নিগূঢ় রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে? বিংশ শতাব্দীর দানবীয় শক্তির উদ্দাম নর্ত্তনে নারীজাতির অবমাননা ও লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীমূর্ত্তিসকলকে ভোগমাত্রৈকসহায়া পরাধীনা দাসী বলিয়া পশু-ভাবেই সকলে দেখিতে শিখিয়াছিল। তাই বুঝি দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীজাতিকে জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ বলিয়া ফুটাইয়া তুলিতে,—নারীকে দেবীর আসনে উন্নীত করিয়া নারীত্বের ভাস্বর মহিমা জগতে পুনঃ ঘোষণা করিতে আজ নবীন যোগী সানন্দে সংসারী সাজিলেন;—পাশ্চাত্য-সভ্যতামুক্ত স্নিগ্ধ শান্ত অনাবিল গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যেই এই স্বর্গীয় অভিনয় আরম্ভ করিলেন।

কামারপুকুর-লীলানাট্যের পুনঃ পট-পরিবর্ত্তন

হইল। পরিণয়ান্তে মাতৃসাধক দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী গুরু স্বামী তোতাপুরীর পদপ্রান্তে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার বিরজ বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বৈতরাজ্যের ঘনকুহেলী ভেদ করিয়া অনন্ত চিৎসিন্ধু-সলিলে ডুবিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল অদ্বৈতবেদান্ত-সিদ্ধান্ত "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। তিনি বুঝিলেন বেদান্তে যিনি নিশ্চল নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া খ্যাত, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তি মা। শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ। এই মহাশক্তিসাগরে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইতেছে, কত হরিহর-ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ সিন্ধু-সলিলে বিলীন হইতেছেন। "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইনিই অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া, আবার ইনিই বন্ধনহারিণী ত্রিনয়নী তারা। ইনিই নির্ব্বিকল্প নিষ্ক্রিয় সমাহিত শিব; ইনিই সক্রিয়া অনন্তভাবের ভাবনী,—শিববুকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী কালী। অদ্বৈতানুভূতির এই অমৃতভাণ্ড হস্তে সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে ফিরিলেন—সকলকে এই জ্ঞানামৃত মুক্তহস্তে বিলাইবার জন্য। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া পত্নী সারদাদেবী ব্রহ্মজ্ঞ পতির সেবার অধিকার পাইয়া নিজকে ধন্য মনে করিলেন। স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞানবর্জ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে সহধর্ম্মিণীর শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

সরলপ্রাণ পল্লীবাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই স্বভাবসুলভ অমায়িকতা, প্রেমপূর্ণ হাস্য-পরিহাস, সেই গভীর তন্ময়তা, অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দিব্যাবেশ-দর্শনে আনন্দে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নীসাহচর্য্য তন্ত্রসাধন-নায়িকা যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মনঃপূত হইল না। এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁহার সরল প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কি ভ্রান্তি! যাঁহার তুষারধবল নির্ম্মল জীবনস্পর্শে বিশ্বের সমগ্র কামনার পরিসমাপ্তি ঘটে, যাঁহার অন্তরে নিখিল ভেদবুদ্ধি চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়াছে, আজ তাঁহারই চিত্তে মালিন্যের আশঙ্কা! গর্ব্বান্ধ ব্রাহ্মণীর ভ্রান্তি ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না। আজ শিষ্যের অনুগ্রহদৃষ্টিতে ভৈরবীর অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল, তাঁহার হৃদয় দিব্যালোকে ভরিয়া গেল। করুণাবতার বিশ্বগুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে নদীয়ার পূর্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জ্ঞানে স্বহস্তে পুষ্পচন্দনে ভূষিত করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া ভৈরবী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণির স্বর্গীয় দাম্পত্য জীবন আধ্যাত্মিক জগতে এক অভিনব অবদান। কামারপুকুরের পুণ্যভূমিতে যে দাম্পত্য জীবনতরু প্রথম অঙ্কুরিত, পুষ্পিত ও ফলসম্ভারে মণ্ডিত, দক্ষিণেশ্বর-তপোবনে তিমিরাঞ্চলা ঘোর অমানিশায় ষোড়শী মহাবিদ্যারূপে স্বপত্নী-পূজায় তাহারই পূর্ণ পরিণতি। এ পবিত্র দাম্পত্য জীবন ভোগতপ্ত আর্ত্ত মানবের চিরশান্তি-পরিমল। শ্রীরামকৃষ্ণও একাধারে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী; সারদাদেবী একাধারে গৃহিণী ও যোগিনী। শিব-শক্তি দুইটী হৃদয় একই সূত্রে গ্রথিত,—দুইটী মহাভাবের চির সম্মিলন, যেথায় বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই; আছে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত গম্ভীর পবিত্র প্রেমের শাশ্বতী দ্যোতনা। এই স্বর্গীয় সমবায় জগতে বিরল। ইতিহাস এতত্তুল্য দ্বিতীয় আলেখ্য অঙ্কিত করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই। একমাত্র কামারপুকুরের পুণ্য-ক্ষেত্রেই এই দাম্পত্য পারিজাত-বৃক্ষের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। বিশ্বের জনক-জননী এমনি করিয়াই জন্মকর্ম্মভূমি কামারপুকুরকে সর্ব্বভাবের অমৃতসলিলে অভিষিঞ্চিত করিয়া উহাকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন।

আজও অদূরে জননী-জন্মভূমি জয়রামবাটীর উন্নতশীর্ষ মাতৃমন্দির প্রতিদিন প্রভাতের কনক-কিরণে,—নিস্তব্ধ নিশীথের শুভ্র জ্যোৎস্নায়,—অপূর্ব্ব শোভায় ঝলমল করিয়া উঠে। আজও দিবা বিভাবরী পিককণ্ঠে মধুর মাতৃনাম সাবলীল ছন্দে ধ্বনিয়া উঠে। আজও ধীর মন্থরপ্রবাহী আমোদর মাতৃপদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া কলকল নাদে নীলসিন্ধু পানে ছুটিয়া চলে। হে অমৃতপথযাত্রী, তৃষ্ণাকাতর শ্রান্ত পথিক! ঐ দেখ পল্লীহৃদিমন্দিরে শান্ত সমাহিত অধিষ্ঠাত্রী জননী সুধাপাত্র হস্তে বিশ্বের কল্যাণকামনায় তোমারই প্রতীক্ষায় গভীর ধ্যানে নিমগ্না। ভক্তি-পূরিত হৃদয়ের প্রেম-পুতার্ঘ্য ঐ রাতুল চরণে উপহার দিয়া আজ মাতৃ-আশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য হও।

ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসবিনী কামারপুকুর ভূমি। আজ তুমি একাধারে অযোধ্যা ও বৃন্দাবন, বারাণসী ও নদীয়া,—অনন্তভাব-তানতরঙ্গিণী বিচিত্র মিলনভূমি, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবভাবের ত্রিবেণীসঙ্গম। তোমারই স্নিগ্ধ শ্যামল অঙ্কে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণের পূর্ণ আবির্ভাব; তোমার প্রতি ধূলিকণা বাৎসল্য-রস-সরযূর সলিল-সিঞ্চনে—গোপীপ্রেম-যমুনার স্নিগ্ধ পরশে পবিত্র ও মধুময় হইয়া রহিয়াছে! তোমারই দিগন্ত-বিস্তৃত শস্য-শ্যামল প্রান্তরে বিচ্ছুরিত সুষমার মাঝে উন্মুক্ত উদার অম্বরতলে প্রকৃতির নগ্ন শিশু কখনও ভাব-সমাধির অতলতলে নিমগ্ন; আবার কখনও শ্মশানের সাম্যরাজ্যে শান্তির সন্ধানে সাধনায় সমাহিত। কখনও পল্লী-পান্থ-নিবাসে সাধুসঙ্গে, কখনও কূটতর্কমুখরিত পণ্ডিতসভায় জটিল প্রশ্ন-সমাধানে, কখনও পল্লীবালাগণের গৃহাঙ্গনে বিচিত্র ক্রীড়া-কৌতুকে ও পুরাণকথা-কীর্ত্তনে, আবার কখনও বা বৃন্দাবনলীলার অতুলিত প্রেমাভিনয়ে এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সমুজ্জ্বল অভিনব বিকাশ-দর্শনে সকলে ধন্য ও মুগ্ধ হইয়াছে। হে অবতারপ্রসবিনি! তোমারই বিশাল বক্ষে সমাজকণ্ঠাবরোধী অর্থশূন্য আচারের বিরুদ্ধে যুগকল্যাণে উদারচরিত্র নররূপী নারায়ণের প্রথম অভিযান; অনন্তভাববিগ্রহ ঠাকুরের দাম্পত্য ও সন্ন্যাসলীলার স্বর্গীয় সুষমা-বিস্তার। তোমারই পবিত্র অঙ্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমরস-পানে দিকে দিকে বাল-বৃদ্ধ-বনিতা মাতোয়ারা, নয়নে নয়নে ধারা, উন্মদ কীর্ত্তন-নর্ত্তনে সকলে আত্মহারা। কালের বধির যবনিকা ভেদ করিয়া আজও সেই অপূর্ব্ব লীলাকীর্ত্তি-গাথার মধুর মূর্চ্ছনা বিপুল উচ্ছ্বাসে দিকে দিকে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। অন্ধ বধির আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না। পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেশ্বর-তপোবনে যে মহা-পুরুষের দিব্য জীবন দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ অলৌকিক কঠোর সাধনায় বিচিত্র দর্শন ও অনুভূতির স্নিগ্ধা-লোকে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার অত্যুচ্চ উদার ধর্ম্মসমন্বয়াত্মক সার্ব্বভৌম আধ্যাত্মিক আদর্শ গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-জীবনের সুখসম্মিলনে হিংসাকলহপূর্ণ জগতের সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম যাঁহার সাধনাপূত জীবনের প্রতিকার্য্যে নবচেতনা লাভ করিয়া পথ-হারা পথিককে প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, তাঁহার কামারপুকুর-জীবনের প্রত্যেক লীলা-খেলার মধ্যে তাঁহার পরিণত জীবনেরই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি-দর্শনে আনন্দে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

আজ এস উচ্চ, এস নীচ; এস প্রাজ্ঞ, এস মূর্খ; এস ভক্ত, এস পাষণ্ড; এস গৃহী, এস সন্ন্যাসী;—যে যেখানে আছ, ছুটে এস এই দিব্য তীর্থধামে, যাহার প্রতিরজঃকণায় ভগবানের শ্রীপাদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে; যেখানে আকাশে

বাতাসে, বিহগকূজনে, বায়ুর নিঃস্বনে, পত্রের প্রতি মর্ম্মরে, শ্বেত শতদলের শুভ্র হাস্থে, জ্যোৎস্নার বিমল লাস্তে, প্রতি কুঞ্জে, প্রকৃতির শ্যামল অঞ্চলে, প্রিয়তমের মধুর স্মৃতি নিত্য নব ছন্দে, ফুটিয়া উঠিতেছে। এস, আজ বিশ্বপিতা বিশ্বজননীর পবিত্র প্রেমসিন্ধুসলিলে অবগাহন করিয়া কোটি-জন্মার্জ্জিত আবিলতা ধৌত করিয়া ধন্য হই। আর হিংসাদীর্ণ বিশ্ববুকে প্রেমের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া কামারপুকুর-লীলামৃত মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া জগতের তৃষিত কণ্ঠে শান্তি-বারিসিঞ্চনে সহায় হই।

"জাগো উঠ উঠ, বাঁধ কটিতট শুন শুন
বাজে বিষাণ।
কাঁপায়ে ভূতল, বীর চল, তোল ধর্ম্ম-
সমন্বয়-নিশান
রামকৃষ্ণ নামে এবে ধরাধামে নরাকারে
হের শ্রীভগবান।
মোহ দূরে ফেলে, বক্ষ-রুধির ঢেলে,
পূজ পদে বলি দাও রে প্রাণ॥
জনম ধন্য হবে ব্রহ্মানন্দ-লাভে, সুখের
সাগরে হবে ভাসমান।
না রবে ভবভয়, নেহারি সর্ব্বময়, নিত্য
সত্য বিভু সর্ব্বশক্তিমান।"
—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।—
ওঁ মধু! ওঁ মধু! ওঁ মধু!

'যদা নাহং তদা মোক্ষঃ'

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

মানব-জনম
লভিয়াছি ব'লে
গরব আসিল প্রাণে,
কতটুকু আর
ব্যবধান হ'বে
আমাতে ও মহাজনে?
শুনিনু সেদিন
বজ্র-নিনাদে
ঘোষিয়া বলিছ তুমি,
"গর্বিত মানব
কেঁদে মরে শুধু
অহংএর পথে ভ্রমি।"

গরব যেদিন
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
হ'ল ধূলিকণা সম,
আশা এলো মনে
পিয়াসা মিটিবে মম।
সেদিন শুনিনু
সুমধুর রবে
কহিতেছে মোরে একা—
"'আমি' বলে যদি
কণাটুকু রহে
মিলিবে না মোর দেখা।"

মরা ভাষা

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

আজকাল ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ প্রায়ই নিজেদের সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে সংস্কৃত ভাষাটিকে dead language বা 'মরা ভাষা' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যদ্যপি ভারতে ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচারকগণই মূলতঃ তাঁহাদের এতাদৃশ মনোবৃত্তির সৃষ্টিকর্ত্তা, তথাপি সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার এই অভূতপূর্ব্ব বিশেষণটী ব্যবহার করিবার কালে তথাকথিত আধুনিক ভারতীয়গণের উক্তিসমূহকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ভাষা বস্তুতঃ মরা ভাষা কিনা তাহাই আমি এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, ভাষার মত একটী অচেতন পদার্থকে সজীব অথবা নির্জ্জীব বলিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে প্রাণিগণের সহিত তাহার সাম্য কল্পনা করিতে হইবে। প্রাণীর মধ্যে যে সমুদয় গুণের অভাব হইলে তাহাকে মৃত বলা হয়, কোন ভাষার মধ্যেও যদি তৎস্থানীয় গুণসমূহের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায় তবেই তাহাকে 'মরা ভাষা' বলা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রাণিগণের মৃত্যু-সূচক সাধারণ ধর্ম্মসমূহ সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আছে কি না আলোচনা করিলেই আমরা উহার উপরোক্ত বিশেষণটীর সঙ্গতি বা অসঙ্গতি অবগত হইতে পারিব।

মৃত প্রাণীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ গুণ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে:

(১) মৃত প্রাণী গতিশীল নহে, (২) ইহার প্রজনন-ক্ষমতা নাই, (৩) ইহা কোনরূপ ভাব-প্রকাশে অক্ষম, (৪) ইহা মানুষের আনন্দ-উৎপাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং (৫) ইহাতে প্রাণ বা চৈতন্যের সম্পূর্ণ অভাব থাকে।

অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় এই পাঁচটি বিষয়েই সম্পূর্ণ বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। যথা:

(১) সংস্কৃত ভাষা গতিশীল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষা যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল, বর্ত্তমানে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার সম্পূর্ণ অভাবে যদিও তাহা তাদৃশ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে না, তথাপি ভারতবরেণ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সাধনার ফলে আজও তাহার গতি একেবারে অল্প নহে। এই বাংলা দেশেও কলিকাতা-সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ বহুতর নব-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহার প্রমাণ দিতেছেন।

ভারতের বিভিন্ন সমৃদ্ধ নগরী হইতে সংস্কৃত ভাষায় কতিপয় সংবাদ-পত্রও প্রকাশিত হইয়া ইংরাজী-শিক্ষিত পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্ত উক্তির অযথার্থতা প্রমাণ করিতেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কাশীধাম হইতে প্রকাশিত 'সন্দেশঃ' নামক পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(২) সংস্কৃত ভাষার অদ্যাপি অফুরন্ত প্রজনন-ক্ষমতা বিদ্যমান। হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া, আসামী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী প্রভৃতি ভারতের প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ ভাষাই সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। অদ্যাপি

এই সকল ভাষায় নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়া সংস্কৃত ভাষার সজীবতা প্রমাণ করিতেছে। নব নব ভাব অবলম্বনে ভারতের নির্য্যাতিত পণ্ডিতগণ যে সমুদয় নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন, তাহা দেখিয়াও কোন্ বিবেচক ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার প্রজনন-ক্ষমতা অস্বীকার করিতে পারিবেন? কেবল মাত্র নূতন কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াই সংস্কৃত ভাষা বিরত নহে, মাত্র সেদিনও কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া এই ভাষার সজীবতা ও প্রজনন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে।

(৩) নব নব ভাবপ্রকাশে সংস্কৃত ভাষা অদ্যাপি জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার সমকক্ষ। ভারতের বিভিন্ন মনীষী কর্ত্তৃক রচিত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থের নাম এই বিষয়ের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবল মাত্র কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াই আমি বিরত হইতেছি। কৃষ্ণমূর্ত্তি শাস্ত্রীর রচিত 'প্রকৃতিবিলাস-কাব্যম্', মঃ মঃ শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্যের রচিত 'ঋতুবিলাসঃ', বর্ত্তমান লেখকের রচিত 'মানব-প্রজাপতীয়ম্' এবং এই জাতীয় অন্যান্য অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠকগণ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) শ্রোতৃবর্গের আনন্দ-উৎপাদনে সংস্কৃত ভাষা জগতের যে কোন ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। অন্যান্য ভাষাসমূহ কেবল সেই সকল ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগকেই আনন্দ দান করিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা যে কোন মানবকে (সে সংস্কৃত জানুক বা না জানুক) আনন্দ দানে সমর্থ। আমি আজ পর্য্যন্ত এমন মানুষ দেখি নাই, কালিদাসের 'মেঘদূত' বা অন্য যে কোনও সুললিত সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোকসমূহ শুনিয়া প্রীতিলাভ করেন নাই।

(৫) সংস্কৃত ভাষা প্রাণহীন ত নহেই, বরং ইহার মত প্রাণবান্ অন্য কোন ভাষা আছে কি না সন্দেহ।

এই বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে জানিতে হইবে ভাষার প্রাণ কি? বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধনের মতে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা; আবার বর্ত্তমান জগতে যাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, সেই সুবিখ্যাত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে রসই কাব্যের আত্মা। কাব্যের আত্মা অবগত হইলে তাহাকেই আমরা ভাষার প্রাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। বস্তুতঃ ধ্বনি রস বা এই জাতীয় অন্যান্য পদার্থের মধ্যে যে সমুদয় বৈচিত্র্য বিদ্যমান, তাহাই ভাষার প্রাণ। এই সত্য কথাটি স্বীকার করিয়া লইলে জগতের অন্য কোনও ভাষাই প্রাণবত্তায় সংস্কৃত ভাষার সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হয় না। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুকরণে ইংরাজীতেও rhetoric বা অলঙ্কারশাস্ত্র রচিত হইয়াছে; কিন্তু সারবত্তায় ইংরাজী rhetoric সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের পাশেও দাঁড়াইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীরা এই বিষয়ে স্বমতের সমর্থক কোনও যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া সোজাসুজি বলিয়া থাকেন যে, যে হেতু সংস্কৃত-ভাষা কোনও জীবিত মানবজাতির কথ্য ভাষা নহে, অতএব ইহা মৃত।

প্রথমতঃ আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই—জগতের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ভাষাসমূহ কোন্ জাতির কথ্য ভাষায় রচিত? সাহিত্যিক বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের কোন্ অংশে কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে? সাহিত্যিক ইংরাজী ইংলণ্ডের কোন্ অংশের কথ্য ভাষা এবং সাহিত্যিক আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা-সমূহই বা আরব,

পারস্য প্রভৃতি দেশের কোন্ কোন্ অংশে মানবের কথ্য ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ?

পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন—জগতের যে কোনও সুসমৃদ্ধ ভাষা অনুন্নত কথ্যভাষা-সমূহ হইতে আপনাকে বহু-দূরে লইয়া গিয়াও যদি 'মরা ভাষা' নামে অভিহিত না হয়, তাহা হইলে জগতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভাষা, ভারতের জ্ঞানগরিমার একমাত্র ভিত্তিভূমি, ভারতীয় হিন্দুদের জীবন-মরণের চির-সখী এই মহতী সংস্কৃত ভাষা কি কারণে 'মরা ভাষা' নামে অভিহিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ আসামী, গুজরাটী, উড়িয়া, সিন্ধী প্রভৃতি এক একটী ভারতীয় ভাষা এবং এই-রূপ অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার প্রত্যেকটীতে উক্ত ভাষাবিদ্ যতজন লোক পাওয়া যায়, সমগ্র ভারতে সংস্কৃতভাষাবিদ্ ব্যক্তিগণের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। মানুষের মধ্যে বহুল প্রচারের অভাবে যদি সংস্কৃতকে মরা ভাষা বলিতে চাও, তাহা হইলে পূর্ব্বে ঐসকল ভাষাকে এই বিশেষণে বিশেষিত কর।

সংস্কৃতভাষাবিদ্গণের বক্তৃতাশক্তি, সাহিত্যিক সাধনা এবং পরস্পর আলাপনের ক্ষমতা সম্পূর্ণ না জানিয়া যে সকল একদেশদর্শী লোক সংস্কৃতকে মরা ভাষা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের এতৎসম্বন্ধীয় উক্তিগুলি অন্ততঃ একবারও পড়িয়া দেখেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদৃশ কতিপয় মহাপুরুষের কয়েকটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে।......এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ তিনিও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন।"—স্বামী বিবেকানন্দ

"না জানি সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কী এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিদ্যমান, যাহার ফলে আমরা বৈদেশিক হইয়াও সর্ব্বদা ইহার জন্য উন্মত্ত। অমৃত অতিশয় মিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মিষ্ট।"—এইচ. এইচ, উইলসন

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান বিপদ্‌রাজি মস্তকে লইয়াও, অনবরত সামাজিক বিপ্লব, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্কার এবং বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিয়াও অদ্যাপি এক-মাত্র সংস্কৃতই এই বিশাল দেশের সর্ব্বত্র কথ্য-ভাষারূপে বিরাজমান।"—ম্যাক্সমূলার

"সংস্কৃত ভাষার মৌলিকতা যাহাই হউক ইহার গঠন অতি অপূর্ব্ব ; ইহা গ্রীক্ ভাষা হইতেও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ, ল্যাটিন অপেক্ষাও অধিকতর সমৃদ্ধ এবং ইহাদের উভয়টী হইতেই সংস্কৃত অধিকতর সমৃদ্ধ।"—স্যার উইলিয়ম জোন্স

"ভবভূতি ও কালিদাসের রচিত শ্লোকসমূহ এত সুমিষ্ট, এমন সুন্দর এবং এত সুললিত যে, ইহা না দেখিলে কোনও ভাষা যে এত সুন্দর হইতে পারে, ইহা অনুমান করা অসম্ভব।"—উইলসন

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁহার 'Discovery of India' নামক গ্রন্থে যদিও সংস্কৃতকে মরা ভাষা (dead language) নামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি ইহার মধ্যে যে অফুরন্ত প্রাণবত্তা বিদ্যমান তাহা ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন—উপ-রোক্ত মনীষিগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহ দেখিয়া ও সংস্কৃত ভাষার সংস্পর্শে না আসিয়া তাহাকে মরা ভাষা নামে অভিহিত করা সমীচীন কি না।

সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই উহা কি ভারতে কি বিদেশে

সর্ব্বত্র প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিকট চিরদিন সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'Hindu Colonies in the Far East' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় সুদূর অতীতে বহু দূরবর্ত্তী প্রাচ্যের চম্পা প্রভৃতি রাজ্যে সংস্কৃতই রাষ্ট্রভাষার গৌরব লাভ করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দ চীন ও জাপান গিয়া সেই সকল দেশের দেবমন্দির-সমূহে সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকসমূহ খোদিত দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মানীতে সংস্কৃত ভাষার গবেষকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব লাভ করিতেন। প্রাচীন ভারতের গৌরবময়ী রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া যদি ভারতীয় জনগণ এখনও ইহার চর্চ্চা ও সমৃদ্ধি-সাধনে যত্নবান হন, তাহা হইলে কেবল যে এই ভাষারই গৌরব বর্দ্ধিত হইবে এমন নহে, ইহার ফলে তাঁহাদের নিজস্ব জাতীয় গৌরবও শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

তোমার আলো

শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

তোমার ধ্যানের আগুন দিয়ে
তোমার ছবি আঁকি;
আমার মনের রঙের খেলা
হলই বা সব ফাঁকি।
তোমার গানের একটি কলি
অজানিতে কখন বলি
আবার তুলি টানি,
কতই সুরে কতই রূপে
আমার মনে চুপে চুপে
বাজে তোমার বাণী।

তোমার চোখের কানায় কানায় ছবি,
রঙের লীলায় ডুব দিয়েছে কবি।
যে রূপ ছিল অসীম নীলে
তারই পরশ আমায় দিলে,
অবাক হ'য়ে দেখি;
নীরব তুমি চোখের জলে
কেমন ক'রে মুখর হ'লে
আমায় বলবে কি?

মধুর তোমার নিখিল আমায় ডাকে,
আমার ঘরের ভার দিয়ে যাই কাকে?
দূরের পথে একলা যাওয়া
তোমার আলোর পরশ পাওয়া
থাকবে কি আজ বাকি?
আমার ঘরে দীপের আলো
তাতেই তোমার আগুন জ্বালো,
মাটির ঘরে তোমার রূপের
লীলায় ডুবে থাকি।

ডাঃ আনন্দীবাঈ যোশী

শ্রীবেলা দে

মহাকালের অতল গহ্বরে কত জীবন, কত সভ্যতা যে হারিয়ে যায় কে তার সন্ধান রাখে? যে জীবনকে সমসাময়িক কাল আদর করেছিল, অনন্তকাল হয় তো তার কোন স্মৃতিই ধরে রাখল না! আবার সমসাময়িক কাল যাকে উপেক্ষা করেছিল ভাবী কালের কাছে সে হয়তো পায় বিপুল সম্মান। বেঁচে থেকে মানুষ চায় উৎসাহের বাণী, চায় বরমাল্য, সে চায় তার জীবনটুকু ঘিরে হোক্ মধুর গুঞ্জনের আলাপ! এ যে পেলো না, সে বড় হতভাগ্য, তাই সমসাময়িক কালের উপেক্ষা মানুষকে দেয় অপরিসীম বেদনা। আবার যে বহুপ্রশংসিত জীবন তার সমসাময়িক কালের কাছে পেয়েছে বহু জয়মাল্য, পেয়েছে দেশ-বিদেশের অভ্যর্থনা, সেই জীবনই হলো কালের উপেক্ষিত। এই কালের উপেক্ষা সে অনুভব করে না—কিন্তু যে সমাজ, যে সভ্যতা তাকে ভুলে গেছে, অনন্তকালের কাছে তার আদর্শকে তার দানকে জীবিত রাখতে পারল না, এ কলঙ্ক সেই সমাজের সেই দেশের। আজ এমনি একজন মহীয়সী নারীর কথা মনে পড়ে গেল—যিনি সমসাময়িক কালের কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত না হলেও আজ তিনি উপেক্ষিত।

ডাঃ আনন্দীবাঈ যোশীর নাম আমাদের নিকট খুব বেশী পরিচিত নয়। যে মহারাষ্ট্রের মেয়ে জীজাবাঈ একদিন সমগ্র মহারাষ্ট্রের আরাধ্যা দেবীস্বরূপা ছিলেন, সেই মহারাষ্ট্র দেশের মেয়ে ছিলেন আনন্দীবাঈ। শিক্ষায়, সংযমে, চরিত্র-মাধুর্য্যে তিনি ছিলেন যে কোন দেশের আদর্শ-স্থানীয়া নারী। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পুণায় আনন্দীবাঈ-এর জন্ম হয়। তাঁর পিতা গণপৎ রাও ছিলেন ধর্ম্মনিষ্ঠ, অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। আনন্দীবাঈ-এর প্রকৃত নাম ছিল যমুনাবাঈ—মহারাষ্ট্রীয় রীতি অনুসারে বিবাহের পর তাঁর নাম হয় আনন্দীবাঈ। এই নামেই তিনি ছিলেন পরিচিতা। স্বাভাবিক উজ্জ্বল প্রতিভা ও দৃঢ়তা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন কিন্তু শিক্ষার জন্য যিনি একদা সুদূর আমেরিকায় গমন করেছিলেন, সেই তিনি শৈশবে একেবারেই লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না। বালিকা বয়সে গোপাল বিনায়ক যোশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্বামী ছিলেন উদারমতাবলম্বী, স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী—বলতে গেলে তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় আনন্দীবাঈ-এর শিক্ষা সফল হয়েছে।

গোপাল রাও ডাকবিভাগে কাজ করতেন, কাজেই স্বামীর সঙ্গে আনন্দীবাঈকে নানা দেশে যেতে হয়েছে। সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞা আনন্দীবাঈকে সেই সময় বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়। পূর্ব্বে রন্ধনাদি কাজ তিনি কিছুই জানতেন না। এই সময় সে বিষয়েও তিনি দক্ষতা লাভ করেন। কখনও শ্রীমতী যোশী একাকী থাকেন নি; কিন্তু তাঁকে সাহসী করবার জন্য, স্বাবলম্বী করবার জন্য তাঁর স্বামী প্রায়ই তাঁকে একাকী রেখে চলে যেতেন।

মহারাষ্ট্র দেশে অবরোধ-প্রথা খুব কঠোর কোন দিনই ছিল না; তবু আনন্দীবাঈ যখন স্বামীর সঙ্গে সমুদ্রতীরে বেড়াতেন, পাঁচ জনে তাঁকে নানাভাবে অপমান করত। মানুষের

দেওয়া লাঞ্ছনা তাঁকে ব্যথা দিলেও অভিভূত করতে পারেনি কোন দিনও। আনন্দীবাঈ তাঁর স্বামীর সাহায্যে মারাঠী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হয় বোম্বাই-এর মিশনারী স্কুলে। পরে তিনি ইংরাজি ভাষা নিপুণভাবে শিক্ষা করেছিলেন। এই জন্য তিনি বহু প্রশংসা পেয়েছেন। আনন্দীবাঈ তাঁর স্বামীর সঙ্গে শ্রীরামপুরে থাকা কালীন মিশনারীদের নিকট বিশেষ পরিচিতা হন। এইস্থানে থাকতেই পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিবার জন্য তিনি আমেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করেন। ভারতীয় মহিলাগণ উপযুক্ত চিকিৎসয়িত্রীর অভাবে বড় কষ্ট পান। এই অভাবটী সেই উন্নতমনা দম্পতী বিশেষভাবে অনুভব করেন। তাই আনন্দীবাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখেছিলেন—"চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে আমাদের দেশের একটী প্রধান অভাব দূর করবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যগ্র হয়েছি। এই সঙ্কল্প হতে কিছুতেই বিচলিত হব না।" আনন্দীবাঈ-এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য ও দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে একটী সামঞ্জস্য বিধান করে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী চিকিৎসাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করা। কিন্তু নানা কারণে গোপাল রাও ছুটী পেলেন না। তিনি শ্রীমতী যোশীকে একাকী যেতে বললেন। কিন্তু তাঁর এই বিদেশ যাবার প্রস্তাবে বহু আত্মীয়স্বজন তাঁকে নানাভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন কি তাঁর চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্ক-কালিমা নিক্ষেপের চেষ্টা করেন। অনেকের ধারণা হলো তিনি নাকি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করবেন। নানা দিক্ থেকে তাঁকে সমাজচ্যুত করবার ভয় দেখানো হলো। তিনি প্রতিবাদস্বরূপ বলেছিলেন যে তিনি মনে প্রাণে সম্পূর্ণ এ দেশীয় থাকবেন, তথাপি যদি শুধু মাত্র বিদেশ যাওয়ার জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়, সেজন্য তিনি ভীতা নহেন।

১৮৮৩ খৃঃ ৭ই এপ্রিল শ্রীমতী জনসন নাম্নী একজন খৃষ্টান মহিলার সঙ্গে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ভাবে একাকী ১৭ বছরের বালিকা সেই যুগে সুদূর আমেরিকা যাত্রা করলেন। এতে আজও ভারতে বিস্ময় লাগে। শুধু মনে হয় সৎ উদ্দেশ্য মানুষকে কতখানি সৎ সাহসের প্রেরণা দেয়। সেদিন স্বামী ভিন্ন কেহই তাঁকে হাসিমুখে উৎসাহ দিয়ে বিদায় অভিবাদন জানান নি। সেই সুদূর দেশেও সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে থাকবেন বলে নিজের আরাধ্য দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং পরিধেয় জামা কাপড় সঙ্গে নিয়েছিলেন। আশ্রমচারিণী তপস্বিনী ঋষিকন্যার মত শুধু বিদ্যালাভের জন্য বিদেশে গমন করেছিলেন। জাহাজে শ্রীমতী জন্‌সন্ তাঁকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি, এমন কি নানাভাবে দুর্ব্যবহার পর্য্যন্ত করেছিলেন, কিন্তু সেই বালিকাকে কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেন নি।

আমেরিকায় পৌঁছে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের গৃহে আনন্দীবাঈ ভারতীয় প্রথায় গৃহকন্যার আদরে থাকতেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের পরি-বারের মধ্যে তিনি অনেক ভারতীয় রীতিনীতির প্রবর্ত্তন করেন। সেই শীতপ্রধান দেশে অতি সাধারণ ভারতীয় কাপড় জামা পরিধান এবং নিজ হাতে রান্না করে আহার করতেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তিনি তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিবিষয়ক মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় আচার পালন করা সত্ত্বেও কেউ সেখানে কোনদিন তাঁকে কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞা বলতে পারে নি।

আনন্দীবাঈ ফিলাডেলফিয়া চিকিৎসা-

বিদ্যালয়ে চার বছরের শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন। যথা সময়ে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলেন। ১৮৮৬ সালের ১১ই মার্চ কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হয়ে মহাসমারোহের সহিত তাঁকে এম ডি উপাধির সনন্দ দান করেন। আজ ভারতীয় নারীর পক্ষে প্রতীচ্যে গমন কিম্বা সেখানকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় উপাধি পাওয়াকে আমাদের নিকট কিছুই আশ্চর্য্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সেই উনবিংশ শতাব্দীর একজন ভারতীয় হিন্দুনারীর পক্ষে মোটেই একাজ সহজসাধ্য ছিল না। তিনি কোন ধনীর কন্যা বা বধূ ছিলেন না; স্বামীর সামান্য অর্থে ও পাঁচজনের সহায়তায় বিদেশে অধ্যয়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিনি যে কতখানি ভারতবর্ষ ও স্বসমাজকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন তাঁর কতকগুলি পত্র থেকে আমরা উহা জানতে পারি। তিনি যখন বিদেশে, সেই সময় গোপাল রাওকে নানাভাবে সমাজে লাঞ্ছিত হতে হয়। গোপাল রাও হিন্দু সমাজের প্রতি বিরক্ত হয়ে আমেরিকায় বাস করবার সঙ্কল্প করে আনন্দীবাঈকে পত্র দেন। তিনি উত্তরে দুঃখিত হয়ে লিখেছিলেন—"হিন্দু বলে আমি গর্ব্বানুভব করি। ভাল মন্দ সকল দেশে ও সকল সমাজেই থাকে। আমি স্বদেশ পরিত্যাগের পক্ষপাতিনী নহি। এখানে যদিও কোন বিষয়ে আমার কষ্ট নেই—তথাপি আমার দ্বারা যদি দেশের কোনও কিছু উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে, তা' আমি করতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি বিষয়ে যাহাতে তাঁদের অভিজ্ঞতা জন্মে, সে বিষয়ে সময় ও শক্তি ব্যয় করা আমি স্বীয় কর্ত্তব্য বলে স্থির করেছি। অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেরই দাবী আমার উপর অধিক আছে। আমি স্বদেশে ফিরে যাব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি। এ দেশে স্থায়ী ভাবে বাস করে আপনি স্বদেশবাসীকে কি শিক্ষা দেবেন? সাধারণের অনুকরণযোগ্য আচরণ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ভারতবর্ষ, আমেরিকা নহে।" আনন্দীবাঈ আন্তরিক কামনা করতেন ভারতীয়গণ শিক্ষায়, জ্ঞানে, পদমর্য্যাদায় ইউরোপীয়গণের সমকক্ষ হোক্। তাই যখন ইলবার্ট বিল পাশ হয় আমেরিকা থেকে তিনি আনন্দ জানিয়েছিলেন। তাঁর সময় আমেরিকায় কয়েকজন ভারতীয় যুবক অভারতীয় আচার ব্যবহার করায় তিনি লজ্জিতা ও দুঃখিতা হয়েছিলেন। তাঁর মতে তাঁরা ভারতবর্ষের কলঙ্কস্বরূপ। আনন্দীবাঈ-এর স্বদেশ-প্রেম ও চিত্তের দৃঢ়তা দেখে একজন খৃষ্টান পাদরী তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন—"মিসেস যোশী যেদিন আমেরিকায় প্রথম আসেন, সেদিন যেমন ছিলেন আজও সেইরূপই আছেন।"

ভারতে ফিরে এসে হিন্দু মহিলাদের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করাই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে সফল করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁর জীবনপ্রদীপের আলোটুকুকে বড় শীঘ্র নির্ব্বাপিত করে দেয়। আমেরিকাতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। কিছুতেই নিরাময় হতে পারেন নি। মাত্র ২১ বছর বয়সেই তিনি মারা যান। চিকিৎসাজগতে ভারতীয় নারীর তিনি ছিলেন অগ্রনায়িকা। তাঁর শিক্ষার সমাপ্তি হয়েছিল, কিন্তু সাধনার সমাপ্তি হয় নি। বুকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি চলে গেছেন। তাঁর স্মৃতির আলোটুকু আজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমরা কি সেই স্তিমিত আলোর শিখাটিকে আবার উজ্জ্বল করতে পারি না? পথের সন্ধান যিনি দিয়েছেন, সেই পথটিকে পেয়ে কি সন্ধানকারীকে ভুলে যাব? জীবনে যে পূজাটি সুরু হয়েছিল উহা কি শেষ হবে না? ডাঃ আনন্দীবাঈ-এর কর্ম্ম-বহুল ক্ষুদ্র জীবনটিকে ঘিরে কবির বাণী সার্থক হয়ে উঠুক—

> "যে ফুল না ফুটিতে
> ঝরেছে ধরণীতে,
> যে নদী মরুপথে
> হারালো ধারা,
> জানিহে জানি তাও
> হয় নি হারা।"

মহাভারত

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

দিক্‌চক্রে প্রলয়ের রোষকম্প্র ভ্রুকুটী ভয়াল
স্তিমিত গম্ভীর।
দারুণ জিঘাংসামত্ত ওৎ-পাতা বাঘের মতন
শিকারের প্রাক্‌কালীন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় চিত্তবল
উদ্যত নখর দন্ত, লালাসিক্ত ক্ষুধিত রসনা,—
পাণ্ডবের প্রতিহিংসা।

ফুরালো অজ্ঞাতবাস
বিশ্বত্রাস কালরাত্রি এল
বোঝাপড়া সুরু আজ অন্ধ তমসায়
আশাদীপ্ত প্রতীক্ষায় নিশি জাগরণ
পরীক্ষা ভীষণ
জীবন্ত উদ্যোগপর্ব অস্ত্রের ঝঙ্কনা।
অর্থহীন কূটতর্ক মিছে বিড়ম্বনা,
স্বাধীনতা স্বাধিকার স্বর্গীয় সুন্দর!
ফুরালো বাঙ্ময় যুদ্ধ তাই
সাড়ম্বর সভাপর্ব বাক্যের বঞ্চনা।

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"
হায় দুর্যোধন,
আত্মঘাতী কী কঠোর পণ,
জতুগৃহে পঞ্চদেহ ভস্মসাৎ ক'রে
পঞ্চ অরাতির ভস্ম 'পরে
ভেবেছিলে নিষ্কণ্টক হ'ল সিংহাসন?
রাজ্যলোভী বুদ্ধিভ্রষ্ট হায় দুর্যোধন!
কূট বুদ্ধি ষড়যন্ত্র কোথা গেল আজ
হে দাম্ভিক ভেবেছিলে সে পঞ্চ-কঙ্কাল
পঞ্চভূতে মিশে গেছে?
হয়তো শিথিল গ্রন্থি ছিল তব বজ্রের বন্ধনে,
বীর্য্যহীন আত্মমূঢ়তায়
ভেবেছিলে পৃথিবীকে মৃৎভাণ্ডের মত
রাজ্যলোভী বর্ব্বরের হ'বে পদানত?

বঞ্চনা করেছে জতুগৃহ
ভস্মীভূত পঞ্চশব পাণ্ডবের নয়
সত্যাগ্রহী পাণ্ডবের মৃত্যু অসম্ভব,
সে পঞ্চ-কঙ্কাল
বারনাবতের পঞ্চ ব্রাহ্মণের শব।

ভারতের মনোজবা শাশ্বত অব্যয়
পুঞ্জিত বিদ্যুৎ কাঁপে মেঘবর্ত্ম জুড়ে
জ্বলন্ত রুধিরবর্ণ শিখা
পঞ্চ-মহাদীপ জ্বলে রোষবহ্নিময়
প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার দাহিকা
ভস্মাকারে পরিণত সাম্রাজ্যের স্বপ্নমরীচিকা!

উঠেছে প্রচণ্ড ঝড় কুরুক্ষেত্র ভীম রণাঙ্গনে
উদ্বেলিত প্রাণসিন্ধু উঠেছে তুফান
পাঞ্চজন্যে ওঠে রুদ্র গান
উত্তেজিত সুসংযত সত্যার্থী সৈনিক
দুর্জ্জয় নির্ভীক।
মানব-সমুদ্রে বুঝি এসেছে জোয়ার!
রক্ষা নেই আর,
মরে গেছে দম্ভ ক্রোধ, অহমিকা ডুবেছে নরকে
ভেঙে গেছে রক্ষিদল কারাগার স্বর্ণসিংহাসন
ভগ্ন-উরু হায় দুর্য্যোধন
কোথা গেল পণ?
রক্তাক্ত পঙ্কিল ভূমি দ্বৈপায়ন তীরে
করাল তিমিরে।
দিকচক্র সুগম্ভীর
শিকারের প্রাক্কালীন ওৎ-পাতা বাঘের মতন
দেখেছ কি মহামান্য রাজা দুর্য্যোধন
দীপ্ত আত্মা মহাভারতের?
দেখেছ কি মহাকাল-বন্দনার পঞ্চ দীপশিখা
প্রতিহিংসা-পরায়ণ আত্মার দাহিকা?

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রূপান্তর

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম্-এ, কাব্যতীর্থ

দক্ষিণদেশীয় একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছিল। একদিন কথা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার বাল্যজীবনের একটি কাহিনী আমার নিকট এইরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন।

বয়স আমার তখনও ষোল পার হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার মনে নানা জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল। সেই সব জিজ্ঞাসার উত্তর না পাইয়া হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শিথিল হইয়াছিল। আমি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সংকল্প লইয়া মাদ্রাজে একজন ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তুমি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাও কেন?' আমি বালকের মতই উত্তর করিয়াছিলাম, 'হিন্দুধর্ম্মে আমার আস্থা নাই।' হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য দোষ-ত্রুটির কথাও তাঁহার নিকট উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি আমার কথাগুলি শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন—'আমি তোমায় খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিব না।' অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'কেন?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যে মনোভাব লইয়া আজ তুমি হিন্দুধর্ম্মকে গালি দিতেছ, সেই মনোভাব লইয়া কাল তুমি খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবে। আর দোষ ত্রুটি কোথায়ই বা নাই? কোন্ ধর্ম্মেই বা বিকৃতি ঘটে নাই? তোমাদের গীতা সত্যই বলিয়াছেন—

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।'

তাঁহার কথাগুলি আমার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, তাই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিলাম।

এই ধর্ম্মযাজক যে খুব বুদ্ধিমান্ ও উদার-চেতা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, যিনি শ্রদ্ধা-হীন চিত্তে কোন ধর্ম্মের আলোচনা করেন, তিনি উহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারেন না। কোন ধর্ম্মের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই শ্রদ্ধা-বুদ্ধি। কিন্তু স্ব-ধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ যে শ্রদ্ধা, উহা মানুষের দৃষ্টিকে করে খণ্ডিত, অন্তরকে করে সঙ্কীর্ণ। এই খণ্ডিত দৃষ্টি পৃথিবীতে শুধু অকল্যাণই বহন করে। ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগণ পুণ্যের প্রতি লোভবশতঃ জননী বসুন্ধরাকে নররক্তে কলঙ্কিত করিতেও দ্বিধা করে না। তাই শুধু পরমতসহিষ্ণু নয়, পরমতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ধর্ম্মের অভিধানে সহনশীলতা ও উদারতা এক বস্তু নহে। উদারতার মূলে আছে শ্রদ্ধাবোধ।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু অপরের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেই আমাদিগকে শিক্ষা দেন নাই, দীর্ঘ ও অক্লান্ত সাধনার দ্বারা এই সত্যই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন 'যত মত, তত পথ'। সমন্বয়ের কথা অবশ্য ভারতবর্ষে নূতন নহে, এ দেশে অনেক মহাপুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্তন কোন মহাপুরুষই সাধনার দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মের মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করেন নাই। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্ম্ম সাধন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক

ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই মানুষ রূপান্তর বা নবজন্ম লাভ করিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মজীবন হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে, বিভিন্ন পথ আশ্রয় করিলেও মানুষ একই লক্ষ্য ভগবানে পৌঁছিতে পারে। আমরা যে প্রকার সাধনাই অবলম্বন করি না কেন, উহার মধ্য দিয়াই চরম উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারি।

সংসারে মানুষ বিভিন্ন পথ আশ্রয় করে রুচি-ভেদে বা প্রকৃতিভেদে। আমাদের শাস্ত্র বলেন—যাহা মানুষের দেশ, কাল, রুচি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির অনুকূল তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম,—যাহা এইগুলির প্রতিকূল তাহাই তাহার পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে মানুষের নিধনও শ্রেয়, কিন্তু পরধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে ভয়াবহ,—গীতার এই বাণীর মধ্যে বিন্দুমাত্র সঙ্কীর্ণতা নাই। আধুনিক মনো-বিজ্ঞানও গীতার এই বাণীরই সমর্থন করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার দ্বারা বহুত্বের মধ্যে একত্ব, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য—সমন্বয়ের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছেন, সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য চরিত্রের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মানুষের আত্মাকে মহত্তম মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। এইজন্য যাঁহারা আপনাদিগকে জড়বাদী বা নাস্তিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

কাম-কাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ সব চেয়ে বড় যে সম্পদ আমাদিগকে দান করিয়াছেন সে সম্পদের নাম অভয়। মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন—সংসারে অভয়দানের তুল্য দান নাই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিঃস্ব হইয়াও ভূরিদাতা। শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে মানবাত্মার শাশ্বত মহিমার কথা। শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশে স্থাপন করিয়াছেন, উহারও মূলে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যানুভূতি। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'যে নিজেকে পাপী মনে করে, সেই পাপী হইয়া যায়।' উপনিষদের ঋষির বাণীই যেন তাঁহার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। উপনিষদের ঋষি মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও সিংহশিশুর আখ্যানের মধ্য দিয়া মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সাধনার মধ্য দিয়া রূপান্তর বা 'ভাগবতী তনু' লাভ করিতে পারে। মানুষমাত্রেরই অন্তরে যে মহাশক্তি প্রসুপ্ত আছে এবং উহাকে জাগাইয়া তুলিলেই যে মানুষের সকল শক্তির উৎস-মুখ খুলিয়া যায়, সে কথাটিও তিনি নানা ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধ একদিন বলিয়াছিলেন,—'আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর।' তিনি প্রচার করিয়াছেন,—মনুষ্য-মাত্রই সাধনা ও তপস্যার দ্বারা নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—মানুষ পাপী নয়, দুর্ব্বল নয়, অধম নয়, হীন নয়; সে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির অধিকারী। সাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—'তাঁর কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দেনা।'

আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠেও আমরা মানুষের জয়-ঘোষণাই শুনিতে পাইয়াছি। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বেদান্তের বাণীকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের কৌশল আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। ফলতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী সাম্য ও মৈত্রীর, স্বাধীনতা ও মানবতার বাণী। তাই আমরা অভয়দাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণতি জানাই।

সৃষ্টির পূর্বে ও পরে

দেবল

সৃষ্টির পূর্বে

মহাকাল তব প্রলয়-শঙ্খ বাজিয়া উঠেছে আজ,
তড়িৎ খেলেছে দিকপাল প্রাণে কেঁপেছে বিশ্ব-রাজ,
করে হেরি' তব রুদ্র পিনাক
অনুচর সবে ছাড়ে হাঁকডাক
বিষম বিষাণ গরজি' উঠিছে—দুর্যোগময়ী রাতি,
বিস্তৃত ব্যোমে জটাভারজাল শিব-তাণ্ডবে মাতি'।
মহাকালী তব রুদ্রাণী প্রিয়া এলায়িত তাঁর কেশ,
করেতে তাঁহার রক্ত খড়্গ বরাভয়হারা বেশ,
পদে দলি তোমা শিব আশুতোষ
মুখে নাই দয়া-ক্ষমা-সন্তোষ
বিভীষণা করালিনী শিবা নরশির-মালা গলে,
ধ্বংসের তালে নাচিতে নাচিতে নেমে আসে ধরাতলে।
লীলাসহচর ভূতপ্রেত সবে দেখিতে ভীষণকায়,
নাশনছন্দে উঠিয়াছে মাতি সকলি ভাঙ্গিতে চায়,
রক্ত-ঝঞ্ঝা ঈশানের কোণে
শত শত কালবৈশাখী সনে
দুর্দম বেগে তুলিতেছে শির নভোমণ্ডল গ্রাসি',
বিষ-নিঃশ্বাস শত অজগর ত্যজিতেছে রাশি রাশি।
আকাশের বুকে মৃত্যুনিনাদে হ'তেছে অশনিপাত
উল্কা খসিছে ঝাঁকে ঝাঁকে ওই ভেদি' তমিস্রা-রাত,
লুপ্ত জগৎ-দীপালোক-ছবি—
তারকা চন্দ্র গ্রহ আর রবি—
উদ্‌বেল হ'য়ে সিন্দু ছুটেছে বন্ধনহারা প্রাণ,
মুখরা ঊর্মি তুলেছে গর্জি ধ্বংসের কুনিশান।
সংহর ক্রোধ, প্রলয়-কম্বু থামাও শম্ভু আজ,
অভয় হাস্য দেখাও সবারে—ত্যজ ত্যজ রণসাজ,
সৃষ্টি তোমায় চিনেছে এবার,
জাগ্রত তুমি হৃদয়ে সবার
ভুলে যাবে নাক কেহ তব আর শক্তি সাধনা যত,
জগৎ-জীবেরে দাও হে এবার আশা বাঁচিবার মত।

সৃষ্টির পরে

মহাকাল তব প্রলয়-শঙ্খ
থামিয়া গিয়াছে আজ,
নূতন সৃষ্টি উঠেছে বিলসি'
ভাঙিয়া জীর্ণ সাজ।
নবীন সূর্য উঠেছে গগনে,
জড়তা ও জরা নাই প্রাণ-মনে,
চির বসন্ত এসেছে পবনে,
নেমেছে স্বর্গরাজ,
অস্তে গিয়াছে ধ্বংসের চির
রক্তিম-রাঙা-তাজ।
রুদ্র কেটেছে ঝঞ্ঝা বিপদ
দীর্ঘ রজনী পার।
মরণবীণার যতেক রাগিণী—
হয়েছে ছিন্ন তার।
তমসা হৃদয় ভিন্ন হয়েছে,
শান্তি-সাগর উথলি' উঠেছে,
অসীম জীবন আঁখি মেলিয়েছে
দুর্যোগ নাহি আর
এসেছে হৃদয়, এসেছে আলোক,
কণ্ঠে বিজয় হার।
প্রলয়-নিশান তুল নি রুদ্র
দেখাতে শক্তি সব,
প্রলয় ভেদিয়া করেছ নূতন
সৃষ্টির উদ্ভব।
ভালোই করেছ প্রলয়ের ভানে
নূতন প্রভাত দিয়েছ পরাণে,
ভরা আনন্দ বিহগের গানে—
হাসিমাখা মধুরব
ভালোই করেছ এনেছ জীবন
মৃত্যুরে করি শব।

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ

শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত

মানব-ইতিহাসের যুগান্তকালে শক্তিধর মহাপুরুষগণ মানবাত্মার মুক্তি-মন্ত্র লইয়া আবির্ভূত হন। তাঁহাদের জীবন মানব-সভ্যতায় কর্ম্ম-সাধনার ইতিহাস। তাঁহাদের প্রেরণা মানুষের প্রাণের কন্দরে আপন ছন্দে অব্যর্থভাবে কাজ করিয়া চলে; তাঁহাদের আদর্শ মানবজাতিকে এক মহাসাধনার অনিবার্য সিদ্ধির দিকে পরিচালনা করে। তাঁহারা যে ভাবাদর্শ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহার ক্ষয় নাই। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যও ইহা সুস্পষ্ট স্পন্দন রাখিয়া যায়। তাঁহাদের প্রেরণা সমগ্র মানবজাতিকে এক সুমহান লক্ষ্যের পথে পরিচালনা করিয়া থাকে। জাতির এক নিদারুণ সঙ্কট-লগ্নে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দও নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানবাত্মার পরম অভ্যুদয়ের বাণী নিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মানুষকে নিছক বৈরাগ্যের পথে পরিচালনা করেন নাই; কেবল নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতার উপরই জোর দেন নাই। তিনি জাতিকে এক নূতনতর কল্যাণ-ধর্ম্মে, এক অভূতপূর্ব্ব ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাদর্শ এই জগতের বুকেই মানুষকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, বরণ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন মানুষের পূজারী। স্বামীজীর জীবন-ধর্ম্ম মানুষের সুমহান্ সৃষ্টিব্যাপার ও বিচিত্র ইতিহাসের প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে সুদূরে পলাইয়া গিয়া নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সাধনার কল্পলোক গড়িয়া তুলে নাই। মনুষ্যত্বের উদার উন্মুক্ত রাজপথে মানুষ নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অবিশ্রাম যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, অসংখ্য ভুল-ত্রুটী, ব্যর্থতা-পরাজয়, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া মানুষ পরিপূর্ণতার সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিবার জন্য পরম দুঃখের সাধনা করিয়া চলিয়াছে। চিরন্তন বিকাশের জন্য কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষের এই যে আত্ম-প্রকাশ ইহাই মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের অভ্রান্ত পরিচয়। মানবসভ্যতার এই উদার বেদিকাতলে স্বামীজী তাঁহার ধর্ম্মের সন্ধান খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মানবধর্ম্ম। স্বামী বিবেকানন্দের এই নব মানব-ধর্ম্ম যেন এক ঐকান্তিক একনিষ্ঠ আহ্বান, একটি অব্যক্ত নির্দ্দেশ। কোন্ দিকে এই নির্দ্দেশ? যেদিকে মানুষ ব্যর্থ নয়, বঞ্চিত নয়, বিড়ম্বিত নয়। তাঁহার মানবধর্ম্ম মানুষের অন্তহীন পরাজয়কে চরম বলিয়া বিশ্বাস করে নাই। পরাভবের বুক বিদীর্ণ করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধির নবাঙ্কুর উদ্গত হয়। মানুষের সর্ব্বশেষ বিজয়ের সম্ভাবনা-কেই তিনি অভিনন্দিত করিয়া গিয়াছেন, মানুষের সাময়িক পরাজয়কে নয়।

বস্তুতঃ স্বামীজীর ধর্ম্মে 'মানুষ'ই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম দর্শন ও তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বহু মৌলিক ব্যাখ্যা রহিয়া গিয়াছে এবং সেগুলির মূল্যও সমধিক কিন্তু জাতির এক মহাযুগসন্ধিক্ষণে নব জীবন-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ নির্ভীক পুরোহিত হিসাবে তিনি জীবনের যে প্রাণদ মুক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই মোহগ্রস্ত জাতিকে জাগাইবার প্রয়াস

পাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রকৃত বাণী। এই বাণীগুলির ভিতর দিয়া যে দর্শন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই তাঁহার 'জীবন-দর্শন', তাহাই 'মানব-ধর্ম্ম'। এই ভারতের বুকেই মানুষের পুরুষোত্তমকে আবিষ্কার করিবার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। স্বামীজী মানুষের মধ্যে এই পুরুষোত্তমকে দেখিয়াছিলেন। নিয়তি-নিয়মের কুটিল জালে আবদ্ধ, অসংখ্য প্রবৃত্তির ললিত ছলনায় বিভ্রান্ত দেহাধীন মানুষের উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। তাই মানুষের বিশ্বাসের রিক্ততা তাঁহাকে আঘাত করিত। মানুষকে তিনি কর্ম্ম, বল ও বিশ্বাসের মন্ত্র দ্বারাই প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। বার বার তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "He who does not believe in himself is an atheist. Believe first in yourself, then in God." স্বামীজীর মতে দুর্ব্বলতাই সব চেয়ে বড় পাপ—"Weakness is the greatest sin." মানুষের শক্তি-চেতনার স্ফুরণই জ্ঞানের স্ফুরণ, বার বার তিনি মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির সম্ভাবনার দিকে সচেতন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের ভিতরের অনন্ত শক্তি ও বিশ্বাসই মানুষকে তাহার স্বমর্য্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। শক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যেই তিনি মানুষের অন্তর-পুরুষকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতেন, "I have never quoted anything but the Upanishads and of the Upanishads, it is that one idea, 'strength'." যাহা কিছু মানুষকে দুর্ব্বল করে তাহাই তাঁহার মতে পাপ। মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত না হউক তাহাতেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু মানুষ যেন দুর্ব্বল না হয়, তাহার মনে যেন বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ না পায়। স্বামীজীর জীবনাদর্শ মানুষকে অপরাধী ভাবিয়া দূরে সরাইয়া দেয় নাই। সেজন্যই তিনি অমোঘ স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। "Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Do even evil like a man! Be wicked, if you must, on a great scale!" এই মানুষের মধ্যেই তিনি তাঁহার উপাস্যকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। "Above all, I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races." মানুষের প্রতি স্বামীজীর এই যে সম্ভ্রম, এই যে প্রেম তাহা শুধু তাঁহার হৃদয়ের উদারতার জন্য নয়। ইহা ছিল তাঁহার অন্তরতম সত্য-উপলব্ধি। মানুষ যে পাপী নয়—এই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া এবং ইহাকে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তিনি আজীবন মানুষের উদ্দেশে অভয়-বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—"It is a sin to call others sinners"—ইহাই তাঁহার বাণী। মানুষের পদস্খলন হয়, মানুষ জীবনে ভুল করে। কিন্তু চলার পথের অসংখ্য ভুল-ত্রুটি, সাময়িক ব্যর্থতা ও পদস্খলন দ্বারা মানুষের সত্যকার পরিচয় সূচিত হয় না। সু-উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য মানুষের যে সাধনা তাহাই সত্য, যাত্রাপথে পদস্খলনটি সত্য নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বই সত্য, সেই দেবত্বের সাময়িক বিকৃতি সত্য নয়। শুধু তাহাই নয়, মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তাহার জীবন-সংগ্রামকে আরও মহীয়ান করিয়া তোলে; মানুষকে তাহার বিকাশের পথে আরও উপযুক্ততা দান করে। সেজন্যই স্বামীজী বলিয়াছেন,

"There have been many mistakes in our lives. Glory be unto us that we have made mistakes! If your present condition is good, it has been caused by all the past mistakes." মানুষের প্রতি স্বামীজীর এই গভীর মমতা, এই নিঃসীম সহানুভূতি, এই অফুরন্ত প্রেম ভারতীয় আত্মদর্শনের এক সার্থক প্রকাশ। অপরিসীম লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মধ্যেও তিনি মানুষের আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পৃথিবীতেও আমরা এক নূতন মানবধর্ম্মের পরিচয় পাই। আধুনিক সমাজ-তন্ত্রবাদে মানুষের ভিতরগত সাম্য অপেক্ষা বাহ্যিক সমানাধিকারকেই বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু স্বামীজী বাস্তবজীবন-নিরপেক্ষ মানবাত্মার চিরন্তন মাহাত্ম্য এবং দেবত্বকেই সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়াছেন; তিনি সমস্ত মানুষের ভিতরগত সাম্যটিকেই প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি মানবাত্মার সর্ব্বশেষ পরাজয়কে কখনও স্বীকার করেন নাই। এই নূতন 'মানববাদ'ই বিশ্বমানবের চিন্তার ইতিহাসে স্বামীজীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। মানুষকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকে নিজস্ব মর্য্যাদা ও চিরন্তন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে নূতন প্রেরণা আজ আমরা অনুভব করি তিনিই তাহার প্রবক্তা। স্বামী বিবেকানন্দই জগতের আসন্ন নবযুগের স্রষ্টা।

"সবার উপরে মানব শক্র তাহার উপরে নাই"

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কুম্ভীরে এড়াই নদী-
জলে নাহি নামি যদি,
সর্পেরে এড়াতে পারি রহিয়া নগরে,
বন হতে দূরে থাকি
বাঘে দিতে পারি ফাঁকি,
কতই করিবে ক্ষতি ইঁদুরে বাঁদরে।

বন্যারে এড়াতে পারি
দূরে যদি রয় বাড়ী
ঝঞ্ঝারে এড়াতে পারি রোয়ে পাকা ঘরে,
কি করিবে মহামারী
ত্বরা যদি দেশ ছাড়ি
ভূকম্পে এড়াতে পারি দাঁড়ায়ে প্রান্তরে।

সবার উপরে সত্য
শুনিয়াছি মনুষ্যত্ব
বিরাজ করেন ব্রহ্ম যাহার ভিতরে;
সেই মানুষের মত
শক্র কেহ নয় অত,
মানুষে এড়াতে হয় যেতে লোকান্তরে।

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগতে অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও বিভিন্ন জ্ঞান, শক্তি, রুচি এবং সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মানুষের বাহ্যিক আকারও যেমন নানা রকম,—অন্তরের চেহারাও তেমনই বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ। আন্তরিক বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই জাগতিক বিচিত্রতার সহিত মানুষের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। বিচিত্রতার লীলাভূমি মনের উপর জাগতিক বৈচিত্র্য গভীর রেখাপাত করে। প্রত্যেক মানুষ নিজের জীবনে বিচিত্র অভাবের দ্যোতনা, বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেরণা এবং বিবিধ আদর্শের আকর্ষণ অনুভব করে। জীবনসমুদ্রের বিচিত্রলহরী একটার পর একটা আসিয়া মনে আঘাত করে। মানুষ নিজের জীবনপথে যতই অগ্রসর হইতে থাকে ততই নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য এবং অপরের সহিত পার্থক্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করে। অন্যের সহিত শক্তি, বুদ্ধি, স্বার্থ এবং অবস্থার পার্থক্য অনুভব করিয়া মানুষ নিজের জীবন রক্ষার জন্য, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে। এই প্রচেষ্টার ফলেই মানুষের সহিত মানুষের বিরোধ বাধিয়া যায়। কারণ, শরীর ও মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালীর বৈলক্ষণ্যের দরুন মানুষের বুদ্ধি, শক্তি, রুচি ও প্রয়োজনের ভেদ অনিবার্য্য এবং এই ভেদের স্বাভাবিক পরিণতিই সঙ্ঘর্ষ।

যে মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা প্রতিযোগিতার সঙ্ঘর্ষে দক্ষতা লাভ করিতে অসমর্থ হয়, এই সংসারে নিজের রুচি অনুসারে চলিয়া সে আত্মরক্ষার কোনও পথ পায় না। অথচ প্রত্যেক মানুষই নিজের রুচি অনুসারে চলিতে চাহে, নিজের ইচ্ছানুসারেই প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং ভয় প্রভৃতি অনিবার্য্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়া মানুষের জীবন বিঘ্নসঙ্কুল করে, যাত্রাপথ বন্ধুর ও দুর্গম করিয়া তোলে। ইহার ফলে অশান্তি মানব-জীবনে সহচর হইয়াই থাকে। কিন্তু যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের এত আয়োজন, প্রতিপক্ষ বিনাশ করিবার এত আড়ম্বর, সেই স্বার্থসিদ্ধিও পরিবর্ত্তনশীল এবং ক্ষয়িষ্ণু রূপ লইয়াই মানুষের কাছে উপস্থিত হয়।

পৃথিবীতে অতৃপ্তির সংস্পর্শশূন্য সুখভোগ, আত্মতৃপ্তি কাহারও অদৃষ্টে জোটে না বলিলেও চলে। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে স্বভাবতঃ যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে তাহা চালাইতে এবং নূতন নূতন যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেই মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। এই সংগ্রামের জন্যই মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ইহার জন্যই নূতন নূতন অধি-কারের দাবী রচনা করে, অভিনব অর্থশাস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আবিষ্কার করে, প্রকৃতির শক্তিকে অধিকার করিবার জন্য, প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার জন্য তাহাকেও যুদ্ধের সরঞ্জামে পরিণত করে। ইহার পরিণাম-স্বরূপে যুদ্ধের ভীষণতা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সংগ্রাম, জাতির সহিত জাতির সঙ্ঘর্ষ, সম্প্রদায়ের সহিত

সম্প্রদায়ের এবং শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সংসারকে শ্মশানে পরিণত করে। কিন্তু মানুষ এই সংগ্রাম চাহে না, এই বিরোধ দীর্ঘতর করিয়া জীবন দুর্ব্বহ করিতে ইচ্ছা করে না। মানুষ সব সময় শান্তি চায়, মানুষের অন্তরাত্মা চায় পরিপূর্ণতা, সকলের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতেই সে ব্যাকুল, ভালোবাসার মাধুর্য্য-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবার জন্যই তার প্রার্থনা।

মানুষ যদি কখনও নিজের অন্তরাত্মার দর্শন লাভ করে, তাহা হইলে সে এই বাণী শুনিতে পায় যে, সংগ্রামের দ্বারা জীবনের সার্থকতা সম্ভব নয়,—প্রকৃতির সংগ্রাম হইতে রেহাই পাওয়াই জীবনের আদর্শ। প্রাকৃত জগতে জীবনসংগ্রাম স্বাভাবিক হইলেও সে এই সংগ্রামের ঊর্দ্ধে উঠিয়া শান্তিময় রাজ্যে বাস করিবার অধিকারী এবং নিজের প্রচেষ্টায় এই দ্বন্দ্বের হাত হইতে, সর্ব্ববিধ সঙ্ঘর্ষের হাত হইতে সে মুক্ত হইতে পারে।

মানুষের অন্তরে শান্তি, তৃপ্তি, সমতা এবং প্রেমের আদর্শ নিহিত রহিয়াছে; উহাই মানুষের স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সঙ্ঘর্ষ চাহে না, শান্তির নীড় রচনা করিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন যাপন করিতে চায়। সুতরাং অন্যায় আচরণ করিবার সময়েও নিজের অন্তরস্থিত সত্যের প্রেরণায়, আত্মার নিরঙ্কুশ শাসনে অন্যায়কে চাপা দিয়া ন্যায় ও নীতির গৌরব-প্রচারের প্রচেষ্টা করে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও শান্তির বাণী আওড়ায়। হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময়েও ঘোষণা করে যে, ইহার উদ্দেশ্য শান্তি, প্রেম, ন্যায় এবং সাম্যের প্রতিষ্ঠা। বাস্তবিক মানুষের জীবনে অন্তরের স্বাভাবিক আদর্শের সহিত বাহ্যপ্রকৃতির এক দ্বন্দ্ব, কামনার সহিত পারিপার্শ্বিক জাগতিক অবস্থার এক বিরাট সংঘাত চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। মানুষের অন্তরাত্মা প্রাকৃত জগতের এই সংগ্রামকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চাহে নাই; নিজের সাধনার দ্বারা সমস্ত রকম ভেদ, দ্বন্দ্ব, কলহ এবং যুদ্ধের স্তর অতিক্রম করিয়া শান্তিময়, সৌন্দর্য্যময় এবং কল্যাণময় এক আনন্দের রাজ্যে পৌঁছিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেই চাহিয়াছে। ভেদের ভিতরে অভেদের প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যস্থাপন, দ্বন্দ্বময় জগতে শান্তি আনয়ন এবং মৃত্যুময় পৃথিবীতে অমৃতের পূর্ণবিকাশই মানবের একমাত্র ব্রত, ইহাই তাহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্যই সমাজ-সংগঠন এবং সমাজের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও পরিচালনার প্রয়োজন। সকল জ্ঞানেই ঐক্যবোধ, সমস্ত প্রেমে ঐকানুভূতি এবং সমস্ত কর্ম্মপ্রেরণায় ঐক্যোপলব্ধিই মানব-জীবনের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত লক্ষ্য। বিচার-বুদ্ধির সম্যক্ অনুশীলন করিয়া জাগতিক সমস্ত-রকম ভেদ ও বৈষম্যের মূলে এক অদ্বিতীয় প্রেমঘন চৈতন্যময়ের রসাস্বাদন করিতে হইবে, প্রেমের যথার্থ অনুশীলনের ফলে সকলের মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভব করিয়া সমস্ত জগতের সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে, সকলের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থ মিলাইয়া নিজের জীবনের সমস্ত কর্ম্মধারাকে পরম ঐক্যের অনুকূলে প্রবাহিত করিতে হইবে। এইরূপে কল্যাণকর মহান্ ঐক্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত হিংসা, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ ও অশান্তির ঊর্দ্ধে উঠিয়া বিরাট প্রেমের পবিত্র আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রতই মানবজীবনের চরম সাধনা, সমাজগঠনের পরম লক্ষ্য। নিজের জীবনের এইরূপ দ্বন্দ্বাতীত, শান্তিময় ও অমৃতময় অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে যে পরিমাণে উপযোগী করা যাইবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার পক্ষেও তাহা সেই পরিমাণে অনুকূল হইবে। কারণ, সমাজের সহিত ব্যষ্টির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। মানবজীবনকে

সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না; সামাজিক সম্বন্ধ হইতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। সমষ্টিগত জীবনের সহিত পরিচয় না হইলে ব্যষ্টিগত জীবন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয় না। মানুষ সমাজের ভিতরেই জন্মগ্রহণ করে, সমাজকে অবলম্বন করিয়াই মানুষের যাহা কিছু উন্নতি ও জীবনের বিকাশ হয়, সমাজের সুশীতল ক্রোড়েই মানুষের জীবনের যবনিকাপাত হয়। সামাজিক পরিবেষ্টনী হইতেই প্রত্যেক ব্যক্তি দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের উপযোগী করিয়া জীবন গঠন করিবার প্রেরণা পায়, মানসিক উন্নতি বা ধর্ম্মানুশীলনের রসদ সংগ্রহ করে।

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ মানুষ যে প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া জীবন গঠন করে, সমাজজীবনের উপরেও তাহার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের ভিতর যাহারা শক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও প্রভাবশালী, তাহাদের বিচার ও কর্ম্মের ধারা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। সমাজের সংগঠন বিধি ও রীতিনীতি কি ভাবে মানুষের অন্তরাত্মার অভিলাষ পূরণের উপযোগী হইয়া জনসমষ্টির কল্যাণ সাধন করিতে পারে, ইহাই সমাজ-হিতৈষীদের একমাত্র চিন্তা। সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, বিদ্বান্ ও চিন্তাশীল, তাঁহাদের হৃদয়ে এই সমস্যাই সর্ব্বদা জাগরূক থাকে।

ব্যক্তির সহিত পরিবারের, ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির, শ্রেণীর সহিত জাতির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের এবং রাষ্ট্রের সম্বন্ধ কিরূপ হইলে দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষা, ঘৃণা ও বিরোধের মূল কারণ যথাসম্ভব দূর করিয়া সমগ্র মানবসমাজে একপ্রাণ, এক জাতি ও একতার প্রতিষ্ঠা করা যায়, সামাজিক জীবন-প্রবাহ কিরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে প্রকৃত কল্যাণ হইবে, কোন জাতীয় আচরণ দ্বারা কর্ম্মের ভিতরে ঐ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিলে প্রত্যেক নরনারী মনুষ্যসমাজের মহান্ ব্রত সম্বন্ধে সজাগ থাকিয়া নিজের জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের সাহায্যে পরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে,—ইহাই সমাজের মনীষিবৃন্দের একমাত্র চিন্তা। মানুষের সহিত মানুষের নানাপ্রকার ভেদ, শক্তি ও জ্ঞানের তারতম্য, কর্ম্মক্ষেত্রের ও প্রয়োজনের বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও কি উপায়ে প্রাণের মিলন ঘটিতে পারে, বিভিন্ন প্রকৃতি ও রুচিসম্পন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়াও কোন প্রচেষ্টার সাহায্যে পরস্পর প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া শান্তির মধ্য দিয়া নিজ নিজ জীবনবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে, মানব-সমাজের পক্ষে ইহাই চিরন্তন সমস্যা। এই সমস্যা-সমাধানের জন্যই যুগে যুগে লোকাতীত প্রভাবশালী মনীষিগণ বিভিন্ন সময়ে নানারকম সমাজব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার যে বিধান অনাদিকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে তাহার ভিতরেও এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য এক মহান্ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বর্ণাশ্রম-বিধানের কথা উল্লেখ করিতে হয়। যুগযুগান্তকাল হইতে এই বর্ণাশ্রম-বিধান ভারতীয় সমাজের সকলকে এক বিলক্ষণ শ্রেণীতে,—নরনারীগণের এক মহাসমন্বয় সাধন করিয়া মনুষ্যোচিত সাধনার পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত মানবসমাজের পক্ষেই এই বিধান আদর্শ-স্থানীয়। সমাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলেও দেখা যায় যে এই বিধানের ভিতর যথার্থ কল্যাণের কারণ নিহিত রহিয়াছে।

মানুষের মধ্যে পরস্পর অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে এবং উহা অনিবার্য্যভাবেই থাকিবে। এই সকল ভেদের ভিতরও অভেদ প্রতিষ্ঠার পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমাজ সর্ব্বদাই অত্যন্ত ভয়াবহ সংগ্রামের

ক্ষেত্র হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা কেমন করিয়া সম্ভব? যে সমস্ত ভেদ অবশ্যম্ভাবী, জনসাধারণের তাহা স্বীকার করিয়া লইবার মনোবৃত্তি গ্রহণ করিয়াই হৃদয়ের প্রসার করিতে হইবে। তাহা না হইলে প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ ও অসন্তোষের অশান্তি চিরদিনই লাগিয়া থাকিবে। মানুষের মনোবৃত্তি যদি উপায়হীনতা ও নৈরাশ্যের অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহার জীবনবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। সমাজের যে ব্যবস্থা প্রত্যেক নরনারীর জীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়া না দেয় সেই ব্যবস্থা দ্বারা কখনও মানুষের সমস্যার সমাধান হয় না। সমাজ-পদ্ধতি এইরূপ হওয়া দরকার, যাহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক শ্রেণী সন্তুষ্ট চিত্তে অনিবার্য্য ভেদ স্বীকার করিয়া আপন অবস্থা, শক্তি এবং তদনুরূপ কর্ম্ম ও সাধনার গৌরব অনুভব করিয়া আনন্দের সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

যে আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত সম্পাদন করিয়া সমাজের এক গৌরবময় অবস্থা আনয়ন করা যায়, সেই আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব-বিকাশের সাধনাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা যায়, প্রত্যেক মানুষের সামনে সেইরূপ মূর্তিমান এক সজীব আদর্শ থাকা দরকার।

দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের আকাঙ্ক্ষা ও আবশ্যকতার ক্ষেত্র হইতেই মানুষের সহিত মানুষের সংঘর্ষ হয়। প্রত্যেক মানুষেরই অন্ন, বস্ত্র, গৃহ ও ধনের আবশ্যকতা আছে। প্রত্যেকের মনেই সুখ-ঐশ্বর্য্য এবং মান-সম্মানের আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আবশ্যকতা ও আকাঙ্ক্ষার বৈচিত্র্যের ফলেই একের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয়। অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এবং সুখ-সম্পত্তি ও প্রভুত্ব স্থাপনই যদি মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ঐ আদর্শকে কর্ম্মের ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টাই যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে স্বার্থের বিরোধের ফলে ব্যক্তিগত, জাতিগত ও শ্রেণীগত সংগ্রাম অনিবার্য্যভাবেই দানা বাঁধিয়া উঠে,—তাহার ফলে সমগ্র জগতে এক দুঃখদায়ক অশান্তির সৃষ্টি হয়। বাহ্যিক সম্পত্তির আদর্শকেই ভিত্তি করিয়া সেই সমাজমন্দির নির্ম্মিত হইবে, তাহার প্রারম্ভে আর্থিক উন্নতি ও রাষ্ট্রীয় প্রভাবের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব; জড় জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের এবং জাতির সহিত জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভিন্ন এই উন্নতি সম্ভব নয়, বিজিগীষার প্রেরণায় অনিবার্য্য সংঘর্ষের রক্তাক্ত পথেই এই উন্নতি আসিয়া থাকে। অতএব এই উন্নতিকে জনসাধারণের কল্যাণকর উন্নতি বলা চলে না। যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি প্রখর, সংগঠনশক্তিরও যাহাদের প্রাচুর্য্য আছে, কেবল মুষ্টিমেয় সেই অল্প কয়েক জন লোকেরই এই উন্নতি —ধন, সম্পত্তি ও প্রভুত্ব বিস্তারের সম্ভাবনা। যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিহীন ও দুর্ব্বল তাহার পক্ষে এই উন্নতি সম্ভব নয়। সে ধনী ও শক্তিমানদের স্বার্থ-সাধনের উপকরণ প্রস্তুত করিয়া কোন রকমে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে। অন্য দিকে শক্তিশালী প্রভুশ্রেণী সর্ব্বদা শক্তি ও প্রভুত্বের হানি ঘটিবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকে, স্বার্থের সংগ্রামে কিছুটা জয়লাভ করিলেও তাহাদের অদৃষ্টে সুখ ও শান্তিলাভ অতি অল্পই হয়। এই বাহ্যিক আদর্শ বা ভালোভাবে বাঁচিবার প্রেরণাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিলে মানবসমাজ ক্রমশঃ সংগ্রামশীল হইয়া উঠে। তখন রণ-নিপুণতাই সভ্যতার চরম নিদর্শন হয়। এই সভ্যতার আওতায় থাকিয়া কোন ব্যক্তি, কোন শ্রেণী বা জাতি দীর্ঘকাল প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারে না। ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব—এই দুইটী চিরকালই একের হাত হইতে অপরের হাতে

যায়। ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব যখন যাহার করায়ত্ত হয় তখনই সে আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। নিজের আত্মরক্ষার জন্যই সে তখন জনসাধারণের হিতকারী সাজিয়া বসে, জনগণের কল্যাণ-কামনায় অর্থব্যয় করে, কিয়ৎ পরিমাণে নিজের প্রভুত্ব-শক্তি পর্য্যন্ত হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। ইহা তাহার স্বার্থসাধনের জন্যই আবশ্যক, সাধারণের বা সমাজের সেবার জন্য স্বার্থত্যাগ করিবার কোন প্রেরণাই ইহার মূলে থাকে না।

বাহ্যিক সম্পত্তি-সঞ্চয় বা ভালোভাবে বাঁচিয়া থাকাই আদর্শ হইলে সমাজে শান্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না, সাম্যপ্রতিষ্ঠার যোগ্যতা বা সংঘর্ষ পরিহার করিবার উপায় থাকে না, মানবের উন্নতির জন্য কোন প্রেরণাও পাওয়া যাইতে পারে না। এই আদর্শ অনুসরণ করিলে যুদ্ধের পর যুদ্ধ, বিপ্লবের পর বিপ্লব অনিবার্য্য। এই বিপ্লবের আঘাতে ব্যথিত হইয়াই মহামানবের অন্তরাত্মা হাহাকার করিয়া উঠে, শান্তির জন্য আকুলি বিকুলি করে। মানবের অন্তরাত্মার এই আর্ত্তনাদ, দুঃখক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য এই মর্ম্মস্পর্শী আবেদন এই সমাজেরই কোন কোন কবি, দার্শনিক ও ধার্ম্মিকের বাণী হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সামাজিক জীবনে অন্তরের এই দুঃখ দূর করিবার কোন উপায়ই এই বাহ্যিক সম্পত্তির আদর্শবাদিগণ দেখাইতে পারে না। এই আদর্শ অনুসরণকারী সভ্যতার পরিণামে আজ সমগ্র বিশ্বে সকলেই অপরের ভয়ে সন্ত্রস্ত, সকলেই আত্মরক্ষার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াও ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিতেছে।

মানব-সমাজকে যথার্থ মানবতা-বিকাশের যোগ্য এবং সাম্য, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার করিবার জন্য এমন একটী আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া সামাজিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, যে আদর্শ মানবের স্বাভাবিক সুখ, সম্পত্তি এবং প্রভুত্ব-বাসনার উপর নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে,—যে আদর্শের সম্মুখে মানুষের এই বাহ্যিক সুখ, সম্পত্তি এবং প্রভুত্বের স্পৃহা নিজ হইতেই লোপ পায়, যে আদর্শ মানবের অন্তরাত্মার আদর্শকেই বাহ্য জীবনের শক্তিশালী নিয়ন্তা করিয়া তুলিতে পারে। যে সামাজিক বিধান হইতে মানুষের আধিভৌতিক প্রয়োজন আধ্যাত্মিক আদর্শদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কাম ও অর্থ ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত হয়,—আত্মিক উন্নতির তারতম্য দ্বারা সামাজিক মর্য্যাদা নিরূপিত হয়,—জ্ঞান প্রেম, ত্যাগ ও তপস্যার স্থান সুখ-সম্ভোগ, ধন-সম্পত্তি এবং প্রভুত্বের বহু উপরে স্বীকৃত হয়,—তাহাই প্রকৃত সমাজ-বিধান। এইরূপ বিধানের ফলেই মানবসমাজের অনন্ত ভেদ থাকা সত্ত্বেও যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা ও সমপ্রাণতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, অশান্তির মূলীভূত বহু প্রাকৃতিক নিয়ম থাকা সত্ত্বেও শান্তি-স্থাপন সম্ভব হয়।

ভারতীয় ঋষিগণ সামাজিক বিধান নির্দ্ধারণ করিবার সময় এই দিকেই প্রধান ভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন,—শ্রেষ্ঠ আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজের সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে একটী বিরাট সমাজদেহরূপে কল্পনা করিয়া বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সম্প্রদায়কে সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং সকলের সমবেত কর্ম্মধারাকে একই লক্ষ্যের অভিমুখে প্রবাহিত করিয়া শান্তি, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় মানবসমাজকে উপনীত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনিবার্য্য ভেদ স্বীকার করিয়া এই ভেদের ভিতরেও যাহাতে অভেদ প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহার প্রচেষ্টাই

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। সকল মানুষের শক্তি, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি সমান নয়, সুতরাং সকল মানুষ একই প্রকার কার্য্যে পারদর্শী হইতে পারে না। সামাজিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়া নিজ নিজ কর্ম্মশক্তির সাহায্যে পরিপূর্ণ জীবনবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কাজ করিতেই হইবে। ইহা ভিন্ন কর্ম্মশক্তির সাহায্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন পথই নাই। সুতরাং বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য সমাজে যদি বিভিন্ন রকমের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট না থাকে তাহা হইলে শীঘ্রই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এইজন্য ভারতীয় সামাজিক বিধানের প্রবর্ত্তক মনীষিগণ বিভিন্ন স্তরের মানুষ লইয়া সমাজ গঠন করিবার উপযোগী কর্ম্মবিভাগ করিয়াছেন। এই কর্ম্মবিভাগ অনুসারে যে সমাজ গঠিত হয় তাহার নাম বর্ণাশ্রমানুমোদিত সমাজ। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক আদর্শকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। হাজার হাজার বৎসর যাবৎ এই ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভারতীয় জীবনধারা কল্যাণ ও শান্তির পথে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

বর্ণাশ্রম-বিধানের মধ্যে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থানে জ্ঞানী ও ত্যাগীকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, জ্ঞানী ও ত্যাগী সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের সমস্ত স্তরের সমস্ত নরনারী জ্ঞানী ও ত্যাগীর অনুশাসন অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া এবং ঐ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকেই আদর্শ মানিয়া নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে। কারণ জ্ঞানী এবং ত্যাগী কাম ও অর্থ-সাধনায় প্রবৃত্ত হন না, সুখ, ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষায় প্রেরিত হইয়া কোন কাজই করেন না। তাঁহারা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বাহিক সম্পদ-বৃদ্ধিকারক উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না, দেশের শাসন-সংরক্ষণ এবং দণ্ডবিধানের কার্য্যও নিজহস্তে সম্পন্ন করিবেন না, কাহারও অধীন হইয়া চাকরীও করেন না। এই সকল কার্য্য তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মের প্রতিকূল, তাঁহাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার বিঘ্ন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর, জ্ঞানতপস্বী, সর্ব্বভূতহিতে রত, বিশ্বপ্রেমিক। ত্যাগ, সেবা, জ্ঞান-বিতরণ ও তপশ্চর্য্যাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত; দরিদ্রতা তাঁহারা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী নিজের সমস্ত শক্তি সমাজের ও নিজের সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং মনুষ্যজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্যই নিয়োজিত করেন। এই জন্যই যথার্থ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইয়া স্ত্রী-কন্যা-পুত্র পরিবেষ্টিত হইলেও ত্যাগ, সেবা, তপস্যা এবং নিঃস্বার্থ জ্ঞানদান প্রভৃতি দ্বারা আদর্শ স্থাপন করেন। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভ করিয়াও মানবজীবনের চরম শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বত্যাগী ও প্রাণিমাত্রে সমদর্শী হইয়া জাগতিক কল্যাণ কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী সমাজের সমস্ত স্তরের নরনারীকে এই মহান্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন, সুতরাং সমাজ তাঁহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহাদের দেহপোষণের, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের এবং তপস্যাময় জীবনের অনুকূলতা-সম্পাদনের যাবতীয় ভার সমাজ স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি ও আর্থিক শক্তির পরিচালকবৃন্দ শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সহিত তাঁহাদের সুবিধা ও স্বতন্ত্রতা-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাঁহাদের উপদেশ ও জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের শক্তি ও সম্পত্তি জনসাধারণের হিতের জন্য, সমাজের সুখের জন্য এবং ভগবৎ-প্রীতির জন্য নিয়োগ করিয়া নিজেদের জীবনের কৃতার্থতা অনুভব করিয়াছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ইহাই প্রধান রূপ।

বাহ্যসম্পত্তিতে উদাসীন, স্বার্থবুদ্ধি-শূন্য, বিশ্বপ্রেমিক এই ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের উপরেই সমাজ এবং রাষ্ট্রের পরিচালনার উপযোগী নিয়মকানুন-রচনার ভার ন্যস্ত থাকিত। নিজের ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত কোন স্বার্থবুদ্ধিই তাঁহাদের নাই ;—কারণ তাঁহারা সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার মত নির্ম্মল-হৃদয়, উদারপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান্। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সত্য ও প্রেমের উপর অবিচলিত দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহারা সমস্ত শ্রেণীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। রাষ্ট্রিক শক্তির ব্যবহার কি ভাবে করিতে হইবে, কি ভাবে ধনের উৎপাদন-বৃদ্ধি ও বণ্টন-ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সমাজের সমস্ত স্তরের জনগণের নিজ কর্ত্তব্য কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সমস্ত সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, নিজ শক্তি ও সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হইলে মানুষ জীবনের পরম কল্যাণ-সাধনের পথে অগ্রসর হইতে পারে,—ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ পক্ষপাতশূন্য নিপুণ বিচারের দ্বারা এই সকল বিষয়ের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীকে রাষ্ট্র ও সমাজের কেন্দ্রস্থলে আদর্শরূপে ও সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সংগঠন, রাষ্ট্রের পরিচালনা এবং কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদির নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে—ইহাই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূল কথা, ইহাতেই ভারতের প্রাণশক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই প্রাণশক্তিই জাতি এবং সমাজের সমস্ত অবয়বে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সর্ব্ব প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের হাত হইতে ভারতীয় জীবনধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

টাইপরাইটারের ইতিবৃত্ত

উইলিয়াম মারো

টাইপরাইটার তৈরীর প্রথম যুগান্তকারী পরিকল্পনার কৃতিত্ব বৃটেনের। ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭১৪ সালে হেন্‌রি মিল্ নামে একজন বিলাতি ইঞ্জিনীয়র সর্ব্বপ্রথম টাইপরাই-টারের পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। বর্তমান যন্ত্রগুলির তুলনায় তা অত্যন্ত বিসদৃশ ছিল এবং তাতে সন্তোষজনক ফলও পাওয়া যায়নি ; কিন্তু সেই যন্ত্রটি আজ বৃটেনের ১,২৫০,০০০ টাইপরাইটারের জনক এবং বৃটেনের জীবনের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

হেন্‌রি মিলের পেটেণ্ট গ্রহণের এক শতাব্দী পরে, ১৮৫০ সালে ম্যানচেষ্টরের জনৈক ব্যক্তি অন্ধদের জন্য এইটি টাইপরাইটার তৈরী করেন। অবশ্য ব্যাপক বিক্রয়ের জন্য সর্বপ্রথম আমেরিকার টাইপরাটার ১৮৭৫ সালে বাজারে দেখা যায়।

সম্প্রতি টাইপরাইটার ফেডারেশনের ব্যবস্থা-ধীনে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রজতজয়ন্তীতে জানা যায় যে বর্তমানে বৃটেনে পাঁচলক্ষেরও বেশী মহিলা টাইপের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

মিলের আবিষ্কারের পর প্রায় ১৭০ বৎসর ধরে এই যন্ত্রগুলিকে অফিসের কাজের জন্য গ্রহণ করতে অনেক আপত্তি দেখা গিয়েছিল। প্রধান কারণ বোধ হয় নকলনবিশদের জীবিকা-র্জনে বাধার সৃষ্টি ; কিন্তু সংস্কার কাটিয়ে উঠতে দেরী হ'ল না। ১৮৮৮ সালে দু'জন নারী টাইপিষ্ট ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। সমগ্র বৃটেনের তৎকালীন প্রথম কুড়িজন নারী-টাইপিষ্টদের মধ্যে এঁরাই ছিলেন অগ্রণী। আজ তার কি অদ্ভুত পরিবর্তন !

প্রথম টাইপরাইটারগুলি কেবল মাত্র ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিকরাই ব্যবহার করতেন, কিন্তু আজ সেই তুলনায় বৃটেনে ১,২৫০,০০০ টাইপরাইটারের ব্যবহার হচ্ছে।

গত ৬৩ বৎসর ধরে প্রচলিত চাবির সারির কোন পরিবর্তন হয়নি, যদিও অন্যান্য ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বর্মীভাষায় টাইপরাইটার তৈরীর জন্য ব্রহ্মদেশ বৃটেনকে অনুরোধ করেছে। বর্মীভাষায় টাইপরাইটার তৈরীর এই প্রচেষ্টা প্রথম।

(New Delhi British Information Services হইতে)

বিশ্ববিজয়ের পথে ভারতীয় কৃষ্টি

শ্রীমোহিনী মোহন দত্ত, বি-এ

যাহা কিছু আমাদিগকে মিথ্যা হইতে সত্যের, অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের, কুৎসিত হইতে সুন্দরের দিকে চলিবার প্রেরণা দেয় তাহাই কৃষ্টির সহায়ক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। যাহা কিছু মহত্ত্বের প্রতি, ভূমার প্রতি আমাদের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া তোলে তাহাও কৃষ্টি। চরম উৎকর্ষলাভের জন্য চিত্তবৃত্তির কর্ষণা বা অনুশীলনের নামও কৃষ্টি। কৃষ্টি আমাদের অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতার দিকে চেতনা খুলিয়া দেয়।

সাধক যখন গাহিলেন—"এমন মানব-জনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা", তখন তিনি সমগ্র মানব-জীবনকেই কৃষ্টির এক বিরাট ক্ষেত্র বলিয়া জানিলেন এবং সেই বার্ত্তা প্রকৃত দরদীর মত মানুষমাত্রেরই দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিলেন। এই যে মানব-জীবনরূপ ক্ষেত্রে কৃষ্টির আবেদন তাহা দেশ, কাল ও পাত্রের গণ্ডী-নিরপেক্ষ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষ অবশ্য জন্ম দিয়াছে বহুবিধ কালচারের—স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া সেগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া। তবুও কালচারের বা কৃষ্টির একটা সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠা-ভূমিও আছে। মানুষের মাঝে রহিয়াছে দুই প্রকৃতি—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত—তাহারই সত্তার lower hemisphere ও higher hemisphere—অবিদ্যা প্রকৃতি ও দিব্য প্রকৃতি। কর্ষণা বা অনুশীলনের অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাহার ঊর্দ্ধচেতনার—ঊর্দ্ধতন এই সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতির স্তরগুলি জাগে না। নিম্নের দিকে, অর্থাৎ অপরা প্রকৃতির দিকে একটা টান স্বাভাবিক হইলেও তাহাই যেমন মানুষের সমগ্রতা নয়, তেমনি আবার ঊর্দ্ধের দিকে, পরাপ্রকৃতির দিকে তাহার যে অভীপ্সা তাহাও তাহার একান্ত সর্ব্বস্ব নয়। সত্যের দুই ভাব—নিত্য ও লীলা। লীলার ক্ষেত্রে যেমন চাই কৃষ্টি, তেমনি চাই নিত্যের ক্ষেত্রেও। মানুষ উভয়ক্ষেত্রে সোনা ফলাইতে পারে। তবু মানুষের কৃষ্টি বা সংস্কৃতির পূর্ণ আদর্শ যদি কিছু থাকে তবে তাহা উভয় ক্ষেত্রকে লইয়াই। ঋষি-ভারত এই তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছিল—

> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা।
> বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

অবিদ্যাকে (lower hemisphereকে) ভর করিয়া, অবিদ্যার মধ্য দিয়া বিদ্যায় (higher hemisphere-এ) উঠিয়া যাওয়া অমৃতত্ত্বের জন্য এবং তাহারই আলোকে মন, প্রাণ ও জড় দেহ লইয়া যে অবিদ্যা প্রকৃতি তাহার রূপান্তর-সাধন—ভগবদনুভূতি (God-realization) এবং ভগবৎ-প্রকাশ (God-manifestation)—ভারতীয় কৃষ্টির বিশেষত্ব। জীবনের বর্জ্জন নয় বরং তাহার বহুভঙ্গিম উপলব্ধি সত্যকেই কেন্দ্র করিয়া—ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। অতি আধুনিক তরুণ-ভারতের লক্ষ্য জীবনের অনন্তমুখী অভিজ্ঞতা; কিন্তু কেন্দ্র তাহার সত্যমুখী বলিয়া মনে হয় না। ভারতের হৃৎপুরুষ—ভারতের অধ্যাত্মপুরুষ আজ নিজেকে প্রকটিত করিতে চান, জ্ঞানে ও কর্ম্মে সাফল্য ও সার্থকতা চান। লক্ষ্য রাখিতে হইবে মনোময় ও প্রাণময় ভারত হৃৎপুরুষের সত্য আকাঙ্ক্ষাকে যেন পিছনে

ঠেলিয়া না দেয়। ভারতের মনীষা ও কর্ম্মশীলতা একদা তাহার অন্তরপুরুষেরই ইঙ্গিতে ও প্রভাবে চালিত হইত। তাই ভারতের কবি পূর্ণ হইয়া উঠেন ঋষিত্বের মধ্যে। তাই ভারতের যোগীর কণ্ঠে বাজে—আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, যে মননশীলতা ভারতের হৃৎপুরুষকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না বরং জাগরণের পথে বাধাই জন্মায়, সে মননশীলতা আজ স্তব্ধ হোক; যে কর্ম্ম-প্রেরণা ভারতের হৃৎপুরুষের চাওয়াকে রূপ দিতে পারে না, তাহাকে বিকৃতই করে, সে কর্ম্মপ্রবণতা আজ শান্ত হোক; আজ দিকে দিকে ভারতের অধ্যাত্মপুরুষের উদ্বোধন-গীতি সহস্র আধারে সহস্র ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত, ঝঙ্কৃত হোক। ভারতের অধ্যাত্মপুরুষকে মনপ্রাণের যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া দিয়া—ভারতীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করিয়া—ভারতের যথার্থ আত্মোপলব্ধি কখনো সম্ভবপর হইতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মবাণীই হইল জ্ঞানের জ্ঞান যে পারমার্থিক জ্ঞান, সত্যের সত্য যে আধ্যাত্মিক সত্য তাহারই ছন্দে সম্পূর্ণতায় প্রথমে আমাদের অন্তরলোকে স্ব-রাজের প্রতিষ্ঠা করা এবং পরে তাহারই ব্যঞ্জনায় প্রেরণায় বহির্জগতে তাহার উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলা। এবং ইহাই যে বিশ্বমানবেরও পূর্ণাঙ্গ কৃষ্টির আদর্শ জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি যেন তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে।

জড়প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা-বিস্তার পরমাণবিক শক্তির আবিষ্কারের মধ্য দিয়া তাহার আয়ত্তে আসিয়াছে; কিন্তু উহা মানবজাতির পক্ষে আজ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতীকরূপেই দেখা দিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, জড়-প্রকৃতির উপর আধিপত্য-লাভ মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতির ফলস্বরূপ দেখা দেয় নাই বা তাহার সঙ্গে সমান তালে চলিতেছে না। অন্তর্জগতের প্রেরণায় বহির্জগতের সৃষ্টি-প্রতিভা বা কর্ম্ম-কৌশল পরিচালিত হইতেছে না। সমস্যা বা সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে এইখানেই। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাগতিক প্রগতির মধ্যে, তাহার অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে ভাবসাম্য-প্রতিষ্ঠার—সামঞ্জস্যবিধানের উপরই আজ মানবমঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের শ্রীমীরাদেবী আণবিক বোমা সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন—"The atomic bomb is in itself the most wonderful achievement and the sign of a growing power of man over the material nature. But what is to be regretted is that this material progress and mastery is not the result of and in keeping with a spiritual progress and mastery which alone has the power to contradict and counteract the terrible danger coming from these discoveries. We cannot and must not stop progress, but we must achieve it in an equilibrium between the inside and the outside." আধুনিক যুগের বিশ্রুতকীর্ত্তি বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন মানুষের নৈতিক শক্তির (যাহা অধ্যাত্ম শক্তিরই পাদপীঠ) উদ্বোধনের তথা ত্যাগ-সংযমের অনুশীলনের উপরই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার নিম্নোক্ত বাণীতে আমরা উপনিষদের "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই ঋষি-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি যেন শুনিতে পাইতেছি। তিনি বলিতেছেন: "The fate of the human race was more than ever dependent on its moral strength to-day. The way to a joyful

and happy state is through renunciation and self-limitation everywhere."

একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিস্ময়কর অভিযানকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন – উহাকে অধ্যাত্মনিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখিবার আবশ্যকতা নির্দেশ করিয়াছেন, – অপর জন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হইয়াও প্রাচ্য নির্লিপ্ততা ও সংযত ভোগপ্রবৃত্তির দিকে বিশ্ব-মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে এই মহতী আশাই মনে জাগে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় অধ্যাত্ম-কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বিশ্ব-মানবের পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতির আদর্শ হইয়া উঠিবে। আর সেই কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঐতিহ্য-ধারায় জগতে ইতঃপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"The spiritual gift of India to the world has already begun. India's spirituality is entering Europe and America in an ever-increasing measure. That movement will grow ; amid the disasters of the time more and more eyes are turning towards her with hope and there is even an increasing resort not only to her teachings but to her psychic and spiritual practice." —অর্থাৎ জগৎকে ভারত তার আধ্যাত্মিক বিদ্যা দান করিতে ইতোমধ্যেই আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিক বিদ্যা ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্রমে অধিকতর পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিতেছে ; এই গতি ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই যুগের দুর্যোগের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আশায় ভরসায় ভারতের দিকে বেশী করিয়া ফিরিতেছে ; কেবল উহার শাস্ত্রই নয়, উহার সাধনা, আন্তর ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়াছে।

বিরহ-মিলনে

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

মন-কুসুমের মালাটি গেঁথেছি
　　ভকতি-চন্দন মেখে,
নয়নের জলে ধুইয়ে চরণ
　　পরাবো তোমারে দেখে।
ভুবন-ভুলানো রূপেতে তোমার
　　এসোহে হৃদয়ে মম,

তব আগমনে দুঃখ যাবে চলে
　　স্রোত-মুখে খড় সম।
বিরহ-রাগের বন্দনা-গীতি
　　হয়ে গেছে মোর শেষ,
মিলন-বাসরে বাঁশী হাতে লয়ে
　　এস পরি পীতবেশ।

স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত

(১)

Darjeeling
C/o. M. N. Banerjee
20th April,'97

প্রিয় শশী,

তোমরা অবশ্যই এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছ। বিলগিরি অবশ্যই অতি যত্ন করিতেছে ও সদানন্দ তোমার সেবা করিতেছে। পূজা-অর্চ্চা পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে মান্দ্রাজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশমাত্র যেন না থাকে। আলাসিঙ্গা বোধ হয় এতদিনে মান্দ্রাজ পঁহুছিয়াছে। কাহারও সহিত বাদ-বিবাদ করিবে না—সদা শান্তিভাব আশ্রয় করিবে। আপাততঃ বিলগিরির বাটীতেই ঠাকুর স্থাপনা করিয়া পূজাদি হউক, তবে পূজার ঘটা একটু কমাইয়া সে সময়টা পাঠাদি ও লেক্‌চার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়। কান ফুঁকতে যত পার ততই মঙ্গল জানিবে। কাগজ দুটার তত্ত্বাবধান করিবে ও যাহা পার সহায়তা করিবে। বিলগিরির দুটি বিধবা কন্যা আছেন। তাঁদের শিক্ষা দিবে ও তাঁদের দ্বারা ঐ প্রকার আরও বিধবারা যাহাতে সংস্কৃত ও ইংরাজী স্বধর্ম্মে থাকিয়া শিক্ষা পায়, এ বিষয়ে যত্ন সবিশেষ করিবে। কিন্তু এ সব কার্য্য তফাৎ হতে। যুবতীর সাক্ষাতে অতি সাবধান। একবার পড়িলে আর গতি নাই এবং ও অপরাধের ক্ষমা নাই।

গুপ্তকে * কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; কিন্তু শুনিতেছি ঐ কুকুর হন্যা নহে—তাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক গঙ্গাধরের প্রেরিত ঔষধ সেবন করান যেন হয়। প্রাতঃকালে পূজাদি অল্পে সারা করিয়া সপরিবার বিলগিরিকে ডাকাইয়া কিঞ্চিৎ গীতাদি পাঠ করিবে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শুদ্ধ সীতা-রাম ও হরপার্ব্বতীতে ভক্তি শিখাইবে। এ বিষয়ে কোনও ভুল না হয়। যুবক-যুবতীদের রাধাকৃষ্ণলীলা একেবারেই বিষের ন্যায় জানিবে। বিশেষ বিলগিরি প্রভৃতি রামানুজীরা রামোপাসক, তাদের শুদ্ধ ভাব যেন কদাচ বিনষ্ট না হয়।

বৈকালে ঐ প্রকার সাধারণ লোকের জন্য কিছু শিক্ষাদি দিবে। এই প্রকার ধীরে ধীরে 'পর্ব্বতমপি লঙ্ঘয়েৎ'।

পরমশুদ্ধ ভাব যেন সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। ঘুণাক্ষরেও যেন বামাচার না আসে। বাকি প্রভু সকল বুদ্ধি দিবেন, ভয় নাই। বিলগিরিকে আমার বিশেষ দণ্ডবৎ ও আলিঙ্গনাদি দিবে। ঐ প্রকার সকল ভক্তদের আমার প্রণামাদি দিও। আমার রোগ অনেকটা এক্ষণে শান্ত হইয়াছে—একেবারে সারিয়া গেলেও যাইতে পারে প্রভুর ইচ্ছাতে। আমার ভালবাসা নমস্কার আশীর্ব্বাদাদি জানিবে।

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

পুনঃ—ডাক্তার নন্‌জুণ্ড রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ দিবে ও তাহাকে যতদূর পার সহায়তা করিও। তামিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা হয় তাহা করিবে। ইতি—

বি—

ভাই শশী,—তুমি আমার ভালবাসা জানিবে এবং গুপ্তকে জানাইবে। তুমি সেখানে কেমন থাক সর্ব্বদা লিখিবে। স্বামিজী এখানে অনেক ভাল আছেন, প্রস্রাবের দোষ অনেক কমিয়াছে। এই উপকার স্থায়ী হইলে আরোগ্য হইয়া যাইবেন। গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ভাবিত আছি—সে কেমন আছে লিখিবে। তাহাকে সর্ব্বদা আমোদে রাখিবে এবং সকল আবদার সহ্য করিবে। যেমত আমাদের উপর তোমার ভালবাসা সেইরূপ তাহাকে জানিবে। ইতি— †

—দাস রাখাল

* স্বামী সদানন্দ † স্বামীজীর পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাখাল মহারাজের) লিখিত অংশ।—উঃ সঃ

(২)

Almora
The 29th July, 1897

প্রিয় শশী,

তোমার কাজকর্ম্ম বেশ চলছে খবর পাইলাম। তিনটী ভাষ্য বেশ করে পড়ে রাখবে আর ইউরোপী দর্শনাদিও বেশ করে পড়বে, ইহাতে অন্যথা না হয়। পরকে মারতে গেলে ঢাল তলওয়ার চাই, একথা যেন ভুল একদম না হয়। সুকুল এক্ষণে পৌঁছিয়াছে, তোমার সেবাদিও বেশ চলছে বোধ হয়। সদানন্দ যদি সেখানে থাকিতে না চায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে; এবং প্রতি সপ্তাহে একটা রিপোর্ট, আর ব্যয় প্রভৃতি সব সমেত মঠে পাঠাইতে ভুল যেন না হয়। আলাসিঙ্গার বোনাই এখানে বদ্রীদাসের নিকট হতে চারিশত টাকা ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে—পৌঁছিবা মাত্র পাঠাইবার কথা, এখনও কেন পাঠাইল না। আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসিবে এবং সত্বর পাঠাইতে কহিবে, কারণ আমি পরশুদিন এখান হতে যাচ্ছি—মশুরি পাহাড় বা অন্য কোথাও যাই পরে ঠিক করব। কাল এখানে ইংরেজ মহলে এক লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুসী। কিন্তু তার আগের দিন হিন্দিতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুসী—হিন্দিতে যে oratory করতে পারবো তা ত আগে জানতাম না। মঠে ছেলেপুলে যোগাড় হচ্ছে কি? যদি হয় ত কলিকাতায় যেভাবে কার্য্য হচ্ছে ঠিক সেইভাবে করে যাও। নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন বেশী খরচ করবে না, পাছে ফুরিয়ে যায়—কিছুদিন পরে করো।

তোমার শরীরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে—তবে বিশেষ আতুপুতুতে শরীর উল্টা আরও খারাপ হয়ে যায়। বিদ্যের জোর না থাকলে কেউ ঘণ্টা মানবে না, একথাটা নিশ্চিত এবং এইটী মনে স্থির রেখে কাজ করবে।

আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে ও Goodwin প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি—

বিবেকানন্দ

(৩)

আম্বালা
১৯ আগষ্ট, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

মান্দ্রাজের কাজ অর্থাভাবে উত্তমরূপে চলিতেছে না শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আলাসিঙ্গা ও তাহার ভগিনীপতির টাকা আলমোড়ায় পৌঁছিয়াছে শুনিয়া সুখী হইয়াছি। Goodwin লিখিতেছে যে, যে টাকা বাকি আছে lectureএর দরুণ—তাহা হইতে কিছু লইবার জন্য Reception Committee-কে চিঠি লিখিতে বলিতেছে।

*　　*　　*

আমি এক্ষণে ধর্ম্মশালার পাহাড়ে যাইতেছি। নিরঞ্জন, দীনু, কৃষ্ণলাল, লাটু ও অচ্যুত অমৃতসরে থাকিবে। সদানন্দকে এতদিন মঠে কেন পাঠাও নাই? যদি সে সেখানে এখনও থাকে, পরে অমৃতসর হইতে নিরঞ্জন পত্র লিখিলেই তাহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইবে। আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী পাহাড়ে বিশ্রাম করিয়া পাঞ্জাবে কার্য্য আরম্ভ করিব। পাঞ্জাব ও রাজপুতানাই কার্য্যের ক্ষেত্র। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তোমাদের পত্র লিখিব।

*　　*　　*

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে ধীরে শুধরাইতেছে। পাহাড়ে দিন কতক থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। আলাসিঙ্গা G G, R A Goodwin, গুপ্ত, সুকুল প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা দিও ও তুমিও জানিও। ইতি— *

বিবেকানন্দ

*এই সংখ্যার মুদ্রণ প্রায় শেষ হইলে এই পত্র তিনখানা পাওয়া যায়। এ জন্য ইহা শেষের দিকে প্রকাশ করিতে হইল।—উঃ সঃ

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের কথা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-সংগৃহীত

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দজী উত্তর কাশীতে দীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তথাকার প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী দেবী গিরিজী এখনও তাঁহার তপস্যার কথা বলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলিতেন, 'সাধু তেইশ ঘণ্টা আমির, এক ঘণ্টা ফকির।' সারাদিনের মধ্যে ঘণ্টাখানেকের জন্য সাধু ভিক্ষাদিতে রত থাকেন—তখন তিনি ফকির, অর্থাৎ ভিক্ষুক। আর বাকী তেইশ ঘণ্টা তিনি ঈশ্বরচিন্তা ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদিতে মগ্ন থাকেন—তখন তিনি আমির, অর্থাৎ সম্রাট। পাঞ্জাবের উত্তরে 'কুলু' নামক একটী স্থান আছে। স্থানটীর জলবায়ু উত্তম এবং ভিক্ষা সুলভ বলিয়া বহু সাধু তথায় যাইয়া তপস্যা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী গুরু ভ্রাতার সহিত কিছু দিন কুলুতে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ তপস্যা ও বিবেক-বৈরাগ্য দর্শনে কুলুবাসীরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৯১৭ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দজী কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শুভাগমন করেন। তিনি আসিয়া স্বীয় গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দজীকে পাদস্পর্শ-পূর্বক প্রণাম করিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজীও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলিলেন, 'নিরভিমানত্বে আপনাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কি আমার আছে?' ইহা বলিয়া তিনি পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) কাশী সেবাশ্রমে কিছুদিন বাস করেন। তাঁহার পায়ে বাত ছিল। শীতকালে ঘরের মধ্যে খালি পায় চলিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া বাত বাড়িত। স্বামী শুভানন্দজী বাবুরাম মহারাজকে (স্বামী প্রেমানন্দজী) এক জোড়া লাল রঙের ক্যাম্বিশ জুতা দিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ ঐ জুতা জোড়া হরি মহারাজকে দিয়া বলিলেন, 'আমার ত দরকার হয় না। আপনি এটী ব্যবহার করুন।' হরি মহারাজ জুতা জোড়া মাথায় রাখিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। এমনি ছিল তাঁহার গুরুভ্রাতৃ-ভক্তি!*

হরি মহারাজ মাঝে মাঝে উপদেশপ্রদ সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতেন। এখানে তৎকথিত কয়েকটী গল্প প্রদত্ত হইল: এক স্থানে দুইজন সাধু বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। জনৈক শেঠজী একবার তথায় আসিয়া একজন সাধুর নিকট অপর সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, 'ও ত গৌ হ্যায়।' শেঠজী অপর সাধুর কাছে অন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন, 'ও ত ভয়িস্ হ্যায়।' সাধুদের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব দেখিয়া তিনি মর্মাহত হন। তিনি একবার বহু সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। অন্যান্য সাধুর সঙ্গে উপরি উক্ত সাধুদ্বয়ও আসিলেন। শেঠজী সকল সাধুর জন্য উত্তম আহার্য পরিবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দুই জনের জন্য খড়-বিচালি দিলেন। সাধুদ্বয় তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'কেন আপনারা পরস্পরকে গৌ বা ভয়িস্ বলেছেন?' বহু

* কয়েকটী ঘটনা স্বামী বাসুদেবানন্দজী-কথিত।

সাধুর সমক্ষে সেই সাধুদ্বয়ের উত্তম শিক্ষা হইল। আর একটী গল্প এইঃ এক স্থানে একজন সাধু বাস করিতেন। স্থানীয় জনৈক শেঠজী স্বপ্নে আদেশ পাইলেন—'এঁকে ডাল-রুটী দাও।' শেঠজী সাধুকে নিত্য ডাল-রুটী জোগাইতেন। সাধু পূর্বাশ্রমে কৃষক ছিলেন এবং খুরপি দিয়া বাগানে ও মাঠে কাজ করিতেন। সাধু তথায় অনেক দিন থাকার পর একজন বিদ্বান সাধু আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শেঠজী স্বপ্নে আদেশ পাইলেন 'এঁকে পরটা হালুয়া, রাবড়ি প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার দিও।' শেঠজী স্বপ্নাদেশানুযায়ী কার্য করিলেন। প্রথম সাধু কৌতূহলী হইয়া একদিন নবাগত সাধুর আহার দেখিলেন। নবাগত সাধুকে উত্তম আহার দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শেঠজী কহিলেন, 'আমি যেমন স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছি তেমনি করেছি।' প্রাচীন সাধু উত্তর-শ্রবণে বিরক্ত হইলেন। আর এক দিন শেঠজী স্বপ্নে শুনিলেন, 'সাধু যদি ডাল-রুটীতে সন্তুষ্ট না হন তাঁহাকে খুরপি নিতে বল।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেঠজী স্বপ্নাদেশটী সাধুকে জানাইলেন। গল্পের মর্মার্থ এই যে,—বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই শ্রেয়ঃ। যে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয় সে কষ্টকর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাক।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে একবার দীর্ঘ ছয় বৎসর তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সময় একবার তাঁহারা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত একটি শিব-মন্দিরে অবস্থান করেন। পাহাড়ের চারি দিকের গ্রামে বৃষ্টির অভাবে খুব জলকষ্ট হইয়াছিল। ঐ সব দেশে অনাবৃষ্টি হইলে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একটা দিন ঠিক করিয়া ঘটি দ্বারা কুণ্ড হইতে জল তুলিয়া শিবের মাথায় ঢালিত। কুণ্ডটী পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে। উহার জল খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সেই জলই ঘটি ঘটি আনিয়া গ্রামের ছোট বড় সব ছেলেমেয়েরা শিবের মাথায় একদিন ঢালিতে লাগিল। 'বাবা বর্ষাও', 'বাবা বর্ষাও' বলিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের সকলে ভোর রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া শিবের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল। স্বামী তুরীয়ানন্দজী তাঁহার গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে মন্দিরের একপাশে বসিয়া জপ করিতে করিতে বৃষ্টির জন্য মহাদেবকে প্রার্থনা জানাইলেন। গ্রামবাসীদের শিব-ভক্তি দর্শনে তাঁহারা প্রীত হইলেন। এত নরনারীর আকুল নিবেদন এবং ঈশ্বরদ্রষ্টা সন্ন্যাসি-যুগলের প্রার্থনায় আশুতোষ অচিরে তুষ্ট হইলেন: সে দিনটি বেশ রৌদ্রদীপ্ত এবং আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বিকালে হঠাৎ আকাশের এক কোণে কাল মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইল। সকলে ভিজিতে ভিজিতে পরমানন্দে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া স্বামীজি-দ্বয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। সরল বিশ্বাসে অসম্ভব সম্ভব হয়।

একবার স্বামী তুরীয়ানন্দজী তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের সহিত কিছুকাল কনখলে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। বোম্বাই বা দিল্লী হইতে রেলওয়ে পার্শ্বেলে পাকা আম আসিয়াছে। পার্শ্বেলটী ষ্টেশনে পড়িয়া আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী প্রভবানন্দজীকে (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র হলিউড বেদান্ত হোমের অধ্যক্ষ) পার্শ্বেলটি আনিতে পাঠাইলেন। স্বামী প্রভবানন্দজীর ফিরিতে দেরী হইতেছিল। এগারটা বাজিয়া গেল। সকলে অপেক্ষা করিতেছেন, পার্শ্বেল আসিলেই খাইতে বসিবেন এবং আম খাইবেন। আসন করা হইয়াছে। এমন সময় স্বামী প্রভবানন্দজী শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'পার্শ্বেল-ক্লার্ক বলিলেন,—আমি ত ঐ দিকেই

যাবো। পার্শ্বেলটি নিয়ে যাবো। আপনি চলে যান।' তাঁহার কথা শুনিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কিছু না বলিয়া গম্ভীর হইয়া খাইতে বসিলেন। হরি মহারাজ স্বামী প্রভবানন্দজীর এইরূপ নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি খাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, 'দেখ শিষ্য তিন প্রকার। যারা গুরুর অব্যক্ত মনোভাব বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে তারা উত্তম শিষ্য। যারা গুরুর ব্যক্ত আদেশ পালন করে তারা মধ্যম শ্রেণীর শিষ্য। আর যারা গুরুর ব্যক্ত ইচ্ছাটিও কার্যে পরিণত করতে পারে না তারা অধম শিষ্য।'

স্বামী তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে তপস্যাকালে কুসুম সরোবরের কাছে থাকিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। উভয়েই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইতেন। শেষরাত্রি হইতে উভয়ে জপধ্যানাদিতে বসিতেন। একদিন রাখাল মহারাজের শরীর ভাল না থাকায় ভোর বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া একটি বৈষ্ণব প্রেত আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়াছিল। রাখাল মহারাজ তৎক্ষণাৎ হরি মহারাজকে এই অদ্ভুত ঘটনাটি বলিলেন। হরি মহারাজ তাহা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ইহার পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে একাকী তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন তীব্র শীতকাল; তাঁর গায়ে সূতার কাপড় ও সূতার চাদর ব্যতীত কোন গরম জামা বা চাদর ছিল না। কিন্তু তাঁহার সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না। সেই জন্য রাত্রে শীতে ভাল ঘুম হইত না; রাত ২।৩টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তখন উঠিয়া তিনি পাতকুয়ার জল তুলিয়া স্নান সারিতেন। পাতকুয়ার জল রাত্রে একটু গরম থাকে, তাই বেশ আরাম হইত। তার পরেই ধ্যানে বসিতেন। ধ্যান জমিলে ঘাম বাহির হইত। শীতের প্রকোপে তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে এবং হাত পা ফাটিয়া রক্ত পড়িত। যেমন কঠোরতা তেমনি তপস্যা! একদিন এক বৃদ্ধ সাধু শুইবার সময় একখানি কম্বল আনিয়া তাঁহার গায়ে দিয়া বলিলেন, 'স্বামীজি আপনাকে দয়া করে এই কম্বলটি রাত্রে গায়ে দিতেই হ'বে। নচেৎ আপন্যর অসুখ হ'তে পারে। আমার আরও ২।৩টা কম্বল আছে। এখানি কাজে লাগে না।' বৃদ্ধ সাধুর আন্তরিকতা ও প্রীতি দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দজী বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রথমে তিনি 'আমার প্রয়োজন নেই' বলিয়া আপত্তি করিলেন। পরে কম্বলটী তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ইহাতে শীতের রাত্রে আরাম পাইতেন। বৃদ্ধ সাধু খুব ত্যাগী ও প্রেমিক ছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী গুরুদাস মহারাজকে আমেরিকাতে বলিয়াছিলেন, 'ধর্মজীবন কখনও নিরাপদ মনে করো না। যতদিন দেহ থাকবে ততদিন প্রলোভন আসবেই।' তারপর এই গল্পটি * বলিলেন: জনৈক প্রাচীন সাধু গ্রামের ধারে এক জঙ্গলে বাস করিতেন। তিনি ধ্যানজপ শাস্ত্রপাঠেই সময় কাটাইতেন। স্বীয় কুটীর ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইতেন না। কম লোকেই তাঁহার কুটীরে আসিত। গ্রামবাসীরা তাঁহার কাছে ধর্মোপদেশ লইতে আসিয়া সাধুকে যে ডালচাল শাকসবজী দিত তাহাতেই তাঁহার আহার চলিত। তিনি গভীর জঙ্গলে থাকায় কোন স্ত্রীলোক ঐদিকে আসিত না। এইজন্য ত্রিশ বৎসর যাবৎ কোন নারী তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হয় নাই। একদিন হঠাৎ নারীহস্তস্থিত কঙ্কণাদির মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অজ্ঞাতসারে উঠিয়া নারীমুখ-দর্শনে চলিলেন। তিনি কি করিতে যাইতেছেন তাহা ভাবিবার সময় তাঁহার হইল না: লোহা যেমন চুম্বকদ্বারা আকৃষ্ট হয় তিনি তদ্রূপ

* "With the Swamis in America" পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নারী-কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, বিবেক জাগিল। তিনি ভাবিলেন, 'আমি কি করিতে যাইতেছি? ত্রিশ বৎসর যাহা দেখি নাই তাহা দ্বারাই এই বৃদ্ধ বয়সে প্রলুব্ধ হইলাম? 'রে পদযুগল, তোমাদের শাস্তি দিব। তোমরা এই দেহ কোথাও বহন করিতে পারিবে না'—এই বলিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। তিনি যে কয় বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ছিলেন, একপাও অন্যত্র যান নাই। সাধনার পথে যেমন দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় আছে তেমনি অদম্য অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তি চাই!

১৯১৭ খ্রীঃ স্বামী তুরীয়ানন্দজী আলমোড়া হইতে কাশী সেবাশ্রমে আগমন করেন। কাশীর নৃপেন্দ্র ডাক্তারের ভ্রাতা হরি মহারাজের বন্ধু ছিলেন এবং স্বামীজিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। হরি মহারাজকে বলিলেন, 'দেখ, প্রজ্ঞান (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী) বল্‌ছিল, তুমি যদি অমুককে একটু বলে দাও, মায়াবতী আশ্রমের জন্য কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। আমারও মনে হয়, তুমি তাঁকে একটু বল, তাহ'লে ভাল হয়।' স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলিলেন, "তুমি সে কি বল্‌ছো? আমি জীবনে কারো কাছে একটি পয়সা চাই নি আজ পর্যন্ত! আর প্রজ্ঞানের কথায় মায়াবতীর জন্য টাকা চাইব? তা কি কখনও হয়? আমি জীবনে একবার-মাত্র পয়সা চেয়েছিলুম বাধ্য হয়ে, তাও রাখাল মহারাজের কথায় এবং তাঁরই জন্য। আমি ও রাখাল মহারাজ এক সময় ছয় বৎসর এক সঙ্গে তপস্যা ও তীর্থ-ভ্রমণ করেছিলাম। তখন এক স্থানে জনৈক ভক্ত ব্যবসায়ী আমাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়া দিয়েছিল। রাখাল মহারাজ প্রথমে কিছু বলেন নি। পরে আমাকে হঠাৎ বল্লেন, 'হরি মহারাজ, আপনি গিয়ে ইণ্টার ক্লাশের ভাড়া চেয়ে আসুন। থার্ড ক্লাশে বড় ভিড়, কষ্ট হ'বে। সে খুব ভক্ত লোক, এক কথাতেই দেবে।' আমি বল্লাম, 'হাঁ, তাই যাচ্ছি।' ভক্তটি তৎক্ষণাৎ বাকী পয়সা দিলে এবং পূর্বে থার্ড ক্লাশের ভাড়া দেবার জন্য ক্ষমা চাইলে। আমার জীবনে এই একবার মাত্র পয়সা চাওয়া হয়েছিল। আর কখনও কাহারও নিকট পয়সা চাই নি। না চাইলেও দেখেছি, পয়সা এসে যায়, অভাব পূর্ণ হয়। সাধুর পয়সা চাওয়া উচিত নয়। প্রজ্ঞানকে বলো, আমার দ্বারা টাকা পয়সা চাওয়া হ'বে না।" ভদ্রলোকটি অনেক যুক্তি দিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হরি মহারাজ তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না।

সৎ চিন্তা ও সৎ কার্য সাধুর সনাতন স্বভাব—এই ভাবটি বুঝাইবার জন্য হরি মহারাজ এই গল্পটি প্রায়ই বলিতেন: এক সাধু কোন নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় একটি বৃশ্চিক নদীর জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। সাধু বৃশ্চিকটিকে জলমগ্ন দেখিয়া সদয় হইয়া উহাকে নদীতীরে তুলিয়া রাখিলেন! তুলিবার সময় বৃশ্চিকটি সাধুর হাতে দংশন করিল, কিছুক্ষণ পরে বৃশ্চিকটি তরঙ্গাঘাতে পুনরায় জলে পড়িয়া গেল। সাধু আবার উহাকে তীরে নিক্ষেপ করিলেন। এবারও বৃশ্চিক তাঁহার অঙ্গুলিতে দংশন করিল। সাধু তিনবার বৃশ্চিকের প্রাণরক্ষা করিলেন, আর তিন বারই তিনি দষ্ট হইলেন। পার্শ্ববর্তী কোন ব্যক্তি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি বার বার বৃশ্চিক-দংশনে জর্জরিত হইয়াও উহার প্রাণরক্ষার কাজ হইতে বিরত হইতেছেন না কেন?' সাধু বলিলেন, 'প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা আমার ধর্ম। দংশন করা বৃশ্চিকের স্বভাব। সাধু দুর্বাক্য শুনিয়া বা দুর্ব্যবহার পাইয়াও স্বীয় স্বভাব হইতে কদাপি বিচ্যুত হইবেন না।'

সাধুর সৎ স্বভাবের প্রশংসা করিবার জন্য হরি মহারাজ এই গল্পটি বলিতে ভালবাসিতেন।

১৯২০।২১ সালে হরি মহারাজ যখন কাশী সেবাশ্রমে ছিলেন তখন জনৈক সাধু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তাঁহার তপস্যা ও অনুভূতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। হঠাৎ একদিন তিনি তদুত্তরে বলিলেন, 'কি আর করেছি বা হয়েছে? একবার ইচ্ছা হলো ঘুমটা কমান যাক্ এবং সর্বদা ঈশ্বরের অনুধ্যান করি। দিনে আদৌ ঘুমাতাম না: ঘুম আমার এমনি কম ছিল। রাত্রে ঘুম কমাতে লাগলাম। ঘুম কমাতে কমাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক দেড় ঘণ্টার বেশী ঘুম হ'তো না। কিছুদিন পরে দেখি, ঘুমের তত প্রয়োজন আর হচ্ছে না, ধ্যান খুব গভীর ও দীর্ঘ হচ্ছে এবং শরীর-মনের বিশ্রাম ধ্যানেই পাওয়া যাচ্ছে। তখন ধ্যান strain (জোর) করে করতে হ'তো না, আপনা আপনি ধ্যান হ'তো। তাতে শরীরেও rest বিশ্রাম হয়ে যেতো। শেষে রাত্রে ঘুম আদৌ হ'তো না, আমিও চেষ্টা করতুম না। দীর্ঘ সময় ব্যাপী গভীর ধ্যান হ'তে লাগলো। দিবা-রাত্রি আদৌ ঘুম নেই, তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানচিন্তার স্রোত চল্‌তো। শরীরেরও ক্লান্তি নেই। প্রথম দুই তিন দিন বেশ চল্‌লো। এইরূপে সাত দিন কাটল। ৭।৮ দিন পরে ভাবনা হ'লো, ঘুমটা কমাতে গিয়ে ঘুম একেবারেই চলে গেল। তখন স্বামিজীর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর ভাল ঘুম হ'তো না, অতি কষ্টে অল্প স্বল্প হ'তো। সেইজন্য তাঁর খুব strain (ক্লান্তি) হ'তো। এবং শরীর ভেঙ্গে গিছলো। গভীর রাত্রে এক দিন মনে হ'লো, ঘুমটা একেবারে যাওয়া ভাল নয়, চেষ্টা করে ঘুমুতে হ'বে। চোখ বুজে ঘণ্টা খানেক শুয়ে রইলুম; কিন্তু ঘুম এ'লো না, তবে একটু rest (বিশ্রাম) হ'লো। ২।৩ দিন এইরূপ চেষ্টা করতে করতে অল্প তন্দ্রা আসতে লাগলো। পর দিন একটু ঘুমও এলো এবং দেহের আরও বিশ্রাম হ'লো। ঘুম চেষ্টা করে বাড়াতে বাড়াতে পূর্বাভ্যাস ফিরে এলো। সেই সময় ধ্যেয় বস্তুতে মনকে সম্পূর্ণ বিলীন করতে চেষ্টা করতাম এবং তার ফলে সমাধির মত অবস্থা লাভ হয়েছিল। ধ্যানকালে তখন ধ্যেয় ও ধ্যাতার মধ্যে কাচ-ব্যবধান মাত্র থাকতো। সামান্য ব্যবধানের জন্য তাঁকে ধরা যেত না। ঠাকুর যাকে নির্বিকল্প সমাধি বলতেন তাতে কাচ-ব্যবধানও থাকে না, ধ্যেয় ও ধ্যাতা একীভূত হন। একবার সেই সময় সে অবস্থাও হয়েছিল। ঠাকুর আমাকে 'উঁচু শক্তির ঘর' বলতেন। জীবনে যখন যা ধরেছি তা শেষ পর্যন্ত দেখেছি। কোন বিষয় একটু একটু বা আস্তে আস্তে করতে পারতুম না। খুব পুরুষকার ছিল, সর্বদা sure success (নিশ্চয় সাফল্য) দেখ্‌তে পেতাম। চেষ্টা করে কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হই নি।'

তপস্যা-কালে স্বামী তুরীয়ানন্দজী অতিশয় কঠোরী ছিলেন: মাধুকরী বা ছত্রে প্রাপ্ত ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। যত্র তত্র শয়ন এবং সামান্য পরিধানেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। সংযম ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। কেহ তপস্যা করিতে যাইতে চাহিলে তিনি এই গল্পটী বলিতেন: 'রামচন্দ্র যখন বনবাসে ছিলেন তখন একস্থানে গিয়ে থাকবার ইচ্ছা করলেন। স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুমতির জন্য তিনি লক্ষ্মণকে পাঠালেন। লক্ষ্মণ অদূরবর্তী এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন, একটী বালক স্বীয় লিঙ্গটী ধরে জিভ্‌টী কামড়ে নাচ্‌ছে। তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিরক্ত হয়ে এলেন রামচন্দ্রের কাছে। দৃশ্যটীর বর্ণনা করলেন। রাম বল্লেন, 'ভাই লক্ষ্মণ, তুমি ঠিক দেখেছ। জিহ্বা ও উপস্থ সংযত করে পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকতে পার।' তপস্যারত সাধুকে হরি মহারাজ জিহ্বা-সংযম ও কামজয় করিতে উপদেশ

দিতেন। এই দুইটীতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। সংযম-প্রসঙ্গে তিনি এই শ্লোকটী বলিতেন, :

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকম্।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে,পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥

পৃথিবীর সকল প্রাণী কাম ও জিহ্বার বশীভূত। কামজয় ও জিহ্বা-সংযম করিলে পৃথিবী বিজিত হয়।

১৯২১ খ্রীঃ হরি মহারাজ যখন কাশী সেবাশ্রমে ছিলেন তখন একদিন বিকালে এক্কা চড়িয়া সেবককে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,'রাখালমহারাজ বলতেন, এক্কার ঝাঁকানিতে ঘুম হয়। মাঝে মাঝে এক্কা চড়া মন্দ নয়।' কিন্তু পরদিন বিকালে আর বেড়াইতে গেলেন না। তাঁহার বাম হাতের অঙ্গুলিতে একটা বেদনা হইল। ২।১ দিনের মধ্যে বেদনার স্থানে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এক্কা জোর করিয়া ধরার জন্য সম্ভবতঃ ব্যথা হইয়াছিল। তাঁহার বহুমূত্র ছিল, তাই অঙ্গুলির ব্যথা ও ফোলা খুব বাড়িয়া গেল। ডাক্তার অমর বাবু অঙ্গুলিতে অস্ত্রোপচার করিলেন। তিনি রোজ আসিয়া অঙ্গুলিটী স্ক্রেপ ও ড্রেস করিতেন। খুব strict dietএ (কড়া পথ্য) তাঁহাকে রাখা হইল কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলির ফোলা বা ব্যথা কমিল না। অমর বাবুর এক দিন অন্তর অঙ্গুলিটি স্ক্রেপ করিয়া খানিকটা মাংস কাটিয়া দিতেন ও বলিতেন, abnormal growth (অস্বাভাবিক মাংসবৃদ্ধি) হইয়াছে। স্ক্রেপ করা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ দেহজ্ঞানরহিত স্বামী তুরীয়ানন্দজী কোন দিন স্ক্রেপ করিবার সময় 'আহা, উহু' করিতেন না, নির্বিকার থাকিতেন, যেন আর কাহারো হাতে অস্ত্রোপচার হইতেছে। রোজই মাংসবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং রোজই স্ক্রেপ করা হইত। রোজ তাঁহাকে অম্লান বদনে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে দেখিয়া হরি মহারাজের উক্ত অসুখের বিষয় ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্যকে জানাইবার জন্য সেবক কলিকাতায় ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষের নিকট পত্র দিলেন। চিঠি পাইয়াই পরদিন দুর্গাপদ বাবু ও সুরেশ বাবু কাশী গেলেন। দুইজন ডাক্তারকে উপস্থিত দেখিয়া হরি মহারাজ বলিলেন, 'দেখেছ, এঁদের কী ভালবাসা। একটু খবর পেয়েই সব কাজ ফেলে চলে এসেছেন। ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা!'

হরি মহারাজ চিকিৎসকদ্বয়কে পান তামাক দিতে বলিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ক্ষণ গল্প করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাখানিক গল্প হইল, কিন্তু অসুখের কথা উঠিতেছে দেখিয়া সেবক অধীর হইলেন। পরে ডাক্তারগণ অঙ্গুলির ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, এরূপ ঘা স্ক্রেপ করা অমানুষিক অত্যাচার। তালগাছের তাড়ি (yeast) দিয়া ব্যাণ্ডেজ করা হইল। সুরেশ বাবু স্ক্রেপ করিতে নিষেধ করিলেন। ২৪ ঘণ্টা পরে খোলা হইল। তাঁহারা উগ্র খোস মনে করিয়া নিমঘি দিয়া পুনরায় ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন। হরি মহারাজের অসাধারণ দেহবোধরাহিত্য দেখিয়া সুরেশ বাবুর সেইবার খুব মানসিক পরিবর্তন হইল। তাঁহাকে চেয়ার দেওয়া সত্ত্বেও তিনি মেজের উপর বসিলেন। মেজের উপর কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি কম্বলে না বসিয়া মেজেতেই বসিয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঐ ঘা স্ক্রেপ করাতে যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে তা অন্য রোগী সহ্য করতে পারতো না, মারা যেতো।'*

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামী তুরীয়ানন্দজী উত্তর ভারতের তীব্র শীত বা গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিতেন। একবার গ্রীষ্মকালে এলাহাবাদের নিকট কোন আম্রবনে অবস্থান-কালে দ্বিপ্রহরে ভিক্ষাটনাদি সমাপনান্তে তিনি স্নান করিতে যান। সেদিন এত গরম ছিল যে, গায়ে ফোস্কা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ সময় লু লাগিয়া কয়েক জন লোকের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। স্নানের জন্য গাত্রে জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সেই মূর্চ্ছা দুই দিন ও দুই রাত্রি স্থায়ী হয়। সংজ্ঞালাভের পর তিনি দেখেন যুক্তপ্রদেশ-বাসী কোন ভক্তের গৃহে আছেন।† তিনি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন, তাই ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন।

* উপরোক্ত কয়েকটী ঘটনা স্বামী প্রবোধানন্দজী-বর্ণিত।

† 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (১৯২২, সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) শ্রীম-লিখিত প্রবন্ধে উক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ঃ

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২রা বৈশাখ হইতে এক সপ্তাহব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে ভারতের অবতারগণের জীবনী ও উপদেশ আলোচিত হয়।

প্রথম দিবসে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক প্রেমভক্তি ও সর্বস্বত্যাগরূপ সন্ন্যাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয় প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, দ্বেষ-হিংসাপূর্ণ রক্তপাতকলুষিত বর্তমান ভারতে প্রেমের একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় দিবসে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তানাথ তৈলঙ্গ শাস্ত্রী হিন্দিতে শ্রীরামচরিত বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, শৌর্য, ভক্ত-বাৎসল্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন হয়।

তৃতীয় দিবসে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও লীলা আলোচনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বলেন, ভক্তের অহংকার ও ভগবানের অকৃপা এই দুইটী ভক্তিলাভের অন্তরায়। তৎপরে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ওঙ্কারানন্দজী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলার উল্লেখ করিয়া বলেন যে বৃন্দাবনের দ্বিভুজ-মুরলী-ধর শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপেক্ষা "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ", "তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব"-উপদেষ্টা গীতার বীর ও ধর্মসমন্বয়কারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও উপদেশ বর্তমানে ঈর্ষ্যা ও দৈন্যগ্রস্ত ভারতের অধিকতর কল্যাণের নিদান।

চতুর্থ দিবসে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় শ্রীবুদ্ধের জীবনী ও বাণী আলোচনা করিয়া বলেন, অষ্ট আর্যমার্গ-পালন বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি এবং সর্বভূতে একত্ব দর্শনের দ্বারা আত্মসম সেবা শ্রীবুদ্ধদেবের প্রধান কথা।

পঞ্চম দিবসে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলদেব উপাধ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্যের দার্শনিক মতের গভীরতা, জ্ঞানবত্তা, ধর্মপ্রচার ও ভক্তির সবিশেষ আলোচনা করিয়া বলেন যে, শঙ্করের "সৌন্দর্য-লহরী স্তোত্র" পাঠ করিলে তাঁহার জীবনে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় বুঝা যায়।

ষষ্ঠ দিবসে স্বামী ওঙ্কারানন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন, ধর্মজগতে 'কথামৃত' এক অপূর্ব দান। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট ছোট কথা, গল্প ও উপদেশের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে। স্বামী রামানন্দজী 'কথামৃতে'র কয়েকটি সংগীত গান করেন।

সপ্তম দিবসে এক বিশেষ সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী"। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সাধন ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-সমন্বয়ের প্রচার, ন্যায়াচার্য ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সনাতন হিন্দুধর্মের সার্বভৌমতা এবং নিরক্ষর সাধকের ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনে শ্রোত্রিয়ত্বের স্বতঃ আবির্ভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী যমুনাবাঈ পাঠক বক্তৃতা-

প্রসঙ্গে বলেন, বারবনিতাকেও শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃ-বুদ্ধিতে এবং সর্বাবস্থায় সকল নারীতে ভগবতীকে দর্শন করিতেন। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম ও করুণার উল্লেখ করিয়া বলেন, কেবল হৃদয়ের ভালবাসা ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়, তাঁহাকে আপনার হইতে আপনার জ্ঞান করাই পরম পুরুষার্থ। সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সত্য লাভ হইতে প্রেম এবং প্রেম হইতে কিরূপে সেবার ভাব সঞ্চারিত হয় তাহা প্রদর্শন করেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার শেঠ ধন্যবাদ প্রদান করিলে ভগবৎ-কীর্তনের পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৭শে চৈত্র হইতে তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অরুণেন্দু ভট্টাচার্য ও ব্রহ্মচারী অটলচৈতন্যের ভজন, প্রসিদ্ধ কবি জনাব গুমানি দেওয়ান ও শ্রীযুক্ত লম্বোদর চট্টোপাধ্যায়ের কবিগান, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ-কথকতা এবং শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, জনসভায় বক্তৃতা এবং পাঁচ হাজারেরও অধিক সংখ্যক নরনারীর প্রসাদ-গ্রহণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনদিনই বহু শ্রোতার নিকট বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দজী "ভারতবর্ষে ধর্মের ক্রমবিকাশ", "শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম ও উহার পরিণতি", "ভারতের বর্তমান প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎ গৌরব" সম্বন্ধে তিনটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায়, মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মজুমদার মহাশয়গণের অভিভাষণও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

জামসেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই আশ্রমে গত ৭ই চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে মহিলাদের একটি, ছাত্র-ছাত্রীদের একটি এবং স্থানীয় মিশন কেন্দ্রে ও শহরের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি জন-সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দজী ও স্বামী আত্মানন্দজী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহোদয়গণ শ্রীশ্রীপরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ৮ই চৈত্র তিন হাজার নরনারী স্থানীয় মিশনকেন্দ্রে প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য পারিতোষিক-বিতরণ করা হয়।

১৫ই চৈত্র শহর হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী হলুদপুকুর গ্রামে উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পূর্বাহ্নে তথায় বিভিন্ন বক্তা হিন্দী ও বাঙ্গলায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং অপরাহ্নে প্রায় ছয় শত গ্রামবাসী জাতিধর্মনির্বিশেষে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই স্থানেও স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুল-সমূহের ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে রচনা-প্রতিযোগিতার জন্য পারিতোষিক ঘোষণা করা হয়।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৮শে ফাল্গুন হইতে ১৩ই চৈত্র পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা হোম কীর্তন চণ্ডীপাঠ প্রসাদ-বিতরণ এবং শোভাযাত্রা উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১লা চৈত্র মঠ-প্রাঙ্গণে এক সভায় বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দজী ও স্বামী হংসা-

নন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। ২রা চৈত্র মঠ-প্রাঙ্গণে পলাশডাঙ্গার কীর্তনীয়াগণের 'মানভঞ্জন' পালা কীর্তন হয়। ৩রা চৈত্র হইতে ১৩ই চৈত্র পর্যন্ত স্বামী পূর্ণানন্দজী মঠ-প্রাঙ্গণে ২টি, শহরের ধর্মশালায় ১টি, হিন্দু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ১টি, গোয়েঙ্কা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ১টি, বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্মুখে ১টি, বাঁকুড়া হইতে ২৪ মাইল দূরবর্তী যাতড়া নামক স্থানে ১টি, ভাডুল গ্রামে ১টি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। ৪ঠা চৈত্র মঠ প্রাঙ্গণে 'সবুজসংঘে'র ব্যায়াম-কৌশল-প্রদর্শন দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ৭ই চৈত্র মিশন-পরিচালিত ছাত্রাবাস ও হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক "টাকার পূজা" নাটিকা অভিনীত হয়।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২০শে চৈত্র শুক্রবার হইতে দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, শাস্ত্রপাঠ, মহকুমার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের বক্তৃতা ও সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা, স্থানীয় বিশিষ্ট সুরশিল্পিগণের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত ও তিন সহস্র লোকের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। আশ্রম, শহর ও মহকুমার বিভিন্ন স্থানে বেলুড়-মঠের স্বামী পূর্ণানন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে আটটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামী প্রণবা-আনন্দজী ছায়াচিত্র-সহযোগে লোকশিক্ষাপ্রদ "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে ৬টি বক্তৃতা দেন। খুলনা দৌলৎপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনগুপ্তের বক্তৃতাও মনোজ্ঞ হইয়াছিল। খেজুরী থানার কল্যাচক গ্রামে ও কাঁথি থানার সাত মাইল দূরবর্তী মির্জ্জাপুর গ্রামে তিনটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়। জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত যশোদাকান্ত রায়, অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী ও পূর্বোক্ত স্বামীজীদ্বয়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীযুক্ত বনবিহারী মাইতি সভায় বক্তৃতা করেন। বন ও মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মির্জাপুরের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে হিন্দুমহাসভা-ছাত্রাবাসের উদ্বোধন—গত ২রা বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'হিন্দুমহাসভা-ছাত্রাবাসে'র দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্মিণী স্বর্গীয়া ইন্দুপ্রভা দেবী তাঁহাদের একমাত্র পুত্র ৺রামচন্দ্রের ও কন্যা ৺প্রীতিদেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই বালকাশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য জমি ও অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। দ্বারোদ্ঘাটন-প্রসঙ্গে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, "নানা অবস্থার ভিতর দিয়া এই আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন যে প্রকারে এই সকল প্রতিষ্ঠান বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। বাঙ্গালা দেশের এই প্রতিষ্ঠান (রামকৃষ্ণ মিশন) ভারতের সর্বত্র কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়া আসিতেছেন। দিল্লীর কুরুক্ষেত্র আশ্রয়-শিবিরে বহু লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী অবস্থান করিতেছেন। আমার পরামর্শে রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবাকার্যের জন্য আহ্বান করা হয়। তথায়ও তাঁহারা প্রশংসার সহিত সেবাকার্য করিতেছেন। বাঙ্গালীর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা খাওয়া-পরা ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আশ্রমের বালকগণকে আমি বলিতে চাই, তোমাদের নিজদিগকে গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। তোমাদের নিজদিগকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিবে যে, তোমরা যখন বড়

হইবে, তখন যাহাতে দুঃস্থ ও দরিদ্রের সেবা করিতে পশ্চাৎপদ না হও। যে গঠনমূলক শিক্ষা তোমরা পাইবে, উহাদ্বারা ভবিষ্যতে তোমাদের জীবন সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিবে। আমি আশা করি, এই প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আরও উন্নতি লাভ করিবে এবং আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য সম্ভব তাহা আমি করিব।"

আশ্রম-পরিচালক স্বামী পুণ্যানন্দজী আশ্রমের কার্য-বিবরণীতে উহার প্রতিষ্ঠা-ইতিহাস, শিক্ষা-প্রণালী ও আয়-ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, "বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভা একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য ১৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন; অদূর ভবিষ্যতে ছেলেদের বাসের ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা সম্ভব হইবে। আশ্রমের বালক-সংখ্যা ১৯৫; তন্মধ্যে ১২৯ জনের বয়স ১২ বৎসরের নিম্নে। অধিকাংশ বালকই বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। বাঙ্গালা সরকার আশ্রমকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেছেন। আশা করা যায়, স্বাধীন ভারতে এই প্রকারের জাতিগঠনমূলক কাজ অধিকতর সরকারী সাহায্য লাভ করিবে। বালকগণকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়া 'মানুষ' করিয়া তুলিবার জন্য আশ্রমকে একটি আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিণত করাই মিশনের ইচ্ছা।" এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণী সভা—গত ২৮শে চৈত্র শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে বাগবাজারস্থ এই বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা আহূত হইয়াছিল। ছাত্রীগণের আবৃত্তি, ভজন ও অভিনয় সুন্দর হইয়াছে। সম্পাদকীয় বিবরণী হইতে জানা যায় যে ১৯৪৭ সালে বিদ্যালয়ে ৫৮১ জন ছাত্রী ছিল, তন্মধ্যে ৩৬৮ জন অবৈতনিক। ঐ বৎসর সারদা-মন্দিরসহ বিদ্যালয়ের আয় ২১১৬৬৸৶১০ এবং ব্যয় ২২৩৮২॥৵০ আনা। গত বৎসর ১৮ জন ছাত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল। সকলেই বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২১ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, তন্মধ্যে ৮ জন গ্রাজুয়েট্।

সভানেত্রী মহোদয়া বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা ও শিল্প-বিভাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন, মিশনের সাধুগণ বৈরাগ্য-আশ্রয়ে কর্মযোগ করিয়া চলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ছাত্রীগণের সম্মুখে মিশনের এই ত্যাগ ও সেবার মহান্ আদর্শ রহিয়াছে। আজ ভারতের বন্ধনের রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। মুক্তির সূর্য উঠিয়াছে কিন্তু উহা এখনও মেঘে ঢাকা। যদি এই মহান্ আদর্শ ধরিয়া আমরা চলিতে পারি তাহা হইলে অচিরে ঠিক ঠিক স্বাধীনতা আসিবে।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, (মুর্শিদাবাদ)—গত ৪ঠা বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের স্মৃতিপূজা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ব্রহ্মচারী অটল চৈতন্যের ভজন ও বাণীনাথপুর-গ্রামবাসী চাষীদের "বোলান" গান সমস্ত দিবস ব্যাপী আনন্দোৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রায় ৮০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিবিধ সংবাদ

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ঃ—

গয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও এই আশ্রমের উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পুণ্যক্ষেত্র গয়াধামে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২৮শে ফাল্গুন তিথিপূজা, হোম, পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। ১লা চৈত্র এক হাজার ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় কলেজ-হলে ১৬ই চৈত্র বেলুড় মঠের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ও স্বামী জপানন্দজী যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দের কৃষ্টিগত পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়' এবং 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বিশেষ আমন্ত্রণে স্বামী জপানন্দজী ১৭ই চৈত্র কলেজ-হলে আর একটী বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস স্থানীয় টাউন হলে গয়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেকটর শ্রীযুত জে সি মাথুর, আই-সি-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক মহতী সভায় ব্রহ্মচারী গৌর উদ্বোধন সঙ্গীত গান করিলে স্বামী জপানন্দজী হিন্দীভাষায় 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও শিক্ষা' সম্বন্ধে এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অপূর্ব অবদান এবং বর্তমান দুর্দিনে জগৎবাসীর কর্তব্য' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। খাজা এনায়েতুল্লার ভাষণান্তে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্থানীয় এ্যাড্ভোকেট্ শ্রীযুত অম্বুজাক্ষ ঘোষ মহাশয় ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য শেষ হয়।

আমরা এই আশ্রমের ১৯৪৭ সনের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে এই আশ্রম-কর্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়, একটী পাঠাগার ও একটী ছাত্রাবাস পরিচালিত হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় পৃথক অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া রোগগ্রস্ত যাত্রিগণের সেবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে মোট ২৫৫৮ জন নূতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। দুইটী নৈশ বিদ্যালয়ে ৮১ জন ছাত্র ও ছাত্রীকে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। আশ্রম-ছাত্রাবাসে দুই জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে এক জন অনাথ। পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা ৮৪৩ ছিল, তন্মধ্যে ১৩ খানা পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। কয়েক জন গরীব ছাত্রকে মাসিক ও সাময়িক আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছে। এ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যগণের তিথি-উৎসব ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবাদি এবং প্রতি শনিবার রামনামসংকীর্তন ও নির্দিষ্ট দিনে সদ্গ্রন্থাদি পাঠ হইয়াছে। ইন্দোব্রিটিশ শুভেচ্ছা মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ গয়াধামে আসিলে তাঁহাদের অভ্যর্থনাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই আশ্রমের মোট আয় ৩৫৫০৮/১৫ এবং মোট ব্যয় ২৫০৭।৵০।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই সোসাইটি-ভবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৪ঠা বৈশাখ বেলুড় মঠের স্বামী বাসুদেবানন্দজী "বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তৎপর দর্জিপাড়া মানস-মন্দিরের সভ্যগণ শ্রীশ্রীকালীকীর্তন করেন। ৫ই বৈশাখ শোভাবাজার

বেনেটোলার নবগৌর কীর্তন-সম্প্রদায়ের গায়ক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সদলবলে নিমাই-সন্ন্যাস পালাকীর্তন করিয়া শ্রোতৃবন্দের আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্ত গুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'শিবানন্দ-বাণী' ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

সরিষাবাড়ী (মৈমনসিংহ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১২ই বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্রয়োদশাধিক শততম জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম এবং মধ্যাহ্নে আরাত্রিক, ভজন, কীর্তন হয়। প্রায় ৮০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সায়াহ্নে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিমলানন্দজী "স্বাধীনতায় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দান" সম্বন্ধে অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

মথুরাপুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৮শে ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে ভজন, পূজা, চণ্ডীপাঠ, বাণী সেবক সমিতির কালীকীর্তন ও ঐকতান-বাদন হয়। পর দিবস কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসের পৌরোহিত্যে আহূত সভায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী ও সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ-রচিত একটি সরস ও মধুর কবিতা পঠিত হয়।

কলিকাতা মেকলিয়ড কোম্পানীতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা মেকলিয়ড কোম্পানীর কর্মচারীদের উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর ভিতর দিয়া কি ভাবে উহা শ্রেষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জ্যোতিরূপানন্দজী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, ভক্ত ও কোম্পানীর কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতে আঞ্চলিক বাহিনী গঠন—ভারতের দেশরক্ষা-সচিব সর্দার বলদেব সিং ভারতে আঞ্চলিক বাহিনী গঠন-সম্পর্কে এক ঘোষণায় বলিয়াছেন, "দেশের যুবকদের সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য কিছুদিন যাবৎ আইন-সভার ভিতরের ও বাহিরের সকলেই দাবী করিতেছেন। স্বাধীন দেশের অধিবাসীদের পক্ষে এই দাবী একান্ত ন্যায়সঙ্গত এবং সরকার এই দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া গত কয়েক মাস যাবৎ বিষয়টি সম্পর্কে সতর্কভাবে বিবেচনা করিতেছিলেন। বর্তমানে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত অফিসারের অভাব আমাদের বেশী; কিন্তু তথাপি অবস্থার চাপে পড়িয়া এবং উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা অবিলম্বে আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করি।

"পরিকল্পনাটী মোটামুটি এইরূপ:—আঞ্চলিক বাহিনীর কাজ হইবে (১) জাতির প্রয়োজনের সময় দেশরক্ষার দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ হিসাবে ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য করা, (২) রাষ্ট্রের সঙ্কটের সময় দেশের আভ্যন্তরীণ রক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব লইয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাহাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করিবার সুযোগ দেওয়া, (৩) বিমান-আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও উপকূলরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সর্বোপরি (৪) দেশের

প্রত্যেক যুবক ও সমর্থ লোককে সামরিক শিক্ষাদানের এরূপ সুযোগ দেওয়া যাহাতে দেশের প্রয়োজনে প্রত্যেক ভারতবাসী অস্ত্র-ধারণ করিতে পারে।

"আঞ্চলিক বাহিনীকে স্বাবলম্বী করিয়া গঠন করার জন্য পরিচালনা, কারিগরি বিদ্যা ও যুদ্ধ এই তিনটি বিভাগে ভাগ করা হইবে। কারিগরি বিদ্যায় পটু লোক লইয়া এই ধরনের একটি বিভাগ গঠন করা সত্যই কষ্টকর এবং এইজন্য আমাদের ভিন্ন পথ গ্রহণ করিতে হইয়াছে আমরা স্থির করিয়াছি যে রেল ডাক তার ও পোর্ট ট্রাষ্টের কারিগরি বিদ্যায় পটু কর্মচারীদের লইয়াই এই বিভাগটী এরূপভাবে গঠিত হইবে যাহাতে প্রয়োজনের সময় ইহারা ঠিকমত কাজ চালাইয়া যাইতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্রে বিমান-আক্রমণ হইতে রক্ষা ও উপকূলরক্ষার দায়িত্ব সাধারণতঃ অস্থায়ী সৈন্যবাহিনীর উপরেই ন্যস্ত আছে। এইজন্য আমরাও আঞ্চলিক বাহিনীকে এই দায়িত্ব দানের মনস্থ করিয়াছি।

"আঞ্চলিক বাহিনী প্রধানতঃ ইহার নিজস্ব অফিসারদের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। এই বাহিনীতে লোক সংগ্রহ ও তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক ভাবে স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর অফিসারদিগকেই বর্তমানে কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে। শিক্ষার মেয়াদ ও বাহিনীর অন্তর্ভুক্তির সর্তাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। যাহারা আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগ দিবে, তাহাদের প্রত্যেককে প্রতি বৎসরে একমাস বা দুইমাস কঠোর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মাসেই তাহাদের কিছু পরিমাণ কুচকাওয়াজ করিতে হইবে। বয়সের বিধি-নিষেধ এমনভাবে করা হইবে যাহাতে প্রত্যেক সমর্থ দেশবাসীই শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

"আঞ্চলিক ভিত্তিতেই এই বাহিনী গঠন করা হইবে। এই জন্য ভারতকে মোট ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। অঞ্চলগুলি এইরূপ:— ১নং—পূর্বপাঞ্জাব, পূর্বপাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য এবং দিল্লীসহ রাজপুতনা। ২নং—যুক্ত প্রদেশ। ৩নং—মধ্যপ্রদেশ ও পূর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ। ৪নং—বোম্বাই ও কাথিয়াবাড়। ৫নং—মান্দ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর। ৬নং—বিহার ও উড়িষ্যা। ৭নং—পশ্চিমবঙ্গ ও কুচবিহার। ৮নং—আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর। বর্তমানের চারিটি সামরিক অঞ্চল লইয়া মোটামুটিভাবে এই অঞ্চলগুলি ভাগ করা হইয়াছে। আঞ্চলিক বাহিনীর প্রাথমিক শক্তি হইবে ১৩০০০০ জন। সমগ্র বাহিনীকে আগামী এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ বাহিনী হিসাবে গড়িয়া তোলা যাইবে বলিয়া আমরা মনে করি। উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক ও অস্ত্রশস্ত্রাদির অভাবের জন্যই আমাদের এতদিন সময় লাগিবে, তবে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, এই পরিকল্পনাকে যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করিবার জন্য সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। আমরা ইতোমধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি এবং এক জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে আঞ্চলিক বাহিনীর ডিরেক্টর হিসাবে দেশরক্ষা দপ্তরে গ্রহণ করিয়াছি। যত শীঘ্র সম্ভব তিনি এই বাহিনী গড়িয়া তুলিবার কাজে ব্রতী হইবেন।"

পূর্ববঙ্গে সদিচ্ছা মিশন প্রেরণ সম্পর্কে অভিমত—নবগঠিত সদিচ্ছা মিশনের সভ্যগণের পূর্বপাকিস্তান পরিদর্শন-সম্পর্কে কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র ও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন, "পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সদিচ্ছা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এখন শুধু

প্রয়োজন বহিরাগত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অপসারণ ও শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ন্যায়বিচার। * * *

"বহু হিন্দু যশোহরে ভাষাগত বিরোধ সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন অথচ ইঁহারা যে উক্ত বিরোধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। যশোহর পরিদর্শনকালে মিঃ সুরাবর্দি এ সম্পর্কে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করায় তিনি আমার সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু আমরা চলিয়া আসার পর কিছুই আর করা হয় নাই। এভাবে সদিচ্ছা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? খুলনার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশের ডি আই জির যেরূপ মনোভাব দেখা গেল, উহাও মিশনের উদ্দেশ্যের অনুকূল নহে। ঢাকা খুলনা ও যশোহরে বহু বাড়ী রিকুইজিশন করা হইয়াছে এবং অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ঐগুলি দখল লওয়া হইয়াছে। এইভাবে যদি বাড়ী রিকুইজিশন করা হইতে থাকে, তবে সদিচ্ছা রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব হইবে? শুল্ক-সম্পর্কিত বিধিনিষেধ এবং তৎসহ অবমাননাকর তল্লাসী-সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভাল। এই শুল্কপ্রাচীর যদি না উঠাইয়া লওয়া হয়, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে শিথিল না করা হয়, তবে পূর্ববঙ্গে জীবন-ধারণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

"এই সকল কারণ এবং অন্যান্য বহু প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি জানিতে পারে যে, তাহাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, তবে এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহারা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত। পাকিস্তান ঐস্‌লামিক রাষ্ট্র বলিয়া সম্প্রতি মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ যে ঘোষণা করিয়াছেন, উহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের যদি প্রতিকার না হয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই আশ্বাস তাহাদিগকে যদি না দেওয়া হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সমান অধিকার ও জীবনের সুযোগ-সুবিধা তাহারা ভোগ করিতে পারিবে, তাহা হইলে সেখানে তাহাদিগকে শান্তিতে বসবাস করিতে বলা নিরর্থক। ফাঁকা কথায় তাহাদিগকে আর সন্তুষ্ট করা যাইবে না। তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে এবং তাহাদের সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। যত দিন পর্যন্ত ইহা না করা হইতেছে, ততদিন সদিচ্ছা মিশন প্রেরণ করিলে কোন লাভ হইবে না।"

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র-সংঘ—লণ্ডনে গাওয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্র-সংঘের হেডকোয়ার্টার্স গত যুদ্ধে জার্মান আক্রমণে প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। সেই স্থানেই তাঁহাদের নূতন হেডকোয়ার্টার্স এবং ছাত্রাবাস-পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। নির্মাণকার্য আগামী আগষ্ট মাসে আরম্ভ হইবে এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই ছাত্র-সংঘ ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল হইতে আগত ছাত্রদের মিলনকেন্দ্র।

ছাত্রাবাসে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান হইতে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র আসিয়া একটি সুখী পরিবারের মত একত্রে পরস্পরের সুখ-দুঃখ লইয়া বাস করিতেছেন। ভারতীয় ছাত্রমাত্রেই এই সংঘের সভ্য হইতে পারেন। তাহা ছাড়া ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে আগত ছাত্রগণও ইঁহার সভ্য হইতে পারেন। লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ও পাকিস্তানী মোট ৫০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩০০ জনই এই ছাত্রসংঘের সভ্য।

ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং সিংহলের লণ্ডনস্থিত হাইকমিশনারগণ এবং ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রদূত ভারতীয় ছাত্র-সংঘ-সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়া থাকেন। 'সভা-সমিতি ও

সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহারা সকলেই পরস্পর দেশের মধ্যে প্রীতি ও সংস্কৃতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করিতে আগ্রহান্বিত।

প্রথম যুদ্ধের সময় এই সংঘ লণ্ডনস্থিত ভারতীয় সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থল হিসাবে সাধারণ ভাবে কাজ আরম্ভ করে, পরবর্তী কালে ভারতীয় ছাত্রগণের বান্ধবহীন প্রবাস-জীবনের দুঃখকে লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে এই ছাত্রসংঘ পুনর্গঠিত হয়।

নূতন গৃহে পঞ্চাশজন ছাত্রের উপযোগী বাস-ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া এ্যাসেম্বলী হল, *বিশ্রাম-কক্ষ, রেস্তোরঁা এবং একটি পাঠাগার* থাকিবে। এই পাঠাগারটি 'মহাত্মা গান্ধী লাইব্রেরী' নামে অভিহিত হইবে। ইতোমধ্যে মিঃ পোলক কতকগুলি পুস্তক পাঠাগারে দান করিয়াছেন।

ছাত্রগণের পক্ষ হইতে ছাত্র-সংঘকে বোম্বাই-এর প্রখ্যাত শিল্পী মিঃ ভি-আররাও কর্তৃক অঙ্কিত মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রতিকৃতি উপহার দেওয়া হইবে। সেইজন্য ছাত্রগণ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। চিত্রটি নূতন গৃহে শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইবে।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যনিবাস

আবেদন

আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় আজ পর্যন্ত অতি সামান্যই হইয়াছে। এদেশে প্রতিবৎসর অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ ব্যক্তি এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন; আর সারাদেশের চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যনিবাসসমূহে এই রোগের চিকিৎসার জন্য মাত্র ছয় হাজার শয্যার ব্যবস্থা আছে। রোগীকে তাঁহার বাড়ী হইতে সরাইয়া চিকিৎসালয় বা স্বাস্থ্যনিবাসে রাখিবার ব্যবস্থা করিলে শুধু যে তাঁহার আরোগ্য-লাভের উপায় হয় তাহা নহে, পরন্তু এক একটি রোগী হইতে বহুসংখ্যক সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে রোগ-সংক্রমণও নিবারিত হয়।

জনস্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট এই দারুণ সমস্যা-সমাধানে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রায় দশ বৎসর পূর্বে রাঁচি ষ্টেশন হইতে আট মাইল দূরে চাইবাসা রোডের পার্শ্বে ২৪০ একর পরিমিত এক মনোরম ভূমি-খণ্ড সংগৃহীত হয় এবং ঐ ভূমির উপর সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি সমেত ৬০ জন রোগীর উপযোগী যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভের আয়োজন হয়। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধাবসানের পরও গৃহনির্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এতদিন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। বর্তমানে একটি ওয়ার্ড ও দুইটি কুটির নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি বাড়ীর কাজে শীঘ্র হাত দেওয়া হইবে। এক বৎসরের মধ্যে যাহাতে চিকিৎসা আরম্ভ করা যায় সে চেষ্টা চলিতেছে। এই কাজের জন্য সংগৃহীত প্রায় এক লক্ষ টাকার অর্ধেকের বেশী জমি ও গৃহ-নির্মাণের উপকরণ-সংগ্রহে এবং আরব্ধ গৃহ-নির্মাণে ইতোমধ্যে খরচ হইয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যনিবাসটি সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ করিতে হইলে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট এই অতি প্রয়োজনীয় কার্যে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। আর্থিক বা অন্যবিধ অতি অল্প পরিমাণ সাহায্যও নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে: (১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া; (২) কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন-কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা; (৩) কার্যাধ্যক্ষ অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা ১৩; (৪) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়, পোঃ আঃ হাটিয়া, জেলা রাঁচি।

১২-৩-৪৮

মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

উদ্বোধন
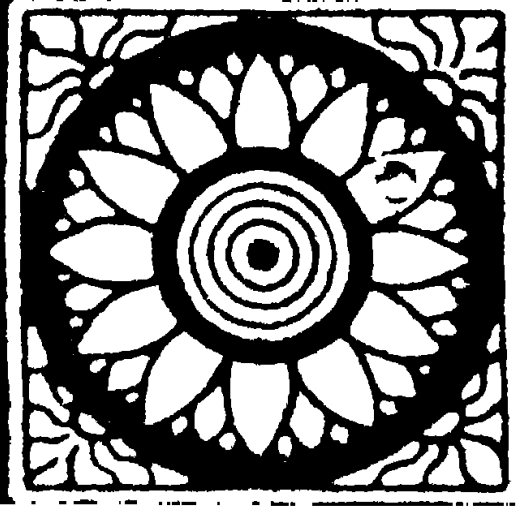
স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

(৪)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

শ্রীনগর, কাশ্মীর

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

এক্ষণে কাশ্মীর দেখিয়া ফিরিতেছি। দু এক দিনের মধ্যে পাঞ্জাব যাত্রা করিব। এবার শরীর অনেক সুস্থ হওয়ায় পূর্ব্বের ভাবে পুনরায় ভ্রমণ করিব মনস্থ করিয়াছি। Lecture ফেক্‌চার বড় বেশী নয়—যদি একটা আধটা পাঞ্জাবে হয়ত হইবে নইলে নয়। এদেশের লোক ত এখনও এক পয়সা গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত দিলে না—তাহাতে মণ্ডলী লইয়া চলা যে কি কষ্টকর বুঝিতেই পার। কেবল ঐ ইংরাজ শিষ্যদের নিকট হাত পাতাও লজ্জার কথা। অতএব পূর্ব্বের ভাবে 'কম্বলবন্ত' হইয়া চলিলাম। এস্থানে Goodwin প্রভৃতি কাহারও প্রয়োজন নাই বুঝিতেই পারিতেছ।

Ceylon হইতে একটী সাধু P. C. Jinavara Vamar নামক আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তিনি ভারতবর্ষে আসিতে চান ইত্যাদি। বোধ হয় ইনিই সেই Siamese রাজকুমার সাধু। ইঁহার ঠিকানা Wellawetta, Ceylon, যদি সুবিধা হয় ইঁহাকে মান্দ্রাজে নিমন্ত্রণ কর। ইঁহার বেদান্তে বিশ্বাস আছে, মান্দ্রাজ হইতে ইঁহাকে অন্যান্য স্থানে পাঠান তত কঠিন কার্য্য নহে। আর অমন একটী লোক সম্প্রদায়ে থাকাও ভাল। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ সকলকে জানাইবে ও জানিবে। ইতি—

বিবেকানন্দ

খেতরীর রাজা 10th Oct. বম্বে পৌছিবে—address দিবে, ভুলিও না।

(৫)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮

প্রিয় শশী,

মান্দ্রাজের মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আমরা সকলেই তোমায় অভিনন্দন জানাইতেছি। আশা করি লোকসমাগম ভালই হইয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক খোরাকেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

তোমার অতি প্রিয় মুদ্রাদি এবং ক্লীং-ফটের পরিবর্তে তুমি যে মান্দ্রাজের লোকদের আত্মবিদ্যা শিখাইবার জন্য অধিকতর কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছ, তাহাতে আমরা খুব খুসী হইয়াছি। শ্রীজীর সম্বন্ধে তোমার বক্তৃতা সত্যই চমৎকার হইয়াছিল—যদিও আমি খাণ্ডোয়ায় থাকাকালে মান্দ্রাজ মেল পত্রে ছাপা উহার একটা বিবরণ একটু দেখিয়াছিলাম মাত্র, এবং মঠে তো উহারা কিছুই পায় নাই। তুমি আমাদিগকে একখানি কপি পাঠাইয়া দাও না?

শুনিতে পাইলাম, আমার পত্রাদি না পাইয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছ; সত্য কি? প্রকৃতপক্ষে তুমি আমায় যত চিঠি লিখিয়াছ, আমি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও তোমায় তদপেক্ষা অধিক লিখিয়াছি। তোমার উচিত মান্দ্রাজ হইতে প্রতি সপ্তাহে যতটা সম্ভব খবর আমাদিগকে পাঠান। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, প্রতিদিন একখানি কাগজে কয়েক পঙ্‌ক্তি ও কয়েকটি সংবাদ টুকিয়া রাখা।

কিছুকাল যাবৎ আমার শরীর ভাল যাইতেছিল না। সম্প্রতি উহা অনেক ভাল। এখন কলিকাতায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একটু বেশী শীত পড়িয়াছে এবং আমেরিকা হইতে যেসব বন্ধুরা আসিয়াছেন তাঁহারা ইহাতে খুব আনন্দেই আছেন। যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।

গঙ্গা এখানে আছে এবং তোমায় জানাইয়া দিতে বলিতেছে, সে যদিও ব্রহ্মবাদিন্ কাগজের জন্য জন কয়েক গ্রাহক যোগাড় করিয়াছে, তথাপি কাগজ এত অনিয়মিত ভাবে পৌঁছায় যে তাহার ভয় হয়, তাহাদের সকলকে শীঘ্রই না হারাইতে হয়। তুমি জনৈক যুবকের সম্বন্ধে যে প্রশংসা-পত্র দিয়াছ উহা পাইয়াছি এবং উহার সঙ্গে আছে সেই চিরন্তন কাহিনী, "মহাশয়, আমার জীবনধারণের কোনই উপায় নাই।" অধিকন্তু এই কাহিনীর মান্দ্রাজী সংস্করণে এইটুকু বেশী আছে, "আমার অনেকগুলি সন্তানও আছে।"......আমি তাহাকে সাহায্য করিতে

পরিচয়:—শ্রীজী—শ্রীগুরুমহারাজজী অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ; গঙ্গা—স্বামী অখণ্ডানন্দ; রাজা বা রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ; সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীত; হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ; তুলসী—স্বামী নির্ম্মলানন্দ; খোকা—স্বামী সুবোধানন্দ; শরৎ—স্বামী সারদানন্দ; শ্রীশ্রীমহারাজ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

পারিলে খুসী হইতাম, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার হাতে টাকা নাই—আমার যাহা ছিল তাহার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত রাজার হাতে দিয়াছি।.....যাহা হউক, আমি পত্রখানি রাখালকে পাঠাইয়াছি—সে যদি কোন প্রকারে তোমার বন্ধু যুবকটিকে সাহায্য করিতে পারে। সে লিখিয়াছে যে, সে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে খ্রীষ্টানরা তাহাকে সাহায্য করিবে; কিন্তু সে তাহা করিবে না। তাহার হয় তো ভয় হইতেছে পাছে তাহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণে হিন্দুভারত একটি উজ্জ্বলতম রত্নকে হারায়!

নূতন মঠে নদীতীরে বাস করিতে হওয়ায় এবং যে পরিমাণ বিশুদ্ধ ও ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করিতে হইতেছে তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় এখানে ছেলেরা অনেকটা হায়রান হইয়া পড়িতেছে। সারদা দিনাজপুর হইতে ম্যালেরিয়া লইয়া আসিয়াছে। হরিরও একটু হইয়াছিল। আমার মনে হয় ইহাতে তাহাদের অনেকটা মাংস বাড়িবে। ভাল কথা, আমরা এখানে আবার আমাদের নাচের ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছি; হরি, সারদা ও স্বয়ং আমাকে ওয়াল্‌ট্‌জ্‌ নৃত্য করিতে দেখিলে তুমি আনন্দে ভরপুর হইতে। আমি নিজেই অবাক হইয়া যাই যে, আমরা কিরূপে টাল সামলাইয়া রাখি।

শরৎ আসিয়াছে এবং তাহার অভ্যাস মত কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। এখন আমাদের কিছু ভাল আসবাব হইয়াছে—ভাব দেখি, সেই পুরাণ মঠের চাটাই ছাড়িয়া সুন্দর টেবিল, চেয়ার ও তিনখানি খাট পাওয়া কত বড় উন্নতি! আমরা পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার ক্লীংফট্‌, ঝাঁজ ও ঘণ্টা যে ভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে তাহাতে তুমি মূর্চ্ছা যাইবে। জন্মতিথি-পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে। তুলসী ও খোকা কেমন আছে? রাখালের নিকট অপেক্ষা তোমার নিকট কি তাহারা অধিক ঠাণ্ডা আছে? তুমি তুলসীকে কাজের ভার দিয়া একবার কলিকাতায় আস না? কিন্তু উহা ভয়ানক খরচসাপেক্ষ—আর তোমাকে তো ফিরিয়াও যাইতে হইবে; কারণ মান্দ্রাজের কাজটা পুরাপুরি গড়িয়া তোলা দরকার। আমি মাস-কয়েক পরেই মিসেস্ বুলের সঙ্গে আবার আমেরিকায় যাইতেছি। গুডউইনকে আমার ভালবাসা জানাইও এবং তাহাকে বলিও, আমরা অন্ততঃ জাপানে যাইবার পথে তাহার সহিত দেখা করিব। শিবানন্দ এখানে আছে এবং আমি তাহার হিমালয়ে চিরপ্রস্থানের প্রবল আগ্রহ কতকটা দমাইয়াছি। তুলসীও তাহাই ভাবিতেছে নাকি? আমার মনে হয়, ওখানকার বড় বড় ইঁদুরের গর্ত্তেই তাহার গুহার সাধ মিটিতে পারে—কি বল?

এখানে মঠ তো স্থাপিত হইল। আমি আরও সাহায্যের জন্য বিদেশে যাইতেছি।...শ্রীমহারাজের আশীর্ব্বাদে ভারত বাঁচিয়া উঠিবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৬)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

(সম্ভবতঃ) মার্চ্চ, ১৮৯৮

প্রিয় শশী,

আমি তোমায় দুইটি কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। (১) তুলসীর উচিত গুডউইনের নিকট হইতে সাঙ্কেতিক লিখন—অন্ততঃ উহার গোড়ার জিনিস—শিখিয়া লওয়া। (২) ভারতের বাহিরে থাকা কালে আমায় প্রায় প্রতি ডাকে মান্দ্রাজে একখানি করিয়া চিঠি লিখিতে হইত। আমি ঐ সব চিঠির নকলের জন্য লিখিয়া বিফল হইয়াছি। আমাকে ঐ চিঠি সব পাঠাইয়া দিও। আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখিতে চাই। ইহাতে অন্যথা করিও না। কাজ হইয়া গেলেই আমি ঐগুলি ফেরৎ পাঠাইয়া দিব। 'ডন্' (Dawn) কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০্ টাকা খরচ হইবে এবং দুই শত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারিবে—ইহা একটা মস্ত খবর। 'প্রবুদ্ধ ভারত' অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; উহার সুশৃঙ্খলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। বেচারা আলাসিঙ্গা! আমি তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এইটুকু করিতে পারি যে, সে এক বৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়া ব্রহ্মবাদিন্ কাগজের জন্য খাটিতে পারে। তাহাকে বলিও সে যেন চিন্তিত না হয়। তাহার কথা আমাদের সর্ব্বদাই মনে আছে। বৎস আমার! তাহার ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারিব না।

আমি ভাবিতেছি, মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাক্‌লাউডের সঙ্গে আবার কাশ্মীর যাইব। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া সেখান হইতে আমেরিকা যাত্রা করিব।

মিস্ নোবলের মত মেয়ে সত্যই দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস্ বেসান্তকে ছাড়াইয়া যাইবে।

আলাসিঙ্গার প্রতি একটু নজর রাখিও। আমার যেন মনে হয়, সে কাজে ডুবিয়া গিয়া নিজের শরীর পাত করিতেছে। তাহাকে বলিও, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম—এই ভাবেই সর্ব্বোত্তম কাজ হইতে পারে। তাহাকে আমার সম্পূর্ণ ভালবাসা জানাইও। কলিকাতায় জনসাধারণের জন্য আমাদের দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল—একটি মিস্ নোবলের এবং অপরটি আমাদের শরতের। তাহারা দুইজনেই খুব চমৎকার বলিয়াছিল। শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। উহাতে মনে হয়, কলিকাতার জনসাধারণ আমাদিগকে ভুলিয়া যায় নাই। মঠের কাহারও কাহারও একটু সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল। তাহারা সকলেই এখন ভাল। কাজ সুন্দর চলিয়া যাইতেছে। শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত এক সঙ্গে খাইয়াছিলেন!..... ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? প্রভু আমাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোন ভয় নাই—সাহস হারাইও না, স্বাস্থ্য ঠিক রাখিও এবং কোন বিষয়ে অতিব্যস্ত হইও না। খানিকক্ষণ

জোরে দাঁড় টানিয়া তার পর দম লওয়া—ইহাই চিরন্তন পন্থা। রাখাল নূতন জমি বাড়ী লইয়া আছে। এই বৎসরের মহোৎসবে আমি সন্তুষ্ট হই নাই।……প্রত্যেক মহোৎসব হওয়া চাই এখানকার সকল ভাবধারার একটি অপূর্ব্ব সমাবেশ। আমরা আগামী বৎসর এই বিষয়ে চেষ্টা করিব এবং আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

বিবেকানন্দ

(৭)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

মঠ, বেলুড়

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হলুন। শরীর যদি খারাপ হয়, অবশ্য এখানে তোমার আসা উচিত নয়—এবং আমিও কল্য মায়াবতী যাচ্ছি। সেখানে আমার একবার যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

আলাসিঙ্গা যদি আসে আমার প্রত্যাগমন অপেক্ষা তাকে করতে হবে। কানাই সম্বন্ধে এরা কি করছে—তা জানি না। আমি আলমোড়া হতে শীঘ্রই ফিরবো, তারপর মান্দ্রাজ যাওয়া হতে পারে। ওয়ালামবড়ি হতে এক পত্র পেয়েছি—তাদের আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিয়ে এক পত্র লিখো এবং আমি মান্দ্রাজ আসবার সময় অবশ্য সে স্থান হয়ে আসব এ কথা জানিও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। তুমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করবে না। আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি—

বিবেকানন্দ

(৮)

The Math, Belur, Howrah Dist.

The 3rd June, 1901

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেয়ে হাঁসিও পেলে কিঞ্চিৎ দুঃখও হল। হাঁসির কারণ এই যে পেট গরমের কি স্বপ্ন দেখে তুমি একটা সত্য ঠাউরে নিজেকে দুঃখিত করেছ—দুঃখের কারণ যে এতে বোঝা যায় যে তোমার শরীর ভাল নয়—তোমার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক!

আমি তোমাকে কস্মিন্ কালেও শাপ দিই নাই আজ কেন দেব? আজন্ম আমার ভালবাসার পরিচয় পেয়ে কি আজ তোমাদের অবিশ্বাস হলো? অবশ্য আমার মেজাজ চিরকালই খারাপ, তায় আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে বড্ডই ভয়ঙ্কর হয়—কিন্তু নিশ্চিত জেনো যে সে ভালবাসা যাবার নয়।

আমার শরীর আজকাল আবার একটু ভাল হচ্ছে। মান্দ্রাজে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কি? দক্ষিণে একটু বর্ষা আরম্ভ হলেই আমি বোধ হয় বম্বে, পুণা হয়ে মান্দ্রাজ যাব। বর্ষা আরম্ভ হলেই বোধ হয় দক্ষিণের প্রচণ্ড গরম থেমে যাবে।

সকলকে আমার বিশেষ ভালবাসা দিও, তুমিও জেনো।

কাল শরৎ দার্জ্জিলিং হতে মঠে এসেছে—শরীর অনেক সুস্থ পূর্ব্ব অপেক্ষা। আর আমি বঙ্গদেশ ও আসাম ভ্রমণ করে এস্থানে পৌছেছি। সকল কাজেই নরম গরম আছে—কখন অধিত্যকা কখন উপত্যকা। আবার উঠবে। ভয় কি?

যাহা হক, আমি বলি যে তুমি কাজ কর্ম্ম কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে একদম মঠে চলে এস—এখানে মাসখানেক বিশ্রামের পর তুমি আমি একসঙ্গে will make a grand tour in Gujrat, Bombay, Poona, Hyderabad, Mysore to Madras. Would not that be grand! তা না যদি পার একান্ত মান্দ্রাজের lecture এখন একমাস স্থগিত থাক—তুমি দুটি দুটি খাও আর খুব ঘুমোও। আমি দুই তিন মাসের মধ্যে সেথা আসছি। যা হক পত্রপাঠ একটু বিস্তার করে লিখবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদঃ

বিবেকানন্দস্য

(৯)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

প্রিয় শশী,

আমি আমার মায়ের সহিত ৺রামেশ্বর যাইতেছি—এই তো কথা! আমি আদৌ মান্দ্রাজে যাইব কি না জানি না। একান্তই যদি যাই, উহা সম্পূর্ণ গোপনে। আমার দেহ মন একেবারে অবসন্ন। একজন লোকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি কাহারও সাথী হইতেছি না; কাহাকেও সঙ্গে লইবার মত শক্তি, অর্থ বা ইচ্ছা আমার নাই—তাহারা গুরু মহারাজের ভক্ত হউক আর না হউক, আসে যায় না। এরূপ প্রশ্ন করাই তোমার পক্ষে অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে।

তোমায় আবার বলিতেছি—আমি এখন মরিয়া আছি বলিলেই চলে এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। এইরূপ ব্যবস্থা যদি তুমি না করিতে পার আমি মান্দ্রাজে যাইব না।

শরীর বাঁচাইবার জন্য আমায় একটু স্বার্থপর হইতে হইতেছে। যোগেন মা প্রভৃতি নিজেদের ব্যবস্থা করুন। আমার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কাহাকেও সঙ্গে লইতে পারিব না। আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ

সম্মিলিত চুক্তিপত্র

সম্পাদক

ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মালপত্র ও যাত্রী চলাচল সম্বন্ধীয় বিরোধ মীমাংসার জন্য কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরখানায় গত ২রা বৈশাখ হইতে পাচ দিন-ব্যাপী এক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ইহাতে উভয় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। সুখের বিষয় যে, সকল বিষয়েই উভয় পক্ষ সন্তোষজনক আপস-মীমাংসায় উপনীত হইয়া এক চুক্তিপত্রে সহি করিয়াছেন। ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতা—ভারত সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এবং পাকিস্তান প্রতিনিধি-দলের নেতা—পাকিস্তান সরকারের অর্থ-সচিব মিঃ গোলাম মহম্মদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে উহাতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। পাকিস্তানে ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ, ভারতে পাকিস্তানীয় হাই-কমিশনার খাজা সাহাবুদ্দীন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায় এবং পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন প্রমুখ উভয় রাষ্ট্রের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ভারত ও পাকিস্তান দুইটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-গণই সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাস্তুত্যাগ তাঁহাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অত্যন্ত প্রতিকূল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। অধিকন্তু বাস্তুত্যাগ প্রশমিত এবং বাস্তুত্যাগীদের প্রত্যাবর্তনের উপযোগী অবস্থা-সৃষ্টি ত্বরান্বিত করিবার নিমিত্ত সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মেলনে ধার্য হইয়াছে—সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষ হইতে যে ক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপিত হইবে যে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে আনীত অভিযোগের কোন প্রতিকার করা হইতেছে না বা হয় নাই, সে ক্ষেত্রে অবিলম্বে ন্যায়সঙ্গত ভাবে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি-প্রদান এবং অতিশীঘ্র প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাও স্থির হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্রই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করিতে তাঁহাদের কর্মচারিগণকে আদেশ দিবেন। যদি দেখা যায় যে, কোন সরকারী কর্মচারী সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সম্বন্ধে কর্তব্য কার্যে অবহেলার অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দৃষ্টান্তস্থানীয় কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠগণের এবং বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উভয় রাষ্ট্রের প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় এক একটি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ভারত ও পাকিস্তানে মালপত্র ও যাত্রী চলাচল সম্বন্ধেও উভয় রাষ্ট্রের প্রতি-নিধিগণ সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়াছেন। পাকিস্তান ঘোষিত হইবার পর দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কয়েক মাসের জন্য অনেক বিষয়ে 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' (Standstill Agreement) সম্পাদিত হয়। ইহার অবসান ঘটিলে মালপত্র ও যাত্রী চলাচল

সম্পর্কে অর্থনীতিক কারণে আরোপিত বিধি-নিষেধের ফলে জনসাধারণকে যে সকল দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে, উহাদের উপশমের জন্য উভয় রাষ্ট্র কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

আলোচ্য সম্মেলনে দুইটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মাল-পত্রাদি সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, তাজা ফল, শাক-সব্জী, দুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্য, হাঁস, মুরগী, ডিম, স্থানীয় মসলা-পত্র, বাঁশ, জ্বালানী কাঠ চলাচলে কোন শুল্ক বসান হইবে না। এই সকল জিনিস উভয় রাষ্ট্রে অবাধে আমদানী ও রপ্তানী করা চলিবে। ইহাও ধার্য হইয়াছে যে, অতীতের ন্যায় যাত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র সমেত দ্রব্যাদি বে-আইনী ভাবে যাহাতে আর আটক করা না হয়, তদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। যাত্রীদের মাল-পত্র অনুসন্ধান-কার্য কেবলমাত্র ভারপ্রাপ্ত শুল্ক-কর্মচারিগণ এবং মহিলা যাত্রীদের দেহতল্লাসী যদি করিতেই হয় তাহা হইলে উহা মহিলা কর্মচারিগণ পরিচালন করিবেন। মালপত্র চলাচল সম্পর্কিত কতকগুলি সাধারণ ও সহজ বিধান উভয় রাষ্ট্রের শুল্ক-বিভাগের কর্তৃপক্ষ আলোচনান্তে নির্ণয় করিয়াছেন এবং উহা সীমান্তের উভয় দিকে যাতায়াতকারী যাত্রীদের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। পরে ইহাও ঘোষিত হইয়াছে যে, এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানী বা রপ্তানী করা চলিবে না। ডাক তার ও টেলিফোন হার এবং চিঠিপত্র বিনা বিলম্বে আদান-প্রদান সম্বন্ধেও দুইটি রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণ আলাপ-আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন।

সম্মেলনে উত্থাপিত অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির সভ্যগণের সুপারিশ অনুসারে গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য অধিবেশন সমাপ্ত হইলে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী দপ্তরখানার দ্বিতলস্থিত অলিন্দে এক বৃহত্তম সাংবাদিক সম্মেলনে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষরিত চুক্তিনামার সর্তাবলী প্রকাশ করেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নিয়োগী এবং পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ গোলাম মহম্মদ বলেন যে, তাঁহাদের গবর্নমেণ্ট উক্ত চুক্তিনামা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করিবেন। এতদ্ভিন্ন দুইটি রাষ্ট্রের কতিপয় বিশিষ্ট প্রতিনিধি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব পরিবর্ধনে সংবাদপত্র-সমূহকে সংশ্লিষ্ট গবর্নমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন।

গত ২০শে বৈশাখ নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পুনরায় মিলিত হইয়া কলিকাতায় স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র অনুমোদন করিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ইতোমধ্যেই উভয় রাষ্ট্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থ সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব কর্মচারিগণকে আদেশ দিয়াছেন।

এই চুক্তিনামার সর্তগুলি কার্যতঃ প্রতিপালিত হইলে দুইটি রাষ্ট্রেরই সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষিত এবং আতঙ্ক দূরীভূত হইবে। ইহার ফলে উভয় ডমিনিয়নের অধিবাসিগণের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং শান্তি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই জন্য এই চুক্তিনামা কার্যে পরিণত করিতে যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা করিবার জন্য আমরা ভারত ও পাকিস্তানের সকল নরনারীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর সহিত আমার দিনগুলি কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। কালের এই দীর্ঘ ব্যবধানেও সেগুলি আমার স্মৃতিতে এখনও সমুজ্জ্বল। আমার সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভে এমন একজন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

আমি যখন খুবই তরুণ তখন আমি বেলুড় মঠ হইতে মান্দ্রাজ মঠে তাঁহার অধীনে সেবা করিবার জন্য প্রেরিত হই। মান্দ্রাজে যাইয়া তাঁহার জীবনযাপন-প্রণালী দর্শনে আমি সর্বপ্রথমে মুগ্ধ হইলাম। ভগবৎপদে একান্ত আত্মনিবেদন ও সম্পূর্ণ শরণাগতি ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহার জীবনসর্বস্ব। এরূপ সমুন্নত ব্যক্তি কর্তৃক চালিত হওয়াই উচ্চতম আধ্যাত্মিক সাধনা। তাঁহার সঙ্গে বাস করা এবং তাঁহার বিশুদ্ধ উদাহরণ অনুসারে জীবন গঠন ও উন্নয়ন করা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ সুযোগ।

আমি তাঁহার জীবনে সেবা ও সাধনার সুথকর সমন্বয় দেখিয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'হে অর্জুন, যাহা কিছু কর তাহা আমাতে অর্পণ কর।' এই উপদেশ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। একবার বক্তৃতা প্রদানান্তে মান্দ্রাজ মঠে ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দের তৈলচিত্রের সম্মুখে তাঁহাকে প্রার্থনারত দেখিয়াছিলাম। প্রতিমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইয়া তিনি এই আকুল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'হে প্রাণপ্রিয় ভ্রাতঃ, তুমিই প্রকৃত পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্যতম প্রতিনিধি, এবং তুমিই আমাকে এখানে তাঁহার বাণী প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছ। আমি কেবলমাত্র তোমার আদেশ পালন করিতেছি। ভ্রাতঃ, তোমার কাছে এই নিবেদন, যেন কোন গর্ব বা আত্মাভিমান আমার অন্তরে প্রবেশ না করে, নাম যশের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা যেন আমার মনে না উঠে। যে গুরু ভার বা দায়িত্ব তুমি আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছ তাহা তোমারই। আশীর্বাদ কর, যাহাতে আমি ঠাকুরের হাতের যন্ত্র হইয়া তাঁহার কাজ করিয়া যাইতে পারি, এবং আমার সকল কর্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই। আমাকে সর্বদা সৎপথে পরিচালিত কর।' শ্রীভগবানে শরণাগতি এবং ভগবৎকর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার কি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ভক্তিবিশ্বাস এত সুগভীর ছিল যে, প্রভুর পূজা করিবার কালে তাঁহার অন্যদিকে আদৌ হুঁস থাকিত না। যে প্রতিকৃতির সামনে তিনি নিত্য পূজা করিতেন তাহাতে ঠাকুরের জীবন্ত উপস্থিতি কী গভীর ভাবেই না তিনি অনুভব করিতেন! স্বীয় সত্তা তাঁহার নিকট যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্য ছিল, ঠাকুরের ছবিটীও তাঁহার কাছে তেমনি জাগ্রত ও জীবন্ত ছিল। মান্দ্রাজের গ্রীষ্মকাল বাঙ্গালীর পক্ষে অসহ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বর্ণ জয়ন্তী সুভেনিরে প্রকাশিত ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ।

জুন মাসের এক দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বিশ্রামকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী গ্রীষ্মের তীব্র তেজে অতিষ্ঠ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এই অসহ্য গ্রীষ্মে ঠাকুরের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হইতেছে। তিনি স্বীয় কষ্ট বিস্মৃত হইয়া ঠাকুরঘরে নীরবে প্রবেশ করিলেন এবং ঠাকুরের প্রতিকৃতির উপর হাত পাখা দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। তিনি সুমিষ্টস্বরে 'হে প্রাণবল্লভ প্রভু আমার, হে প্রাণবল্লভ প্রভু আমার' ইত্যাদি বলিতে বলিতে প্রায় দুই ঘণ্টা ঠাকুরকে ব্যজন করিলেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্বক তিনি যখন ব্যজন করিতেছিলেন তখন পারিপার্শ্বিক কোন কিছুতেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, গ্রীষ্মের তীব্রতাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কেবলমাত্র ঠাকুরের জীবন্ত প্রকাশই তাঁহার নিকট সত্য ও অনুভবগম্য ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি গুরু ও ইষ্টের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ মঠের ঠাকুরঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত খুব নিয়মিত ভাবে তিনি প্রত্যহ সেই ঠাকুরঘরে পূজা করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মান্দ্রাজ গমনের বহুপূর্ব হইতেই এইরূপ পূজা চলিতেছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যখন মান্দ্রাজে পদার্পণ করেন তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর একান্ত বাসনা হইল স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দিয়া অন্ততঃ একবার ঠাকুর পূজা করান। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাহা হইলেই ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার আবির্ভাব ঘটিবে। কিন্তু তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে সেই অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইতেছিলেন না। একদিন যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্নানান্তে ঠাকুরঘরের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি করজোড়ে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে ঠাকুরঘরে যাইয়া পূজা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, 'আনুষ্ঠানিক পূজায় আমি অভ্যস্ত নহি'; কিন্তু তাঁহার সকল আপত্তিই নিষ্ফল হইল। তাঁহাকে প্রিয় গুরুভ্রাতার সপ্রেম অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঠাকুরঘরের মধ্যে কি ঘটিল তাহা বহির্জগতের নিকট চিরতরে অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

যিশু খ্রীষ্ট সত্যই বলিয়াছেন, 'যিনি পুত্রকে দেখিয়াছেন তিনি পিতাকেই দেখিয়াছেন।' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে ঠাকুরের মানসপুত্রজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। সেই জন্য তিনি উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ১৯০৮-৯ খ্রীঃ যখন মান্দ্রাজ মঠে অবস্থান করিতেছিলেন তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন। তিনি স্বয়ং সাগ্রহে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সেবাদি কার্য করিতেন এবং আমাদিগকে অবিচলিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিতে প্রায়ই উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিতেন, 'একমাত্র তাঁহার সেবা করিলেই ঠাকুরের প্রকৃত সেবা হইবে এবং তোমরা অন্য কোন তপস্যাদি ব্যতীত পরম ও চরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবে। ঠাকুরের সকল মহিমা তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত এবং ঠাকুর তাঁহার মধ্য দিয়াই আমাদের সংঘের কল্যাণ বিধানে নিরত আছেন।' একদিন কোন ভক্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবার জন্য কতকগুলি ভাল ভাল ফল মঠে আনিলেন। কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী সেগুলি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে নিবেদন করিয়া ভক্তটীকে বলিলেন, 'ঠাকুর আপনার উপহার স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মধ্য দিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যখন মান্দ্রাজে ছিলেন তখন স্বামী বিবেকানন্দের 'দেববাণী'র ইংরাজি সংস্করণ স্থানীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী উক্ত পুস্তক প্রচারে আগ্রহান্বিত হইয়া উহার বিক্রয় বাড়াইবার জন্য কয়েকটী পরামর্শ দেন। সমালোচনার্থ বইখানি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেরণের ভার আমার উপর পড়িল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, "মান্দ্রাজের (শ্রেষ্ঠ ইংরাজি দৈনিক) 'হিন্দু' পত্রিকায় একখানি বই আগে পাঠাও। উহাতে সমালোচনা প্রকাশিত হইলে 'বোম্বে ক্রনিকল' নামক বিখ্যাত দৈনিকে 'হিন্দু'র সমালোচনা সহ আর একখানি বই পাঠাও।" এই বিষয়ে উভয় গুরুভ্রাতার মধ্যে মতভেদ হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বলিলেন, 'উভয় দৈনিকে এক সময়ে বই সমালোচনার্থ পাঠানই যুক্তিসঙ্গত।' যখন এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী হঠাৎ স্বীয় প্রস্তাব উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিত এই মঠের মোহন্ত এবং পণ্ডিত লোক। এটা তোমারই কাজ। ইহাতে আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় নাই।' এই বলিয়া তিনি এই বিষয়ে ও মঠের অন্যান্য ব্যাপারে একেবারে উদাসীন রহিলেন। সেদিনই তিনি একটী কার্ড লইয়া মান্দ্রাজত্যাগের দিন স্থির করিয়া পুরীতে জনৈক ভক্তকে পত্র দিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী কোনরূপে দুই এক দিন নীরব রহিলেন। প্রিয় গুরুভ্রাতার ঔদাসীন্য তাঁহার বুকে শেল বিদ্ধ করিল। একদিন সকালে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকটে যাইয়া নতজানু হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার কৃপা হ'তে আমি বঞ্চিত হয়েছি। আমি কিছুই নই। তোমার ইচ্ছায় ধূলা হ'তে আমার মত শত শত লোক সৃষ্ট হ'তে পারে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ভাই।' তৎক্ষণাৎ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতি পুনঃ প্রকাশিত হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর গুরুভ্রাতৃ-ভক্তি অতুলনীয়।

এই মহামনা সন্ন্যাসিদ্বয়ের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া আমি শিক্ষা করিয়াছিলাম যে, মঠে থাকিবার সময় সন্ন্যাসীর পক্ষেও অর্থব্যাপারে খাঁটি ব্যবসায়-প্রণালী অনুসরণ করা উচিত। আমি তখন মঠের কোষাধ্যক্ষ ছিলাম এবং যে লৌহ সিন্ধুকে টাকা থাকিত তাহা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর ঘরে ছিল। আমাকে প্রায়ই সিন্ধুক হইতে টাকা লইতে হইত এবং তিনি আমাকে প্রায়ই এইরূপ করিতে দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, 'তোমাকে প্রায়ই টাকা নিতে দেখি। তুমি যথাযথ হিসাব রাখ ত? টাকা যখন অগ্রিম দেবে তার রসিদ রাখবে।' আমি এই সকল বিষয়ে তখন একপ্রকার অনভিজ্ঞই ছিলাম এবং বলিলাম, 'না মহারাজ, আমি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে তাঁর নির্দেশে টাকা যখন তখন অগ্রিম দিই এবং সেই টাকার কোন রসিদ রাখি না।' স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিলেন, "তা' হ'বে না। যে টাকা অগ্রিম দাও তার রসিদ রেখো।" মহারাজ যাহা বলিলেন তাহা আমি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে যাইয়া বলিলাম। তিনি ইহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তখন হইতে আমি তাঁহাকে যে টাকা দিতাম তাহার রসিদ রাখিতাম। আমার যখন বাঙ্গালোর যাইবার সময় হইল আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'মহারাজ, সিন্দুকের চাবিগুলি আপনি রাখুন। আমি যতদিন কোষাধ্যক্ষ ছিলাম ততদিনের মধ্যে আপনি আমার নিকট হইতে মোট ছয়শত টাকা নিয়েছেন।' শশী মহারাজ বলিলেন, 'এত টাকা কি আমি নিয়েছি? না, না, খুব বেশী আমি দুই তিন শত টাকা নিয়েছি। সে যাই হোক, যা টাকা আছে তা' ব্রহ্মচারী রুদ্রচৈতন্যকে বুঝিয়ে দাও।' আমি বলিলাম, 'অগ্রিম প্রদত্ত সব টাকার রসিদ আমার কাছে আছে।' তিনি বলিলেন, 'তা ভাল, সেগুলি আমাকে দেখাও।' আমি রক্ষিত রসিদগুলির সাহায্যে হিসাব মিলাইয়া

দিলাম। ইহাতে আমরা উভয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম।

মান্দ্রাজে অবস্থানকালে (১৮৯৭—১৯১১) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী শ্রীগুরুর বাণী প্রচারের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিত্যপূজা ব্যতীত তিনি মঠে এবং শহরের বহু স্থানে সাপ্তাহিক ধর্মব্যাখ্যা করিতেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নানা সংঘ ও সমিতির আহ্বানে তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে যাইতে হইত। এই সকল বক্তৃতার তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি অতি সরলভাবে ও যত্ন সহকারে তিনি বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর তাঁহার বক্তৃতার ফলাফলের কথা তিনি আদৌ ভাবিতেন না। শ্রোতার সংখ্যা অল্প হইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। ট্রিপ্লিকেনে তাঁহার একটি ক্লাশে যাইবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সেই ক্লাশে খুব কম শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন কেরাণী। সারাদিন অফিসে কাজ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তাঁহার ক্লাশে আসিয়াছিলেন। শশী মহারাজ যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের কয়েক জন ঝিমাইতে লাগিলেন। মঠে ফিরিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার ক্লাশে যাঁহারা ঘুমাইতেছিলেন তাঁহাদের তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি না। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, 'শ্রোতারা মনোযোগের সহিত আমার ব্যাখ্যা শোনে কিনা তাহা আমি লক্ষ্য করি না, আমি নিজেই চিরকাল ছাত্র এবং নিজেই নিজের ব্যাখ্যা শুনি। ইহাতে আমি উদ্দীপনা পাই এবং আমার চিত্ত উন্নত হয়। ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার দুইটী মহৎ বাসনা ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল সংঘের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে মান্দ্রাজ লইয়া যাওয়া এবং তথা হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত তাঁহার তীর্থভ্রমণের বন্দোবস্ত করা, যাহাতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির লোক তাঁহার পুণ্য দর্শন ও সঙ্গলাভে ধন্য হয়। তাঁহার দ্বিতীয় বাসনা ছিল সংঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে মান্দ্রাজ এবং রামেশ্বরাদি স্থানে লইয়া যাওয়া। ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার উভয় বাসনাই পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে তিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সকল ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন বাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী আশ্রমগৃহের বহির্দেশে একটি তাঁবুতে থাকিতেন এবং স্বয়ং তাঁহার সেবাদি করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে তিনি উদ্যান হইতে সুগন্ধি পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিতেন। মায়ের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতিপূর্বক ব্যাকুলভাবে কৃপা ভিক্ষা করিতে তাঁহাকে কতবারই না দেখা গিয়াছে! এক সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীসারদাদেবী আশ্রমের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে কয়েকজন নবীন সন্ন্যাসীর সহিত গমন করিয়া সূর্যাস্ত দর্শন করিতেছিলেন। আকাশে নানা রঙের বিচিত্র লীলা দেখিতে দেখিতে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। অবিলম্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হন। মাতৃপদে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্বক সজল নয়নে তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'হে জননি, হে গিরিকুমারি, তুমি সত্য সত্যই হিমালয়সুতা। তুমি জগদম্বা উমা। তুমিই শক্তিরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা এবং তুমি প্রসন্না হলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়। মা, আমাকে আশীর্বাদ কর, যাঁরা তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের সকলকে কৃপা কর যাতে তারা সকলে সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হয়।' শ্রীশ্রীমা চোখ খুলিয়া স্নেহভরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর মস্তকে স্বহস্ত স্থাপনপূর্বক

তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। ইহাতে শশী মহারাজ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে শ্রীশ্রীমা মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন। তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার মানসে বাঙ্গালোরে যান। তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি ইতোমধ্যেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শশী মহারাজ ছিলেন তাঁহার পদসেবক। প্রত্যহ তাঁহার জ্বর ও কাশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি মায়ের পূত সঙ্গে রামেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে গমন করেন। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে তিনি স্বীয় রুগ্নদেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। পাছে শ্রীশ্রীমার কোন অসুবিধা হয় বা তাঁহার নিরন্তর সেবায় তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন সেইজন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা তিনি স্বীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান নাই! শ্রীশ্রীমা কলিকাতা যাইবার পর শশী মহারাজ বাঙ্গালোর থাকিলে তাঁহাকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করান হয়, তখন জানা যায় যে, তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ডাক্তার খোলাখুলি-ভাবে আমাদিগকে বলিলেন যে, এই রোগ আর সারিবে না। তিনি শশী মহারাজকে শীঘ্র কলিকাতায় পাঠাইতে পরামর্শ দিলেন যাহাতে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি গুরু ভ্রাতাদের সঙ্গে আনন্দে ও শান্তিতে কাটাইতে পারেন। এইবার বাঙ্গালোরে থাকিবার সময় তিনি প্রায়ই আমাদিগকে ঠাকুর এবং তাঁহার অসীম করুণার কথা ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেন। একদিন তিনি ভাবাবেগে ঠাকুরের অপার করুণার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দাক্ষিণাত্যে লইয়া যাইবার সুদীর্ঘ কালের বাসনা দেহরক্ষার পূর্বে ঠাকুরের কৃপায় পূর্ণ হওয়ায় তিনি পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এখন তাঁহার আর কোন বাসনা নাই। এখন তিনি শান্তিতে দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

উপসংহারে আমি বলিতে পারি যে, মহাবীর হনুমান যেমন ভগবান রামচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক ছিলেন, তেমন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত শিষ্য ও সন্তান। তাঁহার দেবচরিত্রে দাস্যভক্তি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পদানুসরণ করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে প্রেরণা দিন!

সম্রাট ও সন্ন্যাসী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ডাইওজিনিস ছিঁড়ি সংসার-পাশ
প্রকাণ্ড এক টবের মধ্যে নিভৃতে করেন বাস,
নিদাঘতপ্ত বালুকার 'পরে দেন তিনি গড়াগড়ি।
শীতে র'ন তিনি নগ্ন গাত্রে বক্ষে পাষাণ ধরি'।
ভোগ-বিলাসের পঙ্কে মগ্ন হইয়াছে সারা গ্রীস,
জর্জর তারে করেছে লালসা-বিষ।
সারাটি দেশের হ'য়ে
দারুণ আত্মনিগ্রহ আর কৃচ্ছ্রপীড়ন স'য়ে
প্রায়শ্চিত্ত করেন দার্শনিক
তাপসজীবন যেন তাঁর সদা গর্জিছে ধিক্ ধিক্।

নৃপতি সেকেন্দার
এলেন একদা তাপসের কাছে, বাসনা হইল তাঁর
দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরে করিবারে দরশন
তাঁর শ্রীচরণ করিবারে পরশন।
নৃপতি রহেন খাড়া,
তাপস তপ্ত বালুতে গড়ান দেন না'ক কোন সাড়া।
অধীর হইয়া ক'ন তিনি 'আমি নৃপতি সেকেন্দার',
কহিলেন সমকণ্ঠে তাপস —'আর
ডাইওজিনিস আমি চির বৈরাগী।'
কহিলেন নৃপ—'আমি আপনার লাগি'
করিতে কি কিছু পারি?'
কহিলেন ঋষি —"সরিয়া দাঁড়াও
শুধু রোদ টুকু ছাড়ি'।"

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় সমুদ্রের দান

জোসেফ কালমার

প্রতিবারে ঝড়ের দিনে স্ফীত সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় আয়ার্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও হেব্রাইডিসের উপকূলে এসে জমে বহু পরিমাণে এক রকমের জলজ আগাছা। তার বাৎসরিক পরিমাণ হবে প্রায় ৫,০০০,০০০ টন। ঝড়ের ঠিক পরেই এই আগাছাগুলিকে স্থানীয় কৃষকরা সংগ্রহ করে রাখে, কারণ অতলান্তিকের জোয়ারে তাদের আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই জলজ আগাছাগুলির মধ্যে যে 'এল-জিনিক্ এসিডের' সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার ব্যাপক ব্যবহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়েছে বলেই এই সংগ্রহণ-ব্যবস্থা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে এগার-এগার (agar agar) নামক এক রকম পদার্থের খুব অভাব হয়, জিনিষটি কেবল জাপান থেকেই পাওয়া যেত এবং তা জীবাণুতত্ত্ব-গবেষণার জন্য বিশেষ জরুরী। এই স্কটিশ আগাছা থেকে এক রকম জেলির আবিষ্কার হওয়ায় এগার এগারের অভাব দূর হয়। এলজিনিক্-এসিড উল, কসমেটিক্, মূল্যবান আইসক্রীম, টুথ্‌পেষ্ট প্রভৃতি তৈরীর কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রমশিল্পেও এর ব্যবহার যথেষ্ট।

এলজিনিক-এসিড আবিষ্কার করেন মিঃ ই সি ষ্টান্‌ফোর্থ ১৮৮৩ সালে। সমুদ্রের আগাছা থেকে আইওডিনের নির্যাস বের করবার সময় তিনি আর একরকম জেলির মত পদার্থ আবিষ্কার করেন, তার নাম দেন "এল্‌জিন।" এই আবিষ্কারের প্রায় দশ বৎসর পরে শ্রমশিল্প ও ভেষজ-বিজ্ঞানে এল্‌জিনিক এসিডের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়।

অস্ত্রচিকিৎসায় এল্‌জিনিক-এসিডের ব্যবহার সুরু হয় ১৯৪১ সালে। এই সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে হলে কেম্ব্রিজের ষ্ট্রেঞ্জ্‌ওয়েজ্ রিসার্চ ল্যাবরেটরির ডাঃ জর্জ ব্লেইন কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণগুলি পাঠ করতে হবে। ইনি অস্ত্রচিকিৎসায় এল্‌জিনিক্-এসিডের ব্যবহার নিয়ে আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন।

প্লুরিসি চিকিৎসায় ডাঃ ব্লেইন এই এল্‌-জিনিক্-এসিড অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এসিড্‌টির সর্বপ্রধান ধর্ম বোধ হয় এই যে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণে haemostaticএর কাজ করে। এই ব্যাপারে ক্যাল্‌সিয়াম্ এলজিনেটের ব্যবহার-ফল অত্যদ্ভুত;—পেনিসিলিনের সঙ্গে ক্ষত চিকিৎসায় এবং রক্তস্রাব বন্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে ক্যাল্‌সিয়াম্ এলজিনেট আশ্চর্য সুফল দিয়েছে। আজ ষ্ট্যানফোর্থের এই আবিষ্কারের মূল্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

এ্যালজিনিক এ্যাসিড এবং তার যৌগিক পদার্থগুলির নানা রকম ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ভবিষ্যতেও অনেক কিছু জানা যাবে, কারণ এই নিয়ে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। মানুষের শরীর সহজে এ্যালজিনিক এ্যাসিড শোষণ করতে সক্ষম একথা ১৯৪৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত কারো জানা ছিল না। এই সময় ক্যাল্‌সিয়াম্ এলজিনেট ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাবার কাজে ফস্‌ফেটেস্-এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর লণ্ডনস্থিত মিড্‌লসেক্স হাসপাতালের ডাঃ মাথ্যুজ প্যারাফিন্ এবং গ্লিসারিনের পরিবর্তে সোডিয়াম এল্‌জিনেট ব্যবহারের সুপারিস করেন এবং ১৯৪৪ সালে ডাঃ গাফ্ যক্ষ্মারোগের ফুস্‌ফুসে প্রবেশকারী শ্বাসনালীতে এল্‌জিনিক এসিড সঞ্চারিত করে সুফল পেয়েছেন। এই সকল চিকিৎসার উপায়গুলি মানুষের দেহে প্রয়োগের পূর্বে পশুর দেহে পরীক্ষিত হয়েছিল।

এল্‌জিনিক এসিড ব্যবহারের ব্যাপকতা ভবিষ্যতে আমরা আরও দেখতে পাবো, এ নিয়ে এখনও নানাপ্রকার পরীক্ষা চল্‌ছে।

(New Delhi British Information Services হইতে)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধুরভাব-সাধন*

ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ্-ডি

বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত আরাধ্য যে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণকে রচয়িতা ব্যাসদেব 'সর্ব্ববেদান্তসার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহাতে পরমহংসগণ-দ্বারা প্রাপ্য অমল ও শ্রেষ্ঠ অদ্বয় জ্ঞান গীত হইয়াছে ("যত্র পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে"), সেই গ্রন্থ হইতে একটি ভক্তিবহুল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। শ্লোকটি এই :

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

'নন্দগোপের ব্রজে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের কি মহাভাগ্য, কি মহাভাগ্যই উদিত! কারণ, পরমানন্দময় সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্ররূপে (সেখানে) অবস্থান করিতেছেন।'

এই শ্লোক শুনিলেই মানুষের মনে এক প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে—কেমন করিয়া পরমানন্দময় পূর্ণ ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের গোপ ও গোপীদিগের উপাস্য হইতে পারিয়াছিলেন? মঠের সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ সকলেই জানেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস করিতেন যে, অদ্বয়ব্রহ্ম সবিশেষ বা সগুণও হইতে পারেন এবং নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণও হইতে পারেন। নিরাকার হইয়াও তিনি জগতের হিতকামনায় সাকারও হইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ ঠাকুর সর্ব্বদাই ভক্তগণকে উপদেশ করিতেন—যেমন সমুদ্রের নিরাকার জলরাশিতে স্থানে স্থানে শৈত্যের আধিক্য বশতঃ জমাট বরফও দেখা যায়, তেমন ভক্তগণের ভক্তি-শৈত্যের আধিক্যে নিরাকার পরব্রহ্মও স্বমায়াশক্তিতে সাকার হইয়া শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতাররূপে জগতের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার জন্য ও লোকের কল্যাণার্থ, নিজ নিজ আচরিত ধর্ম্ম স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে মানুষী তনু ধারণ করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

পরমহংসদেবের ধর্ম্মাচরণের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি সব ধর্ম্মমতই আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করিতেন এবং তিনি ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে 'যত মত—তত পথ' এই মহাবাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ের প্রতীক-স্বরূপ ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, এবং তিনি এক অপূর্ব্ব রহস্যময় অবতার ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগেরই ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথে বিচরণ করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাগবত শ্রবণ করাইবার সময়ে রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥
বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্।"

'হে রাজন্! তুমি এই কৃষ্ণকেই, আত্মা,

* ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৩-তম জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ

সকলেরই আত্মা বলিয়া জানিবে। জগতের হিতের জন্য সেই কৃষ্ণই নিজ মায়াবলম্বনে এই পৃথিবীতে দেহীদিগের ন্যায় দেহধারী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে যাঁহারা (অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্তেরা) কৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ মূল পুরুষোত্তমরূপে জানিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সব বস্তুই ভগবান্ কৃষ্ণেরই স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। জগতে তিনি ছাড়া অন্য কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সব বস্তুরই পরমার্থ-তত্ত্ব কারণে অবস্থিত, এবং সেই সব কারণেরও কারণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। অ-তৎ (অর্থাৎ ভগবানের শক্তি বিরহিত) কোন বস্তুই কি বর্তমান দেখিতে পাও?'

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণই যখন সর্ব্বকারণকারণ তখন তাঁহাকেই যাঁহারা ভক্তি বশতঃ শরণরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদের মোক্ষ অযত্নসিদ্ধ হইয়া উঠে। এক পরম ব্রহ্মেরই রাম-কৃষ্ণাদি নাম দিয়া জগতে উপাসনা প্রচলিত আছে। ঠাকুর বিশ্বাস করিতেন যে গীতার এই সব বাণী গূঢ় সত্য কথা। যথা:

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" ও "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি"—অর্থাৎ 'পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মই সমস্ত জগতে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন'; এবং 'বাসুদেবই পরিদৃশ্যমান সব বস্তুতে বিদ্যমান'। কাজেই—

"যো রাম দশরথকে বেটা, ওহি রাম
ঘট্-ঘট্‌মে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা॥"

অর্থাৎ যে রাম দশরথের তনয়, সেই (ব্রহ্মরূপী) রামই প্রত্যেকের দেহে জীবাত্মস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, এবং সেই রামই সমগ্র জগদ্রূপে নিত্য প্রকাশিত, এবং তিনিই জগতের প্রত্যেক বস্তু হইতে পৃথক্‌স্থিত বলিয়াও উপলব্ধ হইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই বৈদান্তিকও ছিলেন প্রেমের অবতারও ছিলেন। ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন না—অধ্যাত্ম-জগতে এই কথা অসমঞ্জস। ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ কল্পনা পাপের কাজ বলিয়া মনে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীর বেদান্তবিৎ সন্ন্যাসীদিগকে হরিনামের মাহাত্ম্য ও ভক্তিরস শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই নিজে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এবং তিনি কেশব ভারতীর নিকট যে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নাকি বৈদান্তিক 'সোহহম্' মন্ত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে সব ধর্ম্মমতকে একই গন্তব্য স্থানে, অর্থাৎ পরমেশ্বরে, পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মনে করিয়া, সাধনরূপে সব পথেই বিচরণ করিয়া, বৈষ্ণবগণের আচরিত মধুরভাব সাধনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রসব্রহ্মের আস্বাদও করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্য এখানে একটু আলোচিত হইবে।

দাক্ষিণাত্যের আলবার-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম যে বহু প্রাচীন সময়ে (আনুমানিক প্রথম খৃষ্টাব্দে) প্রচলিত ছিল, তাহা আপনাদের বিদিত থাকিতে পারে। তামিল ভাষায় রচিত 'দ্রাবিড়াম্নায়' বা 'দ্রমিড়োপনিষদ' নামে একখানি বিপুলায়তন বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থে পরমবৈষ্ণব আচার্য্য শঠারির (অপর নাম শঠরিপু বা শঠজিৎ) রচিত কতক অংশ আছে। অনেককাল পরে (সময় অজ্ঞাত), অভিরাম বরাচার্য্য নামক এক ভক্ত সংস্কৃত ভাষায় 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্য্য' নামে একখানি গ্রন্থে পূর্ব্বোল্লিখিত তামিল ভাষায় রচিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ সেই গ্রন্থে

শঠারি আচার্য্যের শৈশব জীবনেই ভগবদ্দর্শনের কথা ও ষোড়শ বর্ষের পর হইতেই তাঁহাতে অলৌকিক ভাবসমূহের প্রকাশের উল্লেখ লক্ষিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজললনাদিগের যে সব রসময় ভাবের কথা জানা যায় তদপেক্ষা অধিক রসময় ভাব শ্রীভগবানের প্রতি শঠারিতে দৃষ্ট হইত। কিঞ্চ, প্রহ্লাদ, নারদ প্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণের যে ভক্তি এবং দশরথ ও অর্জ্জুনাদির যে সব বাৎসল্য সখ্যাদি স্নেহের বিষয় প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রনিচয়ে বর্ণিত দেখা যায়, পদসেবী ভক্তগণের চিত্তে আনন্দরস-প্রদানকারী পরম পুরুষের প্রতি শঠারির তৎ-তাবৎ সব ভাবই অতি মাত্রায় প্রস্ফুরিত ছিল। সেই তাৎপর্য্যগ্রন্থ হইতে শঠারি সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে :

> "পুংস্ত্বং নিযম্য পুরুষোত্তমতাবিশিষ্টে
> স্ত্রীপ্রায়ভাবকথনাজ্জগতোঽখিলস্য।
> পুংসাং চ রঞ্জক-বপুর্গুণবত্তয়াঽপি
> শৌরেঃ শঠারিযমিনোঽজনি কামিনীত্বম্॥"

এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থবিশিষ্ট শ্লোকটির ব্যাখ্যা, হয়ত আধুনিক সমাজের সব পুরুষজনের নিকট খুব রুচিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন নাও হইতে পারে। কিন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেষ্টা ও প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনলীলা ও প্রেমভক্তির স্বরূপ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভাব-সাধনের পরিচয় জানিতে হইলে, এই প্রাচীন শ্লোকটির প্রতিপাদ্য অর্থ বুঝা প্রয়োজন মনে করি। ইহার ব্যাখ্যাটি এইরূপ হইতে পারে :—'ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতেই অখিল জগতের স্ত্রী-স্বভাববিশিষ্টতা অনুমিত হইতে পারে, এবং সকলের পতিরূপে পুরুষোত্তমাবিশিষ্ট পরমপুরুষেই কেবল পুংস্ত্ব বা পুরুষস্বভাববিশিষ্টতা আরোপিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; সংযমী মুনি শঠারি বুঝিলেন যে, শৌরি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা তনু ও তদীয় কারুণ্য-প্রেমাদি যে সব কল্যাণকর গুণনিচয় বর্ত্তমান থাকা উপলব্ধি করা যায়, তাঁহার সেই তনু ও গুণসমূহ (স্ত্রীগণের ন্যায়) পুরুষগণেরও মন রঞ্জিত বা অনুরক্ত করিতে সমর্থ হয়;—এই ভাবিয়া অবশেষে এই মুনির (শঠারির) নিজেরও কামিনীভাব উদিত হইয়াছিল।' এই কামিনীত্ব বা নারীভাবের অর্থ এই যে, যেমন ভাবনিরপেক্ষ বা ভাবের প্রতিকূল জ্ঞান-প্রবণতা কেবল পুরুষেই অত্যধিক লক্ষিত হয়, তেমন জ্ঞান-নিরপেক্ষ বা জ্ঞানের প্রতিকূল ভাব-প্রবণতা কামিনী বা নারীতেই অত্যধিক পরিপুষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাঁহারা জ্ঞান-প্রবণ প্রবৃত্তি লইয়া প্রপঞ্চাতীত সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা তত্ত্বের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন, তাঁহাদিগকেই 'জ্ঞানী' বলা হইয়া থাকে; এবং যাঁহারা সেই একই প্রপঞ্চাতীত বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভাব-প্রবণ প্রবৃত্তি লইয়া তাঁহার উপাসনায় বা প্রীতিসম্পাদনে তৎপর হন, তাঁহাদিগকে 'ভাবুক' বা 'ভক্ত' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আলবার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে, "এই ভক্ত-ভাব বা ভাবুকতার যে চরম উৎকর্ষ বা প্রেম-লক্ষণা ভক্তি, তাহা সুতরাং নারীভাবে বা কামিনীভাবেই সম্ভবপর, পুরুষভাবে নহে।" গোপীভাবই যে নারীভাবের সার সত্ত্ব, বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শান্ত-দাস্যাদি চারি ভাবও এই গোপীভাবের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মধুর ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব এবং তাহাই বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের মতে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছে। বাস্তবিকই জগতে দেখা যায় যে, পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ ভক্তিপ্রবণ বেশী। ব্রজ-যুবতীগণের প্রখ্যাত উপাসনানীতি অবলম্বন করিয়া শঠারি শ্রীভগবানকে উপভোগ করিয়াছিলেন—রসস্বরূপ ভগবানের রস তিনি আস্বাদন করিয়া-ছিলেন। তাই দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে

বহু প্রাচীনকাল হইতেই, অন্ততঃ দক্ষিণাপথে, ব্রজ-রমণীগণের রসভাবসমন্বিত রীতিতে শ্রীভগবানের উপাসনা প্রচলিত ছিল। ব্রজসুন্দরীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য স্ব স্ব ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে সেবা করিবার মানসে, দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিপুরুষদিগেরও জ্ঞান দ্বারা অন্বেষণীয় মুকুন্দচরণ ভজনা করিতেন। আনন্দরসময় পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া ধন্য হইবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বা প্রপত্তির আশ্রয় লইয়া সেবা-পরতায় ব্যস্ত থাকিতেন। এই উৎকট সেবা-পরতার নামই বৈষ্ণবশাস্ত্রে অহৈতুকী বা রাগানুগা ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিধুরা হইয়া, কিরূপ দাহময় জীবন ধারণ করিতেন এবং দুর্ব্বহ দুঃখভার সহিতে না পারিয়া তাঁহাদের দয়িতের সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করিতেন —ইহাই ভাগবতের রাসলীলা-প্রসঙ্গে সবিস্তার বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার গ্রহণের প্রয়োজন কি হইতে পারে এবং তিনি কেন কিভাবে ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থে বর্ণিত প্রেমধর্ম্ম ও হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া কলিমল বিদূরিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত দামোদরস্বরূপের কড়চাতে দুইটি অতিপ্রসিদ্ধ শ্লোকের অবতারণা পূর্ব্বক তদীয় অবতারের হেতু-ত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতে এখন ইচ্ছা করি এবং পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও কেমনভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পথই অবলম্বন করিয়া পরম বস্তু পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরস উপভোগ করিয়া শ্রীরাধিকার অন্তরের সুখ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে বাসনা করি।

গীতাদি ধর্ম্মপুস্তকে ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণের হেতু বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে এক পূর্ণ অবতার ছিলেন তদ্বিষয়ে বৈষ্ণবগণ নিঃসন্দেহ। তাঁহার নবদ্বীপে অবতার গ্রহণের মূল কারণ, দামোদরস্বরূপের কড়চাতে একটু বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

এই শ্লোকটির অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা এইরূপ :—'শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকারস্বরূপা, অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতম মহাভাবনাম্নী অবস্থা, এবং তিনি (সচ্চিদানন্দময়) শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময়ী শক্তি যাহার অপর নাম হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা—উভয়ে এই কারণে (অর্থাৎ শক্তিমান্ ও শক্তির অভেদ হেতু) একাত্মা হইলেও, পুরাকাল যাবৎ এই ভূলোকে ভিন্ন ভিন্ন শরীর পরিগ্রহ করিয়া লীলা করিতেছেন। এই যুগে এই দুইজনই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীরাধার ভাব ও বর্ণকান্তি দ্বারা সুসংযুক্ত হইয়া চৈতন্য-নামক কৃষ্ণস্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার মিলিততনুরূপী তাঁহাকে (শ্রীগৌর-হরিকে) স্তুতি করিতেছি।' এস্থলে সুপ্রসঙ্গ পাইয়া স্বরূপ গোস্বামী রাধাতত্ত্ব উল্লিখিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দে পরিপূর্ণ; তাই তিনি বৈষ্ণবমতে সদংশে সন্ধিনী শক্তি, চিদংশে সংবিৎ-শক্তি ও আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি সমন্বিত বলিয়া বর্ণিত হন। হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত সার অবস্থার নাম 'প্রেম', প্রেমের ঘনীভূত সার অবস্থার নাম 'ভাব' এবং ভাবের পরমকাষ্ঠার নাম 'মহাভাব'। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :

"মহাভাব-স্বরূপ-শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥"

* * * *

"জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥"

শক্তিমান্ ও শক্তির অভেদবশতঃ (যথা, অগ্নি ও তদ্‌জ্বালা) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি বলিয়া, তাঁহার চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও দেহ কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত। তাই অতি সংক্ষেপে সুমধুরভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন মধুরভাবের কথা। যথা—

"রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে—চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥"

আরও স্পষ্টতরভাবে স্বরূপগোস্বামিপাদ তদীয় কড়চাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অবতারের মূল প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশো বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

"(১) শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কিরূপ, (২) সেই প্রেমদ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্যাধিক্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কিরূপ, এবং (৩) আমাকে (অর্থাৎ আমার মাধুর্য্য) অনুভব করিয়া শ্রীরাধার সুখই বা কিরূপ—এই (তিন) বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীরাধার ভাবে সমৃদ্ধ বা ধনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরূপ সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রজের কানাই রাধার অঙ্গের সোনার বরণ ধারণপূর্ব্বক ও তদীয় ভক্তিভাব লইয়া এবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় তৎ-তৎ-কারণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য রাধিকার মূর্ত্তি ও ভাব লইয়া অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর রাধাভাবেই সুখদুঃখ অনুভব করিতেন, এবং উদ্ধবের দর্শনে শ্রীরাধার মনে কৃষ্ণ-বিরহজনিত "ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময় বাদ" ও উন্মাদ যেরূপ হইত, তাঁহার মনেও তদ্রূপ উৎকণ্ঠাবাহুল্যের উদয় হইত। কৃষ্ণাবতারে রসের সদন হইয়া রাসাদিবিলাসে রসের নির্য্যাস অনুভব করিয়াও, উপরি উল্লিখিত তিন বাঞ্ছা প্রপূরণের লোভে, পরমপুরুষ পুনরায় চৈতন্যাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দময় ও সকল রসেরই নিধান হইলেও শ্রীরাধিকার অচিন্ত্য শক্তিসম্বলিত প্রেম তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া নাচাইত। শ্রীরাধার প্রেমসেবা পাইয়া প্রেমের বিষয়ভূত শ্রীকৃষ্ণ যে সুখ আস্বাদন করেন, তাহা দ্বারা তিনি শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কতকটা বুঝেন; কিন্তু, তিনি যেন মনে ভাবেন—শ্রীরাধিকা প্রেমের আশ্রয়ভূতা হইয়া প্রেমাস্বাদনে যে সুখ প্রাপ্ত হন, সেই সুখ কোটিগুণে গুরু। তাই শ্রীরাধার ন্যায় প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত লোলুপতার তত্ত্বই যেন শ্লোকটিতে উল্লিখিত প্রথম বাঞ্ছার কথা। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

"বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥"

শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় লোভের কথা এই বলা হইতেছে যে, স্বমাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন বিচার করিতেছেন—

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥"

একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য প্রেমের অধিকারিণী হইয়া পূর্ণমাত্রায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থা, অন্য কোন গোপী নহেন। নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের প্রতিবিম্বগ্রহণে সমর্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের সমীপে শ্রীরাধার প্রেমদর্পণের স্বচ্ছতা এমন বাড়িতে থাকে যে, তাঁহার মাধুর্য্যও নব নব রূপে ভাসমান হইয়া তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণমাধুর্য্য ও রাধাপ্রেমের মধ্যে যেন অহমহমিকা

আরম্ভ হয়। অর্থাৎ 'আমি বড়, আমি বড়'—এইরূপ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। তাই কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন—

"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে, কেহো নাহি হারি॥"

শ্রীকৃষ্ণ দর্পণাদিতে প্রতিফলিত স্বমাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া, তাহা আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেও আস্বাদন করিতে পারেন না। তাই তিনি নিজে শ্রীরাধিকার স্বরূপ হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। যথা ঃ

"দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥"

আবার কৃষ্ণমাধুর্য্যের এমন এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, ইহা কেবল গোপীগণকেই আকৃষ্ট করে না, গোপগণ ও অন্যান্য পুরুষভক্তগণকেও আকৃষ্ট করে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও ইহা প্রলুব্ধ করে।

"আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥"

ইহা আস্বাদন করিলেও ভক্তের তৃষ্ণা শান্তি হয় না, বরং ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণের লোভের তৃতীয় হেতুর কথা এই বলা হইতেছে যে, কামগন্ধহীন গোপী-প্রেমের পক্ষে, সুখ উৎপাদন করিবার শক্তি ইহাতে কতখানি হইতে পারে, তাহাও যেন শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি করিতে চাহেন। পৃথিবীতে সাধারণ লৌকিক শৃঙ্গারের তাৎপর্য্য দেখা যায় নিজ সম্ভোগসুখে; কিন্তু গোপীদিগের উজ্জ্বল বিশুদ্ধ শৃঙ্গারের অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তিশ্রীর তাৎপর্য্য দেখা যায় কেবল আনন্দময় কৃষ্ণের সুখ উৎপাদনে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"আত্মসুখ-দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনো-ব্যবহার॥
কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥"

বাস্তবিকই গোপীদিগের সুখ কৃষ্ণসুখেই পর্য্যবসিত হয়। গোপীভাবের প্রকৃতি এই যে,—

"গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
* * *
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥"

নিরুপাধি প্রেমের রীতি এই প্রকারই হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই যেন মনে করেন—

"আমা হৈতে রাধা পায় যে-জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥"

তাই ভক্তভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ শ্রীরাধার ভাব ও বর্ণ লইয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি ও নামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তদীয় প্রেমবন্যা দ্বারা বারাণসীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকেও ডুবাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনামরূপ মহা-মন্ত্রের শক্তিতে যে কৃষ্ণে ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, এবং কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমভক্তি যে পরমপুরুষার্থ এবং প্রেমের স্বভাবেই যে ভক্ত হাসে, কাঁদে, গায় ও নাচে, এবং এই প্রেমভক্তিই যে ভক্তের মনে নানারূপ ভাবের উদয় করায় তাহা বলিতে যাইয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥"
* * * *
"প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবাসুখ-রস॥"

এতক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোপীভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হওয়ার কথা বলা হইল। এখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও গোপীভাব সাধন করিয়া কিরূপে সেই একই মাধুর্য্যরস অনুভব করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মধুরভাব-সাধনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে করিতে অবশেষে অদ্বৈত ব্রহ্মরসে আপ্লুত হইয়া পড়িতেন। ভক্তের মনে শঠারির ন্যায় কামিনীভাবের উদয় না হইলে —অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধার মনোভাব না উপস্থিত হইলে—তাঁহার পক্ষে মধুর রস আস্বাদন সম্ভবপর নহে। ঠাকুরের শরীর ও মনের এমনই গঠন ছিল যে, যখনই তিনি যে ভাব অবলম্বন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখনই সে ভাবের উপযোগী মানসিক ও শারীরিক বৃত্তি তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। ঠাকুরের স্ত্রীসুলভ ভাবভঙ্গি খুব বেশী ছিল। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বাবুর গৃহাভ্যন্তরে তিনি অনেক সময়ে স্ত্রীলোকদের সহিত যেন স্ত্রীভাবেই কথা-বার্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিতেন। অনেক সময় তিনি স্ত্রীবেশ ও স্ত্রীভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক অবিকল স্ত্রী-লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া দর্শক সামাজিকদের —এমন কি, নারীগণেরও মনে আনন্দ বিতরণ করিতেন। এই স্ত্রীজনোচিত ভাবভঙ্গি যে, মধুরভাব-সাধনে তাঁহাকে অত্যন্ত সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ঠাকুর যে স্বয়ং বৈষ্ণবকুলসম্ভূত ছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণীয়। স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়া-ছেন—"ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী —উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্মিলন দেখা যাইত।" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলিত তনু লইয়াই যেন অর্দ্ধনারীশ্বরের ন্যায় নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥"

আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে, কখনও তাঁহার হৃদয় যেন ভগবানের প্রতি বাৎসল্যভাব-পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তিনি তখন মা যশোদার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপালরূপে পুত্রবৎ ভজনা করিতেন। আবার কখনও তাঁহাকে কৃষ্ণ-সখা সুবল-সুদামাদির ন্যায় সখ্যভাব অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে শুনা গিয়াছে। কখনও তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পদসেবী হনুমানের নির্ম্মল ভক্তি স্মরণ করিয়া নিজকে ভগবানের দাস বলিয়া গণনা করিতেন। কিন্তু আবার অনেক কাল পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে স্ত্রী এবং ভগবানকে পতিরূপে অনুভব করিয়াও মধুরভাবের মধুরিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে—আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥"

স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া কেবল ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই, অর্থাৎ ভগবানকেই কেবল সুখী করিবার বাঞ্ছাই হইল প্রেমভক্তিরসের প্রধান লক্ষ্য। ভগবানের প্রতি প্রেমের প্রকৃষ্ট লক্ষণই হইল এই যে, নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের সুখবর্দ্ধনের ইচ্ছা লইয়া কোন ভক্ত ভজনে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বাত্মক দেহে অবস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহের প্রীতি বর্দ্ধনের ইচ্ছাতেই তিনি তাহা করেন। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর কয়েকটি উক্তি উল্লেযোগ্য—

"সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥

* * * *

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় লক্ষ্য করিতেন ও বুঝিতেন যে, তাৎকালিক নব্যশিক্ষিত যুবকেরা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের বৃন্দাবনলীলার কদর্থ করিয়া ইহার অন্তঃস্থিত ভাবের উপলব্ধি-বিষয়ে অপারগ। তখন তিনি যুবকদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেন—"তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ্ না, ধর্ না—ঈশ্বরে মনের এইরূপ টান হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। দেখ্ দেখি, গোপীরা স্বামী, কুল, শীল, মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, লোকভয়, সমাজভয়—সব ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদুর উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল! ঐরূপ করিতে পারিলে, তবে ভগবান্ লাভ হয়।" আবার ঠাকুর তাহাদিগকে আরও বলিতেন—"কামগন্ধহীন না হইলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই গোপীদের মনে কোটি কোটি রমণ-সুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হইয়া দেহবুদ্ধির লোপ হইত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাহাদের মনে উদয় হইতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের দিব্য জ্যোতিঃ তাহাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া প্রতি রোমকূপে যে তাহাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত!"

ঠাকুর বরাবরই শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন যে, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও জাতিকুলশীলাদিরূপ মনের পাশবন্ধ ছিন্ন করিতে না পারিলে, কাহারও পক্ষে ঈশ্বরাভিমুখী হওয়া কঠিন। তাই তিনি নিজে লজ্জা প্রভৃতি মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুর ভাবসাধনকালে মথুরা-মোহন বাবুর প্রদত্ত বারাণসী সাড়ী, স্বর্ণালঙ্কার ও চাঁচর কেশগুচ্ছাদি পর্য্যন্ত পরিধান করিয়া নিজকে ব্রজরমণী সাজাইয়া কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া থাকিতেন এবং তিনি এই ভাবে ছয় মাসকাল পর্য্যন্ত রমণীর বেশভূষা ধারণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ঠাকুর যখন প্রতি প্রত্যূষে দেবসেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরের বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন, তখন নাকি শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী তাঁহার ঐরূপ পুষ্পচয়ন করিবার কালে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম করিতেন। এই সময়ে তিনি প্রতি দিন দয়িত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ উপলব্ধি করিবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল থাকিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ অনুভব করিতেন। ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেম ছিল অতীন্দ্রিয় প্রেম। ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত শ্রীরাধিকার যে প্রেমের কথা প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রেমের মাহাত্ম্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীরাধিকার ন্যায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখেই নিজকে সুখী মনে ভাবিতেন। ভক্তের মনে রাধাভাব উদিত না হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করেন না এবং ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে স্বমাধুর্য্যরস আস্বাদন করান না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর শ্রীগৌরচন্দ্রই নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া এই কামগন্ধহীন কৃষ্ণপ্রেমের ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনামের মহিমা প্রচার করিয়াছেন—

"আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার।"
"সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥"

শ্রীরাধিকার দয়া না পাইলে প্রেমঘন রসরাজ

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই মধুরভাব সাধনে-কৃতার্থ হইয়া শ্রীরাধিকার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগ-কেশর পুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।" উপসংহারে এইরূপ বলা বোধ হয় একবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের জীবাত্মা স্ত্রীস্বভাববিশিষ্ট, তাই ইহা (জীবাত্মা) পরমাত্মা পুরুষোত্তমকে ভক্তি দ্বারা পূজা করিয়া বিগলিত বেদান্তের রসময় ভগবানের সহিত একরসতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই মধুরভাবসাধনকালে ঠাকুরের শরীরে শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় প্রেমের সারভূত মহাভাবের লক্ষণসমূহ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাণপতিরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বভক্তিশ্রী দ্বারা ভজনা করিয়া ঠাকুর তন্ময় হইয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন এবং সমস্ত জগৎটিকে কৃষ্ণময় দেখিতেন।

সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

"সমাশ্রিতা যে পদ-পল্লব-প্লবং
মহৎ-পদং পুণ্যযশো-মুরারেঃ
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন যেষাম্‌॥"

"পুণ্যযশোবিভূষিত মুরারি শ্রীকৃষ্ণের মহজ্জন-সেবিত পদপল্লবরূপ ভেলা যে ভক্তগণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিশাল ভব-সাগরও বৎসপদে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র গোষ্পদে) পরিণত (সুতরাং সহজতরণীয়) হইয়া থাকে, এবং শ্রেষ্ঠ ধামই (বৈকুণ্ঠই) তাঁহাদের বাসস্থান হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের সমীপে কোন বিপদের বিষয়ই উপস্থিত হয় না।"

আমারে বুঝিয়ে বলো

শ্রীচিত্ত দেব

আমারে বঞ্চিত করে কী লাভ তোমার
হে বিধাতা এ-কথা শুধাই বার বার!
যা-ই পেয়ে ভুলে রই হারানোর পর
তা-ও কেড়ে নিয়ে যাও—এতো তুমি পর?

তোমার আপন কে এ-বিপুল ধরায়
হারিয়ে গেলেও কিছু ফিরে পুনঃ পায়?
অধীর জীবন মন হতাশায় ভরা
তুমি যদি পর নও—দাও না গো ধরা!

হাওয়া সনে হাওয়া হয়ে যদি বয়ে যাও
জল হয়ে কল কল যে সুর লাগাও
খুশি হয়ে হাসো যদি কুসুমের রূপে
প্রাণবেণু সব ঠাই বাজো চুপে চুপে!

রামধনু রঙ তব আকাশের গায়
কোনোদিন একবারো দেখা যদি যায়;
তাতে যে প্রসাদ লাভ নয়নে ও মনে
আমি তা পাবো না কেন—বলো এ-জীবনে?

তোমার স্বভাবে কিগো বঞ্চিতের লাগি'
রয়না করুণাকণা এতটুকু জাগি'?
আমারে বুঝিয়ে বলো—কী ক্ষতি তোমার
বঞ্চিত না করো যদি মোরে বার বার!

কোরানে জকাৎ বা দয়াদাক্ষিণ্য

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ

জকাৎ বা দয়াদাক্ষিণ্যকে ইসলাম ধর্ম্মের ৫টি অবশ্য করণীয় বিধির একটি বলিয়া কোরানে উল্লিখিত হইয়াছে। জকাৎ-এর অর্থ সাধারণতঃ দান, বদান্যতা বা দয়াদাক্ষিণ্য করা হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার শব্দগত অর্থ অনুধাবন করিলে, ইহার অর্থ দাঁড়ায় বর্দ্ধিষ্ণুতা বা পবিত্রতা। জকাৎ, জকা (বর্দ্ধিত হইয়াছিল) শব্দ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। পবিত্রতা অর্থেও জকা শব্দের ব্যবহার কোরানের অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। য়ুজক্কীকুম্ (বা তোমাদিগকে পবিত্র করে, যেমন ২; ২৫১) বা য়ুজক্কীহুম্ (বা তাহাদিগকে পবিত্র করে, যেমন ২; ১২৯) জকা শব্দ হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। এই জকাৎ বা বদান্যতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রধান উদ্দেশ্য নিজকে পবিত্র করা এবং এই পবিত্রতা দ্বারা মহৎ জীবন লাভ করার নির্দ্দেশও কোরানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "যে ইহাকে (আত্মাকে) পবিত্র করিয়াছে, সেই সফল জীবন লাভ করিয়াছে (ক্বদ্ অফ্‌লঃহ মন্ জকাহা, ৯১; ৯)।" অথবা, "সেই সংযত আত্মাকে ইহা (অর্থাৎ এই নরকাগ্নি) হইতে রক্ষা করা হইবে, যে নিজকে পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে, তাহার ধনসম্পত্তি বিলাইয়া দেয় (...অল্লজী য়ূতী মালহু য়তজক্কী, ৯২; ১৭-১৮)।" পবিত্রতা ও বর্দ্ধিষ্ণুতা অর্থের একত্র সমাবেশও জকাৎ শব্দে দৃষ্ট হয়। জোহন্ বা ইয়হিয়া পয়গম্বরের উল্লেখ করিয়া কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "তাহার শৈশবকালেই তাহাকে জ্ঞানসম্পন্ন করিয়াছিলাম এবং আমাদের (ভগবান) হইতে দয়ালু অন্তঃকরণ ও উন্নত মনের পরিপোষক পবিত্রতা (দান করিয়াছিলাম। ..ব ঃহনানান্ ম্মিন্ লুদুন্না ব জকাতন্, ১৯; ১৩)।" নিছক পবিত্রতা অর্থে জকাতের ব্যবহার কেমন সুন্দরভাবে মৌলনা রুমী তাঁহার মসনবীতে প্রয়োগ করিয়াছেন!

কি চশদ্ দরবীশ-ই-স্ব্রৎ জ-আন্ জকাৎ।
ম'নীস্ত আন্ নি ফ'উলন্ ফা'ইলাৎ॥

(বাহ্যিক আড়ম্বরশীল সাধু এই পবিত্রতার কি স্বাদ পাইবে?...৬; ১৬০) বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম্মের ন্যায় সকল ধর্ম্মেরই বিধি নিষেধ মানিয়া চলার প্রধান উদ্দেশ্য সংযত দেহ, মন ও চিন্তার ভিতর দিয়া আত্মাকে পবিত্র, প্রশস্ত বা বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করা বা ভগবদাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করা।

সকল ধর্ম্মেরই আদেশ বা অনুশাসন ভগবৎ-লাভ উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত হইয়াছে। মানুষ মাত্রেরই অপরের প্রতি, এমন কি সকল জীবজন্তুর প্রতি, দয়াশীল হওয়া উচিত। মানুষ যতই অপর জীবের প্রতি স্নেহপ্রবণ ও দয়াশীল হইবে, ততই তাহার মন পবিত্র হইবে, এবং সে ক্রমশঃ অনুধাবন করিতে পারিবে যে সকল জীবই এক ভগবান হইতে উদ্ভুত এবং সে অবশেষে তাঁহার সহিতই মিলিত হইবে (ইন্না লিল্লাহি ব ইন্না ইলাহি রাজি'উন)। সকল জীবে নারায়ণ উপলব্ধির উদ্দেশ্যেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে দয়াদাক্ষিণ্য, দান-বদান্যতা, স্নেহপ্রবণতা ও ভালবাসা প্রভৃতি গুণের উৎকৃষ্ট সাধনের জন্য নানা রকম বিধি নিষেধের উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "তাহারা তাঁহার (ভগবান) প্রতি

ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ গরীব-দুঃখী, মাতৃ-পিতৃহীন ও দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধদের ভরণপোষণ করিয়া থাকে (৭৬ ; ৮)।" পুনরায়, "তাঁহাকে (ভগবান) ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ আত্মীয়-স্বজন, গরীব-দুঃখী, মাতৃপিতৃহীন, পথচারী ও ভিক্ষুককে দাসত্ব-বন্ধন-মুক্তির জন্য নিজ সম্পত্তি বিলাইয়া দাও (২ ; ১১৭)।"

ইসলামধর্ম্মের সারকথা এই দুইটি নিম্নলিখিত বাক্যে আছে দেখিতে পাই ; এবং ইহাতে দান বা জকাতের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। "যাহারা সেই অদৃশ্য (পরম-পুরুষকে) বিশ্বাস করে, প্রার্থনায় স্থিতিশীল হয় এবং তাহাদের উপজীবিকা (স্বরূপ) যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি, তাহা (সৎপথে) ব্যয় করিয়া থাকে (য়ুন্‌ফিক্‌ন) ; এবং যাহারা তোমার (অর্থাৎ মোহম্মদের) এবং তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী (অবতারদের) নিকট (ভগবান হইতে) যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের জীবন সার্থক (২ ; ৩-৪)।" বস্তুতঃ এই কয়টি বিষয়ই সকল ধর্ম্মের মূল কথা। ভগবান ও তাঁহার অবতারে বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস হেতু অবতারনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইয়া, প্রার্থনা ও দানদক্ষিণা দ্বারা নিজেকে পবিত্র ও উন্নত করিয়া তাঁহাকে নিবিষ্টভাবে জানা এবং ভগবানকে জানিবার জন্য সততা ও পবিত্রতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ইহা কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের জন্য একচেটিয়া নহে ; যে কেহ সততা ও পবিত্রতা অবলম্বন করিতে পারিবে, সেই ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবে। কোরানে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে ইহুদি ও খৃষ্টান ব্যতীত আর কেহ স্বর্গারোহণ করিতে পারিবে না ; ইহা তাহাদের (ভুল) ধারণা মাত্র। (তাহাদের) বল যে যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে ইহার প্রমাণ দাও। বস্তুতঃ যে কেহ নিজকে ভগবৎসমীপে সমর্পণ করিয়াছে এবং যে দানশীল বা সদাচারী (মুঃহসিন্‌ন্‌), সে তাহার প্রভু হইতে (নিশ্চয়ই) পুরস্কৃত হইবে ; এবং তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই বা সে কখনও অনুতপ্ত হইবে না (২ ; ১১১-১২)।" এইরূপ সদাচারী ও দানশীল হইতে হইলে উপযুক্ত পাত্রকে বিধিমতে দানদক্ষিণা দ্বারা মহানুভবতা বা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করাই সকল জীবের কাম্য।

দানের উপযুক্ত পাত্র নির্দ্ধারণ করিয়া কোরানে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—"দান তাহাদের জন্যই প্রযোজ্য যাহারা ফকির (ফুক্করা), অভাবগ্রস্ত (মসাকীন্‌), এই (অভাবগ্রস্তদের) দেখিবার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিবৃন্দ, যাহাদের মন (সত্যের প্রতি) আকৃষ্ট, কেনা দাস বা বন্দী এবং ঋণগ্রস্ত। ভগবৎপথের পথিকদের জন্য দান (বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য)—৯ ; ৬০।" বস্তুতঃ কেবল ইহারাই দানের বিশেষ উপযুক্ত পাত্র।

কোরানে দানের বিধি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে দান গোপনে বা প্রকাশ্যে উভয় রকমেই করা যাইতে পারে, তবে প্রকাশ্য দান হইতে গোপন দানই শ্রেয়ঃ। কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "প্রকাশ্যে দান করা ভালই কিন্তু যদি তুমি কাহাকেও না জানাইয়া গরীব-দুঃখীদের দান কর, তাহা হইলে ইহা অধিকতর ভাল (২ ; ২৭১)।" তাছাড়া, ভিক্ষুকদের সাহায্য করার বিধি যদিও কোরানে রহিয়াছে, কিন্তু ইহা কখনই ভিক্ষার মধ্য দিয়া অলসতার প্রশ্রয় দেয় নাই। যে দানের উপযুক্ত অর্থাৎ যে সৎভাবে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করে, তাহাকেই দান করিতে কোরানে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। "যে সকল ফকির ভগবৎচিন্তায় লিপ্ত থাকা বশতঃ (আহারের জন্য)

এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন না তাঁহাদিগকেই দান করা উচিত। নির্বোধ লোকেরা ভিক্ষা হইতে বিরত থাকার জন্য আপনাদিগকে ধনী বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে (২; ২৭৩)।"

যদিও আমরা দেখিতে পাই যে কোরানের অবশ্য করণীয় কার্য্যাদির মধ্যে নমাজ ও জকাৎকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু লোকদেখান প্রার্থনা ও দান-দক্ষিণার কোন মূল্য নাই, যদি না মানুষ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে এবং দান-দক্ষিণা দ্বারা সততা, পবিত্রতা ও মহানুভবতা অর্জ্জন করিতে পারে। কোরানে উল্লিখিত হইয়াছে, "সেই প্রার্থনাকারীদের ধিক, যাহারা তাহাদের প্রার্থনায় মনোনিবিষ্ট নহে এবং লোকদেখান (কাজ করে) এবং সামান্য দান-দক্ষিণা (আল্-মা'উন্) হইতেও বিরত। (১০৭; ৪-৭)।" অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, "কষ্টযুক্ত দান (স্বদকতিন্) হইতে বিনম্র বচন ও ক্ষমাশীলতা উত্তম; (কারণ) ভগবান নিরাকাঙ্ক্ষ ও অমায়িক। হে (ভগবৎ-) বিশ্বাসিগণ, তিরস্কার করিয়া ও কষ্ট দিয়া স্বীয় দানের (ফল) নষ্ট করিও না; যেমন কোন লোক (অপর) লোকদের দেখাইবার জন্য দান করে (য়ুন্ফিকু), কিন্তু ভগবান ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাসী নহে। এইরূপ দানের উপমা যেমন কোন মসৃণ পাথরের উপর কিছু মাটি জমাট হইল, আর তাহার উপর বৃষ্টিপাত হইয়া (সকলই) ধৌত হইয়া গেল। এইরূপ সঞ্চয় (অর্থাৎ লোক-দেখান দান) হইতে (অন্তিমে) তাহারা কিছুই ফল লাভ করিবে না এবং ভগবান (কখনও) অবিশ্বাসীদের পথপ্রদর্শক হন না। আর যাহারা ভগবৎসন্তুষ্টির জন্য ও আত্মার পরি-তৃপ্ত্যর্থে স্বীয় ধন বিলাইয়া দেয়, তাহাদের উপমা যেমন একটি উচ্চ স্থানের উপর উদ্যান স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়া দ্বিগুণ ফলে ফুলে শোভিত হইয়াছে। যদি ইহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, অল্প বৃষ্টি-পাতই (যথেষ্ট) এবং তোমরা কি করিতেছ, তাহা ভগবান অবগত আছেন (২; ২৬৩-৬৫)।" এখানে বলা বাহুল্য যে উচ্চ স্থানকে বিশ্বাসী মন ও মসৃণ পাথরকে অবিশ্বাসী মনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। লোকদেখান সৎ-কাজের ফল ক্ষণস্থায়ী; ইহাতে কখনও ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয় না। আর বিশ্বাসী মনের আন্তরিকতাই যথেষ্ট; কতটুকু সৎকাজ করা হইয়াছে, তাহার পরিমাপের কোন দরকার করে না, অন্তিমে সে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবেই।

দান, দয়াদাক্ষিণ্য বা বদান্যতা অর্থে যে সকল শব্দ কোরানে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে সৎ চরিত্র বা মহানুভবতার পরিপোষণের উদ্দেশ্যেই এই সকল বিধির নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইন্ফাক্, ইঃহসান্, জকাৎ, স্বদকৎ ও মা'উন্ প্রভৃতি শব্দ দান অর্থে কোরানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্ফাক্-এর শব্দগত অর্থ (পরের উপকারার্থে) নিজের সঞ্চিত অর্থাদি বিলাইয়া দেওয়া। ইঃহসান্ দান অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার শব্দগত অর্থ পরের উপকারার্থ সৎকার্য্যে দ্রব্যের ব্যবহারাদি করা। ইহা হুস্ন্ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। হুস্নের শব্দগত অর্থ সৎ বা সৌন্দর্য্য, এবং যে কার্য্য সদ্প্রবৃত্তি বা সৌন্দর্য্যের পরিপোষক হয়, তাহাই ইঃহসান্। 'স্বদকৎ' স্বিদ্ক্ শব্দ হইতে উদ্ভূত; এবং স্বিদ্কের অর্থ সরলতা বা সত্যবাদিতা। 'মা 'উন্' ম্ 'অন্ (সাধারণ জিনিষ) শব্দ হইতে উদ্ভূত; এবং ইহার শব্দগত অর্থ ছোট

খাট দান। বস্তুতঃ কোরানে দানের পরিমাপক হিসাবে দানের সুফলের প্রতি কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। দাসের মুক্তিদান (অর্থাৎ দাসকে তাহার চিরজীবনের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া স্বাধীন করিয়া দেওয়া), মাতৃপিতৃহীনদের ভার গ্রহণ এবং দুঃখী ও নিঃসহায়দের সাহায্য করাই কেবল দানের বিষয় নহে; ছোটখাট দান, যেমন জল দান বা অগ্নি দান কিংবা স্নেহমাখা কথাও দানের সামগ্রী বলিয়া কোরানে উল্লিখিত হইয়াছে।

দানের স্বরূপ বা ইহার ফল সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "যাহারা ভগবৎপথে দান করে, তাহাদের (দানের) উপমা সেই শস্যদানার ন্যায় যাহাতে সাতটি গুচ্ছ জন্মে এবং প্রত্যেক গুচ্ছে একশত দানা হয়; এবং ভগবান যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া তোলেন (২; ২৬১)।" যাঁহারা ভগবৎ-উদ্দেশ্যে দান করেন, তাঁহাদের পরিণাম অতি শুভ; কারণ তাঁহারা ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিবেনই। ইহা সৎ-মনের পরিচায়ক এবং সর্ব্বজ্ঞ ভগবান ক্রমশঃ তাঁহাদের উন্নত করিয়া ভগবৎ-উপলব্ধির যোগ্য করিয়া তুলিবেন। অন্যত্র দান ও অন্যান্য ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির পুরস্কার সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "ইহা (অর্থাৎ কোরান) সদাচারীদের জন্য বিশেষ) অনুগ্রহ এবং পথপ্রদর্শক স্বরূপ। যাহারা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে এবং জকাৎ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত (৩১; ৩-৪)।" অথবা, "কিন্তু যদি তাহারা (অর্থাৎ যাহারা বিপথে চালিত হইয়াছে, তাহাদের পাপকার্য্যাদির জন্য) অনুতাপ করে ও প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে এবং জকাৎ প্রদান করে, তাহা হইলে তাহারা তোমারই ধর্ম্ম-ভাই (৯; ১১)।" বস্তুতঃ যাহারা ভগবৎ-অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাহাদের কোন ধর্ম্মগণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হইবার দরকার করে না। যে সৎ এবং সৎপথে চালিত হয়, সেই তাহার ভাই। ইহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইল তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান। এই সম্বন্ধে বিখ্যাত সুফী কবি হাফিজ্ লিখিয়াছেন,

মবাশ্ দর্ পায় অজার্ ব হর্‌চি খ্বাহী কুন্।
কি দর্ ত্বরীকৎ-ই-মা ঘায়র্ অজ্-ঈন্
গুনাহী নীস্ত্॥

কাহাকেও কোন মনঃপীড়া দিও না আর যাহা ইচ্ছা কর; কারণ আমাদের ধর্ম্মে ইহা ছাড়া আর কোন পাপ নাই।

বস্তুতঃ অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ভালবাসা দ্বারা তাহাদের মন জয় করিতে চেষ্টা করাই দয়াদাক্ষিণ্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

তখন তোমায় চিনি নাই

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

সময় যখন ছিল ভাল,
তখন তোমায় চিনি নাই।
এখন আমার অসময়—
এখন কি গো তোমায় পাই?
অনেক-কিছু দয়া ক'রে,
দিয়েছিলে দু'হাত ভ'রে,
সে সব-কিছুই হারিয়ে গেছে,
শুধু হাতে দিন কাটাই।

দিনগুলো সব কেটে গেলো
বৃথাই অলস অবসরে,
সন্ধ্যা এখন নামলো এসে
আমার জীর্ণ আঁধার ঘরে।
তখন তুমি ডেকে ডেকে
ফিরে গেছ দুয়ার থেকে,
এখন পাগল হ'য়ে তোমায়
পথে পথে খুঁজে বেড়াই।

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ, এম-এ

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী ১৩৫৪ সনের ১৩ই ভাদ্র মোক্ষধাম বারাণসীতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ। ভক্ত কবি গোরাচাঁদকে স্মরণ করিয়া গাহিয়াছেন, "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর"; আজ রাজেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়া আমরা এই কবিভারতীর সার্থকতা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি।

রাজেন্দ্রনাথের শুচিহাস্যে সমুজ্জ্বল, প্রসন্ন মধুর মুখখানি স্মরণ করিলে চিত্ত সমাহিত হইয়া আসে। তাঁহার গুণ যে কত ছিল তাহা বলিলে শেষ হয় না। তিনি ছিলেন আদর্শ পুত্র ও আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ সুহৃৎ, আদর্শ ছাত্র ও আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সন্ন্যাসী; এককথায় যে গুণে মানুষ অলক্ষ্যে মানুষের হৃদয়কে পরম তৃপ্তির আনন্দে ভরিয়া দেয় রাজেন্দ্রনাথের জীবনে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। আকাশ বাতাস ও আলোকের ন্যায় তিনি ছিলেন মানুষের নিকট একান্ত সুলভ, অথচ একান্ত অপরিহার্য্য মধুর সুন্দর।

বাংলার মাটিতে এত বড় জ্ঞানের আধার, হৃদয়ের এতবড় হিমাদ্রি যে অত সহজে অত অলক্ষ্যে কেমন করিয়া পাদোনশতাব্দী কাল থাকিয়া চলিয়া গেলেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে দর্শন-শাস্ত্রের অতি দুরূহ তত্ত্ব জলের ন্যায় তরল, বালবোধ্য করিয়া যে বলা যায়, তাহা যিনি রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গ করিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন।

'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' এবং 'বাদরায়ণ-ব্যাসসম্মত-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়ঃ'-এর নিবন্ধক রাজেন্দ্র-নাথের কথা বলিবার যোগ্যতা আমাদের কিছুমাত্র নাই। বাংলার তথা ভারতের, তথা জগতের ভাগ্য হইলে দূর বা অদূর ভবিষ্যতে যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা রাজেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও তপস্যাময় অমিয়মধুর চরিত আলোচিত ও পরিবেশিত হইয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবে। অবোধ শিশু পিতা বা মাতাকে দেখিলে যে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে এবং হারাইলে যে ভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠে, সেই আনন্দ ও সেই দুঃখ আজ আমা-দিগকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। শিবমহিমার স্তুতি করিতে গিয়া গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত কহিতেছেন, "প্রভু তোমার মহিমার পরপার আমি জানি না। তথাপি যে তোমার স্তুতি করিতেছি, এ কেবল নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য।"

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজীর কথাও আমরা এই একই কারণে বলিতে যাইতেছি। এই পাণ্ডিত্যের সাগর ও মূর্ত্তিমান লোকহিতব্রতকে পরিমাপ করিবার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু এই আনন্দময় মহান পুরুষের কথা শ্রবণে আনন্দ, মননে আনন্দ, কীর্ত্তনে আনন্দ। আজ তিনি এ মরভুবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিরহে আজ আমরা দুঃখসাগরে ভাসিতেছি। তাঁহার কথা শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের এই সীমাহীন দুঃখ অপনোদনের আর কোনও উপায় নাই।

১২৭৯ সালের ২৫ শে শ্রাবণ বুধবার

২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসতের নিকটবর্ত্তী প্রতিভা গ্রামে এক অতীব ধর্ম্মপরায়ণ ও বিত্তশালী কায়স্থকুলে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম হইয়াছিল। রাজেন্দ্রনাথের পিতা ৺হীরালাল ঘোষ ও জননী ৺হেমাঙ্গিনী দেবী। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের একমাত্র জীবিত ভ্রাতা ক্ষেত্রপাল বাবু "কমার্শিয়াল গেজেট" (বাণিজ্যদর্পণ) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর হইতে তিনিও কাশীধাম আশ্রয় করিয়াছেন। ক্ষেত্রপাল বাবুর কমার্শিয়াল গেজেট প্রেস নামে একটি মুদ্রণালয়ও ছিল। বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী সুযোগ্য ভ্রাতার নিকট অবস্থান করায় পণ্ডিতগণের সহিত রাজেন্দ্র নাথের পক্ষে সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও গ্রন্থরচনা বড়ই সহজসাধ্য হইয়াছিল। রাজেন্দ্রনাথের প্রায় সকল গ্রন্থই এই মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রকাশক ক্ষেত্রপাল বাবু। রাজেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা হইবে বিংশতিরও অধিক। এই গ্রন্থসমূহের প্রতিখানিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দর্শনবিষয়ক। ক্ষেত্রপাল বাবুর ব্যয়ে ও একান্ত যত্নে প্রতিখানি গ্রন্থ যথাকালে ও যথাযোগ্যভাবে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালার দার্শনিক সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে।

রাজেন্দ্রনাথ আশৈশব কলিকাতায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। এই বিদ্যালয় হইতে তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন এবং সিটি কলেজ হইতেই এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী রাজেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথ ১৩০৩ সালে কলিকাতার আহিরীটোলার অন্তর্গত বলরাম বসু ষ্ট্রীটের মিত্রবংশের কন্যা ৺শান্তিসুধা দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শান্তিসুধা স্বামীর উপযুক্ত পত্নী ছিলেন। এই দেবীসদৃশী রমণী নানা গুণের আধার, বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন। তৎকালীন 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁহার শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্বামীর নিকট আচার্য্যপাদ শঙ্কর প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির অনুলিপি করিয়া দিতেন। রাজেন্দ্রনাথ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার যে পদ্যময় অপূর্ব্ব ভাষ্য লিখিয়াছেন উহার সহিত তাঁহার এই সুযোগ্য পত্নীর অনূদিত গীতামাহাত্ম্য যোজিত হইয়াছে। রাজেন্দ্রনাথের এই পুণ্যশীলা পত্নীই তাঁহার পদ্যময়ী গীতা নিবন্ধনের কারণ। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে শান্তিসুধা পীড়ায় মরণাপন্ন হন। তাঁহার এমন অবস্থা হয় যে চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহার জীবনবিষয়ে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন। এই সময়ে শান্তিসুধার গীতাদানে অভিলাষ হয়। রাজেন্দ্রনাথ একখানি সুপ্রকাশিত গীতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রচলিত কোন গীতায়ই তিনি পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া অগত্যা রুগ্না পত্নীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নিজেই পদ্যগীতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। ভগবৎকৃপায় শান্তিদেবী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকেন। রাজেন্দ্রনাথ পত্নীর আশু মৃত্যুর আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পদ্যময় অনুবাদ ও ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ করেন। শান্তিসুধা দেবী গীতামুদ্রণের সমাপ্তিমুখে গীতামাহাত্ম্যটির অনুবাদ করেন। এই কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি এক বৎসর কাল মাত্র জীবিতা ছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথের এই সমাহাত্ম্য গীতা সমাপ্ত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

ইহার অল্পদিন পরেই শান্তিদেবী দেহ সংবরণ করেন। মনে হয় যেন স্বামীকে দিয়া গীতা প্রকাশ করাইবার জন্যই তিনি ঐ সংবৎসরকাল দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই সাংসারিক কারণে দার্জ্জিলিং এর লুইস স্যানিটরিয়ামে হিসাবরক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে তিনি ঐ স্থানেই য়ুরোপীয়ান্ ক্লাবের প্রধান হিসাবরক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএ চাকরি করিতে করিতেই রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রালোচনায় এবং আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ সম্বন্ধে তথ্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর দার্জ্জিলিং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। কিন্তু বিষয়কর্ম্মকে এই অনুসন্ধানের অন্তরায় জ্ঞান করিয়া তিনি দার্জ্জিলিংএর কর্ম্মত্যাগ করেন এবং স্ত্রীকে সঞ্চিত অর্থসহ শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের পূত জীবনের ঘটনা-বলীর অনুসন্ধানে ভারতপর্য্যটনে বাহির হন। এই পর্য্যটনের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ভ্রমণ করিতে করিতেই ঘড়ি মেরামত, অফিসের হিসাব পরীক্ষা ও পত্রাদি লেখা প্রভৃতি যদৃচ্ছালব্ধ কার্য্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেন। রাজেন্দ্রনাথ একান্ত আত্মনির্ভরশীল এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। এই দুইটী গুণ অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। একান্ত সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত নিরুদ্বেগ ধীরতায় তিনি একটীর পর একটী কাজ সমাপ্ত করিতে করিতে নরদেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বৈষয়িক কর্ম্মে এবং জ্ঞানানুসন্ধানে তুল্যভাবে তৎপরতা প্রকাশ করিত। ভারতভ্রমণ সমাপ্ত হইলে রাজেন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও অভীষ্ট গবেষণাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়েই তাঁহার 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' প্রকাশের পর তিনি তীব্র অভিনিবেশ সহকারে মহামহোপাধ্যায় ৺পার্বতী চরণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং নব্যন্যায়ের গ্রন্থ 'ব্যাপ্তি-পঞ্চকের' বঙ্গানুবাদ করেন। সাংসারিক ও গবেষণাকার্য্যের ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত তিনি বৎসরের কিছু কাল হিসাবপরীক্ষকের কার্য্য করিতেন এবং লব্ধ অর্থের সাহায্যে অবশিষ্টকাল গবেষণাকার্য্যে রত থাকিতেন। সমগ্র জীবনে কখনও তাঁহার অর্থের প্রাচুর্য্য বা অভাব ছিল না। তিনি প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতেন এবং একান্ত সহজ ও নিশ্চিন্তভাবে জ্ঞানানুসন্ধানে ও জ্ঞানবিতরণে রত থাকিতেন।

রাজেন্দ্রনাথের সহিত কেহ দেখা করিতে আসিলে তিনি সংবাদ পাইবামাত্র অবিলম্বে আগন্তুকের নিকট উপস্থিত হইতেন। আগন্তুকের কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা তিনি কখনও করিতেন না। একদা আমি রাজেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আপনি নির্ব্বিচারে যে কোন ব্যক্তির সহিত এত দ্রুত সাক্ষাৎ করিতে আসেন কেন?" রাজেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন "একদা আমরা বড়ই দুরবস্থায় পড়িয়াছিলাম। তখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, সেখানে আমরা বড়ই অযথা বিলম্বিত হইতাম। এই দুঃখে সংকল্প করিয়াছিলাম, কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে জীবনে কখনও তাঁহাকে অযথা বিলম্বিত করিব না।

'কাদম্বরী'-কাব্যে বাণভট্ট মহাশ্বেতার বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রশমমধুরাকৃতি বলিয়াছেন। এই কথাটীর তাৎপর্য্য রাজেন্দ্রনাথকে দেখিয়া আমার উপলব্ধি হইয়াছিল। শান্তি ও মাধুর্য্য যেন সমপরিমাণে মিলিত হইয়া রাজেন্দ্র-নাথের মূর্ত্তিখানি গঠন করিয়াছিল।

রাজেন্দ্রনাথ যে কয়েক জন ভারতবরেণ্য

আচার্য্যের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথই সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং একমাত্র তিনি এখনও জীবিত আছেন। রাজেন্দ্রনাথের প্রথম আচার্য্য ছিলেন মঃ মঃ পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ। পার্ব্বতীচরণের নিকট অধ্যয়নকালে তাঁহারই সাহায্যে রাজেন্দ্রনাথ 'ব্যাপ্তিপঞ্চক', 'তর্কামৃত', 'তর্কসংগ্রহ' এই তিনখানি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। বঙ্গানুবাদ বলিলে গ্রন্থত্রয়ের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। 'ব্যাপ্তিপঞ্চকের' বিস্তৃত ভূমিকায় রাজেন্দ্রনাথ সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রকে যেন নখদর্পণে ধরিয়াছেন। রাজেন্দ্রনাথ সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রকে কিরূপ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত 'ব্যাপ্তিপঞ্চকের' সুবিস্তৃত ভূমিকায় প্রদত্ত ন্যায়শাস্ত্রের নানা তথ্যপূর্ণ মধুর মনোরম ইতিহাস পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশ্রুতনামা অধ্যাপক বলিয়াছেন, রাজেন্দ্রনাথের 'অদ্বৈতসিদ্ধির' ভূমিকা পাঠ করিয়া বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে তিনি একটা সুসম্বদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কোন ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানার্থীও রাজেন্দ্রনাথের 'ব্যাপ্তিপঞ্চকের' ভূমিকা পাঠ করিয়া অনুরূপ মন্তব্য করিতে বাধ্য।

রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে সুনিপুণ গ্রন্থ-সম্পাদক এবং নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় ভারতের দর্শনাচার্য্যগণের যথাযথ ভাব গ্রহণে পটু। স্বর্গীয় মনীষী দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একদা রাজেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থমালা উপহার পাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি গ্রন্থের বিষয়বস্তু ভাল বুঝি না বটে; কিন্তু গ্রন্থগুলি যে কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার তুলনা বঙ্গভাষায় বিরল।"

এবার রাজেন্দ্রনাথের গ্রন্থরচনার ও অধ্যাপনার একটী ক্ষুদ্র চিত্র দিবার চেষ্টা করিব। রাজেন্দ্র-নাথের নিকট প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পড়ুয়া হইতে 'চিৎসুখী' সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানার্থী নানা শ্রেণীর বিদ্যার্থী প্রায় প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। রাজেন্দ্রনাথ পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। বালক ও বৃদ্ধ সকল বিদ্যার্থীই তাঁহার পাঠনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেন। বিদ্যা ছিল তাঁহার কাছে একাধারে সাধ্য ও সাধনা। বিদ্যার্থীরা তৃপ্ত হইলে সুপ্তমীন হ্রদের ন্যায় নীরব নিস্তব্ধ হইয়া তিনি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।

রাজেন্দ্রনাথের বিদ্যাগৃহে তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্তই হাতের কাছে গোছান থাকিত। তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স থাকিত। পত্নীর জীবদ্দশায়ও রাজেন্দ্রনাথ এইরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তবে ১৩২৫ সাল হইতে দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠগৃহ এইরূপই ছিল। তাঁহার পার্শ্বে কম্বলের উপর সর্ব্বদা একছড়া ছোট রুদ্রাক্ষের মালা শোভা পাইত। লিখিতে লিখিতে তিনি মাঝে মাঝে বিরত হইয়া মালাগাছি হাতে লইয়া নিমীলিত নেত্রে জপ করিতেন। আমার মনে হইত গ্রন্থ লিখিতে লিখিতে চিত্তে সংশয় জাগিলে তাহা নিরসন করিবার জন্য তিনি জপ করিতেন। রাজেন্দ্রনাথের এই প্রসন্ন, মধুর, গম্ভীর ধ্যানমূর্ত্তি অবিস্মরণীয়। অহোরাত্র সত্যের সন্ধান ব্যতীত রাজেন্দ্রনাথের জীবনে আর কোনও চেষ্টা লক্ষিত হইত না। লিখিতে লিখিতে অনেক সময়ে সংশয়ের আবির্ভাব হইত, কিন্তু যখনই উহার মীমাংসা হইত তখনই তিনি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কত দিন তিনি গভীর রাত্রিতে সহসা আলো জ্বালিয়া এইরূপ গ্রন্থরচনায় নিবিষ্ট হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রনাথের বেদান্তাচার্য্যগণের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত

হইয়াছে। রাজেন্দ্রনাথ আরও দুইজন বিশ্রুত-কীর্ত্তি বেদান্তাচার্য্যের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা হইতেছেন মঃ মঃ ৺লক্ষ্মণশাস্ত্রী ও মঃ মঃ ৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ। এই দুই জন যোগেন্দ্রনাথেরও বেদান্তগুরু। যোগেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি মঃ মঃ লক্ষ্মণশাস্ত্রীর সমস্ত শারীরকভাষ্য কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি দুই হাতের দুই আঙ্গুল যথাক্রমে ভামতী ও কল্প-তরুর উপর রাখিয়া ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন। রাজেন্দ্রনাথ বলিতেন যে মঃ মঃ লক্ষ্মণ-শাস্ত্রী অপরিমেয় মেধার অধিকারী ছিলেন। মীমাংসার সহস্র অধিকরণ ও বেদান্তের নিরা-নব্বইটি অধিকরণ তাঁহার বুদ্ধিতে নিরন্তর ভাসমান ছিল। ভারতের সূত্রসাহিত্যের অন্ত-র্নিহিত নীতিটি যাহা ক্রমশঃ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহা এই মহামেধাবী আচার্য্য অবগত ছিলেন। "বাদরায়ণ-ব্যাসসম্মত-ভাষ্যনির্ণয়ঃ" নামক রাজেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ অপূর্ব্ব গ্রন্থে ঐ নীতির সাহায্যেই কোন্ ভাষ্যে ব্যাসের যথার্থ আশয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিরূপিত হইয়াছে।

জীবনের শেষ সাত বৎসর রাজেন্দ্রনাথ মোক্ষ-ভূমি বারাণসীতে যতিজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সাত বৎসর মুহূর্ত্তকালের জন্যও তিনি ৺কাশীধাম ত্যাগ করেন নাই। শাস্ত্রের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠাই রাজেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের একমাত্র নীতি ছিল। এই নীতির কনকসূত্রে তাঁহার জীবনের সকল কর্ম্ম এক একটী হীরক-খণ্ডের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। যে ধীরতা ও একাগ্রতা তাঁহার প্রত্যেকটী আরব্ধ কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে বেদশাস্ত্রবিহিত উপায়ে লাভ করিয়াছিলেন।

যতিজীবনেও রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রানুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস-জীবনে প্রত্যহ বেদান্ত শ্রবণ করিতে হয়, এইজন্য তিনি সেবাশ্রমে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া প্রতিদিন শ্রবণার্থী যতি, ব্রহ্মচারী, গৃহী প্রভৃতি সকলের সহিত একান্ত মনে বেদান্তাধ্যাপকের মুখে ভাষ্যটীকাদির সহিত বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যান শ্রবণ করিতেন। যতিজীবনের সাত বৎসরেও তিনি বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই বহু গ্রন্থের রচনা ও সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থমালার মধ্যে তাঁহার সম্পাদিত ব্রহ্ম-সূত্রের বঙ্গানুবাদ ও সাধু নিশ্চলদাস-কর্তৃক হিন্দী ভাষায় নিবদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থ 'বিচার-সাগরের' বঙ্গানুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থখানি চিদ্‌ঘনানন্দজীর মায়িক সম্পর্কে অন্যতম ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত দেবশঙ্কর মিত্র মহাশয় কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে। শেষজীবনে রচিত তাঁহার অনেক সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

৺কাশীধামেও দ্বিতীয়ভাগের পড়ুয়া হইতে বেদান্তজিজ্ঞাসু পর্য্যন্ত নানাশ্রেণীর বিদ্যার্থিগণ নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার 'কৌপীনাষ্টকে' বসন্তের ন্যায় লোকহিতব্রত কৌপীনধারী যতির স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু যতি-জীবনে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেও লোকহিত রাজেন্দ্র নাথের স্বভাবসিদ্ধ ব্রত ছিল। শাস্ত্রীয় তপস্যা যেন রাজেন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। গীতাপ্রোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানস তপস্যা সাত্ত্বিকভাবে আচরিত হইয়া রাজেন্দ্রনাথকে যে দেবমানবে পরিণত করিয়াছিল তাহার তুলনা মেলা ভার।

ব্রহ্মচারী প্রাণেশের মুখে শুনিয়াছি—৺কাশীধামে চিদ্‌ঘনানন্দজীর নিরন্তর সকরুণ 'হা বিশ্বনাথ, হা বিশ্বনাথ' ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত। ভগবান মনু বলিয়াছেন, 'তপোমূলম্ ইদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।'—এই

ঐহিক পারত্রিক সকল সুখের মূলই তপস্যা। সাধুগণ বলিয়া থাকেন—

"অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥"

'অসার সংসারে কাশীবাস, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাজল এবং শম্ভুসেবন এই চারিটিই সার।' রাজেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপিনী তপস্যার ফলে চারিটি বস্তুই একান্তভাবে লাভ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সূর্য্যের নবীন কিরণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা বিবেকানন্দ-যুগের পতাকাবাহী বলিলে সত্যভ্রষ্ট হইব না। প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু জ্ঞানসম্পদ রহিয়াছে তাহা অবাধে কেবল ভারতের কেন জগতের সকল মানবের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়াই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। রাজেন্দ্রনাথ এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়া বাংলার জনগণের নিকট ভারতের দার্শনিক সম্পদাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন।

যে কয়টি কৌস্তুভমণির আলোকে বেদান্তভুবন উদ্ভাসিত হইয়া আছে 'চিৎসুখী', 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য', 'সিদ্ধান্তলেশ' ও 'অদ্বৈতসিদ্ধি' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থচতুষ্টয় এতই দুরবগাহ যে রাজেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আর কোন বৈদান্তিকই ইহাদের বঙ্গানুবাদের কল্পনা করিতে পারেন নাই। এই চারিখানি গ্রন্থের আংশিক বঙ্গানুবাদ করাইয়া এবং বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া রাজেন্দ্রনাথ বঙ্গবাণী ও তাঁহার সেবকদিগকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই দুষ্কর কার্য্যে তাঁহার সহায় ছিলেন মঃ মঃ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মঃ মঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

রাজেন্দ্রনাথের আর এক কীর্ত্তি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় শাস্ত্রীর সাহায্যে 'উপদেশসাহস্রী'র সম্পাদনা। কেবল সম্পাদনে ও অনুবাদেই নহে স্বতন্ত্র গ্রন্থরচনায়ও রাজেন্দ্রনাথের প্রতিভার ন্যূনতা ছিল না। 'বেদ মানিব কেন?' ও 'বাদরায়ণ-ব্যাসসম্মতভাষ্যনির্ণয়ঃ' তাঁহার স্বতন্ত্র গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি সংস্কৃতে নিবদ্ধ। এই গ্রন্থখানিতে রাজেন্দ্র নাথের সারা জীবনের শাস্ত্রসাধনা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। একদা প্রয়াগের মহাকুম্ভে শাস্ত্রপারদর্শী যতি-সম্মেলনে রাজেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যতিগণ একবাক্যে ইহাকে অপূর্ব্ব গ্রন্থ বলিয়া প্রশংসা করেন। রাজেন্দ্রনাথ বাংলার ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত চর্চ্চা বাড়াইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত সরল সংস্কৃত ব্যাকরণ 'উপক্রমণিকা'র নানাতথ্যপূর্ণ একটি সংস্করণও বাহির করিয়াছিলেন।

হে ব্রহ্মভূত, আজ ব্রহ্মসাগরে-বিলীন তোমাকে ব্রহ্মমন্ত্রেই প্রণাম করিতেছি। 'ওঁ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্, বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধি অস্মদ্ জুহুরাণমেনো, ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।'—হে অগ্রণী, কল্যাণলাভের নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে শুভপথে চালিত কর। হে জ্যোতির্ম্ময়, বিশ্বের সকল বৃত্তান্তই তুমি অবগত আছ। যে পাপ ক্ষয় করে তাহা হইতে তুমি আমাদিগকে দূরে রাখ। তোমার উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রণতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছি।

শিশুদের চলচ্চিত্র

মেরী ফিল্ড

(গমণ্ট বৃটিশ ইনষ্ট্রাকসানাল ফিল্ম কোম্পানীর 'চিলড্রেনস
এণ্টারটেনমেণ্ট ফিল্মস' বিভাগের ডাইরেক্টার)

চলচ্চিত্র-শিল্পের বয়স হল প্রায় পঞ্চাশ বছর কিন্তু এতদিন পরে শিশুদের জন্য ছবি তোলার সত্যিকারের চেষ্টা হচ্ছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ শিশুসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের বহুকাল পরে।

শিশুদের উপযোগী ফিল্মের একান্ত অভাব দেখে ১৯৪৪ সালে গমণ্ট-বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী 'চিলড্রেনস্ এনটারটেনমেণ্ট ফিল্মস্' নামে একটি বিভাগ খোলেন। শিশুদের জন্য ফিল্ম তোলার কাজে এঁদের গবেষণা, ঐকান্তিক চেষ্টা ও তার ফলাফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে পরিচালকদের একটা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বয়স্কদের জন্য তৈরী ছবি দেখে শিশুমনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাই পর্য্যবেক্ষণ করে শিশুদের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে একটা ধারণা করে সেই অনুযায়ী কতকগুলি ছবি তোলা হয়। এর ফলে অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটে। শিশুরা তো তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে ভাললাগা মন্দলাগার সঙ্গত কারণ দেখাতে পারে না। সেই জন্য পরীক্ষামূলকভাবে নানা ধরনের ছবি তোলা হয় এবং প্রতিক্ষেত্রে শিশু দর্শকদের মধ্যে বসে তাদের মনে সেই সব ছবির প্রতিক্রিয়া, ছবি দেখার সময় তাদের বিচিত্র অনুভূতির নানাভাবে প্রকাশ বিশেষ যত্নের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। এইভাবে অনেক চেষ্টা ও ব্যর্থতা, অনেক ভুল ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে শিশুদের জন্য ফিল্ম তৈরী করার কতকগুলি নিয়ম-কানুন ঠিক করা সম্ভব হয়েছে।

গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে C.E.F.এর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি ছবি তোলা হয়েছে। ছোট ও বড় গল্প, সিরিয়াল, খণ্ড খণ্ড কাহিনীর সমষ্টি, ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক ফিল্ম, কার্টুন, গীতিমূলক ছবি —ইত্যাদি নানা রকমের ছবি দেখিয়ে তাঁরা শিশু মন জয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

ছবি দেখার ব্যাপারে শিশুদের রুচি সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশের সময় এখনো আসেনি কিন্তু বহু পরীক্ষার ফলে তার কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা স্পষ্ট হয়ে দেখা গেছে। শিশুরা চায় যে একটি সহজ গল্প অবান্তর কথোপকথন বাদ দিয়ে ছবির সাহায্যে বলা হোক।

বয়স্কদের মত ছবির টেকনিকাল দোষ ত্রুটি নিয়ে তারা অত মাথা ঘামায় না কিন্তু বয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে তারা ছবি দেখে এবং তাদের মন অনেক বেশী অনুভূতি-প্রবণ।

ঠিক কি রকম ধরনের ছবি সব শিশুদেরই ভাল লাগবে তা জোর করে বলা কঠিন। বিভিন্ন বয়সী শিশুদের মধ্যে, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এবং যাকে বলে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শিশু তাদের মধ্যে রুচির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সব শিশুই নিজেদের বয়সী ও নিজেদের মত শিশুদেরই ছবি পর্দায় দেখতে ভালবাসে। বয়স্ক অভিনেতাদের যে তারা দেখতে চায় না তা নয়। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ টাইপের বয়স্ক অভিনেতার সম্বন্ধে তাদের

পক্ষপাতিত্ব আছে এবং অভিনেতা নির্বাচন করবার সময় সে বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

ছবির বিষয়বস্তু শিশুদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকেই সংগ্রহ করা উচিত। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে অন্যান্য বিষয়ে ভাল ও উত্তেজনাপূর্ণ ছবির চেয়ে শিশুরা বইয়ে পড়া বা রেডিওতে শোনা কোন পরিচিত কাহিনী বা চরিত্রের চিত্ররূপ দেখতে বেশী পছন্দ করে।

ছবি শিশুদের মনোমত হয়েছে কিনা জানতে হলে ছবি দেখার সময় তাদের মধ্যে যে নানারকম শব্দ ও চীৎকার শোনা যায় সেদিকে কান রাখতে হবে। আনন্দ ও উত্তেজনার মুহূর্তে 'ওঃ' চীৎকার, উল্লাসের উচ্চ হাসি, বিরক্তির অস্ফুট গুঞ্জন ও গভীর মনোযোগের সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা—এই সব থেকেই তাদের মতামত বুঝতে হবে। শিশু দর্শকের মধ্যে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা খুব ভাল লক্ষণ নয়। শিশুরা ছবি দেখে চুপ করে থাকবে না—মহাউৎসাহের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দেবে বা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়বে ছবি ত এম্নিই হওয়া উচিত।

ছবির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নীতি উপদেশ বা শিক্ষাদান শিশুরা বিশেষ ভাল চোখে দেখে না কিন্তু ছবি দেখা শিশুদের শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। C. E. F. এর তত্ত্বাবধানে শিশুদের জন্য যেসব ছবি তোলা হয়েছে তাতে পরিচালকেরা এই চেষ্টাই করেছেন যাতে শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করতে পারে। ছবির মধ্য দিয়ে তাদের কখনো নিয়ে যাওয়া হয়েছে দূর বিদেশে, কখনো নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশেরই নানা জায়গায় বা কোন নাচগানের আসরে। গীতিমূলক ছবিতে তাদের নানা জায়গার পল্লীগীতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে।

শিশুদের জন্য ছবি তুলতে হলে একটা বিষয়ের ওপর সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে ছবির মধ্যে মানুষের স্বভাব চরিত্রের ভাল দিকটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা। মন্দ চরিত্রের লোককে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ করে সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের চরিত্রে নাম-করা চোর ডাকাতদের মত 'গ্লামার' থাকবে না।

(New Delhi British Information Services হইতে)

স্পর্শ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ক্ষণেকে ঘুচালে ব্যথা অমৃত পরশে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ নবীন হরষে।
নিমেষে দেখিনু তব অম্লান আলোক
টুটি গেল হৃদয়ের যত তমঃ শোক।
ক্ষণেকে দাঁড়ানু আসি তোমার সম্মুখে
শাশ্বত অসীম পূর্ণ শান্তি লয়ে বুকে।
পলকে ভাঙ্গিল দৃঢ় মিথ্যার নিগড়
রহিল আপন-সত্য সুন্দর ভাস্বর।

গহন নিবিড়তম প্রাণেতে সদাই
জাগিতেছে অলক্ষিতে। আমি যদি চাই
অমনি ছুটিয়া এস গূঢ় অনুভবে।
প্রভু তব মৃত্যুঞ্জয়ী স্পর্শের প্রভাবে—
অজস্র মরণে নাহি অণুমাত্র ভয়
জানি তুমি আছ মোর সম্বল অক্ষয়।

আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি ও তাঁহার দার্শনিক মত

অধ্যাপক শ্রীঅযোধ্যানাথ ব্যাকরণাচার্য্য

চোল রাজ্যের (উত্তর তামিল) প্রান্তে ত্রিরুমলৈ নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণগৃহে আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম তিব্বতী পরম্পরায় কোরুনন্দ। কেহ কেহ বলেন যে ইনি কুমারিল ভট্টের ভাগিনেয় ছিলেন। ইনি যে প্রকারে কুমারিল ভট্টের তর্কের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাতে কুমারিল ভট্টের মাতুলত্ব প্রতিপন্ন করা দুষ্কর! ধর্ম্মকীর্ত্তি বাল্যকালে অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই ইনি বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি পাইলেন না। সে সময়ে সমস্ত ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছিল। নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ দার্শনিক মনীষিবৃন্দের প্রতিষ্ঠা বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সেই জন্য ধর্ম্মকীর্ত্তির ও অন্তরে বৌদ্ধ দর্শনের সিদ্ধান্ত-রাজি অধিগত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইল। তিনি বৌদ্ধ গৃহস্থের বেশে বৌদ্ধ দার্শনিক-গণের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যখন ইহা অবগত হইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে স্বসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। তদানীং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সুদূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্ম্মকীর্ত্তি নালন্দা আসিলেন এবং তত্রত্য বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক ও নালন্দার সংঘস্থবির ধর্ম্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষু-সংঘে যোগদান করিলেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই জন্য তিনি দিঙ্‌নাগের শিষ্যপরম্পরা-ভুক্ত ঈশ্বরসেনের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন গ্রন্থপ্রণয়ন, শাস্ত্র-বিচার ও অধ্যাপনায় ব্যতীত করিয়াছিলেন।

চৈনিক পর্য্যটক ই-চিঙ্‌ স্বীয় গ্রন্থে ধর্ম্ম-কীর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং ৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ইঁহার আবির্ভাব কাল হওয়া সম্ভব।

বৌদ্ধ প্রমাণশাস্ত্র সম্বন্ধেই ইনি যাবতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ নয়টী, সাতটী মূল ও দুইটী টীকা—(১) প্রমাণবার্ত্তিক, (২) প্রমাণবিনিশ্চয়, (৩) ন্যায়বিন্দু, (৪) হেতুবিন্দু, (৫) সম্বন্ধপরীক্ষা, (৬) বাদন্যায়, (৭) সন্তানান্তর-সিদ্ধি, (৮) প্রমাণবার্ত্তিক প্রথম পরিচ্ছেদের বৃত্তি, (৯) সম্বন্ধপরীক্ষার বৃত্তি। ধর্ম্মকীর্ত্তি কেবল ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধেই সাতটী গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তবিষয়ক যাহা কিছু তাঁহার বক্তব্য ছিল, তাহা প্রমাণশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সাতটী গ্রন্থের মধ্যে প্রমাণবার্ত্তিক (১৪৫৪½ শ্লোক) প্রমাণবিনিশ্চয় (১৩৪০ শ্লোক), হেতু-বিন্দু (৪৪৪ শ্লোক) ও ন্যায়বিন্দুর (১৭৭ শ্লোক) প্রতিপাদ্য বিষয় একই। ইহাদের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা বড় ও অধিক বিষয়ের সংক্ষেপে প্রতিপাদক গ্রন্থ প্রমাণবার্ত্তিক। বাদন্যায়ে গৌতমীয় ন্যায়-দর্শনের ১৮টী নিগ্রহ স্থানের আলোচনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রার্থযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে নিগৃহীত করিবার জন্য ১৮ প্রকার নিগ্রহস্থান স্বীকৃত হইয়াছে। এতগুলি নিগ্রহস্থানের অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া কেবল অর্দ্ধ শ্লোকেই নিগ্রহ-স্থানের ভেদ বলা হইয়াছে—"সাধ্যের সাধনের জন্য যে সমস্ত অঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যক, তাহা

না করা এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিতে দোষোদ্ভাবন না করা।"

সম্বন্ধপরীক্ষায় ২৯টী কারিকা আছে। ইহাতে আচার্য্য ক্ষণিকবাদ অনুসরণক্রমে কার্য্যকারণ ভাবের স্থাপনা করিয়াছেন।

সন্তানান্তরসিদ্ধি পুস্তকে ৭২টী সূত্র আছে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়—মন একটী বস্তু নয় কিন্তু প্রতিক্ষণ নাশ ও উৎপত্তি বিশিষ্ট সন্তান অর্থাৎ ঘটনা মাত্র। একটি চিত্ত-বিজ্ঞানের নাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটী চিত্ত-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে। এইরূপ চিত্তবিজ্ঞান-প্রবাহই মন। পরিশেষে বলা হইয়াছে এই সন্তান-সমুদয় কি ভাবে দৃশ্যজগৎকে বাহিরে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। ইহাই বিজ্ঞানবাদ, ইহার চর্চা প্রমাণবার্ত্তিকেও আচার্য্য করিয়াছেন।

আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি অসঙ্গ-প্রবর্ত্তিত যোগাচার-সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদের উপরই আস্থা রাখিতেন; কিন্তু সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়-সম্মত জগতের বাস্তবতাও স্বীকার করিতেন। তবে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় জাগতিক সত্তাকেও যেরূপ মূলতত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লইতেন, ধর্ম্মকীর্ত্তি ঠিক ঐরূপ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার উপরে ছিল যোগাচারসম্মত বিজ্ঞানবাদের প্রবল প্রভাব; সেইজন্য তিনি জাগতিক সত্তা মানিলেও বিজ্ঞানকেই উহার মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি-প্রতিপাদিত বিজ্ঞানবাদের উপরে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়েরও প্রভাব ছিল বলিয়া উহাকে শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদ বলা চলে না, স্বতন্ত্র বিজ্ঞানবাদ বলিলেই ভাল হয়।

এখন বিজ্ঞানবাদের স্বরূপ অনুধাবন করা যাক্। এক সময়ে এই মতবাদের এত বেশী প্রচার হইয়াছিল যে ইহার যৌক্তিকতায় প্রভাবিত হইয়া বসুবন্ধু দিঙ্‌নাগ ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমুখ প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আচার্য্যগণও ইহা অঙ্গীকার করেন।

এই মতে বিজ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব। বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনরূপ তত্ত্ব নাই। আমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহাদের কিরূপে প্রতিভাস হয়? কোনও একটী বস্তুর নীল, পীত আদি রূপ এবং স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব আদি ভাবরূপে প্রতিভাসিত হয়। নীলাদির গ্রহণের দ্বারাই বস্তুর গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও রূপে বস্তু গ্রহণ করা যায় না। যদি কোন বস্তুতে কোনরূপ গুণ না থাকে, তাহা হইলে উহার গ্রহণ প্রত্যক্ষ আদি কোন প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে না। কোনও বাহ্যার্থের বিশ্লেষণ করিতে হইলে হয় চক্ষুগ্রাহ্য-রূপে রূপায়িত, না হয় স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোমল কঠোর আদিরূপে প্রতিভাসিত, ইহাই বলিতে হইবে। ইহা রূপ, ইহা স্পর্শ ইত্যাদি বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ। কেন না নীল, পীত প্রভৃতি রূপ ও কঠোর প্রভৃতি স্পর্শ জ্ঞানকেই অবগাহন করিয়া থাকে। তাহা হইলে উহাদিগকে চক্ষু-বিজ্ঞান, স্পর্শ-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান ও জিহ্বা-বিজ্ঞান রূপে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; আর ষষ্ঠ মনের বিজ্ঞান। এই সমস্ত বিজ্ঞানকেই প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলা হয়। এই সমস্ত প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানের মূলে আবার একটী বিজ্ঞান আছে, তাহার নাম আলয় বিজ্ঞান। ইহা প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানের আলয় অর্থাৎ গৃহ। যেমন সমুদ্রেই তরঙ্গ উৎপন্ন ও নষ্ট হয়, সেইরূপ আলয়-বিজ্ঞানেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন ও নষ্ট হইতেছে। উৎপদ্যমান তরঙ্গমালার কারণ সমুদ্র, ঠিক সেইরূপ আলয়-বিজ্ঞানই সমস্ত জগতের কারণ। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে পৃথক বস্তু নয়, জগৎও বিজ্ঞান হইতে পৃথক নয়, ইহাও বিজ্ঞান-স্বরূপ। এক কথায় আলয়-বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসমষ্টি ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানব্যষ্টি বলিলেও চলে।

ঘট, পট আদি সমস্ত জাগতিক পদার্থই বিজ্ঞান, ইহাদিগকে বাহ্য বিজ্ঞান বলা হয়। এই বাহ্য বিজ্ঞানই গ্রাহ্য এবং সুখ, দুঃখ আদির গ্রাহক চিত্ত-বিজ্ঞানই সমস্ত বাহ্যবিজ্ঞানের গ্রাহক। বাহ্য বিজ্ঞানও আন্তর বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ নয়, দুইটাই বিজ্ঞান মাত্র। বাইরে ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের এই ভিন্নরূপতা ভ্রমমূলক। যদি গ্রাহ্য-বিজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে গ্রাহক-বিজ্ঞানের ভান হইতে পারে না এবং গ্রাহক-বিজ্ঞান না থাকিলে গ্রাহ্য-বিজ্ঞানের ভান হওয়া অসম্ভব। নিরাকার-বিজ্ঞানই গ্রাহ্য ও গ্রাহক রূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারই না করা যায় কেবল বিজ্ঞান মাত্রই বলা হয়, তাহা হইলে এইটী ঘট, এইটী পট এইরূপ জ্ঞানের ভেদ কিরূপে হইতে পারে? ইহার সমাধানে আচার্য্য বলেন যে অনাদি কাল হইতে একটী বাসনা চলিয়া আসিতেছে. আলয়-বিজ্ঞানের প্রবাহে অবস্থিত যে বাসনা-প্রবাহ, তাহাই এইরূপ ভিন্নতাবোধের কারণ। ইহা ঘট, ইহা পট এইরূপ ভেদ জ্ঞানের পর যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহা আলয়-বিজ্ঞান-প্রবাহে অবস্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ সংস্কার হেতু ইহার বিজ্ঞান এইরূপে ভাগ না হইয়া ইহা ঘট, ইহা পট ইত্যাদি প্রকারে ভিন্নরূপে ভাগ হইয়া থাকে।

এই মতে বিজ্ঞান প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল। একটির উৎপত্তি হইতেছে ও অপরটির নাশ হইতেছে, এইরূপ উৎপত্তি নাশ—উৎপত্তি-নাশের প্রবাহরূপেই এই জগৎ অবস্থিত। এই মতে কোন নিত্য স্থির আত্মা বলিয়া বস্তু নাই। নিশ্চল বলিয়া কোন বস্তু নাই যখন, তখন নিত্য-স্থির আত্মার অস্তিত্ব এই মতে কিরূপে হইতে পারে?

নিত্য-স্থির আত্মা স্বীকৃত না হইলেও জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। আত্মবাদীর হৃদয়েও আশঙ্কা হয়—স্থির আত্মা না থাকিলে জন্ম ও মৃত্যু হইবে কাহার? নির্ব্বাণই বা কাহার হইবে? অনাত্মবাদী বৌদ্ধদের নির্ব্বাণের জন্য সচেষ্ট হওয়াও বৃথা। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষ হইতে ইহার উত্তর দেওয়া হয়, জন্ম বলিতে নিত্য আত্মার নূতন শরীরের সহিত সম্বন্ধ বুঝায় না; কিন্তু মন-প্রবাহের নূতন শরীরের সহিত সম্বন্ধ বুঝায়। চেতন বিন্দুর পঙ্‌ক্তিই জীবন। শরীরও প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল এবং শরীরাশ্রিত মনও প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। তাহা হইলে ক শরীরের অন্তিম চিত্ত-বিন্দু নষ্ট হইয়া খ শরীরের সহিত সংলগ্ন হয়। ক নামক শরীরের বিন্দু-রেখা নষ্ট হওয়ার পরই যখন খ নামক শরীরের বিন্দু-রেখা আরম্ভ হয়, তখন ক নামক শরীরের যে ক নামক চিত্ত-বিন্দু-রেখা আছে, তাহার অন্তিম বিন্দুর সঙ্গে খ নামক শরীরের বিন্দু-রেখার সম্বন্ধ হয়, ইহা জন্ম। আর ক শরীরের অন্তিম বিন্দু নষ্ট হওয়ার নামই মৃত্যু।

বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ ভাবপদার্থ নয়, অভাব-স্বরূপ। ঐরূপ বিজ্ঞান-প্রবাহের নিরোধ করিতে পারাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়। অবিদ্যার নিরোধ হইলে তাহার কার্য্য-সংস্কার নিরুদ্ধ হয় এবং সংস্কারের নিরোধ হইলে তাহার কার্য্য-বিজ্ঞানের নিরোধ হয়, বিজ্ঞানের নিরোধ হইলে, তাহার কার্য্য-নাম-রূপের নিরোধ হয়। নাম-রূপের নিরোধ করিতে পারিলে, তাহার কার্য্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের নিরোধ হয়। এই ছয়টির নিরোধ হইলেই স্পর্শের নিরোধ হয়। স্পর্শের নিরোধ হইলে, তাহার কার্য্য বেদনা হয় না এবং বেদনা নিরুদ্ধ হইলে, তাহার কার্য্য তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হইলে, তাহার কার্য্য গ্রহণ ও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নিরুদ্ধ হয়। পরে তাহার কার্য্য ভব নিরুদ্ধ হইলেই জাতি অর্থাৎ জন্ম নিরুদ্ধ হইয়া

যায়। এইরূপে চেতন-প্রবাহের উচ্ছেদ হইলেই নির্ব্বাণ হইল। ইহা ব্যতীত নির্ব্বাণের অর্থ অন্য কিছু নহে। আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিকে বিজ্ঞানবাদের এইরূপ গূঢ় রহস্যকে অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তি শব্দপ্রামাণ্যবাদের অনেক যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরাকরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানবিরুদ্ধ শব্দপ্রমাণ স্বীকৃত নহে। যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ, তাহার সিদ্ধির জন্য বেদের কি প্রয়োজন? আর যাহা পরোক্ষ—ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তাহার অস্তিত্বে সন্দিহান ব্যক্তি কিরূপে বেদের শরণাপন্ন হইবে? এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, উভয়ের জন্যই বেদের প্রামাণ্য প্রয়োজনীয় নহে। ধর্ম্মকীর্ত্তি পাঁচ প্রকার অজ্ঞানের নিরাকরণ করিয়াছেন—(১) বেদের প্রামাণ্য, (২) ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, (৩) জাতিবাদ, (৪) স্নানে ধর্ম্মের ইচ্ছা এবং (৫) উপবাস আদি ব্রত দ্বারা পাপনিবৃত্তি।

লীলা ও নিত্য

শ্রীজ্যোতি

আজি এ জীবন সাঁঝে
　　আমার হৃদয় মাঝে
একি এ শুনছি আজি
　　বীণার রণন বাজি।
চতুরা সখীরা কত
　　সদানন্দে নৃত্যরত
ফুল্ল কুসুমরাজি
　　গন্ধ বরণে সাজি,
তিমির গভীর রাতি
　　পরশে উঠিল মাতি,
দিব্য আলোকে সব
　　লইয়া বারতা নব,
ছন্দ মধুর গীত
　　বসন পরি গো পীত,
দীরঘ বিরহ পরে
　　এলে কি এলে এঘরে।
নিঠুর তুমি গো অতি
　　তবু যে করি গো নতি,
বুঝেছি জীবনে সার
　　কেহ যে নাহি কো আর।

কত যে বেদনা হায়
　　অশ্রু বহিয়া যায়,
দুঃখ পীড়ন কত
　　বয়েছি নিয়ত শত।
তোমার দরশে আজি
　　পরশে উঠিল সাজি।
প্রেম দোদুল দোলায়—
　　দোলে তোমারি গলায়,
মধুর মধুর ছন্দে
　　তোমার চরণ বন্দে।
আমার আমি আজি কৈ?
　　তোমারই প্রেমে ওই
ডুবে, তুমি ছাড়া আর
　　কোথা কোন কিছু নাই,
তুমি খেল তোমা লয়ে,
　　তুমি ভুল তোমা চেয়ে,
তোমা প্রেমে তুমি গল
　　বিশ্বজগৎ ভুলিয়া,
তোমার সাগরে তুমি
　　রয়েছ সদা ডুবিয়া।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা

রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়,
জেলা—হাওড়া—২৬।৬।১৯২৩

শ্রীমান—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। * * তোমরা নূতন বাড়ীতে গিয়াছ এবং রীতিমত যজ্ঞাদি করিয়া ঠাকুরকে স্থাপন করিয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

যে সকল ছেলেরা আন্তরিক প্রভুর কার্য্য ও সাধন ভজন ও পাঠাদি করে এবং যারা উহাদের ভিতর বৈরাগ্যবান—প্রভুই তাদের জীবনের ভার নিশ্চয় লইবেন। আমার বোধ হয় তিনি লইয়াছেন। আমাকে তুমি তাদের ভার লইতে বলিয়াছ কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব ধনই ঠাকুর। আমার গুরু-অভিমান কোন কালেই নাই এবং হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, কারণ আমি তাঁর দাসানুদাস; আমি আবার গুরু হইব কি? আমি চিরকালই শিষ্য, চিরকালই দাস। প্রভুই আমার সর্ব্বস্ব। অবশ্য যারা আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করে প্রভুই তাদের জীবনের সমস্ত ভার লইবেন। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি ভক্তি করিয়া আমাকে যেরূপ লিখিয়াছ সে সব প্রভুরই বিশেষণ এবং সে সকলই তাঁরই প্রাপ্য,—তিনিই যুগাবতার, তিনিই জগতের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ নামে ও রূপে সভক্ত জগতে অবতার হইয়াছেন। আমাদের বলিয়াছেন কেবল এই সংবাদ জগতে দিবার জন্য। আমরা জীবকে বলি ও বলিব যে ভগবান রামকৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছেন, তোমরা সকলে তাঁর আশ্রয় লও, তাঁর নাম কর, তাঁর চরিত্র পাঠ কর, তাঁর গুণগান কর। তাঁর বিশেষ প্রকাশমুখ স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্র পাঠ কর, তাঁর কার্য্য—প্রিয়কার্য্য যথাসাধ্য কর। তাহা হইলেই পরম কল্যাণ হইবে—ভবসংসার পার হইবার আর ভাবনা নাই। আমাকে যেরূপ বলিয়াছ সে আমি নই, সে ঠাকুর। আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান; তাঁর কথা জীবকে বলিব বলিয়াই তিনি আমাকে বা আমাদিগকে এখনও জগতে রাখিয়াছেন—ইহার অধিক আর কিছুই নয়।

তুমি যেরূপ কার্য্য করিতেছ তাহা প্রভু ও স্বামিজীর প্রিয় কার্য্য, ইহাতে তোমাদের ও বহু লোকের কল্যাণ হইবে—আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। * * *

শ্রীভগবানের আশ্রয় লইয়াছ আর ভয় কি? আনন্দে তাঁর গুণগান কর, তাঁর স্মরণ মনন কর, তাঁর কার্য্য যথাসাধ্য কর—জীবন ধন্য হইবে। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং ছেলেদের দিবে। * * *

ইতি—তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যিনি রাষ্ট্রশক্তির পরিচালক হইবেন, দেশের শান্তিরক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধির ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে, অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে জাতি ও সমাজকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে অর্পিত হইবে, যিনি তত্ত্বদর্শী স্বার্থবুদ্ধিশূন্য সর্ব্বপ্রেমিক ব্যবস্থাপক-দিগের অনুশাসন অনুসারে জাতি এবং সমাজের স্বার্থরক্ষা করিয়া বাহ্য সম্পত্তি ও অধ্যাত্ম-সম্পদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সমস্ত নরনারীকে প্রদান করিবেন, তিনি হইবেন ক্ষত্রিয়। অর্থের সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইবে না, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য তাঁহার নিজের হাতে থাকিবে না; জাতির বাহ্যিক সম্পদ উৎপাদনে ও বণ্টনব্যবস্থায়ও তাঁহার কোনও স্বার্থ থাকিবে না, পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার সমস্ত নরনারীকে যথাযথ পালন করিতে হইবে।

জাতির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি উৎপাদন ও বণ্টনের ভার থাকিবে তাঁহাদের উপর, যাঁহারা প্রধানতঃ যজ্ঞব্রতী, ত্যাগশীল, স্বার্থবুদ্ধিরহিত, তত্ত্বদর্শী ও বিশ্বপ্রেমিক। এই শ্রেণীর লোকের নামই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বাহ্যসম্পদ উৎপন্ন করিবার ভার যাঁহাদের হাতে থাকিবে তাঁহারাই বৈশ্য। কারণ ক্ষত্রিয়ের উপর দেশরক্ষার গুরু-দায়িত্ব অর্পিত, দেশের শান্তিরক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ আহরণ করিয়া সমাজের সমস্ত স্তরের উপকার করিবেন; বৈশ্যগণ ধন আহরণ করিয়া সমাজের সকল শ্রেণীর আর্থিক দুর্গতি মোচন করিবেন, অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিবেন। বৈশ্যের দ্বার জনসাধারণের জন্য, —বিশেষতঃ জ্ঞানী, ত্যাগী, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, রোগী, দুর্গত, অনাথ প্রভৃতির সেবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে। কখনও দুর্ভিক্ষ হইলে উহার প্রতীকারের ভার বৈশ্যের উপরই পড়িবে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে সর্ব্বস্বান্ত মানুষের অন্ন-বস্ত্র গৃহ প্রভৃতির সংস্থান বৈশ্যেরই কর্ত্তব্য। মহামারী হইলে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা অন্তর্বিপ্লব ঘটিলে, সবলের দ্বারা দুর্ব্বলের উপর উৎপীড়ন হইলে, বুদ্ধিমান্ ও শক্তিশালী ব্যক্তি অথবা শ্রেণী দ্বারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিহীন ও শক্তিশূন্য ব্যক্তি অথবা শ্রেণীর শোষণ আরম্ভ হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন ক্ষত্রিয়। কারণ ক্ষত্রিয়ই দেশের শাসক, সমস্ত শক্তি ও সম্পদের নিয়ামক, দেশের সমাজের এবং জাতির সেবক। এইজন্য ত্যাগী ও জ্ঞানপন্থীদের পরেই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক পদ ও প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অনু-শাসন অনুসারে দেশের প্রভুশক্তির পরিচালনা করিবেন, অর্থশক্তির পরিচালনার জন্য বৈশ্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রভুত্ব ও সম্পদ এই দুই বিষয়েই তাঁহাকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মচ্যুত হইবেন। প্রভুত্ব ও সম্পদের একমাত্র মালিক হইয়াও তিনি সমাজের সেবক ও ত্যাগব্রতী,—ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

রাষ্ট্রশক্তির পরিচালক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অর্থলাভজনক কৃষি-শিল্প প্রভৃতি ধর্ম্ম ও মর্যাদার যেরূপ হানিকর, সেরূপ কৃষি-শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্যে দেশের অর্থশক্তি বৃদ্ধিকারী বৈশ্যের পক্ষেও রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সমাজে প্রভুত্ব করিবার স্পৃহা পোষণ করা চলিবে না।

প্রভুত্ব ও সম্পদ এই দুইটী মত্ততা জন্মায়। সমাজে প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা এবং অর্থশক্তি একই হাতে অর্পিত হইলে অর্থাগমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাষ্ট্রে ন্যায় ও ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই ন্যায়ানুমোদিত ধর্ম্মনিষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তির আধার ক্ষত্রিয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ করেন, অর্থোৎপাদনের হ্রাস না ঘটাইয়া তিনি যথাযথভাবে ইহার নিয়োগ করিবেন. অন্যদিকে ন্যায় ও ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান আদর্শরূপেই ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রশক্তি ও অর্থশক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করিবেন। ইহাই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিধান ছিল।

রাষ্ট্রশক্তি যদি অর্থশক্তিতে বলীয়ানদের হস্তগত হয়, কৃষাণ, শ্রমিক ও বণিকসমাজ যদি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্রশক্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লালায়িত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সমাজে নানাপ্রকার অশান্তির কারণ ঘটে, সমাজ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।

অর্থনিয়ন্ত্রণের অধিকার যদি রাষ্ট্রপরিচালকের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্ম্মনীতিকে ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী অর্থের উৎপাদন ও বণ্টন করে, তাহা হইলে সমাজে অবশ্যম্ভাবী বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সহযোগিতার ক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সমাজের অর্থশক্তির নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার রাষ্ট্রশক্তির এবং রাষ্ট্রপরিচালনার ভার ধর্ম্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম-বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল।

এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বাদ দিলে সমাজের জনসাধারণের কথাই চিন্তা করিতে হয়। যাহাদের জ্ঞানশক্তির ও কর্ম্মশক্তির ভালভাবে বিকাশ হয় না, যাহারা সূক্ষ্মভাবে তত্ত্ববিচার করিতে পারে না, সমগ্র সমাজের কল্যাণকর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে,—মানবজীবনের চরম আদর্শ অনুসরণ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে যাহারা অসমর্থ, অথবা রাষ্ট্রশক্তি বা অর্থ-সম্পদকে যাহারা সমাজের কল্যাণের উপযোগী করিয়া নিয়োগ করিতে জানে না, সমাজে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। যাহাদের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কর্ম্মশক্তি ব্যবহারের জ্ঞান না থাকিলে দেশে শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি অসম্ভব, নির্ব্বিঘ্নে রাষ্ট্রপরিচালনা ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি অনুষ্ঠানসমূহের যন্ত্রস্বরূপ সেই জনসাধারণ - সেই বিরাট অজ্ঞ জনসমষ্টিই শূদ্র নামে অভিহিত।

সংখ্যার দিক হইতে সমাজের সর্ব্বপ্রধান অংশ হইলেও ইহারা অজ্ঞতার দরুন স্বাধীনভাবে নিজেকে পরিচালিত করিয়া জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্যই ইহারা সমাজের সেবার জন্য নিয়োজিত। নিজ সামর্থ্যের অনুরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া, যথার্থ প্রেম ও সহানুভূতির সহিত ইহাদের উপযুক্ত ভোগ-সুখের ব্যবস্থা করিয়া ইহাদের জীবনের উন্নতি সাধন করা এবং মানবজীবনের চরম আদর্শের দিকে ইহাদের মনোবৃত্তি জাগ্রত করিয়া সেই পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ক্ষত্রিয়ের রাষ্ট্রপরিচালনায় ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে এবং বৈশ্যের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে শূদ্রের সহায়তা একান্তই আবশ্যক। সমাজের ধর্ম্মশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি এবং অর্থশক্তির অনুগত হইয়া সমাজের

সেবা করা শূদ্রের কর্ত্তব্য। উন্নততর স্বাধীন কর্ম্মে রত উচ্চ শ্রেণীর অনুগত হইয়া স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সহিত তাঁহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া সেবাত্মক কর্ম্ম দ্বারাই জনসাধারণ উন্নত হইতে পারে, সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

সমাজের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কার্য্যের জন্যই শারীরিক শক্তি নিতান্ত আবশ্যক। শক্তির অধিকারীরা শারীরিক শক্তি দ্বারা সমাজের মহা কল্যাণ সাধন করে। ধর্ম্মশক্তির জন্য শারীরিক পরিশ্রমকারী সেবক নামে, রাষ্ট্রশক্তির জন্য শারীরিক পরিশ্রমকারী সৈনিক নামে এবং অর্থ-শক্তির জন্য দৈহিক পরিশ্রমকারী শ্রমিক নামে অভিহিত হয়।

এইভাবে ভারতীয় মনীষিগণ সমগ্র মানব-জাতিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্মের সমন্বয়ের দ্বারা সমাজ সংগঠন করিবার বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মানুষের সহিত মানুষের যে বুদ্ধি, শক্তি ও অন্যান্য গুণের স্বাভাবিক ভেদ রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া এই ব্যবস্থার সাহায্যে সমস্ত মানুষের গুণ ও শক্তিকে একই আদর্শের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সমগ্র মানবসমাজের এক মহাসমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, অর্থ-সম্পদ এবং সেবা— এই চারিটি শক্তিরই বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং এই শক্তিচতুষ্টয়ের বিকাশের জন্য চারি প্রকার গুণ নির্দ্ধারণ করিয়া গুণানুসারেই কর্ম্মের অধিকার নিরূপিত হইয়াছে।

ভারতীয় ঋষিগণ সমগ্র সমাজকে এক বিরাট পুরুষরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সেই সমাজের মস্তকস্থানীয়, ক্ষত্রিয় তাহার বাহুযুক্ত বক্ষঃস্থল, বৈশ্য তাহার উদর এবং শূদ্র তাহার চরণ বা গতিস্থানীয়। এই চতুর্ব্বর্ণের দ্বারা সমস্ত অবয়ব-যুক্ত বিরাট সমাজপুরুষের শরীর গঠিত। প্রত্যেক অঙ্গের শক্তি ও প্রয়োজন বিভিন্ন, সুতরাং পরস্পরের ভেদও স্বাভাবিক, কোনটি উপেক্ষণীয় নহে।

সমাজের ভিতর এইরূপ বিভিন্ন গুণশালী মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। বিভিন্ন রুচি ও কর্ম্মশক্তিবিশিষ্ট মানুষের দ্বারা একই রকমের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং গুণ ও শক্তি অনুসারে এইরূপ বিভাগ না করিয়া সমাধানের আর কোন পথ নাই। এই কাজের মধ্যেও নানা প্রকারের বৈচিত্র্য থাকার জন্য এবং এক এক রকম কার্য্যে বংশপরম্পরাক্রমে নিযুক্ত থাকার দরুন ক্রমশঃ উপবর্ণ বা উপজাতিসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

কর্ম্ম এবং গুণ অনুসারে (অর্থাৎ কর্ম্মের যোগ্যতা অনুযায়ী) শ্রেণীর ভেদ অস্বাভাবিক কিছুই নয়, বরং ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি অশান্তি উৎপন্ন না হইয়া সকলের সহিত পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয়, প্রেম, মৈত্রী এবং শান্তির প্রতিষ্ঠাই হয়। এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায়,—ভারতীয় সমাজ গঠনকারী ঋষিগণ সামাজিক সমস্যার যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, উহার অপেক্ষা কোনও শ্রেষ্ঠ সমাধানের কল্পনা জগতে আজ পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই।

আর্য্য ঋষিগণের মতে কর্ম্মকে ধর্ম্মসাধনায় রূপায়িত করিয়া সমাজের সকল স্তরের উপর উহার প্রচার করাই সমস্যা-সমাধানের সর্ব্বোত্তম উপায়। কর্ম্মকে যদি কেবল লৌকিক ভোগ সুখের উপায় স্বরূপই মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে উহার কোন শেষ লক্ষ্য বা মর্য্যাদা থাকে না। ভোগের অপেক্ষা কর্ম্মের স্থান সমাজে উচ্চস্তরে রাখা আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যই কোন একটি প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সেই উদ্দেশ্য যত মহৎ হয়, কর্ম্মও ততই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। কার্য্যের উদ্দেশ্য যথার্থ কল্যাণপ্রদ হইলে নিজের জীবন উন্নত হয়। নিজের অন্তরে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ করা

নিজের অন্তরস্থিত কাম ক্রোধ প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তি সংযত করিয়া ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি বন্ধনপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অন্তরাত্মাকে অসীম আনন্দময় শোক-তাপশূন্য মৃত্যুভয়বিজয়ী নিত্য পরিপূর্ণ জীবনের যোগ্য করাই কর্ম্মের প্রকৃত কল্যাণজনক উদ্দেশ্য। এইরূপ শান্তিময় জীবনকেই আর্য্য ঋষিগণ 'স্বর্গ' বলিয়াছেন—"স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে, কামস্যাপ্তির্জগতঃ প্রতিষ্ঠা ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।" মৃত্যুর কুটিল হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার শোক, তাপ, অভাব, আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব এবং অশান্তির সম্ভাবনা অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন অনন্তযৌবনমণ্ডিত হইয়া সমগ্র বিশ্বের প্রাণের সহিত নিজের প্রাণের প্রেমপূর্ণ মিলন সাধন করিয়া, পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তিই মানবীয় কর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের মানুষ নিজের শক্তি ও অবস্থানুসারে নিয়মানুক্রমে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া জীবনের যেরূপ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, শূদ্রও নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সেই পূর্ণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। অপরের কর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তদপেক্ষায় নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে নিজ নিজ কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলেই প্রত্যেক মানুষ একই লক্ষ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হইতে পারে, একই পরমানন্দ লাভ করিতে পারে।

অবশ্য একথা সত্য যে, সংসারে লৌকিক সুখ-সম্পত্তির ন্যূনাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার মূল্য কতটুকু? অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির তুলনায় লৌকিক সুখ সম্পত্তি অতি তুচ্ছ এবং পরম সত্যের অপেক্ষায় ইহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র! আধ্যাত্মিক সম্পদে সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। ঐ সম্পদ লাভ করিবার জন্য নিজ শক্তি ও অবস্থা অনুসারে হৃষ্টচিত্তে যথাবিধি কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। এই আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক শ্রেণী প্রত্যেক সম্প্রদায় বা সমাজ অপরের কার্য্যে, অন্যের ভোগ বা অপরের মনে প্রতিষ্ঠার প্রতি লোভ না করিয়া সকলের সহিত অস্বস্তিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত না হইয়া, গৌরব ও শ্রদ্ধার সহিত উৎসাহ সহকারে নিজ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিলেই চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্র উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।"

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"

ইহাকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানিয়া লইয়া আর্য্য ঋষিগণ সকল শ্রেণীর সকল নরনারীর জন্য সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মর্ত্ত্য জীবনে স্বর্গীয় জীবনধারা প্রবাহিত করিবার জন্য শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার, পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও সৎকর্ম্মের, রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধিপ্রভৃতির, কৃষি-শিল্পাদির সাহায্যে দেশের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির এবং সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট অনুশীলনের আবশ্যকতা আছে। বংশনীতি, সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি যদি ধর্ম্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলেই ধর্ম্মনীতি একমাত্র আদর্শ হইয়া বিশ্বপ্রেম ও সত্যের সংমিশ্রণে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

আর্য্য বিদ্বান্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, জাতি ও সমাজের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ শক্তি ও সম্পত্তি উৎসর্গ করা দিব্যজীবন প্রাপ্তির উপায়। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরাত্মা সমগ্র জগতের অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন। অতএব সমস্ত সমাজের সেবার জন্য, কল্যাণের জন্য ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার প্রকৃতপক্ষে নিজের অন্তরাত্মারই সেবা, নিজেরই পূর্ণতাপ্রাপ্তির তপস্যা মাত্র। সমগ্র সমাজের ঐহিক স্বার্থের সহিত নিজের আধ্যাত্মিক স্বার্থের কোনই ভেদ নাই। অতএব ত্যাগের দ্বারাও যথার্থ

সম্ভোগের অধিকার লাভ হয়—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" .

নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া আর্য্যঋষিগণ যজ্ঞবিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মানবজীবনে যজ্ঞই মনুষ্যোচিত কার্য্য। তোমার নিকট যাহা কিছু আছে তাহা সমাজের কল্যাণের জন্য বিলাইয়া দাও, তাহা হইলেই সমাজের সহিত নিজের একতা উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং বিশ্বপ্রকৃতি তাহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তোমার প্রার্থনানুরূপ সুন্দর ফল প্রদান করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবে। ইহাই আর্য্যঋষিকথিত যজ্ঞের মূল কথা। মানবসমাজ যখন এই যজ্ঞনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সর্ব্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, দ্বেষ ও সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। যজ্ঞনীতি অনুসরণ করিলে সমাজে সংগ্রামের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়, একই সমাজ-শরীরের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পর প্রেম ও মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক শ্রেণী সমগ্র সমাজ-দেহের অঙ্গরূপে নিজেকে সমাজ হইতে অপৃথক্ মনে করিয়া সমাজের কল্যাণই নিজেদের কল্যাণ বলিয়া উপলব্ধি করে। শক্তি, জ্ঞান, রুচি ও অবস্থার বৈষম্য সত্ত্বেও সকলের ভিতর প্রাণের একতার অনুভূতি হয়। আত্মসুখের প্রবৃত্তি হইয়া যায়।

জীবনকে সার্থক করিবার জন্য মানুষের প্রথমতঃ শক্তি অর্জন ও জ্ঞানের সাধনার প্রয়োজন। প্রথম জীবনে সুযোগ্য শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া সংযমের উচ্চ আদর্শের সহিত জীবন মিশাইয়া দেওয়া দরকার। তাহার ফলে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম সম্পাদনের উপযোগী জ্ঞানবিজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করা যায়। জীবন-প্রভাতের এই সাধনার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা দ্বারা সুস্থ দেহ-মন, সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মসম্পাদনের কৌশল আয়ত্ত করা যায়, জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। ইহার ফলে নিজের সহজাত শক্তি, সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপযুক্ত জ্ঞান লাভ হয় এবং কর্ম্মজীবনে প্রবেশের পথ সহজ হয়। এই কর্ম্মজীবনই গার্হস্থ্য জীবন। এই জীবনে পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। গার্হস্থ্য জীবনেই আধ্যাত্মিক আদর্শ হৃদয়ে রাখিয়া পূর্ব্বকথিত যজ্ঞজীবন বিস্তৃত করিতে হয়। সকলেরই নিজ নিজ অধিকার ও অবস্থা অনুসারে এই কর্ম্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। যাহার হৃদয়ে যজ্ঞের আদর্শ ও উদ্দেশ্য যতখানি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, যে যত বেশী আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহার যজ্ঞ ততখানি সার্থক হয়।

কর্ম্মজীবনের শেষে বিশ্রামের প্রয়োজন। সুতরাং কর্ম্মত্যাগের জন্য—সর্ব্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যেমন কর্ম্মজীবনের যোগ্যতা লাভ করা দরকার, বানপ্রস্থের দ্বারা ঐরূপ সন্ন্যাসের জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়।

সন্ন্যাস আশ্রমে ব্যক্তিগত জীবনের সহিত বিশ্বজীবনের পরিপূর্ণ মিলন সাধিত হয়। এই অবস্থায় নিজ পরিবার, সমাজ এবং জাতির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ঐহিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক বিশ্বপ্রাণের সহিত ব্যষ্টিপ্রাণের, বিশ্বাত্মার সহিত জীবাত্মার ও সমাজাত্মার ঐক্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধনায় রত হইতে হয়। এই সাধনায় সিদ্ধ হইলে মানুষ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। ইহাই পরম সাম্য, পরম শান্তি, পূর্ণজ্ঞান ও পরিপূর্ণানন্দ। ইহাই অমৃতের ক্ষেত্র। এই অবস্থায় মানুষ সকলের ভিতর নিজকে এবং নিজের ভিতর সমগ্র জগতকে প্রতিষ্ঠিত দেখে। ইহাই ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার চরম আদর্শ, ভারতীয় সাধনার প্রধান লক্ষ্য।

সমালোচনা

গীতা ও হিন্দুধর্ম—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ, এম-এ, পিএইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৮৫ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ। ইংরেজী, পাশ্চাত্য দর্শন, অর্থনীতি ও হিন্দুশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। কলেজসমূহে অধ্যাপনাকার্যের অবসর-সময়ে তিনি সাংখ্য ও যোগদর্শন সম্বন্ধে কয়েকখানি সারগর্ভ ইংরেজী গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনার সুফল। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে ইহা গীতা-সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্নরূপে পরিগণিত হইবে।

গ্রন্থকার শাস্ত্রাবলম্বনে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উপনিষৎ, সাংখ্য ও গীতায় চরমতত্ত্ব একই, শাস্ত্রত্রয়ে সাধনার ভেদমাত্র লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মের সনাতন স্বরূপ উপনিষদে ব্যক্ত। হিন্দুধর্মের প্রকৃত পরিচয় বেদে পাওয়া যায়। উপনিষদে যাহা সূত্রাকারে উক্ত তাহাই গীতায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত। অদ্বৈতবাদ হিন্দুধর্মের ভিত্তি—এই সার সিদ্ধান্তে উপনিষৎ ও গীতা একমত। গ্রন্থকার বলেন, "হিন্দুধর্ম কালক্রমে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, তথাপি কোন পরিবর্ত্তন বেদবিরোধী হয় নাই। সুতরাং হিন্দুধর্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণার্থ বেদের আলোচনা সঙ্গতই।"

পুস্তকের শেষের দিকে অবতারবাদ সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন, গীতোক্ত অবতারবাদ প্রচলিত অবতারবাদ হইতে পৃথক্। গীতার অবতারবাদ অদ্বৈতবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আর প্রচলিত অবতারবাদের সঙ্গে বেদতত্ত্বের সঙ্গতি নাই। ভাগবতেও আছে, আত্মতত্ত্বনিগমের জন্যই অবতারের আবির্ভাব হয়। গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের বিভূতি বলা হইয়াছে, অথচ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বা তাঁহার অবতাররূপে সংস্তুত। সুতরাং গীতা প্রচলিত অবতারবাদের সমর্থক নহে। গীতায় অদ্বৈতবাদ ও অবতারবাদের অপূর্ব সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে। উপসংহারে গীতার আলোকে জড়বিজ্ঞানের আপত্তি নিঃশেষে খণ্ডন করা হইয়াছে।

বেদ, সাংখ্য ও গীতার মধ্যে মর্মান্তিক বিরোধ নাই এবং এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে হিন্দুধর্মের স্বরূপ পরিস্ফুট। ইহা সুচারুরূপে এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাবের গভীরতার জন্য ভাষার প্রাঞ্জলতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে। গ্রন্থে অধ্যায়-বিভাগ না থাকায় পাঠক-পাঠিকার পাঠক্লান্তির সম্ভাবনা। আলোচিত বিষয়গুলি পার্শ্বে উল্লিখিত। এই গুলির সূচী গ্রন্থারম্ভে দিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। গীতাসম্বন্ধে বহু গ্রন্থ থাকিলেও ইহা ভাবগাম্ভীর্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত নহে।

জয়তু নেতাজী—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৭৫ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

মোহিত বাবু বর্তমানে বাংলার একজন চিন্তাশীল সাহিত্যিক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এবং

'বাংলার নব যুগ' লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থরাজির মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি ভাবে ও ভাষায় অপূর্ব ও অভিনব।

এই গ্রন্থে তিনি স্বামিজী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং মহাত্মাজী গান্ধীর যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা যেমন মৌলিক, তেমনি সারগর্ভ। গ্রন্থকার নেতাজীকে স্বামিজীর মন্ত্রশিষ্য, উত্তর সাধক বা মানস পুত্র বলিয়াছেন। মোহিত বাবু বলেন, "বিবেকানন্দ যাহাঁকে তত্ত্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আসন্ন ভবিষ্যতের প্রয়োজন চতুর্দিকের মাটীতে বপন করিয়াছিলেন তাহারই একটী বীজ অনতিবিলম্বে অঙ্কুরিত হইয়া নেতাজী নামক বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।" তিনি বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত ভাষ্যরূপে নেতাজীকে দেখিয়াছেন। স্বামিজীর মত স্বদেশপ্রেমিক ভারতবর্ষে আর দেখা যায় নাই। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে স্বদেশপ্রেম প্রচার করিলেন এবং দেখাইলেন, স্বদেশপ্রেম ভগবৎপ্রেমেরই একটী বিশিষ্ট রূপ। স্বামিজীর এই বাণী শুধু ভারতে নহে, জগতেও অভিনব। স্বামিজী যে মহাভারতের বীজ বপন করিয়াছিলেন উহাকেই নেতাজী সাকার করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপাত করিলেন।

সুভাষ-নীতি ও গান্ধী-নীতির তুলনা করিয়া মোহিত বাবু দেখাইয়াছেন, মহাত্মাজীর মনোভাব উনবিংশ শতাব্দীর। স্বামিজী হিন্দুধর্মকে মধ্য-যুগীয় সংকীর্ণতা ও ভাবপ্রবণতা হইতে মুক্ত করিয়া মহাভারতীয় হিন্দুধর্মরূপে প্রচার করিলেন। নেতাজীর জীবনে সেই বীর্যপ্রদ শক্তিধর্মই প্রকটিত। গান্ধীজী পুনরায় আমাদের ধর্মে মধ্যযুগীয় ভাব সংযুক্ত করিলেন এবং কংগ্রেস গান্ধী-ভক্তিকে দেশভক্তির উপরে স্থান দিল। মোহিত বাবু বলেন, "প্রত্যেক মানুষের যেমন জাতিগত, বংশগত ও সমাজগত সংস্কার আছে, গান্ধীজীরও তাহা আছে। যেহেতু তিনি অসাধারণ চরিত্রশক্তিমান পুরুষ সেইজন্য এই সকল সংস্কার তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় স্ফুরিত হইয়াছে। একে ভারতীয় সংস্কারের অধ্যাত্ম-প্রীতি, তাহার উপরে জৈনধর্মের প্রভাব এবং তাহারও উপরে রক্তগত বৈশ্যবুদ্ধি। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, গান্ধী-নীতিই ভারতীয় মনীষার বা সাধনার এক মাত্র তত্ত্ব নহে। উহা একটা আংশিক তত্ত্ব মাত্র, বরং প্রধান চিন্তাধারার বিরোধী।" (৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা) যে কাথিয়াবাড় প্রদেশে গান্ধীজী সঞ্জাত ও শিক্ষিত তথায় জৈন প্রভাব প্রবল। মোহিত বাবুর মতে মহাত্মার অহিংসনীতির মূলে আছে তাঁহার সমাজগত জৈন সংস্কার এবং তাঁহার আপোষ-নীতির মূলে আছে তাঁহার স্বজাতীয় বৈশ্য মনোবৃত্তি। তৎপ্রচারিত অহিংস নীতি হিন্দু-ধর্মানুমোদিত নহে, যুগোপযোগীও নহে।

মোহিত বাবু যে ভাবে গান্ধী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা অপ্রিয় হইলেও অসত্য নহে। নেতাজীর সঙ্গে গান্ধীজীর যে বিরোধ তাহা এই নীতিগত পার্থক্য হইতে উৎপন্ন। বইখানি আমরা বাংলার শিক্ষিত তরুণতরুণীগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। স্বামীজী, নেতাজী ও গান্ধীজীর সম্বন্ধে এই গভীর সমালোচনা ও সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ অতি বিরল।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ছোটদের দাবাখেলা—স্বামী শান্তানন্দ ভারতী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ক্যালকাটা ফটো হাউস, ১৩৪।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১৷৹।

এই পুস্তকখানি ছোটদের জন্য লিখিত। ইহাতে বিলাতী নিয়ম অনুযায়ী দাবাখেলা শিক্ষা করিবার পদ্ধতি বর্ণিত আছে। আমাদের দেশে

দাবাখেলাকে সতরঞ্চ বলে ; ইহার ইংরেজী নাম চেস্ (chess)। গ্রন্থকার পুস্তকের সূচনায় বিলাতী নিয়ম অনুসরণ করিবার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—"এখন জগতে দাবাখেলার যত বড় বড় প্রতিযোগিতা চলে তার বেশীভাগই বিলাতী নিয়মে হয়। আমাদের দেশী নিয়মের চেয়ে বিলাতী নিয়মের দাবাখেলায় অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। তাই দেশী বা ভারতীয় নিয়মের চেয়ে বিলাতী নিয়মে দাবা খেলা সহজ ; এইজন্য প্রথমেই বিলাতী প্রথায় দাবাখেলার কথা বলা হল। এই খেলা শিক্ষার পর আমাদের দেশীয় প্রথার দাবা খেল্‌লে তার জটিলতা বুঝতে তখন আর কোনও অসুবিধা হবে না।" পুস্তকখানিতে বিলাতী খেলা ও দেশী খেলার পার্থক্য ও দোষ-গুণ সচিত্র দেখান হইয়াছে। সাধারণ লোক লেখা ও চিত্র দেখিয়া কিভাবে সহজে দাবাখেলা শিখিতে পারে উহার বিস্তৃত নির্দেশ ইহাতে আছে। বিদেশী প্রথার যাহা ভাল উহা আবশ্যকমত গ্রহণ করিয়া, ভারতীয় প্রথানুযায়ী দাবাখেলার প্রচলন করিলেই দেশী ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় এবং জাতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিসাধনের সহায়তা হয়। 'দাবাবোড়ে' খেলিলে সংসারে অকল্যাণ ঘটে, এজন্য আমাদের দেশের অভিভাবকগণ ছোট ছেলে-মেয়েদের দাবা খেলিতে দেখিলেই কঠোর শাসন-তাড়ন করেন। লেখক আমাদের দেশে প্রচলিত প্রবচনটি—'তাস তামাক পাশা, তিন কর্মনাশা' উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "দাবাখেলা তিন কর্মনাশার অন্তর্ভুক্ত নয় ; দাবাখেলায় সদা-সর্বদা সময় না কাটাইয়া ছোটরা লেখাপড়া, খাওয়া-বসা, দৌড়-ঝাঁপের মত ইহাকেও অন্যান্য কাজের একটি অংশ বলিয়া গ্রহণ করিবে। এই খেলা অনুশীলন করিলে ছোটদের নির্দোষ আমোদের সহিত বুদ্ধি-বিকাশ, স্মৃতি-শক্তি-বর্ধন ও কৈশোরের চপল মনের সংযম-শিক্ষা হইবে।" আলস্য, নিদ্রা, পরনিন্দা, পরচর্চা, তরল খোশগল্প, কুৎসিত সিনেমাচিত্র-দর্শন, কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল নাটক নভেল পাঠ, তাস, পাশা প্রভৃতিতে সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া শুধু অবসর-বিনোদনের জন্য 'ঘরের ভিতরের খেলা' (indoor pastime) হিসাবে দাবাখেলার কিছু উপযোগিতা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু শারীরিক শক্তি-বর্ধক 'ঘরের বাহিরের খেলা'তেই (outdoor game) ছোটদের সমধিক মনোযোগী ও উৎসাহী হওয়া কর্তব্য। কারণ সুস্থ, বীর্যশালী, নির্ভীক, চরিত্রবান্ ও মেধাবী ছেলেমেয়েরাই দেশের একমাত্র বল-ভরসা ও গৌরব।

ভারতের বহু প্রাচীন পুস্তকে দাবাখেলার উল্লেখ দেখা যায়। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে দাবাখেলার তিনখানা মূলগ্রন্থের সাতটি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ তিনখানার নাম—(১) 'বিলাসমণিমঞ্জরী'—রচয়িতা ত্রিবেঙ্গ আচার্য। পেশোয়া বাজীরাও এর আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়। (২) 'সতরঞ্চ-কুতূহলী বা বুদ্ধিবল'—শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই খেলা বিবৃত করিতেছেন, এই ভাবে খেলা বর্ণিত। (৩) 'চতুরঙ্গ রচনা'—রচয়িতা জ্যোতির্বিদ গিরিধর। আলোচ্য পুস্তকখানির ভাষা সহজ, বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গী সুন্দর এবং চিত্রগুলি সযত্ন-অঙ্কিত।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

বোধন—(শ্রীমদ্ভাগবত লীলা ছায়া কাব্য-গীতি)। শ্রীসত্য কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা ও শিক্ষাসংঘ, বর্দ্ধমান। মূল্য—দেড়টাকা।

স্বভাব কবি সত্যবাবুর 'বোধন' কবিতা পুস্তকখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার

সাবলীল ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী, উচ্চাঙ্গের ভাবধারা ও দরদী মনের সংস্পর্শে গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল। ফলতঃ ভাগবতের মধুর রসের মাধুর্য্যে এই লীলা-চিত্রটি অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, রস-পিপাসু সুধী-সমাজে ইহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে। বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রভূত পরিচলন বাঞ্ছনীয়।

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম্-এ

সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম—বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত; বজ্‌বজ্‌ (২৪ পরগণা) বিবেকানন্দ সংঘ হইতে প্রকাশিত। ৯৬ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা মাত্র।

বর্তমানে আমাদের দেশে শরীরচর্চা ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষ যৌগিক ব্যায়ামের জন্মভূমি, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় এই দেশেই ইহার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে না। সাধারণ ব্যায়ামের তুলনায় যৌগিক ব্যায়াম যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ তাহা শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকখানিতে অতি চিত্তাকর্ষক ভাবে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিভিন্ন যৌগিক ব্যায়ামের বিধিও এত সরলভাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে যে, কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতিরেকেও আসনগুলির অভ্যাস দুষ্কর হইবে বলিয়া মনে হয় না। 'মন ও স্বাস্থ্য' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত সুলিখিত ও তথ্যবহুল। বইখানির শেষ দিকে বিভিন্ন আসনের কয়েকখানি চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক প্রশান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই এই পুস্তকখানি নিত্যসঙ্গী হওয়া উচিত।

Vedic Culture—By Swami Mahadevananda Giri. Published by the University of Calcutta. Pages XIII+448. Price rupees seven & annas eight only.

বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ এযাবৎ যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। এই সুবিশাল কৃষ্টির স্বরূপ ও প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করিতে যাইয়া তাঁহাদের মধ্যে মতভেদও নিতান্ত কম হয় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৈদিক ঐতিহ্যকে তাহার প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থকার কেবলমাত্র বৈদিক সাহিত্য-নিষ্ণাত নন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোচনাশৈলীর সহিতও পরিচিত। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে যে বৈদিক সংস্কৃতির অনবদ্য সুন্দর অশেষ মহিমময় রূপ ধরা পড়িবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মনে করেন বেদমন্ত্র অদ্বৈত-ব্রহ্মপর। প্রাচীন ভারতে গোমাংস-ভক্ষণ প্রচলিত ছিল বলিয়া গ্রন্থকার মনে করেন না। তাঁহার মতে বৈদিক আর্যগণের আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ নহে, ভারতবহির্ভূত সুমেরু প্রদেশ। গ্রন্থকারের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত অকাট্য যুক্তি ও অসংখ্য বেদমন্ত্রের উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত। পরিশিষ্ট-প্রদত্ত বিভিন্ন মণ্ডলোক্ত ঋষি-নামের সুদীর্ঘ তালিকা গবেষণাকার্যে বিশেষ সহায়ক হইবে। "The Devotional Practices of Modern Times" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শুদ্ধিপত্রে আরও কয়েকটি অশুদ্ধির উল্লেখ বাদ পড়িয়াছে। বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-এর পার্থক্য স্থানে স্থানে রক্ষিত হয় নাই। মোটের উপর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভ্রান্ত মত-নিরসনে এবং বেদের যথার্থ পরিচিতি-প্রদানে সাহায্য করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে :—

আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন ষোড়শোপচারে পূজা এবং সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাংগণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দজী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী এবং সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় আসানসোল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন শাস্ত্রী, স্বামী পূর্ণানন্দজী ও সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় দিন স্থানীয় কয়লা-খনির মালিক শ্রীযুক্ত দামজী খেলাভাই পারমার মহাশয়ের সভাপতিত্বে আশ্রম-পরিচালিত হাইস্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। ছাত্রদের আবৃত্তি এবং আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠের পর স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দজী ও স্বামী পূর্ণানন্দজী ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে ছাত্রগণ কর্তৃক 'চিতোর-গৌরব' নামক একখানি নাটিকা ও 'শহরে-বোমা' নামক একটি প্রহসন অভিনীত হয়।

টাকী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কিছু দিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, ভজন, কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্নে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন। আশ্রম-সম্পাদক স্বামী দয়ানন্দজী কর্তৃক আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে বসিরহাটের কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর বেলুড় মঠের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী এবং স্বামী ভূতেশানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতির অভিভাষণান্তে সভার কার্য শেষ হয়। পরদিন সন্ধ্যায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ "সভ্যতার অভিশাপ" ও "অভিমন্যুবধ" নামক দুইটি নাটক অভিনয় করে।

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠার ষড়বিংশ বার্ষিক মহোৎসব গত ২৮শে বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর পবিত্র জন্মভূমিতে এই প্রতিষ্ঠানের ষড়বিংশ বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজা, ভোগ, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনেক

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও দরিদ্র-নারায়ণগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসব উপলক্ষে বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল। বৈকালে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে এক সভায় শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীমন্দির পুষ্প, পত্র, পতাকা এবং আলোক-মালায় বিশেষভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিক, স্তোত্রপাঠ, ভজন, কীর্তন এবং ঐকতান-বাদন হইলে উৎসবের কার্য পরিসমাপ্ত হয়।

উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি (সানফ্রান্সিস্কো)—এই প্রতিষ্ঠানে গত এপ্রিল মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী এবং তাঁহার সহকর্মী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী প্রতি রবিবার ও বুধবার "ব্রহ্মবিদ্যা", "আত্মার তমিস্রা রজনী", "ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিও না—প্রত্যক্ষ কর", "কাল হইতে অনন্ত কাল পর্যন্ত", "স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ", "আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুধারণা", "আত্মানুসন্ধান", "পুনর্জন্ম কি সত্য?"—এই কয়টি বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় বেদান্ত সোসাইটির প্রেক্ষাগৃহে সদস্য ও ছাত্রগণকে ধ্যান ও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছেন।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ—গত ২৯শে বৈশাখ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন। সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দজী তাঁহাকে সারদাপীঠের বিভিন্ন বিভাগ দেখান। বিদ্যামন্দিরের (কলেজ) ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, "আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকাস্থিত বহু কেন্দ্র দেখিয়াছি এবং সংঘের অনেক স্বামীজীকেই ব্যক্তিগতভাবে জানি। রামকৃষ্ণ মিশন প্রচারিত আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মহান্ আদর্শ স্বাধীন ভারতের নবজাগ্রত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে বাধ্য। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন নিছক ধ্যানপরায়ণ জীবন ক্লিষ্ট মানবজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে পারিবে না। ইহা এক প্রকার সংকীর্ণতা এবং ইহাই অন্যায়রূপে বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মনকে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়াছে। দুর্বোধ্য ধ্যানপরায়ণতার শক্তিকে সেবার কার্যকারিতায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, স্বাধীন ভারতে জাতির সেবার জন্য বহু সংখ্যক নিঃস্বার্থ সেবকের প্রয়োজন—যাঁহারা তাঁহাদের কার্য দ্বারা আমাদের মাতৃভূমির মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন, কিন্তু সরকারী চাকরী করিয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করিবেন না। ত্যাগ ও সেবার যে গৌরবময় আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষায় পরিস্ফুট হইয়াছে উহাই বিদ্যা-মন্দিরের ছাত্রগণকে মহতী সার্থকতার দিকে পরিচালিত করিবে।"

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সফর ও বক্তৃতা—গত মার্চ হইতে মে পর্যন্ত তিন মাস বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাংলা প্রদেশের কতিপয় অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া ২৮টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়-প্রার্থী শিবির পরিদর্শন উপলক্ষে 'বালক-বালিকার আদর্শ', কনখল-হরিদ্বারে 'শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য', গয়া কলেজে 'ভারতীয় কৃষ্টির পাশ্চাত্য বিজয়', গয়া টাউন হলে 'শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান', আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে 'কর্মজীবনে ধর্ম', আসানসোল কলেজে 'বর্তমানের প্রয়োজন,' আসানকোল জাম্বাদ কলিয়ারীতে 'সনাতন ধর্মের মূলনীতি' সম্বন্ধে হিন্দী ও ইংরেজীতে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তৎপর তিনি পূর্ববঙ্গে বানরী (বিক্রমপুর) হাই স্কুলে 'মানুষ হ'বার উপযোগী শিক্ষা', সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 'বিশ্বসমস্যার

সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যায় নারীজাতির কর্তব্য', পানাম গ্রামে 'বর্তমান সমস্যায়' ধর্মের স্থান', সোনার গাঁ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে 'জাতি-সংগঠনে একতা এবং ভগবানের অস্তিত্ব', নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে 'সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ', ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 'বর্তমানে নবীন ভারতের কর্তব্য', 'ভারতীয় নারীর আদর্শ'', 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যার সমাধানে ভারতীয় কৃষ্টি', ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে 'রবীন্দ্রনাথের অবদান', ঢাকা আনন্দ আশ্রমে 'বর্তমান সমস্যায় নারী জাতির কর্তব্য', কুমিল্লা মহেশ প্রাঙ্গণে 'বর্তমানে জনগণের কর্তব্য', কিশোরগঞ্জ কালীবাড়ীতে 'বর্তমান সমস্যার সমাধান', বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে 'শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় নারীর আদর্শ'', বরিশাল জগদীশ আশ্রমে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান ও বিশ্ববাসীর কর্তব্য', কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে 'বর্তমানে আমাদের কর্তব্য', এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারস্থ বেঙ্গল থিওসফিক্যাল হলে 'বিশ্বসমস্যা-সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান' সম্বন্ধে বাংলায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ রোড, মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ (যুক্তপ্রদেশ)।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনী ও উপদেশ। ২৯৭ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ—সুসাহিত্যিক এবং কবি শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ গত ১৮ই মে কালিমপং-এ শ্রীযুক্ত অনাদি মিত্রের বাসভবনে ৬০ বৎসর বয়সে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি কালিমপং গিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ মহাশয় ভারত সরকারের রাজস্ববিভাগে উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁহার বাসস্থান ছিল।

কান্তিবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 'ওমর খৈয়ামের রুবায়েতের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন এবং ইংরেজী ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী নাটকের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা তিনি অতি সুন্দরভাবে অভিনয় করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বাঙলাদেশের তদানীন্তন ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সম্পাদকের কার্যে তিনি বহু বৎসর নিযুক্ত ছিলেন; ঐ কার্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসেন

এবং শান্তিনিকেতনে নিজস্ব ভবনে বাস করিতে থাকেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র সাহিত্যের তিনি অধ্যাপক ছিলেন এবং ওখানকার সকল প্রকার অনুষ্ঠানে অতি উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন।

কান্তিবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পত্নী এবং আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে ঃ

কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৯শে ও ২০শে বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন পূজা, পাঠ, হোম ও প্রসাদবিতরণ হয়। সন্ধ্যায় কোচবিহারাধিপতি শ্রীজগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ-বাহাদুরের সভাপতিত্বে আহূত এক মহতী সভা হয়। সভাপতির অভিভাষণের পর বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দজী এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় ধর্মের যথার্থ স্বরূপ কি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য কি ভাবে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করেন। প্রায় চার পাঁচ হাজার নরনারী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আর একটি সভায় স্বামী জপানন্দজী ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন এবং বাণী কিরূপে জাতীয় জীবনে কার্যকরী হইতে পারে এবং ইহা দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুবিধ সমস্যার মীমাংসা করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। কুমারী জয়ন্তী বক্সী, সুজাতা বক্সী, মঞ্জু মুখোপাধ্যায় এবং গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন এবং সমাপ্তি সঙ্গীত অতি মনোহর হইয়াছিল।

যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধ-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রী-ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা ও প্রসাদ বিতরণ হয়। বৈকালে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। ইহাতে বালক-বালিকাগণের গান ও আবৃত্তি হইলে দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার ও সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

লালমনির হাট (রংপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৯ই বৈশাখ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, অষ্টপ্রহর শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-কীর্তন, নগর-পরিক্রমা ও প্রসাদ-বিতরণ হইয়াছে। এই উৎসবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আঠারবাড়ী (ময়মনসিংহ)—গত ১৬ই ও ১৭ই বৈশাখ স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে যুবক-সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, চণ্ডীপাঠ, অষ্টপ্রহর কীর্তন, ভজন, বাউল সঙ্গীত ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দজী যুবকগণকে সময়োপযোগী উপদেশ প্রদান করিয়া বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন।

সেনহাটী (খুলনা)—গত ১৯শে বৈশাখ স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও অধিবাসীদের উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব

অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ হইলে অপরাহ্ণে বেলুড় মঠের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী সুধানন্দজী মধুর ভজন-সঙ্গীত দ্বারা সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দেন। পরদিন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী সেনহাটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

ইতঃপূর্বে সেনহাটী গ্রামের অধিবাসীদের উদ্যোগে ৺শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব-উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, দরিদ্র-নারায়ণদের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ হয় এবং অপরাহ্ণে এক ধর্মসভায় 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পার্শ্ববর্তী মহেশ্বরপাশা গ্রামেও অনুরূপ একটি সভায় উক্ত স্বামীজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী—এই প্রতিষ্ঠানে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বৌদ্ধ পূর্ণিমা দিবসে স্বামী সুন্দরানন্দজী "মহাযান ও হীনযান" এবং শ্রীযুক্ত রজনীকুমার দত্তগুপ্ত "বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক মীরাবাঈ-ভজন গীত হয়। থিওসফিক্যাল হলে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী "বিশ্বসমস্যা-সমাধানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ফলহারিণী কালীপূজা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুষ্ঠিত ষোড়শীপূজা স্মরণে বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দজী "নারীজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভারত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক "শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রণাম" গীত হয়। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা সভায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত", "শিবানন্দ-বাণী", "গীতা" এবং "কঠোপনিষদ্" ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

জাতীয় সামরিক শিক্ষার্থী বাহিনী—ভারত গবর্নমেণ্ট স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের লইয়া যে জাতীয় সামরিক শিক্ষার্থী বাহিনী গঠন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী জুনিয়ার ডিভিশনে পদাতিক শাখারূপে স্কুলের ছাত্রদের এবং সিনিয়র ডিভিশনে পদাতিক শাখা, সিগন্যাল শাখা, ইঞ্জিনীয়ারিং শাখা এবং মেডিকেল শাখারূপে কলেজের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাদান-কার্য আগামী জুলাই মাস হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শিক্ষার্থী বাহিনীতে মহিলা শাখায় ছাত্রীদের সামরিক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা এক্ষণে করা হয় নাই। শিক্ষার্থী বাহিনীর সিনিয়র ডিভিশনে বিভিন্ন শাখায় কেবল কলেজের ছাত্রদিগকে সামরিক শিক্ষা দান করা হইবে। আর জুনিয়ার ডিভিশনে মাত্র পদাতিক শাখায় শুধু স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদেরই গ্রহণ করা হইবে। সিনিয়র ডিভিশনে উপরোক্ত ৪টি শাখা ব্যতিরেকে অন্যান্য শাখা খোলার পরিকল্পনা পরে কার্যকরী করা হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ।

এতদনুসারে কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের নির্দেশে পশ্চিম বঙ্গ গবর্নমেণ্ট এক্ষণে জুনিয়ার ডিভিশনে ৯০ জন শিক্ষার্থী লইয়া এক একটি শাখা গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; উক্ত শাখার আবার ৩০ জন শিক্ষার্থী লইয়া ৩টি উপশাখা

থাকিবে এবং স্কুলের শিক্ষকদের মধ্য হইতে ঐ তিনটি উপশাখার জন্য তিন জন অফিসার নিয়োগ করা হইবে। আর সিনিয়ার ডিভিশনে এক একটি শাখা ৬০ জন কলেজ-শিক্ষার্থী লইয়া গঠিত হইবে; ঐ শাখার ৩০জন শিক্ষার্থী লইয়া ২টি করিয়া উপশাখা থাকিবে এবং কলেজের অধ্যাপকদের মধ্য হইতে দুই জন অধ্যাপককে ঐ দুইটি উপশাখার অফিসাররূপে গ্রহণ করা হইবে। স্কুল ও কলেজগুলির শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এই সব শাখা অফিসার বাছাই করিয়া তাহাদের উত্তমরূপে সামরিক শিক্ষাদান করিবার পর শিক্ষার্থী বাহিনীর বিভিন্ন শাখার স্কুল কলেজের ছাত্র শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে।

এক্ষণে পশ্চিম বঙ্গ গবর্নমেণ্ট জুনিয়ার ডিভিশনের পদাতিক বাহিনীগুলির জন্য ১০০ জন অফিসার (স্কুল শিক্ষক) গ্রহণ করিবেন; তন্মধ্যে ৬১ জনকে কলিকাতার বিভিন্ন স্কুল হইতে এবং ৩৯ জনকে মফঃস্বলের স্কুলগুলি হইতে গ্রহণ করা হইবে। আর সিনিয়ার ডিভিশনে পদাতিক বাহিনীর জন্য ৪৫ জন অফিসার (কলেজ অধ্যাপক), সিগন্যাল শাখার জন্য ২জন অফিসার, ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার জন্য ২জন এবং মেডিক্যাল শাখার জন্য ২জন অফিসার গ্রহণ করা হইবে। সিগন্যাল ইউনিটের অফিসারদ্বয়কে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে, ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার ২জন অফিসারকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে এবং মেডিক্যাল শাখার ২জন অফিসারকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হইতে গ্রহণ করা হইবে। পদাতিক শাখার ৫৫ জন অফিসারের মধ্যে ২৫ জনকে কলিকাতার কলেজগুলি হইতে এবং ২০ জনকে মফঃস্বলের কলেজগুলি হইতে গ্রহণ করা হইবে।

যাহাতে অপেক্ষাকৃত উত্তম ধরনের লোক পাওয়া যায়, তজ্জন্য গবর্নমেণ্ট যে সংখ্যক অফিসার লওয়া হইবে তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক লোককে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সিনিয়ার ডিভিশনের সিগন্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিক্যাল শাখাগুলির অফিসারগণের শিক্ষাদান কার্য আগামী ১৫ই মে তারিখ হইতে যথাক্রমে মেয়ো (মধ্য প্রদেশ), রুরকী ও লক্ষ্ণৌয়ে আরম্ভ হইবে। সিনিয়ার ডিভিশনে পদাতিক শাখার অফিসারদের শিক্ষা সমাপ্ত হইতে তিন মাস এবং জুনিয়ার ডিভিশনের অফিসারদের শিক্ষা সমাপ্ত হইতে ২ মাস লাগিবে। তবে সিনিয়ার ডিভিশনে সিগন্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার অফিসারদের ৪ মাস শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যাহারা ইতঃপূর্বেই ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্সের অফিসার ছিলেন তাঁহাদিগকে ৩ সপ্তাহকাল স্বল্পকালীন শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। জুনিয়ার ডিভিশনে অফিসারদের বয়স সাধারণতঃ ২৩ হইতে ৩৮ বৎসর এবং সিনিয়ার ডিভিশনের অফিসারদের বয়স ২৫-৩৮ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে। জুনিয়ার ডিভিশনের ১শত জন অফিসার শিক্ষান্তে ৩ হাজার স্কুল শিক্ষার্থীর এবং সিনিয়ার ডিভিশন পদাতিক শাখার ৪৫ জন অফিসার ১৩৫০ জন কলেজ শিক্ষার্থীর সামরিক শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী দল গঠন—পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী দল গঠন করিতেছেন, কাঁচরাপাড়ায় সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রে তাহার প্রথম দলে পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব সীমান্তবর্তী ছয়টি জেলার প্রায় এক হাজার গ্রামবাসীর শিক্ষাদান-কার্য আরম্ভ হইবে। এই দলের শিক্ষাদান-কার্য দুই মাসকাল চলিবে এবং রক্ষী দলের স্বেচ্ছাসেবকগণকে অন্যান্য

সহ অগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাও দেওয়া হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট এই বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী দলটি গঠন করিতেছেন। জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগনা সীমান্তবর্তী এই ছয়টি জেলার প্রায় সাড়ে তিন শত গ্রামের অধিবাসী-দের মধ্য হইতে প্রায় ছয় হাজার গ্রামবাসীকে এই বৎসর বাছাই করিয়া একমাত্র তাহাদিগকে এই বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী দলের সভ্যরূপে গ্রহণ এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হইবে; অন্য কোন অঞ্চলের অধিবাসীকে এই রক্ষী বাহিনীতে গ্রহণ করার পরিকল্পনা নাই। এই রক্ষী দল সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান হইবে। এক বৎসরে এই বাহিনীকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং সভ্যগণের পোষাক পরিচ্ছদ ও হাত খরচা বাবদ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় লাগিবে; এই ব্যয় পশ্চিম বঙ্গ সরকারই বহন করিবেন। রক্ষী দলের জন্য সভ্য-নির্বাচন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, স্থানীয় ব্যবস্থা পরিষদ সদস্য ও জেলা কর্তৃপক্ষের মনোনীত অপর একজন বে-সরকারী সদস্য লইয়া একটি করিয়া জেলা কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রথম দলে যে এক হাজার গ্রামবাসীকে গ্রহণ করা হইতেছে উক্ত সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটিগুলি ইতো-মধ্যেই তাহাদিগকে চূড়ান্তরূপে নির্বাচন করিয়া-ছেন। এই সব নির্বাচিত লোককে শিক্ষাদান করিবার জন্য ৪৮ জন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন বাঙ্গালী সদস্যকে কলিকাতার একটি নিয়মিত পদাতিক সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কিছু গুর্খাও আছেন। কাঁচড়াপাড়ার রক্ষী দলের শিক্ষাদানের জন্য যে কেন্দ্র হইয়াছে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট শীঘ্রই সেই কেন্দ্রের জন্য একজন কমাণ্ডাণ্ট নিয়োগ করিবেন। প্রথম দলে ১৭ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের যুবক গ্রামবাসীদের এই শিক্ষা দিবার জন্য নির্বাচন করা হইয়াছে। রক্ষী দলের সভ্যগণ সম্পূর্ণ জেলা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করিবে এবং তাহারা সীমান্ত এলাকাগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং পশ্চিম বঙ্গ পুলিশের অতিরিক্ত সাহায্যকারী রূপে জেলা কর্তৃপক্ষগণের কার্যে সাহায্য করিবে। রক্ষী দলের সভ্যগণকে পোষাক ও আবশ্যক ব্যয় দেওয়া হইবে। তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকিবে এবং প্রয়োজনের সময় ঐগুলি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। রক্ষী দলের লোকেরা জলপাইগুড়ির উত্তর-পূর্ব হইতে ২৪ পরগনার সন্দেশখালীর দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩৫০টি সীমান্তবর্তী পল্লী অঞ্চলে কাজ করিবে।

উদ্বোধন

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Math
P.O. Belur Math, Dt. Howrah
25. 3. 1931

শ্রীমান চন্দ্র,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বেশ ত তুমি ৺বীরেশ্বর শিবের ছবির চেষ্টায় আছ এবং শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। যত সত্বর হয় পাঠাইয়া দিও। শুধু ৺বীরেশ্বরের স্তোত্র পড়িয়াই আমার তাঁহার মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই। ইহার সঙ্গে একটা বেশ বহুকালের association (allusion) জড়িত রহিয়াছে তাহা তোমার জ্ঞাতার্থ লিখিতেছি—তুমি জানিলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিবে এবং হয়ত ভাবিবে যে আমরা একেবারে সাধারণ পদবীর নই—অসাধারণত্বও কিছু আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুরের বাগানে ছিলেন এবং স্বামিজী প্রমুখ আমরা সকলে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতাম, সে সময় আমাদের একটা বড় মশারির মধ্যে শুইতে হইত। আমি স্বামিজীর পাশে শুইয়াছিলাম—রাত্রে চমৎকার এক স্বপ্ন দেখিলাম—দেখিলাম যে স্বামিজীর শরীরের চারিদিকে ও আশে পাশে এবং আমার চারিদিকে সব ৺বীরেশ্বর শিবের ন্যায় ৺শিবের বালমূর্ত্তি বেড়াচ্ছেন, আমি তখন ভাবছি—এ আবার কি! তার কিছুকাল পর ৺বীরেশ্বর শিবের স্তোত্র পড়ে যখন মিলে গেল তখন বুঝলুম যে স্বামিজী ত ৺কাশীতে ৺বীরেশ্বরের কাছে মানত করার পরে জন্মগ্রহণ করেন, আর তিনিই ত স্বয়ং শিব। আমারও তাই—বাবা ৺তারকেশ্বরের কাছে মেনেছিলেন—তাই জন্ম হওয়ার পর ৺তারকেশ্বরের নামানুকরণে তারকনাথ নাম হয়েছিল। ঐ স্বপ্নে আরও মনে দৃঢ় ভাব জাগিল যে আমাদের মধ্যে নিশ্চয় ৺শিবের অংশ আছে। এই কথা, আর কিছু নয়। তোমার জানবার জন্য লিখিলাম—তুমি এতে সুখী হবে। এখনত আর ৺কাশীধামে যেতে পার্ব্ব না। আর যাওয়ার আমার দরকার তেমন নাই। তবে ৺বীরেশ্বরের স্তোত্রটী শুনলেই ঐ কথা মনে পড়ে এবং সেই সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে খুব ইচ্ছা হয়। ৺বীরেশ্বর মহাদেব আমি পূর্ব্বেও দেখেছি—তবে ৺শিবের মাথায় সাপ আছে কিনা এইটী আমার মনে ছিল না।

অধিক কি লিখিব। আমি সুবিধামত তোমাকে ভাল ২ খানা দশমহাবিদ্যা ও দশাবতারের ছবি পাঠাইয়া দিব। বেশ ভাল ছবি পাঠাইবার ইচ্ছা আছে। তুমি একদিন গাড়ী করিয়া বাবা ৺ বিশ্বনাথের ও মা শ্রীশ্রী ৺ অন্নপূর্ণার বাড়ী যাইয়া দর্শনাদি করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়া আসিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম।

আমার শরীর একপ্রকার চলিতেছে—একটু ভাল, একটু মন্দ। আজ তত খারাপ কিছু নয়। কাল রাত্রে একটু ঘুম হয়েছে। মঠের আর সব মঙ্গল। তোমাদের সকলের ও তোমার কুশল সংবাদদানে সুখী করিবে। তুমি এবং আশ্রমস্থ সকলে ও ভক্তগণ আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। মন্দিরের কাজ বেশ হচ্ছে জেনে আনন্দিত হইলাম। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

Ramakrishna Advaita Ashrama
Luxa, Benares City.
8. 4. 07.

প্রিয় যতীন বাবু, *

তোমার প্রেরিত বরদা বাবুর অতি সুন্দর বক্তৃতা গ্রন্থখানি পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি এবং ইহার আয় যে সেবাশ্রমে দেওয়া হইয়াছে ইহাতে আরো অধিক আনন্দ হইয়াছে। আশা করি, তুমি এখন শারীরিক সুস্থ আছ এবং বাটীর অন্য সকলেও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্ত হইয়াছে। ঢাকায় ঠাকুরের বিষয় চর্চ্চা হইতেছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হয় এবং কৃতবিদ্য লোকেরা এরূপ আগ্রহ সহকারে তাঁর বিষয় চর্চ্চা করিলে অপরের অনেক ভরসা হয়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন অপরে তাঁহাদের অনুসরণ করে।

তোমরা এখানকার Free School for poor Hindu Boys সম্বন্ধে একটু মনে রাখিও, ইহাতে এখানে অনেক দরিদ্র বালক কিঞ্চিৎ বিদ্যা লাভ করিতেছে। কতকগুলি বেঞ্চ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে—তোমরা ঠাকুরের এসব কার্য্যে সহানুভূতি কর এই জন্য তোমাকে লিখিতেছি। স্বামিজীর এসকল কার্য্য বড়ই প্রিয়। ১ম ধর্ম্মদান, ২য় বিদ্যাদান, ৩য় প্রাণদান, ৪র্থ অন্নদান—কলিতে এই দানধর্ম্মই প্রধান। ৺ কাশীতে ঠাকুরের এই চার প্রকার কার্য্য কিছু কিছু হইতেছে এবং আরো হইবে। আশা করি, তোমরা সহায় হও। আমার আশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জানিও।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

* ঢাকার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র দাসের নিকট লিখিত

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ

সম্পাদক

'পারমার্থিক' শব্দের মানে—পরম (শ্রেষ্ঠ) ধর্মবিষয়ক এবং 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ—ব্যবহারসম্মত বা প্রয়োগসিদ্ধ, অর্থাৎ সত্য ধর্ম ও ন্যায়সঙ্গত না হইলেও যাহা ব্যবহার-ক্ষেত্রে প্রচলিত। সর্বত্র দেখা যায়—মানুষের ব্যবহারিক জীবন পরমার্থসম্মত হইতেও পারে এবং না-ও হইতে পারে। যাঁহারা পরমার্থের মূল্য বা উপযোগিতা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবন পরমার্থসম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, যাঁহারা পরমার্থের মূল্য বা উপযোগিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবন পরমার্থসম্মত না হওয়া অসঙ্গত অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, অধিকাংশ হিন্দুই পরমার্থকে তাঁহাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও ব্যবহার-ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে প্রকাশ্য ভাবে পরমার্থের বিপরীত আচরণ করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহারা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই যে এইরূপ করিয়া থাকেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন কোন সত্যসন্ধ ব্যক্তি তাঁহাদের এই দুর্বলতা স্বীকার করেন, কিন্তু অধিকাংশ নরনারীই ব্যবহারিক ধর্মের দোহাই দিয়া তাঁহাদের এই দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত যুক্তি দেখান। এই শ্রেণীর অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই হিন্দুসমাজে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ স্বীকৃত ও প্রচলিত।

কিন্তু হিন্দুদের পারমার্থিক কোন শাস্ত্র এই ভেদ সমর্থন করেন না। বেদ উপনিষৎ গীতা ভাগবত প্রভৃতি পারমার্থিক শাস্ত্র দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সকল নরনারীকেই পরমার্থের নির্দেশে তাহাদের সমগ্র জীবন পরিচালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—পরমার্থকে বৃদ্ধ বয়সের বা পরকালের কর্তব্য বলিয়া ফেলিয়া রাখিতে অথবা ইহজীবনে ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণ করিতে বলেন নাই। 'কেনোপনিষৎ' বলেন, "এই শরীরেই ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরমার্থ লাভ হয়, আর এই শরীরে জ্ঞান লাভ না হইলে মহা অনিষ্ট হয়।"[১] যিনি ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমার্থ লাভ করেন, তিনি সকল জীবকে আপনারই আত্মার বহুরূপ বলিয়া সন্দর্শন করেন। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যিনি পরব্রহ্মকে সর্বভূতে সমভাবে এবং নশ্বর বস্তুতে অবিনাশী রূপে অবস্থিত দর্শন করেন, তিনিই সম্যকদর্শী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী।"[২] এই অবস্থায় উপনীত হওয়াই হিন্দুর সকল শাস্ত্র-মতে পারমার্থিকতার সর্বোচ্চ আদর্শ। হিন্দুগণ এই পারমার্থিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু দুঃখের বিষয়—তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার বিপরীত আচরণ করিতে দেখা যায়।

নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ নিত্য ঋগ্বেদে পাঠ করেন,

১ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
— কেনোপনিষৎ, ২।৫

২ সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
—গীতা, ১৩।২৮

"তোমাদের সঙ্কল্প সমান, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান এবং তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হউক। যাহাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তাহাই হউক।"[৩] হিন্দু পণ্ডিত উপনিষৎ-অবলম্বনে শিক্ষা দেন, "সকল ভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরাত্মারূপে এক সর্বব্যাপী পরমেশ্বরই বিদ্যমান।"[৪] হিন্দুধর্ম-প্রচারক 'ভাগবতের' আসনে বসিয়া বলেন, "ঈশ্বর জীবরূপে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এই জ্ঞানে বহু মান প্রদান করিয়া সকলকে প্রণাম করিবে।"[৫] এই মহান উপদেশ সমর্থন করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার করেন, "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।" এইরূপে হিন্দুধর্মশাস্ত্র-মাত্রই মানুষে মানুষে ঐক্য, আত্মার দিক দিয়া সকল জীবের একত্ব এবং জীবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাহাত্ম্য যেরূপ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, এরূপ আর পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্র করেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, অতি মুষ্টিমেয় হিন্দুই তাঁহাদের সামাজিক সাংসারিক ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই অত্যুচ্চ পারমার্থিক ভাব কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। অধিকাংশ হিন্দুই ধর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলেন—'জীবই শিব'—'নরই নারায়ণ', কিন্তু সমাজক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াই বলেন—'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না'। হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্মজীবন বা পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক তথা ব্যবহারিক জীবনের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়—এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দেখিয়াও দেখিতেছেন না, জানিয়াও জানিতেছেন না এবং বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না যে, "ইহার তুল্য চরম ভণ্ডামি আর হইতে পারে না।

হিন্দুজাতির এই বিসদৃশ আচরণ দেখিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্মের ন্যায় কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্মও এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মতদ্বারা সর্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।" অন্যত্র তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শুন, সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম ত শিখাইতেছেন জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আত্মার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।"

উদ্ধৃত বাক্যে স্বামী বিবেকানন্দ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদকে আত্মাভিমানী ভণ্ডদের আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই শ্রেণী তাঁহাদের মতবাদের সমর্থনে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তৎসম্বন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছেন, "যখন লোককে বলা যায়, তোমাদের শাস্ত্রে আছে—সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া ও কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এই ভাব কার্যে পরিণত করিবার কিছুমাত্র

৩ সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥
—সংজ্ঞানসূক্তম্, ১০। ৯১। ৪

৪ একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১

৫ মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।
—ভাগবত, ৩।২৯।৩৪

চেষ্টা না করিয়া উত্তর দেয়—পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসা রহিয়াছে।"

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদের সমর্থনে অনেকে বলেন, 'পারমার্থিক ভাব—সমদৃষ্টি—সমদর্শন—নর-মাত্রকেই নারায়ণ জ্ঞানে সম্মান-প্রদর্শন অতি উচ্চ পারমার্থিক অবস্থা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপযোগী; আমরাও যখন তাঁহাদের ন্যায় মহাপুরুষ হইব, তখন ঐরূপ করিব, এখন ব্যবহারক্ষেত্রে অত উচ্চ ভাব অবলম্বন করিলে আমাদের চলিবে না!' কিন্তু ইঁহারা একবারও তলাইয়া দেখেন না যে, যাহাকে তাঁহারা উচ্চ আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, কার্যতঃ ইহার উল্টা পথে চলিতে থাকিলে, ঐ স্থানে পৌঁছান তাঁহাদের পক্ষে কোন কালেও সম্ভব হইবে না। পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে পশ্চিম দিক কি কখনও নিকটবর্তী হয়? অসাম্যের সহায়ে সাম্য, বিরোধের আশ্রয়ে মিলন, অনৈক্যের সাহায্যে ঐক্য, অসংযমের সহায়তায় সংযম, অধর্মের পথে ধর্ম কি কখনও হইতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়?" সুতরাং পারমার্থিকতা যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য তাঁহাদের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে উহার বিপরীত পথে চলা একেবারেই অযৌক্তিক।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্যবহারক্ষেত্রে ভেদ স্বীকার না করিলে হিন্দু-সমাজের চাতুর্বর্ণ্য দাঁড়াইবে কোথায়? উত্তরে বলা যায়—হিন্দুসমাজের চাতুর্বর্ণ্য-ব্যবস্থায় ভেদ বা ভোগাধিকার-বৈষম্যের কোন স্থান নাই। দেখা যায়—পৃথিবীর সর্বত্র মানব-সমাজ গুণ ও কর্মানুসারে কোন না কোন আকারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত। সকল দেশেই গুণ ও কর্মানুসারে এক শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মণ, এক শ্রেণীর লোক ক্ষত্রিয়, এক শ্রেণীর লোক বৈশ্য এবং এক শ্রেণীর লোক শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। সমাজ-পরিচালনের জন্য এই চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া জীবিকার্জন করা সকল দেশের অধিবাসিগণের পক্ষেই অপরিহার্য। এই গুণগত ও কর্মগত ভেদ অতিক্রম করা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত ও মূর্খে ভেদ, শিক্ষক ও ছাত্রে ভেদ, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞে ভেদ, স্বাস্থ্যবান ও রুগ্নে ভেদ, পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃতে ভেদ, সংযমী ও অসংযমীতে ভেদ প্রমুখ বহুবিধ ভেদ অনতিক্রমণীয়। কিন্তু এই ভেদগুলি আছে বলিয়াই মানব-সমাজে মানুষে মানুষে কোন বিষয়ে জন্মগত ভোগ ও অধিকারের পার্থক্য এবং উন্নতিলাভের সুযোগে তারতম্য থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে সকল নরনারীর সমান অধিকার থাকা একান্ত সঙ্গত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "জাতি-বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অপর কার্য্য করিতে পার। তুমি না হয় একটা দেশ শাসন করিতে পার, আমি একজোড়া ছেঁড়া জুতা সারিতে পারি। কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড় হইতে পার না! তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পার? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কার্য্য-বিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তা বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না। তুমি খুন করিলে তোমার প্রশংসা করিতে হইবে, আর আমি একটা আম চুরি করিলে আমায় ফাঁসি দিতে হইবে, এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার-তারতম্য উঠিয়া যাইবে। * * যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে, এই অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে। এ গুলিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে।"

দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানেও হিন্দুসমাজপতিগণ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদের দোহাই দিয়া চারি বর্ণে ভেদ-বৈষম্য ও ভোগাধিকার-তারতম্যকে আঁকড়াইয়া আছেন। তাঁহারা দেশের মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘিষ্ঠ নরনারীকে সমাজে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে অধিকার এবং উন্নতি লাভের সুযোগ দিতেছেন এবং যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ—যাঁহাদিগকে লইয়া দেশ—যাঁহারা দেশের মেরুদণ্ড তাঁহাদিগকে সমাজে নিম্নস্থান দিয়া বহু বিষয়ে অধিকার ও উন্নতি লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল কারণে হিন্দুসমাজ অনৈক্য বিরোধ বিদ্বেষের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য হিন্দুজাতি স্ব-গৃহে শতধা বিচ্ছিন্ন, সংঘশক্তিহীন, উত্থানশক্তি-রহিত, পঙ্গু। ইহাই হিন্দুদের গৃহ-বিবাদ এবং তৎসম্ভূত রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক হীনাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিধ দুঃখ দৈন্য ও দুর্দশার মূল কারণ।

এক শ্রেণীর প্রভুত্বলোলুপ স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের চেষ্টায় পরমার্থ বা ধর্মের নির্দেশে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন পরিচালিত না হওয়ার জন্যই তাঁহাদের জাতীয় জীবনে এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বর্তমানেও অধিকাংশ হিন্দুর ধর্মক্ষেত্রে চলিয়াছে ধর্মের আবরণে ভণ্ডামি, সমাজক্ষেত্রে চলিতেছে জন্মগত মিথ্যা জাত্যভিমান এবং তৎপ্রসূত মানুষের প্রতি মানুষের অপমান ও অসম্মান, সংসারক্ষেত্রে চলিতেছে 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থোপার্জন, ব্যবসাক্ষেত্রে চলিতেছে কন্‌ট্রোলের নামে উৎকোচ ভেজাল ও জোয়াচুরি, রাষ্ট্রক্ষেত্রে চলিতেছে প্রভুত্ব স্বার্থ সাম্প্রদায়িকতা দলাদলির তাণ্ডব নৃত্য! এখন অধর্ম অসত্য দুর্নীতি যেন অধিকাংশ হিন্দুর জীবনের প্রচলিত নীতি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে! কারণ ভিন্ন কোন কার্য হইতে পারে না। ইহা সত্য হইলে মানিতেই হইবে যে, উল্লিখিত কারণেই পৃথিবীতে বহু দেশ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ সাত সমুদ্র ও তের নদী পার হইয়া এই দেশ প্রায় অনায়াসে দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিল! ইদানীং স্বাধীনতা লাভ করিয়াও হিন্দুরা এই সাংঘাতিক দোষগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। সত্যের অনুরোধে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যেও এই দোষগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু এই প্রবন্ধে অ-হিন্দু জাতিসমূহের সমস্যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। অধিকাংশ হিন্দুর মন হইতে ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সংযম প্রভৃতি পারমার্থিক গুণাবলী নির্বাসিত হইয়া তাহাদের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি অসংযম প্রভৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই যে হিন্দুদের জাতীয় জীবন নানাবিধ সমস্যা-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে পরমার্থ তথা ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সমদর্শনের নির্দেশে হিন্দুদের সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা প্রমুখ ব্যবহারিক জীবনের সকল বিভাগ নিয়ন্ত্রিত করিতেই হইবে। এ জন্য অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি অসাম্য ভেদ-বিরোধ প্রভৃতি পরমার্থ-বিরোধী বিষয়গুলিকে তাঁহাদের সামাজিক সাংসারিক ও ব্যবহারিক জীবন হইতে একেবারে উচ্ছেদ করা আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে যে, পরমার্থকে ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্মে পরিণত করাতেই উহার সার্থকতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম যদি মানুষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই, উহা কতকগুলি ব্যক্তির মতবাদ মাত্র।" পরমার্থ বা ধর্মকে গ্রন্থে, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে এবং

সাধকের সাধন-সম্পদে সীমাবদ্ধ রাখিলে উহা দ্বারা জনসাধারণের কোন উপকার হইবে না। উহা তাঁহাদের নিকট নির্বস্তুক তত্ত্বে বা অর্থহীন শব্দমাত্রেই পর্যবসিত থাকিবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই পরমার্থকে ব্যবহারিক জীবন হইতে পৃথক রাখিতে বলেন নাই। তাঁহারা সকলেই সমস্বরে পরমার্থের নির্দেশে মানুষমাত্রেরই দৈনন্দিন জীবন পরিচালন করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে উপনিষৎ বা বেদান্তই হিন্দুজাতির সর্বপ্রধান পারমার্থিক শাস্ত্র। তিনি 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই যুগধর্ম-প্রচারক হিন্দুগণকে তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের সকল বিষয় বেদান্তের চূড়ান্ত একত্ব সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শনের আদর্শে পরিচালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা, যে যে কার্য্যই করুক না কেন, যে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। * * যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—তুমিও যেমন, আমিও তেমন; তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরেও সে ঈশ্বর আছেন, আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।"

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের এই নির্দেশ অনুসারে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ একেবারে উঠাইয়া দিয়া পরমার্থের নির্দেশে হিন্দুজাতির ব্যবহারিক জীবন পরিচালন করাই তাঁহাদের সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীন ভারতের সাম্য-মৈত্রী-মূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে হিন্দুদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে এই উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

ঈর্ষ্যাবাদ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

আগে না ঘুচায়ে জাতিভেদ যবনিকা
আগে না দূরিয়া মিথ্যার মরীচিকা
দূর নাহি করি প্রভু ভৃত্যের ভেদ।
নাহি করি দূর স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ
প্রচার করিলে এই দেশে বারবার
বিশ্বে সবার আছে সম অধিকার।
প্রেম জাগাইতে পারিলে না কারো মনে
ঈর্ষ্যাই শুধু জাগাইলে অকারণে।

ক্ষেপিল মূর্খ, দস্যু, সুবিধাবাদী,
ক্ষেপিল গুণ্ডা শ্রমভীরু ইত্যাদি,
যারা ধনী মানী যারা করিয়াছে পুঁজি
তাদেরে কোথাও তারা পাইল না খুঁজি,
নিরীহ কাঙাল যাহারা নিরপরাধ
তাদের মারিয়া মিটাল মনের সাধ!
পিইয়া শোণিত ঘুচাল ঈর্ষ্যা জ্বালা
সমগ্র দেশ হইল হনন-শালা!

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস

শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

বৌদ্ধ থিসৃটিক আর্ট ও দেবদেবীর উৎপত্তি

বৈদিক যুগে সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদিকে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে পূজা করিতে দেখা যায়। তাঁহারা কাল্পনিক দেবতা মাত্র; তাঁহাদের কোনো মূর্ত্তি বা মন্দির ছিল না। জনসাধারণ এই নির্বস্তুক দেবতা বুঝিত না: তাহারা যক্ষ নাগ ও ভূমিদেবীকে পূজা করিত। ভূমিদেবীর বৃক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ। অথর্ব্ববেদে বিশাল বৃক্ষের আরাধনার উল্লেখ আছে; উর্ব্বরতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ। বৃক্ষে অপ্সরার অধিষ্ঠান আছে।

প্রাচীন মৌর্য্যশিল্পে যক্ষ ও যক্ষিণী দেখি, বারহুত ও সাঞ্চিতে যক্ষ যক্ষিণী ও বৃক্ষের পূজা প্রচুর দেখি। গোয়ালিয়রের নিকটে পাবায়াতে প্রাপ্ত (১ম খৃষ্টাব্দ) যক্ষ মণিভদ্র মূর্ত্তির নীচে লেখা আছে "ভগবান"। বুদ্ধ সর্ব্বত্রই অনুপস্থিত। বারহুত ও সাঞ্চিতে বুদ্ধ প্রতীক দ্বারা বুঝান হইয়াছে। এই সময়কার গ্রন্থে দেব প্রতিমার উল্লেখ থাকিলেও খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে দেবতার পাথরের মূর্ত্তি দেখা যায় না। ধর্ম্ম ও শিল্পের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দেবদেবীর উদ্ভব হয়। প্রাচীন মুদ্রায় এই ক্রমপরিণতি সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর একটি মুদ্রায় বৃষ আছে; ইহা শিবের প্রতীক। গ্রীকেরা এই হিন্দু প্রতীক মুদ্রায় গ্রহণ করিয়াছিল। ২য় খৃষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় আছে বৃষের সহিত শিবের মূর্ত্তি। কুশান যুগের পূর্ব্বের মুদ্রায় শুধু প্রতীক দেখা যায় হস্তী, অশ্ব, বৃষ, কুকুর, কোবরা, মৎস্য, ময়ূর, চৈত্যবৃক্ষ, পদ্ম, সূর্য্য, চন্দ্রকলা, ত্রিশূল, স্বস্তিক, ডবল ত্রিকোণ (তান্ত্রিক চিহ্নের ন্যায়) ইত্যাদি। ভারতীয়গণ গ্রীকদের অনুকরণে মুদ্রা প্রস্তুত করে। কুশানগণই প্রথম রোমকদের অনুকরণে মুদ্রায় রাজমুণ্ড অঙ্কিত করে।

শিলালেখ হইতে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর ব্রাহ্মণ-মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। নগরীতে (চিতোরের নিকট) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে এবং পাথরের দেয়াল আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দির হয়ত কাঠের ছিল। গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভের শিলালেখ হইতে জানা যায় যে বেসনগরে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গ্রীক হেলিওদোর (খৃঃ পূঃ ২য়) বাসুদেব-মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য কি বৌদ্ধ মন্দিরের আদর্শ ভারতের আদিমজাতির বাসগৃহ এবং সমাধিস্থান হইতে গৃহীত হইয়াছে। আদিমজাতি টোডাদের গম্বুজাকৃতি এবং ব্যারেলাকৃতি (পিপার ন্যায়) খড়ের ছাদ দেখা যায়। ইহা হইতে ফলকে নির্ম্মিত ডোলমেন (সমাধিস্থান) আদর্শে ভারতীয় স্থাপত্যের উদ্ভব হইয়াছে।

কুশান (৫০-২৩৫ খৃষ্টাব্দ)

কুশানরা চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইউচি জাতির শাখা। ইহারা শক (শিথিয়ান), পহলব (পার্থিয়ান) ও গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়া উত্তর-ভারতের অধিপতি হন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে কুশানদের দলপতি প্রথম কদফিস (Kadphises) কাবুল ও গান্ধার জয় করেন।

তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কদফিস কাশী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পর কুশান রাজগণের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনিষ্কের পর, একে একে বসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কনিষ্ক এবং বাসুদেব রাজত্ব করেন। ইঁহাদের পতনের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়।

কনিষ্কের রাজত্ব কাবুল উপত্যকা হইতে কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কনিষ্কের গ্রীষ্মের রাজধানী ছিল কপিস (আফগানিস্থান) এবং শীতকালীন রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার)।

কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার-সাধনার্থ তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেন। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সংস্কারপন্থিগণ প্রবল হওয়ায় মহাযান নামে অভিহিত হন, অন্য দল হীনযান (আদি বৌদ্ধ) নামে পরিচিত হন। মহাযানগণ বুদ্ধের মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করেন। কনিষ্কের রাজসভায় বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ ও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য চরক ছিলেন।

কুশান আমলে ভক্তিমার্গের প্রচলন হয়। বহু শক ও গ্রীক রাজ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গ্রীক শক ও কুশানগণ হিন্দু-বৌদ্ধ প্রতীক ও মূর্ত্তি মুদ্রায় গ্রহণ করে। এই সময়ের চিন্তায় পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নাগার্জ্জুন হয়তো পতঞ্জলির দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হিসাবে গণ্য হন। নূতন মহাযান বৌদ্ধ দর্শন সাকার ঈশ্বর মানিয়া লন, কাজেই সেস্থানে বুদ্ধ দেবতা হিসাবে আবির্ভূত হন।

পতঞ্জলির মতে অশরীরী দেবতারা দেহ ধারণ করিতে পারেন—এই তত্ত্ব দেবমূর্ত্তি-গঠনে প্ররোচিত করে। এই সঙ্গে হেলেনিক আদর্শও বৈদিক ভারতকে মূর্ত্তিপূজায় উৎসাহিত করে। বারহুত যুগে শিল্পীদের দেবমূর্ত্তি-গঠনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তাহা আর্য্যধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া সম্ভব হয় নাই। আমার মনে হয় পৌত্তলিক গ্রীক ও যাযাবর বর্ব্বর শকের পক্ষে বেদের উচ্চ ধর্ম্ম উপযোগী ছিল না। তাহাদের জন্য সাধারণ ধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। হিন্দুধর্ম্ম সব সময়ই বর্দ্ধনশীল। উহা আর্য্য আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াও কালোপযোগী ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে এবং বহু বিদেশীকে নিজের আওতায় আনিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রভাবের ফলেই Anthropomorphism বা নরমূর্ত্তিপূজা মথুরা শিল্পে সম্ভব হইয়াছে।

গান্ধার শিল্প

গান্ধার ভাস্কর্য্যকে ডিকাডেণ্ট গ্রেকো-রোমান ভাস্কর্য্য বলা হইয়াছে। গ্রীক আদর্শে বৌদ্ধ শিল্পের উৎপত্তি। শান্ত সমাহিত ভারতীয় মূর্ত্তির আদর্শ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। গ্রীক দেবদেবীগণ ভারতীয় বেশে উপস্থিত। স্থাপত্যে ও দেহের গঠনে গ্রীক প্রভাব বর্ত্তমান। গান্ধার ভাস্কর্য্যের কাল ৫০ হইতে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যায়। সবই বুদ্ধ মূর্ত্তি এবং সবই কালো শ্লেট পাথরে খোদিত।

গান্ধার ভাস্কর্য্যের কাল একেবারে সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কারণ কোথাও ইহার কোনো শিলালেখ পাওয়া যায় না। যেগুলি অধিক গ্রীকভাবাপন্ন সেগুলিকে অধিক পুরাতন মনে করিতে হয়, আর যেগুলি ভারতীয়ভাবাপন্ন, সেগুলি পরবর্ত্তী যুগের।

কুশান সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে ছিল গ্রীক ব্যাকট্রিয়ান রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য। কাজেই গ্রীক রোমান কারিগরেরা কুশান সাম্রাজ্যে কর্ম্মের তল্লাসে আসিত এবং গৃহমন্দিরাদি ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রচুর কাজ

পাইত। আধুনিক কমার্শ্যাল আর্টের অনুযায়ী তাহারা প্রচুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাদের কাজ আফগানিস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। গান্ধার শিল্প মধ্য এশিয়ার খোটানের ভিতর দিয়া সুদূর প্রাচ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

গ্রীক শিল্পীরা ভারতীয় আর্যাদের উপর কিছু টেকনিক্যাল বা কলাকৌশলের প্রভাব ছাড়া আর কিছু স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; বরং গ্রীক শিল্পীরাই ভারতীয় ভাবদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

কিন্তু গান্ধার শিল্পের প্রভাবে আর একটা ফল হইয়াছেঃ ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে মূর্ত্তি-শিল্প প্রথম উৎসাহ পাইয়াছে। খৃষ্টীয় যুগ হইতে প্রচুর দেবমূর্ত্তি নিৰ্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। জনসাধারণ বেদের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিত না, 'অজ্ঞরা কাষ্ঠ মৃত্তিকা ও প্রস্তরের মধ্যে তাহাদের দেবতাকে খোঁজে।' তাহারা মূর্ত্তি-পূজার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

বুদ্ধের প্রতিকৃতি কিরূপ ছিল বলা যায় না। গান্ধার মথুরা ও অমরাবতীতে প্রথম বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখি। বুদ্ধমূর্ত্তি লইয়া বহু শিল্পীর পরীক্ষা চলিয়াছিল। তখন হাজারে হাজারে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। গান্ধার বুদ্ধমূর্ত্তির কাঁধের দুই দিকে কাপড়, মাথুর বুদ্ধের ডানকাঁধ ঘেরা।

জাতক এবং বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা গান্ধার ভাস্কর্য্যে পাওয়া যায়। শক্রের (ইন্দ্র) বুদ্ধকে ইন্দ্রশৈল-গুহায় দর্শন গান্ধার ভাস্কর্য্যের একটি বিষয়। এখানে কুবের ও সঙ্গী হারিতি দেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। লাহোরের যাদুঘরে রক্ষিত বিশালকায় কুবেরের মূর্ত্তি গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস নির্ম্মিত 'জিয়াস'-এর মূর্ত্তি স্মরণ করায়। কুবেরের গোঁফ রহিয়াছে।

এক বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তিতে গোঁফ এবং লম্বা চুল আছে। ইহা ভারতীয় রীতির বহির্ভূত। গান্ধার মূর্ত্তি অনুযায়ী গোঁফওয়ালা বুদ্ধমূর্ত্তি জাপানে অপ্রতুল নহে।

তপশ্চর্য্যানিরত কঙ্কালসার বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি আছে (লাহোর যাদুঘর, সিকরি বিহারে প্রাপ্ত)। চক্ষু কোটরগত, বুকের পাঁজরগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধকে এরূপভাবে দেখান অভারতীয়। চীন ও জাপানে এরূপ কঙ্কালসার মূর্ত্তি আছে। পরবর্ত্তী যুগে হিন্দু ভাস্কর্য্যে কঙ্কালসার তপস্বীর মূর্ত্তি দেখা যায়। এলিফেণ্টা গুহায় শিবের অনুচর ভৃঙ্গির মূর্ত্তি আছে। কঠিন তপশ্চর্য্যানিযুক্ত ভৃঙ্গি বহুকাল যাবৎ উপবাস করিয়া কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে।

স্টুকো ও টেরাকোটায় প্রচুর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২।৩ ইঞ্চি ক্ষুদ্রকায় মূর্ত্তি হইতে প্রমাণ আকারের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধরা মূর্ত্তি দান করা পুণ্যকার্য্য মনে করিত। কাজেই অল্পমূল্যে স্টুকো বা টেরাকোটার মূর্ত্তি পাইত। শেষ যুগের মূর্ত্তিগুলি স্টুকো ও মাটীর সমাবেশে প্রস্তুত। একই ছাঁচ হইতে মাথাগুলি প্রস্তুত হইত। এসব মূর্ত্তিতে রং দেওয়ার বিধি ছিল।

নিম্নলিখিত স্থানে গান্ধার শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে,—জালালাবাদ, হাড্ডা, বামিয়ান (আফগানিস্থান), স্বাত উপত্যকা, তক্ষশীলা ও পেশোয়ার। কুশান যুগের বহু স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। হাড্ডায় বিহার ছিল, সেখানে বহু গান্ধার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বামিয়ানে বহু বিহার ও গুহা ছিল; তথায় বিরাটাকার বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, পর্ব্বতগাত্রে ফ্রেস্কোপেন্টিং-এরও নিদর্শন আছে। ভারতীয় অপেক্ষা এ চিত্রের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার সম্বন্ধ বেশী।

গান্ধার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; লাহোর যাদুঘরেই ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখা যায়।

গান্ধার মূর্ত্তির সঙ্গে গ্রীক্ স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া যায়, বেশীরভাগই করিন্থিয়ান। স্তম্ভশীর্ষে পাতায় প্রচুর কারুকার্য্য ; ইহাকে ইন্দো-করিন্থিয়ান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

হ্যাভেল গান্ধার শিল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Greek remained a child always, with childish dreams of life and beauty. Let us ever cherish those dreams of childhood which belong to the spring-time of humanity. But the art of India grew to maturity and put away childish things. The art of Gandhara was her plaything as a child."

কুশান শিল্প

কনিষ্কের রাজত্বের শ্রেষ্ঠনিদর্শন বোধ হয় পেশোয়ার স্তূপ। চীনা পরিব্রাজকের লেখা হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচটি স্তরে ছিল ইহার ভিত্তি ১৫০ ফুট উচ্চ। ইহার উপর ১৩ তলা কাঠের স্তূপ ৪০০ ফুট উচ্চ। ইহার উপরে লৌহস্তম্ভে সোনার গিল্টি করা তামার ছত্র ৮৮ ফুট ; সর্ব্বসাকল্যে ৬৩৮ ফুট। ভারতে এই ধরনের স্তূপ নাই। জাপানে যে কাঠের পেগোডা আছে, অনুমান করা হয়, এই স্তূপ সেই ধরনের ছিল। ইহা নিশ্চয়ই জমকালো বিরাট এক অট্টালিকা ছিল। স্তূপের ভিত্তিভূমি খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে, ২৮৬ ফুট পরিমিত ব্যাস।

রাওলপিণ্ডি হইতে ২৫ মাইল দূরে মানিকালাতে অনেকগুলি কুশান স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মথুরা ভাস্কর্য্য

মথুরায় জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রচুর পাওয়া যায়। নিকটবর্ত্তী সিকরি ও রূপবাস খনি হইতে লাল বেলে পাথর পাওয়ায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণের সুবিধা হইয়াছে। মথুরা হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছে। ধনী ভক্তরা শত শত মাইল দূরেও বিরাটাকার মূর্ত্তি বহন করার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। মথুরার বুদ্ধমূর্ত্তি সারনাথ ও গয়ার বুদ্ধমূর্ত্তির আদর্শে স্থাপিত।

সময়ের দিক দিয়া বিচার করিলে, গান্ধার শিল্পীরা প্রথম বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। মাথুর শিল্পীরা পরে করিলেও, তাহারা গান্ধার শিল্পদ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। তাহাদের বুদ্ধমূর্ত্তি সম্পূর্ণ দেশজ। গান্ধার বুদ্ধকে আর কোনো শিল্প অনুসরণ করে নাই। কাজেই বলা চলে, প্রচলিত বুদ্ধমূর্ত্তির পরিকল্পনা প্রথম কুশান শিল্পীরাই প্রথম শতক হইতে করিয়াছে।

প্রাচীন নগরী মথুরা যমুনার তীরে স্থাপিত এবং জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্মৃতিতে রঞ্জিত। মন্দির ও ভাস্কর্য্যে সুশোভিত মনোহর নগরী ছিল মথুরা। বহু শত ভাস্কর এখানে থাকিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মথুরার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। মুসলমানের আক্রমণে ইহা ধ্বংস হয়।

বারহুত এবং তদপেক্ষা প্রাচীন বেসনগরের (মৌর্য্য) ভাস্কর্য্যের প্রভাব মথুরায় বর্ত্তিয়াছে। কোনো কোনো মূর্ত্তি এবং রিলিফে তৎকালীন গান্ধার শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন কুশান শিল্পে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা উচ্চ রিলিফ বা সম্পূর্ণাকার। মাথা কামান, মাথায় কোথাও কুঞ্চিত কেশ নাই, উষ্ণীষ যেখানে আছে, তাহা প্যাঁচানো (spiral), ডান কাঁধ খোলা, ডান হাতে অভয় মুদ্রা, বাম হাত হাঁটুর উপর ন্যস্ত (বসামূর্ত্তি), দাঁড়ান মূর্ত্তিতে বাম হাতে উত্তরীয় ধরিয়া আছে, বস্ত্র দেহের গঠনকে ব্যক্ত করিয়াছে, কাঁধ প্রশস্ত, বক্ষ উন্নত, মাথায় আলোকমণ্ডল প্লেন। পরবর্ত্তী গুপ্তযুগে

আলোকমণ্ডল কারুকার্য্যপূর্ণ। কোথাও পদ্মাসন নাই; সিংহাসনে উপবিষ্ট। দাঁড়ান বুদ্ধমূর্ত্তির পায়ের নীচে অনেক সময় উপবিষ্ট সিংহ দেখা যায়। মুখে শান্তি ও মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে শক্তিমত্তার ভাব।

মথুরার বুদ্ধমূর্ত্তিকে বোধিসত্ত্ব বলে। শিল্পীরা নিজেদের কল্পনা ও ধারণা অনুসারে বুদ্ধকে গড়িয়াছে। তাহারা বুদ্ধকে যক্ষের আকারে গড়িয়াছে, তাহাকে চক্রবর্ত্তী (পৃথিবীর অধিপতি) স্বরূপ দেখিয়াছে। মথুরার বুদ্ধ সাংসারিক আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি। তাঁর খোলা চক্ষু হাস্যময় মুখ একটু খাপছাড়া।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি সারনাথের যাদুঘরে রক্ষিত বোধিসত্ত্বের বিরাট মূর্ত্তি। ইহা কনিষ্কের রাজত্বের ৩য় বৎসরে (৮১ খৃষ্টাব্দ) নির্ম্মিত। সন্ন্যাসী "বল" ইহা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতার যাদুঘরে যে এরূপ একটি মূর্ত্তি আছে তাহাও এই সময়ে নির্ম্মিত। ইহা শ্রাবস্তির জেতবনে পাওয়া গিয়াছে।

মথুরার অসংখ্য ভাস্কর্য্যের মধ্যে খুব কম মূর্ত্তিতেই গান্ধার প্রভাব দেখা যায়, যদিও মথুরা ও গান্ধার শিল্পের এক সময়েই উৎপত্তি। মথুরার ভারতীয় ভাস্কর বাহিরের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াই শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে।

মথুরার সম্পূর্ণ রেলিং কোথাও পাওয়া যায় নাই। জামালপুরের কতগুলি রেলিংএর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। ইহা মথুরা লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ইহাতে উচ্চ রিলিফে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও যক্ষিণী মূর্ত্তি (বৃক্ষকা) খোদিত আছে। বেশভূষিত চিত্র এবং জান্‌রে চিত্রও কিছু আছে।

রেলিং-এর নগ্ন রমণীমূর্ত্তি লক্ষণীয়। প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সকল মন্দিরেই এরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার শেষ পরিণতি খাজুরাহো ও কোনারকের মৈথুন মূর্ত্তিতে। ইহার তত্ত্ব বৌদ্ধ, জৈন অথবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে গৃহীত নহে। ইহার উৎপত্তি অতি প্রাচীন, ভূমিদেবী বা মাদার গডেসের মধ্যে নিহিত আছে। লৌরিয়া নন্দঘরে প্রাপ্ত নগ্ন রমণী মাদার গডেস্। পশ্চিম এশিয়া জুড়িয়া এক সময় এই মাদার গডেসের পূজা ছিল। এই পূজার সঙ্গে উর্ব্বরতার সম্বন্ধ আছে।

জামালপুরে প্রাপ্ত জল-অপ্সরার মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। গোলাকার কলসী হইতে উদ্ভিন্ন পদ্মে দাঁড়াইয়া আছেন অপ্সরা। ইহার সঙ্গে মায়াদেবী ও লক্ষ্মীমূর্ত্তির সম্বন্ধ আছে। এই মূর্ত্তি 'পূর্ণঘট'কে সূচিত করিতেছে। প্রাচীন শিল্পের অলঙ্করণে 'পূর্ণঘটের' ব্যবহার আছে। পূর্ণঘট মঙ্গলজনক এবং প্রাচুর্য্যদানকারী; খোটান দণ্ডান উলিকের অষ্টম-শতাব্দীর ফ্রেস্কোপেন্টিং জল-অপ্সরার চিত্রের সঙ্গে এই মূর্ত্তির তুলনা চলে।

এ সকল মূর্ত্তি সবই নগ্ন নয়, সূক্ষ্মবস্ত্র পরান, শরীরের উপর শুধু কয়েকটী রেখা টানিয়া এই বস্ত্রের অস্তিত্ব বোঝান হইয়াছে। শুধু মথুরায় নহে, ভারতের অনেক মূর্ত্তিশিল্পে বস্ত্র শুধু দেহের উপর রেখা টানিয়া বোঝান হইয়াছে। দেহের উপর রেখা ছাড়া কাপড়ের আর কোনো অস্তিত্ব নাই। গান্ধার ভাস্কর্য্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, বস্ত্র স্বাভাবিক ভাবে দেখান হইয়াছে। বস্ত্রের ভাঁজে দেহের গঠন বোঝা যায়।

এ সকল মূর্ত্তি ছাড়াও মাথুর ভাস্কর আর এক বিষয়ে মূর্ত্তি গড়িয়াছে; তাহা হইল কুশান রাজাদের প্রতিকৃতি। কনিষ্কের মস্তকহীন মূর্ত্তি সর্ব্বপরিচিত। ইহা সিথিয়ান বা শক শিল্পীর নির্ম্মিত। জোব্বা ও পাজামা পরিহিত, পায়ে বুটজুতা রহিয়াছে, কোমরে তরবারী ঝুলিতেছে। ইহা মধ্য এশিয়ার পোষাক। ইহা উল্লেখযোগ্য, প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তিতে এক সূর্য্যমূর্ত্তি ছাড়া কাহারো পায়ে পাদুকা নাই। গান্ধার মূর্ত্তিতে গ্রীক স্যাণ্ডেল আছে।

কুশান যুগে নাগমূর্ত্তি দেখা যায়। নাগেরা জলের অধিষ্ঠাতা। শ্রেষ্ঠ নাগমূর্ত্তি মথুরার যাদুঘরে আছে; ইহা প্রমাণ আকার মানুষের মূর্ত্তি, কিন্তু পিছনে সাপের ফণা রহিয়াছে। কুশান যুগেও যক্ষ ও নাগের উপর আস্থা ছিল। যক্ষমূর্ত্তিগুলিতে দেখা যায়, উদর স্ফীত। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ জম্ভল মূর্ত্তি ও হিন্দু গণেশ মূর্ত্তি ইহা অনুসরণ করিয়াছে। বৌদ্ধপুরাণে, জম্ভল বৈশ্রবণ একই ব্যক্তি।

লক্ষ্য করার বিষয়, কুশান যুগে জাতকের বিষয় খুব কম। বারহুতে খুব বেশী, সাঞ্চিতে তদপেক্ষা কম, কুশানে আরো কমিয়া আসিয়াছে।

আমেরিকার চিঠি

ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌

এই ঘূর্ণাবর্তের দেশে পদার্পণ করা মাত্র আমাকে কেবলি ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে—এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১৪টি প্রদেশ অগণিত শহর গ্রাম বিদ্যাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হল। একদিকে যেমন একান্ত অস্বাভাবিক জীবনের ক্লান্তি এবং অতি বৈচিত্র্যের ব্যর্থতা মনকে পীড়িত করে, অন্যভাবে তেমনি মানুষের সংসারে এইভাবে পথিকবৃত্তি করার কিছু মূল্য পাওয়া যায়—প্রকাণ্ড অপরিচিত সমাজের সুখ-দুঃখ সৃষ্টি-অনাসৃষ্টির নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। সবচেয়ে বোধ হয় তৃপ্তি পাই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত মাধুর্য্যের সংস্পর্শে এসে—এই দেশের সুন্দর শৈল প্রদেশ নদী বড়ো বড়ো অরণ্য এবং অজস্র ফুলের বন শ্যামল ঐশ্বর্য্য মনকে চমৎকৃত করে। যেখানে মানুষের বহিঃশক্তির পরিচয় প্রকাণ্ড শহর এবং আশ্চর্য বিজ্ঞান-কৌশল এদের দেশকে বিরাট করে তুলেছে, তা দেখে বিস্মিত হই, কিন্তু সে বিস্ময় অন্য রকম। ভারতীয় মনকে এই সব আয়োজন এবং বিক্রম বিশেষ কিছু নাড়া দেয় না। আঙ্কিক অনুপাতে বিশ লক্ষের জায়গায় বহু কোটি ইঁট সাজিয়ে বা দানবিক কারখানায় লোহা পিটিয়ে ষাট সত্তর তলা বাড়ী তুললে সেটা বড়ো বাড়ী হয় মাত্র; তার মধ্যে আর কোন মহিমা নেই। সর্বত্রই এরা বৃহতের সাধনাকে মহত্ত্বের সাধনা ব'লে ভুল ক'রে বসে। দেহ বা মনের ক্ষুধাগুলিকে দ্বিগুণ বহুগুণিত ক'রে তারই চরিতার্থতা-বিধানকে এরা মনে করে সভ্যতা। বলা বাহুল্য, এই সবের মধ্যে থেকেও অনন্ত দূরে থাকার বিদ্যা ভারতীয় অভ্যাস-জাত—এদেশেও কিছু কিছু লোক আছে যারা আমাদেরই মতো দূরে থাকে। কিন্তু এদের এই জটিল এবং নিরন্ত বহির্মুখী সভ্যতার পরিবেশ বড়ো ভয়ঙ্কর—এই সভ্যতার ভিত্তি ভেঙ্গে পড়বে! পশ্চিমের এই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র এবং বস্তুপ্রধান সামাজিক অত্যাচারের ধ্বংস অনিবার্য। দুঃখ হয় জনসাধারণের কথা ভেবে, কেননা তাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। যদিও এখন এরা যাকে সুখ মনে করে তার চেয়ে দৈন্য এবং দুঃখ-দশা আর কী হতে পারে? ভালো লাগে এদের বিদ্যাকেন্দ্র-গুলিতে জ্ঞানী দু একজনের সঙ্গে কথা বলতে—যাঁরা আলো জ্বালিয়ে নিভৃতে কোনো সত্যের চর্চায় নিরত—তাঁরা কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চিকিৎসক, কেউ জ্ঞানের সৃষ্টিশিল্পের সাধক। আমার এই দুঃখকর বক্তৃতা-ব্যবসায়ের অনেক কষ্ট দূর হয়ে যায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় বা বড়ো আরোগ্যভবনের বা দুরূহ গবেষণাকেন্দ্রের সংস্পর্শে আসি—আমার কাজও বেশীর ভাগই এইসব জায়গায়। তা ছাড়া 'Friends' রা এদেশের শ্রেষ্ঠ কর্মী এবং ভাবুকের পর্যায়ভুক্ত এবিষয়ে সন্দেহ নেই—এদের ক্ষুদ্র অথচ যথার্থ কল্যাণে ও বীর্যে অনুপ্রাণিত অনুষ্ঠান কেন্দ্রগুলিতে যখনই যাই তখন মনে বড়ো গভীর তৃপ্তি পাই।

মধ্যে ক্যানাডার ধারে গিয়েছিলাম—এখন একেবারে দক্ষিণে New Orleansএ যাচ্ছি

এবং সেখান থেকে বহুদূর Seattle। তারপর Californiaর সর্বত্র ঘুরতে হবে এবং আগষ্ট মাসের শেষে আমার ছুটি। অর্থাৎ তখন থেকে Howard Universityতে আমার যথার্থ কাজের আরম্ভ। অন্ত দু একটি বিশ্ববিদ্যালয়েও Exchange Professor এর কাজ ক'রে পরের বৎসর দেশে ফিরব।

সমস্তক্ষণই মন ভারতবর্ষের তপঃস্মৃতিময় আপনতার দিকে চলে যায়—দূরে দূরে থাকা খুবই দুঃসহ। পৃথিবীতে আর ক-টা দিনই বা পাব—আর হারাতে ইচ্ছা হয় না। সমস্ত বিশ্বসত্যের সঙ্গে জন্মমৃত্যু পেরিয়ে দেশ-বিদেশের অতীত হয়েই যে তা রাখতে হয়—কিন্তু জন্মগত পরিবেশের একটি বিশেষ সহজতা আছে, তার অভাব মানুষের পক্ষে কম অভাব নয়।

প্রায়ই ভাবি এখন দেশে কী হচ্ছে—সেই আপন নিভৃত শান্ত সর্বসহ ভারতীয় জীবন। বিদেশে এত প্রচণ্ড পরিশ্রম ক'রে কতটুকুই বা জ্ঞান নিয়ে যেতে পারব যা দেশকে দেবার যোগ্য। ওখানে স্বাধীনতা লাভের পর আরো কত কঠিন পরীক্ষা চলেছে যাতে কিছু না কিছু সাহায্য এখনই করা দরকার—এবং কতজনে তাই করছেন। যা খবর পাই তা মোটের উপর ভালো কিন্তু যথেষ্ট ভালো নয়। বিদেশে এলে স্বদেশের প্রতি প্রত্যাশা আরো বেড়ে যায়। *

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ তালুকদার আই-সি-এস্ মহাশয়কে লিখিত পত্রাংশ। ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী বর্তমানে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। এই পত্র আমেরিকার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় জন হপকিনস্ হইতে লিখিত।

তমসার তীরে

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

তমসার তীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,
পাষাণ দেবতা, ও দুটী নয়ন মেল।
আমার সকল পরাণ তোমারে চাহে,
প্রতি পরমাণু সঙ্গীত তব গাহে।
শিরায় শিরায় রুধির বিন্দু নাচে,
উল্লাসে তব মধুর পরশ যাচে।
বিশ্ব-ভুবনে করুণা কিরণ রাজি,
দীপ্ত দেবতা হ'ক প্রতিভাত আজি।

শত সন্দেহ মিথ্যার কারা ভাঙ্গি
উদয় অচল উঠুক আলোয় রাঙ্গি।
নিখিল পরাণ শত বন্ধন মাঝে,
হৃদয়দেবতা, তোমারে চিনিছে না যে!
অন্ধ নয়ন খুলে দাও অনুরাগে,
দৃষ্টি আলোক আঁখিতে যেন গো লাগে।
পাষাণ দেবতা ভাঙ্গিয়া পাষাণ কারা
ফুটাও তোমার প্রেমের আলোক-ধারা।

উচ্চাংগ সংগীতের আদর

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

উচ্চাংগ সংগীত বলতে আমরা ক্লাসিকাল শ্রেণীর সংগীতকেই বুঝি। ক্লাসিকাল সংগীত অভিজাত ও কুলীন। সাধারণ লোকসমাজ যে সংগীত ভালবাসে ও গান করে, উচ্চাংগ সংগীত তা থেকে একটু ভিন্ন, কেন না উচ্চাংগ সংগীত এমন একটি নির্বাচিত সম্প্রদায়ের ভেতর সীমাবদ্ধ যা সে সম্প্রদায়ই মাত্র এর গঠন, প্রকৃতি বিকাশ ও রস-মাধুর্য সম্বন্ধে সচেতন। তাই উচ্চাংগ সংগীতের মর্যাদা ও আদর সর্বসাধারণের ভেতর ঠিক বিস্তৃত নয়, সংকীর্ণ ই বল্‌তে হবে।

উচ্চাংগ সংগীতের রূপ ও রসকে সাধারণ সমাজ ঠিক সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারে না। তার কারণ—হয় উচ্চাংগ সংগীতের নিজেরই সর্বসাধারণকে আকর্ষণ করবার শক্তি নেই, নয় উচ্চাংগ সংগীত যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁরা সর্বসাধারণের রুচি অনুযায়ী ক'রে একে বিতরণ করতে পারেন না, অথবা জনসাধারণ উচ্চাংগ ক্লাসিকাল সংগীতের বৈশিষ্ট্য নিয়ম-কানুন ও সৌন্দর্যকে ঠিক ঠিক জানে না ব'লে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য এ তিনটি কারণকে উচ্চাংগ সংগীতের সমাজে অসমাদরের সপক্ষে গ্রহণ করা যেতে পারে, যদিও পরিপূর্ণ রূপে নয়।

উচ্চাংগ সংগীতের কথা ছেড়ে দিলে যে কোন শ্রেণীর সংগীতকে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এখনো ঠিক শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করতে পারেন না। তাছাড়া একথাও সত্যি যে, ছেলে-বেলায় আমরা যখন পাঠশালা বা স্কুলে যাই, সংগীত-শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই সেখানে দেখ্‌তে পাই না। যতটুকু পাই নাম্‌তা পড়ানো বা সমস্বরে সুর ক'রে পাঠের উচ্চারণ যেগুলোও নেহাৎ মামুলি ও সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য দানের সমান। স্কুলে যে কোন সংগীতের প্রচলনকে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা আবার ভাল চোখে নিতেও পারেন না। সংগীত তাঁদের কাছে একটি নগণ্য জিনিস বলেই মনে হয়। এতে ছেলে-মেয়েদের চরিত্র সংশোধন তো পরের কথা, অসংশোধনের আপদই দেখা দেয় বেশী, ছেলে-মেয়েরা বরং বেয়াড়া বা বখাটে হয়ে যায় এটাই বেশীর ভাগ তাঁরা মনে করেন। কাজেই ছেলেবেলায় স্কুলে অভিশাপের পর্যায়ভুক্ত সংগীতের শিক্ষা একরকম নিষিদ্ধই বল্‌তে হবে যদিও আজকাল কিছু কিছু হয়েছে ও হচ্ছে।

স্কুল-পাঠশালার শিক্ষা শেষ ক'রে যখন কলেজের ভেতর আমরা প্রবেশ করি, সেখানেও দেখি সংগীত-শিক্ষা হয়েছে সম্পূর্ণ অপাংক্তেয়। কলেজের অধিনায়ক ও প্রফেসাররা উচ্চাংগ সংগীতের মর্যাদাকে যদিও একটু করুণার চক্ষে দেখেন (অবশ্য সকলের কথা আমরা বল্‌ছি না), তাহলেও সংগীতকে তাঁরা যথার্থ চরিত্রগঠনোপযোগী শিক্ষা হিসাবে গণ্য করেন না বলেই মনে করি। আর যদিও বা কথঞ্চিৎ শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করেন তাও গণ্য করেন বিশাল সংগীত-সিন্ধুর তুলনায় ক্ষুদ্র একটি বারিবিন্দুর সমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-তালিকাতেও সংগীতের কোন নামগন্ধ ছিল না। তবে কয়েক বছর হোল উচ্চাংগ সংগীতের শিক্ষাকে তালিকাভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে

যদিও সে নেওয়াকে ঠিক ঠিক প্রশংসা করতে এখনো আমরা পারি না। কেন না যে পদ্ধতি ও প্রণালীকে অনুসরণ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সংগীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তা ঠিক বৈজ্ঞানিক ও সুসংগত নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা যদি সত্যি সত্যিই উচ্চাংগ সংগীতের সংগে সকল রকম সংগীতকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন তবে সুসংগত বৈজ্ঞানিক একটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করাই তাঁদের পক্ষে কর্তব্য হবে। যথার্থ শিক্ষিত সংগীতজ্ঞদের দিয়ে অবশ্য এ পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। কার্যকরী শিক্ষার সংগে সংগে ঔপপত্তিক (থিওরি) অংশও ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো চাই। সংগীতের ইতিহাস বিজ্ঞান ও গ্রামার সম্বন্ধেও রীতিমত অনুসন্ধান-মূলক গবেষণার, আর তার জন্যে বৃত্তিরও ব্যবস্থা করতে হবে যেমন মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা করেছেন। শাস্ত্রীয় উচ্চাংগ সংগীতের অনুশীলন ও প্রচারের দিক থেকে অথবা সংগীতের যথার্থ আলোচনার কথা বল্লে দক্ষিণ ভারতই এখন আমাদের গৌরবস্থল বল্‌তে হবে। উত্তর ভারতে সাধনাংশের মর্যাদা রয়েছে, কিন্তু ঔপপত্তিকের আদর নেই বল্লেও বেশী বলা হয় না। কাজেই উত্তর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির উচিত হবে, এলোমেলো ভাবে সংগীত-শিক্ষার ব্যবস্থা না ক'রে সুসংগত, বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

উচ্চাংগ সংগীত সকলের কাছে আদর না পাবার আর একটি কারণঃ বেশীর ভাগ উচ্চাংগ সংগীতের শিক্ষক বা উস্তাদরা শিক্ষার্থীদের সামনে এমন এক ভয়াবহ শিক্ষার ফিরিস্তি হাজির ক'রে বসেন যা শুনে বা দেখে শিক্ষার্থীদের বেশীর ভাগের প্রাণে হতাশা না এসে পারে না। তবে আজকাল শিক্ষার প্রণালী অবশ্য অনেকটা উন্নত হয়েছে বলতে হবে। স্বর্গীয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর প্রবর্তিত পদ্ধতি উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষার পথকে অনেক সুগম করেছে। মোট-কথা সংগীত-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটুকুই উচিত হবে শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চাংগ সংগীতকে ঠিক ঠিক ভাবে তাদের রুচি মাফিক গ্রহণ করতে পারে তার সুব্যবস্থা করা। সংগীতের প্রাচীন যে সকল বই বা পুঁথিপত্র আছে তাদের তর্জমা ক'রে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। গতানুগতিক গান, গৎ ও স্বরলিপির লিখন ও সাধন, হরেক রকমের মিষ্টতা-বর্জিত তান ও বাঁটের কেরামতি নিয়ে আত্মহারা হোলে চল্‌বে না। রসসৃষ্টি ও রসপরিবেশন করার কৌশল প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা দিতে হবে। গলার অস্বাভাবিক ব্যায়াম, কর্কশ ও মিষ্টতাহীন আওয়াজ, বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গিমা, অযথা সুরের কাজ ও বিস্তার, একই সুর বা তানের পুনরাবৃত্তি—এ সমস্ত দোষ বা বদভ্যাস থেকে সংগীত-সাধকদের দূরে থাক্‌তে হবে। ভাল ভাল কৃতবিদ্য শিল্পীদের নিয়ে গানের আসরের বন্দোবস্ত ক'রে শিক্ষার্থীদের শোনাতে হবে। তাতে ক'রে তাদের নিজেদের দোষ সংশোধন ও ভাল গান করার রীতি-পদ্ধতির পরিচয় লাভ করারও অনেক সুযোগ-সুবিধা মিলবে।

সকল রকম সংগীতকেই শিক্ষা হিসাবে আমাদের গণ্য করা উচিত। লেখাপড়ার উদ্দেশ্যঃ অজ্ঞানের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোককে বরণ করা। লেখাপড়াকে 'বিদ্যা' বলা হয়, কেন না লেখাপড়া আমাদের অজানা সকল জিনিষকে প্রকাশ করে, আমাদের চরিত্রকে উন্নত করে এবং মানুষের সমাজে আমাদের নিজস্ব সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সংগীতও সেজন্য শিক্ষা তথা বিদ্যা। সংগীতে স্বর, সুর, অলংকার মূর্ছনা প্রভৃতির সমাবেশ থাকলেও রাগ-রাগিণীই তার প্রাণ। যে ধ্বনি স্বরবর্ণ বা শব্দ মানুষের মনোরঞ্জন ক'রে মনের তৃপ্তি

সাধন করে তাকে বলে রাগ বা রাগিণী। রাগ-রাগিণীর বিকাশে মানুষের সৃজনী শক্তিরই প্রকাশ পায়। মনের একাগ্রতা রাগ-রাগিণীদের প্রকাশের পক্ষে একটি অপরিহার্য জিনিষ। মনের একাগ্রতা চিত্তের নির্মলতারই পরিচায়ক। ব্রহ্মচর্য, প্রাণায়াম নিয়মনিষ্ঠাও চিত্তকে নির্মল করার পক্ষে সহায়ক। প্রাচীন সংগীতের শাস্ত্রকারেরা সংগীতের আলোচনার গোড়াতেই তাই যোগসাধনার প্রসংগের অবতারণা করেছেন। সংগীতও সেজন্য সাধনা। ভগবান, জ্ঞান বা শান্তিলাভ করবার অন্যতম উপায় তাই সংগীত। আর সংগীতকে সেজন্যেই বিদ্যা, শিক্ষা ও সাধনা হিসাবে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

সংগীত ও বিশেষ ক'রে উচ্চ সংগীতের সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকের ধারণা: সংগীত কেবল গলাবাজী করা বা গলার কসরৎ দেখানো মাত্র। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত ভুল। কারণ সংগীতও একটি গঠন-মূলক বিদ্যা। সংগীতেরও ইতিহাস, সাহিত্য, ব্যাকরণ, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন আছে। ব্রাহ্মণ-সাহিত্য, শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি সংগীতবিদ্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সংগীতবিদ্যার নিজস্ব একটি মর্যাদা এবং কৌলীন্য আছে। কাজেই সংগীতবিদ্যা শিক্ষা করায় সময়ের অপচয় বা গলাবাজী মোটেই হয় না। সংগীত সাধারণের কাছে এমন কি কোন কোন শিক্ষিত লোকের কাছে পর্যন্ত সমাদর লাভ করতে পারে নি, আর উচ্চাংগ সংগীতের যথার্থ রুচিও তাঁদের কাছে না থাকার জন্যে তাঁরা এসব অসংগত কথা বলে থাকেন। সংগীতকেও তাই—বিশেষ ক'রে উচ্চাংগ সংগীতকে সর্বসাধারণ যাতে আদর করতে শেখে তার ব্যবস্থা সংগীত-সাধকদেরই করতে হবে। সেজন্যে সংগীতের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা চাই। শুধুই কয়েকটি সমজদার বা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভেতর সংগীতকে সীমাবদ্ধ রাখলে চল্‌বে না। স্কুল-পাঠশালা থেকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছেলেমেয়েদের উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্কুলে উচ্চ সংগীতের শিক্ষালাভ করলে ক্রমশঃ তারা সংগীতের পরিপূর্ণ পরিচয় পাবার জন্যে কলেজেও সংগীত শিক্ষার দাবী জানাবে। ছাত্র-ছাত্রীরাই ভবিষ্যৎ সমাজের কর্ণধার। তাদের সুরুচি ও কৃতকার্যতাময় অনুশীলনের জন্যে অভিভাবকদের সুদৃষ্টিও ক্রমশঃ উচ্চাংগ সংগীতের ওপর পড়বে, আর এভাবেই ক্রমবিবর্ধমান রুচির বিস্তারের সংগে সংগে গণ-চেতনাও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে। গণ-চেতনার উদ্বোধনে উচ্চাংগ সঙ্গীতের আদর ও মর্যাদা নিশ্চয়ই অব্যাহত থাকবে; ললিতকলা হিসাবে সংগীতও তাহলে নিজের গৌরব ও সৌন্দর্যকে ক্রমশঃ মহিমময় করতে সমর্থ হবে!

যন্ত্রসাহায্যে কৃষিকার্য

দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধির একমাত্র উপায়

পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান জন-সংখ্যার সম্মুখে যে অন্নসমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান করতে হলে প্রয়োজন দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি, তা ছাড়া এর অন্য কোন সহজ সমাধান নেই। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে কৃষিকার্যে এখনও যন্ত্রের ব্যবহার প্রসার লাভ করেনি অথচ ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলিতে সম্প্রতি যান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রবল চেষ্টা দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়ে কৃষিসম্পদ বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে কৃষিকার্যকে 'শ্রমশিল্পে'র পর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা হাস্যকর ছিল। সে সময় লোকে 'শ্রমশিল্প' অর্থে কেবল কলকারখানাই জানত। তখন 'মোটর-লাঙ্গল' ছিল দুর্লভ বস্তু এবং কৃষকদের প্রতি ঘরে মোটর-যানও এত অধিক সংখ্যায় ছিল না। কিন্তু সে যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র কৃষিকার্যে যন্ত্র ও মোটর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই এই যান্ত্রিক পরিবর্তন।

১৯১৭ সালে বৃটেন প্রথম ট্রাক্টার আমদানি করে। আর আজ পৃথিবীর মধ্যে বৃটেনেই কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। সেখানে প্রায় ২,৪০,০০০ ট্রাক্টার কৃষিকার্যে নিযুক্ত এবং এই ট্রাক্টারের সাহায্যে গত যুদ্ধের সময় কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে প্রায় ১৯,০০০,০০০ একর হয়।

বর্তমানে বৃটেনে বিদেশ থেকে ট্রাক্টার আমদানি করতে হয় না। লণ্ডনের কাছে ড্যাগেনহামে যে কারখানা আছে সেখানে বৃটেনের সমগ্র ট্রাক্টার-উৎপাদন-পরিমাণের শতকরা ৯৪-টি তৈরী হয়। যুদ্ধের সময় এই কারখানায় প্রায় ১,৩৭,০০০ ট্রাক্টার তৈরী হয়েছিল, তা ছাড়া আরও ৮০,০০০ ট্রাক্টার গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তৈরী হয়েছে। এই ট্রাক্টারের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে বৈদেশিক রপ্তানির জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই অল্প সময়ের মধ্যেই ৬৭টি বিভিন্ন দেশে বৃটেন বহু ট্রাক্টার রপ্তানি করেছে।

পৃথিবীর সর্বত্র ড্যাগেন্হাম কারখানায় তৈরী ট্রাক্টারগুলির প্রচুর চাহিদা হয়েছে, তার প্রধান কারণ এই যে ট্রাক্টারগুলির সঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ ধরনের অতিরিক্ত যন্ত্রের আবিষ্কার ড্যাগেনহাম ট্রাক্টারগুলিকে আকর্ষণীয় করেছে। এই সব যন্ত্রের সংখ্যা ৩৬।

উদাহরণ স্বরূপ ত্রিমুখী লাঙ্গলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ট্রাক্টারের সঙ্গে যুক্ত করে এই লাঙ্গলটি চালানো হয়। এক একর জমি চাষ করতে একজন মানুষ এবং দুটি ঘোড়ার এক দিন সময় লাগে, অথচ সেই সময়ের মধ্যে এই যন্ত্রটি তার পাঁচগুণ কাজ করতে সমর্থ।

আর একটি যন্ত্র আছে—তা আলুর বীজ বপনের যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিন সারিতে এক সঙ্গে বীজ বপন করা যায়। ১০ জন মানুষ এবং ৪-টি ঘোড়া একদিনে ৯ একর জমিতে বীজ বপন করতে পারে, কিন্তু এই যন্ত্রটি ট্রাক্টারের

সঙ্গে যুক্ত হয়ে অতি সহজে সেই কাজ সম্পন্ন করে মাত্র তিনজন মানুষের সাহায্যে।

শস্য-অনিষ্টকারী, কীট-পতঙ্গাদির বিনাশের কাজে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র ফলপ্রদ হয়েছে। বিস্তীর্ণ জমিতে স্বল্প সময়ে কীটবিনাশক ঔষধ বিক্ষেপণের জন্য যন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া আরও অনেক প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। ট্রাক্টার-সহযোগে এই সব যন্ত্রের ব্যবহার কৃষিকার্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। আজকাল পৃথিবীর সমস্ত দেশেই উপযুক্ত শ্রমিকের অভাব, অথচ উৎপাদন-বৃদ্ধি ছাড়া খাদ্যসংকট অতিক্রম করার আর কোন উপায় নেই। সেইজন্য কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

কৃষিকার্যে ট্রাক্টার-ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছিল বর্তমানে তার শতকরা ৭ভাগ কম হওয়ায় পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। অথচ জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার সমতা রক্ষা করে উৎপাদন বৃদ্ধি করবার অন্যতম উপায় 'ট্রাক্টার' এবং এই ট্রাক্টারই খাদ্যসমস্যার আশু সমাধান করতে সমর্থ।

পৃথিবীর বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে শ্রমশিল্পে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার যতখানি সম্ভবপর হয়েছে ততখানি কৃষিকার্যে হয়নি। আজ সমস্ত কলকারখানায় যন্ত্র অপরিহার্য। কারখানার মালিকরা বুঝেছিলেন যে পশু-সাহায্যে কারখানা চালাবার পুরাতন পন্থা ব্যয়বহুল। সেই জন্য বৈদ্যুতিক এবং বাষ্পচালিত যন্ত্রের সাহায্য তাঁরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। অপর পক্ষে পৃথিবীর শতকরা ৯৮-টি কৃষিকারবার এখনও গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভরশীল।

কেবলমাত্র প্রগতিশীল দেশসমূহে কৃষিকার্যে পশুর ব্যবহার প্রায় সম্পূর্ণভাবে বর্জিত। তারা ট্রাক্টার ব্যবহার করে বুঝতে পেরেছে যে যান্ত্রিক শক্তি যে কেবল অনায়াসলব্ধ এবং সুলভ তা নয়, অধিকতর খাদ্য-উৎপাদনের সঙ্গে মুনাফাবৃদ্ধির কাজেও প্রধান সহায়ক।

বর্তমান পৃথিবীর চাহিদা প্রতি বৎসরে ৬,০০,০০০ ট্রাক্টারের এবং এর বেশীর ভাগই বৃটেনে নির্মিত হবে, কারণ ট্রাক্টার-নির্মাণকার্যে গত কয়েকমাস ধরে পৃথিবীতে বৃটেনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

এই বৎসর বৃটিশ শ্রমশিল্প ২,০০,০০০ ট্রাক্টার নির্মাণ শেষ করতে পারবেন বলে আশা করেন। প্রতিবৎসর এই অনুপাতেই ট্রাক্টার নির্মিত হবে। বৃটিশ শ্রমশিল্প ইতোমধ্যে ১,২০,০০০ ট্রাক্টার নির্মাণ করেছেন এবং অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই নির্মাণ-হার অনেক বেশী।

বর্তমানে স্ট্যাণ্ডার্ড মোটর কোম্পানী দৈনিক ২৫০টি ফার্গুসন ট্রাক্টার নির্মাণ করছে, এই হার ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে এই বৎসরের শেষে হবে ৫০০।

লণ্ডনের নিকট ড্যাগেনহাম কারখানায় ফোর্ড মোটর কোম্পানী গত বৎসর জুন মাস পর্যন্ত ২,৫০,০০০ 'ফোর্ডসন' ট্রাক্টার নির্মাণ করেছে। গত বৎসর তারা দৈনিক ১২০-টি হিসাবে ট্রাক্টার নির্মাণ করে কিন্তু এই বৎসর দৈনিক ২০০০র উপর ট্রাক্টার নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছে। বৃটেনের এই দুই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ট্রাক্টার নির্মাণ-কার্যে সাহায্য ক'রে পৃথিবীর চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করবে।

ট্রাক্টার নির্মাণ-পরিকল্পনায় মিঃ হেন্‌রি ফার্গুসনের কৃতিত্ব সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। স্বয়ংক্রিয় উত্তোলক যন্ত্রের (automatic implement lift) আবিষ্কার বৃটেনের ট্রাক্টার-শিল্পে বৈপ্লবিক

পরিবর্তন এনেছে। উত্তোলক যন্ত্রের সহযোগিতায় ট্রাক্‌টারের কার্যকারিতা অত্যাশ্চর্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিঃ ফার্গুসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইতোমধ্যে ৫'৩২ কোটি টাকা মূল্যের ট্রাকটারের অর্ডার পেয়েছেন। ফ্রান্স থেকে এসেছে ২'৬৬ টাকার অর্ডার। অন্যান্য দেশের চাহিদাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মিঃ ফার্গুসন বলেন তিনি প্রতি বৎসর ৩৩ কোটি টাকা মূল্যের ট্রাক্‌টার বিক্রয় করতে পারবেন বলে আশা করেন। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই বৃটিশ ট্রাক্‌টারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে। সম্প্রতি আরবে বিমানযোগে 'ফোর্ডসন' ট্রাক্‌টার প্রেরণ করা হয়েছে।

নানা সঙ্কটের মধ্যে খাদ্যাভাব মানুষকে অধিকতর বিচলিত করেছে, তাই স্বল্প ব্যয়ে সর্বত্র উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য আজ অধিকসংখ্যক ট্রাক্‌টার আবশ্যক। বৃটেন এই চাহিদা-পূরণের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। পৃথিবীকে খাদ্যসম্পদে সমৃদ্ধশালী করতে হলে কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের প্রবর্তন করতে হবে এবং সেই জন্য ট্রাক্‌টার-ব্যবহার অপরিহার্য।

(নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত)

'হে নিঃস্ব মানুষ, ভাই, তোমায় প্রণাম'

অধ্যাপক শ্রীশচীনাথ ভট্টাচার্য্য

পুঞ্জীভূত বেদনার ভারে
রাত্রিদিন চলিয়াছ কভু আলো কভু অন্ধকারে ;
কোথায় পথের শেষ ?
জানা নাই, নাই তবু শ্রান্তি-ক্লান্তি লেশ।
স্তুতি-নিন্দা, মান-অপমান
কর তুচ্ছ জ্ঞান।
বিপদের দিনে বন্ধু শুধু ভগবান।

নাই ক্ষয়,
কোথা বা সঞ্চয় ?
অপচয়-ভয় তাই জানে না হৃদয়।
সমাজের নিম্নতম স্তরে
আছ বসি, লাঞ্ছিত ও চিত্ত হতে তাই
বেদনার বাণীও না সরে।
মানীর মানের ধন—বিলাস-ব্যসন
নিত্য তবু দুহাতে জোগাও
নিজেরে রাখিয়া সংগোপন।

হে মূর্ত্ত দীনতা,
নিঃস্ব তুমি, বিশ্বে তবু দিয়েছ পূর্ণতা ;
দুঃখী তব দুঃখে
তাই নব-যুগে
বিশ্বের কবিরা মিলি' মৌন-ভাষে
কালের করুণ কণ্ঠে গায় জয়-গান ;
তোমার সম্মান,
নয় অর্থ, নয় মিথ্যা চাটুকার বাণী,
তোমার উদ্দেশে শুধু
ভক্তি-ভরে নামে অবিরাম
মহতের সন্নত প্রণাম।
হে নিঃস্ব মানুষ, ভাই, তোমায় প্রণাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

৺বিপিনচন্দ্র পাল

('প্রবুদ্ধ ভারত', জুলাই, ১৯৩২ হইতে অনূদিত)

অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

আধুনিক মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে পারে, যেমন স্বামী বিবেকানন্দকেও তদীয় গুরুর জীবনালোকেই বুঝিতে পারা যায়। পরমহংসদেব এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি ছিলেন। কাজে কাজেই তিনি যুক্তিবাদী জনসমষ্টির নিকট এক দুর্বোধ্য রহস্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেন। ভাবুকতা সমস্ত অধ্যাত্ম জীবনের প্রাণ; আর যুক্তিবাদ বলিতে আমরা প্রকৃতপক্ষে ভাবুকতা-রাহিত্যই বুঝি। পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও বার্তা এ যুগের মানুষের বোধগম্য ও উপযোগী করিয়া প্রচার ও ব্যাখ্যা করিবার গুরু দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দের উপর দায়স্বরূপ ন্যস্ত হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সম্প্রদায় বা দলের ছিলেন না। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় সকল সম্প্রদায় ও দলভুক্তই ছিলেন। তিনি যথার্থই সার্বভৌম-ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সার্বজনীনতায় পরিবর্জন ও বিশ্লেষের লেশ ছিল না। সার্বভৌম ধর্মের উপলব্ধির জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও অনুষঙ্গগুলিকে বাদ দেন নাই। তাঁহার নিকট সার্বজনীনতা ও বিশিষ্টতা, সূর্য ও তাহার প্রতিবিম্বের ন্যায়, একসঙ্গে বাস করিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবান্ যুক্তি-তর্ক বা দার্শনিক বিচারের ভগবান্ ছিলেন না; তাঁহার ভগবান্ ছিলেন অপরোক্ষানুভূতির ভগবান্। কেবল প্রাচীন শাস্ত্র, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের অথবা কোন গুরুর প্রামাণ্যের উপরই শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবদ্বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তাঁহার ভগবদ্বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি ছিল স্বকীয় সাধন-প্রসূত প্রত্যক্ষানুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণ দার্শনিক ছিলেন না, আধুনিক বা প্রাচীন পণ্ডিত এবং তার্কিকও ছিলেন না। তিনি যথার্থই একজন সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। তিনি যাহা দর্শন করিয়াছিলেন উহাই বিশ্বাস করিতেন।

যীশুখৃষ্টের ন্যায় পরমহংসদেবেরও জীবন ও বার্তা প্রচারের জন্য একজন ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতার প্রয়োজন হইয়াছিল। যীশু এরূপ একজন ভাষ্যকার পাইয়াছিলেন সন্ত পলের মধ্যে, আর শ্রীরামকৃষ্ণ পাইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃতি ও শক্তির অন্তর্গূঢ় উপাদানটি দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই নিজ বাণী প্রচারের যোগ্যতম যন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষার প্রকৃত কাহিনী। এক অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মহান্ গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উহা ছিল আত্মিক শক্তির অমোঘ প্রভাব। গভীর আধ্যাত্মিক ভূমিতে যখন এক আত্মা অপর আত্মাকে স্পর্শ করে, তখন উভয়ই এক অচ্ছেদ্য দিব্য বন্ধনে চির-সম্মিলিত হন। তদবধি দুই-ই এক হইয়া যান; গুরু শিষ্যের মধ্য দিয়া কার্য করেন, শিষ্য অবগতও নহেন যে তিনি গুরুর সুরে সুর

বাঁধিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। লোকে ইহাকেই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা বলে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ছিল প্রকৃতপক্ষেই আধুনিক মানবের বাণী। স্বদেশবাসিগণের নিকট তাঁহার বার্তা ছিল—"তোমরা মানুষ হও।" গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ন্যায় পরমহংসদেবের নিকটও চরম সত্য একটি ভরবগাহ তত্ত্বমাত্র ছিল না। চরম সত্যের প্রকৃত রূপ নর-লীলায় প্রকট—ইহা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চাক্ষুষ রূপ নহে, পরন্তু ইহা মানুষের চক্ষুর অগোচর এক অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক রূপ। মানুষ ও ভগবান্ স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন।

সমস্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা। মানুষ হওয়ার জন্য যখন স্বামী বিবেকানন্দ সকলের নিকট প্রবেদন জানাইয়াছিলেন তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে এই দেবত্ব-উপলব্ধির জন্যই উদাত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। দেবতার পূজার সময় ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটি ব্যবহার করেন: "আমি ব্রহ্ম। ইহা ব্যতীত আমি অন্য কেহ নই। আমি শোক-দুঃখের অতীত, সৎ-চিৎ-আনন্দ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।" ইহাই বর্তমান জগতের নিকট বিবেকানন্দ-প্রচারিত পরমহংসদেবের বার্তা।

কাল বৈশাখী

শ্রীসংযুক্তা কর, বি-এ

আকাশে ধূলার ঝড় ওড়ে
ধূলা ওড়ে পথে ও প্রান্তরে
ঘূর্ণিপাকে ওঠে তীব্র রব
বাজে শাঁখ দিকে দিগন্তরে।

রিক্তবৃন্ত করবীর ডালে
বেদনার বহ্নি জ্বলে আজি—
বিদ্রোহিণী তাই কৃষ্ণচূড়া
প্রলয়ের শিঙা ওঠে বাজি।

শঙ্কর জাগিছে আজ খ্যাপা
এলায়িত জটা তার দোলে
গ্রহে গ্রহে লাগিছে কাঁপন
বিশ্ব মত্ত মহা কলরোলে।

থর থর কাঁপি উঠে উমা
এত দিনে সাঙ্গ বুঝি তপ-
নিত্য-ভোলা নটরাজ-পদে
নিবেদিত আজি সব জপ।

উল্লাসেতে চমকিয়া ওঠে—
লোলজিহ্ব নাগিনীর দল
স্মরেরে স্মরিয়া কাঁদে রতি
মুক্তবেণী গঙ্গা উতরোল।

বৈশাখের কালরূপ একি
মিলনের মহাগান শুনি
সুপ্ত ছিল যত সম্ভাবনা
এযে তারি পূর্ণতার বাণী।

বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট

ডাঃ অভীশ্বর সেন, এম্-এস্‌সি, পিএইচ্-ডি

আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও চাষবাসের দুরবস্থা আজকাল সবাইকার চোখে প'ড়বে। খাদ্যসঙ্কট কিন্তু আজকার নয়, আকস্মিক কি ক্ষণস্থায়ী, তাও নয়। দেশে অনেকদিন ধ'রে এ অবস্থা ছিল। হয়তো আরো কিছুদিন ধ'রে এ অবস্থাই চ'লবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বেশী খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হ'লে আমরা হয়তো আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারবো, কিন্তু তার থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠতে হবে।

১৯৪৪ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশন (Famine Enquiry Commission) দেখলেন যে লড়াই'র আগেও ভারতবর্ষ কখনও খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী ছিল না। ১৯৩০ খৃঃ অব্দ থেকে ভারতের কৃষিপরিদর্শকরা দেশের লোকদের সাবধান ক'রে আসচেন—আমাদের দেশের কৃষি-ব্যবস্থা মোটেই সুচারু নয়। খাদ্যদ্রব্য-উৎপাদন বেশী হয় না, আর যা হয়, তা থেকে খালি দুই তৃতীয়াংশ লোকদের অন্নসংস্থান হ'তে পারে। তার মানে দেশের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য খেয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে প্রায় ১৩ কোটি লোককে না খেয়ে থাকতে হবে।

দেশের লোক ও তখনকার ভারত সরকার এসব কথায় কান দেননি। ১৯৩৪ খৃঃ অব্দে খাদ্যশস্যের চাষের জমি কমিয়ে যাতে পণ্যশস্যের জমি বাড়ানো হয় তার জন্য একটি পরিকল্পনার ব্যবস্থা হয়। এই পরিকল্পনাটি যদিও ব্যর্থ হয় এবং যদিও খাদ্যশস্য বা পণ্যশস্যের জমির খুব বেশী তফাৎ দেখা যায় নি, চাষীরা নিজেদের ভালো ভালো জমি পণ্যশস্যের জন্য রাখতো নগদ বেশী টাকা পাবে ব'লে। যা কিছু সার যা কিছু যত্ন ঐসব জমিতে ঢালতো,—খাদ্যশস্যের জমি থাকতো প'ড়ে। কাজেই খাদ্যশস্যের পরিমাণ যে ক্রমেই ক'মে আসবে, আশ্চর্য্য নয়।

দেশের খাদ্য উৎপাদনের সামান্য একটা হিসাব নীচে দেওয়া হল:

বৎসর	খাদ্য উৎপাদন (১,০০০,০০০ টন)
১৯২১-২২	৫৪.৩
১৯৩১-৩২	৫০.১
১৯৪১-৪২	৪৫.৭

প্রদেশগুলির মধ্যে যেখানে লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম—পাঞ্জাব, সিন্ধু, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও আসাম, খাদ্যশস্যের কিছু কিছু জন-বহুল প্রদেশগুলিতে—বাংলা, বিহার, সংযুক্ত-প্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে চালান দেয়। তাতেও আমাদের প্রয়োজন মেটে না। চাষীরা ও আমাদের দেশের গরু বাছুর অকালে অর্দ্ধ আহারে অভ্যস্ত আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে। যখন রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী থাকে না, তখনও দেশের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না—শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে কমিয়ে ফেলে। আশ্চর্য্য নয়, আমাদের দেশের লোকের সাধারণ আয়ুষ্কাল মাত্র ত্রিশ বৎসর।

ইংরাজ আমলের আগে দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সব সময় লেগে থাকতো। অনেক সময় দেশের শাসনব্যবস্থার সুশৃঙ্খলা ছিল না।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অনিশ্চিতের মধ্যে কাটিয়ে চাষীরা সকল উৎসাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল। ভারতবর্ষে চাষের দুরবস্থা তখন থেকেই সুরু হয়।

ইংরাজ আমলে দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট খাদ্যশস্যের চাষের উপর বিশেষ স্নেহশীল ছিলেন না। পণ্যশস্যের উপর ঝোঁক ছিল তাঁদের বেশী। তার কারণ তাতে বিলাতের লোকদের ব্যবসার সুবিধা হ'তে পারতো।

এই দুই আমলের মধ্যেই মাটির ও চাষীর উপর চাপ ক্রমেই বেড়ে চ'লেচে। এর ফলে যত শতাব্দীর পর শতাব্দী এগিয়ে চ'লেচে দুর্ভিক্ষও তত বেড়ে চ'লেচে। ৯১৭ খৃঃ অব্দ থেকে ১৯৪৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের একটা মোটামুটি হিসাব নীচে দেওয়া গেল :-[১]

সময় (খৃঃ অব্দ)	প্রতি শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা
৯১৭-১১১৭	১'০
১১১৭-১৫৫৪	৩'৮
১৫৫৫-১৮৯৯	১২'৯
১৯০০-১৯৪৫	১৭'০

আকবরের সময় থেকে এখন পর্যন্ত চাষীর খাজনা বেড়েচে একশ গুণ।[২] ইংরাজ আমলেও এই বৃদ্ধি খুব স্পষ্ট দেখা যায়। ১৯০৮ খৃঃ অব্দ থেকে ১৯৩৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে ত্রিশ বৎসর জমির খাজনা কি রকম বেড়েচে তার একটা হিসাব নীচের অঙ্কগুলিতে পাওয়া যাবে :

প্রদেশ	খাজনা (১৯০৮-১৯০৯) (লক্ষ টাকা)	খাজনা (১৯৩৮-৩৯) (লক্ষ টাকা)
মান্দ্রাজ	৩৬০'৮	৫১৩'৪
বোম্বাই	৩০২'৬	৩৫৪'৬
বাংলা	১৯৫'২	৩২৪'১
সংযুক্তপ্রদেশ	৪৫৪'৭	৫৮১'৭
পাঞ্জাব	১৪৭'৩	২৬৩'৫

ভারতবর্ষের জনসংখ্যাও দ্রুত গতিতে বেড়ে চ'লেচে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষে যত লোক ছিল ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে ভারতের জনসংখ্যা তার দ্বিগুণ হ'য়েচে। গণনা ক'রে দেখা গেছে ২০০০ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা হবে ৭০ কোটি।[৩]

মানুষের খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনের কথা উঠে। আমাদের দেশের চাষবাস গবাদি পশু নিয়েই হ'য়ে থাকে। গরু মানুষের একটি অতি প্রয়োজনীয় খাবার দুধও সরবরাহ করে। গোবর সার ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মানুষের খাদ্য-উৎপাদনও কৃষিসমস্যা ও গবাদি পশুর খাদ্যসমস্যার সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

১৮৮০ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন (Famine Commission) আমাদের দেশের গবাদি পশুর দুর্দ্দশার কারণ তাদের খাদ্যাভাব বলে ধ'রেচেন। এর থেকে দুটি জিনিষ আমাদের চোখে পড়ে। একটি হ'চ্চে আমাদের দেশের গবাদি পশুর দুর্দ্দশা ও খাদ্যাভাব অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে আছে। আর একটি হ'চ্চে পশুর খাদ্যাভাব আমাদের দেশের চাষবাসের অধঃপতনের আংশিক কারণ।

অনেকের ধারণা[৪] আমাদের দেশে গবাদি পশুর সংখ্যা খুব বেশী এবং আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু হিসাব ক'রে দেখলে দেখা যাবে প্রতি ত্রিশ বিঘা জমির জন্য আমাদের মাত্র আছে দুটি ক'রে বলদ আর দুটি ক'রে গরু।

১ Dr. B. Viswanath—Journal of the Benares Hindu University, VoL II, No 1.

২ সুধী প্রধান—কৃষি ভারতের নগ্নরূপ।

৩ Indian Information, May 1944.

৪ M. Masani—Our India.

এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্চে জমির উৎপাদন বাড়ান। মানুষ শস্যকণা নেবে তার খাবাবের জন্য, গবাদি পশুর জন্য থাকবে পরিত্যক্ত খড়। জল থাকলে পতিত জমিতে গরুর খাবারের উপযোগী তৃণ জন্মানো যেতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে যে মানুষের খাদ্যশস্যের বদলে পশুর খাবার তৈয়ার হবে আমাদের জমিতে তা কখনও সম্ভব নয়।

খাদ্য-সমস্যা যে কত গুরুতর তা এখন সকলের চোখেই পড়চে। ১৯৪৬ খৃঃঅব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টকে দেশের বাহির থেকে খাদ্যশস্য আনতে আর তা দেশের মধ্যে বিতরণ করতে প্রায় একশ কোটি টাকার উপর খরচ করতে হ'য়েছিল। ভারতবর্ষের ঘাটতি খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে কিনতে গড়পড়তা প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা করে বছরে খরচ হবে ব'লে মনে হয়। গত নয় বৎসর ধ'রে খাদ্যশস্যের বাবদ গভর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর প্রায় একশ কোটি টাকা খরচ ক'রচেন।[৫]

কিন্তু তাই ব'লে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যা বরাবরই আছে। আমাদের অর্দ্ধাহার ও অনাহার সহ্য হ'য়ে গেছে। এই অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য স্বাভাবিক ভয় এমন কি ভালো মানুষকেও খাদ্যশস্য জমিয়ে রাখবার জন্য প্রলুব্ধ ক'রে রাখে। আমরা যদি দৃঢ়ভাবে এই সকল প্রবৃত্তি দমনের ব্যবস্থা ক'রে রাখি আর অনেক জিনিষ নষ্ট না হ'তে দিই, মনে হয়, খাদ্যসমস্যা এত তীব্র হ'য়ে উঠবে না।

দেশের উৎপাদন বাড়াবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনেক পরিকল্পনা ক'রেচেন। অনেকে জনসংখ্যার দ্রুত বিস্তৃতি দেখে মনে করেন ভারতের খাদ্যাভাব স্থায়ী ভাবে কখনও দূর হবে না। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে ঠিক তা নয়। এক সময় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বেড়েচে শতকরা ৩৬ জন ক'রে। ইংলণ্ডে ঠিক ঐ সময়ে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৫৪ জন। শুধু তাই নয়, গত একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েচে প্রায় তিন গুণ, ভারতবর্ষে মাত্র দ্বিগুণ হ'য়েচে। অন্যান্য দেশের যদি খাদ্যাভাবের কষ্ট না হয়, তা হ'লে আমাদের দেশেই বা কেন হবে?

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যশস্য-উৎপাদন তাল রেখে চ'লতে পেরেচে তার কারণ সে সব দেশের চাষীরা নিজেদের কৃষিসমস্যাগুলির সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখে, আর বাইরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেদের পরিবর্ত্তিত করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য দুইই তাদের আছে। আমাদের দেশের চাষীদের অসামান্য দক্ষতা, উর্ব্বর মাটি, ও অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা কিছুরও অভাব নেই। আমাদের জনসংখ্যার অতিরিক্ত লোকদের খাওয়াবার ক্ষমতা আমাদের আছে। কৃষি-গবেষণাগারগুলিতে সঞ্চিত আছে অমূল্য জ্ঞানসম্পদ, শুধু দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলানোর,—আমাদের কৃষিকে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন-গুলির সঙ্গে তাল রেখে চলার।

অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের চাষীরা চিরাচরিত প্রথায় ছোট ছোট জমি নিয়ে চাষ করে, তাতে উৎপাদন খুব কম হয়। ছোট ছোট জমি ভেঙে বড় বড় জমি ক'রে বিদেশী প্রথায় চাষ ক'রলে উৎপাদন খুব বেশী হবে। কিন্তু কথা হ'চ্চে তাতে আমাদের দেশের বহু চাষী নিজেদের জীবিকা হারাবে, ভূমিহীন মজুরদের সংখ্যা অনর্থক বাড়বে। তাদের কাজের যোগাড় না হ'লে বেকার-সমস্যা তীব্র হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তবু যদি আমাদের জমির উৎপাদন বাড়ে, হয় তো তাই আমাদের ক'রতে হবে। বড় জমিতে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করা লাভজনক হয় শুধু সেখানে, যেখানে দেশের জনসংখ্যা কম, মজুরের বেতন খুব বেশী আর

৫ Hindustan Times—9th April, 1948.

সত্যিই যদি জমির উৎপাদন বাড়ে। রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের পরস্পর তুলনা করলে দেখা যায়, প্রতি বর্গমাইলে রাশিয়ায় আছে ২০জন লোক, আমেরিকায় ২৮ জন, আর ভারতবর্ষে আড়াই শ' লোক। সেই হিসাবে ভারতবর্ষে যন্ত্রের সাহায্যে বড় জমিতে চাষ সুবিধার হবে না।

রাশিয়ায় যদি ফসল উৎপাদনের হিসাব করা যায়, দেখা যাবে (১৯০৯ থেকে ১৯৩৫) উৎপাদন বিশেষ কিছু বাড়ে নি। লড়াইএর আগে একর পিছু যা ফলন ছিল, ১৯৩৫এও তাই আছে। ইংলণ্ডের ১৯২১ খৃঃ অব্দের একটা হিসাবে দেখা যায় চাষীর জমির পরিমাণ যত কম একর পিছু ফলন ও আয় তত বেশী।

১৯৪৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত একটি হিসাবে নানা দেশের ফলন ও চাষীদের মাথা পিছু জমির পরিমাণ থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়ঃ

দেশ	চাষী পিছু জমির পরিমাণ	প্রতি একশ একরে আয়ের পরিমাণ (পাউণ্ড)
নিউজিল্যাণ্ড	১২৩	৩৬৫
যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা	৮৮	২১২
অষ্ট্রেলিয়া	৬৮	৪৪২
কানাডা	৫৯	২৩৫
ইংলণ্ড	২৮	৭২১
ডেনমার্ক	২৫	১০৩৪
আয়ার্লণ্ড	১৮	৩৬১
ফ্রান্স	১১	৭৮২
সুইজারল্যাণ্ড	১১	৯৪৫
জার্ম্মাণী	৮	৮৫৫
হলাণ্ড	৮	১৪১৩
বেলজিয়ম	৭	১৩৫০

বড় বড় যুদ্ধের পরে, দেশের কৃষিব্যবস্থাগুলি যখন ধ্বংস হ'য়ে যায় তখন যে সব দেশের চাষীরা ছোট ছোট জমি নিয়ে চাষ করে তারা খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধের আগেকার উৎপাদন ফিরে আনতে পারে। বড় বড় জমি নিয়ে চাষীরা যেখানে চাষ করে, তাদের আগেকার অবস্থায় ফিরে আসতে অনেক দেরী হয়। ডেনমার্ক তারই উদাহরণ।

ধান হ'চ্চে আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। ভারতের জমির শতকরা ৩১ ভাগে জন্মায় ধান, ১০ ভাগে গম, আর মাত্র ৫ ভাগে অন্যান্য খাদ্যশস্য। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ জন ভাত খায়, চাষীদের সকলকার চেয়ে বেশী লোক ধান চাষ করে। কাজেই ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে ধানের উৎপাদন বাড়ানো নিবিড় ভাবে বিজড়িত। ধানের চাষে জলের প্রয়োজন সকলকার চেয়ে বেশী। অতীতের সকল উৎপাদন-পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হ'য়েছে শুধু এই জলের অভাবেই।

দেখা গেছে চাষের জমির শতকরা মোট ২২ ভাগে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। বাকী জমির চাষ করা হয় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। খাদ্য উৎপাদন প্রসঙ্গে সবাই দেশের বিস্তৃত পতিত জমিগুলির দিকে নজর দিচ্চেন। কিন্তু যেখানে চাষের জমিতেই জল দেবার জল নেই, সেখানে জমি বাড়িয়ে জল দেবার কি ব্যবস্থা হবে?

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে শুধু জলসেচের ফলেই শস্যের ফলন অনেকগুণ বাড়ানো যায়।[৬] সার দিয়ে আর উন্নত ধরনের বীজে ফসলের ফলন এত বাড়ানো যায় না।[৭] সুতরাং দেখা যাচ্চে খাদ্য-উৎপাদন বাড়াতে হ'লে সকলকার প্রথমে দরকার প্রভূত জলের ব্যবস্থা করা।

অধুনাতন কৃষিবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত

৬ C. H. Parr—Indian Farming, March 1948,

৭ W Burns—Technical Possibilities of Agricultural Improvements in India.

করার জন্য ভারত সরকার বহু ছাত্রকে বিলাতে পাঠিয়েছেন। আমাদের সর্ব্বপ্রথম দরকার ছিল বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারের। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি বিস্তৃত জল-সেচের বন্দোবস্ত থাকতো, খাদ্য-উৎপাদন আপনা আপনিই বেড়ে যেতো। আমাদের দেশে শস্য সময়মত জল পায় না, সাধারণ গঠন তাদের হয় না, অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গড়ে উঠে বলে উদ্ভিদের রোগ তাদের মধ্যে এত বেশী। দরকার মত জল পেয়ে গাছ বেড়ে উঠলে, গাছের রোগও কম হয়, লোকসানও এত বেশী হয় না।

জমির উর্ব্বরতা-শক্তির কথা উঠলেই আমাদের কৃষিসংশ্লিষ্ট রাজপুরুষেরা এবং বৈজ্ঞানিকেরা গোবর সারের কথা ভাবেন। বিদেশে রাসায়নিক সারের প্রচুর প্রচলন হ'য়েছে। রাসায়নিক সারের প্রচুর ব্যবহারের ফলেই ১৯৩৮ খৃঃঅব্দের শেষে ইটালীতে খাদ্যাভাব দূর হ'য়েছিল। রাসায়নিক সারের এত বেশী প্রচলনের মূলে আছে তার সস্তা দাম আর ঢের বেশী কাজ।

হিসাব ক'রে দেখা গেছে, একমণ শুকনো ঘুঁটে বাজারে অনায়াসে দু' টাকায় বিক্রি করা যায়। ঐ এক মণ ঘুঁটের ভিতর গাছের খাবার যা থাকে (ঘুঁটে পোড়ালে যেটুকু খালি নষ্ট হয়—নাইট্রোজেন) তা কেনা যায় রাসায়নিক সারে মাত্র কএক আনায়। সার হিসাবেও গোবর রাসায়নিক সার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিলাতে[৮] এমন কি ভারতবর্ষেও[৯] দেখা গেছে রাসায়নিক সারের নাইট্রোজেন গোবরের নাইট্রোজেন অপেক্ষা দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট। আমাদের চাষীরা বোকা নয়। তাই গোবর সম্বন্ধে হাজার বক্তৃতা দেওয়া হ'লেও, দেশী বিদেশী অনেক বই লেখা হ'লেও তারা গোবর পুড়িয়েই থাকে, আর পোড়াবেও যত দিন না তারা কোন সস্তা জ্বালানী পায়। সে যখন এত সহজে সম্ভব হবে না তখন আমাদের উচিত গোবরের কথা বাদ দিয়ে দেশের স্থানে স্থানে রাসায়নিক সার তৈরীর কারখানা স্থাপিত করা, আর চাষীরা যাতে তা সহজে কিনতে পারে এর জন্য বিতরণ-কেন্দ্র তৈরী করা। তবেই আমাদের দেশে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

৮ Rothamsted Experiments

৯ Report on the results of Cotton Manurial Trials in India, Indian Central Cotton Committee, 1942.

"ধর্ম্মকথা শুনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অসময়ের সংস্থানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্যাল, এম্‌-এ

মা লক্ষ্মী একে কৃপণা তায় চঞ্চলা। মুষ্টিমেয় কয়েক জন অবশ্য তাঁর কৃপালাভ করেন প্রচুর ভাবেই, সাংসারিক ভাবনাচিন্তার বালাই বিশেষ তাঁদের নেই। এই ভাগ্যবানদের গোষ্ঠীবহির্ভূত যারা, অভাব অনটন দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার সম্মুখীন হতে হয় তাদের জীবনের পদে পদে। দিনে এনে দিন-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় তাদের, অথচ জীবনে দুর্যোগের ত অন্ত নেই। আপদ-বিপদের সময়ে যথাযথ সংস্থান করা তাদের সাধ্যাতীত এবং এ অবস্থায় কোন কারণে হঠাৎ বিপন্ন হয়ে পড়লে তাদের অবস্থা কত অসহায় হয় সহজেই বোঝা যায়। কোন দুর্ঘটনায় হয়ত একজন মারা গেল, তখন তার ছেলেপুলেদের কি গতি হবে? সে কিছু রেখে যেতে পারেনি বলেই কি তাদের পথে দাঁড়াতে হবে? অসুখবিসুখে পড়ে থাকলেই বা তার সংসার চলবে কি করে, আর ঔষধ-পত্রই বা সে কিনবে কেমন করে? বার্দ্ধক্যে অক্ষম বা হঠাৎ বেকার হয়ে পড়লেও সেই একই সমস্যা। আয়ের এই ক্ষীণ অনিশ্চিত ধারা 'মানব-জমিন' সরস রাখবে কেমন করে? এছাড়া রকমারি খরচ-খরচা তো সংসারে আছেই। ছেলেদের মানুষ করতে হবে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ঘটা করে মৃত আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধ করতে হবে। স্বল্প আয় থেকে এই সব খরচ মেটাতে গিয়ে তাকে অনেক সময়ই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পরম দৈন্যের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কিন্তু, কেন?

আমাদের এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে হবে যেখানে জীবনের সমস্ত আকস্মিক প্রয়োজনের সংস্থানের দায়িত্ব নেবে সমাজ। রোগে শোকে, দুঃখে দারিদ্র্যে, আপদে বিপদে সমাজের প্রত্যেক লোককে রক্ষা করবার এমন এক সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থা থাকবে যাতে ভাগ্যের দোষে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকতে না হয় কাউকে।

এই স্বপ্ন সম্প্রতি রূপ নিয়েছে ইংলণ্ডে প্রখ্যাত "বেভরিজ-পরিকল্পনায়" (Beveridge Plan)। Lord Beveridge জন্মেছিলেন বাংলাদেশের রংপুর জেলায়। তাঁর বাবা সিভিলিয়ান হিসেবে এসে সমস্ত কর্ম্মজীবন এখানেই কাটান। পরবর্ত্তী কালে London School of Economics-এর Director-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় ছাত্রদের নানা ভাবে সাহায্য করে বেভরিজ সাহেব তাঁর জন্মস্থানের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখিয়েছিলেন।

আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থানের যে ব্যাপক ব্যবস্থা "বেভরিজ-পরিকল্পনায়" হয়েছে তার পেছনে রয়েছে দেশের দুঃস্থ ও বিপন্নদের সমস্যাসমাধানের দীর্ঘদিনের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা। সেই হিসেবে এই পরিকল্পনা এক ক্রমবিকাশের সার্থক পরিণতি মাত্র, এবং এটিকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে সেই ক্রমবিকাশের পরিচয় পেতে হবে।

অর্থনৈতিক সংস্থানের সমস্যাকে প্রধানতঃ যন্ত্র-সভ্যতাযুগের সমস্যা বলা যেতে পারে। যন্ত্রসভ্যতা আসার আগে, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা এবং সকলেরই পেটচলার মত কিছু জমিজমা থাকায় দুর্দ্দিনে একেবারে অসহায় হয়ে পড়তে হোত না। কিন্তু

যন্ত্রশিল্পপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনে এল বিরাট পরিবর্ত্তন, ধনধান্যে ভরা গ্রামগুলি নষ্ট হয়ে গেল একে একে। জমিজমা খুইয়ে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় জীবিকানির্বাহের জন্য শহরে দলে দলে লোক আসতে লাগল এবং সেই সঙ্গে সৃষ্ট হল অর্থনৈতিক সংস্থানের সমস্যা।

প্রথমটা ধনীদের মহানুভবতা ও দাক্ষিণ্যের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই সমস্যা-সমাধানের ভার। অসহায় এবং দুঃস্থদের সাহায্যে মুক্তহস্ত হবেন তাঁরা সমাজের এই হল অনুশাসন। দরিদ্র-নারায়ণসেবার খানিকটা ভার নিলেন বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান। পুণ্যার্জ্জনের দিক থেকে এই রকম দয়াদাক্ষিণ্যের যত মূল্যই থাক, এ রকম সাহায্যের ব্যবস্থায় সমস্যাসমাধান সম্ভব নয় সহজেই বোঝা যায়। দুঃস্থদের রাষ্ট্র থেকে সাহায্য করবার প্রথম আয়োজন করা হয় ইংলণ্ডে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে Poor Relief Act প্রবর্ত্তনের সঙ্গে। সাহায্য দেবার সর্ত্ত এতই কঠোর ছিল এবং যারা সাহায্য নিত তাদের এত উপেক্ষা সহ্য করতে হত যে নিতান্ত অক্ষম যারা তারাই এর সুযোগ নিতে বাধ্য হত। শ্রমিকরা জীবনের অনিশ্চয়তার সংস্থান করবার জন্য নিজেদের সমবেত চেষ্টায় ছোট ছোট যৌথ বীমা সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। এই সমিতিগুলিকেই বর্ত্তমান ট্রেড ইউনিয়নের জনক বলা যেতে পারে। কিন্তু শ্রমিকদের আয় এতই পরিমিত যে সমবেত চেষ্টা দ্বারাও নিজেদের যথাযথ অর্থনৈতিক সংস্থান করা তাদের সম্ভব নয়, শ্রমিক শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার শ্রমিকরাই এ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পেরেছিল। যন্ত্রশিল্পের ফলে সম্বলহীন শ্রমিকদের যে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয় তার সংস্থান করবার সমস্ত দায়িত্ব তাকে নিতে হবে কোন্ যুক্তিতে? এ প্রশ্ন আসতে লাগল অনেকের মনে। তাই কারখানায় কাজ করবার সময় কোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে শ্রমিককে মালিকের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হোলো ১৮৯৭ সালের Workmen's Compensation Act-এ।

রাষ্ট্র এ পর্য্যন্ত নিজের দায়িত্ব প্রায় এড়িয়েই চলছিল। ১৯০৮ সালে প্রথম বার্দ্ধক্যে সঙ্গতিহীন লোকদের রাষ্ট্র থেকে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হোল। এর ফলে জীবনের একটা মস্ত দুর্ভাবনার বার্দ্ধক্যের সংস্থান-দুর্ভাবনার—খানিকটা নিরসন হোল।

কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনের সংস্থান না করে, শ্রমিক-মালিক এবং রাষ্ট্রের সমবেত চেষ্টায় সমস্ত প্রয়োজনগুলির যুগপৎ সংস্থান করাই ভাল সকলে উপলব্ধি করলেন। ১৯১১ সালের Health Insurance Bill-এ প্রথম এই নীতি স্বীকৃত হয়। এই আইনের দ্বারা দুর্ঘটনা, অসুস্থতা এবং স্ত্রী-কর্ম্মীদের প্রসূতি-অবস্থায় বিনা খরচে চিকিৎসা এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য শ্রমিক মালিক এবং রাষ্ট্রের দেয় অর্থ নিয়ে একটি তহবিল স্থাপন করা হয়। দেয় সাপ্তাহিক চাঁদার হার এবং প্রয়োজনের সময় সাহায্যের পরিমাণ আয়-নিরপেক্ষভাবে সকলের পক্ষে সমান হবে। ইংলণ্ডের সামাজিক সংস্থান-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। এ ছাড়া যে সব শিল্পে অবস্থার পরিবর্ত্তনে বেকার-সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের কর্ম্মীদের বেকার অবস্থায় সাহায্য দেবার ব্যবস্থাও হয় এই বছর থেকে।

এই ভাবে জীবনের অধিকাংশ প্রয়োজনের সংস্থান বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালে এই ব্যবস্থাগুলিকে অনেক উন্নত করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনগুলির সংস্থানব্যবস্থা ভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে হওয়ায় ব্যবস্থাগুলির ভেতরে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে অসুস্থতার জন্য আয় করতে না পারলে সর্ব্বোচ্চ সাপ্তাহিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৮ শিলিং

(তা-ও আবার প্রথম ২৬ সপ্তাহের পর কমিয়ে ১০ শিলিং ৬ পেন্স করা হবে) কিন্তু বেকার হলে সাহায্য মিলবে সাপ্তাহিক ৩৮ শিলিং আর কারখানায় দুর্ঘটনার জন্য কাজ করতে না পারলে সাহায্য পাওয়া যাবে সাপ্তাহিক ৪৩ শিলিং হিসাবে। উপার্জ্জন নষ্ট হওয়ার কারণ অনুসারে সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া এত দিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক সংস্থানের আয়োজন করার চেষ্টা হয়েছে, অন্যেরা বাদ পড়েছে যদিও তাদের প্রয়োজন কিছুমাত্র কম নয়। এই সব ত্রুটি সংশোধন করে ১৯৪২ সালে Lord Beveridge দেশের সমস্ত লোকের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনের উপযুক্ত সংস্থানের এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, বার্দ্ধক্য বা কাজের অভাবের দরুন যদি কেউ উপার্জ্জনহীন হয়ে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ২৪ শিলিং অর্থাৎ ১৬৲ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে তার ভরণপোষণের জন্য। এর ওপর পোষ্য-পরিজনের প্রত্যেকের জন্য সাপ্তাহিক ১৬ শিলিং এবং প্রতিটি নাবালক ছেলের ভরণপোষণের জন্য ৮শিলিং হিসেবেও তাকে দেওয়া হবে রাষ্ট্র থেকে। অর্থাৎ উপার্জ্জনহীন অবস্থায় স্বামী স্ত্রী ও দুটি নাবালক ছেলের একটি পরিবার সপ্তাহে ৫৬ শিলিং অর্থাৎ মাসে ১৫০৲ টাকা পাবে নিয়মিতভাবে বিনাসর্ত্তে। এ ছাড়া সকলের জন্য বিনে পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিয়েতে "Marriage grant", শবসৎকারের সময় ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৮০৲ টাকার "Funeral grant", সন্তানপ্রসবের সময় ৪ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৫৲ টাকার "Maternity grant" তো আছেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন সময়েই, কোন কারণে যেন কাউকে বিপন্ন হয়ে জীবনের আনন্দ ও উৎসাহ হারাতে না হয় তার কি সুষ্ঠু ব্যবস্থা! মোটামুটি সচ্ছল ভাবে জীবনযাপন করবার অধিকার থাকবে দেশের প্রত্যেকটি লোকের। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনার ব্যয়ের অঙ্ক বেশ মোটা ধরনের হবে। এই ব্যয়ের একটা অংশ দেবেন রাষ্ট্র। এতে রাষ্ট্রের ব্যয় আপাততঃ ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড হবে। বাকী অংশটা নির্ব্বাহ করা হবে শ্রমিক এবং মালিকের প্রদত্ত অর্থে। পুরুষ শ্রমিকেরা প্রতি সপ্তাহে ৪ শিলিং ৩ পেন্স করে, স্ত্রী-কর্ম্মীরা দেবে ৩ শিলিং ৬ পেন্স হারে, আর মালিক দেবেন প্রতি পুরুষ শ্রমিকের মাথা পিছু ৩ শিলিং ৩ পেন্স এবং স্ত্রী শ্রমিকের মাথা পিছু ২ শিলিং ৬ পেন্স।

এই বিরাট পরিকল্পনার দুঃসাহসিকতা আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করবে সন্দেহ নেই। জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশাকে বিধির বিধান বলে মেনে নিতে হবে আমাদের, কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে বিনা প্রতিবাদে এই বিশ্বাস রয়েছে আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। কিন্তু অন্য দেশের ঢেউ এসে লেগেছে আমাদের দেশেও এবং সহায়সম্বলহীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করবার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী উঠেছে এখানেও।

১৯২৩ সালে, কারখানায় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে মালিকের শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থার দ্বারা বিপন্ন শ্রমিকের সাহায্যের প্রথম আয়োজন করা হয়। তারপর বিভিন্ন প্রদেশে স্ত্রী-শ্রমিকদের প্রসূতি-অবস্থায় সাহায্য দেবার বিধানও মালিকদের প্রতি দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেবলমাত্র মালিকদের ওপর ন্যস্ত থাকায় ফল আশানুরূপ হয়নি। শ্রমিকের অজ্ঞতা ও অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে বঞ্চিত করা মালিকের পক্ষে বিশেষ শক্ত নয়।

স্বাধীন ভারতের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুত জগজীবন রামের চেষ্টায় এবং বহুদিনের আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি শ্রমিকদের রোগে, দুর্ঘটনায় এবং স্ত্রী-

শ্রমিকদের প্রসূতি-অবস্থায় সাহায্য করবার জন্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত এক সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থা করা হয়েছে Workmen's State Insurance Bill-এ। তুমুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে এই বিল গত ২রা এপ্রিল ভারতীয় বিধানপরিষদে আইনে পরিণত হয়। মালিক এবং শ্রমিকদের প্রদত্ত সাপ্তাহিক চাঁদা নিয়ে "Workmen's State Insurance Fund" নামে একটা তহবিল সৃষ্টি করা হবে। এর থেকে শ্রমিকদের সাহায্য দেওয়া হবে আয় অনুসারে। প্রসূতিদের সাহায্য দেওয়া হবে ১২ সপ্তাহের জন্য এবং অসুস্থতার জন্য সাহায্য দেওয়া হবে দৈনিক আয়ের অর্দ্ধেক হিসেবে বৎসরে আট সপ্তাহ। সমস্ত ব্যবস্থাটি নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে "Workmen's State Insurance Corporation" নামক একটি সংসদের ওপর, এর অধিকাংশ সদস্যই হবেন রাষ্ট্রের মনোনীত। নিয়ন্ত্রণব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ প্রথম পাঁচ বছর দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। এ ছাড়া বিনা মূল্যে শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে এই আইনে এবং চিকিৎসার ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ দেবেন প্রাদেশিক সরকারেরা।

অন্য দেশের তুলনায় আমাদের প্রয়োজন খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হবে সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র তিনটি প্রয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছে এতে, তাও সকলের নয় কেবল শ্রমিকদের জন্য। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আমাদের মত গরীব দেশে রাতারাতি সেটা বসিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় সকলেই স্বীকার করবেন।

বিপন্নের অর্থনৈতিক সংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের এই আইনের দ্বারা প্রথম সেইটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং সেই স্বীকৃতিটাই সব চেয়ে বড় কথা।

বিবেকানন্দ

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সেদিন ছিল না আলো,
সমাজের বক্ষ জুড়ে শুধু অন্ধকার,
অসত্যের অভিযানে
পথভ্রান্ত মুহ্যমান নরনারী সবে
তুমি এনে দিলে জ্ঞান।
অন্ধ আঁখি 'জ্ঞান-যোগে' ফোটালে সবার।
মুগ্ধ সবে দলে দলে
তোমারে ঘিরিয়া আসি দাঁড়াল নীরবে।
শুধু তো এখানে নয়—
তোমার সত্যের যাত্রী দেশ-দেশান্তরে।
অমর হইয়া আছে
তব কীর্তি! অমলিন তব যশোগাথা।
পথের ধূলার থেকে
মানুষেরে টেনে নিয়ে এলে নিজ ঘরে;
মানুষ শিখিল সেবা,
তোমার আদর্শ সবে নিল পেতে মাথা।
ভুলেছি আজিকে মোরা
তোমার সে দিব্যদান পূর্ণ আশীর্ব্বাদ।
দেশে দেশে হানাহানি
তাই আজ রাজা রাজ্য করে ছারখার
মানুষের করি ঘৃণা,
আত্মজন সনে করি বাদ-বিসংবাদ।
পুনঃ এসে দূর কর
হে স্বামীজী, আমাদের মিথ্যা অহঙ্কার।

জাতির অভিশাপ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী

জাতির পক্ষে অস্পৃশ্যতার মতো এতো বড়ো অভিশাপ মনে হয় আর কিছুই থাকতে পারে না। এ পাপ কোন্ কুক্ষণে জেঁকে বসে পড়লো এসে এজাতির বুকের ওপর জগদ্দল পাষাণ ভারের মতো—তা' সঠিক নিরূপণ করা শক্ত।

তবে একথা সংশয় না রেখেই বলা চলে এমন একটা যুগান্ধকার নেমে এসেছিল ভারতের বুকে, যার অতলে ডুবে গেলো যা কিছু সভ্যতার সম্পদ এ জাতির। সে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর প্রভুত্বলোভী পণ্ডিতম্মন্য, ঋষিম্মন্য যুগধুরন্ধর অধিকার করে বসলেন প্রভুত্বের আসন সমাজশাসনের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে। মানুষ তখন দৃষ্টিহারা, দিশেহারা। এঁরা যে পথের নির্দেশ দেন তারা তাই মেনে নেয় নতমস্তকে দেবতার আশীর্বাণীর মতো। বৃটিশরা আপন শোষণ-দণ্ড কায়েম রাখবার জন্য এদেশে এসে আশ্রয় নিলে ভেদ-নীতির, আজ স্বাধীনতা পেয়েও যার জন্য আমরা দাঁড়াতে পাচ্ছি না নিজের পায়ে মেরুদণ্ড সোজা করে। এঁরাও কতকটা এই নীতিই অনুসরণ করলেন।

আজ আমাদের সে কথা ভুলতে হবে—মানুষ মানুষের কাছে অস্পৃশ্য থাকতে পারে, আমাদের প্রাণের সঙ্গে অনুভব করতে হবে—এ বিষ ঝেড়ে না ফেলতে পারলে জাতির ধ্বংস কেউ পারবে না রুখতে—স্বয়ং বিধাতাও নয়।

আমাদের আর ঘুমিয়ে কাল বিলম্ব করা চলবে না। আমাদের আজ বোঝবার সময় এসেছে—এতদিন ধর্মের নামে মহা অধর্মের যে হিমাচল আমরা বয়ে মরেছি তার সত্তাকে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে। যে ধর্ম আর্য-ঋষিদের প্রবর্তিত—যার ওপর ভিত্তি করে এত বড়ো জাতি এত বিরাট সভ্যতা উঠেছে গড়ে—খুঁজে ব'র করতে হবে তাকে আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে ফেলে। তবেই জাতির কল্যাণ নইলে নয়।

এক শ্রেণীর গোঁড়া সনাতনী উদাত্তকণ্ঠে তাদের প্রতিবাদ তুলে বলবেন—এই আমাদের ধর্মের নির্দেশ, সনাতন রীতি—একে না মানলে নরকে যেতে হবে।

যাঁরা এ মতবাদ এবং ধারণা পোষণ করেন তাঁরা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, আমাদের ধর্মের কোথাও যে এমন মানব-বিগর্হিত উপদেশ থাকতে পারে না তাই এখন প্রমাণ করা প্রয়োজন।

যে বেদ আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ এবং আদি নিদর্শন তাতে আমরা কোথাও খুঁজে পাই না—মানুষ মানুষের কাছে অস্পৃশ্য হতে পারে তার কোন নির্দেশ বা প্রমাণ। বর্ণভেদ-প্রথাই তখন ছিল না। ছিল দু'টো মাত্র শ্রেণী—সভ্য অর্থাৎ আর্য আর বর্বর অর্থাৎ অনার্য। বেদের কোন কোন অংশে তাদের শ্বেত ও কৃষ্ণ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। তাই বলে এমন কোন প্রমাণ তার থেকে পাওয়া যায় না বিংশ-শতকের অতি সভ্য শ্বেত জাতিরা যেমন বর্ণ-বিদ্বেষের পরিচয় দিচ্ছে, তেমন বা সামান্যতরও বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল তাদের মধ্যে। কৃষ্ণ জাতির বর্বরতা যখন এসে শ্বেতদের সভ্যতায় আঘাত

হানলো তখন দু'দলে সংঘর্ষ লাগলো ঠিক—কিন্তু আর্যরা তাদের বশে নিয়ে এল। আধুনিক সুসভ্য শ্বেতাঙ্গরা দাস জাতিদের যেভাবে পশুর অধম করে রেখে ব্যবসা চালাতো প্রাচীন আর্য-সভ্যতায় তা ছিল না, আর্যরা তাদের শিক্ষা দিয়ে স্ব-সমাজভুক্ত করে নিতো। যারা তা চাইতো না তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হতো সভ্য-সমাজ থেকে।

পরবর্তী যুগের তথ্য খুঁজে দেখলেও জাতি-ভেদের কোন নজির চোখে পড়ে না। মূল বেদ থেকে যখন শাখা বেদের সৃষ্টি হয় তখন দেখা যায় মাত্র চারিটি বর্ণের উল্লেখ—জাতির নয়। জাতি ঠিক একটিই আর্য।

একটা জাতিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করার কারণ ছিল। মানুষমাত্রই সম-যোগ্যতার অধিকারী নয়। সমাজ বা রাষ্ট্রকে সুনির্দিষ্ট পথে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে চালিয়ে নিতে হলে যোগ্যতা-ভেদে কাজের ব্যবস্থা করতে হয়। সে জন্যে প্রখরচিন্তাশীল এবং দীপ্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানসিক বলে বলীয়ান লোকদের বেছে ব্রাহ্মণ্য-পদে রাখা হলো। বাহুবলে বলীয়ান যাঁরা রাষ্ট্ররক্ষার কাজে তাঁরা নিয়োজিত হলেন, ব্যবসা আর কৃষিবিদ্যায় পারদর্শীদের রাখা হলো সে সব কাজে। যারা এসবের কোন কাজেরই যোগ্য নয় তারা ঐ তিন শ্রেণীর চাকরি করেই জীবিকা চালাতো। এমন সুন্দর নিয়মতান্ত্রিক প্রথার মধ্যে ভেদবুদ্ধি বা অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন যে কী করে জাগতে পারে ভেবে পাওয়া বড় শক্ত।

"শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে। আবার ব্রাহ্মণও শূদ্রত্বে নেমে যেতে পারে। কারণ গুণ এবং কর্মই পদমর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি, জন্ম নয়"—মনু ১০।৬৫। মনুর একথা থেকেই প্রমাণিত হয় না কি আজকালকার মতো জন্মগত অধিকার নিয়ে নির্গুণ হলেও অধিকার দাবী করা চলতো না সে কালে? মনুর আরো একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি তাঁর সংহিতার ২।২৪০ শ্লোকে বলছেন—"স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, হিতকথা ও শিল্পকলা প্রভৃতি সকলের কাছ থেকে গ্রহণ করবে।" শুধু এখানেই শেষ নয়, আর্য সভ্যতায় কোন কালে যে জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার বালাই ছিল না তার কয়েকটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায় দেবর্ষি নারদ ছিলেন একজন দাসীপুত্র। ভাগবতের প্রারম্ভে তিনি নিজের মুখে এ কথা ব্যক্ত করেছেন। অথচ তাঁর জন্ম নিয়ে কোন প্রশ্নতো ওঠেনি—তিনি ছিলেন ত্রিজগৎপূজ্য। ব্রহ্মবিদ্ ঋষিদের অন্যতম সত্যকাম কে? তাঁরও পিতার পরিচয় নেই, মাতা দাসী (ছাঃ ৪।৪।১)। মহামুনি বেদব্যাসের মাতা ছিলেন ধীবর-কন্যা। মহামতি বিদুর—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং সাধুতায় যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণেরও সম্মানার্হ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিও যাঁর পাদস্পর্শ করে সম্মান জানাতেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে সখারূপে বুকে তুলে নিতেন—তাঁর পরিচয়ও দাসীপুত্র ছাড়া আর কিছু নয়। যযাতির বহু সন্তানের মধ্যে শূদ্র-কন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুরুই একমাত্র যোগ্য ছিলেন পৈত্রিক রাজ্যলাভের। তাপস সিন্ধু—মৃগভ্রমে দশরথ যাঁকে বাণবিদ্ধ করেন তিনি কি ব্রাহ্মণ ছিলেন জন্মগত? তাঁর পিতা মুনি হলেও জন্মে বৈশ্য, মা শূদ্রা। মহাভারতের আদি পর্বের ৮ম অধ্যায়ে দেখা যায়—ঋষি স্থূলকেশ স্নানে যাওয়ার সময় পথে এক কন্যাসন্তান কুড়িয়ে পান, তাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য-আদর্শে মানুষ করলেন আর রুরু নামক এক মুনিপুত্র তাকে করলেন বিয়ে। এজন্যে সমাজ তাঁর দণ্ডমুণ্ডের কোন বিধান করেছিল বলেতো জানা যায় না। মহারাজ দ্রুপদ পাঞ্চালীর বিয়ের পর জামাতাদের নেমন্তন্ন করেন। সুবেশধারী

দাস-দাসীরাই অন্ন পরিবেষণ করলে তাঁদের এবং অন্যান্য সকলকে (মহাভারত, আঃ, ১৯৪ অঃ)। শান্তনু পথিমধ্যে অসহায় কৃপ ও কৃপী নামক দু'টো শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে যখন নিয়ে আসেন তখন একমাত্র মানুষের বাচ্চা ছাড়া এদের গায়ে অন্য কোন কৌলীন্যের ছাপ থাকা সম্ভব ছিল না (মঃ, আঃ, ১৩০ অঃ)। কৌলীন্যের মাপকাঠিই যদি সব হতো তা'হলে যাজ্ঞবল্ক্যের মতো একজন ব্রহ্মবিদ্ ঋষি ক্ষত্রিয় জনকের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে যেতেন না। শতপথ ব্রাহ্মণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেখা যায় রাজর্ষি প্রবহণের কাছে শ্বেতকেতু আর তাঁর পিতা মুনি উদ্দালক ব্রহ্মবিদ্যা শিখেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বের ২০৮ অধ্যায়ে দেখা যায় কৌশিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এক ব্যাধের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

সত্যবতী জেলের মেয়ে হয়েও কুলীনশ্রেষ্ঠ শান্তনুর মহিষীদের মর্যাদা পেয়েছিলেন। বশিষ্ঠ এক শূদ্রাকে আর ধৃতরাষ্ট্র এক বৈশ্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেছিলেন। রামচন্দ্র দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে অনার্য বুনোদের মধ্যেই বাস করেছিলেন। রাক্ষস, বানর, চণ্ডাল সকলকে তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে সর্বজাতি-সমন্বয়ের যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তা' আমাদের ভুললে চলবে না। এ'র পরও যারা বলবার সাহস পান জাতিভেদ ভারতীয় সভ্যতার মূলগত বিষয়—তাঁরা অজ্ঞ, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতার কোন খবরই রাখেন না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীর্ঘদিন চণ্ডালের গৃহে বাস করার অপরাধে ঘোর নরকে যাওয়াইতো ছিল উচিত। কিন্তু তা' না হয়ে ফল হলো উল্টো—তিনি গেলেন স্বর্গে।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বিভিন্ন বর্ণে বিয়ে করেছিলেন। মহারাজ পাণ্ডু আশ্রমে মৃত অবস্থায় ছিলেন ১৭ দিন। শেষে ঋষিরা তাঁর শব বয়ে নিয়ে আসেন রাজধানীতে (মঃ আঃ ১২৬ অঃ)। অথচ এখনকার শাস্ত্রে ব্রাহ্মণেরও শবানুগমনে বা স্পর্শে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ তো দূরের কথা বর্ণবিদ্বেষ যে ছিল না তা' মনুর বিয়ের প্রচলিত ব্যবস্থা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলছেন—"শূদ্র শূদ্রাকে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূদ্রাকে, আর ব্রাহ্মণ সকল বর্ণ থেকেই বিয়ে করতে পারেন।" (মনু ৩।১৩)।

জাতিভেদ বা বর্ণবিদ্বেষ জাতির পক্ষে একটা সর্বনাশা পাপ এ কথা তখনকার সমাজপতিরা খুব ভালো করেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁরা মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়ার জন্যেই সব রকম বিধিব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁরা জানতেন লোক-সংখ্যা যত বেশি হবে, যতই তারা একতাবদ্ধ হয়ে সৌভ্রাত্রের বন্ধনে থাকবে ততই জাতির কল্যাণ। নইলে আট প্রকার বিয়ের প্রচলন করবার কোন্ প্রয়োজন ছিল? আজকাল আমরা উঁচু গলায় বলে বেড়াই—আমরা সভ্য প্রগতিশীল। অথচ অগণিত অপহৃতা যুবতীদের বিয়ে করবার জন্যে তথাকথিত সুসভ্য প্রগতিশীল যুবকরা এগোতে সাহস পায় না। নিগৃহীতা মেয়ে, বৌ, মাকে সমাজে গ্রহণ করবার নৈতিক বল তাদের নেই। তারাই বলতে লজ্জা বোধ করে না—আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল মূর্খ, আর সমাজ ছিল অনুন্নত।

এমন কি বৈদ্য কায়স্থকে, কায়স্থ ব্রাহ্মণকে বিয়ে করতে চাইলেও প্রগতিশীল মা বাপ দণ্ড উঁচিয়ে ধরেন। অনেক ছেলে মেয়েকে এই জন্যে পিতা-মাতার স্নেহ থেকেও চিরবঞ্চিত হতে দেখা যায়। অথচ তাঁরাই হয়ত বক্তৃতামঞ্চে, বেতারে কি খবরের কাগজে জোরালো ভাষায় বলে বেড়ান—জাতিভেদ তুলে দিতে হবে, বিয়ের ব্যাপারে শ্রেণী-বিচার তুলে না দিলে সমাজের মঙ্গল হবে না।

কণ্বমুনির মতো মেয়ের এতবড় অপরাধকে আজকের সমাজের কোন উদারহৃদয় ব্যক্তি ক্ষমা ও স্নেহের চক্ষে দেখতে পারেন ?

যদিও সুনিয়ন্ত্রিত আইন কানুন রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে ছিল তা' হলেও ব্যতিক্রম যে হতেই পারে না বা হবে না এ কথা কেউ বলতে পারে না। তাই দেখা গেলো কালে কালে আট প্রকার বিয়ের বিধান করা সত্ত্বেও সাংকর্য-ধর্মের প্রসার বহুল পরিমাণে দেখা দিতে লাগলো। কারণ, ইহাই জীবের ধর্ম। মনুও এ কথা স্বীকার করে গেছেন।

আইন মানুষেরই জন্যে মানুষ আইনের জন্যে নয়। এ কথা ভেবেই তখনকার দিনের সমাজ-পতিরা কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধি-বিধানেরও পরিবর্তন সাধন করে চলেছিলেন। এ সাংকর্য-প্রথাকে তাঁরা পায়ে ঠেলে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিলেন না, সাদরে তুলে নিয়ে এসে স্থান দিলেন সমাজের মধ্যিখানে। প্রতিভা এবং যোগ্যতা বিচার করে বিভিন্ন শিল্পে তাদের নিযুক্ত করে জীবিকা নির্দেশ করে দিলেন।

সমাজপতিদের সুদূরবিসারী দৃষ্টি ছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এদের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়ে গেছে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে। এরা না হলে বিভিন্ন শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি সাধিত হয়ে রাষ্ট্র-সমাজের সমৃদ্ধি ও সুখ বাড়তে পারে না। তা বলে তারা অস্পৃশ্য ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। যা কিছু হয়েছে যুগান্ধকারের সময়েই।

তা' যদি না হতো উপনিষদের যুগে সাম্যবাদী ঋষিরা উদাত্ত স্বরে ডেকে বলতেন না সকলকে -- "এসো আমরা সকলে একসঙ্গে আহার করি, চল একসাথে শত্রুর বিরুদ্ধে বীর্য প্রকাশ করি, এসো পরস্পর স্ব স্ব তেজোবলে পরস্পরকে বিপন্মুক্ত করি। কারুর প্রতি কেউ যেন বিদ্বেষ প্রকাশ না করি।" আর বেদের যুগেও উদারমতবাদ-প্রচারকারী ঋষিরা সাম্য, মৈত্রী আর অহিংসার বাণী প্রচার করে যেতেন না—"ইঁহাদের (আমার দেশবাসিগণের) মন্ত্র এক হোক, সমিতি এক হোক, মন ও চিত্ত এক হোক— আমি তোমাদের ঐক্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করছি এবং হবিঃ দ্বারা হোম কচ্ছি। * * তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, হৃদয় ও মন এক হোক, তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যলাভ কর।" (ঋক্ ১০।১৯১)

এভাবে যাঁরা সকল শ্রেণীকে, সমগ্র মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক করবার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরা কিনা শিখিয়ে গেলেন—বিধান দিয়ে গেলেন মানুষকে ঘৃণা করবার !

যারা প্রাণ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে করে এলো সমাজের ও রাষ্ট্রের সেবা—সমৃদ্ধি বাড়িয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সৌধ নির্ম্মাণ করে দিল যারা মানুষের— তারা কিনা আজ অস্পৃশ্য মানুষের ? এত বড় পাপ যে সমাজে, যে রাষ্ট্রে স্থান পায় সে রাষ্ট্র বা সমাজের ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

তপশীলী বলে আজও যাদের বৃহত্তম সমাজের অঙ্গ থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে— তাদের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বজ্রমুষ্টিতে পথ-রোধ করে দাঁড়ানো উচিত। তারাও বিশাল অবিচ্ছিন্ন আর্যজাতির একটা প্রধান অংশ, তারাও আর্যবংশীয়, আর্যদের সন্তান-সন্ততি।

আজকের এ বিষম সংকটের দিনে জাতির মেরুদণ্ড সকল শ্রেণীর যুবকদের এক ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এ পাপকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্যে, আজ তাদের সংকল্প নিতে হবে—মানুষের প্রতি যারা অমানুষের মতো নিপীড়ন এবং ঘৃণা চালায় তাদের ঠেলে দিতে হবে মৃত্যুর মুখে। মহাপ্রাণ নিয়ে যুবশক্তিকে আজ জেগে উঠতে হবে—বিনা দোষে যে সব মা-বোন আজ দানবীয় পাপানলে পলে পলে পুড়ে যাচ্ছে তাদের মাথায় করে তুলে নিয়ে এসে গড়ে তুলতে হবে নতুন এক শক্তিশালী সমাজ।

শ্রাদ্ধে পুরাণপাঠ

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য

এক সময়ে আমাদের দেশের যজ্ঞমণ্ডপগুলি বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ সহায়ক ছিল। যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের অপরাহ্নে সমবেত যাজ্ঞিক ও যজ্ঞদর্শকগণ কোনও বিচক্ষণ পুরুষের মুখে পুরাণ, ইতিহাসকথা প্রভৃতি শ্রবণ করিতেন। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ যজ্ঞমণ্ডপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাভারতের প্রথম প্রচার পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত তক্ষশীলায়। সেখানে বক্তা ব্যাসশিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা মহারাজ জনমেজয় প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিগণ। মহাভারতের দ্বিতীয় আবৃত্তি নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্রে। সেখানে বক্তা লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতি এবং শ্রোতা শৌনকাদি সংশিতব্রত ব্যক্তিগণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বক্তা ব্যাসপুত্র জীবন্মুক্ত শুকদেব এবং শ্রোতা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিৎ। স্থান—পুণ্যসলিলা সরস্বতীর তীর। দ্বিতীয় আবৃত্তির বক্তা সূত এবং শ্রোতা শৌনকাদি ঋষিগণ। স্থান—নৈমিষারণ্য। উপলক্ষ্য—শৌনকাদি ঋষির দীর্ঘকালসাধ্য সত্র।

এইভাবে প্রচারের ফলে অনেক লোক শুনিতে পাইতেন এবং উপকৃত হইতেন। পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিকে লোকসমাজে প্রচার করিবার নিমিত্ত শিক্ষিতদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রকাশ করিলে প্রকাশক বিশেষ পুণ্যভাগী হইবেন, এইরূপ ফলকীর্ত্তন প্রত্যেক পুরাণেই আছে। যজ্ঞমণ্ডপের ন্যায় শ্রাদ্ধবাড়ীতেও বহু লোকের সমাগম হইত। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত নানাশ্রেণীর লোকের শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর। সংস্কৃত ভাষায় কথিত পুরাণকথা শুনিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞদের অর্থবোধ না হইলেও শুধু শ্রবণেই তাঁহারা একটা পবিত্রতা অনুভব করিতেন, ভাষান্তরিত করিয়া বুঝাইবার ব্যবস্থা ছিল কিনা—জানা যায় না। অতি প্রাচীনকালে শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কোন আড়ম্বরের স্থান ছিল না। শ্রাদ্ধাদিতে আড়ম্বর করা সকল শাস্ত্রেই নিন্দিত হইয়াছে। অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলে বা অন্যান্য বিষয়ে বেশী জাঁকজমক করিলে সকল দিকে ভালরূপে লক্ষ্য রাখা সম্ভবপর হয় না। তাহাতে সবই পণ্ড হয়। বিশেষ গুণবান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহাকেও পিত্র্যকর্ম্মে বরণ করা চলে না। শ্রদ্ধাই শ্রাদ্ধের প্রধান উপকরণ। মনুসংহিতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, দেবপক্ষে দুইজন এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেবপক্ষে একজন এবং পিতৃপক্ষেও একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়। সমর্থ হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদান করিতে নাই। অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা প্রভৃতি কাজে ত্রুটির আশঙ্কা থাকে:

> দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
> ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে॥
>
> মনু, ৩।১২৫-১২৬

মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি বা সদ্গতির নিমিত্ত জলাশয়-খনন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম ধনিসমাজেই সীমাবদ্ধ। সামর্থ্য অনুসারে দান, লোকজন খাওয়ানো প্রভৃতি সমাজের সকল স্তরেই

প্রচলিত। দরিদ্র স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াকাণ্ডের দান গ্রহণ করিতেন। প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র প্রস্তুত করিতে সমাজে যে ব্যবস্থা ছিল, আদর্শহিসাবে তাহাও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। সাধুব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করাকে যাঁহারা জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের বিদ্যা, চরিত্রবল এবং বৃত্তির শুচিতা অনন্যসাধারণ ছিল। এই সকল কারণে ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা সমাজও বিশেষ উপকৃত হইত। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম হইলেও মৃতের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রমুখ ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে শ্রাদ্ধমণ্ডপে লোকসংখ্যা নিতান্ত কম হইত না।

যজ্ঞমণ্ডপে পুরাণপাঠ করিতেই হইবে, এইরূপ নিয়ম ছিল। শ্রাদ্ধকৃত্যে ব্রাহ্মণের ভোজনের সময় ঈশ্বরবিষয়ে আলোচনা করা পিতৃগণের অভীপ্সিত। উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস প্রভৃতি শোনাইতে হয়।

পুরাণং বেদ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত।

শতপথব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩

ব্রহ্মোদ্যাশ্চ কথাঃ কুর্য্যাৎ পিতৄণামেতদীপ্সিতম্।

মনু, ৩।২৩১

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।

মনু, ৩।২৩২

কঠোপনিষদ্ হইতে জানা যায়, যিনি সংযত হইয়া শ্রাদ্ধকালে এই পরম গুহ্য উপনিষৎ ব্রাহ্মণগণকে শোনাইবেন তাঁহার কৃত শ্রাদ্ধে অনন্ত ফল হইবে:

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

কঠ, ১।৩।১৬

উপনিষৎ, পুরাণ প্রভৃতির প্রচারের নিমিত্ত সমাজে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহার একটি দিক্ এই অলোচনা হইতে জানা যাইতেছে। বঙ্গ, আসাম এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও শ্রাদ্ধবাসরে গীতাপাঠ প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত পিতৃস্তোত্র বা রুচিস্তোত্রও বঙ্গ ও আসামে পঠিত হয়। সম্ভবপর হইলে অনেকে কঠোপনিষৎ এবং গরুড়পুরাণ পাঠ করাইয়া থাকেন। বৃষোৎসর্গে যজ্ঞের হবিঃ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া (বৃষোৎসর্গকর্ম্মাঙ্গভূতহোমীয়হবিরক্ষয়ত্ব-কামঃ) মহাভারতের বিরাট পর্ব্বের বাচন বঙ্গ ও আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। শ্রাদ্ধে বিরাটপর্ব্ব পাঠ করাইলে হবিঃ অক্ষুণ্ণ থাকিবে বা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইবেন, এরূপ কোন কথা মহাভারতে পাওয়া যায় না। মহাভারত পাঠের কথা বলা হইয়াছে, (মহা আদি ১।২৬৬) কিন্তু বিরাটপর্ব্ব পাঠ করিবার কোন কারণ মহাভারতে প্রদর্শিত হয় নাই।

মৃত ব্যক্তির স্বর্গ-কামনায় নির্জ্জন অরণ্যে বৃষ এবং বৎসতরীকে উৎসর্গ করিবার (ছাড়িয়া দেওয়ার) কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে অরণ্যে যজ্ঞনাশক রাক্ষসদের উপদ্রব ছিল, তাহারা যজ্ঞের হবিঃ বিনাশ করিত। বিরাট পর্ব্বের যুদ্ধাদির বর্ণনা শুনিলে ভয়ে তাহারা নিকটে আসিত না। এই কারণে বিরাটপর্ব্ব পাঠ করা হইত—ইহাই কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, মৎস্যরাজ বিরাটের অনেক গরু ছিল। গো-সম্পৎ এবং গো-হরণের কাহিনী বিরাটপর্ব্বে বর্ণিত হওয়ায় বৃষোৎসর্গে উহা পাঠ করা হয়। পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্কল্পের সহিত এই অভিমতেরও কোন সম্বন্ধ নাই। বৃষোৎসর্গে বিরাট পাঠের প্রথা কোন্ সময় হইতে সমাজে চলিতেছে তাহাও স্থির করিবার উপায় নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্ব ও ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্বে ভবিষ্যপুরাণের দানধর্ম্মীয় বৃষোৎসর্গপ্রকরণের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, হবিঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত স্বস্তিবাচনের পর 'মহাভারত' এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, রাঢ়দেশ

(বর্দ্ধমান বিভাগ) প্রভৃতিতে বৃষোৎসর্গের সময় বিরাটপর্ব্ব পঠিত হইয়া থাকে।

পারস্করগৃহ্যসূত্রে বলা হইয়াছে, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা, নারাশংস প্রভৃতি শ্রাদ্ধবাসরে পাঠ করাইতে হয়। নারাশংস-নামে কতকগুলি মন্ত্র আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, নরের প্রশংসা বা মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই নরাশংস বা নারাশংস। অর্জ্জুন পূর্ব্বজন্মে নরঋষি ছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য ও শৌর্য্যবীর্য্য বিরাটপর্ব্বেই বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিরাটপুরীতে তিনি একা অনেকের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছেন এবং উত্তরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করিয়া পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করায়ও তাঁহার চরিত্রের একটি দিক্ উজ্জ্বলতর হইয়াছে। এই সকল কারণে তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত নরাশংস ঋকের পরিবর্তে বিরাটপর্ব্ব পঠিত হইয়া থাকে।

পণ্ডিতদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, অথর্ব্ববেদের বিরাটসূক্তে (অষ্টম কাণ্ডের পঞ্চম অনুবাক) সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিরাটপুরুষ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, জীব অজর অমর, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই নাই ইত্যাদি তত্ত্ব সেই সূক্ত হইতে জানা যায়। এই সকল কথা শুনিলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। এই কারণে বিরাট সূক্তই শ্রাদ্ধে পঠিত হইত। কালক্রমে বেদের আলোচনা মন্দীভূত হওয়ায় নামসাদৃশ্যে বিরাটসূক্তের স্থলে বিরাটপর্ব্ব পঠিত হইয়া থাকে।

এই অভিমত মানিয়া লইলেও বৃষোৎসর্গে মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্ব পাঠের যে সঙ্কল্প করা হয়, সেই সঙ্কল্পবাক্যের কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ঘুমপাড়ানি*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শিশু

ঘুম যাই মা···আজ ঘুম যাই মা···,
তোর বুকে আজকে ঘুম যাই মা!
আমি আর কোথাও না চাই ঠাঁই মা!
শোন্, আর যা চাই—পেলেই হারাই···
তাই, চাই যেথা হারানো নাই।

মা

আয় রে আয়···কোলে আয় আয়!
ছেলে তো মা-র কোলেই ঘুমায়—
দিনের শেষে সাঁঝের ছায়ায়।
শোন্ মা-ও চায়···শিশুকে চায়
তাই ফিরাতে তাকে কাঁদায়।

শিশু

প্রাণ জানত না ··মা জানত না
মা, তোকে তো প্রাণ জানত না···
তাই তোর সুধা মন টানত না।
সে জানত না···তাই মানত না-
দেয় মা বিনা কে সান্ত্বনা!

মা

মা জানত রে · সে জানত যে:
ছেলে কী চায়—মা জানত যে!
আড়াল থেকে তাই টানত সে।
সে জানত যে—অশান্ত রে।—
মা চিনবি—হ'লে ক্লান্ত রে।

* এই গানটি শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় ও শ্রীমতী মঞ্জু দেবী দ্বৈতসঙ্গীতে গেয়েছেন গ্রামোফোনে।

রাসায়নিক উপায়ে খাদ্যশস্য-রক্ষণ-ব্যবস্থা

খাদ্য-সমস্যা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জটিলতম সমস্যাবলীর মধ্যে অন্যতম। লোকসংখ্যা অনুপাতে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ায় এই উদ্বেগ-জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি এবং অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ হইতে খাদ্যশস্য-রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞগণ সচেতন হইয়াছেন।

জনৈক বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ডাঃ ই জি রিচার্ডসন্ সম্প্রতি রাসায়নিক উপায়ে কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ হইতে সাফল্যের সহিত শস্যাদি-রক্ষণ-ব্যবস্থা কিরূপে সম্ভবপর তাহার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই রাসায়নিক কীট-বিনাশক ঔষধ (Insecticides) বিমানযোগে ঊর্দ্ধ হইতে শস্যক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিলে কতখানি কার্যকর হইবে তাহা লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন।

'এফ্-এ-ও'র (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) বিশ্ব-খাদ্য-সংসদ কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ হইতে খাদ্যশস্য-রক্ষার জন্য সকলকে অবহিত হইতে বলিয়াছেন এবং সেইজন্য বৃটিশ রাসায়নিকগণ কীট-বিনাশক ঔষধের ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ও ইন্দুর ইত্যাদির আক্রমণে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য ও তৈল-বীজ বিনষ্ট হয়। এই অপচয়-নিবারণ সম্ভব হইলে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইবে। তখন খাদ্য উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই ঔষধবিক্ষেপণ-কার্য অত্যন্ত সহজ কিন্তু তাহা নহে, এই কাজে প্রচুর দক্ষতার প্রয়োজন। যদি এই তরল বিক্ষিপ্ত ঔষধবিন্দুগুলি ভূমি স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ না করে তাহা হইলে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

ডাঃ রিচার্ডসন তাঁহার বিবরণীতে বলিয়াছেন যে "কিউ উদ্যানের" (Kew Garden) প্যাগোডার উপর হইতে এইরূপ পরীক্ষামূলক ভাবে ঔষধ বিক্ষেপ করা হয়। বিন্দুগুলির অবস্থাক্রম দূরবীণ-সাহায্যে লক্ষ্য করা হয় এবং সেই সঙ্গে ১২০ ফুট উচ্চ হইতে প্যাগোডার অভ্যন্তরে ঔষধবিন্দুগুলি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কি অবস্থায় ভূমি স্পর্শ করে তাহার একটি চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হয়। বিন্দুগুলির আকার শেষ পর্যায়ে কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য প্যাগোডার নীচে ব্লটিং কাগজ রাখিয়া তাহাদের ধরা হয়। তাহার পর পড়ন্ত বিন্দুগুলির সহিত তাহাদের আকার-ভেদ লইয়া তুলনামূলক পরীক্ষা চলে। ঔষধের সর্বোচ্চ পরিমাণ-কার্যকারিতা গ্রহণের জন্যই এই পরীক্ষা।

এইভাবে নানারূপ পরীক্ষার মধ্য দিয়া স্বীকৃত হয় যে বিমানযোগে ঔষধ-বিক্ষেপণ-ব্যবস্থাতেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। বিমানগুলি উড়িয়া যাইবার সময় তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী ঔষধের প্রবহমাণ ধারার বিক্ষেপণ-চাপকে বিমান গতি বেগের সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রয়োজনীয় আকৃতির বিন্দু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

বিমানের উড্ডয়ন-উচ্চতা জানা থাকিলে বিক্ষিপ্ত ঔষধবিন্দুগুলি কিরূপ অবস্থায় ভূমি স্পর্শ করিবে পূর্ব হইতেই তাহার আভাস দেওয়া সম্ভব। কেবল বিমানযোগে নহে, হস্তচালিত যন্ত্র-সাহায্যেও অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে।

ডাঃ রিচার্ডসন্ মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদের প্রকারভেদ লইয়া এই সম্পর্কে বিবিধ পরীক্ষা-মূলক কার্যে ব্যাপৃত আছেন।

(নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত)

যোগিগুরু মহর্ষি কপিল

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি কপিলকে সিদ্ধদের প্রধান বলিয়াছেন, যথা—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" (গীতা-১০।২৬)। ইনিই সাংখ্য-দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কপিল। কপিল ভারতের আদি দার্শনিক। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসিদ্ধ—ইহাই তাঁহার মত। তৎ-প্রণীত সাংখ্যদর্শন-মতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। ইহা ষড়দর্শনের অন্যতম। ইনি বিভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগসাধন ও যোগধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম কপিলাশ্রম নামে খ্যাত। নাথদের মধ্যে আজিও প্রবাদ আছে যে কপিল যোগিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কপিলের একটি আশ্রম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবস্থিত। যে দ্বীপের উপর আশ্রমটি স্থাপিত তাহাকে সাগর দ্বীপ বলে। আজিও সেখানে নাথ-মোহান্ত পূজাকার্য করেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ 'কপিলাশ্রম ও বারুণী স্নান' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"Among the pilgrims I could not find a single Kayastha, Vaidya or Brahman. All the lower classes of Hindus almost without an exception were present. The reason is—the three higher classes named above donot believe in the sanctity of Kopotaksha at the time of Baruni. This would seem to prove that Kapila was born of low parentage indeed. He is suspected by some to be an ancestor of the present Mohantas who are Jugis (weavers) by caste. Hence his influence over the higher castes is very small." (J. R. A. S. of Bengal. Vol 29) অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ একজনকেও দেখা যায় নাই। সকল নিম্ন জাতির কোনটিই বাদ পড়ে নাই। ইহার কারণ উল্লিখিত তিনটি উচ্চজাতি বারুণীর সময় কপোতাক্ষের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে না। এসব হইতে বুঝা যায় কপিল নীচবংশোদ্ভব। প্রকৃতপক্ষে লোকে তাঁহাকে এখানকার যোগী (তন্তুবায়) শ্রেণীভুক্ত মোহান্তদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে করে। এই কারণেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপর তাঁহার বিশেষ প্রভাব নাই। *

নাথদের নেতাগণ নাথাচার্য সিদ্ধ বা সিদ্ধা নামে খ্যাত ছিলেন। অধ্যাপক ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত নাথদের সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—"সম্ভবতঃ এই ধর্ম্মের নেতৃবৃন্দের নাথ উপাধি ছিল বলিয়া নাম নাথধর্ম হইয়া থাকিবে। এই নেতাগণ সিদ্ধাই বা সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ (ইতিহাস ও আলোচনা, শ্রাবণ, ১৩২৮ বাং)।" শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী বলেন—"শৈব যোগীরা সিদ্ধ আর বৌদ্ধ যোগীরা সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন" (বসুমতী, পৌষ, ১৩৩৯ বাং)। নাথদের নেতাগণ কখন হইতে সিদ্ধ বা সিদ্ধা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। তবে মহাভারতের যুগে যে সিদ্ধ উপাধি ছিল তাহার প্রমাণ গীতার উপরোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়।

এই কপিল মুনি কি সগর রাজার ৬০ হাজার পুত্র নিধনকারী রামায়ণের কপিল? কোন কোন পুরাণ কপিলকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন। কপিলের নামানুসারে নাথদের মধ্যে কপিলানী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।

মহর্ষি কপিল যে বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন 'কপিল-গীতা'য় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

* এই সকল অভিমত প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া আমরা মনে করি না। উচ্চবর্ণের নরনারীগণও কপিল ও কপিলাশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং তথায় বারুণী স্নানেও যোগ দেন। কপিল মুনি যোগিবংশসম্ভূত ছিলেন, ইহারও কোন প্রমাণ নাই।—উঃ সঃ

লীলাবাদ ও জগৎসৃষ্টি

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, ভাগবত-রত্ন

প্রলয়ের পর ঘনান্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ; ভগবান্ মনুর ভাষায় "আসীদিদং তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতম্ অলক্ষণম্"—সৃষ্টি তখনও হয় নাই, সৃষ্টির কল্পনা তখনও জাগে নাই—ক্ষীরোদশায়ী একমেবাদ্বিতীয়ং বিষ্ণু বটপত্রে প্রলয়-সলিলে কারণার্ণবে সুপ্ত।

এমনি চলিতেছিল, একদা বাসনা জাগিয়া উঠিল সেই মহানের হৃদয়ে, বিরাটের হৃদয়ে, সুপ্তের অন্তঃকরণে। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়'—এক আমি বহু হইব—তিনি নিজেকে নিজ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন। এক বহু, অনন্ত কোটি বহু হইয়া জড়ে জীবে, চন্দ্রে সূর্যে নক্ষত্রে, গ্রহে উপগ্রহে, শত শত অজানা জগতে নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন, তিনি নিজেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন। অসীম সসীমের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলেন—অনন্ত সান্তের মধ্যে লুকাইলেন। এই যে আদি বাসনা তাহা কামনা হইতে উদ্ভূত। 'সোঽকাময়ত'—সে কামনাটি এই—তিনি নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ জানিতে পারিতেছিলেন না, তাই তিনি ব্যাপ্ত হইয়া—বিকশিত হইয়া নিজের মাধুরী নিজের ঐশ্বর্য নিজের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ভক্ত বলিলেন—

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।"

ইহাই লীলাবাদের গোড়ার কথা। এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে একটি কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"সেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমায়
দেখা।

* * *

আমি এলাম ভাঙলো তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটলো আলোর
আনন্দ কুসুম।"

সেই অনন্ত মহীয়ান্, বিরাট আপনাকে পৃথক করিয়া ফেলিলেন, অর্থাৎ এক রহিলেন না। তখনই লীলা আরম্ভ হইল—অসীম সীমার সঙ্গ চাহিলেন—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে চাহিলেন. আবার এই বিরহ-বেদনা সসীমের প্রাণেও জাগিয়া উঠিল। সে যে একদিন সেই অনন্তের বুকে সুপ্ত ছিল, একাঙ্গ ছিল, আজ তাহারও প্রাণে তাই অসীম ব্যাকুলতা। একদিকে ভক্ত, অন্য দিকে ভগবান্। ভগবান বিশ্বনাথ চাহিতেছেন ভক্তকে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি তাই রাধা নামে সাধা। আবার ভক্ত চাহিতেছেন ভগবানকে। শ্রীরাধা অন্বেষণ করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণকে। এইভাবে লীলা আরম্ভ হইল। ভক্তের যেমন প্রয়োজন ভগবান্কে, ভগবানেরও প্রয়োজন ভক্তকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ভগবান্ নিজেকে নিজে পৃথক করিলেন। তার্কিক বলিবেন—তিনি পূর্ণ ছিলেন তাঁহাতে অপূর্ণতা আসিল।

কিন্তু শ্রুতি ইহার উত্তর পূর্বেই দিয়া রাখিয়াছেন—

'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।'

অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলে কেবল পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

এখন প্রশ্ন—ভগবান্ নিজেকে নিজ হইতে পৃথক করিলেন্ কেন ? ইহার উত্তর—নিজেকে নিজে খুঁজিবার জন্য—নিজেকে নিজে ভালবাসিবার জন্য, নতুবা লীলা হয় না—নতুবা জগৎই বা তাঁহাকে খুঁজিবার প্রবৃত্তি কোথা হইতে পাইবে, আবার খুঁজিবার পথই বা কোথা হইতে পাইবে ? লীলা শেষ হইলে নিজেই নিজেকে খুঁজিয়া পাইবেন—কিন্তু লীলার শেষ নাই—লীলা আদি অনাদি ও নিত্য। তাই বিশ্বকবি বলিয়াছেন—

"আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়,
ওঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।
এখনও সে বাঁশি বাজে যমুনার কূলে
এখনও প্রেমের খেলা
সারানিশি সারা বেলা
আজিও কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে।"

প্রশ্ন তবুও রহিল। তার্কিক বলিবেন—ইহাতে কি তাঁহার অসীমত্বের ব্যাঘাত হইল না ? ইহার উত্তর পূর্বেই একভাবে দিয়াছি। আরও বলা যায়—ভগবান বিশ্বেও আছেন, বিশ্বের বাহিরেও আছেন। বিশ্ব তাঁহাতেই আছে সত্য, কিন্তু তিনি বিশ্বের মধ্যে সমগ্রভাবে নাই। গীতার উক্তি—

"বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।"

তিনি লীলার আনন্দের জন্য সসীমের মধ্যে ধরা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অসীমত্বের ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি সসীমের মধ্যে সসীম হইয়া পড়েন নাই। তিনি এই বিশ্বেও যেমন আছেন, তেমনই আবার 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার যেরূপ স্বরূপলক্ষণ আছে তেম্নি তটস্থলক্ষণও আছে। এই দুইটি দিক আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। অসীমের সহিত সসীমের এই সম্বন্ধ অতি সুন্দরভাবে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কবিতাটিতে বিবৃত হইয়াছে ঃ

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে,
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ সে চাহে সুরেরে রহিতে জুড়ে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।"

ইহাই লীলাময়ের লীলা, সসীম সর্বদা অসীমকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল। আবার সেই অসীম সসীমের মধ্যে ধরা দিবার জন্য তুল্যরূপে ব্যস্ত। এই বিশ্বলীলায় আমরা জীবকুল যে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া একেবারে অসহায় ভাবে আঁধার হইতে গভীরতর আঁধারের দিকে ছুটিয়া চলিতেছি ও বলিতেছি—What is sport unto you is death unto us. এই জীবন-সংগ্রামে আমরা ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হইয়া রহিয়াছি—একথা যাহারা বলেন তাঁহারা লীলাবাদের গোড়ার কথাই ভুলিয়াছেন। এই বিশ্বের যিনি কর্তা তিনি একমাত্র সত্য, তিনি আনন্দময়। "রসো বৈ সঃ" তাঁহার একটিমাত্র ইচ্ছা আছে—তিনি রসময়, আত্মারাম ও আপ্তকাম হইয়াও যোগমায়া আশ্রয় করিয়া বিলাসের জন্য ব্যাকুল।

"রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আলিঙ্গিতে মনে ওঠে কাম।"

ইহাই ভগবানের স্বরূপের নিগূঢ় পরিচয়। মানুষ যদি সজ্ঞানে ভগবানের এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারে তবে সে এই মহৎ ও মধুর একমাত্র কার্যের সহায়তায় আত্মবিসর্জন না করিয়া পারে না। তখন এই লীলারস আস্বাদনের জন্য শ্রীভগবানের যে নিত্য ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতার সহিত তাহাকে তাহার জীবনের সুর মিলাইয়া ফেলিতেই হইবে। তখন তাঁহার আর আত্ম সুখ-দুঃখ বা লাভালাভ কিছুই থাকে না। তাঁহার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসিত হয়। চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

ইহাই জীবের স্বভাব, ইহাই অধ্যাত্ম, ইহাই স্বরূপে অবস্থান, ইহারই উপরে শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্যলীলাবাদ প্রতিষ্ঠিত।

শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবেলা দে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য নানা-রকম সুন্দর কবিতা রচনা করে গেছেন। যে সম্পদ তিনি দিয়েছেন তার কণাটুকুও গ্রহণ করে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করতে পারি। কবি হিসেবে তিনি ছিলেন জন্মকবি, সাধক কবি—মানুষ হিসেবে মহামানব। কিন্তু এই মহামানবও একদিন শিশুদের মত ছোট ছেলেটী ছিলেন, তখন তাঁর মনোরাজ্যে কত না ভাব, কত না ছন্দ খেলে বেড়াতো। কল্পনায় তিনি কত কী ভেঙ্গেছেন গড়েছেন! সেখানে প্রাচীন বটগাছটী কুকুরছানাটী সুয়োরাণী দুয়োরাণী রাজপুত্র রাজকন্যা তেপান্তরের মাঠ আরো কত কী! রবীন্দ্রনাথ যখন খুব ছোট ছিলেন তখন থেকেই কবিতা রচনা করেন। তাঁর 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'ছড়া', গল্পসল্প', 'খাপছাড়া' প্রভৃতি কবিতার বই শিশুদের হাতে দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর 'শিশু ভোলানাথ' বইতে ছোটদের ভোলানাথ, শিব-মহাদেবরূপে কল্পনা করে সম্বোধন করেছেন! ভোলা মহেশ্বর যেমন সব ভুলে থাকেন, ধূলোবালি মেখে সদাই হাসিমুখ, আবার মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেন, শিশুদেরও তিনি সেই শিবের মূর্তিতে কল্পনা করেছেন, যেমন—

"ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব।"

শিশুদের নানারকম দুষ্টামিও তাঁর ভালো লেগেছে। তিনি তিরস্কারের সুরে তাদের ছেলেমানুষীতে বাধা দেন নি! সব ছেলেকেই তিনি ভালবেসে বলেছেন—

"খোকা বলেই ভালবাসি
ভালো বলেই নয়।"

* *

"বিচার করি শাসন করি
করি তাদের দুখী"
আমার যাহা খুসী।"

* *

"শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে ছোট ছেলেরা ছোট হয়েই থাকে না। এক দিন তারা বড় হয়ে এই মহাবিশ্বে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করবে এই তাঁর বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মাঝে আছে অনেকখানি শ্রদ্ধা, তাই তিনি নবজাত শিশুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—

"নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।"

শিশুরা কত রকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করে। তিনিও একদিন শিশুদের মত ছোটটী ছিলেন—তখন কত রঙ্গিন স্বপ্ন, কত গান, ছড়া, কত কাহিনী তাঁর শিশু মনকে দোলা দিয়ে গেছে। পরে ভাষায় তিনি তাদের রূপ দিয়েছেন—

"রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকী জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটী পারুল কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা।"

তালগাছ মাথা উঁচু করে সব গাছকে

অবহেলা করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে শিশু যেমন ভাবে তিনি ও শিশুর মন নিয়ে তাল গাছটীকে দেখেছেন।

"তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।"

ছোট ছেলেরা সর্বদাই কিছু মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা কর্তে পারে না। মা রাগ করেন, না পড়ার জন্য দুপুর বেলায় শান্ত হয়ে লেখাপড়া কর্তে হয়; কিন্তু তার শিশু-মনের লেখাপড়া ফেলে খেলার দিকেই বেশী আগ্রহ। কেন মা দুপুর বেলাকে বিকেল মনে কর্তে পারে না? তাঁর কবি-মনের কাছে কিন্তু দুপুর বিকেল এক হয়ে আছে—

"মাগো আমায় ছুটী দিতে বলো
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করবো শুধু পড়া পড়া খেলা।
তুমি বল্‌ছ দুপুর এখন সবে
না হয় যেন সত্যি হলো তাই
একদিনো কী দুপুর বেলা হলে
বিকাল হলো মনে করতে নাই।"

ছোট ছেলেরা মাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, তাই নানাভাবে সে মাকে ভাবতে চেষ্টা করে—

"মা যদি তুই আকাশ হতিস্
আমি চাঁপার গাছ
তোর সাথে মা বিনি কথায়
হতো কথার নাচ্।"

ছুটির দিনে সকলের চেয়ে মাকেই বেশী ভালো লাগে—

"ঐ দেখো মা আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো
আজকে আমার ছুটোছুটী
লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন
অনেক হলো বেলা
তোমায় মনে পড়ে গেলো
ফেলে এলাম খেলা।"

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সেই অমর কাহিনী রবীন্দ্রনাথের শিশু মনে কতখানি যে দোলা দিয়েছিল তাঁর একটী করিতাতে আমরা তার আভাস পাই। তিনি লিখেছেন—

"আমাকে মা, শিখিয়ে দিবি
রামযাত্রার গান
মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো,
হাতে ধনুকবান!
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এমনি বরষাতে
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকতো সাথে সাথে।"

ছোট শিশুরা মনে ভাবে বড় হয়ে অনেক টাকা পয়সা, হীরা জহরৎ উজাড় করে মার আঁচলে ঢেলে দিলে সুখী হবে, মায়ের সকল দুঃখ দূর হবে—

"মনে করো তুমি থাকবে ঘরে
আমি যেন যাবো দেশান্তরে
কী এনে মা দেব তোমার তরে।

* *

পরতে কী চাস্ মুক্তো গেঁথে হারে
জাহাজ বেয়ে যাবো সাগর পারে।
যত পারি আনব ভারে ভারে
তোর তরে মা দেব কৌটা খুলি
সাত রাজার ধন মানিক একটী জোড়া।"

এমনি করে গাছপালা, নদনদী, পশুপক্ষী, রাজারাণী, তেপান্তরের মাঠ, সাতমহলা রাজার বাড়ী প্রভৃতিকে কল্পনার রাঙ্গা তুলিতে জীবন্ত ছবি এঁকে শিশুদের দিয়ে গেছেন। বাংলার কোলে প্রকৃতি-রাজ্যের প্রতিটী প্রাণী যেন

এতদিন প্রাণহীন হয়েছিল তাঁরই স্পর্শের অভাবে! আজ তারা সকলেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের লেখনীর স্পর্শে—তারা আজ কথা বলতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে নূতন প্রাণ দান করেছেন—তিনি তাদের জয়গান গেয়েছেন! সারা বাংলা দেশটাই যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধরা দিয়েছে! তাঁর সেই সব অমর কবিতাগুলি পড়ে আমাদের সোনার বাংলা দেশ ধন্য হয়ে গেছে! এক দিন কাগজের নৌকায় নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে জলে ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছা হয়েছিল—

"যদি সে নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে।
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি
কার কাছ হতে ভেসে এলো স্রোতে
কাগজ নৌকাখানি!"

কী চমৎকার ভাব শিশু-মনে সেদিন ফুটে উঠেছিল! আজ কাগজের নৌকায় তাঁর নাম ভাসিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হয়নি! কাগজে লেখা তাঁর কবিতা তাঁর নাম সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! দিয়ে গেছে বাংলার রবীন্দ্রনাথের গলায় শ্রেষ্ঠ যশের মাল্য। এক দিন তিনি গেয়েছিলেন—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু এই চিরশিশু, চিরনবীন রবীন্দ্রনাথ এই সুন্দর ভুবন ছেড়ে কোন্ এক অজানা সুন্দর ভুবনে চলে গেছেন! সে কেমন সুন্দর দেশ আমাদের জানা নেই। তাঁর অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তে ব্যথার সঙ্গে অনুভব করি। কোনও দেশের কোন কবি এমন করে শিশুদের ভালবাসেন নি! শিশুদের জন্য তাঁর স্নেহ-ভালবাসার, সহানুভূতির অন্ত ছিল না। তাই তাদের জন্য রেখে গেছেন এক এক টুকরো হীরার মত মহামূল্য কবিতা-সম্পদ! তিনি শিশুদের আশীর্বাদ করে গেছেন—

"ইহাদের কর আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ
ইহাদের কর আশীর্বাদ।"

ভাবী কাল শিশুদের পানে আশার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! খেলা শেষ হয়ে গেলে তারা যখন বড় হবে, জীবনের সঙ্গে প্রতিপদে তাদের যখন সংগ্রাম সুরু হবে—সেই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত তাদের অন্তর যাতে সহানুভূতির অভাবে ভেঙ্গে না পড়ে তাই আশীর্বাদের সাথে অভিবাদন জানিয়েছেন—

"ইহাদের কাছে ডেকে
বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা করো গো আশীর্বাদ।
বলো "সুখে যাও চলে
ভবের তরঙ্গ দলে—
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস
সুখ দুঃখ করো হেলা
সে কেবল ঢেউ খেলা
নাচিবে তাদের চারিপাশে।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদমাখা আশার বাণী শিশুদের অন্তরে চিরজাগরূক থাকুক।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অবদান*

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের প্রসারণে ও পুষ্টিসাধনে এবং স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নব্য-বেদান্ত আন্দোলনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অবদান অতুলনীয় ও অনির্বচনীয়। স্বীয় গুরুর নামাঙ্কিত বিশাল সংঘের তিনি একজন অমর আচার্য ও স্রষ্টা। তিনি যে কেবল দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু অন্যার্থে সমগ্র সংঘেরই প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, তিনিই স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সংঘের শৈশবাবস্থায় প্রায় এক দশকাধিক কাল উহাকে লালনপালন করেন। তিনি গুরুর ভস্মাস্থির সেবা-পূজায় ব্রতী ছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাস্মরণে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'রামকৃষ্ণানন্দ মঠের প্রধান স্তম্ভ। সে না থাকিলে আমাদের পক্ষে বরাহনগর বা আলমবাজার মঠে থাকা অসম্ভব হইত। মঠবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই আহারের চেষ্টা বা চিন্তা ভুলিয়াই সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইত। শশী তাহাদের জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিত এবং সময়মত তাহারা না খাইতে আসিলে তাহাদিগকে ধ্যান তপস্যা হইতে টানিয়া তুলিয়া খাওয়াইত।' শশী মহারাজ ছিলেন যেন মঠের মা। ১৯০১ খ্রীঃ যখন স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠকে একটী রেজিষ্টার্ড ট্রাষ্ট বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করেন তখন তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এগার জন প্রথম ট্রাষ্টির অন্যতমরূপে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপ্রণীত বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থাবলীর সংখ্যাও অল্প নহে। এই পুস্তকগুলি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংঘের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের নিকট তাঁহার নিবেদিত সেবাময় জীবন অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার অমর উৎস।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের কেন্দ্রসমূহে শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুরূপে, দেবতারূপে পূজিত হন। উক্ত ঔপচারিক পূজা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়। অনুষ্ঠান ব্যতীত ধর্মসাধন সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। সোপচার পূজা প্রচলনের দ্বারা সহস্র সহস্র নরনারীর রামকৃষ্ণভাব-সাধনের পথ সুগম হইয়াছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের মূর্ত সব্যক্তিক সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ-জীবনে ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ ভাবের অপূর্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক শ্রীরামকৃষ্ণমঠের উপাসনাগারে ঠাকুর ভাগবতী তনুতে বর্তমান, ইহা তিনি স্বয়ং অনুভব ও প্রচার করিতেন। তাঁহার মতে ঠাকুর যখন শরীরে বিদ্যমান ছিলেন তখন যেমন তাঁহার সেবা-পূজা করা হইত, এখনও তাঁহার তদ্রূপ সেবাপূজা আবশ্যক। ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে প্রত্যেক মঠে সদা বিরাজিত, এই ভাবটি মঠ-বাসিগণের হৃদয়ে যতই গভীর রেখাপাত

* লেখকের প্রকাশমান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ চরিত পুস্তকের শেষ অধ্যায়।

করিবে ততই তাঁহাদের ধর্মজীবন দৃঢ় ও স্বাভাবিক হইবে। ইহাই ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হৃদ্‌গত বিশ্বাস। বরাহনগর মঠের উদ্বোধনকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'আমরা গৃহহীন, রমতা সাধু। কাল আমরা কোথায় থাকিব বা আমাদের পরবর্তী আহার কোথা হইতে আসিবে তাহা আমরা জানি না। সুতরাং ঠাকুরের নিত্য নিয়মিত পূজা কে চালাইবে? পরন্তু ঠাকুরের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আস, আমরা সকলে জীবন গঠন করি ও তাঁহার ভাব প্রচার করি।' স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই ব্যয়সাধ্য গুরু দায়িত্ব বহনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন মঠে ভীষণ অর্থসঙ্কট। প্রত্যহ মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতেন, কিন্তু কোন কোন দিন এমনও হইত যে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় চাউলও ভিক্ষায় মিলিত না। ভিক্ষাকালে স্থানীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে কখনও উপহাস, কখনও বা করুণা করিত। পূজার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি ঐ সময়ে বরাহনগর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে দ্বিপ্রহরে দুই ঘণ্টা করিয়া শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরের পূজা ও মঠের ব্যয় নির্বাহ-কল্পে তিনি এই শিক্ষকতা প্রায় তিন মাস করিয়াছিলেন।

সে সময়ে ঠাকুরের পূজা আরও বিস্তৃত ভাবে হইত, সকালে ঠাকুরকে দাঁতনটী পর্যন্ত থেঁতো করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে কিন্তু ঐরূপ খুঁটী নাটী বিষয়গুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার প্রবর্তকরূপে চিরস্মরণীয়। যে ভাবধারা সংঘের প্রাণস্বরূপা শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা তৎসাধনের সহজ উপায়। সাকার মূর্তিতে ঠাকুর যেমন আধ্যাত্মিক ভাববৈচিত্র্যের ঘনীভূত মূর্তি, নিরাকার রূপে তিনিই সচ্চিদানন্দ। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'সর্বদেবদেবীস্বরূপ' এবং 'অবতারবরিষ্ঠ' বলিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে ঠাকুর এক দিন ভাবমুখে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে চিন্তা করিলেই সব হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। একথাও তিনি ভাবমুখে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে যেখানে প্রতিষ্ঠা করিবেন সেখানেই তিনি লোককল্যাণার্থ বিরাজিত থাকিবেন। তাঁহার কোন কোন শিষ্য উক্ত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে বিবিধ উপচারে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাগবতী মূর্তির পূজার প্রচলন হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মুষ্টিমেয় তদানীন্তন শিষ্যগণের পক্ষে তাঁহার 'অরূপ রূপটী ধারণা' করিয়া সাধন করা সম্ভব হইলেও পরবর্তী কালের শত শত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ এবং দেশবিদেশের সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর জন্য একটী বিশ্বজনীন আদর্শ বিগ্রহ আবশ্যক। এই অভাব পরিপূরণের জন্যই ভগবদিচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতির প্রচার ঘটিয়াছে। ঠাকুর যে অপূর্ব সমন্বয়, অভিনব আদর্শ উপলব্ধি পূর্বক প্রচার করিলেন উহা জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে ঐ পূজাপদ্ধতি অধিকসংখ্যকের পক্ষেই প্রয়োজন। সেই জন্য সহস্র সহস্র যুবক ও বৃদ্ধ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারী উক্ত অনুষ্ঠান সাদরে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, সুদূর আমেরিকার বেলাভূমিও এই ভাববন্যায় প্লাবিত। ভাবসাধনা ও চিত্তশুদ্ধির জন্য এই অনুষ্ঠান সাধারণের পক্ষে অপরিহার্য। মুনিঋষিগণ উক্ত কারণেই ধর্মানুষ্ঠানের অসংখ্য বিধান সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সোপাধিক উপাসনা করিলে নিরুপাধিক উপাসনা সহজ ও সফল হয়। অনুষ্ঠানবিহীন ধর্মে দেখা যায় ঋষিত্বও দুর্লভ।

যে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী বিশ্বাস করেন, ঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে বর্তমান বা যে ভক্ত মনে করেন ঠাকুর তাঁহার পূজা-ঘরে অধিষ্ঠিত, তাঁহার জীবন অলক্ষ্যে তদাদর্শে আকারিত হইবে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা প্রচারকল্পে তিনি জীবনপাত করিয়াছেন। উক্ত প্রচলনের ফলে সংঘের প্রত্যেক আশ্রমে একটী ঠাকুর ঘর স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমবাসিগণের আন্তরিক বিশ্বাস, ঠাকুর সেই ঘরে বিরাজিত। সেই হেতু তাঁহার জীবৎকালে তিনি যে ভাবে সেবিত হইতেন সেই সকল উপাসনালয়ে তিনি সেই ভাবেই সেবিত ও গুরুরূপে পূজিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার বিস্তৃত মন্ত্র ও পদ্ধতি তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে সংকলন পূর্বক স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেলুড় মঠে এবং সংঘের অন্যান্য কেন্দ্রে উক্ত পূজা-পদ্ধতিই অদ্যাবধি অনুসৃত হইতেছে। উক্ত পদ্ধতিতে ভক্তি, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনের অপূর্ব কৌশল একত্র সন্নিবিষ্ট। শশী মহারাজের স্বহস্তে লিখিত পূজার পুঁথিখানি এখনও বেলুড় মঠে সংরক্ষিত আছে।

ঠাকুর ছিলেন দেবমানব। মানবভাব ও দেবভাবের অলৌকিক সামঞ্জস্য তাঁহাতে দৃষ্ট হয়। সংঘে তিনি মানবরূপে সেবিত এবং দেবতারূপে পূজিত। মানবরূপে তিনি মঠের ঠাকুরঘরে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ও স্নানাদি করেন। সেই হেতু মঠে তাঁহার স্নানাহার বিশ্রামাদির ব্যবস্থা আছে। দেবতারূপে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ব্রহ্মের সাকার মূর্তি। তাঁহার মানবভাবটী ধরিলেই কালে তাঁহার দেবভাবটীও আমাদের বুদ্ধিগত হইবে। তিনি একাধারে মানবরূপে গুরু এবং দেবরূপে ইষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার ইহাই পূর্ণ তত্ত্ব। ষোড়শোপচার-পূজার অঙ্গীভূত হোমে শ্রীরামকৃষ্ণ অগ্নিরূপে ভাবিত ও পূজিত হন। রামকৃষ্ণাগ্নিতে তখন সাধক দেহমন শুদ্ধ করেন।

দীপাবলী রাত্রিতে বাংলার ঘরে ঘরে কালী পূজা হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দীপাবলী রাত্রিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মান্দ্রাজ মঠে কালীপূজা করেন। সারাদিন উপবাসী থাকিয়া মহানিশায় তিনি কালীপূজায় প্রবৃত্ত হন। পূজান্তে রামকৃষ্ণ-হোম হইল। ব্রহ্মচারী তেজনারায়ণ ও যোগীন্দ্র তখন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে ব্রহ্মচারিগণ যে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন, উহার মন্ত্রাদি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শাস্ত্র-সাহায্যে রচনা করেন। উক্ত মন্ত্র ও ব্রতাদি সুললিত সংস্কৃতে রচিত। ব্রাহ্মণসন্তানগণের উপনয়ন দীক্ষার মন্ত্রাদি হইতে উক্ত মন্ত্রাদি ভাবে ও ভাষায় অনেকাংশে পৃথক্। তাঁহার মতে সংঘের ব্রহ্মচারিগণের নিম্নোক্ত ব্রতগুলি অবশ্য পালনীয়। সূর্যোদয়ের অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পদ্মাসনে বসিয়া ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা কর্তব্য। আরাধনাকালে ভাবিতে হইবে তোমার চিত্ত নিষ্পাপ ও নির্মল। পূর্বকৃত পাপকর্মের চিন্তা সর্বপ্রকারে বর্জনপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে ভক্তি বিশ্বাস প্রার্থনা কর্তব্য। প্রাতঃকৃত্য জপধ্যানাদি, ব্রাহ্ম মুহূর্তে সমাপনই শ্রেয়ঃ। শম, দম ও সত্যপালন এবং শত্রু ও মিত্রকে সমভাবে মিষ্ট বাক্যে সুখী করাই কর্তব্য। ব্যবহারিক জীবনে সাধুতা ও কর্মকুশলতাই অক্ষরণীয়। ক্ষুধিতকে অন্নদান, দরিদ্রকে বস্ত্রদান, সৎপাত্রে অর্থদান এবং রোগীকে ঔষধপথ্যাদি দান ও শুশ্রূষা কর্তব্য। সকলের প্রতি-প্রীতিপরায়ণতাই স্মরণীয়। অতিভোজন নিষিদ্ধ। যুক্তাহার এবং নিদ্রা ও জাগরণে মিতাচার পালনীয়। মধুকর যেমন মধু অন্বেষণ করে তদ্রূপ গুণগ্রাহিতা অবলম্বনীয়। মক্ষিকা

যেমন অশুচি ও অস্পৃশ্য বস্তুতে বসে, সেইরূপ হীনবৃত্তি পরিত্যাজ্য অর্থাৎ কাহারো দোষদর্শন মহাপাপ। অভিমান সুরাপান তুল্য, সুতরাং সর্বথা বর্জনীয়। মানী এবং অমানী উভয়কেই সম্মান দেয়। পরচর্চা অনিষ্টকর, আত্মচর্চাই প্রকৃত কল্যাণকর। অত্যধিক কায়িক ও মানসিক শ্রম পরিত্যাজ্য। সাধন-ভজন, কাজকর্ম ও লেখা-পড়াদি সকল বিষয়েই মধ্যপন্থী হইবে। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ এবং কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ এবং নিজের মাতাপিতা, স্বগৃহ ও স্বদেশের সেবা অপেক্ষা ঈশ্বর-সেবা শ্রেয়স্কর। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের বাক্য ভগবদ্বাক্য জ্ঞানে পালনীয়। আকাশ-কুসুমবৎ মিথ্যা কল্পনাদি পরিত্যাজ্য। মিথ্যাকল্পনাদি মনকে চঞ্চল ও বহির্মুখী করে। তুমি আত্মস্বরূপে পূর্ণকাম, সুতরাং সকল স্বার্থকামনাই তোমার পক্ষে হেয়। অন্যের অভাব দূরীকরণে যত্নপর হওয়াই কর্তব্য। সকল নারীই মাতৃভাবে দর্শনীয়। সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, চিরকৌমার্য ধর্মসাধনের অনুকূল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ব্রতধারী ব্রহ্মচারিগণকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই সকল সুমহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহাব্রত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা এবং অন্য সকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আদর্শ স্ব স্ব জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন। সংঘের ভবিষ্যৎকে গৌরবোজ্জ্বল করিবার চিন্তা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আকুল করিত।

উপরোক্ত অবদানসমূহ ব্যতীত মান্দ্রাজে ও বাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন এবং বোম্বাই হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত বহু স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-প্রচার এবং হিন্দুধর্মের নব জাগরণ আনয়ন তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ধরাধামে থাকিবে ততদিন রামকৃষ্ণানন্দ নামও স্মরণীয় হইবে, যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ থাকিবে ততদিন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাসে তাঁহার নাম জ্বলন্তাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণময় রামকৃষ্ণানন্দকে সভক্তি প্রণতি নিবেদন পূর্বক এই সামান্য রামকৃষ্ণানন্দ-চরিত সমাপ্ত হইল। যিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবন চরিত পাঠ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই চিত্ত-শুদ্ধি ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীমনসা-পূজা ও কথা, শ্রীশ্রীশনি-পূজা ও কথা, শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী-পূজা ও কথা এবং শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ-পূজা ও কথা—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ।৶০, ৵১০, ৵১০, ৵১০।

গ্রন্থকার মনসা, শনি, মঙ্গলচণ্ডী ও সত্যনারায়ণের পূজা ও কথা সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঁচালী কথা ছাড়াও এগুলিতে এই দেব-দেবীগণের সংস্কৃত স্তোত্র, ধ্যান ও প্রণাম স্থান পাইয়াছে। শ্রীশ্রীমনসা-পূজা ও কথা নাম্নী পুস্তিকার ভূমিকায় গ্রন্থকার ভারতবর্ষে ও বহির্ভারতে প্রচলিত নাগপূজার একটি সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। দেব-দেবীর পাঁচালী প্রাচীন বাংলার গৃহে গৃহে গীত হইত—আজও পল্লীগ্রামে অধিকাংশ নিষ্ঠাবান হিন্দুর গৃহে গীত হয়। আমরা শহরের কৃত্রিম ও বিদেশী পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন পূজা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সরল গ্রাম্য গাথা প্রভৃতি সকলই ভুলিতে বসিয়াছি। এই সকল পাঁচালী-কথার ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং ধর্মনিষ্ঠা পরিবর্ধিত ও পুষ্ট হয়। পুস্তিকা চারিখানা ধর্মনিষ্ঠ নর-নারীর নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

কলির দধীচি—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৬৪; মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, বাণী ও করুণ আত্মবলিদান-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে ৩টি ছোট কবিতা এবং শেষভাগে গান্ধীজীর কয়েকটি প্রিয় সঙ্গীত আছে। পুস্তকপাঠে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা যায়। মুদ্রণ, প্রচ্ছদপট ও কাগজ ভাল।

চিরদিনের রূপকথা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বুক্স্, ১৬০।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৩০; মূল্য—সচিত্র রাজসংস্করণ ৩৲।

এই গ্রন্থে রাজকন্যা, শিউলী, চাঁদের দেশ, কমল সায়র, মুকুট, চিরদিনের রূপকথা—এই ছয়টি গল্প অনবদ্য সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণারঞ্জন বাবু বাংলার কথা-সাহিত্যের সম্রাট—বাংলার ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি বহু গল্প ও কাহিনী লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অন্যান্য শিশু-সাহিত্যের মতো এই পুস্তকখানিও ছেলেমেয়েদের নিকট সমাদর লাভ করিবে বলিয়া মনে করি। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট, চিত্রাবলী, মুদ্রণ ও বাঁধাই মনোরম।

উজ্জ্বল ভারত—মাসিক পত্র—সম্পাদক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। কার্যালয়—১৮এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬। প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা।

আমরা এই মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৪ এবং চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫৫ পাইয়াছি। এই দুই সংখ্যায় ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে চিন্তাশীল লেখকগণের প্রবন্ধ আছে। সম্পাদক একজন চিন্তাশীল লেখক ও বক্তা, তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক পত্রখানির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

আকাশবাণী—(প্রথমখণ্ড) শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী প্রণীত এবং বোরোডাংগী, পোঃ কোলাঘাট (মেদিনীপুর) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ৪৪ পৃঃ, দাম এক টাকা।

এই পুস্তক খানিতে রবীন্দ্রছন্দে লিখিত ২০টি কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতায় লেখক রঙ্গরস-ব্যঞ্জনায় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কয়েক কবিতার ছন্দ গতি ও ভাব হাল্কা।

প্রভাতী—ডাক্তার হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিমল চন্দ্র দাস। প্রাপ্তিস্থান সঞ্চয়ন পাব্লিশার্স, ৫০।২, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, কলিকাতা। ৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০ টাকা।

পুস্তকখানিতে ৭২টী সুরুচিপূর্ণ কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতার ছন্দ ও গতি ঠিক না থাকিলেও লেখকের ভাব প্রশংসনীয়। বই খানির কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা ভাল, কিন্তু মূল্য অত্যন্ত বেশী।

স্বামী যুক্তাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

তমলুক (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—গত ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে আট দিন এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও শোভাযাত্রাদি হয় এবং প্রায় আট হাজার নর-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। স্থানীয় বর্গভীমা মন্দিরে স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী সুললিত কণ্ঠে চণ্ডীর ব্যাখ্যা করেন। মহিষাদল থানার অন্তর্গত গোপালপুর, পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত রঘুনাথবাড়ী, নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত হাঁসচড়া হাইস্কুল এবং এই শহরেও কয়েকটি সভার অধিবেশন হয়। স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দজী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে রচনা ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় পারদর্শী ছাত্রগণকে ২০টি পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে।

বালিয়াটি (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজাদি অন্তে আট শত নরনারী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন সাহা, এম্-এস্‌সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে আশ্রম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, বি-এ কর্তৃক মঠ ও মিশনের গত বৎসরের কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে আশ্রম-পরিচালিত বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের আবৃত্তির পর সভাপতি মহাশয় তাহাদিগকে পারিতোষিক দান করেন। অতঃপর আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ধর্মানন্দজী ও ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরদিন শ্রীযুক্তা প্রতিভাময়ী রায় চৌধুরাণীর সভাপতিত্বে একটি মহিলা-সভা এবং তৃতীয় দিন একটি ছাত্র-সভায় উক্ত স্বামীজীদ্বয় বক্তৃতা দান করিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

শিবানন্দ-বাণী (দ্বিতীয় ভাগ)—উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত উপদেশসমূহ এই ভাগে সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা—স্বামী অপূর্বানন্দ। মূল্য বোর্ডবাঁধাই ২৷৷০ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ লিখিত ভূমিকা। ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয় হইতে স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থে যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সমন্বয়ালোকে ভক্তিযোগ কর্মযোগ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের মূলতত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ডাঃ কাট্‌জু—গত ১২ই আষাঢ় সকালে পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির পরিদর্শনান্তে মন্দিরের অছিদের সম্বর্ধনার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ডাঃ কৈলাস নাথ কাট্‌জু বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, "তীর্থযাত্রীর মনোভাব লইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির পরিদর্শন করিতে আসিয়াছি। দক্ষিণেশ্বর সমগ্র ভারতের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচ্যে প্রচার করেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায়ই ভারত বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসন লাভ করে। তিনি প্রমাণ করেন যে, ভারতীয় কৃষ্টি ও দর্শনের স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ।

"যখন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে বাংলার নরনারী যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সর্বোচ্চ। গীতোক্ত কর্মের মতবাদ অতীতে ভারতের অগণিত নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনে মিলনের প্রেরণা দান করিয়াছে।

"বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনা যেমন একত্র মিলিত হইয়াছে, সেইরূপ বিভিন্ন সংস্কৃতি পাশাপাশি অবস্থান করিলেও ভারতের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য অনুভব করা যায়। সহস্র বৎসরের অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর আমরা স্বাধীনতার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশা করি যে, এই প্রভাত-দিনের আলোক অধিকতর প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারত স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য ঐক্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাংলার সেবায় আমি আমার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিব। এইজন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।"

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নরকে মন্দিরের চারিদিক ঘুরাইয়া দেখান।

কলমা (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি—গত জ্যৈষ্ঠ মাসে এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড় মঠের স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী নারায়ণানন্দজী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথম দিনের উৎসবের অঙ্গ ছিল ভগবদ্‌-ভজন, স্তোত্রপাঠ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-আলোচনা। অপরাহ্নে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালার পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। দ্বিতীয় দিবস পূজা কীর্তন ভজন শাস্ত্রপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণের পর প্রসিদ্ধ দেশ-সেবিকা শ্রীযুক্তা আশালতা সেনের সভা-নেতৃত্বে আহূত একটি জনসভায় স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ বসু-ঠাকুর ও সভানেত্রী মহোদয়া "যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৃতীয় দিবস বিবেকানন্দ কিশোর সমিতির সভ্যবৃন্দ একটি প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন করিয়া নানাবিধ আবৃত্তি, সংগীত ও হাস্য-কৌতুক দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন।

ফলতা (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারতি ভজন কীর্তন পূজা শাস্ত্রপাঠ হোম প্রসাদ-বিতরণ দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও ধর্মালোচনা এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা, নিকটবর্তী গ্রামের শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-সংশ্লিষ্ট বিদ্যাপীঠের বালিকাগণের ভজন-গান এবং স্থানীয় ভক্তগণের মধুর হরি-কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। এই উৎসবানন্দে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত আষাঢ় মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে স্বামী সুন্দরানন্দজী "স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত নব ভারত" এবং ডক্টর দেবব্রত চক্রবর্তী এম্-এ, পিএইচ্-ডি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-যুগ" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামী সুন্দরানন্দজী পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সোসাইটির নিজস্ব ভবনে সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার শেঠ, বার-এট্-ল "কঠোপনিষৎ", শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব "গীতা" এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত" ও "শিবানন্দ-বাণী" ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরলোকে শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দ্বিপ্রহরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নেহভাজন শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ২২ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীমান্ বিশ্বনাথ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুক এবং ভগবান তাহার শোক-সন্তপ্ত মাতাপিতার মনে শান্তি দিন, এই আমাদের কামনা।

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশের নিকট পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু সমিতির স্মারকলিপি—কিছুদিন পূর্বে ঢাকা সংখ্যালঘু সমিতির পক্ষ হইতে পাকিস্তানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশের নিকট একখানি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের বর্তমান অবস্থা মোটেই লোভনীয় নহে। পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীদের ব্যাপক বাস্তত্যাগের প্রধান কারণ রূপে স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে :

বাস্তত্যাগের মূল কারণ

(১) ভারত দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হওয়ায় নৈরাশ্য।

(২) উভয় ডোমিনিয়ন কর্তৃক অদূর-দর্শী ও অবিজ্ঞোচিত ভাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের কর্মস্থল নির্বাচনের অধিকার দান ও তাঁহাদের সকলের পূর্ববঙ্গত্যাগ।

(৩) পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোকের সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ-নিয়ন্ত্রণে পূর্ববঙ্গ সরকারের ব্যর্থতা।

(৪) সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সম্পর্কিত ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ নীতি ও পক্ষপাতহীনতা সম্পর্কে আস্থার অভাব।

(৫) সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি এবং নারীর মর্যাদা হানিকর ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হওয়ায় আতঙ্ক বৃদ্ধি।

(৬) অনেকটা জুলুম নীতি অনুসরণ করিয়া পাইকারীভাবে স্থানে স্থানে গৃহ অধিকার। এই

সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবেদন ও প্রতিবাদে কর্ণপাত করা হয় নাই। বহুক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক কর্তৃক বলপূর্বক গৃহ ও জমি দখল।

(৭) পাকিস্তানে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত এবং সরিয়ত অনুযায়ী ইহার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে বলিয়া দায়িত্বসম্পন্ন লীগ নেতৃবৃন্দের বার বার ঘোষণা।

(৮) পূর্ববঙ্গের শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্রভাবে ইস্‌লামিক আদর্শে পরিচালিত হইবে বলিয়া পাকিস্তানের শিক্ষাসচিবপ্রমুখ বিশিষ্ট লীগনেতাদের ঘোষণা।

(৯) সীমান্ত-পথে অবাধে লোক ও মাল চলাচল সম্পর্কে বাধা-নিষেধ এবং পাকিস্তানে ডাক ও তারের বিশৃঙ্খলা।

(১০) ভবিষ্যতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভে অসুবিধার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশঙ্কা।

(১১) অত্যধিক হারে ট্যাক্স ধার্য এবং ইহাতে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, অর্থনৈতিক বর্জন এবং তৎফলে জীবিকার্জনের উপায়ের অভাব।

(১২) সংখ্যালঘুদের শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ।

(১৩) শাসন, বিচার, শিক্ষা, সমর ও পুলিশ ইত্যাদি বিভাগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মচারীর অভাব।

(১৪) ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘুদের বন্দুক বাজেয়াপ্ত ও গৃহতল্লাসী।

(১৫) রাষ্ট্রের শত্রু ও 'পঞ্চম বাহিনী'র কার্যকলাপ চলিতেছে বলিয়া পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের বার বার ঘোষণা এবং তৎফলে মুসলিম জনসাধারণের মনে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব সৃষ্টি। সংখ্যালঘুদের পাকিস্তানে বসবাস ও গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে স্বাধীন মতামত-প্রকাশে অসুবিধা।

(১৬) পুলিশ বিভাগের অধস্তন কর্মচারী-দের এক অংশের মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা চলে যে, হিন্দুরা কোন নালিশ জানাইলে উহা লিপিবদ্ধ না করা —লিপিবদ্ধ করা হইলেও তদন্তে গাফিলতি এবং কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করা।

(১৭) পূর্ববঙ্গবাসী কতিপয় বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতার পূর্ববঙ্গত্যাগ।

বাস্তুত্যাগের ফল

(১) বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম বর্তমানে জনমানবহীন। হিন্দুদের মূল্যবান গৃহ-সম্পত্তি চোর-ডাকাত কর্তৃক অপহরণ।

(২) হিন্দুসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্বল হওয়ায় দুষ্কৃতকারীদের হস্তে অতি সহজে হিন্দুদের লাঞ্ছনা।

প্রতিকারের উপায়

(১) সংখ্যালঘুদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক মন্ত্রী দপ্তর গঠন এবং সংখ্যালঘুদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির উপর উক্ত দপ্তরের ভার অর্পণ।

(২) সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের লইয়া ভারত-পাকিস্তান মাইনরিটি বোর্ড স্থাপন করিয়া উভয় ডোমিনিয়নের প্রতি জেলা ও মহকুমায় যথারীতি শাখা-প্রতিষ্ঠান গঠন।

(৩) উভয় ডোমিনিয়নের পারস্পরিক সহ-যোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের উপর সংখ্যা-লঘুদের মনোবল ও আস্থা সর্বাংশে নির্ভরশীল। এই কারণে উল্লিখিত নীতি অনুসরণ।

(৪) পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত ইসলামিক রাষ্ট্র নহে—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা।

(৫) সম্প্রতি সম্পাদিত ভারত-পাকিস্তান-চুক্তি অগৌণে অক্ষরে অক্ষরে পালন এবং সর্ত-

ভঙ্গকারী সরকারী অথবা বেসরকারী ব্যক্তিদের আদর্শ দণ্ড দানের ব্যবস্থা।

(৬) আভ্যন্তরীণ হারে ভারত ও পাকিস্থানের ডাক মাশুলের হার নির্ধারণ।

(৭) ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে লইয়া যাইবার সুযোগদান।

(৮) ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বার্থের খাতিরে উভয় রাষ্ট্রে একরূপ মুদ্রা-ব্যবস্থা।

(৯) ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে সরকারী কর্মচারী যে স্থানে ছিলেন, সেই সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য উভয় ডোমিনিয়ন কর্তৃক কর্মচারীদের সুযোগ প্রদান।

(১০) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ববঙ্গে একজন ডেপুটি হাইকমিশনার নিয়োগ।

(১১) বিভিন্ন সরকারী চাকুরীতে সংখ্যালঘুদের নিয়োগ। অগৌণে প্রত্যেক থানায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দারোগা ও কনষ্টেবল নিয়োগ। রেলষ্টেশনেও অনুরূপ নীতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয়।

(১২) উভয় রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার লাভের ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের দিক হইতে কোন অসুবিধা না রাখা।

(১৩) পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে কার্য-পরিচালনের অধিকার দান।

(১৪) কয়েক বৎসর কাষ্টমস্ শুল্ক নির্ধারণ ব্যবস্থা স্থগিত রাখা।

(১৫) বাস্তুত্যাগী পূর্ববঙ্গবাসীদের পুনরায় স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন এবং তাহারা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা।

নিস্তব্ধ সংবাদ-পত্র অফিস*—সংবাদ-পত্র অফিস বলতেই সাধারণের মনে এক কোলাহল-মুখরিত হট্টগোলের ছবি ভেসে ওঠে। Newspaper worldএর পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত The Press নামক পুস্তকে এই সাধারণ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সংবাদ-পত্র অফিসের কথা বর্ণিত হয়েছে।

"অসাধারণ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এখানে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। টাইপরাইটারগুলি শব্দহীন। টেলিফোন ব্যবহারের বিরাম নেই কিন্তু ঘণ্টার বদলে আলো জ্বলে উঠছে।

"টেপ মেশিনের মাত্র কয়েক গজ দূরে উপবিষ্ট সাব্ এডিটরদের কাছে বাহকেরা কপিগুলি পৌছে দিচ্ছে এবং তাঁদের কাগজপত্রগুলি এক চোষক নলের সাহায্যে কম্পোজিটারদের কাছে পৌছচ্চে। News room সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।"

'ডেইলী হেরাল্ড' সংবাদপত্র অফিস সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলা হয়েছে।

অন্ধের দৃষ্টিলাভ—যে তরুণ ক্যানাডীয় ডাক্তার সম্মোহনী শক্তির সাহায্যে কিছু দিন আগে একটি মেয়েকে বিনা কষ্টে প্রসব করিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনিই আবার লণ্ডনের এক অন্ধ যুবককে দৃষ্টিদান করে কৌতূহলের সৃষ্টি করেন। দশ বছর আগে কাঁচির ফলার খোঁচা লেগে ছেলেটি দৈবাৎ একটি চোখ হারায়। ক্ষত সেরে গেলেও দৃষ্টি ফেরে না, অবশ্য এর মূলে ছিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ। কয়েক দিন আগে ছেলেটি ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। তিনি তাকে সম্মোহিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে জেগে উঠে সে তার অন্ধ চোখ দিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাবে। সম্মোহনের মোহ কেটে গেলে দেখা গেল ছেলেটি আশ্চর্যভাবে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে।

ডাকটিকিট-সংগ্রাহকের পৃথিবী-পরিক্রমা—লণ্ডনে রবার্ট ডারকোটি নামে একজন ডাক-টিকিট-সংগ্রাহক আছেন। নানারকম দেশ-

* নিম্নলিখিত সংবাদগুলি নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্ এর-সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করা এবং বিক্রয় করাই তাঁর কাজ। সেইজন্য পরিশ্রমও তিনি কম করেন না। তিনি এবার আকাশ-পথে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছেন, উদ্দেশ্য—দুই কোটি ডাকটিকিট বিক্রয় করা। তিনি সঙ্গে নিয়েছেন ৫,০০০ বিভিন্ন টিকিটের নমুনা এবং আশা করছেন প্রায় ৮,০০,০০০ টাকার টিকিট বিক্রয় করতে পারবেন। তিনি ভ্রমণ করবেন আমেরিকা, ফিজি, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, এবং ইজিপ্ট। তাঁকে সেইজন্য ৩১০০০ মাইল পরিক্রম করতে হবে।

যক্ষ্মারোগের নূতন ঔষধ—বিলাতের 'ল্যানসেট' পত্রিকায় সম্প্রতি যক্ষ্মারোগের একটি নূতন ঔষধের বিবরণ বের হয়েছে।

ঔষধটির নাম 'Para-Aminosalicylic Acid', সংক্ষেপে P.A.S., দু'টি রোগীর ওপর ষাট দিন ধরে এই ঔষধটি প্রয়োগ করে দেখা হয় ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক।

ঔষধটি যক্ষ্মারোগের জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি নিবারণ করে। রোগীর কফ পরীক্ষা করে দেখা যায় জীবাণুর সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং তাদের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। উপরন্তু রোগীর জ্বরের দ্রুত হ্রাস, শরীরের ওজন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপসর্গের উপশম দেখে মনে হয় যে ঔষধটির অন্যান্য গুণও আছে।

বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ-বিবরণী প্রেরণ—সম্প্রতি লণ্ডনের দুইটি প্রধান ঘটনা—রাজকীয় বিবাহ-শোভাযাত্রা এবং ওয়েমবলী কাপ ফাইন্যাল সম্বন্ধে রিপোর্টাররা চলমান বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ-পত্র অফিসে রিপোর্ট পাঠান। সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

লণ্ডনের 'কেম্‌সলী' সংবাদ-পত্র-গোষ্ঠী এই বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। প্রথমে তাঁরা প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। পরে প্রচুর গবেষণা এবং বহু পরীক্ষার পর সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করেছেন। যুদ্ধের সময় অনুরূপ কার্যে অভিজ্ঞ কয়েকজন বিশেষ দক্ষ রিপোর্টারকে তাঁরা এই কার্যে নিয়োগ করেছিলেন। জানা যায় যে, পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় সংবাদ রিপোর্টের এক সম্পূর্ণ নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

মুখের কথায় ঘটনার চাক্ষুষ বিবরণীর সাংবাদিক মূল্য অনেকখানি এবং এই ব্যবস্থায় আরো একটা সুবিধা এই যে, হেড কোয়ার্টার্স রিপোর্টারদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দানে তাঁদের চালিত করতে পারেন। দারুণ ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোন টেলিফোন খুঁজে বের করতে কি পরিমাণ অসুবিধা ও দেরী হয় রিপোর্টার মাত্রেই সে ব্যাপারে ভুক্তভোগী। উল্লিখিত ব্যবস্থায় তাঁরা সে অসুবিধার হাত থেকেও পরিত্রাণ পাবেন।

শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে দুগ্ধ-সংরক্ষণ—বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা শব্দ-তরঙ্গকে নানা ধরনের কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন। 'Transducer' নামক যন্ত্রে এই তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার সাহায্যে কাপড় কাচা হয়েছে। কীট-পতঙ্গ বিনাশের কাজেও এর ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্প্রতি 'সারের' অন্তর্গত মুলার্ড গবেষণাগারে এই শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে দুধ পরিশোধন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই শব্দ-তরঙ্গের চাপে দুধের মধ্যকার অদৃশ্য জীবাণু সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ফলে দুধ পরিশুদ্ধ হয় এবং অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

এই আবিষ্কারের ফলে অত্যন্ত অল্প ব্যয়ে দুধ পরিশোধনের কাজ সম্পন্ন হবে।

গ্রাহকদিগের নম্বর পরিবর্তন

উদ্বোধনের গ্রাহকদিগের নম্বর যাহা উদ্বোধনের র‍্যাপারের উপর নামের আগে থাকে তাহা সম্প্রতি পরিবর্তন করা হইয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক নিজেদের নূতন গ্রাহক-নম্বর স্মরণ রাখিবেন এবং 'উদ্বোধন'-সংক্রান্ত সমস্ত চিঠি-পত্রে উহার উল্লেখ করিবেন।

উদ্বোধন

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

* উদ্বোধন প্রেস
১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলেটোলা,
শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২শে পৌষ, ১৩০৫

যতীন্দ্র বাবু,

আপনার পত্র পাইয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম। আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ ('উদ্বোধন' নামে বাঙ্গলা পাক্ষিক পত্র) বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে। আগামী সংখ্যাতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে ঃ—

১। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত "উদ্বোধনের প্রস্তাবনা";
২। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "রাজযোগে"র ইংরেজী হইতে শুদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদ;
৩। মুকুন্দমালাস্তোত্র—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক অনুবাদিত;
৪। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের উপদেশ;
৫। স্বামী সারদানন্দ কর্ত্তৃক বক্তৃতা; ৬। বিবিধ।

আপনি যথার্থই নিঃস্বার্থ কার্য্য—হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিতেছেন; নচেৎ 'উদ্বোধনে'র জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকায় যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং ষ্টেশনে হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুণ পৃথক হ্যাণ্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম। ইতি

ত্রিগুণাতীত

* এই পত্র দুইখানি 'উদ্বোধন' পত্রের প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে লিখিয়াছিলেন।—উঃ সঃ

(২)

উদ্বোধন প্রেস
১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বুলেটোলা,
শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০

My dear Jatin Babu,

অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যাণ্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি। প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। আপনাকে পদে পদে কষ্ট দিতেছি, মনে করিবেন না। আপনাদিগের দ্বারাই পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচার কার্য্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও। আপনার ন্যায় উদ্যোগী ও পরিশ্রমী লোক যদি আমরা সব জেলায় পাইতাম ত আমাদের আজ ভাবনা কি ছিল। যাহা হউক. ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক এক খানি হ্যাণ্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যাণ্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন, নচেৎ কেহ হ্যাণ্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমত লেকচার দেওয়ার মত হ্যাণ্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
ত্রিগুণাতীত

হোমের পরিণাম

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

হোম করলে বহু বছর বনের হ'ল ক্ষয়
পুড়্ল তাতে কাঠের হিমালয়।
ঘৃতের গঙ্গা ঢাললে হোমানলে
দেবতোষণের ছলে।
পেটে খেলে পেতে তাহার ফল
সন্তানেরা হ'ত না দুর্ব্বল।
হোমের ধোঁয়ায় ঝাপ্সা হলো তোমার দৃষ্টিপথ,
পারলে না আর দেখতে ভবিষ্যৎ।
আগুন জেলে ঘি পুড়িয়ে নিত্যি অবিরত
ভাব্লে ধর্ম্ম কর্‌ছ তুমি কত।
আসল ধর্ম্ম রইল তোমার পড়ে
হ'রে নিল অনার্য্যসব চোরে।
বিচার তোমার রাখলে শিকেয় তুলে
আচার নিয়ে রইলে শুধু ভুলে।

পূর্ব্বপুরুষ হোম করেনি যাদের কোন দিন
তারাই দেখি গৌরবে আসীন।
দেব্‌তারা সব তুষ্ট তাদের প্রতি
এ জগতে তাদেরি উদ্‌গতি,
হোমের হবির লোভ দিতে না হয়,
পুরুষকারে করছে ভুবন জয়।
তোমার যজ্ঞজ্বালার দেখি এইত পরিণাম
তোমার বংশধরের প্রতি দেব্‌তারা সব বাম।
অন্যে যখন পাতাল হতে ভোগবতীরে টানে
তারা তখন চেয়ে থাকে পর্জ্জন্যের পানে।
তোমার যাগের এই হয়েছে লাভ,
রোগে কাতর তাদের ঘরে নিতিই অন্নাভাব।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর

সম্পাদক

ইদানীং বাংলা দেশে নিছক জড়বাদমূলক রাজনীতিক সংঘগুলির পাশ্চাত্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণীগণ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতেছেন। ইঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও সংবাদ-পত্রে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ ক্রমেই মাত্রা অতিক্রম করিতেছে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ইঁহারা সামাজিক ও ব্যবহারিক এবং রাজনীতিক ব্যাপারে ভোটদান-ক্ষেত্রে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কোন সংকোচ বোধ করেন না। ধর্মমাত্রের উপরই ইঁহারা খড়্গহস্ত বলিয়া গর্ব করিলেও প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধেই ইঁহাদের অভিযান পরিচালিত। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অভিযোগের মধ্যে কয়েকটি প্রধান অভিযোগের উত্তর এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

প্রথম অভিযোগ—হিন্দুধর্ম অসাম্য অনৈক্য ভেদ বিরোধ পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক।

হিন্দুধর্মের সহিত যাঁহাদের অতি সাধারণ পরিচয়ও আছে, তাঁহারাই জানেন যে, হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রসমূহ পৃথিবীর সকল নরনারী দূরের কথা সকল জীবকে পর্যন্ত একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপাভিব্যক্তি বলিয়া সমস্বরে প্রচার করেন। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", 'ব্রহ্ম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত', "পুরুষ এব ইদং সর্বম্", 'সেই পুরুষই সব হইয়াছেন', "ঐতদাত্ম্য-মিদং সর্বম্", 'বিশ্বের সকলই সেই আত্মারই প্রকাশ', "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্", 'জগতের সব কিছুতেই ঈশ্বর বিদ্যমান', "যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা", 'দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিতা', ইত্যাদি হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব। আত্ম-স্বরূপে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষানুভব এবং সকল ভূতে তাঁহার অবস্থিতি সন্দর্শন হিন্দুধর্ম-সাধনার চরম আদর্শ। হিন্দুর সার্বজনীন শাস্ত্র গীতা বলেন, "সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী হইয়া স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন।"[১] হিন্দু-ধর্ম ঘোষণা করেন, 'যিনি সকল ভূতকে (একই ব্রহ্মের বিকাশ মনে করিয়া) আত্মবৎ দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত।'[২] হিন্দুধর্মশাস্ত্রসমূহ বলেন যে, মানুষ কেবল মানুষের ভাই নয়, পরন্তু সকলেই একই আত্মার বহু রূপ—আত্মা হিসাবে সকল নরনারী এক ও অভেদ। আত্মামাত্রই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এবং সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। মানুষে মানুষে ভেদ—জীবে জীবে পার্থক্য কেবল আত্মার ব্রহ্মশক্তি-প্রকাশের তারতম্যজনিত। এই অভেদত্ব একত্ব ও অদ্বৈততত্ত্বে হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন ঔদার্য পূর্ণভাবে প্রকটিত। ইহা অপেক্ষা সাম্য-মৈত্রী কোন মানুষ কল্পনায় স্থান দিতেও যথার্থই অসমর্থ। এই চূড়ান্ত সাম্যের নিকট রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সাম্য সূর্যের আলোকের নিকট খদ্যোতের আলোকের ন্যায় একান্তই নিষ্প্রভ। হিন্দুধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তবেদ্য এই চূড়ান্ত একত্ব ও সাম্য-মৈত্রীকে রাষ্ট্র সমাজ—এমন কি সকল নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ অনুসারে সাম্য-বাদিগণ এই যুক্তিপূর্ণ ঔপনিষদিক চূড়ান্ত সাম্যকে

১ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥—গীঃ, ৬।২৯

২ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।—গীঃ, ৫।১৮

জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন। ভারতের এই সাম্য অপেক্ষা কোন রাজনৈতিক সাম্যবাদ কোন বিষয়েও শ্রেষ্ঠ নহে।

হিন্দুধর্মে বহু মত ও পথ আছে বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে এইগুলি পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। হিন্দুধর্ম অনন্তভাবময় ভগবানকে অনন্ত ভাবে দেখিবার এবং অনন্ত প্রকারে উপলব্ধি করিবার স্বাভাবিক উপায়রূপে অনন্ত মত ও পথের উপযোগিতা স্বীকার করেন। এই জন্য ইহাতে সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণ, দ্বৈত অদ্বৈত, সেশ্বর নিরীশ্বর, একেশ্বর বহুদেবদেবী, জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ, রাজযোগ কর্মযোগ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিমার্গ, গার্হস্থ্য সন্ন্যাসধর্ম প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহের পাশাপাশি বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম বলেন, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার, যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ, যিনি এক তিনিই বহু, ইত্যাদি। অধিকার এবং রুচিভেদে বিভিন্ন নরনারীর পক্ষে বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হিন্দুর সকল মত ও পথ—এমন কি নিরীশ্বরবাদও শ্রুতি-প্রামাণ্যের উপর স্থাপিত। শ্রুতিপ্রমাণমূলে হিন্দু একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে একের অধিষ্ঠান স্বীকার করে। হিন্দুর বহু দেবী এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন রূপ। এই জন্য একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্ব হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিকতা ভাষা বেশভূষা আচার-নিয়মের বৈচিত্র্য উল্লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তিস্বরূপ এই বহুত্বে একত্ব আজও সক্রিয়। বহুবিধ বিভিন্নতার মধ্যে বর্তমানেও সর্বভারতে হিন্দুর ধর্ম এক, শাস্ত্র এক, দেবদেবী এক, অবতার এক, পূজার মন্ত্র এক, ভাষা এক, উপকরণ এক, সাধনা এক, স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা এক, ব্রত-উপবাস-পার্বণ এক, তীর্থ এক, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি এক, ত্রিবর্ণের গায়ত্রী ও সন্ধ্যাদি এক এবং জাতকর্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত এক। এই একত্ব কেবল ধর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু ইহা সর্বভারতে হিন্দুর স্থাপত্য শিল্প ভাস্কর্য ললিতকলা সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিভাগে পরিব্যাপ্ত। স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবাসী এক ধর্ম ও এক সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই একত্বকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে। একমাত্র চীনদেশ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশের অধিবাসি-গণ এরূপভাবে তাহাদের একত্বকে রক্ষা করিতে পারে নাই। সর্ব ভারতে হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া একত্ব থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সমাজে ভেদ বিরোধ অনৈক্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ এক নহে। রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি এই ভ্রমে পতিত যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ এক। কিন্তু ইহা সত্য নহে। হিন্দুধর্ম হইতে হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা।"

হিন্দুধর্ম সর্বধর্মসমন্বয় এবং সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা সমদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাতে পরধর্মবিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত হিন্দুধর্ম মধ্যযুগের আচার্য শংকর রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক বল্লভ রামানন্দ নানক চৈতন্য প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের রামমোহন কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রচারিত ধর্মের উপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মাচার্যগণ পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা বা সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করেন নাই। আচার্য শংকর বৌদ্ধ মতবাদ নিরসন

করিয়াও বুদ্ধকে হিন্দুর অন্যতম অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারক হইয়াও সকল দেবদেবী ও মত-পথের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। রামানুজ মধ্ব প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য-গণের মতেও পরধর্মবিদ্বেষ অভক্তির লক্ষণ। মুসলমান-যুগের আচার্য রামানন্দ কবীর প্রভৃতি হইতে ইংরেজ-যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই সকল ধর্মের - বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মিলনের গান গাহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম একে একে নিজ জীবনে কার্যতঃ সাধন করিয়া সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। হিন্দুধর্মাচার্য-মাত্রই সকল নরনারীকে স্ব স্ব ধর্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করিয়া অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুগণ বাল্যকাল হইতেই সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে অভ্যস্ত হয়। যিশুখৃষ্ট ও হজরত মহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন না এরূপ গোঁড়া হিন্দু খুব কমই দেখা যায়। কেহ পরধর্মবিদ্বেষ পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতা দেখাইলে হিন্দুরা তাহাকে অধার্মিক মনে করে।

পরাধীন ভারতে ইংরেজ-শাসকগণের অনুসৃত ভেদ-নীতি দ্বারা প্ররোচিত হইয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থপর সুবিধাবাদিগণ আপনাদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসাধনের জন্য ধর্মের মুখোস পরিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি করিতেন। তখন রাজনীতিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকামী স্বার্থান্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মের আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রশ্রয় দিতেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ হিন্দুজনসাধারণ এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুগণকে সমর্থন করে নাই। পরাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থ-প্রসূত, ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। যে যে বিষয় লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইত উহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য হিন্দু বা মুসলমান কোন ধর্মই দায়ী নয়, পরন্তু ধর্মের অপব্যবহারকারিগণই সম্পূর্ণ দায়ী। ধর্মের এই অপব্যবহার হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদী অপেক্ষা মুসলমান-সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণই যে অনেক বেশী করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বাধীন ভারতে ইংরেজের ভেদনীতি প্রায় অচল হইয়াছে। এখন হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা স্বাধীন ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনীতি। স্বাধীন ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুগণ সংখ্যালঘু মুসলমানগণকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ তথাকার সংখ্যালঘু হিন্দুগণকে সকল বিষয়ে এখন পর্যন্তও সমান অধিকার দেয় নাই। এই সকল বিষয় দ্বারা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি সাম্প্রদায়িকতা একেবারেই সমর্থন করে না। সুতরাং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ মিথ্যা।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—ইহা ইহকালের উন্নতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কেবল পরলোকের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে উপদেশ দেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। হিন্দুর সার্বজনীন সকল শাস্ত্রই সর্বসাধারণকে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় জীবনের সুখের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দান করেন। "যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী", 'ইহ ও পর উভয় লোকে সুখলাভই যথার্থ চাতুরী' —ইহা হিন্দুধর্মের অতি সাধারণ কথা। হিন্দুধর্ম সকল নরনারীকে সর্ববিধ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি এবং শাশ্বত সুখলাভের উদ্দেশ্যে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সকল প্রকার বন্ধন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিতে বলেন। সকল

নরনারীর সকল দুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগকে স্থায়ী সুখের অধিকারী করাই হিন্দুধর্মের লক্ষ্য। ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়রূপে হিন্দুশাস্ত্র অধিকারী অনুসারে অধিকাংশ নর-নারীকে প্রবৃত্তি বা ভোগের পথ ও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে নিবৃত্তি বা ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করেন এবং উভয় পথের পথিকগণকে ইহজীবনেই স্থায়ী সুখ লাভ করিবার উপায় দেখান। 'কেন উপনিষৎ' বলেন, "ইহলোকেই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সত্য লাভ করিবে। যদি কেহ ইহজীবনে ব্রহ্মকে জানিতে না পারে তাহা হইলে তাহার প্রভূত ক্ষতি হইবে।"[৩] ইহাতে স্পষ্ট যে, হিন্দুশাস্ত্র সকলকে ইহলোকেই সুখলাভ করিতে উপদেশ দেন, পরলোকের ভরসায় বসিয়া থাকিতে বলেন না। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, "ক্লীবভাব আশ্রয় করিও না। এইরূপ কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।"[৪] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, "তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও ও যশ লাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর।"[৫] হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীতে দেবীভক্ত প্রার্থনা করিতেছেন, "আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর।"[৬] যাঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম কেবল বিষয়-বিরাগ বা বৈরাগ্য প্রচার করে তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের এই সকল সাধারণ বিষয়গুলি লক্ষ্য করেন না। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও সংহিতাদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে তাহাদের স্ব স্ব আশ্রমধর্ম পালন করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। এই আশ্রমধর্ম কিছুমাত্র ভোগবিরোধী নয়, বরং ভোগের সমর্থক। স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব-সাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন, "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ভোগ কর—বীর্য্য প্রকাশ কর; সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর; পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে, চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত।" মহাশক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে না হইলেও যে কোন জাতির পক্ষে যে ঐহিক উন্নতি ভিন্ন পারত্রিক উন্নতি অথবা বাহ্য উন্নতি ভিন্ন আভ্যন্তর উন্নতি একেবারেই সম্ভব নয়, ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ওরে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে গেলে আগে কূর্ম্মাবতারের পূজা চাই; পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে, তোর ধর্ম্মের কথা কেউ নেবে না। ধর্ম্মকথা শুনাতে হলে আগে এ দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে।" তিনি তমের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন জনসাধারণকে প্রথমতঃ মহারজোগুণে উদ্দীপিত করিয়া তাহাদের ঐহিক অভাব দূর করিতে এবং পরে ধর্মোপদেশ দিতে বলিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, মৌর্য সুংগ গুপ্ত পল্লব গৌড় পাল প্রভৃতি বংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ ধর্ম-দর্শনে ও ঐহিক উন্নতি-ক্ষেত্রে অপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের শাখাস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের সময়েও ভারতবর্ষ ঐহিক

৩ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।—কেঃ উঃ ২।৫

৪ ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ —গীতা, ২।৩

৫ তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।—গীতা, ১১।৩৩

৬ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।—চণ্ডী

উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈদেশিক পরিব্রাজকদের বিবরণী পাঠে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই হিন্দুধর্ম ঐহিক উন্নতিকে অবহেলা করিয়া কেবল পারত্রিক উন্নতি সাধন করিতে বলেন, ইহা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার মাত্র।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ—হিন্দুধর্ম অপরের কল্যাণসাধন অপেক্ষা ব্যক্তিগত মুক্তির উপর বেশী জোর দেন। হিন্দুধর্মাচার্যদের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা সকল নরনারীকে সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া শাশ্বত শান্তি সুখ দান করিবার উদ্দেশ্যে অক্লান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। মানুষমাত্রেরই কল্যাণসাধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তি-সাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি মহত্তর কার্য্য করেন।" সন্ন্যাস-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—এইহচ্ছে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য।" অন্যত্র—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন—জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যাঁরা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায়—বৃথৈব তস্য জীবনম্।" তিনি মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একখানা পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "আমি প্রার্থনা করি যে, আমি যেন বারংবার জন্মগ্রহণ করে সহস্র দুঃখ সহ্য করি, যেন ঐ সকল জন্মে একমাত্র যে ঈশ্বর বাস্তবিক বর্ত্তমান, আমি একমাত্র যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সেই ঈশ্বরের—সমুদয় জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "নিজের জন্য যা করা যায় তাই অধর্ম্ম এবং অন্যের জন্য যা করা যায় তাই ধর্ম্ম।" স্বামী বিবেকানন্দ উপদেশ দিয়াছেন, "অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করাও পাপ গৃহস্থের পক্ষে, তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন করে স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার মোক্ষ!" এই অভিমতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুধর্মাচার্যগণ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়কে ব্যক্তিগত মুক্তি অপেক্ষাও অপরের কল্যাণ সাধন করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন।

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ—ইহা অত্যন্ত রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াপন্থী এবং যুগোপযোগী সংস্কার-বিরোধী। হিন্দুর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, হিন্দুধর্ম কোন কালেও রক্ষণশীলতাকে আঁকড়াইয়া যুগোপযোগী পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই। মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম কেপ্লার গ্যালিলিও ল্যাপল্যাস লাগ্রাঞ্জ ডিলেম্বার লালণ্ড গিলবার্ট হারভে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্ক্রিয়া এবং বেকন ডারউইন স্পিনোজা হিউম হাক্সলি লক প্রমুখ যুক্তিবাদীদের যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। সে যুগে রাজসাহায্যপুষ্ট পাদরীদের হস্তে অনেক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীকে বহু প্রকারে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। মধ্যযুগে খৃষ্টধর্মগুরু পোপের নির্দেশে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম কখনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া বা যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই। পরন্তু হিন্দুধর্ম বৈজ্ঞানিক মত বরাবর সমর্থন করিতেছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ ইস্লাম ও ইংরেজ-যুগে

অনেক পরিবর্তন স্বীকার করিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। এ যুগেও হিন্দুগণ যুগোপযোগী পরিবর্তন বরণ করিয়া লইতেছে। হিন্দুজাতি তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রাখিয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি লাভের জন্য আবশ্যকীয় পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লইতে সর্বদাই প্রস্তুত। তাহারা কোন কালেও সংস্কারবিরোধিতার পরিচয় দেয় নাই। তাহাদের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা। এই দুইটির জন্যই হিন্দু-জনসাধারণের উন্নতির সকল দ্বার আজও রুদ্ধ। জনসাধারণ দূরের কথা, ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও পরাধীন অবস্থায় উন্নতি লাভের তেমন সুযোগ পান নাই। সুযোগ পাইলে ধর্ম-জাতি-বর্ণ এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই যে রক্ষণশীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে প্রস্তুত, গত মহাযুদ্ধের সময় ইহা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তখন উন্নতি লাভের সুযোগ পাইয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত হাজার হাজার যুবক রক্ষণশীলতা-বিরোধী যুদ্ধঘটিত বহু কার্যে নিঃসংকোচে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের রক্ষণশীল কোন সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করে নাই। এখনও উন্নতির সুযোগ পাইলে লক্ষ লক্ষ নরনারী রক্ষণশীলতা অগ্রাহ্য করিয়া কার্য করিতে প্রস্তুত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উন্নতিলাভের সুযোগের অভাবেই হিন্দুজনসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না, রক্ষণশীলতা বা সংস্কার-বিমুখতার জন্য নহে। অসাধারণ শক্তিমান ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ করা সম্ভব, কিন্তু দরিদ্র নিরক্ষর জনসাধারণের পক্ষে ইহা একেবারেই সম্ভব নয়। তাহাদিগকে সুযোগ দিলে তাহারা যে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্পষ্টরূপে প্রতীত যে, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে জড়বাদী সংঘসমূহের প্রচারকদের চারিটি প্রধান অভিযোগই একেবারে ভিত্তিহীন।

"সেই শক্তি-সিন্ধু হ'তে বিন্দু যদি পাই"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অন্তহীন মহাশূন্যে ঘুরিছে নিয়ত
সংখ্যাহীন গ্রহ-তারা লাটিমের মত
প্রচণ্ড উদ্দাম বেগে। সৃষ্টির সকালে
কোন্ শিশু ঘুরাইল আপন খেয়ালে
আগুনের লাট্টুগুলি গগন-প্রাঙ্গণে ?
আজও তারা ঘূর্ণ্যমান। আমি ভাবি মনে,
শূন্যে শূন্যে ঘুরিতেছে যে-শক্তির জোরে
লক্ষ কোটী সূর্য্য-তারা নিত্যকাল ধ'রে—
তার কোন সীমা নাই। সে মহাশক্তিরে
নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমি নমি নতশিরে।
সেই শক্তি-সিন্ধু হ'তে বিন্দু যদি পাই
সর্ব্ব দুর্ব্বলতা হ'তে মুক্তি পেয়ে যাই।
প্রাণের প্রাচুর্য্যে পূর্ণ হবে দেহ-মন
উচ্ছল তরঙ্গে ভরা গঙ্গার মতন॥

আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ আশ্রম

এলিজাবেথ ডেবিড্‌সন

অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌

রামকৃষ্ণ মিশনের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, ১৮৯৫ সনের গ্রীষ্মকালে কয়েক সপ্তাহের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদীর বক্ষে 'সহস্রদ্বীপোদ্যান'-স্থিত যে ভবনটি নিভৃত বিশ্রামাগাররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের নামে ক্রয় করিয়াছেন।

এই গৃহেই স্বামী বিবেকানন্দের অমর "সন্ন্যাসীর গীতি" রচিত হইয়াছিল, এস্থানেই পরবর্তী কালে প্রকাশিত "দেববাণী" নামক গ্রন্থের ধর্মপ্রসঙ্গগুলি তদীয় অন্তরঙ্গ মার্কিন শিষ্য-শিষ্যা-গোষ্ঠীর নিকট উক্ত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত আছে : "আমাদের মধ্যে একজনের সেণ্ট লরেন্স নদীর বক্ষে বৃহত্তম দ্বীপ 'সহস্রদ্বীপোদ্যানে' একটি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল ; তিনি স্বামিজীকে এবং আমাদের মধ্যে যত জনের জন্য স্থান সংকুলান হয় তত জনকে উহা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। স্থানটি এক অতি চমৎকার উচ্চভূমির উপর অবস্থিত ছিল—সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত প্রসন্নসলিলা নদীর মনোরম দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইত। নদীর তীরের দিকে উত্তর ও পশ্চিমে ক্রমনিম্ন একটি পাহাড়ের পার্শ্বে কুটীরখানি ছিল। গৃহটী প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ের উপরই নির্মিত এবং চতুর্দিকে প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ-পরিবেষ্টিত। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহারের জন্য যে নূতন আশ্রয়-স্থানটি বিশেষরূপে নির্মিত হইয়াছিল উহা পাহাড়-গুলির তুঙ্গ ক্রমনিম্নভাগে তিনদিকে গবাক্ষবেষ্টিত এক বৃহৎ লণ্ঠন-দুর্গের মতো দেখা যাইত—ইহার পশ্চাদ্ভাগে ত্রিতল, পুরোভাগে মাত্র দ্বিতল।" এই আশ্রয়স্থানের শীর্ষভাগে স্বামিজীর প্রকোষ্ঠ ছিল—উহাতে একটি পৃথক্ বাহিরের সোপান এবং দ্বিতলের বারান্দায় একটি উন্মুক্ত গবাক্ষ শোভা পাইত। এই উপরের বারান্দায়ই স্বামিজী তাঁহার সান্ধ্য ধর্মোপদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন। "বারান্দাটি প্রশস্ত, ছাদবিশিষ্ট এবং কুটীরের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে বিস্তৃত। পশ্চিম পার্শ্ব একটি প্রাচীর দ্বারা সযত্নে বিভক্ত ছিল, এজন্য কেহও তথায় অনধিকার প্রবেশ করিতে পারিত না। সমগ্র স্থানটি ঘনবন-পরিবেষ্টিত ছিল। বৃহৎ পল্লীর একটি গৃহও দৃষ্ট হইত না।"

বাহান্ন বৎসর পর, ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে, এই বহুদিনের অবজ্ঞাত গৃহটির অবস্থান নির্ধারণ করিবার জন্য স্বামী নিখিলানন্দ ও কতিপয় বন্ধু 'সহস্রদ্বীপোদ্যানে' ভ্রমণ করিতে যান। নিকটবর্তী শহরের জনৈক বন্ধুর সহায়তায় এই যাত্রিদল অল্প অনুসন্ধানের পরই গৃহটি আবিষ্কার করেন। ওয়েলেস্‌লি দ্বীপে পৌঁছিতে (এই দ্বীপের এক কোণ সহস্রদ্বীপোদ্যান পল্লীর অন্তর্গত) আন্তর্জাতিক সেতুর যে অংশ আমেরিকার দিকে অবস্থিত (American side of the International Bridge) উহাকে অতিক্রম করিতে হইল। সেতুর অনতিদূরে দ্বীপের দক্ষিণ তীরে পল্লীটি অবস্থিত। প্রাচীন এল্‌ম্ (elm)

বৃক্ষরাজির পশ্চাদ্ভাগে এক সারি কাষ্ঠনির্মিত গৃহ সবুজ পল্লীর পরিবেশের মধ্যে দণ্ডায়মান। গৃহগুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে গত শতাব্দীর শেষপাদে এক প্রগতিশীল সময়ে ইহারা নির্মিত হইয়াছিল। বারান্দা ও ছাঁইচের উপরিস্থিত সজ্জা ও অলঙ্করণাদি আমাদের এই সরলতার যুগের প্রচলিত রীতি অপেক্ষা অধিকতর পরিপাটিরূপে খোদিত। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে এক বৃহৎ সভাগৃহ বা ভজনালয়ের সম্মুখে গাড়ীখানা আসিয়া থামিল—এই উপাসনা-গৃহটি পূর্বে ম্যাথডিষ্ট্ অভ্যুদয়ের সভা-সমিতির জন্য ব্যবহৃত হইত এবং স্পষ্টতঃ এখনও নিকটবর্তী ধর্মযাজকগণ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুঙ্গ ও প্রস্তরময় পাহাড়ের পার্শ্বদেশের উপর দিয়া যাত্রিদল পদব্রজে রওনা হইলেন এবং পথে অনেক কুটীর অতিক্রম করিলেন। কুটীরগুলি যেন বৃক্ষের অগ্রভাগে উপবিষ্ট বলিয়া মনে হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উহাকে 'দেববাণী'তে স্পষ্টরূপে বর্ণিত ভবন বলিয়াই চিনিতে পারিলেন। পূর্ব বর্ণনার সহিত ইহা হুবহু মিলিয়া গেল; কেবল এইমাত্র ব্যতিক্রম ছিল যে, পুরাতন লোকবসতি-বিহীন অসজ্জিত গৃহটির গৌরব ও বিষাদময় গাম্ভীর্য এক্ষণে আশ্চর্যরূপে ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিল। কুটীরের বহির্দেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের জন্য নির্মিত আশ্রয়টি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইল। পল্লী হইতে অনতিদূরবর্তী হইলেও গৃহটি উহার আবেষ্টনী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ পরিত্যক্ত গৃহের চতুর্দিকস্থ জঙ্গল এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে গ্রীষ্মকালের কয়েক মাস শাখাপল্লবসমূহের দরুন নদী একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বহু বৎসরের অব্যবহারের ফলে গৃহটি কিয়ৎপরিমাণে ভগ্নদশায় পরিণত হইয়াছে। কুটীরের পুরাতন অংশের দুই পার্শ্ব দিয়া প্রশস্ত বারান্দার দিকে যে সোপানাবলী চলিয়া গিয়াছে উহারা ভয়ঙ্কররূপে বিপজ্জনক।

যে অপ্রশস্ত প্রাচীনরুচিসম্মত রন্ধনশালায় স্বামী বিবেকানন্দ নিজহস্তে এই ভক্ত-গোষ্ঠীর জন্য কখনও কখনও উপাদেয় আহার্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তথায় অনুসন্ধানকারিদল পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। দ্বাদশ শিষ্য-শিষ্যামণ্ডলী গৃহস্থালীর অনভ্যস্ত কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন—ইহা অনুমান করা সহজসাধ্য হয়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকোষ্ঠের নিম্নভাগে দুইখানা বড় ঘর বক্তৃতা-গৃহ ও ভোজনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত। কুটীরের পুরাতন অংশের ঘরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়—এগুলি ভক্তগণের শয়নাগারের কাজ করিত। আশ্রয়-স্থানের নিম্নতলও এরূপভাবে বিভক্ত ছিল। কুটীরের উচ্চতম মেজের দিকে যে খাড়া সম্মুখবর্তী সোপান চলিয়া গিয়াছে—উহার উপরে ছাদের নিম্নভাগে দুইটি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র শয়নাগার অবস্থিত; একটি সংকীর্ণ বারান্দা ইহাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রকোষ্ঠ ও নদীমুখী আবৃত চাঁদনি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। স্বামিজীর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার ব্যবহৃত প্রকোষ্ঠটি, গঙ্গাতীরবর্তী বেলুড়-মঠের স্মৃতি-মন্দিরের ন্যায়, শীঘ্রই একটি মন্দিরে পরিণত হইবে।

স্বামী নিখিলানন্দের প্রথম পরিদর্শনকে কেবল তীর্থযাত্রাই বলা যাইতে পারে। তখন এই স্থানটি ক্রয় করিবার কোনও গভীর চিন্তা বা পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু এই স্থান আবিষ্কারের সংবাদ আমেরিকায় ও ভারতে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী নিখিলানন্দ এই সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধজ্ঞাপক এত অধিকসংখ্যক পত্র পাইয়াছিলেন যে তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্থানটি সঠিক ভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য স্বামী নিখিলানন্দ নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সভাপতি ও

অন্যান্য অছিদের সহিত দ্বিতীয় বার তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। অধিকতর পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের পর সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, গৃহটিকে ক্রয় করিয়া একটি আশ্রম পরিণত করা হইবে। নিস্তব্ধ পরিবেশ এবং অনুপম আধ্যাত্মিক স্মৃতিসমূহ ধ্যান ও বিশ্রামের পক্ষে আদর্শস্থানীয় হইবে। বৃদ্ধ গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আবাসটি ক্রয় করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দীর্ঘ কথাবার্তার পর ১৯৪৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর উক্ত গৃহ ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধিকারে আসিয়াছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার-কার্যের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় ১৯৪৮ সনের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই গৃহটি বাসোপযোগী হইবে। বর্তমানে 'সহস্রদ্বীপোদ্যান'স্থিত কুটীরখানি আসবাবপত্র, সজ্জা ও আধুনিক, রুচিসম্মত দ্রব্যসম্ভার-বর্জিত। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পাইতে অনেক বৎসর লাগিবে। স্বামী নিখিলানন্দ এই পবিত্রস্মৃতি-বিজড়িত স্থানটিকে একটি নির্জন আশ্রমে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—এখানে ভক্ত ও ধর্মার্থিগণ আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভের জন্য নির্জন বাস করিতে পারিবেন। এই সুদূর মার্কিন দেশে যে সকল শান্তিকামী ও জ্ঞানার্থী স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহাদের আপন জন বলিয়া দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য সম্ভবতঃ নিকটবর্তী আরও দুই একখানা কুটীর কালক্রমে ক্রয় করিতে হইবে।

কৃষ্ণাষ্টমী

শ্রীসাহাজী

কংস-কেশি-মুর ও মধুমর্দন,
বৃন্দাবন-বন-কুসুম-ভূষণ
জয় জয় বনমালী।
দুষ্ট-ঘাতী শিষ্ট-জন-পালন,
মহাভারত-সংগঠন-কারণ,
ধন্য তব ঠাকুরালী।
যজ্ঞ-বেদ ও মানব-ধর্মস্থাপক,
চাতুর্বর্ণ্য-সমাজ-স্থিতি-কারক,
মহাসমন্বয়কারী।
জরাসন্ধ-সুনীল-বক্র-বারণ,
ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন-কারণ,
ভারতভূভারহারী।
জয় কৃষ্ণ কেশি-মথন মাধব,
করুণাময় কলি-পাবন কেশব,
জয় যুগচক্রধারী।
জাগে হর্ষ, শুকায় অশ্রু চক্ষের,
বাজে পাঞ্চজন্য শংখ সাম্যের,
জয় জয় ব্যথাহারী।

ইন্দ্র-যম ও কুবের-জয়ী মানব
দানব-দল-দলন মহাযাদব,
বিষ্ণু নর-রূপ-ধারী।
মরণাহতের সে কী আর্তরোদন,
সে কী দুর্বার ঘোর রণোন্মাদন,
সে কী ঘোর মহামারী।
রক্তের স্রোত রুধিতে রণোন্মত্তের
নিরস্ত্র কে চালায় রথ সে পার্থের,—
হিংসারিই সে কংসারি।
বিদ্বেষ-বিষ-বিষম ফণী কালিয়,—
নাচে শীর্ষে কে ঐ স্নিগ্ধ অমিয়,
মূর্তি সে যে অহিংসারি।
কুরুক্ষেত্র-মরণ-সিন্ধু ভীষণ,
শান্তি সুধা তুলিল মথি যে জন,—
জন্মাষ্টমী আজি তাঁরি।
মরণ-ব্যথা-হরণ মহামানব,
জয় মাধব করুণাময় কেশব,
জয় জয় দুখহারী।

কোরানে হজ্ বা তীর্থযাত্রা

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম-এ

ঃহজ্-এর শব্দগত অর্থ ভগবদ্দর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা (অল্ কস্দ্ লিল্ জিয়ারৎ) এবং সাধারণতঃ মক্কার কা'অব শরীফ্ (বা পবিত্র কাবা মসজিদ্) বা বয়ৎ আল্লা (ভগবৎ-মন্দির) পরিদর্শনার্থ যাত্রাকে ঃহজ্ বলা হইয়া থাকে। কোরানে কাবা মসজিদ বা মন্দির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "মানবের জন্য নির্দ্দিষ্ট মক্কা নগরে অবস্থিত সর্ব্বপ্রথম মন্দির (বয়ৎ), যাহা ভগবদনুগৃহীত (মুবারকান্) ও সকল জগতের লোকদের পথ-প্রদর্শক স্বরূপ। ইহার সহিত অনেক প্রকাশ্য স্মৃতিচিহ্ন জড়িত রহিয়াছে,—ইহা (পয়গম্বর বা অবতার) ইব্রাহীমের প্রার্থনা করিবার স্থান বা মন্দির (বয়তু মকামু ইব্রাহিম)। যে কেহ ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে, সেই ভগবৎ-আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সকল লোকেরই ভগবদ্দর্শন উদ্দেশ্যে এই মন্দিরে যাত্রা করা কর্ত্তব্য (লিল্লাহি 'অলা অন্‌নাসি ঃহজ্জুল্‌বয়তি ৩।৯৫-৯৬)।" অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, "ভগবান মানবজাতির পরম আশ্রয়, ইহাকে পবিত্র মন্দির রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।······ইহার কারণ, যাহাতে তোমরা জানিতে পার যে স্বর্গে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই ভগবান অবগত আছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ-৫।৯৭)।"

এই প্রাচীন মন্দির (বয়ৎ-অল্-'অতীক্) আদিমকাল হইতে ভজনালয় বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছে এবং সকল স্থান হইতে এখানে লোকে প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়। কথিত আছে পয়গম্বর ইব্রাহীম ইহাকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহার ভিত্তি স্থাপন সময় ইহাকে পবিত্র করিয়া দিবার জন্য ভগবান সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কোরান এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "হে পয়গম্বর, লোকদের সেই সময়ের কথা জানাইয়া দাও যখন আমরা এই মন্দিরকে (বয়ৎ বা ঘর) মানবের উপাসনালয় ও নিরাপদ স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম; তোমাদের জন্য ইব্রাহীমের প্রার্থনার স্থানকে উপাসনালয় নির্দ্দিষ্ট কর। আমরা ইব্রাহীম ও ইসম'ঈলকে আদেশ করিয়াছিলাম, 'যাহারা ইহা প্রদক্ষিণ করিবে ভগবৎপ্রীত্যর্থে ইহাতে অবস্থান করিবে, (প্রার্থনার অঙ্গ) রুকু' ও সজুদ্ (অর্থাৎ নমিত ও শায়িত অবস্থা) অভ্যাস করিবে, তাহাদের জন্য আমার এই মন্দিরকে পবিত্র করিয়া দাও।' যখন ইব্রাহীম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'হে আমার প্রভু, ইহাকে (মক্কাকে) শান্তিময় স্থান করিয়া দাও, এবং ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ভগবান ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের খাদ্যশস্য দ্বারা উপজীবিকা প্রদান কর' তখন তিনি উত্তর করিলেন, 'যে কেহ অবিশ্বাসী হইবে, তাহাকেও কিছু দিনের জন্য ফলভোগ করিতে দিব, তারপর তাহাকে নরকের শাস্তি প্রদান করিব, বস্তুতঃ ইহা অতিশয় জঘন্য স্থান।' যখন ইব্রাহীম ও ইস্ম'ঈল এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন 'হে আমাদের প্রভু, আমাদের গ্রহণ কর; বস্তুতঃ তুমি শ্রবণকারী ও আমাদের সকল

অবস্থা অবগত আছ। হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়কে তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার সুযোগ দাও, আমাদের বংশ হইতে তোমার নিকট আত্ম-সমর্পণকারী এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কর, আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথ প্রদর্শন করাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি সদয় হও, কারণ বস্তুতঃ কেবল তুমিই একমাত্র দয়াশীল। হে আমাদের প্রভু, তাহাদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতেই একজন ভগবৎ-সংবাদ বহনকারী সৃষ্টি কর, যে তোমার সংবাদসকল তাহাদের এই পবিত্র গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরান) ও ইহার জ্ঞান বিজ্ঞান জ্ঞাত করিবে এবং (এইরূপে) তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। বস্তুতঃ তুমিই প্রকৃত শক্তিশালী ও বিজ্ঞানী (২।১২৫-২৯)।" অন্যত্র ঃহজের বিধান ও ইহার আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "যখন আমি ইব্রাহীমকে (প্রার্থনার জন্য) এই মন্দির নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছিলাম, 'আমাকে অন্য কিছুর সহিত অংশীদার করিও না এবং যাহারা আমার এই পবিত্র মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিবে ও নমিত ও শায়িত অবস্থায় প্রার্থনা করিবার জন্য তথায় অবস্থান করিবে, তাহাদের জন্য এই মন্দিরকে পৌত্তলিকতার আধিপত্য হইতে মুক্ত কর। মানবসমাজে ঃহজের প্রচার কর। তাহারা তোমার নিকট অতি দূর দেশ হইতে পায়ে হাঁটিয়া বা ক্ষীণ (পরিশ্রান্ত) উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিবে, যাহাতে তাহারা (ইহা হইতে) সফলতা লাভ করিতে পারে, ভগবান তাহাদের জন্য যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দান করিয়াছেন, তাহাদের বিসর্জ্জন উদ্দেশ্যে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে পারে এবং ইহাদের হইতে কিছু আহার করিয়া গরীব দুঃখীদের বিতরণ করিতে পারে। তৎপর তাহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিতে হইবে এবং নিজ নিজ মনোবাসনা-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই প্রাচীন মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হইবে (২২।২৬-২৯)।"

মক্কায় পৌছিয়া ঃহজ-যাত্রীদের ঃহজের করণীয় অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে নানা বর্ণনাই ঃহদীস্ (বা মহম্মদের কিংবদন্তী)এ আছে। কিন্তু ইহার কোন বিস্তৃত বিবরণ কোরানে নাই। যাহারা ঃহজ উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করিবে, তাহাদের মক্কাশরীফে পৌছিবার পূর্ব্বে কিছুদূর হইতেই সেলাইশূন্য শাদা ধুতি চাদর পরিধান পূর্ব্বক মন্দিরের দিকে সকল সময়, হে ভগবান, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, হে ভগবান, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি (লব্বয়ক আল্লাহুম্মা লব্বয়ক…) এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। তাহাদের মুঃহরিম্ (ইঃহরাম্ অবস্থা গ্রহণকারী) বলা হয়। ইঃহরাম্ অর্থে যে শুদ্ধ পোষাক ঃহজযাত্রীদের পরিধান করিতে হয়, ইহার শব্দগত অর্থ সংযত অবস্থা। কোরানে ঃহজ-যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে, "যে কেহ তথায় ঃহজ করিবার মানস করিবে, তাহাকে ঃহজকালীন কোন মিথ্যাকথা, গালিগালাজ ও ঝগড়া বিবাদ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। তুমি যে কোন সদাচার কর, তাহা ভগবান অবগত আছেন (২।১৯৭)।"

ঃহদীসে হজযাত্রীদের চিরাচরিত অনুষ্ঠান ও বিধি সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে শুদ্ধ পোষাক পরিধান পূর্ব্বক মক্কার দিকে রওনা হইবে এবং যখন মক্কার নিকটবর্ত্তী স্বফা ও মরওহ্ পাহাড়ের সম্মুখীন হইবে, তখন অসহায় অবস্থায় পতিত ইস্‌ম'ঈ'ল্এর মাতা হগরের স্বীয় পুত্রকে প্রতিপালন করিবার জন্য এই পাহাড়দ্বয়ের উপর ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ির কথা স্মরণ করিয়া, তথায় ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিবে। এই দৌড়াদৌড়ি বা পাহাড়দ্বয় প্রদক্ষিণ করা সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে,

"স্বফা ও মর্‌ওহ পাহাড়দ্বয় ভগবন্নির্দ্দিষ্ট দুঃখ কষ্ট ও সহিষ্ণুতার প্রতীকস্বরূপ। সুতরাং যাহারা হজযাত্রা করিবে বা ভগবৎ-মন্দির দর্শন করিবে, তাহাদের জন্য এই পাহাড়দ্বয় প্রদক্ষিণ করা নিন্দার নহে (২।১৫৮)।" স্বফা ও মর্‌ওহ-এর শব্দগত অর্থ পবিত্রতা ও নির্ভীকতা। ভগবদ্-দর্শন আকাঙ্ক্ষীদের অবশ্যই কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে ও ভগবন্নির্ভরশীল হইয়া পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে হইবে।

এই স্বফা ও মর্‌ওহ পাহাড়দ্বয় প্রদক্ষিণান্তে মিনা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া 'অরফাৎ নামক সমতলভূমিতে জিল্‌হিজ্জ মাসের ৯ই তারিখ দ্বিপ্রহরের পর সকল তীর্থযাত্রী সমবেত হয় এবং বিকালে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা সম্পন্ন করে। যতক্ষণ তাহারা 'অরফাৎ নামক স্থানে অবস্থান করে, ততক্ষণ ভগবন্নামে সময় অতিবাহিত করিবার বিধি রহিয়াছে। যদিও তথায় কয়েক ঘণ্টার জন্য মাত্র অবস্থান করিতে হয়, কিন্তু এই সময়টুকুর এত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে যদি কেহ এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইতে না পারে, তাহা হইলে ঃহজযাত্রাই বিফল হইল মনে করা হয়। সন্ধ্যার পর ঃহজযাত্রিদল 'অরফাৎ অতিক্রম করিয়া মুজ্‌দলিফ নামক স্থানে পৌঁছে ও তথায় সারারাত্র অবস্থান করে। কোরানে মুজ্‌দলিফকে অল্‌-মশ্‌-'অর্‌-অল্‌-ঃহরাম্ (পবিত্র চিহ্ন) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সারারাত্র ভগবচ্চিন্তায় কাটাইবার জন্য কোরানে নির্দ্দেশ দিয়া বলা হইয়াছে, "তৎপর যখন তোমরা 'অরফাৎ অতিক্রম করিবে মশরুল্ হরামে পৌঁছা পর্য্যন্ত ভগবন্নাম উচ্চারণ করিবে; যদিও ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিপথ-গামী ছিলে, কিন্তু এখন তোমাকে তিনি (অর্থাৎ ভগবান) সৎপথে চালনা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার চিন্তাতেই নিমগ্ন থাক (২।১৯৮)।" এই দিনকে য়ূম্‌-অল্‌-জম্‌-'অ (সমাবেশ-দিবস) বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই আনুষ্ঠানিক সমাবেশ-দিবসে সকল যাত্রী তাহাদের একত্র সমাবেশের ভিতর দিয়া সকল প্রাণীই যে ভগবানেরই অংশ এবং সকলই যে অবশেষে তাঁহাকেই উপলব্ধি করিতে পারিবে, ইহার সত্যতা বাহ্যিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সত্যিকার রূপ জানিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে। মুজ্‌দলিফ-এর শব্দগত অর্থ 'ভগবদ্-সান্নিধ্যের স্থান (জল্‌ফ্ বা সান্নিধ্য শব্দ হইতে)। 'অরফাৎ, 'অর্‌ফ্ বা ম্'অরিফৎ (ভগবদ্‌জ্ঞান) শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং যিনি ভগবদ্-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই 'অরফাৎ নামক স্থানে বা 'অরফাৎ অবস্থায় পৌঁছিবার উপযুক্ত। এই অবস্থায় কেহ মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য দেখিতে পারে না।

তৎপর দিন ভোরে আবার যাত্রিদল মিনা উপত্যকায় প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং তথায় প্রার্থনাদি সমাপনান্তে বলিদান করা হয়। ইহাকে 'ঈদুজ্জুহা উৎসব বলা হয়। এই উৎসবের গূঢ়ার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী 'কোরানে প্রার্থনা ও ইহার তাৎপর্য্য' নামক প্রবন্ধে (উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৫৪) বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সংক্ষেপে 'ঈদুজ্জুহার তাৎপর্য্য পার্থিব কামনা বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎসমীপে আত্মসমর্পণ করা। 'ঈদ্ প্রার্থনাদি সমাপনান্তে ঃহজযাত্রিদল কাবা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয় এবং তথায় পবিত্র কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করে। মন্দির প্রদক্ষিণ করার পরও আরো দুই তিন দিন স্বেচ্ছায় মিনা উপত্যকায় অবস্থান করার বিধি কোরানে রহিয়াছে (২।২০৩)। সেই সময়ও ভগবৎ-চিন্তায়ই যাপন করিতে হইবে। এইরূপে মুসলিম ঃহজ্ বা তীর্থ যাত্রা সমাপন করা হয়।

ভগবান অরূপ ও অসীম। তাঁহার ঘর বা মন্দিরের (বয়তুল্লা) কোন অর্থ হয় না; তবু তাঁহাকে একটি প্রতীকের মধ্য দিয়া সীমাবদ্ধ-রূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম্মের ন্যায় সকল ধর্ম্মেরই বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস মাত্র। সেই অসীম, অনন্ত ভগবৎ-সত্তার কোন বর্ণনা হইতে পারে না, তবে যে ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই এই সকল আচার অনুষ্ঠানের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক, সেই মতে অনুধাবন করিয়া পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে হইবে। যখনই কোন ভক্ত বা মুসলিম্ তাহার পবিত্র ও বিশুদ্ধ মন দ্বারা ভগবৎ-সমীপে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে, তখনই সে ভগবদ্-দর্শন লাভ করিবে। ঃহজযাত্রা বা ভগবদ্-দর্শনার্থ যাত্রার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে জানিবার চেষ্টার একটা বাহ্যিক রূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রসিদ্ধ সুফী কবি মৌলানা রূমী তাঁহার মসনবীতে গাহিয়াছেন, "আমাদের ভগবান (কোরানে) নির্দ্দেশ দিয়াছেন, 'তোমরা আত্মসমর্পণ দ্বারা আমার নিকটবর্ত্তী হও'। বস্তুতঃ আমাদের দেহের নমিত অবস্থা ভগবদুপলব্ধির সোপান মাত্র। হে আনন্দ-প্রদায়িনী সহিষ্ণুতার অধিকারী, আনন্দের সহিত ঃহজের দিকে অগ্রসর হও। এই (বাহ্যিক) ঃহজ্ (ভগবৎ) মন্দির দর্শন করা মাত্র, কিন্তু মন্দিরের প্রভুকে দর্শন করাই প্রকৃত কাজ।"

গুফ্‌ৎ রাস্‌জদ্‌র অক্‌তরির য়জ্‌দানি মা।
করবি জান্ শুদ্ সিজ্‌দহ্‌-ই-অব্দানি মা॥
খুশ্ বকশ্ ঈন্ কার্‌রান্ রা তা বঃহজ্।
অয় আমীরি স্ববর মিফ্‌তাঃহু-ল্‌ফরজ॥
ঃহজ্ জিয়ারৎ কর্দন্-ই-খান বুরদ্।
ঃহজ্জি রববুল্-বয়ৎ মর্দ্দানহ্ বুরদ্॥ (৪।১১-১৫)

পৃথিবীর চাউল-উৎপাদন-পরিমাণ ও তার সরবরাহ

জর্জ মার্টিন

আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য সংসদ (International Emergency Food Council) সাম্প্রতিক ঘোষণায় প্রকাশ করেছেন যে ১৯৪৮ সালে রপ্তানির জন্য সমগ্র পৃথিবীর প্রাপ্তব্য চাউলের পরিমাণ ৩,১৮০,৯০০ মেট্রিক টন। উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে কয়েক মাস আগে যে পরিমাণ রপ্তানি আশা করা গিয়েছিল, এ বৎসর তার চেয়ে বেশী রপ্তানি হবে বলে অনুমিত হয় এবং তা ১৯৪৭ সালের রপ্তানি পরিমাণ ২২,১০,০০০ টনের অনেক বেশী। কিন্তু তা হলেও যুদ্ধপূর্ব রপ্তানি পরিমাণের তুলনায় প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ কম হবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় গত দশ বৎসরের মধ্যে বাৎসরিক ১০,০০০,০০০ হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, চাউলই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য এবং সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক এই অঞ্চলে বাস করে।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ঘাটতি দেশ-গুলির চাউলের চাহিদা মেটানো সহজে সম্ভব নয়। এই বৎসর অন্নভোজী দেশগুলিতে চাউল আমদানি মোট ৬১,১০,১০০ টনের বেশী সম্ভব হবে না বলে

মনে হয় এবং তা প্রায় সেই দেশগুলির সমগ্র চাহিদার অর্ধাংশ মাত্র।

বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুপাতে প্রাপ্তব্য চাউলের বণ্টন অনুমোদন করা হয়েছে। কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশের বরাদ্দ পরিমাণ নীচে দেওয়া হল :

ভারতবর্ষ	—	৮,২৫,০০০ টন
মালয়	—	৪,২৫,০০০ টন
চীন	—	৪,২০,০০০ টন
সিংহল	—	৪,০০,০০০ টন
কিউবা	—	২,৭৫,০০০ টন
ইন্দোনেশিয়া	—	১,৭৫,০০০ টন

এই ভাবে মোট ৩,১৮০,৯০০ টন চাউলের বণ্টন ছাড়াও আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য সংসদ ১,৪৬,৯০০ টন পরিমিত চাউলের বিনিময়ে অন্যান্য তণ্ডুল-জাতীয় শস্যাদি (cereals) সরবরাহের অনুমোদন করেছেন। এই বিনিময়ব্যবস্থায় পাকিস্তান এবং ইজিপ্ট্ থেকে ভারতবর্ষ যথাক্রমে অতিরিক্ত ৩৭,৫০০ এবং ২৬,৪০০ টন চাউল পাবে ; ইজিপ্ট্ থেকে মালয় পাবে ৪৩,০০০ টন ; এবং ইজিপ্ট্ থেকে এশিয়াস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এলাকাগুলি পাবে ৪০,০০০ টন।

খাদ্যসংসদের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে ইউরোপীয় দেশগুলির জন্য কি পরিমাণ চাউল বণ্টন করা সম্ভব হবে তার উল্লেখ নেই। যাই হোক রপ্তানিকারী দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপে নির্দিষ্ট স্বল্প পরিমাণ চাউল সরবরাহের জন্য একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি হয়েছে।

যদিও পৃথিবীর চাউল উৎপাদন পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু ১৯৩৪-৩৮ সালের গড় ১০,০৫,০০,০০০ টন উৎপন্ন পরিমাণের চেয়ে তা অনেক কম। রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইজিপ্ট্ এবং আমদানিকারীর মধ্যে চীন দেশেই কেবল চাউল-উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই বৎসর ব্রহ্মদেশ থেকে ১,৪২২,০০০ টন চাউল রপ্তানি স্থিরীকৃত হয়েছে। এই রপ্তানি পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব গড় ৩০,০০,০০০ টন রপ্তানি পরিমাণের অর্ধেক মাত্র, তুলনায় ১৯৪৭ সালে রপ্তানি হয় মাত্র ৮,০৫,০০০ টন।

অন্যান্য দেশ থেকে এ বৎসর কি পরিমাণে চাউল রপ্তানি হতে পারে, তার তুলনামূলক বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

দেশ	গত যুদ্ধপূর্ব গড় রপ্তানি পরিমাণ টন	১৯৪৭ সালের রপ্তানি পরিমাণ টন	১৯৪৮ সালের বরাদ্দ রপ্তানি পরিমাণ টন
শ্যামদেশ	১৪,১৮,০০০	৩,৮৪,১০০	৬,০০,৩০০
ফরাসী-ইন্দোচীন	১৪,৬১,০০০	৭৬,৭০০	২,৪০,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৯৭,৫০০	৪,১৬,৯০০	৪,২৬,১০০
ব্রেজিল	৩৭,৬০০	১,৬৭,০০০	২,২৪,৫০০

উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে রপ্তানি-বৃদ্ধি সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীতে চাউলের সরবরাহ-অবস্থা সংকটজনক। বর্তমান অবস্থায় চাহিদা অনুযায়ী চাউল উৎপাদন করা সম্ভব নয়, উপরন্তু অর্থাভাব এই স্বল্পপরিমাণ সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

চাউল-উৎপাদন-বৃদ্ধির উপায়

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষে খাদ্যসংকটের মূল কারণ তার বিপুল জনসংখ্যা নয়—ভূমির উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের অভাব। ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে হয়ত সাময়িকভাবে তা পূরণ করা যেতে পারে কিন্তু খাদ্য-উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে না পারলে দেশে দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চাউল। ভূমির প্রচুর উৎপাদিকা শক্তি

থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ চাউলের জন্য পরমুখাপেক্ষী। এ অবস্থার সত্বর প্রতিকার হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। অল্প সময়ে, অল্পব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে সর্বোচ্চ পরিমাণ চাউল উৎপাদন করতে হলে কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য।

সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন চাউলের শতকরা ৯০ ভাগ জন্মায় এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি ব্রিটিশ গিনি, মালয়, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে চাউল-উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে যন্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এই পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া গেছে।

ব্রিটিশ গিনিতে ৪০০০ একর সরকারী জমিতে যান্ত্রিক উপায়ে চাষ করা হচ্ছে। চাকাযুক্ত ও চাকাহীন ট্রাকটারের সাহায্যে লাঙ্গল ও মই দেওয়ার কাজ করা হচ্ছে। বীজ বোনাও হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। ধান কাটার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার করার চেষ্টা চলেছে তবে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে।

মালয়ে শুষ্ক জমিতে চাকাযুক্ত ট্রাকটার এবং জলাভূমিতে 'উইজেল' জাতীয় ট্রাকটারের সাহায্যে লাঙ্গল দেওয়া হচ্ছে। বীজবোনা ও ধানকাটা হচ্ছে হাতে করে কিন্তু আশা করা যায় এই দুটি কাজও শীঘ্রই যন্ত্রের সাহায্যে করা সম্ভব হবে।

গুয়াদেল ক্যানালে ২০০ একর পরিত্যক্ত জমিতে ১৯৪৫-৪৬ সালে পরীক্ষা চালান হয়েছিল। লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া ও বীজ বোনা—এই তিনটি কাজই করা হয়েছিল সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে। পরীক্ষার ফল খুবই আশাপ্রদ। খারাপ আবহাওয়ার জন্য ধানকাটায় যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জমি তৈরী, বীজ বোনা ও ধানকাটা—এই তিন কাজই যখন সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে করা সম্ভব হবে তখনই চাউল-উৎপাদন-সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। সম্পূর্ণ জলে ডোবা জমিতেও উভচর ট্রাকটারের সাহায্যে চাষ করা সম্ভব।

বীজ বোনা কাজটি যন্ত্রের সাহায্যে করা একটু কঠিন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এরোপ্লেন থেকে বীজ ছড়ানই সবচেয়ে সুলভ এবং সুবিধাজনক উপায়।

ধানকাটায় যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম আবহাওয়ার অবস্থা বিচার করে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এই পরীক্ষা-কার্যগুলি সফল হলে ঐ দেশের অধিবাসীদের খাদ্যসমস্যা-সমাধান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। *

* ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। —উঃ সঃ

প্রার্থনা

শ্রীনিতাই চক্রবর্তী

ক্রুশবিদ্ধ মানব-আত্মা
কাঁদিছে যীশুর প্রায়,
মুক্তির লাগি ক্রন্দন-রোল
দিকে দিকে বহি ধায়।
মানুষ মেতেছে মানুষের সাথে
হীনতা-কৃপাণে যুদ্ধ,
স্বার্থের লাগি আজিকে সবার
প্রেমের দুয়ার রুদ্ধ।
আমার ব্যথিত হৃদয় হেথায়
লভে যেন তব ছবি,
তোমারে খুঁজিতে সাধনা গভীরে
থাকে যেন সদা ডুবি।

মৃত্যুঞ্জয়

ডাঃ সত্যগোপাল ঘোষ, এম-বি

মরণে যে জন ব্যাকুল হইয়া
অতীতের পানে কৃপণের মত
মুগ্ধ নয়নে চায়—
তাহারি মরণে দুঃখ বেদনা
তাহারি মরণে ভয়।

মরণে শুধু সামনে দৃষ্টি যা'র,
পুরাতন ভুলি নূতনের পানে
করে যেই অভিসার—
মরণের ভয়ে হয়না কখন
কাঁপিত হৃদয় তার।

নিশিতে আমরা যে দেহে ঘুমাই
প্রভাতে সে দেহে জাগি,
ঘুমান মোদের নূতন হইয়া
জাগিবার শুধু লাগি।
মরণে তেমন এ দেহে ঘুমায়ে
নূতন দেহেতে পশি
হেথায় মরিয়া তথায় যাইয়া
হই নবদেহবাসী।
মরণে তা হ'লে ভীত হও কেন
দুঃখ কেন কর তায়,
নূতন দেহেতে নূতন জীবন
কেবা না লভিতে চায়?

জনম মরণ সংকোচ বিকাশ
ক্রিয়ারূপে বিশ্ব ব্যাপি
প্রকৃতি আপন প্রকাশে শকতি
সকল ভূতেতে থাকি।

জাত ভূতমাত্র প্রতি পলে পলে
বিকাশের পানে ছুটি
লভিয়া জীবনে পর পরিণতি
ধ্বংস পেতেছে ওটি।
এই সকলের স্বরূপ-সত্তার
বিনাশ নাহিক হয়,
বিলয়ের কালে বীজরূপ ধরি
কারণেতে হয় লয়।
পুনঃ সে কারণ-জলধি হইতে
বিশ্ব-তরঙ্গ উঠে,
নামরূপ লয়ে ক্ষণিক খেলিয়ে
কারণে মিলিতে ছুটে।

নূতন নিয়ত পুরাতন স্থান
অধিকার সদা করি
বিধির বিধানে চলিছে ভুবনে
একই নিয়ম ধরি,
সুরভি কুসুম পাপড়ি ছাড়িয়া
ফলরূপ সদা ধরে,
সেই ফল পুনঃ পক্ব হইলে
ধরণীর বুকে পড়ে,
বীজরূপে পুনঃ ধরণী উহাকে
অঙ্কুর আকার দানি
পরিণত করে বিটপিস্বরূপে
বিধির বিধান মানি।

শরীর-বিজ্ঞান করিছে প্রমাণ
রক্ত মাংস অস্থি চয়,
প্রতি পলে পলে ধরে নবরূপ
পুরাতনে করি লয়।

যুবদেহে তাই বাল্য নাহি থাকে
কৈশোরেতে বৃদ্ধ নাই,
একই দেহেতে বহু রূপান্তর
সতত দেখিতে পাই।
জীর্ণ বাস ত্যজি যথা নর নারী
অন্য নব বাস পরে,
"আমি"-রূপী আত্মা ত্যজি জীর্ণ দেহ
অন্য নব দেহ ধরে।
জন্মিলে মরণ মরিলে জনম
ইহার অন্যথা নাই,
'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ দেন উপদেশ
শোচন বিফল তাই।

মৃত্যু-ভীতি জীবে স্বভাবতঃ দেখি
শাস্ত্র তা'র হেতু বলে—
সূক্ষ্মদেহী জীব ভীষণ যাতনা
ভোগে দেহ-অন্তকালে।
বহু জনমের মরণযাতনা
সূক্ষ্মরূপে মনে রয়,
সেই হেতু জীব মরণের ভয়ে
অতীব বিহ্বল হয়।
জাতিস্মর যোগী পূর্ব্বজন্মস্মৃতি
উন্মেষিত হ'লে দেখে—
শত শত দেহ গিয়াছে চলিয়া
দেহ স্থায়ী নাহি থাকে।

বস্ত্রসম সদা এ দেহ আমার
আমাকে ঘিরিয়া রাখে,
আমি যে সচ্চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ
আমার এ জ্ঞান ঢাকে।
"দেহ-আমি" বোধে সংসার-খেলনা
খেলি আমি অবিরত,
দেহের জনমে দেহের মরণে
ভাবি আমি জাত মৃত।

মোহ-পারাবারে বাসনাপ্রভাবে
নিয়ত ভাসিয়া যাই।
ডুবিয়া উঠিয়া কূল না পাইয়া
কতনা যাতনা পাই।
কত জনমের অতৃপ্ত বাসনা
তৃষিত হৃদয়ে পূরি,
করি গতাগতি জীবরূপে আমি
কত শত রূপ ধরি।

আলোক ব্যতীত বস্তুরূপ যথা
প্রকাশিত নাহি হয়,
বিচার বিহনে আত্মজ্ঞান তথা
সদা আচ্ছাদিত রয়।
বহু জনমের সুকৃতির ফলে
জানিতে বাসনা হয়,
এল কোথা হতে জগৎ সংসার
কি ভাবে হবে বা লয়।
কে "আমি" এদেহে কিবা রূপ মম,
কোথা হ'তে আমি আসি,
দুদিনের পরে কোথা চলে যাই
কালের প্রবাহে ভাসি।
দেহ অভিমান সুখ দুঃখ জ্ঞান
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায়,
কেবা বোধ করে এদেহ মাঝারে
জরা ব্যাধি মৃত্যু ভয়।
এ দেহ পতনে সূক্ষ্মদেহী জীব
নাহি ধ্বংস হ'য়ে যায়,
অন্য ভোগতরে জনম লইতে
অন্য নব দেহে ধায়।
উপাসনা যোগে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে
দর্পণে ছবির মত,
আত্মজ্ঞান আর জগৎস্বরূপ
হয় তাহে প্রকাশিত।

আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে
সকলি নিঃশেষ করি
পারিব যে দিন সঁপিতে হরষে
তোমার চরণো'পরি,
হৃদয়বীণার তারগুলি মোর
বাজিবে তোমারি সুরে,
কামনা বাসনা নানাভাব আর
রবে না অন্তরপুরে,
স্ফুরিবে যখন স্বরূপ আমার
হৃদয় উজল করি,
ঘুচিবে সেদিন সংসারস্বপন
তুচ্ছ কামনা স্মরি।
সে দীপ্ত জ্ঞানের কিরণ-প্রভায়
দশ দিশ যাবে ভরে,
সকল বাঁধন কেটে যাবে মোর
মায়া-মেঘ যাবে সরে।

হেরিব তখন দেহ প্রাণ মন
কামনা বাসনা যত
মিথ্যাই ভাসিছে, আমারি উপরে
দড়িতে সাপের মত।
মৃত্তিকায় ঘট শুক্তিতে রজত
উষর ভূমিতে জল,
সুবর্ণে কুণ্ডল নির্ম্মল গগনে
নীলিমা কটাহতল
নাহি থাকিলেও দেখা যায় আর
'আছে' মনে হয় জ্ঞানে,
এ বিশ্ব সেরূপ অবিদ্যা-প্রভাবে
সত্য বলে হয় মনে।

মায়া মোহ বশে দেহের ধরম
আত্মায় অধ্যাস করি
সুখ দুঃখ ব্যাধি জন্ম মৃত্যু ভয়
গতাগতি বোধ করি।

সুবর্ণে যেরূপ কেয়ূর কুণ্ডল
নাম হয় আরোপিত,
সেরূপ আমাতে নাম রূপ সব
হয় সদা অধ্যাসিত।
তরঙ্গকল্লোল ফেনরূপে যথা
সলিল স্ফুরিত হয়,
ঘট সরা রূপে মৃত্তিকা যেমন
সদাই প্রকাশ রয়,
সূত্র যথা হয় বস্ত্রের আকারে
নানাভাবে রূপান্বিত,
আমিই সেরূপ জগৎ-আকারে
হই সদা বিবর্ত্তিত।

এ সৃষ্টি যখন মরীচিকা-সম
অসার হইবে জ্ঞান,
'দেহ-আমি' বোধ জন্ম মৃত্যু ভয়
হবে সব তিরোধান।
হেরিব তখন 'আমি' মাত্র আছি
তাহা ভিন্ন কিছু নাই,
কারণ রূপেতে কার্য্যরূপে 'আমি'
আছি ব্যাপ্ত সর্ব্বদাই,
অনন্ত সাগরে ঊর্ম্মিমালা যথা
উঠিয়া বিলয় হয়,
ব্রহ্মাত্ম-সমুদ্রে তেমনি মিশিয়া
করি আমি মৃত্যুজয়।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

অন্ধ্র ভাস্কর্য্য

অন্ধ্র ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম ভারতের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের কার্লি কেনেরি ও নাসিক গুহাতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে অমরাবতী ও নাগার্জ্জুন কোণ্ডার স্তূপে।

কার্লি চৈত্য বোম্বে ও পুনার মধ্যে অবস্থিত। চৈত্যের বারান্দায় পুরুষ ও নারী মূর্ত্তি খোদিত আছে। এগুলি দাতা ও দাত্রীদের মূর্ত্তি এবং ১ম অথবা ২য় শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে। বোম্বে হইতে ২৫ মাইল দূরস্থিত কেনেরি গুহার বারান্দায় কার্লির ন্যায় দাতাদের মূর্ত্তি আছে। এগুলি ২য় অথবা ৩য় শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই দুই চৈত্যের ভাস্কর্য্য মথুরা ভাস্কর্য্যের সমসাময়িক। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং উভয় ভাস্কর্য্যই প্রাণবন্ত।

নাসিকের গৌতমপুত্র গুহা (বিহার) ১৩০ খৃষ্টাব্দে এবং মহাপণগুহা (বিহার) ১৮০ খৃষ্টাব্দে খোদিত। শ্রীযজ্ঞগুহা অন্ধ্ররাজ শ্রীযজ্ঞ সাতকার্ণির আমলে নির্ম্মিত। নাসিকের ১৭নং গুহায় বহু বুদ্ধমূর্ত্তি ও শায়িত বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি (পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তি) আছে। এগুলি ৭ম শতাব্দীতে তৈরী করা হয়েছে।

অমরাবতী স্তূপ (১৫০-২৫০)

গোদাবরী এবং কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বেঙ্গি নামে পরিচিত। জগয়পেটা, অমরাবতী ও নাগার্জ্জুনকোণ্ডার স্তূপ বেঙ্গিতে অবস্থিত। জগয়পেটা অমরাবতীর পূর্ব্ববর্ত্তী। বেঙ্গি অঞ্চলের এ সকল স্তূপের ভাস্কর্য্যে সাদৃশ্য আছে।

কৃষ্ণানদীর তীরে অমরাবতীর স্তূপ। এখানে প্রাচীনকালে নগর ছিল এবং খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দেও ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অমরাবতী স্তূপ হয়ত তখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু রেলিং-এর তারিখ ১৫০ হইতে ২৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইহা অন্ধ্ররাজাদের কীর্ত্তি। ইহা অনেক কারুকার্য্য-সম্ভারে পূর্ণ। এই স্তূপ দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে ছিল, এবং ভক্তদের পূজা তখন পর্য্যন্তও চলিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এই স্তূপ বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় কোনো জমিদার ইহার পাথর খসাইয়া চূণের পোয়ান নির্ম্মাণ করিয়া ইহার ধ্বংস সাধন করেন।

স্তূপের ব্যাস ১৬০ ফুট; রেলিং-এর পরিধি ৬০০ ফুট, উচ্চতা ১৪ ফুট। রেলিং-এর গায়ে যে খোদাই আছে তাহার পরিমাণ ১৭০০০ বর্গ ফুট।

অমরাবতীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মডেলিং-এর সৌকুমার্য্য, দীর্ঘ অঙ্গ, নারীর তন্বী দেহভঙ্গী, পুরুষের শক্তিশালী কাঠামো দর্শনযোগ্য। দেহের "ভঙ্গ" রমণীয়। মথুরা অমরাবতীর শিল্পীদের "ত্রিভঙ্গ" ভঙ্গিমা অতি প্রিয়। অমরাবতীর শরীরের ও বাহুর বক্রতার রেখা ছন্দোময়। প্রার্থনারতা নতজানু রমণীর মূর্ত্তি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। অবসাদজনিত লীলায়িত দেহের শ্লথ ভাব শিল্পী ফুটাইয়াছেন। থ্রি কোয়ার্টার মুখ অমরাবতীর শিল্পীর খুব প্রিয়। ইহা ভারতের অন্য শিল্পে দেখা যায় না।

উৎসব সমারোহ সঙ্গীত ও নৃত্যরত শোভাযাত্রা অজন্তাকে স্মরণ করায়। গৃহের অভ্যন্তরভাগ অমরাবতীর শিল্পের Foreshortening-এর নিদর্শন। বারহুতে ইহা নাই। সাঞ্চিতে ইহার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং অমরাবতীতে ইহা কার্যে পরিণত হইয়াছে। অজন্তাতেও এই প্রকার পরিপ্রেক্ষণ দেখা যায়। অমরাবতীর মণ্ডপ অজন্তার চিত্রের ন্যায়।

অমরাবতীর ভাস্কর্যের কৌশল ও সৌন্দর্য্য কোপিং এ (Coping রেলিং-এর স্তম্ভসমূহের সকলের উপর স্থাপিত দণ্ড) বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। বারহুতের কোপিং-এর ন্যায় ভ্রাম্যমাণ পদ্মলতার ফ্রিজ আছে। বারহুতের পদ্মলতার ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম্য জীবনের দৃশ্য বিদ্যমান। ইহাতে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অমরাবতীতে পদ্মলতা বহু ফুলের মোচড়ান মালার সম্মিলনে সর্পাকারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। বিরাট লতাপুঞ্জের সঙ্গে জনপ্রবাহ চলিয়াছে। বেগ এবং আনন্দে তারা অধীর—কেহ লতা ধরিয়া সতেজ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া আছে। এই সকলে সতেজ জীবনের অভিব্যক্তি দেখা যায়। মাঝে মাঝে বোধিবৃক্ষ আছে, কিন্তু এখানে বারহুতের ন্যায় বোধিবৃক্ষের গুরুত্ব নাই। উদ্ভিজ্জ এবং মানুষ দুইই প্রাণবান। মানবজীবন এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়াছে। এখানে দেখা যায়—পুরুষ ও নারীর জীবন ও যৌবনের জয়গান। অমরাবতীর অনাবিল আনন্দ মথুরার Hedonism বা ভোগবৃত্তি হইতে পৃথক। মথুরার শিল্পী নিজেকে দেহের লালসা হইতে উর্দ্ধে তুলিতে পারেন নাই, কিন্তু অমরাবতী দেহের ছন্দে সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়াছে। অজন্তার চিত্রের ন্যায় অমরাবতীর ভাস্কর্য্য খুব sophisticated. অমরাবতীর ভাস্কর্য্য গুপ্ত যুগের শিল্পকে সূচনা করে। আধ্যাত্মিকতার বার্ত্তা অমরাবতীর শিল্পে পৌছায় নাই।

স্তূপ এবং রেলিং শাদা মার্ব্বেল পাথরে তৈয়ারী এবং সোনালী রং করা ছিল। ইহা যখন রৌদ্রে প্রতিফলিত হইত তখন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। বারহুত সাঞ্চিতে শুধু রেলিং-এ ভাস্কর্য্য আছে। তথাকার স্তূপ প্লেন, তাহাতে কোনো কাজ নাই, কিন্তু অমরাবতীতে স্তূপের উপরেও দুই সারি প্রস্তর ফলকের উপর ভাস্কর্য্য ছিল।

অমরাবতীতে বুদ্ধ আছেন। বুদ্ধের জীবন হইতে নানা চিত্র রহিয়াছে।

অমরাবতীর মডেলিং-এ গ্রীক প্রভাব ধরা পড়ে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে গ্রীকরা সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে অবতরণ করিয়াছিল।

অমরাবতীতে পূর্ণাকার ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ মার্ব্বেলের দাঁড়ান বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় ৩য় শতকে নির্ম্মিত। কাপড়ের ভাঁজে শরীর ঢাকা আছে। গুপ্ত যুগে স্বচ্ছ বস্ত্রে যে রকম শরীরের গঠন দেখা যায়, সে রকম নহে। ইহা অনুরাধাপুরের (সিংহল) বুদ্ধকে স্মরণ করায়।

কুমারস্বামী অমরাবতীর ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It would hardly be possible to exaggerate the luxurious beauty or the technical proficiency of the Amaravati reliefs ; this is the most voluptuous and the most delicate flower of Indian sculpture." ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন, "They (Amaravati reliefs) must have formed, when perfect, one of the most splendid exhibitions of artistic skill known in the history of the world."

স্বামীজী ও গান্ধীজী

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্‌-এস্‌সি, বি-টি

মহামানব গান্ধীজী আজ আর ইহজগতে নাই। তাঁহার নশ্বর দেহাবশেষ প্রাচীন দিল্লীর প্রান্তবাহিনী স্বচ্ছসলিলা যমুনার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বহু যুগের বহু রক্তলাঞ্ছিত দিল্লী নগরীর রাজপথ এই সত্যসন্ধ কর্ম্মযোগীর পূত শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। অতীব আকস্মিক এবং মর্ম্মান্তিক এই মৃত্যু-সংবাদ শুধু ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নয়, পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের এক প্রান্ত হইতে পশ্চিম গোলার্দ্ধের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ বেদনার আলোড়ন তুলিয়াছিল।

মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান নিদারুণ সঙ্কটকালে ভারতবর্ষের হিংসামত্ত সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিষম সন্ধিমুহূর্ত্তে এই মহাপুরুষের তিরোধান যে কতবড় শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেন আজও সঠিক বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ও নিগূঢ় তাৎপর্য্যটি কি ছিল, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ঘটনা-প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্যই বা কোন্ দৈব প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাও আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু ধীরে ধীরে, সত্যানুসন্ধানের চক্ষু লইয়া, স্বকীয় এবং জাতিগত উৎকর্ষের আশু প্রয়োজন স্মরণে রাখিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেই প্রচেষ্টাই আমাদিগকে অচিরে সুরু করিতে হইবে। বিবিধ দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা এই সত্যটি আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতির অব্যর্থ বিধানে চির-পরিচালিত আমাদের এই বিপুল সংসারে কোন কিছুই দৈবাৎ সংঘটিত হয় না। আকস্মিক বলিয়া প্রতিভাত ঘটনানিচয়ের পশ্চাতে কার্য্য-কারণ-পরম্পরার একটা শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং গান্ধীজীর উদ্ভব, তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি এবং জীবনদর্শনও ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকস্মিক ব্যাপার কিছু নহে। পরন্তু ঘটনা-নিচয়ের ক্রমিক অভিব্যক্তি ও বিকাশের সহিত ইহা দৈব নির্দ্দেশেই অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। আমাদের বিশ্বাস যে, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—একই মূল অভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে দৈব বিধানে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই যুগে। তাঁহাদেরই ব্যক্তিত্ব ও তপস্যার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগসাধনা পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। বিবেকানন্দে যাহার ধ্যান, পরিকল্পনা ও জাগরণ সুরু হইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথে তাহারই অভিব্যক্তি ও প্রকাশ এবং গান্ধীজীতে তাহারই কর্ম্মে রূপায়ণ সাধিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাবলম্বনে যে যুগের উদ্বোধন হইয়াছিল ভারতবর্ষের বিশেষ সাধনার সূত্রানুসরণ করিয়া, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে তাহারই ব্যাপক অভিব্যক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার অপূর্ব্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়া। ব্যষ্টি ও সমষ্টির তপস্যা, 'হিমালয়ের ডাক' ও কর্ম্মের প্রেরণা, নিজের মুক্তি ও জাতির সেবা—কী অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যেই

সম্মিলিত হইতেছে এই তিনটি পরস্পরের পরিপূরক বিরাট জীবনের মধ্য দিয়া—ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মনে হয়, সর্ব্বভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার অনুগামী কর্ম্ম-যোগাশ্রয়ী নেতৃপুরুষ গান্ধীজী ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন আর একটিও নাই, তেমনি আপাতদৃষ্টিতে বহু বিরোধী ভাবের মিলনক্ষেত্র তদীয় জীবনরহস্য বুঝিবার পক্ষেও এমন তাৎপর্য্য-পূর্ণ বিশ্লেষণ বা দৃষ্টিভঙ্গী আর কিছু নাই।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অথবা 'Be and make'. আবার ইহাকেই জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "Renunciation and service are the national ideals of India. Intensify her in these two channels and the rest will take care of itself." এই দুই সূত্রেরই কী অনুপম সু-সমঞ্জস প্রকাশই না গান্ধীজীর জীবনে আমরা দেখিতে পাইতেছি। শুদ্ধমাত্র সেবার মধ্য দিয়াই আত্মশুদ্ধি এবং ভগবান লাভ যে সম্ভব—স্বামীজীর এ উক্তির সত্যতা আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের পৃথিবীব্যাপী সেবা-ধর্ম্ম ও গান্ধীজী-কর্তৃক এই আদর্শের অনুসরণের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। 'হিমালয়ের ডাক' চিরাচরিত সংস্কারবশেই বোধ করি প্রবল থাকিয়া প্রাক্-বিবেকানন্দ যুগে সেবা-ধর্ম্মকে ভগবান লাভের অন্তরায় বলিয়া সাধকের ও কর্ম্মযোগীর মনে প্রেরণা দিতেছিল। ভাব ও কর্ম্ম, ধ্যান ও সেবা অনেকটা যেন স্বতন্ত্রই রহিয়া গিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য গান্ধীজীর জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। গান্ধীজী দেখাইলেন যে, ত্যাগের ভিত্তিতে সেবার ফলে, Renunciation ও Service-এর মহিমায় ধীরে ধীরে কেমন করিয়া হৃদয়ের ভগবান হাসিয়া ঝলমল করিয়া ওঠেন। তিনি দেখাইলেন যে, প্রাচীন ভারতের চিরন্তন আরণ্যক সাধনার ও হিমালয়ের আহ্বানের সহিত বর্ত্তমান যুগের 'মানবকেন্দ্রিক' কর্ম্মধারার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান কি ভাবে সম্ভব। তাঁহার মহান্ প্রয়াসের ভিতর দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানলব্ধ সত্যটি অভিনব মহিমায় মূর্ত্ত ও রূপায়িত হইয়াছে।

দরিদ্রের মধ্যে উপেক্ষিত নারায়ণ স্বামীজীর চক্ষেই প্রথম বেদনার অশ্রু নির্গত করিয়াছিল। দরিদ্রের সেবা-ব্রত অকুণ্ঠচিত্তে অনুসরণ করিলে হৃদয়ের নারায়ণ যে সত্যিই জীবন্ত হইয়া উঠিবেন—স্বামীজীর এই উক্তির সত্যতা কর্ম্মের মধ্য দিয়া সপ্রমাণ করিলেন মহাত্মাজী তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন্ত সাধনায়। আবার, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও স্বামীজী ধর্ম্মকেই জাতির মূল জীবনী শক্তিরূপে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন। কেন তাহা চাহিয়াছিলেন তৎপ্রদত্ত ধর্ম্মের তিনটি সংজ্ঞার মধ্যেই তাহার উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। তাঁহার সংজ্ঞা তিনটি এইরূপ ছিল—(১) Religion is a mental science.—যে মনের অধিনায়কতায় ইন্দ্রিয়গ্রাম চালিত হয় তাহার সর্ব্বাবয়ব জ্ঞানলাভ ধর্ম্মসাধনার অঙ্গীভূত এবং ইহাকে নিজ পরিপূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করা ধর্ম্মের লক্ষ্য। ফলে, তদীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় সংজ্ঞাটির উদ্ভব। (২) Purity self-control and unselfishness are the whole of religion.—পবিত্রতা, আত্মসংযম ও নিঃস্বার্থপরতা' ধর্ম্মের সব খানি। ইহার প্রথম দুইটি অর্থাৎ, পবিত্রতা ও আত্মসংযম অনেকটা যেন ব্যক্তিগত কিন্তু তৃতীয়টি অর্থাৎ পরার্থপরতা সমষ্টিগত ও ব্যাপক। মনঃসংযম ও পবিত্রতার মধ্য দিয়াই মানুষ নিঃস্বার্থপরতার

আভাস পাইয়া থাকে এবং তাহাই ধর্ম্মসাধনে অভিপ্রেত। (৩) Religion is the manifestation of the divinity already in man.—মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনই ধর্ম্ম। প্রায় পশুত্বের স্তর হইতে কিংবা মনুষ্যত্বের অতি নিম্ন স্তর হইতে এই দেবত্বাভিমুখী দুস্তর যাত্রার সূত্রপাত হইতে পারে।

এ কথা সত্য যে উল্লিখিত ধর্ম্মের তিনটি সংজ্ঞার উপরই স্বামিজীর জাতিগত এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা-সমূহের ভিত্তি স্থাপিত। তাঁহারই বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ততায় এ দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সব কিছুর সংস্কারই যে ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে তাহাও অতুলনীয় দৃঢ়তায় প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনা কোন্ পথে সমষ্টিগত সাধনার সহিত মিশিয়া যাইবে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত স্বামীজী দিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর প্রথম সংজ্ঞাটিকে নিজ জীবনে প্রয়োগ করিয়া বহু নিয়মের বন্ধনে গান্ধীজী নিজকে সর্ব্বপ্রথম আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বাক্, জিহ্বা ও ইন্দ্রিয়-ভোগলালসাকে অবলম্বন করিয়াই মানবমন সর্ব্বাধিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করে বলিয়া সেই দিক দিয়াই গান্ধীজীর প্রথম কঠোরতার সূত্রপাত হইয়াছিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সত্য রূপ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শুধু আকৃষ্ট করে নাই, উহাই পরবর্ত্তী কালে অতি দ্রুত এবং অনিবার্য্য ভাবসংঘাতে তাঁহাকে রাজনীতির বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "I have come to the conclusion that for myself God is truth. But two years ago I went a step further and said that Truth is God."···এবং "To see the universal and all pervading spirit of Truth face to face one must be able to love the meanest of creation as oneself.···That is why my devotion to Truth has drawn me into the field of politics and I can say without the slightest hesitation and yet in all humility that those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means."

সুতরাং মনঃসংযমের কঠোর সংগ্রামের ফলে পবিত্রতা ও আত্মসংযমের শক্তি যতই গান্ধীজীর ভিতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, নিঃস্বার্থ দেশসেবার আদর্শ এবং প্রয়োজনীয়তাও ততই তাঁহাকে মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে শক্তি ও প্রেরণা দান করিয়াছিল। ফলে, উত্তরকালে ব্যক্তিগত সাধনা এবং জাতিগত তপস্যা যুগপৎ তাঁহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া স্বামীজী-প্রচারিত ধর্ম্মের সূত্রগুলির জীবন্ত ব্যাখ্যা জগতকে উপহার দিয়াছিল। আত্মশুদ্ধি এবং জনসেবার মধ্য দিয়া, ত্যাগ ও জগতের হিতপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক—এক কথায় সর্ব্ববিধ সাধনাই যে পথ করিয়া লইতে পারে তাহারও অভিনব পরীক্ষা এইরূপে সুরু হইয়া স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীকে সফলতার দিকে লইয়া চলিয়াছিল। তাই স্বামীজীর উক্তির হুবহু অনুবৃত্তিতে আরও একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"Politics divorced from religion, have absolutely no meaning." অর্থাৎ ধর্ম্মবিবর্জ্জিত রাজনীতির কোনই অর্থ নাই। জীবনের প্রারম্ভে অতি সাধারণ স্তর হইতেই গান্ধীজী তাঁহার সাধনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। দেবত্বমুখী তদীয় অভিযান মনুষ্য-জীবনের অতি নিম্ন পর্য্যায় হইতেই আরম্ভ

হইয়াছিল। বোধ করি প্রথমতঃ ইহাতে জীবন-সংগ্রামের সর্ব্বাবয়বতা প্রকাশিত হউক এবং তাহাতে অতি সাধারণ দুর্ব্বল ও অসহায় নরনারী আশা ও উৎসাহের দীপ্ত আলোকে পথ দেখিতে পা'ক তাহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধসঙ্কল্প দেশপ্রাণ স্বামীজীর ভবিষ্যদ্-বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্যও হয়ত সে বিশদ প্রক্রিয়ার জাতিগত একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল।

বনের বেদান্তকে ঘরে আনিবার, মন্দিরের দেবতাকে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাহার সেবায় জীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার যে নির্দ্দেশ স্বামী বিবেকানন্দ দিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহাকেই অপূর্ব্ব দক্ষতায় ব্যক্তিগত ও জাতিগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক সাধনা ও মানবসেবা-রূপ দুই পরস্পর আপাতবিরোধী আদর্শের সম্যক্ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া তদীয় "মহাত্মা" উপাধিটিকেও সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মধারা যদি আধ্যাত্মিক সাধনা ও নিরলস সত্যানুসন্ধানে সমৃদ্ধ না হইত, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীতে' অহিংসার প্রয়োগপ্রচেষ্টায় মহীয়ান না হইত তবে ম্যাজিনি, গারিবল্ডি, কুইজন, আউঙ্গ-সেন প্রমুখ রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দের জীবন হইতে তাঁহার জীবনে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না। 'Loss to humanity'—মানব-জাতির পক্ষে মহা ক্ষতিকর বলিয়াও তাঁহার মৃত্যুকে কেহ অভিহিত করিত না। পক্ষান্তরে, যদি কেবলমাত্র ধ্যান ও ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনায়ই তাঁহার জীবন সর্ব্বথা নিয়োজিত হইত, তবে লক্ষ কোটি দীন জন আজ তাঁহার অভাবে অন্তরে বেদনা ও বিরহযন্ত্রণা বোধ করিত না।

ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করিবার বিবিধ পন্থা বহুকাল ধরিয়া আমরা জানিয়া আসিয়াছি কিন্তু জাতিগত কিংবা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহার ব্যাপক প্রয়োগ-সম্ভাবনা বা কৌশল এতকাল একান্তই অস্পষ্ট ছিল। আত্মশুদ্ধি সত্য এবং অহিংসার মধ্য দিয়া গান্ধীজী সেইটি সাধন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"I have nothing to teach to the world. Truth and non-violonce are as old as the hills. All I have done is to try experiments in both on as vast a scale as I could." ভবিষ্যৎ জানে, উত্তরকালে ভারতবর্ষের এই পরীক্ষা কতদূর সার্থক হইবে। কিন্তু এক বিরাট পরীক্ষার সূত্রপাত যে তিনি করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দৈবহস্ত কী ভাবে যুগচক্র নিয়মিত করিতেছে তাহা ধ্যানসহায়ে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—পরস্পরের পরিপূরক হইয়া কী ভাবে এযুগের বিষম সমস্যার সমাধান ভারতের বিশেষ ঐতিহ্যানুসরণে সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাও অনুধাবন করিতে হইবে।

আনন্দমঠের শেষ অধ্যায়ের চিত্রটি এই প্রসঙ্গে চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া আসে। সেদিন বিপ্লবের শেষে এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষ সহসা আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মযোগাশ্রয়ী সত্যানন্দকে গভীর বনপ্রদেশে লইয়া গিয়াছিলেন নিবিড়তম সাধনার জন্য। সেদিন যে চিত্রটি ঋষি বঙ্কিমের কল্পলোকে নিছক একটি ছায়াচিত্রেরই মত প্রতিভাসিত হইয়াছিল আজ তাহাই কি বাস্তব রূপ লইল? শতাব্দীর তপস্যান্তে, জ্ঞানমূর্ত্তি স্বামী বিবেকানন্দ একদা যুগ-প্রভাতে যাহা ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—ত্যাগ এবং সাধনার মধ্য দিয়া তাহাই কি পরবর্ত্তী সময়ে গান্ধীজী কর্ম্মে প্রকাশ করিবার প্রয়াসে দধীচির মত দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন? জ্ঞান ও কর্ম্ম, সিদ্ধি ও তপস্যা, ধ্যান ও সেবা কি

এইরূপে পরস্পরের হাত ধরিয়া নূতন আলোকধারায় যুগবর্ত্ম আলোকিত করিল? জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে, জগৎসভায় নিজের যথাযথ আসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই নিগূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নিরলস কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনজাতিসুলভ পরার্থপরতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়া স্বামীজীর ধ্যানদৃষ্টি ও গান্ধীজীর জীবনস্বপ্ন আমাদিগকে সার্থক করিতে হইবে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আজ চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে সত্য কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে দিব্য জ্যোতি-ধারায় দিক্‌চক্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে—এ ভরসা আমরা অন্তরে পোষণ করিব। যুগে যুগে, দেশে দেশে—মহৎ জীবনের মহতী সাধনা যে-ভাবে সফল হইয়াছে আমাদের দেশেও উহার অন্যথা হইবে না—ইহাও আমরা বিশ্বাস করিব এবং উহারই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ভাবী কালের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিব—

আসিবে, সেদিন আসিবে।
নিরাশারে ভেদি—
আশার আলোক ফুটিবে।
তিমির বিদারি, সূর্য্যের রথ
মহাব্যোম-পথে ছুটিবে;
কর্ম্ম-জ্ঞানের মিলনের পথে
শাশ্বত জ্যোতি পড়িবে।
ভারতের বাণী মূর্ত্তি লভিয়া
সত্যেরই জয় ঘোষিবে।

উধাও*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানস-নলিনং
মম খেলসি মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্।

ওরে উধাও আমার মন!
কবে অন্তরে তোর খুঁজবি অঝোর প্রেমের বৃন্দাবন?
কবে শুনবি বাঁশি তারি
চির সুরের যে কাণ্ডারী?—
কবে নীল যমুনার কূলে যে পাব—বিনা কড়ির পারী?
নিতি গায় যে উছল: "সুরশ্যামল অনন্ত ঝঙ্কার···
তাকে বাসলে ভালো মিলবে আলো—ঘুচবে অন্ধকার।
কোথায় বাইরে তাকে খুঁজিস—ডাকে অন্তরে সুজন!
অবুঝ মন রে! কথা শোন্।
সময় যায় যে ব'য়ে···তার প্রণয়ের অফুর ফসল বোন্।
তোর ঐ অন্তরেরি মাঝে
বাঁশি শোন্ না বাজে···বাজে:
"ওরে পতিত জমির তলেও জ্যোতির ঘুমিয়ে মুকুল আছে।
তাকে আপন ব'লে চিনলে—পলে অচিন কাঁটা কালো
যাবে দেশান্তরে—ভুবন ভ'রে হাসবে ফুলের আলো:
শুধু তারি প্রেমে আসে নেমে ধূলায় বৃন্দাবন।

* গানটি শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তা গ্রামোফোনে দিয়েছেন।

ভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সুবল চন্দ্র মিত্রের 'বাঙ্গালা অভিধানে' (১৪৭৭ পৃষ্ঠায়) সুরেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে আছে—"১৮৫০ খ্রীঃ কলিকাতা মহানগরীর হাটখোলা পল্লীর বিখ্যাত দত্তবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অমায়িক, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, স্বাবলম্বী ও সরল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের মধ্যে একজন বিখ্যাত ভক্ত। 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উক্তি' (উপদেশ), 'সাধকসহচর', 'নারদ-সূত্র' বা 'ভক্তিজিজ্ঞাসা', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সমালোচনা', 'বেদ ও বাইবেল', 'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম সমাজ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত', 'কাজের লোক' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৌলিক উপদেশাবলী সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহার তিনজন গৃহী শিষ্য—রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং সুরেশচন্দ্র দত্ত। মহেন্দ্র গুপ্তের 'কথামৃত' ইংরাজী, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। রাম দত্তের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' এখনও ভাষান্তরিত হয় নাই। সুরেশ দত্তের 'পরমহংসদেবের উপদেশ' এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক হিন্দীতে অনূদিত হইয়া বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরেশ বাবুর মূল বাংলা প্রথম ভাগ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জীবিতকালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইবার পর সুরেশ বাবু ঠাকুরের আরও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত পুস্তক ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। উক্ত সংস্করণে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও সন্নিবিষ্ট হয় এবং প্রত্যেক ভাগে একশত উপদেশ থাকে। উপদেশসংগ্রহে এবং পুস্তকপ্রকাশে ঠাকুরের গৃহী ভক্ত হরমোহন মিত্র তাঁহার বিশেষ সহায়ক ছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটি এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উহাতে ঠাকুরের এক সহস্র উপদেশ ও আখ্যায়িকা আছে। পুস্তকখানির দশটি সংস্করণ হইয়াছে।

ঠাকুরের জীবনী ও বাণী এখন যত প্রচারিত হইয়াছে তখন তত প্রকাশিত হয় নাই। এইজন্য সুরেশবাবুর গ্রন্থাবলী ঠাকুরের অভূতপূর্ব জীবনী ও অমৃত বাণী প্রচারে সে যুগে অশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার নামও বাংলার পাঠকসমাজে তখন সুপরিচিত ছিল।

সুরেশচন্দ্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাটখোলা পল্লীর বিখ্যাত দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২ বৎসর বয়সে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে গুরুপদে লীন হন।* কলিকাতার সেই অঞ্চলে তখন ঠাকুরের গৃহী ভক্ত সাধু, নাগ মহাশয় বাস করিতেন। সুরেশচন্দ্র এবং দুর্গাচরণ নাগ বাল্যেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। সুরেশ দুর্গাচরণকে মামা বলিয়া ডাকিতেন। দুর্গাচরণ তখন হোমিওপ্যাথি পড়িতেন। তিনি ইংরেজী শিখিবার জন্য হিলে (Hiley) সাহেবের গ্রামার পড়িতেন। কিন্তু তিনি ইংরেজী শব্দগুলি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। দুর্গাচরণ সুরেশের নিকট কিছুদিন ইংরেজী পড়িয়াছিলেন।

* ১৩১৯ সালের পৌষ-সংখ্যা 'উদ্বোধন' দ্রষ্টব্য।

ইংরেজী ভাষার উপর সুরেশের বিশেষ দখল ছিল। প্রত্যেক সন্ধ্যায় সুরেশ দুর্গাচরণের বাসায় যাইয়া ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। সুরেশ ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী এবং দুর্গাচরণ ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। প্রত্যহ উভয়ে উত্তেজিত ভাবে ধর্মালোচনা করিতেন; কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। সুরেশ শেষে বলিতেন, "মামা, রাখ তোমার শাস্ত্রমাস্ত্র, আমি ওসব মানি না।" তিনি দুর্গাচরণকে কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও উপাসনাদিতে লইয়া যাইতেন। তিনি বলেন, 'বাল্যকাল হইতে দুর্গাচরণের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ ছিল।' ধর্মালোচনায় তৃপ্ত না হইয়া উভয়ে ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্ম-জীবনের প্রারম্ভেই গুরুগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন। সুরেশ ইতঃপূর্বেই কেশবের ব্রাহ্মসমাজে পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইবার দুইমাস পরেই সুরেশচন্দ্র একদিন দুর্গাচরণকে বলিলেন, "দেখ মামা, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, চল তাঁকে দেখে আসি।" দুর্গাচরণ আর দেরী সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন, "চল, আজই যাই।" সেইদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বন্ধুদ্বয় দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহারা পূর্বে কখনও যান নাই। তখন চৈত্রমাস, প্রখর রৌদ্র। তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরের পথও জানিতেন না। সেই জন্য গন্তব্য স্থল অতিক্রম করিয়া অনেক দূর চলিয়া যান, এবং পরে যথাস্থানে ফিরিয়া আসেন। বৈকাল প্রায় দুইটার সময় তাঁহারা কালীমন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরোদ্যানের সুন্দর দৃশ্য ও প্রশান্ত ভাব তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিল। তাঁহাদের মনে হইল, যেন তাঁহারা স্বর্গে আছেন। ধীরে ধীরে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠের পূর্ব বারান্দায় পৌঁছিলেন। তথায় উভয়ে প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামক এক শ্মশ্রুবিশিষ্ট ভদ্রলোককে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু প্রতাপ হাজরা বলিলেন যে, ঠাকুর সেদিন অন্যত্র গিয়াছেন। উক্ত মিথ্যা সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য হতাশ হইলেন। এমন সময়ে গৃহমধ্য হইতে একজন অঙ্গুলি নির্দেশে তাঁহাদিগকে ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। উভয়ে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ছোট খাটটির উপরে সহাস্যবদনে উত্তরদিকে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। মেঝের উপর একটি মাদুর পাতা ছিল। সুরেশ ঠাকুরকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া উক্ত মাদুরে বসিলেন। ঠাকুর উভয়ের পরিচয় লইয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "পাঁকাল মাছের মত সংসারে থাক। পাঁকাল মাছ কাদার মধ্যে থাকিলেও তাহার গায়ে যেমন কাদা লাগে না তেমনি তোমরা সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক।" সুরেশ ও দুর্গাচরণ ঠাকুরের এই উপদেশটি আক্ষরিক ভাবে সমগ্র জীবন পালন করিয়াছিলেন। কথাবার্তার পর ঠাকুর উভয়কে পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। তাঁহারা তদনুযায়ী পঞ্চবটীতে যাইয়া আধ ঘণ্টা ধ্যান করিবার পর ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাদিগকে মন্দির দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। ঠাকুর অগ্রে চলিলেন এবং তাঁহারা পশ্চাতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে তাঁহারা ঠাকুরের গৃহসংলগ্ন দ্বাদশটি শিবমন্দির একটির পর একটি দেখিলেন। ঠাকুর প্রত্যেক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। ঠাকুর যেমনটি করিলেন, দুর্গাচরণ ঠিক তেমনটি করিলেন। কিন্তু সুরেশ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া দেব-দেবীতে বিশ্বাস করিতেন না। সেইজন্য তিনি তদনুরূপ করিলেন না। এইরূপে তাঁহারা সকল শিবমন্দির দর্শনান্তে বিষ্ণুমন্দির ও সর্বশেষে কালী-মন্দির দর্শন করিলেন। সুরেশ ও দুর্গাচরণ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, ঠাকুর কালীমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্রই ভাবাবিষ্ট হইলেন। অস্থির শিশু যেমন মায়ের আঁচল ধরিয়া তাঁহার চারিদিকে

ঘুরিতে থাকে সেইরূপ ঠাকুর কালী ও শিবমন্দিরের বিগ্রহ প্রণামান্তে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিলেন। কালীমন্দির হইতে তাঁহারা প্রায় ৫টার সময় ঠাকুরের ঘরে ফিরিলেন। সুরেশ ও দুর্গাচরণ গৃহে ফিরিবার জন্য বিদায় লইলেন। ঠাকুর তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আবার এসো। যদি কিছুদিন নিয়মিতভাবে যাতায়াত কর তাহা হইলে আমাদের পরিচয় গভীর হইবে।" সুরেশ পরবর্তী কালে বলিয়াছিলেন, প্রথম দর্শনে তিনি ঠাকুরের যে অসীম ভক্তি ও অসাধারণ ভাব দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে চিরতরে অঙ্কিত ছিল। সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেশ ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। কারণ, তৎসংগৃহীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ"এর প্রথম খণ্ড ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

এক সপ্তাহ পরে সুরেশ ও দুর্গাচরণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে পুনরায় দেখিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন ও বলিলেন, "তোমরা আবার এসে খুব ভাল ক'রেছ। আমি তোমাদের জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি।" সেদিনও ঠাকুর উভয়কে পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যানের পর ঠাকুর দুর্গাচরণকে তামাক সাজিতে আদেশ দিলেন। দুর্গাচরণ তামাক সাজিতে গেলে ঠাকুর সুরেশকে বলিলেন, "দেখ, লোকটী যেন জলন্ত অগ্নি!" এরূপে সুরেশ দুর্গাচরণের সঙ্গে ৮।৯ বার ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিনি অন্য কাহারও সঙ্গে বা একাকী নিশ্চয়ই ঠাকুরকে আরও বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ ঠাকুরের সহস্র উপদেশ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তৎপরে তিনি সরকারী চাকুরী লইয়া কোয়েটাতে চলিয়া যান। এই দূরবর্তী স্থানে যাইবার পূর্বে দুর্গাচরণ ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে সুরেশকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুরেশ তখন মন্ত্রে বা সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। সেই জন্য দুর্গাচরণের সহিত তাঁহার ঘোর তর্কবিতর্ক হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, সুরেশ ঠাকুরের উপদেশানুসারেই চলিবেন। পরদিন উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সুরেশ স্বীয় দীক্ষা-বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "দুর্গাচরণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে তাহা খুবই সত্য। যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণান্তর ধর্মসাধন করা উচিত। দুর্গাচরণ যেমন যেমন বলেছে তেমনি কর।" সুরেশ বলিলেন, "কিন্তু আমার ত এখন মন্ত্রে বা ঈশ্বরীয় রূপে বিশ্বাস নাই।" তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা হ'লে তোমার এখন দীক্ষার দরকার নাই। পরে তুমি উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিবে এবং সময়ে দীক্ষালাভ করিবে।"

অদূর ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। কোয়েটায় কিছুকাল থাকিবার পর সুরেশ দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন শ্রীশ্রী-ঠাকুর কাশীপুর বাগানবাটীতে গলরোগে শয্যাশায়ী। সুরেশ তথায় ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতেই ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ডাক্তার বন্ধু কোথায়? সেও ভাল চিকিৎসক শুনেছি। তাকে শীঘ্র এখানে একবার আস্তে বল্‌বে।" সুরেশ ঠাকুরের নির্দেশ মত দুর্গাচরণকে খবর দিলেন। বন্ধুর পরামর্শানুসারে সময়ে দীক্ষা গ্রহণ না করার জন্য সুরেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার অনুতাপানল আরও তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হইল। ঠাকুরের নিকট দীক্ষালাভ করিতে না পারিয়া তিনি মর্মাহত হইলেন। প্রত্যেক নিশীথে তিনি

নির্জন গঙ্গাতীরে যাইয়া ঈশ্বরকে তাঁহার আকুল প্রার্থনা জানাইতেন। এক রাত্রিতে দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি গঙ্গাতীরে কয়েক ঘণ্টা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন। ভোর রাত্রে তিনি দেখিলেন, ঠাকুর গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। সুরেশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সুরেশ যেমন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে গেলেন, অমনি ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন।

এই ঘটনায় সুরেশ অন্তরে অনুভব করিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশ্বরাবতার। তিনি ঠাকুরকে অবতারজ্ঞানেই পূজা ও ধ্যানাদি করিতেন। তিনি তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি প্রৌঢ়াবস্থায় লোকে সকল সময়েই তাঁহার ভিতর অলৌকিক ঐশী শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছে। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া দূরদূরান্তরের ঘটনা দেখিতেন ও যথাযথ বলিতেন, মানুষের মনের কথা ও ভাব বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার দিব্য স্পর্শের অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে ভক্তগণের ভ্রূযুগলের মধ্যে দ্বিদলপদ্ম প্রস্ফুটিত হইত এবং তন্মধ্যে কালী, রাধা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্য, জ্যোতির্ময় দেবমূর্তির দর্শন এক নব শক্তির সঞ্চার ও হৃদয়ে ভগবৎ-নামের স্ফুরণ হইত।" নিশ্চয়ই সুরেশ ইহা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি হইতে লিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, বর্দ্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিত সুধীবর পদ্মলোচন, ইঁদেশবাসী ভক্তপ্রবর মহাপ্রাজ্ঞ গৌরীপণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত সাধু-পুরুষ আসিয়া সেই সময় তাঁহাকে দর্শন করেন এবং লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্তব করেন। পরমহংসদেব নিজমুখেও আপন অবতারত্ব সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন. 'যেমন রাজারা সময় সময় স্বীয় রাজ্যমধ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করেন' অথচ কেহ তাঁহদের চিনিতে পারে না, এবারে আমিও সেইরূপ ছদ্মবেশে আসিয়াছি; এবারে আমায় সকলে চিনিতে পারিবে না।' তিনি বলিতেন, 'অবতার তাঁর কর্মচারী; কিন্তু এবারে তিনি খোদ এসেছেন।' তিনি আরও বলিতেন, 'আমাকে বকলমা দাও।' ভগবান ভিন্ন একথা কোন্ মনুষ্য বলিতে পারে? তিনি কাহাকেও বলিয়াছিলেন, 'প্রাতঃকালে আমার মন জগৎ ব্যাপিয়া থাকে, অতএব সে সময় আমাকে স্মরণ করিও!' তিনি তাঁহার ভক্তদের বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের কোন সাধন-ভজন করিতে হইবে না, আমাকে যদি তোমাদের ষোল আনা বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সব হইবে।' দিবারাত্র অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার সমাধি হইত। তদবস্থায় তাঁহার নয়ন পলকশূন্য, উভয় নেত্র প্রেমধারাপূর্ণ, মুখ সুমধুরহাসিময়, সর্বাঙ্গ প্রস্তরের ন্যায় স্পন্দহীন বাহ্যচৈতন্য-শূন্য হইয়া যাইত। কানে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁকার শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইত।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভ করিবার পূর্বে সুরেশ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং উহার সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, অমায়িকতা, বন্ধুপ্রীতি ও নিঃস্বার্থ সেবার জন্য আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার আবাল্য সখা ও ঘনিষ্ঠ সহচর সাধু দুর্গাচরণ নাগ তাঁহার এক বন্ধুকে একবার বলিয়াছিলেন যে সুরেশের চরিত্রের মত নির্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তিনি খুব অল্প লোকেরই দেখিয়াছেন। এমন কি, অসহায় অবস্থায়ও সুরেশকে আত্মসম্মান ও বংশমর্যাদা রক্ষা করিতে

দেখা গিয়াছে। কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ যদি সন্ন্যাসের আদর্শ হয় তাহা হইলে সুরেশ নিশ্চয়ই প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন। ঠাকুরের পূত সংস্পর্শ তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের জন্য এত পাগল করিয়াছিল যে, মাঝে মাঝে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া নির্জনে তিনি সাধনভজনে আত্মনিয়োগ করিতেন। কর্মহীন অবস্থায় তিনি যখন পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে অক্ষম হইতেন এবং আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে ক্ষেপা বলিয়া উপহাস করিতেন তখনও তাঁহাকে প্রশান্ত ও প্রফুল্ল দেখা যাইত। তিনি এত ঈশ্বরবিশ্বাসী, অনাসক্ত ও নিরভিমান ছিলেন যে, কাহারও সমালোচনায় বা কটাক্ষে বিচলিত হইতেন না।

একটি ঘটনা হইতে বুঝা যায় সুরেশ কতদূর ন্যায়বান ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ কাবুল যুদ্ধের সময় তিনি মিলিটারী বিভাগে দুইশত টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী লইয়া কোয়েটাতে যান। তখন ভারত সরকার যুদ্ধের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতেছিলেন। বিভাগীয় কোন অফিসার কোন বিল উপরওয়ালার কাছে পাঠাইলেই তাহা মঞ্জুর হইত। ব্যয় অসত্য, কি অধিক, কি অতিরিক্ত ইহা দেখিবার বা ভাবিবার অবসর বা ইচ্ছা অধিকাংশ অফিসারেরই ছিল না। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুরেশের উর্ধতন কর্মচারী একটী নকল বিল পাশ করাইয়া প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভাবী বিপদের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সুরেশকে উক্ত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ ঘুষ দিতে প্রস্তাব করেন। সুরেশ এই অর্থ গ্রহণ করিতে শুধু যে অস্বীকার করিলেন তাহা নহে, ভবিষ্যৎ প্রলোভন এড়াইবার জন্য চাকুরীও ত্যাগ করিলেন। তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী এই পরোক্ষ অপমানে লজ্জিত হইয়া সুরেশকে যুদ্ধবিভাগের কঠোর নিয়মানুসারে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেন। তিনি সুরেশকে আটক রাখিয়া পূর্ববৎ নিজের অধীনে জোর করিয়া কাজ করাইলেন। এই কষ্টকর ও অসহায় অবস্থায় সুরেশের কিছুকাল কাটিল। উক্ত বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন জনৈক সদয় ইংরেজ। সুরেশ তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন। তিনি মেডিক্যাল অফিসারকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং পদত্যাগের জন্য সার্টিফিকেট দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার সুরেশের ন্যায়পরায়ণতা ও লোভহীনতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধবিভাগের চাকুরীর অনুপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট দিলেন। এই সার্টিফিকেট দ্বারা সুরেশ পদত্যাগের অনুমতি পাইলেন; কিন্তু তাঁহার স্থানে আর একজন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে কার্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্থানে অন্য লোক আসিতেই সুরেশ কোয়েটা ত্যাগ করিয়া কাশী অভিমুখে রওনা হইলেন।

সুরেশ যখন চাকুরী ছাড়িলেন তখন তাঁহার হাতে মাত্র বিশ টাকা ছিল। কাশী আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই এই সামান্য অর্থ নিঃশেষিত হইল। রিক্ত হস্তে সুরেশ পদব্রজে কলিকাতার দিকে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ পথ চলার অভ্যাস না থাকায় চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইলেই তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গী 'গীতা' খানি পাঠ করিতেন। পথে ক্ষুধিত হইয়াও তিনি আহার ভিক্ষা করিতেন না। অযাচিতভাবে গ্রামবাসীরা যাহা দিত তাহাই সানন্দে গ্রহণ করিয়া উদরপূর্তি করিতেন। এই রূপে তিনি ভাগলপুর পর্যন্ত আসিলেন। তথায় কোন দয়ালু ভদ্রলোক তাঁহাকে কলিকাতা পর্যন্ত ট্রেণে আসিবার জন্য একখানি টিকিট কিনিয়া দিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি সংসার-প্রতিপালনের ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার নিজের চাকুরী নাই; কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাত্র ২৫৲ টাকা বেতনে চাকুরী করেন।

তাঁহার উপর স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভারই বা কিরূপে দেন ? সুরেশের স্ত্রী ও একটী মাত্র কন্যা ছিল। তিনি উক্ত সমস্যা সমাধানের একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সুরেশ কয়েকটী টাকা সংগ্রহপূর্বক পরিহিত বস্ত্রের খুঁটে বাঁধিয়া কলিকাতা বড়বাজারের আলুপোস্তায় গেলেন। তিনি আধমণ আলু কিনিয়া একটী কুলির মাথায় চাপাইয়া উল্টাডিঙ্গি পুল পর্যন্ত চলিলেন ও তথায় কুলিটীকে বিদায় দিয়া নিজের পরিহিত কাপড় ও কোট পুঁটলি বাঁধিয়া বস্তার মধ্যে লুকাইয়া আলুর বস্তাটী মাথায় করিয়া রাস্তায় আলু ফেরি করিতে লাগিলেন। শাকসবজি-বিক্রেতার ন্যায় দ্বারে দ্বারে আলু বিক্রয় করিয়া তিনি রোজ ৭।৮ আনা মাত্র উপার্জন করিতেন। তদ্দ্বারা তাঁহার ও পরিবারবর্গের অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হইত। এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। সামান্য চেষ্টার ফলে ৬০৲ টাকা বেতনে একটী চাকুরী পাইলেন। তিনি ধর্ম-সাধনার জন্য কয়েকবার চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু সংসার প্রতিপালনের জন্য আবার তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকুরী লইতে হইল। তিনি মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং ঐহিক অভ্যুদয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ঈশ্বরচিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। লোকলোচনের অন্তরালে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন পূর্বক তিনি আদর্শ গৃহস্থের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল তাঁহার অনাড়ম্বর অনাবিল জীবন। তাঁহার বন্ধু ও গুরু ভ্রাতা দুর্গাচরণের ন্যায় তিনি সংসারের মধ্যে বাস করিলেও সংসার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এরূপ গুরুগতপ্রাণ সাধনাপ্রিয় জীবন জগতে দুর্লভ। স্পর্শমণি যাহা স্পর্শ করে তাহাই সোনা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারাই দেবতুল্য হইয়াছেন।

'এলে কি চুপে চুপে ?'

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

আজ বাদলে অশ্রুজলে
 এলে কি চুপে চুপে
শ্রাবণ ঘন ভুবন ভোলা রূপে ?
বাহিরে ঝরে শ্রাবণধারা,
বৃষ্টি আজি বাঁধনহারা,
 ঝড়ের কেতন উড়িয়ে বনে বনে,
 টাপুর টুপুর নূপুর ধ্বনি স্বনে।
নদীর বুকে তুফান উঠে
 বন্ধ আজি খেয়া,
 গুরু গুরু ডাকিছে ঘন দেয়া !

কোন্ অকূলে বাজাও বাঁশী,
বজ্র তোমার উঠে যে হাসি
 পরাণ মোর কাঁপিছে থরথরি,
 অশ্রু আজি নয়নে উঠে ভরি।
মিলন দীপ নিভে কি যায়
 উঠে কি হাহাকার ?
 উথলে তাই হৃদয়-পারাবার।
ডমরু তালে আজি কি ভোলা,
কেবলি দেয় ঝড়ের দোলা,
 মরণ ঘুমে নয়ন আসে ঢুলে,
 বন্ধু আজি লবে কি বুকে তুলে ?

কপিলাশে কয়েক দিন

স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ

মন সৃষ্টির উৎস—সকলের রহস্যাগার। যা কিছু আমরা বাইরে বাস্তব জগতে দেখতে পাই সকলেরই সৃষ্টি হয় মনে। মনে উদ্ভূত হয় ভাবরাশির। সেই সকল ভাব বহির্বিকাশে উন্মুখ হয়—বাস্তব জগতে রূপায়িত হ'তে ব্যগ্র হয়। গ্রীষ্মের ছুটির কিছু দিন আগে বহির্ভ্রমণের একটা ভাব আমার মনে উদিত হয়েছিল। সেই ভাব বাস্তবে রূপায়িত করতে আমার মন লালায়িত হল। মনের কোণে লুক্কায়িত পটে ফুটে উঠল পুরীর ছবি। ক্রমে ছুটির মুখে শুনতে পেলুম ২।৩টি ছেলে আসছে পুরীর পথে। এই প্রসঙ্গ করতে করতে দেওঘরে জনৈক ভদ্রলোকের নিকট শুনলুম কপিলাশের কাহিনী।

কপিলাশ একটি ছোট পাহাড়—শিবস্থান। ২১৮৫ ফিট্ উঁচুতে সেই পাহাড়ে বাবা চন্দ্রশেখর বিরাজ কচ্ছেন। মনে শান্তি লাভ করতে ও গ্রীষ্মের সন্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবার আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হল।

প্রতিবারেই দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে ছুটি হ'লেই রেলওয়ের রিজার্ভ বগিতে বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ কল্‌কাতা যায়। সেখান থেকে তারা নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যায়। কলিকাতাগামী ছাত্র-দলের সঙ্গে আমিও কটকের দিকে যাত্রা করলুম। মধ্যরাত্রে গাড়ী যেন তার ঘুমের ঘোর ভেঙ্গে চল্‌ল জগন্নাথ-যাত্রায়। অপরাহ্নে ক্লান্ত কলেবরে ধূম উদ্গিরণ করতে করতে গাড়ী পৌঁছল কটকে। সেখান হতে ঢেঁঙ্কানলের গাড়ী পেতে এখনও তিন ঘণ্টা দেরী। ইতোমধ্যে উদরপূর্ত্তি করে আমাদের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হ'ল। রাত সাড়ে আটটায় ঢেঁঙ্কানলের গাড়ীতে চেপেই নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হ'লাম। নিদ্রার আকর্ষণে গত্যন্তর না দেখে আমি জগজ্জননীর নিকট সকাতর প্রার্থনা করতে লাগলুম—"মা, চলেছি নূতন অজানা পথে; তাই একটু হুঁস রেখে দিও, যাতে পথ ভুলে বিপথে চলে না যাই।" রাত্রি এগারটায় ঢেঁঙ্কানল পৌঁছলুম। পরদিন ভোরে উঠেই কপিলাশ যাত্রা করলুম।

ঢেঁঙ্কানাল থেকে ১২ মাইল দূরে দেঁওগায়ে আমরা ৮½ টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম। এই গ্রাম বাবা চন্দ্রশেখরের ভোগরাগের জন্য প্রদত্ত। গ্রাম থেকে উপরে চলে যেতে হয় কপিলাশে। কপিলাশে যাবার দুটো রাস্তা—গাড়ীর রাস্তায় গেলে ঘুরে ঘুরে তিন মাইলের উপর চলতে হয়; আর সোজা রাস্তা পায়ে হাঁটা পাগ্‌দণ্ডি ধরে গেলে যেতে হয় মাত্র ১½ মাইল। পাগ্-দণ্ডির রাস্তা ধরেই আমরা এগিয়ে চল্‌লুম উপরের দিকে। দুটো খাড়া চড়াই অতিক্রম করে দেহে একটু অবসাদ এল। খানিক বিশ্রাম করে বাবা চন্দ্রশেখরের রাজ্যে আরোহণ করতে লাগলুম। যত তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলুম্ ততই দেহ মনের ক্লান্তি দূর হতে লাগল। সত্যই চন্দ্রশেখর চন্দ্রেরই মত তাঁর ভরপুর স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সুশীতল ছায়ায় সকলের সন্তাপ দূর করে এক নূতন রাজ্যে নিয়ে যান। এখানে বহু যাত্রী দলে দলে বাবার শরণ নিয়ে প্রাণের জ্বালা

জুড়াতে আসে। বাবা আশুতোষ অতি সহজে তুষ্ট হয়ে যাত্রীদের তপ্ত প্রাণের তাপ গ্রহণ করে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বাবার রাজত্বে হিংসার স্থান নেই। তাই জন্তু জানোয়ার সকলেই নির্ভয়ে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কয়েকটা চড়াই অতিক্রম করে আমরা রামদাস বাবাজীর আশ্রমের কাছে এসে বসলুম্। এখানে ছোট কুণ্ডের মত বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝর ঝর করে ঝরনার জল এসে পড়ছে। সেই জল খেয়ে পথিকেরা পথশ্রান্তি দূর কচ্ছে। আমরাও শ্রান্তি দূর করে বাবাজীর আশ্রম দেখতে গেলুম। আশ্রমে পাথরের উপর পাথর তুলে গাঁথ্নি উঠছে একটা ছাউনির তলায়, কালে গাঁথ্নি উপরে উঠে গেলে পাকা ছাদ হবার কথা। বাবাজী পায়ের উপর পা তুলে বসে আছেন ছাউনির তলায়। লক্ষ্য রয়েছে গাঁথ্নির দিকে।

এই ভাবে বেশ বিশ্রাম করতে করতে আমরা উঠে এলুম উপরে—উঠেই প্রথমে পেলুম আমাদের আস্তানা। আস্তানায় আছে ২।৩ খানা ঘর। এখানে বারান্দায় বসে জোর হাওয়া পাওয়া যায় সব সময়। এই আস্তানা থেকে কয়েক ধাপ নীচে নেবে গেলেই বাবার মন্দির। চার পাশে ছোট খাট অনেক মন্দির রয়েছে। পেছনে উত্তর দিকে রয়েছে মা পার্ব্বতীর মন্দির। উপরে পূর্ব্ব দিকে আরও দুটি সুন্দর মন্দির রয়েছে। একটিতে কাশী-বিশ্বনাথ বিরাজ কচ্ছেন। অপরটিতে রয়েছেন নারায়ণী। নারায়ণীর পাদমূল ধৌত করে ঝরনা বয়ে আসছে নীচের দিকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে। নীচে খানিকটা কুণ্ডের মত করে দেওয়া হয়েছে, আর উপর থেকে ঝরনার ধারা বয়ে পড়ছে। সেই ধারায় স্নান করে সকলে শান্তি লাভ কচ্ছে। ঝরনার জল অতি সুস্বাদু। যাই খাওয়া যায় এই জলে অতি সহজে হয়ে যায় সব এবং জঠরাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে পুনরাহুতির জন্য। কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির পের হয়ে খানিকটা দক্ষিণে এগুলেই ব্রহ্মচারীর আশ্রম—প্রবাদ এই আশ্রমে বসে শ্রীধর স্বামী অতীতে টীকা লিখেছেন। এই আশ্রমের খানিকটা নীচেই আর একটা ধর্ম্মশালার মত বাড়ী রয়েছে। সেখানে পাঁচটি পরিবারের থাকবার মত পাঁচটি কুঠরী রয়েছে। আমাদের আস্তানার ঠিক পশ্চিম দিকে রয়েছে ঢেঙ্কানলের রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে একটি বড় হল আর দুপাশে দুটো করে ঘর রয়েছে। সেখানেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ সব ঘর-বাড়ী রাজষ্টেট থেকে তৈরী। মন্দির থেকে আধ মাইলের ভেতরেই গহন বন রয়েছে। বাঘ, ভাল্লুক সবই আছে ঐ বনে। তবে আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসেনি একদিনও।

আমাদের চার দিকে থরে থরে বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান। তাদের দূর থেকে দেখে মনে হয় কেহ ধ্যানে মগ্ন—কেহ বা আকুল প্রাণে আহ্বান কচ্ছে ভগবানকে। প্রাসাদের পূর্ব্ব দিকে উঁচুতে পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হয় যেন স্বয়ং মহাদেব জটাজূট ধারণ করে ধ্যানে নিমগ্ন। উঁচু পাহাড়ের গা থেকে দুটো শাখা চলে গিয়েছে নীচের দিকে। সেই শাখা দুটো মহাদেব যেন ভক্ত আকর্ষণের জন্য প্রসারিত করে দিয়েছেন বাহুর মত। দক্ষিণ দিকের শাখাতে রয়েছে গভীর জঙ্গল। শাখা দুটোর মাঝে রয়েছে খানিকটা উপত্যকা। এই উপত্যকাতেই মন্দির এবং লোকের বসতি রয়েছে। উপরে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় যেন বিরাট গম্বুজ গড়ে উঠেছে। সামনে প্রাসাদ থেকে নীচের দিকে কচ্ছপাকৃতি পাহাড়ের ঢেউ খেলে চলেছে। একটা স্তরে এখানে রয়েছে আমগাছ, কাঁঠাল

গাছ। কোন কোন কাঁঠাল গাছ দুশো বছর ধরে পাহাড়ের বুকে দাঁড়িয়ে আছে অতীতের সাক্ষ্য দিতে। তাছাড়া নারিকেল সুপারিগাছ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা কচ্ছে। এসব দেখে শুনে বেশ বোঝা যায় বহু দিন ধরে লোকের বসতি আছে এই কপিলাশে। কপিলাশে কাক, কুকুর, বেড়াল, মশামাছির উপদ্রব নেই,খালি একটা শান্তির আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সেই আবহাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে মনের আবিলতা, রোগশোকের কাতরতা।

সকালে মেঘরাশি আমাদের গা ঘেঁষে চলে যায়। মেঘগুলো ধুঁয়োর মত ভেসে ভেসে চলে। প্রভাতে পাখী সব আপন মনে সুরু করে দেয় চন্দ্রশেখরের বন্দনা, তাতে মনে আসে অপূর্ব্ব আনন্দ। এদিকে একটু বেলা হলেই হনুমান এবং বানরের দল ঝুপ্ ঝুপ্ করে এক গাছ থেকে অপর গাছে লাফিয়ে পড়ে, আহারের সন্ধানে ছুটাছুটি করতে থাকে। জ্যোৎস্না রাতে পবিত্র ভাবের উদ্দীপনা এনে দেয়। এখানে দিনের বেলায় একটু গরম হলেও ছট্‌ফট্ করতে হয় না—পিপাসায় প্রাণের উদ্বেগ বাড়ে না। শীতল স্নিগ্ধ হাওয়ায় দেহ মনের শান্তি থাকে বজায়। মন্দিরে সকালে বল্লভ হয় সর্ব্বপ্রথমে। তারপর সকলে একে একে দর্শনে যায়, দুপুরে ভোগারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে থাকে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যায় আরতি অল্প সময়েই শেষ হয়ে যায়। সেই বাজ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে প্রাণে আনন্দের দোলা খেল্‌তে থাকে।

সকালে আমরা ভরপেট খাই, আর এদিক্ সেদিক্ যাই। বিকালে বেড়াতে যাই রোজই। প্রায়ই যেতে হয় মোটরের রাস্তায়। সেটাই বেড়াবার একমাত্র প্রশস্ত যায়গা। একদিন বিকালের দিকে আমাদের আস্তানা থেকে ১½ মাইল দূরে দেবসভায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে দেবতারা সব সভা করে বসে আছেন কোন গূঢ় মন্ত্রণার জন্য। দেবসভায় যাবার সময় রাস্তায় পড়ে আলেখ সম্প্রদায়ী বাবা গঙ্গাধর দাসের আশ্রম। তিনি তাঁর কয়েক জন শিষ্য নিয়ে ওখানে রয়েছেন। তাঁরই আশ্রমের অদূরে একটু উপরে রয়েছে হরিহর বাবার আশ্রম। বর্ত্তমানে এক হিন্দুস্থানী বাবাজী বাস কচ্ছেন ২০ বৎসরের উপর এই আশ্রমে। ভক্তমণ্ডলীর সমাগম হয় এখানে প্রায়ই। বাবাজী টুংটুং করে তারের যন্ত্র বাজিয়ে বেশ ভজন করেন। এক দিন মোটরের রাস্তায় খানিকটা গিয়েই ডান দিকে উপরে উঠে পড়লুম, সেখানে সমতল ভূমির উপর একটি আশ্রম ছিল। সেই জায়গা থেকে চার দিকের দৃশ্য দেখা যায় খুব সুন্দর। এখানে হাওয়া বইছে প্রবল বেগে হুহু করে। সোজা পুরীর সমুদ্র থেকে এই হাওয়া আস্‌ছে।

এই পাহাড়ে কোন জিনিষ পাওয়া যায় না এবং যোগাড় করাও দুষ্কর। বন-বিভাগে আধিপত্য রয়েছে বলেই আমাদের আশ্রয়দাতা ডিভিসনেল ফরেষ্ট অফিসারের সুন্দর ব্যবস্থায় নীচ থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ আস্‌ত।

হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যের আভাস উড়িষ্যা প্রদেশের এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে এলেই কতকটা পাওয়া যায়। তবে বর্ত্তমানে এখানে নবাগতের থাকবার কোন সুবিধে নেই, খালি ষ্টেট্-সম্পর্কিত লোকদেরই স্থান আছে। তাই যাত্রীদের বড় কষ্ট। বহু দূর থেকে যাত্রী আসে এই সময়ে দলে দলে। তাদের রাত কাটাতে হয় বাইরে বারান্দায়। শুনছি উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাসের পরিকল্পনায় রয়েছে এই পাহাড়টি।

স্বামী শিবানন্দ-স্মৃতি-কথা

শ্রীঅমূল্যভূষণ মুখোপাধ্যায়

৯-৫-২৫, শনিবার, স্থান বেলুড় মঠ। বৈকাল ৪-৩০টার সময়ে পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম ক'রে বসলুম। এমনি সময়ে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হ'তে একজন সন্ন্যাসী এসে ওখানকার মোকদ্দমা-সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ নিবেদন করলেন এবং সব চিঠি দেখালেন। প্রায় এক ঘণ্টা এই সব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ল। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, "তোমার ভয় নেই, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর কর, সত্য প্রকাশ হবেই। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, শ্রীশ্রীমাও আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। রাখাল মহারাজও গোলমাল মেটাবার জন্য বড় উৎসুক ছিলেন কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনলে না। এ স্থানটি শ্রীশ্রীঠাকুরের। কালে এটি মহাতীর্থ হ'য়ে দাঁড়াবে। তুমি কি মনে করছ এটি সৌখীন লোকের বাগানবাড়ী হবে? এ স্থান কলকাতার পার্শ্বে, কত লোক এখানে যেয়ে শান্তি পাবে। এটি অমন ভাবে থাকবে না। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ইচ্ছা ছিল তিনিই জানেন। দেখ না, এখন আবার সব ঠিক হ'চ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে!"

এবার জি-বাবু এসে প্রণাম ক'রে কথা-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ সমস্ত শুনে বললেন—"দেখো জি, এর দ্বারা এখন কেবল ভিত্তি তৈরী হ'চ্ছে, পরে কিন্তু স্বামীজির আদর্শ দেশকে নিতেই হবে। দেখছ না এখন সকলেই তাঁর আদর্শ নিতে চায়। তা ভিন্ন উপায় কি? মহাত্মা যা বল্‌ছেন অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে, তা স্বামীজি বহুদিন পূর্ব্বেই বলেছেন।"

অধ্যাপক ভ-বাবু বললেন, "আশু বাবু মারা গেলেন, তা না হলে আমাদের কলেজের আরও শীঘ্রই উন্নতি হ'ত। আশু বাবুর মত এমন ব্যক্তিত্ব বড় দেখা যায় না। আমাদের দেশের সব বড়লোক মারা গেলেন, সি আর দাশ মারা গেলেন। যেরূপ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এই দেশ ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।" এই সব কথা শুনে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী খুব জোরের সহিত বললেন,—"তা নয় ভ—! আবার এমন সব লোক জন্মাবে। মার ইচ্ছা নয় যে এই দেশ এই ভাবে উৎসন্ন যায়। তিনি কাউকে কাউকে রাজনীতিতে বড় করে তোলেন, কাউকে বা বিজ্ঞানে। কিন্তু শক্তি তো মার নিকট হতেই সব আসছে। তবে এত দিন একটা শক্তিতে কাজ হচ্ছিল এক জনের ভেতর দিয়ে. এখন তা না হয়ে সকলের ভেতর দিয়ে সেই ভাবে কাজ হবে। এখন সকল দেশেই সাড়া পড়ে গেছে, এখন ভারতের মঙ্গল হবেই। চৈতন্য-শক্তির বিকাশ হ'চ্ছে, তবে ধীরে ধীরে।"

দ-বাবু প্রশ্ন করলেন, "মহারাজ, সংসারে থেকে যদি কেউ সৎ ভাবে ভগবান লাভ করতে চায় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন বাধা দেয়, সে কি তখন তাদের ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে সাধন-ভজন করবে?" মহারাজ—"কখনও না. বরং যারা বাধা দেয় তাদের নিয়ে ধর্ম্ম করবে। যাতে তাদেরও ভগবানে মতিগতি হয় তার চেষ্টা করবে, কারণ তুমি যদি বাইরে গিয়ে ধর্ম্ম লাভ কর তবে তা

তোমার নিজেরই হলো, অন্যের তাতে কি লাভ? সেই জন্যই বলছি, সকলে মিলে একটা সময় নির্দ্দেশ ক'রে সকালে হোক, বৈকালে হোক, ভগবানের নাম করবে। সংসার অনিত্য। রোজই এই সংসারের অনিত্যতা স্মরণ ক'রে ভগবানে মন-প্রাণ দেবার চেষ্টা করবে। মনে মনে ভাববে—এই তো বেশ চলছে কিন্তু এমন তো চির দিন চলবে না; তবেই মনে বিবেক, বৈরাগ্য আসবে, ভগবান্‌কে মনে পড়বে। কোথাও দেখতে পাইনে যে একটি পরিবার একটা সময় নির্দ্দেশ করে ভগবানের নাম করে। কেবল বাজে বকছে।"

দ-বাবু—মহারাজ, তাঁকে ডাকতে হ'লে সময়ের দরকার, নানা বিঘ্নও আছে; এমন অবস্থায় তাঁকে কি করে ডাকবো?

মহারাজ—তুমি কি বল্‌ছ? সময় নেই, বাধা-বিঘ্ন! যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তবে নিশ্চয়ই হ'বে। তোমাদের খাওয়া-শোয়া প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, আর কিনা ভগবান্‌কে ডাকতে পাঁচ মিনিট সময় পাচ্ছ না। এ কি কথা বলছ! বিঘ্ন যা বল্‌ছ তা তো আছেই এবং থাকবেও। তা কখনও যায় না। এই সব বাধা-বিঘ্নের মধ্যেই সংগ্রাম করতে হ'বে। তাতেই জীবন তৈরী হ'য়ে যাবে। যেখানে বাধা নেই সেখানে জীবন নেই।

দ-বাবু—মহারাজ, বাড়ীতে এমন অবস্থা যে একজন যদি জপ-ধ্যান করে, তবে সে যাতে তা না করতে পারে, সেভাবে অন্যান্য লোক তাকে কষ্ট দেয়। এমন অবস্থায় অন্যত্র যাওয়া সঙ্গত কি?

মহারাজ—হাঁ। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে সাধন-ভজন করবে। তখন বাড়ীতে কোন খবর দেবে না।

দ-বাবু—হাঁ, তা বটে, কিন্তু তারা খবর পেলে আবার যন্ত্রণা দেয়। এমন অবস্থায় কি ক'রে ভগবানের দিকে এগুনো যায়?

মহারাজ—আপনার মাথার মধ্যে এই সব ভাব রয়েছে। যদি বাস্তবিকই আপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে ভগবান্ নিশ্চয়ই পথ করে দেবেন। 'God helps those who help themselves'. আমরা এটা বেশ জানি। আমাদের কথায় বিশ্বাস করুন।

দ-বাবু—এই মঠে আমাদের থাকবার উপায় হয় কি?

মহারাজ—না, কারণ স্থানের বড় অভাব।

দ-বাবু—যদি একটা কলেজ হয়, তবে বেশ হয়।

মহারাজ—তা হ'বে যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হয়। আমাদের কাজ মন্থর অথচ নিশ্চিত। দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের কোন লোক পর্য্যন্ত যেখানে যায় নি সেখানেও প্রচার-কেন্দ্র হয়ে গেছে।

দ-বাবু—(নিজের একটি ছোট ছেলেকে দেখিয়ে) একে আশীর্ব্বাদ করুন, মহারাজ।

মহারাজ—তা হবে, এখন এরা শিশু। এরা ধর্ম্মের কি বুঝে? এখন এরা বাবা-মাকে জানে। তাঁরাই এদের গুরু। ছেলেদের বাবা মা-রা যদি ভাল হন তবে ছেলেরাও ক্রমে ভাল হবে। বাবা-মাকে যদি ছোটবেলা থেকেই সাধন-ভজন করতে দেখে তবে ছেলেরাও তাই শেখে।

কথাপ্রসঙ্গে মাছ খাওয়া নিয়ে কথা উঠল।

মহারাজ—এ দেশের লোক যে মাছ খায় তা তারা একবার মনেও করে না যে, এর দরুন একটা জীবের প্রাণনাশ হয়। পশ্চিম দেশে এটা হবার জো নেই। মাছ খেলে আর রক্ষা নেই। অবশ্য যদি কারও ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাঁর পক্ষে সবই সমান, কারণ তখন তিনি শাকশবজির মধ্যেও প্রাণ দেখতে পান।

উদ্বোধন কার্য্যালয় হ'তে জনৈক ব্রহ্মচারী এসে

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম করে তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

মহারাজ—আমার শরীর ভাল নেই।

ব্রহ্মচারী—মহারাজ, চলুন, 'উদ্বোধনে' কয়েক দিন থেকে শরীরটা সেরে আসুন।

মহারাজ—তুমি বল্‌ছ সত্য, আমার কিন্তু কলকাতায় থাকতে ইচ্ছে হয় না। আমি ওখানে গেলেই অন্য রকম হয়ে যাই। ঐ সব elements আমার ভালই লাগে না। এই মঠে আছি, বেশ আছি। দেখ, যে দিকে তাকানো যায় বেশ! পূর্ব্বে গঙ্গা, উত্তরে আকাশ, পশ্চিমে শ্রীশ্রীঠাকুর ঘর, দক্ষিণে ফুলের বাগান। কেমন সুন্দর একটা ভাব! তুমি বল্‌ছ সত্য, কিন্তু যেতে আমার মনে ইচ্ছেই আসছে না। মন থেকে না এলে আমরা কখনও কিছু করি না। পূর্ব্ব থেকে পরিকল্পনা করে আমাদের কোন কাজ হয় না। ভেতর থেকে হুকুম না এলে কিছুই করি না। দেখ না কাশীতে যাবার জন্য চিঠি ও টাকা এসে হাজির, আমার কিন্তু যাবার জন্য উৎসাহই হয়নি।

এইবার শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী জলযোগ করলেন ও অবশিষ্ট প্রসাদ আমাকে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর কথা উঠল।

মহারাজ—তাঁর ফটো দেখলেই আমাদের সকল কথা মনে পড়ে, কি ভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কত ভালবাসতেন, যত্ন করতেন—তা ভাবলে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি! অবশ্য ফটো না দেখলেও সর্ব্বদা তাঁর কথা আমাদের মনে ওঠে। কি ভাবেই না তিনি আমাদের জীবন গঠন ক'রে দিয়েছেন! মাদ্রাজ মঠের এলাকায় কোন পল্লীগ্রাম থেকে একখানা চিঠি এসেছে। মহারাজ আমাকে চিঠিখানা পড়তে বল্লেন। আমি পড়লে মহারাজ বল্লেন, "দেখ, কত Girls' School, High School শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে হয়েছে।"

আমি—হাঁ মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব এখন সর্ব্বত্র। শিক্ষা ভিন্ন এ যুগে কল্যাণ নেই।

মহারাজ—হাঁ, শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর আদর্শে এই সব শিক্ষা হলে ধর্ম্ম ও অর্থ দুই হবে। এ ভিন্ন উপায়ও নেই।

জনৈক ভদ্রলোক—মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর গান গাইতে পারতেন?

মহারাজ—হাঁ, তিনি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। গানে তাঁর একটা মস্ত আকর্ষণ ছিল। খুব মিষ্টি গলা ছিল। তিনি নিজেই বলতেন—আমি ত ওস্তাদ।

ক-মঃ—স্বামীজি কিরূপ গাইতে পারতেন?

মহারাজ—তিনি ত গানে সিদ্ধই ছিলেন। তিনি খুব যত্ন করে ছেলেবেলা হতেই গান শিখেছিলেন। তিনি উত্তম গান করতেন।

ল-মঃ (কঃ মঃকে লক্ষ্য করে)—মহাপুরুষজীও কিন্তু ভাল গান গাইতে বাজাতে পারেন।

ক মঃ—সত্য নাকি? (মহারাজকে লক্ষ্য করে) দয়া করে মহারাজ আমাদের গান শুনান।

মহারাজ—এখন আমার সর্দ্দি রয়েছে, কি করে গাইব? স্বামিজী নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি ত সকল বিষয়ে সিদ্ধ হয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত লোকের কি কথা!

কঃ-মহারাজ—স্বামিজীর মধ্যে একাধারে এত গুণ।

মহারাজ—হাঁ, তাঁর আর কথা কি? বিশেষ শক্তি নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ম-বাবু—স্বামীজির কথা কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর খুব শুন্‌তেন।

মহারাজ—হাঁ।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী চাতকের গল্পটি বললেন।

ন্যাংটা তোতাপুরী যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন সে কথাও বল্লেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম কচ্ছিলেন, তা দেখে তোতাপুরী ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন —"ক্যা রুটী ঠোক্‌তা হ্যায়"। অনন্তর কি ভাবে তোতা গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলেন এবং মা কালীকে মেনেছিলেন-সেই সব প্রসঙ্গ বর্ণনা করলেন।

এবার অ-বাবু গান আরম্ভ করলেন—গৌরাঙ্গ বিষয়ে হিন্দিতে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী শুনে বেশ আনন্দিত হলেন এবং ল-মঃকে লক্ষ্য করে বললেন,—"দেখ ল—,শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমাদের এখন যে কোন গানেই আনন্দ হয়। কারণ আমাদের ত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নেই; তাই আমরা সকল রকম গান শুনেই আনন্দ পাই। অন্য অন্য সম্প্রদায় কালী বিষয়ে গান হলে হয়ত উঠেই যাবে, আমাদের তা হবার জো নেই।" এবার গায়ক অ-বাবু বিদায় নেবার জন্য উঠলেন। মহারাজ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

অ-বাবু অবিবাহিত শুনে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজী বললেন, "তুমি যে ভাবে জীবন যাপন কচ্ছ—এ বড় উত্তম পথ। বিয়ে করলে লোক আর সেরূপ থাকে না। সব মান যশ ভালবাসা মেয়ে লোকের দিকে চলে যায়। ঐ মন দিয়ে আর ভগবানের সেবা হয় না। তুমি সদ্‌ভাবে জীবন যাপন কর, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করবেন। দেখ, এই সংসারে মান যশ বেশী দিন থাকে না। ভগবানই সত্য, তাঁর দিকে মন গেলেই ধন্য। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

এবার সকলে আস্তে আস্তে প্রণাম করে বিমল আনন্দে বাড়ী ফিরলেন। মহারাজও আহারের জন্য উঠলেন।

ধর্ম ও রণোন্মত্ত পৃথিবী

শ্রীচুনিলাল মিত্র, এম্-এ, বি-টি

'ধর্ম' বিষয়টি এতই ব্যাপক যে ইহার আলোচনা সীমাবদ্ধ করা আদৌ সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া সমগ্র মানবসমাজ যখন দ্বেষ হিংসায় মত্ত, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থান্ধতায় যখন সমাজ-দেহ বিদীর্ণ, অজ্ঞান ও অবিশ্বাসে যখন আকাশ-বাতাস বিষাক্ত, এক কথায়—হিংসায় যখন সমগ্র বিশ্ব জর্জরিত এবং রণোন্মত্ত, তখন ধর্ম-আলোচনা নির্বুদ্ধিতা না হইলেও কতকটা দুঃসাহসিকতা নিশ্চয়ই। চোখের উপর আমরা যখন দেখি যে জাতীয়তা কৃষ্টি ও ধর্মের নামে, দেশরক্ষা ও দেশপ্রেমের নামে নারীধর্ষণ, গৃহদাহ, নরহত্যা ও রক্তপাত চলিতেছে, তখন ধর্মকথা শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও বলিবার সাহস হয় না, প্রবৃত্তিও আসে না। তবে যে দেশে নির্ভীক রামমোহন, তেজস্বী ঋষি দয়ানন্দ, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়ী বীর আচার্য বিবেকানন্দ এবং অহিংসার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, সে দেশে ও সে জাতির মধ্যে ধর্ম শাশ্বত ভাবে প্রকট থাকিবেই।

বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনা ধর্মের

একটি অঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিব। ধর্ম যে বিশ্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনও বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নয় এবং পক্ষান্তরে ধর্মই যে শান্তির বাহক ইহাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রারম্ভেই ধর্মের বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রধান অভিযোগ খণ্ডন করা নিতান্ত প্রয়োজন। ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহা ধারণ করে, যাহা রক্ষা করে। ইহা ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজ-গত, রাষ্ট্রগত সকল জীবনকেই রক্ষা করে। যে বস্তু যাহাকে রক্ষা করে উহা তাহার অনু-কূলেই হয়; সুতরাং সকল জীবনেই ধর্ম কল্যাণ-কর ও মঙ্গলদায়ক। কোনও প্রকার বিনাশ, বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খলা উহা আনিতে পারে না। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানা আমাদের একান্ত দরকার। মনে রাখিতে হইবে, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণাদি ধর্মের বহিরঙ্গ। ধর্ম-জীবনলাভের পক্ষে উহারা সোপানস্বরূপ, সহায়ক। ছাদে উঠিতে সিঁড়িগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্যও বটে; তবুও ছাদ ও সিঁড়ি এক নয়।

ধর্ম অনুভূতির বস্তু। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—অনুভূতিই ধর্ম, বাকী যা কিছু সবই উহার প্রস্তুতি-মাত্র। ইহা বিশেষ কোনও বয়সে বা স্থানে অধীত ও আচরিত হওয়া বাঞ্ছিত নয়। পক্ষান্তরে আজীবন ইহার আচরণ করিতে হয়। আবার ধর্ম-জীবনের অন্যতম লক্ষণ —জীবনের ব্যাপকতা। কারণ যে জীবন যত ব্যাপক, যত বিরাট সে জীবন তত সত্য। আর সত্য ধর্মের নামান্তর মাত্র। প্রসারণই অধ্যাত্মজীবনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—প্রসারই জীবন, সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে ধর্মব্যর্থতা আসিয়াছে উহা ধর্মের বিকৃতাবস্থা মাত্র। ধর্মের বিরুদ্ধে লোকের আক্রোশ ও আক্রমণ বিভিন্ন প্রকারের। কেহ কেহ বলেন, ধর্ম একজাতীয় মাদকদ্রব্য যাহা সেবনে মাদকতা আনে। প্রতিবাদে আমাদের জবাব এই যে, ধর্ম যদি মাদকতাই আনে তবে উহা আমরা আপামর সাধারণের ভিতর বিতরণ করিবার পক্ষপাতী। কারণ যত অধিকসংখ্যক ব্যক্তি পরমহংস রামকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্মোন্মত্ত হইবে ততই পৃথিবী হিংসা, দ্বেষ ও ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবে। অনেকে আবার বলেন, ধর্ম ভীতি হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ প্রকারের উক্তি ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানাভাবের পরিচয় দেয়। ভীতি ধর্মজীবনের প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মূলমন্ত্র অভয় ও অহিংসা—চিন্তা, বাক্য, ও কর্মে নির্ভীক ও অহিংস থাকাই ধর্মজীবনের তাৎপর্য।

ধর্মের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অভিযোগ এই যে ধর্মই পৃথিবীতে একাধিক যুদ্ধের কারণ হইয়াছে। এবম্বিধ মন্তব্য নিতান্তই অলীক। ইহা বাস্তবতার সহিত সম্বন্ধশূন্য। কয়েকটি মাত্র ঐতিহাসিক যুদ্ধের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে ধর্ম কোন রক্তাক্ত যুদ্ধের কারণ হয় নাই। পরন্তু ইহার প্রভাবই বিশ্বকে একাধিক বার অবশ্যম্ভাবী বৃহত্তর ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কোনও প্রকারের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সহিত ধর্মের যে আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই ইহা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে, রোগ, শোক বা মহামারী অধিকাংশ স্থলেই মানুষের স্বীয় কর্মফলজনিত। দুর্ভিক্ষাদি দুর্যোগ মানুষের দূরদৃষ্টির অভাব, দুর্বুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধি-হেতু সংঘটিত হয় বলা যাইতে পারে। অপরাপর একাধিক সামাজিক বিপর্যয় মানুষের কপটতা ও স্বার্থান্ধতা হইতে উদ্ভূত।

কৌরবদের ঈর্ষ্যাপরায়ণতা ও সংকীর্ণতাই ভারতীয় মহাসমর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কারণ ছিল

এবং তাহাদের বিনাশেই উহার অবসান ও মীমাংসা হয়। পিতৃপুরুষের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার দৃঢ় পণের জন্যই এবং পুরুষানুক্রমে একে অপরের প্রতি বৈরিভাব-পোষণ-হেতু প্রাচীন পিউনিক যুদ্ধ রোম ও কার্থেজের মধ্যে শতাধিক বর্ষব্যাপী চলিয়াছিল। বৈদেশিক শাসনের কঠোর কবল হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্যই আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং পরবর্তী কালে দাসত্ব-মোচনের তীব্র উদ্দীপনায়ই সে দেশে গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, কুশাসন, অনশন, উৎপীড়ন ও অত্যধিক করধার্য হেতু প্রজাসাধারণের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উন্মেষই ১৭৮৯ সালের ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের মূল কারণ ছিল। যদিও সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া ইউরোপ খণ্ডে জার্ম্মাণীর স্বীয় প্রভাব বিস্তারের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রথম বিশ্ব মহাসমরের অন্যতম কারণ ছিল, তথাপি সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডই উহার মুখ্য ও নিকটতম কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সাম্রাজ্যলোলুপতাই দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। আর তৎকালীন আমাদের শাসক-শ্রেণী ইংরেজ জাতিও তাহাদের কায়েমী সাম্রাজ্য-বাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরে যোগদান করেন। হিটলার, মুসোলিনী ও হিরোহিটো যদি রাজ্যবিস্তারের জন্য অপরাধী হইয়া থাকেন, তবে ষ্টালিন, চার্চিল, রুজভেল্টও মহাযুদ্ধে নৃশংস নরহত্যার জন্য অনুরূপ অপরাধী। একমাত্র হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে নৃশংসতার তাণ্ডবলীলা প্রকটিত হইয়াছে, উহা যে কোনও পাশবিক বর্বরতাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে।

তাই দেখিতে পাইতেছি যে, এই সব যুদ্ধের মূলে ধর্মের কোনও হাত ছিল না। সামাজিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংঘাত, সাম্রাজ্য-বিস্তারের লালসা ও আধিপত্য-স্থাপনের দুরাকাঙ্ক্ষা সকল যুদ্ধের মূল। যদি আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবী পুনরায় এক সর্ববিধ্বংসী বিশ্ব-গ্রাসী তৃতীয় মহাসমরে নিমজ্জিত হয়, উহার জন্যও পূর্ণভাবে দায়ী হইবে স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিক ধুরন্ধরদের শঠতা ও ষড়যন্ত্র।

বলা বাহুল্য, শান্তি ও সত্য, স্বাধীনতা ও গণ-তন্ত্রের বাণী প্রচার এবং তৎসঙ্গে বাধ্যতা-মূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন ও গোপন সমরায়োজন নিছক কপটতা ও ষড়যন্ত্রেরই পরিচায়ক। সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করার ইচ্ছা, নির্বিবাদে শোষণনীতি পরিচালনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও শান্তির বাণী প্রচার চরম কপটতার চূড়ান্ত পরিণতি। ইহা হীন পাপাচার মাত্র। সুতরাং অদূরবর্তী, অবশ্যম্ভাবী মহাসমর কয়েক জন মাত্র শোষক, লোভী, সাম্রাজ্য-লিপ্সু রাজনীতিকই রচনা করিবেন। বস্তুতঃ ধর্মের উহাতে কোন সংস্পর্শ থাকিবে না। মহামতি বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন, "নিরস্ত্রীকরণেই যুদ্ধের অবসান হয় না। কারণ নিরস্ত্র মানুষও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে, নৃশংস হত্যাও করিতে পারে। প্রকৃত যুদ্ধকর্তা অস্ত্র নয়, মানুষ নিজেই।" আমরা আরও বলিব যে, যুগে যুগে মানুষের কলুষিত মন, পঙ্কিল হৃদয় ও অপরিমিত লোভ সকল যুদ্ধকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সংগ্রাম প্রধানতঃ ভাবের সংঘর্ষেই ঘটে। এবম্বিধ বিরুদ্ধভাব আত্মপ্রকাশ করে তখনই; যখন বিভিন্ন স্বাধীন জাতি স্বার্থপূর্ণ জাতীয়তাকেই চরম সত্য ও পরম কাম্য মনে করিয়া মানবতাকে পদদলিত করেন। যখন কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ মুষ্টিমেয় লোভীর ক্রীড়ার বস্তু হইয়া পড়ে, স্বজাতির স্বার্থ-সংরক্ষণের সংকীর্ণ মনোবৃত্তি যখন মানবতাকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তখনই বিশ্বগ্রাসী

মহাসমরের দাবানল অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই গভীর দুঃখে মহামান্য ওয়েলস্ প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ বর্ণনায় বলিয়াছেন,—কি কারণে উহা সংঘটিত হইয়াছে ইহা আসল প্রশ্ন নয়; প্রকৃত ঐতিহাসিকের পক্ষে বৃহত্তর প্রশ্ন ইহাই হওয়া উচিত কেন ও কি ভাবে বিগত বিংশতি বর্ষ ইউরোপে শান্তি ও তথাকথিত সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্রের নেতারা প্রকৃত স্থায়ী শান্তির চেষ্টা করেন নাই বলিয়া মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, ধর্মের ভিত্তিতেই সে প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে। গভীর দুঃখের বিষয়, একমাত্র ভারতের ধর্মাচার্যগণ, চিন্তানায়কগণ এবং গান্ধীজী ব্যতীত সে চেষ্টাও বিশ্বের অপর কেহই ব্যাপকভাবে করেন নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য: ধর্ম পৃথিবীতে কি স্থায়ী সুফল আনিয়াছে? প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব—যেখানে বিরাট ক্ষেত্রে অগণিত দুর্বৃত্ত, হিংসা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নরহত্যায় প্রবৃত্ত, সেখানে মুষ্টিমেয় লোকের শান্তিচেষ্টা কতটুকু ফলপ্রসূ হইতে পারে? তবুও নিঃসঙ্কোচে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, ধর্ম বিশ্বে যতদূর না স্থায়ী মঙ্গল আনিয়াছে, তাহা অপেক্ষা শতগুণে বৃহত্তর অমঙ্গল নিবারণ করিয়াছে। শুধু এদিক দিয়াও ধর্মের দান অতুলনীয় ও অমূল্য। ধর্মের মূল তথ্য ও তত্ত্ব যত প্রচারিত হইবে, যত বেশী সংখ্যক মনুষ্য যথার্থ ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে, ততই উহা দেশের শান্তি তথা বিশ্বের কল্যাণ আনয়ন করিবে।

সমালোচনা

রামানুজ চরিত—স্বামী প্রেমেশানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দে, বি-এ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, টাঙ্গাইল। প্রাপ্তিস্থান—(১) উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা; (২) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া, এবং (৩) নিউ বুক ষ্টল, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শঙ্কর চরিত, দশাবতার চরিত প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সুলেখক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য (স্বামী প্রেমেশানন্দ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক দাক্ষিণাত্যের স্মরণীয় মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামানুজের সংক্ষিপ্ত চরিত রচনা করিয়া পাঠকবর্গের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। যে সকল মহাপুরুষ যুগসন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যুগোপযোগী রূপ প্রদান পূর্ব্বক ভ্রান্ত জীবকুলকে সুপথে পরিচালিত করিয়াছেন তাঁহাদের অপূর্ব্ব জীবনী ও অমর বাণীর সহিত আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু উপযুক্ত পুস্তকের অভাবে ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় উহা পূরণ হয় না। এই অভাব দূরীকরণার্থ গ্রন্থকারের মহতী প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী প্রণীত সুবিখ্যাত বৃহদাকার "রামানুজ চরিত" পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইলেও সর্ব্বসাধারণের,

জন্ম এইরূপ একখানি ক্ষুদ্রকায় পুস্তকের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল সে সম্বন্ধে সকলেই একমত। সাবলীল ভাষায় লিখিত বইখানি অতীব সুখপাঠ্য হইয়াছে। আচার্য্যদেবের দুইখানি চিত্র পুস্তকখানির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। শ্রীরামানুজ-প্রচারিত ধর্ম্মের এবং উহার সাধন-প্রণালীর আর একটু বিশদ আলোচনা থাকিলেই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের বাজারে পুস্তকখানির মূল্য খুব কম ধার্য্য হওয়ায় ইহা সহজলভ্য হইয়াছে। এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রের জন্য ব্যয়িত হইবে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

তিন বৌদ্ধস্থান—শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মহাবোধি সোসাইটী, ৪এ, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এবং ধর্মপাল রোড্, সারনাথ। পৃষ্ঠা-১৬৭; মূল্য দেড় টাকা।

এই গ্রন্থে তক্ষশীলা, রাজগৃহ ও অজন্তার বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও অপূর্ব শিল্পগৌরবের মহত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বৌদ্ধযুগ ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ; এই যুগে ভারতবাসীর অধ্যাত্ম-সম্পদের সহিত শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল। এই তিন বৌদ্ধস্থানের অনুপম চিত্রস্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলা স্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে যে ভারত-সভ্যতায় কলাবিদ্যার চর্চা বিশেষ সজীব ছিল এবং জাতীয় চিত্ত ধর্ম-দর্শন-নীতির ক্ষেত্র ছাড়াও সুকুমার শিল্পে সক্রিয় থাকিত। বর্তমান যুগেও আবার স্বাধীন ভারতবাসী তাহাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া নূতন নূতন পরিকল্পনায় ভাস্কর্য ও চিত্রস্থাপত্য সৃষ্টি করিয়া দেশ-মাতৃকার অঙ্গ শ্রীমণ্ডিত করুক। গ্রন্থকারের ভাষা, প্রকাশ-ভঙ্গী ও বর্ণনারীতি প্রশংসনীয়; তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞান ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ গভীর। প্রাচীন বৌদ্ধশিল্প ও চিত্রাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি যে আনন্দরস উপভোগ করিয়াছেন, উহাই পাঠক-পাঠিকাদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, মুদ্রণ ও কাগজ উত্তম। সাতখানি চিত্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীসারদালীলা-সংকীর্ত্তনম্—শ্রীপ্রসন্ন কুমার বলবন্তরাও জুন্নরকর, এম্-এ, এল্‌এল্-বি প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ; পোদ্দারপাড়া রোড্, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ৩০; প্রচারার্থ মূল্য দুই আনা মাত্র।

এই পুস্তিকার রচয়িতা অধ্যাপক জুন্নরকর একজন গভীরচিন্তাশীল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত। পুস্তিকায় শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী পরমারাধ্যা শ্রীসারদাদেবীর দিব্য লীলা-মাহাত্ম্য সহজ সংস্কৃত ভাষায় ও মধুর ছন্দে সংকীর্তিত হইয়াছে। সমগ্র লীলা-কাহিনী বাল্য, কৌমার, দাম্পত্য, গার্হস্থ্য, তীর্থভ্রমণ, গুরু এবং মাতা—এই সাতটি পর্যায়ে সজ্জিত করা হইয়াছে। প্রারম্ভে বন্দনা ও প্রার্থনা এবং উপসংহারে প্রার্থনা ও প্রণাম আছে। সুরসংযোগে কীর্তন করিবার সৌকর্যার্থ পুস্তিকার শেষে একটি সুর ও স্বরলিপি সং-যোজিত হইয়াছে। ভক্ত-মাত্রই প্রচলিত শ্রীরামনামসংকীর্তনের অনুকৃতিতে "শ্রীশ্রীসারদা-লীলা" কীর্তন করিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইবেন —ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পুস্তিকার আদ্যোপান্ত ভক্তহৃদয়ের গভীর তন্ময়তা, ভাষার

সরলতা এবং ছন্দের, মাধুর্যের সুন্দর সমাবেশ পাঠক-পাঠিকা, গায়ক-গায়িকা মাত্রেরই মনোরঞ্জন করিবে। সংস্কৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদও সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। পুঁস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

Swami Akhandananda and His Memoirs of Sri Ramakrishna—By Swami Jagadiswarananda. Published by Ramakrishna-Vivekananda Centre, Dadar, Bombay. Pages 69. Price : Rupee one only.

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের চিহ্নিত পতাকাবাহিগণের অন্যতম। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত নরনারায়ণ-সেবাদর্শের বাস্তব অথচ বিশিষ্ট রূপায়ণ তাঁহার জীবনে লক্ষণীয়। আলোচ্য পুস্তিকার প্রথমাংশ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের চরিতকথা। মহাপুরুষ-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও অনুধাবনযোগ্য। শ্রদ্ধেয় লেখকের বিবৃতির স্বচ্ছতা এই লোকোত্তর জীবনের ঘটনাবলীকে প্রেরণাদায়ক করিয়া তুলিয়াছে। নারায়ণের জীবন্ত বিগ্রহ দীন-হীন সর্বহারাদের আর্তিহরণে অখণ্ডানন্দ মহারাজের আকুলিবিকুলি বড়ই মর্মস্পর্শী! স্বামী বিবেকানন্দের 'জগদ্ধিতায়' মন্ত্রটির কত নিবিড় অনুপ্রবেশ তাঁহার এই উৎসর্গীকৃত জীবনে দেখিতে পাই! পুস্তিকার শেষাংশ অখণ্ডানন্দ মহারাজের স্মৃতি-কথার অনুবাদ। শ্রদ্ধেয় লেখক 'উপকার-শ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ' এই দেবতাত্মার পূত চরিত্র অনুধ্যান করিবার সুযোগ দিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুস্তিকার মুদ্রণ প্রশংসনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও দক্ষিণেশ্বরের চিত্র পুস্তিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

সাধুসঙ্গ—৺বৈষ্ণবচূড়ামণি হরগোবিন্দ শুকুল প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গড়বেতা, মেদিনীপুর। ১০১ পৃষ্ঠা; মূল্য ৸০ আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখকের ১৫১টি ভক্তিভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের সমষ্টি। সঙ্গীতগুলি ভাবুক ভক্তগণের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য।

মুক্তির সোপান—শ্রীসৃষ্টিধর চক্রবর্তী কর্তৃক হলদিনালা, পোঃ গড়বেতা (মেদিনীপুর) হইতে প্রকাশিত। ১৫ পৃষ্ঠা; মূল্য ৴০ আনা মাত্র।

পুস্তিকাখানি প্রকাশকের স্বর্গত পিতৃদেবের উপদেশের সারসংগ্রহ। সংগ্রহকর্তার উত্তম প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম্-এ

তীর্থরেণু—(স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারা ও ক্লাশ-লেকচার)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২২৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৷৹ টাকা।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ দীর্ঘকাল আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের পর কলিকাতায় ফিরে ১৯২৪ খ্রীঃ ১১, ইডেন হস্পিটাল রোডে রাজযোগ, গীতা ও উপনিষদ্ সম্বন্ধে যে সব সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঐ সবের অনুলিপি রেখেছিলেন। ঐ গুলির কিয়দংশ আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত। বক্তৃতার বিষয়গুলির সারমর্ম সহজ-বোধ্য করবার জন্য গ্রন্থারম্ভে স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক ভাবধারার ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। রাজযোগের আলোচনায় যোগ ও তন্ত্রমতে ষট্‌চক্রের একটী চিত্রও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সত্যই গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী অভেদানন্দ জঙ্গম মহাতীর্থ।

এই মহাপুরুষের অমৃত বাণীর রেণুমাত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হওয়ায় 'তীর্থরেণু' নামের সার্থকতা হয়েছে।

পুস্তকখানি নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বিস্তৃত বিষয়সূচী থাকায় পাঠকপাঠিকার বিশেষ সুবিধা হবে। পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম আলোচিত। পাদ-টীকায় শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ ও বিজ্ঞানাদির উদ্ধৃতিগুলি মহামূল্যবান্। তুলনামূলক আলোচনায় এগুলি অত্যাবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ বলেন, "সকল রকম সাধনাতে একই অখণ্ড সত্যকে তিনি উপলব্ধি করে বুঝলেন, ধর্মের সাধনই কেবল ভিন্ন, লক্ষ্য সবার এক। সকল মতের সামঞ্জস্য বিধানের সঙ্গে সমস্ত ধর্মকে তিনি প্রচার কল্লেন সত্য বলে। আর এই সার্বভৌম উপলব্ধিময় ধর্মই হ'লো বর্তমানে বিশ্বের অখণ্ড ধর্ম যাকে আমরা বল্‌তে চাচ্ছি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্ম'।" (১৬৯ পৃষ্ঠা)

স্বামীজীর অন্যান্য বাংলা পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকের বহুল প্রচার কাম্য। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ-সন্তানগণের মুখনিঃসৃত ধর্মপ্রসঙ্গের ন্যায় স্বামী অভেদানন্দের এই দার্শনিক প্রসঙ্গসমূহও ধার্মিক ও দার্শনিক সমাজে নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে। পুস্তকের প্রচ্ছদ-পট, বাঁধাই ও ছাপা মনোরম।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

হিন্দুধর্মপরিচয়—(১ম, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—এস্ মণ্ডল, মডেল পাবলিশিং হাউস্। মূল্য যথাক্রমে ছয় আনা ও দশ আনা।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে লেখা হিন্দুধর্মের মোটামুটি পরিচয় এই বই দুটিতে পাওয়া যায়। অতি সহজ সরল ভাবা এই বই দুটির বৈশিষ্ট্য। লেখক নিপুণ-তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের সারসত্যটি সঙ্কলন করেছেন। সেই সঙ্গে জীবনের সাথে ধর্মের নিবিড় সংযোগটি দেখিয়েছেন। বই দুটি সম্পূর্ণ পড়লে শুধু যাদের জন্য লেখা হয়েছে তারাই নয়, তাদের পিতামাতা অভিভাবকেরাও হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক পরিচয় লাভ করবেন। শৈশবের শিক্ষা যদি এই সার্বজনীন ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভবিষ্যতে আমাদের খুবই আশা থাকে।

ধর্ম—ভারতের বৈশিষ্ট্য। এ ধর্ম সমগ্র জীবনের। তাই অন্তরে যেমন নির্মল ও পবিত্র হওয়া প্রয়োজন, দৈহিক শক্তিতেও তেমনি সমর্থ সুদৃঢ় বলবান হওয়া দরকার। লেখক এ দিকে একটু কম দৃষ্টিপাত করেছেন। অথচ এ দেশে শিশুস্বাস্থ্য যে ভয়াবহ রকমের নীচু স্তরের, সে কথা সুবিদিত। প্রথম ভাগে শারীরিক শুচিতা সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে শরীর-রক্ষার কয়েকটি প্রণালী নির্দেশ করলে ভালো হত।

বই দুটি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য। পাঠ্য হিসাবে এদের উপযোগিতা অসাধারণ। ছবি ও প্রচ্ছদপট নয়নলোভন—শিশুদের জ্ঞানলাভের আনন্দ বাড়িয়ে দেবে। শিশুশিক্ষার জন্য বাংলাভাষায় ধর্মসম্বন্ধে এমন বই আর চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না।

শ্রীপ্রণব ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্বামী ঘনানন্দজীর প্রচার-কার্য—১৯৩৯ সনে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ স্বামী ঘনানন্দজীকে বেদান্ত-প্রচারের জন্য মরিশাসে প্রেরণ করেন। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত তিনি তথাকার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও প্রচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাটালের ষ্টেঙ্গারস্থিত হিন্দু বেদ সভার তদানীন্তন সভাপতির আমন্ত্রণে দক্ষিণ-আফ্রিকায় বেদান্ত-প্রচারের জন্য স্বামী ঘনানন্দজী ১৯৪৭ সনের ১লা জানুয়ারী ডারবানে উপনীত হন। ষ্টেঙ্গার, ডারবান, পিটারমরিট্‌জ্‌বার্গ, জোহানেসবার্গ, প্রিটরিয়া ও অন্যান্য বহু স্থানে হিন্দু বেদ সভা, হিন্দু মহাসভা, তামিল মন্দির সমিতি, তামিল লিগ্‌, হিন্দু সেবা সমাজ এবং অন্যান্য ত্রিশটি সমিতি ও সঙ্ঘ কর্তৃক স্বামীজী বিপুল-ভাবে সম্বর্ধিত হন। সম্বর্ধনা-সভাগুলিতে আট শত হইতে ষোল শত পর্যন্ত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী ঘনানন্দজী সর্বসাকল্যে ৬৫টি জনসভায় ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, সমাজনীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা, ১৫টি আলোচনা-সভায় ধর্মবিষয়ক কথোপকথন এবং ৬টি সভায় গীতা ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যেথানেই ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছেন সেখানেই প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০ জন দর্শনার্থী ও জিজ্ঞাসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ১৫টি জনসভায় তিনি তামিল ভাষায়ও বক্তৃতা দিয়াছেন। জনসভাগুলিতে ভারতীয় শ্রোতা ৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত, ইউরোপীয় শ্রোতা ৫০ হইতে ১৫০, এবং ধর্মবিষয়ক কথোপকথনে ৬০ হইতে ২০০ এবং গীতা-ব্যাখ্যায় গড়ে ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামীজী ডারবান আন্তর্জাতিক ক্লাবে, জোহানেস্‌বার্গ, প্রিটোরিয়া ও ডারবানস্থিত থিওসফিক্যাল সোসাইটির শাখাকেন্দ্রে ইউরোপীয় শ্রোতৃবর্গের নিকট ৬টি এবং প্রিটোরিয়া ইউরোপীয় হাই স্কুলের ১৬০০ জন বালকের নিকট একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ডারবানস্থিত দক্ষিণ-আফ্রিকা ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন ভারতীয়দের মধ্যে সার রাধাকৃষ্ণনের পর স্বামী ঘনানন্দজীকে বেতার বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

১৫ই আগষ্ট তামিল লিগ ও হিন্দু সেবা সমাজের উদ্যোক্তৃগণের আমন্ত্রণে স্বামী ঘনানন্দজী এক মহতী জনসভায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া সময়োচিত বক্তৃতা করেন। ঐ তারিখে জোহানেস্‌বার্গেও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক জনসভায় স্বামীজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় মেয়র মিঃ জেম্‌স্‌ গ্রে। কয়েক শত ভারতীয়, ও ইউরোপীয়, বিভিন্ন দেশের কন্‌সাল জেনারেলগণ এবং ভারতের হাই কমিশনারের সহকারী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণ রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের আদর্শ, ভাবধারা ও কর্মনীতির প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল হওয়ায় ১৯২৭ সনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথিদিবসে ডারবানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির একটি প্রধানকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির উদ্যোগে স্বামী ঘনানন্দজী হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আটটি ধারাবাহিক বক্তৃতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে আহূত সভাগুলিতে পাঁচ শতের অধিক নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন। নবগঠিত সোসাইটির উদ্যোগে স্বামীজী ১০টি আলোচনা-সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা

দিয়াছিলেন। ডারবান হইতে যথাক্রমে ৪৫ এবং ৫০ মাইল দূরবর্তী ষ্টেঙ্গার ও পিটারমরিট্জ্বার্গে অদূর ভবিষ্যতে সোসাইটির দুইটি শাখা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। পিটার মরিট্জ্বার্গে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠ-চক্র গঠিত হইয়াছে। ইহার বর্তমান্ সদস্য-সংখ্যা ৬৫০ জনের অধিক।

স্বামী ঘনানন্দজী দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রায় নয় মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় কার্যের প্রসারণ অপেক্ষা প্রগাঢ়তার দিকেই স্বামীজীর বেশী দৃষ্টি ছিল। আগষ্ট মাসে তিনি ফিল্ড মার্শেল স্মাট্স্ এবং দক্ষিণ-আফ্রকা গভর্নমেণ্টের তদানীন্তন ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব সচিব মিঃ হফ্মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্মাট্স্ ও হফ্মেয়র উভয়ই রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কর্ম-প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি দেখান। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্থাপিত হইলে গভর্নমেণ্টের সহায়তা পাওয়া যাইবে কিনা—স্বামীজীর এই প্রশ্নের উত্তরে অনরেবল হফ্মেয়র বলেন যে, খৃষ্টীয় মিশনগুলি যে পরিমাণ সাহায্য গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে পাইয়া থাকে, রামকৃষ্ণ মিশনও তদপেক্ষা কম সাহায্য পাইবে না। স্বামী ঘনানন্দজী জোহানেসবার্গ হইতে বিমানযোগে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পৌছিয়াছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রগুলিতে বেদান্তপ্রচার করিতেছেন।

লেডি মাউণ্টব্যাটেনের দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় পরিদর্শন—গত ৯ই জুলাই ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট-পত্নী লেডি মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিতে আসিলে অধ্যক্ষ স্বামী গঙ্গেশানন্দজী ও পরিচালকসমিতির সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা করেন। এই উপলক্ষে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বড়লাট-পত্নী বলেন, "দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত যক্ষ্মা-চিকিৎসালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট নূতন ভবন পরিদর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ-স্থাপিত রামকৃষ্ণ মিশনের ভারত ও পৃথিবীব্যাপী উল্লেখযোগ্য জনহিতকর কার্যাবলীর কথা জানিয়া এবং ভারতের অপর অংশে—ত্রিবেন্দ্রম্, মহীশূর, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে মিশনের প্রশংসনীয় সেবাকার্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে রাজধানী দিল্লীস্থ মিশনকেন্দ্র পরিদর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। আজ সেই সুযোগ মিলিয়াছে। এখানকার সেবাকার্য দেখিয়া আমি প্রকৃতপক্ষেই মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রদেশে এই যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্র গত পনর বৎসর যাবৎ মারাত্মক যক্ষ্মাব্যাধির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। মিশনের এই নিঃস্বার্থ সেবাকার্য দেশবাসী মাত্রেরই প্রশংসা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্য আকর্ষণ করিয়াছে। যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ের নূতন ভবনগুলি প্রস্তুত হওয়ায় উহার কার্য বহুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করিবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সকল বিভাগের সেবাকার্যে কর্মীদের একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা, অকুণ্ঠ কর্মনিপুণতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও নিষ্কাম মানবপ্রেম দেখিয়া আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। জনসেবার জন্য কর্মীদের এরূপ বিশুদ্ধ মনোভাবই বর্তমান সময়ে একান্ত প্রয়োজনীয়। আমি ও আমার স্বামী গত পনর মাস যাবৎ ভারতের নর-নারীর আন্তরিক সৌহার্দ্য, প্রীতি ও বিশ্বাস লাভ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত ও সুখী মনে করিতেছি। ভারত ত্যাগ করিবার পরও আমরা ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করিতে থাকিব এবং এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিব যে, বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও রামকৃষ্ণ মিশন একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবার কার্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইবে।"

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি—গত জুন মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী (১) "আত্মার নিভৃত কন্দর", (২) "আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতা ও আলো", (৩) "পরিপূর্ণ জীবনযাপন", (৪) "বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ", (৫) "আমাদের কেন অবিলম্বে ঈশ্বর-দর্শন হয় না?", (৬) "দুঃখের রহস্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। সোসাইটির সহকারী ধর্মোপদেশক স্বামী শান্ত-স্বরূপানন্দজী "কর্মের রহস্য", "বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্ত" এবং স্বামী ঘনানন্দজী "মানুষের মন ও আত্মা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামী অশোকানন্দজী সোসাইটীর সদস্য ও শিক্ষার্থিগণকে 'ধ্যানযোগ' শিক্ষা দিয়াছেন এবং 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সোসাইটিতে একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় এবং একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে।

রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রমে পশ্চিম-বঙ্গের গবর্নর—গত ৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণে পশ্চিমবঙ্গের গবর্নর শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজু খড়দহ রেল ষ্টেশনের নিকট রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম পরিদর্শন করেন। তথায় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে অনাথ বালকদিগকে শিক্ষাদান করা হইতেছে; তিনি ইহার প্রশংসা করেন। ১৯৪৪ সালে দুর্ভিক্ষে মাতৃপিতৃহীন ২৫টি অনাথ বালককে লইয়া এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষণে আশ্রমে ১৯৮টি অনাথ বালক শিক্ষালাভ করিতেছে।

গবর্নর ডাঃ কাটজু আশ্রমের বালকগণ ও পরিচালকগণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "আশ্রমের অধিবাসী বালকেরা দুর্ভাগ্য-ক্রমে মাতৃপিতৃহীন হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহারা এই আশ্রমে যথাসম্ভব সেবা ও যত্ন পাইয়া থাকে। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এরূপ আশ্রমগুলিতে অনাথ বালকেরা স্বগৃহের মাতৃপিতৃস্নেহ পায় না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে তাহারা শুধু যে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার স্নেহ ও যত্নই পায় তাহা নহে, পরন্তু তাহারা রাষ্ট্র ও জনগণের নিকট হইতেও আদর-যত্ন লাভ করিয়া থাকে। এই দেশের রাষ্ট্র এখন আর বিদেশী রাষ্ট্র নহে; ইহা জনগণের রাষ্ট্র। সুতরাং এই আশ্রমের বালকদের এই ভাবিয়া মন খারাপ করিবার কারণ নাই যে, যেহেতু তাহাদের মাতাপিতা নাই, সেই হেতু তাহারা কোন সেবাযত্ন পাইবে না বা মানুষ হইতে পারিবে না। এই আশ্রমে বালকেরা উত্তমরূপ চিকিৎসারও সুযোগ পায়, নিয়মিত ও পরিমিত খাদ্য পায়, সাধারণ শিক্ষা ও নানাবিধ হস্তশিল্প শিক্ষা করিবার সুযোগ পায় এবং যখনই তাহাদের মন খারাপ হয়, তখনই স্নেহ-যত্ন করিবার লোক পায়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নাম অনাথালয় রাখা গান্ধীজী মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি চাহিতেন যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানের বালকাশ্রম বা আশ্রম নাম রাখা হউক। আমি মনে করি যে, অনাথ বালক-বালিকাদের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতি জেলা ও মহকুমায় এরূপ ধরনের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্র ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই সব প্রতিষ্ঠানে সর্বপ্রকার সাহায্য করা সঙ্গত।"

আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দজী ইহার কার্যাবলী বিবৃত করিয়া বলেন, "১৪৬ জন বালকের সর্বপ্রকার ব্যয় বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট বহন করিয়া থাকেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখার্জির বদান্যতায় এই প্রতিষ্ঠানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তিনি এই আশ্রমের জন্য তিন লক্ষাধিক টাকা এবং কয়েকটি পাকা বাড়ীসহ ৪টি বাগান বাড়ী দান

করিয়াছেন। জনপ্রতিনিধিস্থানীয় গবর্নমেণ্ট ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার ফলে কিরূপ ভাল কাজ হইতে পারে এই প্রতিষ্ঠান তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আশ্রমের বালকেরা যাহাতে নিজেদের অসহায় ও পরিত্যক্ত বলিয়া মনে না করে, তজ্জন্য আশ্রমের কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে যথাশক্তি গৃহের সুখকর পরিবেশের মধ্যেই রাখিবার চেষ্টা করেন। বালকদের মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য খেলাধূলা, ঘোড়ায় চড়া, সন্তরণ, সঙ্গীত, অভিনয়াদির অনুষ্ঠান, দলবদ্ধ ভাবে বহির্ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বালকেরা শিক্ষার দিকেও বেশ ভাল ফল দেখাইয়াছে। এবার তিনটি বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২ জন প্রথম বিভাগে এবং ১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বালকদের নানাবিধ হস্তশিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে।”

গবর্নরকে আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রমের সকল বিভাগ দেখেন। পরিদর্শনকালে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বরাহনগর (২৪ পরগনা)—কিছু দিন হয় এই আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন প্রাতে মঙ্গলারতি, আশ্রম-বালকগণের ভজন-সঙ্গীত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। অপরাহ্ণে পশ্চিমবঙ্গের তদনীন্তন প্রদেশপাল চক্রবর্তী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয় এবং শ্রীমতী নামগিরি মহোদয়া ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন। বেলুড় মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা কাশীপুর বরাহনগর ও তন্নিকটবর্তী স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিরন্তরানন্দজী প্রদেশপালকে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং আশ্রমের বালকগণ সামরিক প্রথায় সম্মান প্রদর্শন করে। সভায় “বন্দে মাতরম্” গীত হইবার পর আশ্রমের সভাপতি মহাশয় রাজাজীকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন এবং সম্পাদক আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। আশ্রম-বালকগণের ব্যায়াম ও ড্রিল প্রদর্শনের পর শ্রীযুক্ত দামোদর দাস খান্না হিন্দিতে বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত রাজাজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা ও বিবিধ জনহিতকর কার্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, “বালকদিগের চরিত্র গঠন ও তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি-উন্মেষের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই জাতি-সেবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প অথচ শিক্ষালাভেচ্ছু বালকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। যে ব্যক্তি বা যে সংঘ বালকদিগের জন্য এক বা ততোধিক এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান পরিচালনের চেষ্টা করেন, তিনি বা সেই সংঘ জাতীয় সেবার এক মহদংশ গ্রহণ করেন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। বিদ্যা-শিক্ষার সহিত চরিত্রগঠনের শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা অবশ্য কর্তব্য। এই নিমিত্ত আমি এই প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

“আমরা রামকৃষ্ণ মিশন এবং তৎসংশ্লিষ্ট নৈতিক-শিক্ষামূলক ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ও ঐতিহ্যই বালকদিগের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এই নামটিই বাংলার সংস্কৃতিপ্রসারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। আমি আশা করি, ভারতের সর্বত্র এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার আদর্শে অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

গড়িয়া উঠিবে। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপেক্ষা আর কেহই উপনিষদের বাণী, শিক্ষা ও জ্ঞান জীবনে এত সুন্দররূপে সফল করিতে পারেন নাই। আমি ২০ বৎসর ধরিয়া উপনিষদ্ চর্চা করিতেছি। আমি যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী বা শিক্ষা একদিনের জন্যও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরো বেশী শিক্ষা করিতে পারিব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামের সহিত জড়িত বিদ্যালয়ে বালকগণ যে শিক্ষালাভ করিতেছে ইহাই তাহাদের পক্ষে পরম পুরস্কার।"

দ্বিতীয় দিবস আমোদ-প্রমোদ এবং শেষ দিবস সঙ্গীতাদি ও বেলুড় মঠের বহু বিশিষ্ট সাধু এবং ভক্তগণের সমাগম হয়।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন— আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৭ সনের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে মঠে নিত্য নিয়মিত পূজা এবং ২৫১টি অধিবেশনে ধর্মপুস্তক পঠিত হয়। এবার শ্যামাপূজা, সরস্বতীপূজা, বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের আবির্ভাব উপলক্ষে পাঠ ও ধর্মালোচনাদি হইয়াছে। বেলুড় মঠ ও শাখাকেন্দ্রাদি হইতে সন্ন্যাসিগণ আগমন করিয়া শহর ও পল্লী অঞ্চলে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকাগার ও পাঠাগারের কার্যও সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৬০৭ এবং ২০৭৮ খানা পুস্তক পাঠের জন্য বাহিরে দেওয়া হইয়াছিল। পাঠাগারে ২৪টি মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ-পত্র সর্বসাধারণের পাঠের জন্য রক্ষিত ছিল।

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ৩টি শাখাকেন্দ্রে মোট ৭৫৬২৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। নূতন রোগীর সংখ্যা ২৮৩৮৬, পুরাতন রোগী ৪৭২৩৮, অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৩৭৮। হাসপাতাল বিভাগে মোট ১৭১ জন রোগী ছিল।

বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে মোট ৮ জন শিক্ষার্থী ছিল, তন্মধ্যে ৭ জন মঠে বাস করিত। ২ জন বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা-কার্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছে।

সারদানন্দ ছাত্রাবাসে মোট ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১৯ জন, তন্মধ্যে ২ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছে।

আশ্রম-পরিচালিত রামহরিপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় আলোচ্য বর্ষে জেলা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইহাতে মোট ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১৬৭, তন্মধ্যে ১১টি বালিকা। ছাত্র-সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি হেতু আর একটি নূতন গৃহের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

আঁধারথোল ও কালপাথর ইউনিয়নের ১৩টি গ্রামের ১১৬ জন ব্যক্তিকে ২/ মণ পশম সূতা কাটিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। সূতা-কাটা ও কাপড়-বুনা বাবদ তাঁতিদিগকে মজুরী ৮২১৸৵৫ দেওয়া হইয়াছে। কতিপয় দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাময়িক ভাবে ৪৭৷৹ সাহায্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৩৮০ জন রুগ্ন-ব্যক্তির মধ্যে ২১ পাঃ ১১আঃ ২ড্রাঃ ২৪ গ্রেঃ কুইনাইন, ১২ জনের মধ্যে ২৮২ ভাইটামিন বটিকা এবং ৯৪ জনকে ৫৪১টি মেপাক্রিন, ১০০ জনকে কলেরার প্রতিষেধক ইন্জেক্শন ও ১০০ জনকে বসন্ত-প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হইয়াছে। শহরের বিভিন্ন অংশ ও কতিপয় পল্লীগ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে ২৮৸৹ মণ বিস্কুট এবং রামহরিপুর শাখাকেন্দ্রে ১০,০১৯ জনের মধ্যে ৪৯২ পাঃ গুঁড়া দুগ্ধ বিতরিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শহর হইতে আশ্রমে যাতায়াতের সৌকর্যার্থ একটি পাকারাস্তা নির্মিত হইয়াছে। বি এন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রকে ঐ ভূমি দান করিয়াছেন। রাস্তা-নির্মাণ বাবদ মোট ৫৫৫০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এইজন্য সরকার বাহাদুর ৩৩৫৯৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অবশিষ্ট অর্থ স্থানীয় মহানুভব দাতাগণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী—বাঙ্গলার বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং মনীষী শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম-এ, পি-আর-এস মহাশয় মাত্র কয়েক দিন রোগ ভোগ করিয়া বাগবাজারস্থ তাঁহার বাসভবনে গত ২০শে আষাঢ় রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় হরিনাভি-নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত অমরনাথ বিদ্যাবিনোদের পুত্র এবং স্বর্গত পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, এম্-এ, পিএইচ্-ডি মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। অশোকনাথ পাঠ্যাবস্থায় গবর্নমেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার বৃত্তি এবং বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তৎপর তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। অধুনা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য সাধারণের বোধগম্য করিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিভিন্ন মাসিক ও সাময়িক পত্রে তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসম্পাদিত "অভিনয় দর্পণ" সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থের কঠিন তত্ত্বগুলি তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

শাস্ত্রী মহাশয় সদালাপী, নিরহঙ্কার, বন্ধুবৎসল এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। সদাহাস্য-ময় অশোকনাথ ছোট-বড় সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন।

অশোকনাথ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরি-বারের কুলগুরু এবং পুরোহিত ছিলেন। মাত্র ছয়মাস পূর্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্ত্রী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বৃদ্ধা মাতা একমাত্র পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

গৌরীপুর (দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল কেন্দ্র—কিছুদিন হয় এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে, প্রথম দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হিলির কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি সভা হয়। সভায় দিনাজপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দজী ও সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিবস নরনারায়ণের সেবান্তে উৎসব শেষ হয়।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল হলে বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী "ভারতীয় স্বাধীনতা ও বর্তমান জগৎ" এবং শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্ "উপনিষদে ভক্তিতত্ত্ব" সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেন রায় শ্রীযুক্ত বিজয়-বিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এবং দ্বিতীয়

বক্তৃতায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সুন্দরানন্দজী এবং উভয়ই মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সোসাইটি হলে (২১ নং বৃন্দাবন বসু লেন) সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার শেঠ, বার-এট্-ল "কঠোপনিষৎ", পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব "গীতা", এবং শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "গুরু, শিষ্য ও দীক্ষা", "ভক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম)", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" ও "শিবানন্দ-বাণী" আলোচনা করেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীরাধারমণ সাধনাশ্রম ও জন-কল্যাণ সঙ্ঘ গত ২৯শে আষাঢ় মঙ্গলবার শঙ্কর মিশন পরিচালিত জন-কল্যাণ সঙ্ঘ ও শ্রীরাধারমণ সাধনাশ্রম প্রভৃতি কেন্দ্রে শ্রীরাধারমণদেবের জন্ম-তিথি উপলক্ষে পূজা হোম ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা হয়। এই সকল অনুষ্ঠান মিশনের প্রধান কার্যালয় কৃষ্ণনগর জন-কল্যাণ সঙ্ঘ, বীরপুর জন-কল্যাণ সঙ্ঘ, শিবপুর জন-কল্যাণ সঙ্ঘ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, শ্রীরাজপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি শ্রীরাধারমণ সাধনাশ্রম কেন্দ্রে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২রা শ্রাবণ স্বামী সুন্দরানন্দজীর পৌরোহিত্যে এক স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে শঙ্কর মিশনের সভানেত্রী শ্রীদেবীমাতা, সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর প্রেম-চৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত সতেন্দ্র নাথ সাহিত্য-শাস্ত্রী, ডাঃ সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, মৌলভী ফজলুল রহমান ও ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরাধারমণদেবের জীবনী ও ভাবধারা অবলম্বনে অনুপ্রাণিত শঙ্কর মিশনের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী সুন্দরানন্দজী "মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

পশ্চিমবঙ্গে সেনাবাহিনী-গঠন—ভারত গবর্নমেণ্ট অনতিবিলম্বে বাঙ্গলা হইতে একটি সেনাবাহিনী (মিলিসিয়া) গঠন করিবার আদেশ জারী করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলেন যে, এক্ষণে পশ্চিমবাঙ্গলার দুই ব্যাটেলিয়ান সেনাবাহিনী গঠন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং এই জন্য অবিলম্বেই লোক ভর্তি আরম্ভ করা হইবে। বাঙ্গালী যুবকদের লইয়া এই নবগঠিত ব্যাটেলিয়ানগুলি ভারতীয় নিয়মিত সেনাবাহিনীর পদাতিক বাহিনীরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বর্তমানে ১৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের ২ হাজার বাঙ্গালী যুবককে এই ব্যাটেলিয়ানে ভর্তি করিবার প্রচেষ্টা হইবে। সাময়িক ভাবে এক্ষণে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন লোকদের মধ্য হইতেই ঐ লোক সংগ্রহ করা হইবে। এই দুইটি ব্যাটেলিয়ানের জন্য লোক সংগৃহীত হইবার পর অন্যান্য শ্রেণীর যুবকদের মধ্য হইতেও পরবর্তী ব্যাটেলিয়ানগুলির জন্য লোক সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা তাহারাই এই বাঙ্গালী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হইতে পারিবে।

উপরোক্ত কার্যের জন্য ভারত গবর্নমেণ্টের দেশরক্ষামন্ত্রি-দপ্তর হইতে একজন লোকসংগ্রাহক কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। তিনি ২৮ নং থিয়েটার রোডে দৈনিক সকাল ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্যন্ত প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে।

'ডাফরিন' জাহাজে শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি—বাণিজ্য জাহাজে এক্সিকিউটিভ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং উভয় বিভাগে ভারতের যুবকদের অফিসার হিসাবে কাজ করিবার সুযোগদানের জন্য "ডাফরিন" জাহাজে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ফেডারেল

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিচালনাধীনে গৃহীত একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটি বালককে "ডাফরিন" জাহাজে শিক্ষালাভের জন্য গ্রহণ করা হয়। শিক্ষালাভের সময় তিন বৎসর এবং ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীর বয়স সেই বৎসর ১৫ই জানুয়ারী ১৩ বৎসর ৮ মাস হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। শিক্ষার্থী "ডাফরিন" জাহাজে শিক্ষা-সমাপ্তির পর উপকূলভাগের এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগামী জাহাজে অথবা বোম্বাই ও কলিকাতার জাহাজের ওয়ার্কসপে মাষ্টার মেট, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি পদের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থে শিক্ষানবীশ হিসাবে সুযোগ পাইবে।

প্রতি বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে আই এম এম টি এস "ডাফরিণের" গবর্নিং বডির সেক্রেটারীর নিকট মাঝগাঁও পারবে, বোম্বাই ১০—এই ঠিকানায় নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদনপত্র পৌছান চাই। ফি মাসিক ৫০৲ প্রতি টার্মে অগ্রিম দেয়। প্রথম টার্মে মোট ২২৫৲ টাকা এবং দ্বিতীয় টার্মে ১৭৫৲ টাকা দিতে হইবে। আহার, বাসস্থান, শিক্ষার খরচ এবং চিকিৎসার ব্যয় ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত লাগিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যে সকল অভিভাবক তাঁহাদের পুত্রকে এই জাহাজে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইবার পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে তিন বৎসরের জন্য প্রতি বৎসর তিনটি করিয়া বৃত্তি দিবেন। যে বালকের পিতা পশ্চিমবঙ্গের লোক বা স্থায়ী বাসিন্দা নহেন অথবা যে বালক বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প দপ্তর হইতে যোগ্যতার নিদর্শনপত্র পায় নাই, সে এই বৃত্তিলাভের যোগ্য বিবেচিত হইবে না।

উল্লিখিত বৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে প্রতি বৎসর ১৫ই নভেম্বরের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য শ্রম ও শিল্প দপ্তরের সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। গবর্ণিং বডির সেক্রেটারীর নিকট আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে।

রাশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির সমাদর— সম্প্রতি রাশিয়ার প্রাচীনতম লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর বলেন যে, রুশ পণ্ডিতগণ ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল। শ্রীমতী পণ্ডিতকে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড পুস্তকাগার দেখান হয়। সেখানে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কয়েক সহস্র পুস্তক রহিয়াছে। শ্রীমতী পণ্ডিত রামায়ণ ও মহাভারতের রুশ সংস্করণের এবং পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূর্জপত্রের অনেক পুঁথিও দেখিতে পান।

জারের প্রাচীন প্রাসাদ এবং সংরক্ষিত জিনিষপত্রের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি মন্তব্য করেন, এই নগরেই যে রুশ বিপ্লবের জন্ম হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রুশ সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কে ভারতীয়গণের আগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলা প্রয়োজন।

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য চাকরি সংগ্রহ —পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট চাকরি খালি হইলে যথাসম্ভব পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকদিগকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাণিজ্যসভাগুলির নিকট এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন:

"আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, অনিবার্য কারণে পূর্ববঙ্গের বহু অধিবাসী বাস্তত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণের জন্য চলিয়া আসিয়াছেন। বাস্তত্যাগীদের মধ্যে অনেকের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাঁহারা যথাযোগ্য বাসস্থান পাইতেছেন না। কলিকাতা নগরীতে আদৌ স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে অনেকের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন; শীঘ্রই তাঁহাদিগকে হয়ত অনশনে থাকিতে হইবে।

"যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য চাকরি সংগ্রহ করাই এক্ষণে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। গভর্নমেণ্ট আশ্রয়প্রার্থীদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন রিলিফ কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আশ্রয়প্রার্থীদিগকে ছোটখাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বা কুটীরশিল্পে এবং কৃষি-কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মালিকদের সহযোগিতা ব্যতীত সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর জন্য চাকরি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জকে আশ্রয়প্রার্থীদের নাম এবং তাঁহাদের সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় রেজিষ্ট্রীতে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকরি খালি হইলে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ না করিয়া চাকরি খালি থাকিবার সংবাদটি অবিলম্বে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জকে জানাইবার জন্য মালিকদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। এই এক্সচেঞ্জসমূহ শূন্য পদে লোক গ্রহণের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়প্রার্থীর নাম সুপারিশ করিবে। উক্ত নামের তালিকা হইতে মালিকগণ সাক্ষাৎকার এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য প্রকার পরীক্ষা গ্রহণের পর প্রার্থী নির্বাচন করিতে পারেন। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা হইতেই কোনও প্রার্থীকে চাকরিতে গ্রহণ করিতে হইবে মালিকদের এরূপ কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদিগকে চাকরিদানের জন্য এই ভাবে মনোনীত করিবার সুযোগ প্রদান করিতে আমি মালিকদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। চাকরির জন্য মনোনীত হইবার পূর্বে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে যে সঙ্কটজনক অবস্থায় কাল কাটাইতে হইতেছে তৎসম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য আমি মালিকদের নিকট আবেদন করিতেছি। গভর্নমেণ্ট আশা করেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য যথাযোগ্য চাকরি-সংগ্রহ-সংক্রান্ত এই দুরূহ সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে মালিকগণ গভর্নমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।"

ভারতীয় বিমানচালনা-শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষা-ব্যবস্থা—ভারতীয় অসামরিক বিমান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর-জেনারেল শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি বৃটেন পরিদর্শন কালে এল্ডারম্যাষ্টনের 'এয়ারওয়েজ ট্রেনিং লিমিটেড' বৈদেশিক শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থায় কি কি সুযোগ ও সুবিধা দিয়া থাকেন তাহার অনুসন্ধান করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ এয়ারওয়েজ ট্রেনিং লিমিটেডের আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম এবং উহাদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কৌতূহল দেখান। তিনি ভারতীয় বিমান-শিক্ষার্থীদের এখানে অতিরিক্ত শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

বৃটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ এবং বৃটিশ ইউরোপীয়ান এয়ারওয়েজ এই বিমানচালনা-শিক্ষা-কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করে। বৃটেনের বৈমানিক ও বিমানসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মীদের উচ্চতর শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রটি পরিকল্পিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইতেছে। এখানে তাহাদের পাইলট,

নেভিগেটর, রেডিও অপারেটর, রেডিও এবং রাডার মেকানিক্, গ্রাউণ্ড্ ইঞ্জিনীয়র সম্পর্কিত উচ্চ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে ১৯৪৫ সাল হইতে আজ পর্যন্ত রয়াল এয়ার ফোর্স হইতে গৃহীত ১০০০ শিক্ষার্থী এল্ডারম্যাষ্টনে অসামরিক বিমান-চালনায় উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়াছে। এল্ডারম্যাষ্টন আজ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অসামরিক বিমান-চালনা-শিক্ষা-কেন্দ্র।

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

দেশের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের দশটি আশ্রম পূর্ব্ব পাকিস্তান এলাকায় পড়িয়াছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ প্রভৃতি উহাদের অন্যতম। জনসাধারণ অবগত আছেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া এই আশ্রমগুলি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ঐ সকল অঞ্চলের দরিদ্র-নারায়ণগণের নানাভাবে সেবা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যাঁহাদের অর্থানুকূল্যে ঐগুলি এত দিন পরিচালিত হইতেছিল, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অধিকাংশ ঐসকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় ঐ আশ্রমগুলি আজ এক কঠিন অর্থসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কোন কোন আশ্রমের অবস্থা এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে যে অচিরে সাহায্য না পাইলে উহাদের অধিকাংশ সেবাকার্য্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

শ্রীভগবানের কৃপায় আশা করি দেশের এই অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয় ততদিন এই আশ্রমগুলিকে আমাদের অবশ্যই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

তজ্জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদের আন্তরিক আবেদন—তাঁহারা মুক্তহস্তে দান করিয়া এই আশ্রমগুলিকে উহাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা হইতে রক্ষা করুন। সহস্র সহস্র নরনারী যে সকল আশ্রম হইতে এত দিন নানাবিধ সাহায্য পাইয়া আসিতেছে, অর্থাভাবে সেগুলি যাহাতে উঠিয়া না যায় সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে :—

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রী শ্রীদুর্গা

উদ্বোধন
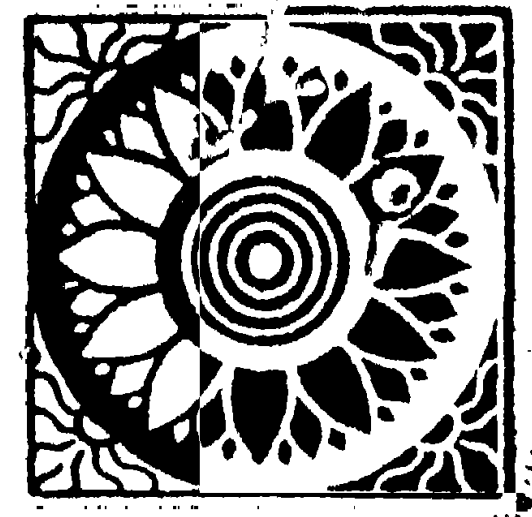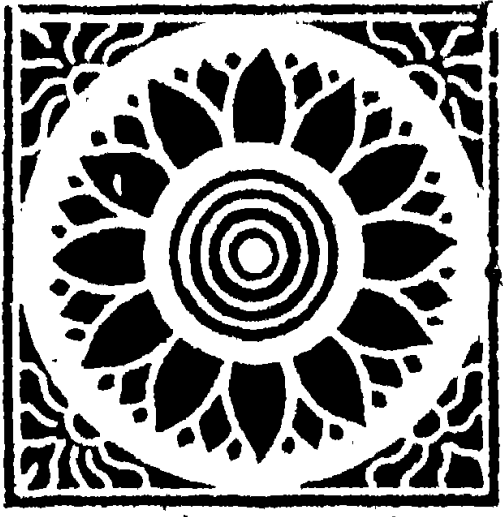
র প্রথম চরিত্র

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর তিনটী চরিত্র বর্ণিত আছে—প্রথম চরিত্র মহাকালী, দ্বিতীয় চরিত্র মহালক্ষ্মী ও তৃতীয় চরিত্র মহাসরস্বতী। শক্তি-সাধক মেধামুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির নিকট চণ্ডীদেবীর চরিত্রত্রয় ব্যক্ত করেন। সুরথ ছিলেন ধর্মপ্রাণ রাজা। তিনি শাস্ত্রোক্ত রাজধর্মানুসারে প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। একদা যবনরাজগণের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। মহাভাগ সুরথ স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান-কালে দুষ্ট, দুরাত্মা ও বলী অমাত্যগণ শত্রুগণের চক্রান্তে তাঁহার ধনাগার ও সৈন্যাদি অধিকার করিল। অনন্তর সুরথ রাজ্যচ্যুত হইয়া মৃগশিকারচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণে গহন বনে গমন করিলেন। তথায় তিনি দ্বিজবর মেধামুনির প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণ মুনিশিষ্যোপশোভিত আশ্রম দেখিতে পাইলেন। মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুরথ তাঁহার আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্বক কিছু সময় কাটাইলেন। মমত্বাকৃষ্ট চিত্তে তিনি পরিত্যক্ত রাজধানী, ধনভাণ্ডার, ভৃত্য, হস্তী ও অশ্বাদির বিষয় ভাবিতেছিলেন, এমন সময় আশ্রমসমীপে সশোক দুর্মনা বৈশ্য সমাধি উপস্থিত হইলেন। সুরথের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে সমাধি বিনয়াবনত হইয়া বলিলেন, অসাধু স্ত্রীপুত্রগণ তাঁহার ধনাদি আত্মসাৎ করায় তিনি মনের দুঃখে বনে আসিয়াছেন। বনবাসী হইয়াও সমাধি স্ত্রী, পুত্র ও ধনসম্পদের কথা ভাবিতেছিলেন। দুর্বৃত্ত স্ত্রীপুত্রগণের প্রতি তিনি এত স্নেহাসক্ত ছিলেন যে, তাহাদের জন্য বৈশ্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছিল এবং দুশ্চিন্তা হইতেছিল। সুরথ ও সমাধি স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কিছুতেই মমতাত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

ইহার প্রকৃত কারণ অবগত হইবার জন্য উভয়ে মেধামুনির নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামান্তে উপবেশন করিলেন। সুরথ মুনিকে প্রশ্ন করিলেন, "বিষয়াদিতে দোষদর্শন সত্ত্বেও ইহাদের প্রতি মমতা থাকে কেন?" মুনি বলিলেন, "আহার-নিদ্রাদির জ্ঞান পশুর ও মানুষের সমান। তবে পশুর ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষের ধর্মজ্ঞান আছে; আর পশুর ধর্মজ্ঞান নাই। সুতরাং ধর্মহীন মানুষ পশুতুল্য। দেখুন, শাবকের ভোজনে নিজেদের ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না জানিয়াও পক্ষিগণ ক্ষুধায় পীড়্যমান হইয়া মোহবশতঃ শাবকগণের চঞ্চুপুটে শস্যকণা-প্রদানে কত অনুরক্ত! আহা! মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হয়। বিবেকের আলোকে অনুধাবন করিলে এই অপ্রিয় সত্য আপনার

মনেও প্রতিভাত হইবে। সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মমতাবর্তে ও মোহগর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। 'এই মহামায়াই জগদম্বার মোহিকা শক্তি। এই শক্তিই জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন।"

মেধামুনি মমতাকে আবর্ত বলিয়াছেন। ঘূর্ণায়মান জলে বা বায়ুতে পতিত হইলে জলযান বা বায়ুপোত যেমন জলমগ্ন বা ভূপতিত হয়, মানুষ তেমনি মমতাবদ্ধ হইলে আদর্শভ্রষ্ট হয়। এইটী আমার—ইহাই মমত্ববুদ্ধি। এই বুদ্ধি অহংভাব-বর্ধক। মুনিবরের মতে মোহ এক প্রকার গর্ত। গর্তে পতিত মানুষ যেমন নিজে উঠিতে পারে না, মোহগ্রস্ত ব্যক্তিও স্বয়ং নিজের নাশ করিতে পারে না। মমত্ব মোহ-উৎপাদক। গীতাতে আছে, 'মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বিবেক-বুদ্ধি-নাশ, বিবেক-নাশ হইতে সর্বনাশ হয়।' মহামায়াই মর্তকে মোহাচ্ছন্ন করেন সৃষ্টি-ক্রীড়া-পরিচালনের জন্য। মেধামুনি সুরথ ও সমাধিকে পুনরায় বলিলেন, 'বিবেকহীনগণের কি কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। ভবাদৃশ সংসারিগণের কি কথা? মহামায়া অপক্ককষায় যোগিগণেরও মোহিকা। তিনিই এই সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন। তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্টবরদাত্রী হন। তিনি সংসারমুক্তির হেতু-ভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সনাতনী। তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।'

মহামায়াতত্ত্বই শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়। 'মহামায়া' শব্দটী চণ্ডীতে আটবার উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকাকার নাগোজীভট্ট এবং গোপাল চক্রবর্তীর মতে মহামায়া যথাক্রমে বিসদৃশপ্রতীতি-সাধিকা ঈশ্বরশক্তি ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। এই মহাশক্তির দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টিসংহারাদি ও জন্মলীলাদি কার্য করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি তাঁহারই অধীন। উপাসকগণের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য ইনি অভৌতিক রূপ ধারণপূর্বক দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। দেবীভাগবতে (৫।৮) ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—'নটের রূপ এক হইলেও যেমন সে লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গমঞ্চে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্যসিদ্ধ্যর্থ স্বলীলায় সত্ত্বাদিগুণযুক্ত বিবিধ রূপ ধারণ করেন।' এই গ্রন্থে (৩।৭) ব্রহ্মা নারদের নিকট মহামায়া-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে মহামায়াকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবতী বলা হইয়াছে। রুদ্র-যামলের মতে মহামায়াই পরব্রহ্ম। চণ্ডীর টীকাকার ভাস্কর রায় বলেন, 'চণ্ডী পরব্রহ্মের পটমহিষী দেবতা।' বাংলার শক্তিসাধক শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীকমলাকান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মতে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম সক্রিয়, সগুণ, সাকার হইলেই মহামায়া নামে কথিতা হন। নিশ্চল ও সচল সর্প যেমন এক, প্রশান্ত ও তরঙ্গায়িত জলাশয় যেমন অভিন্ন, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মও তেমনি অভেদ। দুগ্ধ ও ইহার ধবলতা, সূর্য ও ইহার আলোক, অগ্নি ও ইহার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, শিব ও শক্তি তেমনি অভেদ। দেবীপুরাণের নামনির্বচনাধ্যায়ে মহামায়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে আছে—'মাতৃগর্ভে অবস্থিত জ্ঞান-সম্পন্ন শিশু প্রসূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র যিনি তাহাকে নিরন্তর জ্ঞান-রহিত করেন, যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার-

সমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমতা দ্বারা আবৃত করেন, যিনি জীবকে 'ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করিয়া অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও বাসনাসক্ত করেন সেই জগদীশ্বরই এই জন্য মহামায়া বলিয়া কথিত হন।"

মেধামুনিকে রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কার্যই বা কি? হে ব্রহ্মবিদ্বর, সেই মহামায়ার স্বভাব, স্বরূপ এবং আবির্ভাব সম্বন্ধে আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।' মেধা ঋষি বলিলেন, 'সেই মহামায়া নিত্যা, জগন্মূর্তি এবং বিশ্বব্যাপিনী। জগদতিরিক্ত মুখ্য শরীর তাঁহার নাই, তিনি জগদাশ্রয়ভূতা শক্তি। তথাপি তাঁহার সাকার আবির্ভাবের কথা আমার নিকট শ্রবণ করুন। দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি যখন আবির্ভূতা হন তখন তিনি উৎপন্না এইরূপে পৃথিবীতে অভিহিতা হন। প্রলয়কালে বিশ্বপ্রপঞ্চ কারণসলিলে নিমজ্জিত হইলে ভগবান বিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন মধু ও কৈটভ নামক উগ্র অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা ভীত হইয়া প্রসুপ্ত বিষ্ণুর বিবোধনের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা অতুলা বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী তামসীদেবীর একাগ্র চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন।' ব্রহ্মা মহামায়ার যে স্তব করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ এইরূপ—"হে নিত্যা, অক্ষরা দেবী, আপনিই দেবোদ্দেশে হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা। আপনিই যজ্ঞে দেবাহ্বানের স্বধামন্ত্ররূপা। আপনিই পিতৃলোকের উদ্দেশে দ্রব্যদানের স্বধামন্ত্ররূপা। আপনি যজ্ঞমন্ত্ররূপা, স্বরাত্মিকা, মাত্রাত্রয়রূপা, প্রণবরূপা অমৃতস্বরূপিণী। আপনি অনুচ্চার্যা নির্গুণা, সাবিত্রী, দেবজননী। আপনি এই জগৎকে সৃষ্টি, ধারণ, পালন ও সংহার করেন। হে জগন্ময়ি, আপনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, স্মৃতি ও অস্মৃতি, মহাদেবী ও মহা-অসুরী, সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের তারতম্যবিধায়িনী; আপনি ব্রহ্মার কালরাত্রি, বিশ্বের মহারাত্রি এবং মানবের দারুণা মোহরাত্রি। আপনি শ্রী, ঈশ্বরী, হ্রী, বোধলক্ষণা বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, ও ক্ষান্তিরূপে বিরাজিতা। আপনি খড়্গিনী, শূলিনী, ভয়ঙ্করী, গদিনী, চক্রিণী, শঙ্খিনী, চাপিনী, বাণ-ভূশুণ্ডী-পরিঘা-অস্ত্রধারিণী। হে দশভুজা মহাকালী, আপনি দশপ্রহরণধারিণী। আপনি ভক্তগণের প্রতি অতিসৌম্যা এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা এবং সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও শ্রেষ্ঠা, সর্বপ্রধানা দেবী ও পরমেশ্বরী। হে অখিলাত্মিকে, যে কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড়বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সেই সকলের শক্তি আপনিই সুতরাং কিরূপে আপনার স্তব করিব? আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কিছু নাই। আপনার স্তব কিরূপে সম্ভব? যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং শিবরূপে সংহার করেন সেই পরমেশ্বরকেই আপনি যোগনিদ্রাবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং এই সংসারে কে আপনার স্তব করিতে সমর্থ? আপনি আমাকে, বিষ্ণুকে ও রুদ্রকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন। কে আপনার স্তুতি করিতে পারে? হে মহাকালী, আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া স্বীয় অলৌকিক প্রভাবে দুরাধর্ষ অসুরদ্বয় মধুকৈটভকে

মোহিত করুন। শীঘ্র আপনি জগৎস্বামী বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া এই মহাসুরদ্বয়কে বধ করিবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি সঞ্চার করুন।"

তামসী দেবী ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ এবং বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গের জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা বাহু, হৃদয় ও উরুস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইলেন। যোগনিদ্রামুক্ত জগন্নাথ জনার্দন একীভূত জলময় বিশ্বে অবস্থিত অহি-শয়ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুরাত্মা, মহাবীর্য ও মহাপরাক্রমশালী, ক্রোধরক্তেক্ষণ মধুকৈটভকে ব্রহ্মার বধের জন্য উদ্যত দেখিলেন। ভগবান বাহুপ্রহরণ দ্বারা দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অতিবলোন্মত্ত অসুরদ্বয় মহাকালীর প্রভাবে বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, 'আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন।' ভগবান বিষ্ণু বলিলেন, 'যদি তোমরা আমার যুদ্ধে তুষ্ট হইয়া থাক তবে তোমরা এই ক্ষণে আমার বধ্য হও, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। এথানে অন্য বরের প্রয়োজন কি?' মহামায়া কর্তৃক বঞ্চিত ও বিমোহিত মধুকৈটভ সমগ্র বিশ্ব জলমগ্ন দেখিয়া কমললোচন বিষ্ণুকে বলিল, 'আপনার যুদ্ধে আমরা উভয়ে প্রীত হইয়াছি। আপনার হস্তে আমাদের মৃত্যু শ্লাঘ্য। পৃথিবী যে স্থানে আপোময়, 'সলিলেন পরিপ্লুতা' নহে সেখানে আমাদের উভয়কে বিনাশ করুন।' তখন শঙ্খ-চক্র-গদাভৃৎ বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া অসুরদ্বয়ের মস্তক স্বীয় জঙ্ঘাদেশে স্থাপনপূর্বক চক্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলেন।

বিষ্ণুদেহ হইতে দেবীর আবির্ভাবের দ্বারা মহাকালীর দেহের শুদ্ধমায়িকত্ব ও অপাঞ্চভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইল। মহাকালী দশভুজা, দশাননা ও দশপদা। তিনি দশ হস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, ত্রিশূল, ভুশুণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন। তিনি ত্রিনয়না, সর্বালঙ্কারশোভিতা, নীলকান্তমণিতুল্য জ্যোতি-রূপা। ডামরতন্ত্র-মতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের ঋষি—ব্রহ্মা, দেবতা—মহাকালী, ছন্দঃ—গায়ত্রী, শক্তি—নন্দা, বীজ—রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব—অগ্নি, স্বরূপ—ঋগ্বেদ। ধর্মলাভের জন্য উক্ত চরিত্র-পাঠের প্রয়োগ হয়। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে, 'মহাকালী তমোগুণময়ী, দুরধিগম্যা, সনাতনী, বৈষ্ণবী, মায়াশক্তি। ব্রহ্মাকথিত স্তবে ইনি আশুতুষ্টা হন।' তমঃপ্রধানপ্রকৃতিবিশিষ্ট অসুর বিনাশের জন্য তামসী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। মহাকালীই যোগনিদ্রা, মহামায়া। কালিকাপুরাণে (৬।৫৯) ব্রহ্মা মদনকে যোগনিদ্রার এইরূপ বর্ণনা দিতেছেন—'যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর ও অধোদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অন্তর্হিতা হন তাঁহারই নাম যোগনিদ্রা।' দেবীভাগবতে (১।২।১৯-২০) আছে, 'যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও মঙ্গলরূপিণী, ধ্যানগম্যা, বিশ্বা-ধারা ও তুরীয়া, তাঁহারই তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী শক্তি যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীরূপে আবির্ভূতা।"

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিতে উক্ত মধুকৈটভ-বধোপাখ্যানটী দেবীভাগবতের ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত আকারে পাওয়া যায়। শৌনক প্রমুখ ঋষিগণ সূতসমীপে মধুকৈটভ যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্নপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

মূর্খেণ সহ সংযোগো বিষাদপি সুদুর্জরঃ।
বিজ্ঞেন সহ সংযোগো সুধারসসমঃ স্মৃতঃ॥ ৬।৫

অর্থাৎ ইহ সংসারে বিষ প্রায়ই অজরণীয় বটে; কিন্তু মূর্খের সংসর্গ তাহা অপেক্ষাও দুর্জর। তেমনি প্রাজ্ঞের সহিত সংযোগকে পণ্ডিতগণ অমৃতরসতুল্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ঋষি-গণের প্রশ্নোত্তরে সূত তাঁহাদিগকে দানবদ্বয়ের উৎপত্তি এবং স্বোৎপত্তির কারণানুসন্ধান-বিষয়ে

এইভাবে বলিয়াছিলেন: মহাকায় মহাবীর ক্রুর-প্রকৃতি দানবদ্বয় একার্ণবসলিলে শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়প্লাবিত সাগরমধ্যে পরিবর্ধিত হইল। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ কারণসলিলে ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে মনে মনে ভাবিল, 'এই অসীম জলরাশি কে সৃষ্টি করিল? আমরাই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইলাম?' তাহারা এই প্রকার বিচার করিয়া বুঝিল, অনির্বচনীয় শক্তিই এই সকলের মূলীভূত কারণ। যখন বিচারশীল অসুরদ্বয় এই দুষ্প্রাপ্য বোধ লাভে সমর্থ হইল, তখন একটী মনোহর বাগ্‌বীজময় আকাশে সুশ্রুত হইল। শ্রুত মন্ত্রটী উপদেশরূপে গ্রহণ-পূর্বক তাহারা উহা জপ করিতে লাগিল। দৃঢ়াভ্যাসের ফলে জপ্ত মন্ত্রটী সৌদামিনীরূপে আকাশে সমুদিত হইল। সেই সময় তাহারা গগনে মাল্য-পুস্তক-পাশাঙ্কুশধারিণী সরস্বতীর সগুণ ধ্যানমূর্তি দর্শন করিল। তাহারা নিরাহার, জিতাত্মা, তন্মনস্ক ও সমাহিত হইয়া দেবীর মন্ত্রজপে ও মূর্তিধ্যানে ব্রতী হইল। এইরূপে দীর্ঘকাল কঠোর অনুষ্ঠানে কাটাইবার পর পরমা চিৎশক্তিরূপিণী তাহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া আকাশাভ্যন্তরে অদৃশ্য থাকিয়া তাহাদিগের অনুগ্রহার্থ অশরীরিণী বাণী উচ্চারণ করিলেন, 'রে দৈত্যদ্বয়, তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্টা হইয়াছি। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।' তপঃক্লিষ্ট দানবদ্বয় আকাশবাণী শ্রবণান্তে স্বেচ্ছামৃত্যু-বর প্রার্থনা করিল। দেবী কহিলেন, 'মৎপ্রসাদে তোমাদের ইচ্ছামত মরণ হইবে। তোমরা উভয়ে সুরাসুরের অজেয় হইবে।' দেবীর নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া দুর্দান্ত মধুকৈটভ মদগর্বিত ভাবে প্রলয়সাগর-মধ্যে জলজন্তুগণের সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইভাবে ভ্রমণকালে যোগানিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত শুভাসন পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র প্রস্থান করিতে বলিল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে যখন বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন না, তখন তিনি বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন।

দেবীভাগবতে ব্রহ্মার যে স্তব আছে তাহা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রাপ্ত ব্রহ্মার স্তব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; অথচ ইহা অতি সুন্দর ও সারগর্ভ। স্তবটীর সরল অনুবাদ এই—"হে মাতঃ, এই অখিল জগতে আপনিই যে একমাত্র কারণ তাহা আমি বেদবাক্যাবলী হইতে জানিয়াছি। তাহাতে আবার সমগ্র লোক-মধ্যে সমধিক শক্তিমান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও যখন আপনি এই প্রলয়-কালে নিদ্রায় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন তখন আর সে বিষয়ে সংশয় কি? জননি, আপনি স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও অখিল জীবের মনোময় মন্দিরে সর্বক্ষণ বিরাজিতা থাকিয়া যে সমস্ত লোকমোহকর বিলাসরূপ লীলা করিয়া থাকেন, আমি বিষ্ণু ও শিব সর্বদেবের বরিষ্ঠ হইলেও সে সকল বুঝিতে পারি না। অধিক কি, আমি ত একেবারেই বিমোহিত হইতেছি। আবার লোকনাথ হরিও বিবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রায় অভিভূত। তখন আমাদের অধীন এই বিশ্ব-সংসারে কোটি কোটি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ-মধ্যে এইরূপ জ্ঞানিপ্রবর কে আছে যে, আপনার ঈদৃশ অনির্বচনীয় মায়াবিলাস-লীলায় বিমূঢ় না হইয়া তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে? সাংখ্যবাদী পণ্ডিত-গণ বলেন, পুরুষ বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কোন কার্যই তিনি করেন না। যিনি ত্রিগুণপ্রধানা জড়স্বভাবা প্রকৃতি তিনিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। অম্বিকে, সত্যসত্যই কি আপনি জড়রূপিণী? তাহা হইলে আপনি এই প্রলয় সময়ে কি প্রকারে

জগন্নিবাস ভগবান্ বাসুদেবকে অচেতন করিয়া রাখিলেন? ভগবতি! আপনি স্বরূপতঃ নির্গুণ বিশুদ্ধচৈতন্য-স্বভাবা হইলেও মুনিগণ আপনাকে প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে সন্ধ্যা এইরূপ নাম কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন। হে ভবানি, আপনি সগুণরূপা হইয়া সৃষ্ট্যাদিকালে যে বিবিধ নাট্যলীলার বিস্তার করেন সেই সমস্তের কার্য-কারণযোগসম্বন্ধ কেহই সম্যকরূপে বিদিত নহেন। দেবি, এই জগতীতলে আপনিই জ্ঞানদায়িনী বুদ্ধিস্বরূপা। আপনি সুরগণের সুখদাত্রী। মাতঃ, অধিক কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারের জীবনিবহে আপনিই একমাত্র কীর্তি, মতি, স্মৃতি, কান্তি, শ্রদ্ধা এবং রতি। ফলতঃ এই ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই আপনি। মাতঃ, এই অনন্ত বিশ্বের আপনিই যে যথার্থ জননী তাহা আমি বিষমসঙ্কটাপন্ন হইয়া যোগনিদ্রাবিচেতন ভগবান বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিতে যাইয়াই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব, আর ইহার অধিক বিবিধতর্কজালনিষ্পন্ন অনুমানাদি প্রমাণ কি জন্য গ্রহণ করিব? কেননা, লোকে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে অপর প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে ইহা একপ্রকার চিরসিদ্ধান্ত আছে। পরন্তু হে দেবি! যখন শ্রুতিসকলও আপনাকে সর্বতোভাবে জানিতে সমর্থ নহেন তখন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আপনাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হইবেন! কারণ, কার্যজাত এই অখিল জগৎ বা বেদসমূহ সমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন, তাহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ রহিয়াছে। হে অম্বিকে, আপনার অখিল কার্যকলাপ আমার মানসসঞ্জাত পুত্র নারদাদি বা অপরাপর মহর্ষিগণ কেহই জানিতে সমর্থ নহে। অধিক কি? ভগবান হরি, ভব বা আমি যখন বুঝিতে পারি নাই তখন ভূতলমধ্যে এরূপ প্রজ্ঞাবান পুরুষ কে আছে যে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? বস্তুতঃ এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আপনার মহিমা অনির্বচনীয়। দেবি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞক্রিয়াস্থলে 'স্বাহা' এই বেদমন্ত্রটী উচ্চারণ না করিতেন তাহা হইলে সহস্র সহস্র আহুতি প্রদত্ত হইলেও দেবগণ কোন কালেই স্ব স্ব প্রাপ্য ক্রতুভাগ পাইতে সমর্থ হইতেন না। অতএব আপনি স্বাহাশক্তিরূপে যজ্ঞীয় হব্যদ্বারা আমাদিগেরও জীবনযাত্রা নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। ভগবতি, পূর্বকল্পেও আমাদিগকে দুর্দান্তদৈত্যসম্ভূত ভয় হইতে আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন। বরদে, এবারেও সেইরূপ এই ঘোরমূর্তি মধুকৈটভকে দেখিয়া ভয়ে কাতর হইয়াই আপনার শরণাগত হইতেছি। দেবি, যদিও ভগবান বিষ্ণু এই লোকের পালয়িতা তবুও আপনি যোগনিদ্রারূপে ইহার সমস্ত দেহাবয়ব-গুলিকে এতদুর বিবশ করিয়াছেন যে, তিনি যেন একেবারে জড়পিণ্ড হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। সুতরাং ইনি আমার এতাদৃশ দুঃখের বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। অতএব হে অম্বিকে! হয় এই আদিদেব বিষ্ণুকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করুন, না হয় এই প্রচণ্ড দানব-দ্বয়কে স্বয়ং সংহার করুন। মাতঃ, এ জগতে যখন আপনিই একমাত্র অনন্তপ্রভাবসম্পন্ন, তখন এবিষয়ে আর আমি আপনাকে কি জানাইব? আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন। দেবি, যে সমস্ত দুর্মতিগণ আপনার পরম প্রভাব বিদিত নহে, তাহারাই হরিহরাদির ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু জননি, এক্ষণে যখন ভগবান বিষ্ণুও নিদ্রিত আছেন, তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি যে, ইহ জগতে আপনিই একমাত্র পরমারাধ্যা। অধিক কি, এই হরি আপনার প্রভাবে এতদুর নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন যে, এক্ষণে সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীও নিজ পতিকে প্রবোধিত করিতে সমর্থা নহেন। ভগবতি, আমার

বোধহয়, আপনি রমাদেবীকে বলপূর্বক নিদ্রার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্য তিনিও অবশেন্দ্রিয়ের ন্যায় অবস্থিতা, সুতরাং প্রবোধলাভ করিতে পারিতেছেন না। হে দেবি, এই ভূমণ্ডলে যাহারা অপর দেবতার ভজন পরিত্যাগপূর্বক আপনাকেই সর্বতোভাবে সর্বকামনাপূরণকারিণী ও সর্ব-জননীরূপা জানিয়া আপনার চরণে বিলীনান্তঃকরণ এবং একান্তভক্তিপরায়ণ হইয়া আপনাকে ভজন করিয়া থাকে তাহারাই ধন্য। ভগবতি, ইহ জগতে আপনিই পরমপূজনীয়া। কারণ, তাদৃশপ্রভাবসম্পন্ন এই হরিও আপনার যোগ-নিদ্রাশক্তির অনতিক্রমণীয় প্রভাবে বন্দীকৃতের ন্যায় রহিয়াছেন। হায়! সেই মতি, কান্তি বা কীর্তি প্রভৃতি শুভ বৃত্তিগুলি বিষ্ণুকে পরিহার পূর্বক কোথায় পলায়ন করিল? জননি! এই সমস্ত জগতের আপনিই সর্বশক্তিরূপিণী। আপনিই অখিল প্রভাবের আধারভূতা। এই অনন্ত বিশ্বে উৎপদ্যমান বস্তুমাত্রই আপনা হইতে উৎপন্ন। দেবি, নাট্যাভিনেতা যেমন স্বরূপতঃ একরূপ থাকিয়াই রঙ্গভূমে আসিয়া আবশ্যকমত নিজের নানারূপ দেখাইতে থাকে, সেইরূপ আপনিও এই মোহজালময় সংসারনাট্যভূমিতে স্বরূপতঃ নিত্যা অবিকৃতা থাকিয়াই নানারূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। হে অম্বিকে, আদি যুগে বিষ্ণুকে প্রকাশিত করিয়া জগৎপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিমল সাত্ত্বিকী শক্তি প্রদানপূর্বক অখিল সংসার রক্ষা করিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে তাঁহাকেই নিদ্রাভিভূত রাখিয়াছেন। মাতঃ, আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করিয়া থাকেন। তাহাতে অপরের কি সাধ্য আছে যে, ইহার অন্যথা করিতে পারে? ভগবতি, এই জগতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া যদি বিনাশ করিবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে মৌন-ভাব ত্যাগ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন। হে ভবানি, আপনি কী নিমিত্তই বা এই কালস্বরূপ অসুরদ্বয়কে উৎপাদন করিয়াছেন তাহা জানি না। অথবা বোধ হয়, মাতঃ, আপনি আমাকে উপহাসাস্পদ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছেন। জননি, আমি আপনার অদ্ভুত কার্যকলাপ অবগত হইয়াছি। কারণ, আপনি এই অখিল জগতের উৎপাদন করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে রমণ করিয়া থাকেন। আবার কালে অবলীলাক্রমে এই সমস্ত সংসার আপনাতে বিলীন করেন। অতএব হে ভবানি, এইরূপ স্থলে যদি আমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? হে অম্বিকে, যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদের হস্তে এই দণ্ডেই আমার বধকার্য সম্পন্ন করুন। মরণ জন্য আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। তবে এইমাত্র আক্ষেপ যে, আপনিই প্রথমেই আমাকে এই সৃষ্টির কর্তারূপে উৎপাদিত করিয়া যদি দৈত্যহস্তে নিপাতিত করেন, তাহা হইলে এই গুরুতর অপযশ আপনারই জানিবেন। দেবি, আপনার সমস্ত লীলা বালক্রীড়াবৎ তাহা আমি জানি। এক্ষণে উত্থান করুন। করালকালীরূপ ধারণপূর্বক হয় আমাকে, না হয় এই দৈত্যদ্বয়কে সংহার করুন। ফলতঃ, আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করুন। যদি আপনি স্বয়ং সংহার না করেন তাহা হইলে যিনি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ, সেই হরিকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করুন। মাতঃ, আমি জানি, এই জগতের কার্যকলাপই আপনার আয়ত্ত।"

ব্রহ্মার স্তবে দেবী বিষ্ণুর সর্বাবয়ব হইতে আবির্ভূতা হইয়া আকাশে অবস্থিতা হইলেন। বিষ্ণু যোগনিদ্রামুক্ত হইয়া মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অসুরদ্বয়কে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত ও বধ করিতে অক্ষম হইয়া দেবীর শরণাপন্ন

হইলেন। তিনি দেবীকে স্তব করিলেন। বিষ্ণুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাকালী তামসী দেবী রণাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া প্রথম হাস্য করিলেন। পরে আরক্ত নয়নে সেই অসুরদ্বয়ের প্রতি মন্দস্মিতযুক্ত দ্বিতীয়কন্দর্পশরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন। পাপিষ্ঠ মধুকৈটভ মন্মথবাণ-প্রপীড়িত হইয়া দেবীর প্রতি একাগ্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্বক জড়ের ন্যায় সেই স্থলে অবস্থিত রহিল। অসুরদ্বয় দেবী কর্তৃক একেবারে বিমোহিত হইল। বিষ্ণু তাহাদিগকে বর দিতে চাহিলে তাহারা বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিল। বিষ্ণু তখন উভয়কে তাঁহার হস্তে মৃত্যুবর লইতে বলিলেন। বিষ্ণু তাহাদিগকে স্বীয় উরু-দেশে স্থাপনপূর্বক সুদর্শনচক্রদ্বারা নিধন করিলেন। অসুরদ্বয় গতাসু হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয়প্লাবিত কারণসাগর তাহাদের মেদদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। সেইজন্য পৃথিবীর নাম মেদিনী। মধুবধের জন্য বিষ্ণুর নাম মধুসূদন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রোক্ত সুরথসমাধি-উপাখ্যানটিও দেবীভগবতের ৫ম স্কন্ধের দ্বাত্রিংশৎ এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত। উহাতে মেধাঋষি এবং তাঁহার আশ্রমের একটী সুন্দর বর্ণনা আছে। সুরথ যখন মুনিবরকে দর্শন করিলেন তখন তিনি শালবৃক্ষতলে মৃগজিনাসনে সমাসীন শান্ত তপসাতি-কৃশ ঋজু, শীত ও গ্রীষ্মে অনভিভূত, শিষ্যগণকে শাস্ত্রাধ্যাপনরত বেদশাস্ত্রার্থদর্শী, ক্রোধলোভাদি-রহিত, বিমৎসর, শমসংযুক্ত ও সত্যবাদী। তাঁহার আশ্রমটী বহুবৃক্ষসমাযুক্ত, নদীপুলিনসংস্থিত, নির্বৈর-শ্বাপদাকীর্ণ, কোকিলারাবমণ্ডিত, শিষ্যাধ্যয়নশব্দাঢ্য, মৃগযূথশতাবৃত, নীবারান্নসুপকাঢ্য, সুপক্কফলপাদপপূর্ণ, হোমধূমসুগন্ধে আমোদিত, বেদধ্বনিসমাক্রান্ত এবং স্বর্গাদপি মনোহর।

প্রথম চরিত্রে মহামায়ার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মধুকৈটভবধে অক্ষম হইয়া দেবীর সাহায্য প্রার্থনাপূর্বক স্তব করিলেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে দেব্যধীন। দেবীর সৃষ্টিশক্তিই ব্রহ্মারূপে এবং পালনীশক্তি বিষ্ণুরূপে কার্যকরী। ত্রিগুণময়ী মহামায়ার তমঃ-শক্তিই শিবরূপে, রজঃশক্তি ব্রহ্মারূপে এবং সত্ত্বশক্তি বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত। তমঃশক্তি সংহার, রজঃশক্তি সৃষ্টি এবং সত্ত্বশক্তি পালন করেন। মধুকৈটভ তমঃশক্তিসম্ভূত। প্রলয়কালে সংহারকর্তা নিষ্ক্রিয় থাকেন; পালনকর্তা বিষ্ণুও যোগনিদ্রাভি-ভূত। সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। তখন মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, তমঃশক্তি রজঃশক্তিকে অভিভূত করিবার উপক্রম করিল। সেই জন্য তামসী দেবী আবির্ভূতা হইলেন এবং সত্ত্বশক্তিরূপ বিষ্ণু তমোজাত অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। সত্ত্ব তমকে অভিভূত করিয়া রজকে ক্রিয়াশীল করিল। নচেৎ সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হইত না। সৃষ্টি আরব্ধ হইলে পালনকর্তার প্রয়োজন। সেইজন্য বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন। সৃষ্টিশক্তি ও পালনী শক্তি সংহার-শক্তিকে প্রলয় পর্যন্ত অভিভূত করিয়া নব কল্পের আরম্ভ করিল। প্রকৃতিতে গুণত্রয় যেরূপে ক্রিয়া করে মানব-জীবনেও তদ্রূপ। তমকে বিনাশ না করিলে রজঃ বা সত্ত্ব প্রভাবশালী হইবে না। এই জন্য ধর্মজীবনের প্রারম্ভে মহাকালীর ধ্যান দ্বারা তমোবিনাশ পূর্বক রজঃ ও সত্ত্বকে ক্রিয়াশীল করিতে হয়। তাহা না হইলে তমোগুণজাত কামক্রোধাদি রিপু এবং কুসংস্কারাদি ধ্বংস করা অসম্ভব। মহাকালীর ধ্যান-অভ্যাস দ্বারা মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর উপাসনার যোগ্যতা সাধক লাভ করেন।

শূদ্রযুগ

সম্পাদক

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।" বিশ্বময় বৈশ্য-প্রভুত্বের পূর্ণ প্লাবনের সময়ে স্বামীজী এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভবিষ্যৎ বাণী বর্তমানে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভারতবর্ষে নয় পরন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রতিপত্তির যুগ বহু কাল পূর্বেই অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হইয়াছে, বৈশ্য-প্রভুত্বের যুগও সকলের চক্ষের সম্মুখে দ্রুতগতিতে অন্তর্হিত হইতেছে এবং শূদ্রপ্রাধান্যের যুগ ক্রমেই ব্যাপকভাবে উহার স্থান অধিকার করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিদ্যা ধর্ম ত্যাগ সংযম পরার্থপরতা প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মণ-জাতি প্রাচীনকালে সমাজের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই মহৎ গুণ গুলিতে এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন যে, আজ পর্যন্তও পৃথিবীর কোন জাতি এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

পরবর্তী কালে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এই গুণাবলী-বিবর্জিত হইয়াও তাঁহাদের জাতিগত প্রাধান্য রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির উপর ক্রমেই অধিকতর বিধি-নিষেধের বোঝা চাপাইতে থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ পুরোহিত-ব্রাহ্মণদের ক্রম-বর্ধমান জাঁকজমকপূর্ণ মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকর্ম ও যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সংঘর্ষের শেষাবস্থায় ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য-বলের উপর ক্ষত্রিয়দের বাহুবল প্রাধান্য লাভ করে। ক্রমে অধিকাংশ গুণহীন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত প্রভাবশালী ক্ষত্রিয় রাজাদের উপাসকে পরিণত হন। ক্ষত্রিয় রাজগণের মধ্যে অনেক ধর্মপ্রাণ ও প্রজারঞ্জক এবং অধিকাংশই উচ্ছৃঙ্খল ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণী ভোগ-বিলাসের জন্য বিত্তশালী বৈশ্যগণকে শোষণ করিয়া তাঁহাদের সম্পদ সংগ্রহ করিতেন। এ জন্য দেশের ধন্য-ধান্যের অধিপতি বৈশ্যগণ অর্থবলে ক্ষত্রিয় রাজশক্তিকে করায়ত্ত করিতে সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু ভারতীয় বৈশ্যজাতি সংঘবদ্ধ ছিল না বলিয়া তাঁহাদের এই চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দেশসমূহের বৈশ্যগণ সংঘবদ্ধ হইয়া অর্থবলে তথাকার রাজ-শক্তিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতীয় বৈশ্যদের মধ্যে অনেকে দানশীল ছিলেন। তাঁহাদের অর্থ-সাহায্যেই ভারতে ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি ও শিল্পাদি পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সকল দেশেই বৈশ্যগণ রাজশক্তি-সাহায্যে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করিতেন এবং এখনও করেন মক্ষিকারূপ অগণন শূদ্রজনসাধারণের বহু কষ্টে তিলে তিলে সঞ্চিত মধুচক্র হইতে।

সংখ্যাবহুল শূদ্রদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব, ক্ষত্রিয়দের শক্তি এবং বৈশ্যদের ধন-ধান্য সম্ভব হইলেও দেশের আপামর শূদ্রজনগণ 'চলমান শ্মশান', 'ভারবাহী পশু' নামে অভিহিত হইয়া বরাবর উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সংহিতা ও পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা

শূদ্রগণকে বিদ্যার্জন, ধর্ম-সাধন, সংস্কৃতিলাভ—এমন কি কোন সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিবার অধিকার হইতেও বরাবর বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। 'ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তাঁহাদের স্বার্থের জন্য এই অত্যাচার সমর্থন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি মিলিয়া শত বিধি ও সহস্র নিষেধের পাষাণচাপে অসহায় শূদ্রগণকে পিষ্ট করিয়াছেন। সম্মুখে নির্মলসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা সত্ত্বেও পয়ঃপ্রণালীর জলপান করিতে এই পশুপ্রায় শূদ্রনরনারীকুলকে বাধ্য করা হইয়াছে! তাঁহাদের বিদ্যালাভ ও ধর্মসাধনের চেষ্টারূপ গুরুতর অপরাধের জন্য তাঁহাদিগকে 'জিহ্বাচ্ছেদ', 'শরীরভেদ' প্রভৃতি দণ্ড প্রদান করা হইত! ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে অগণন শূদ্র-জনসাধারণ হিন্দু হইয়াও হিন্দুধর্ম হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুর মঠ মন্দির প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া মনে করিবার কোন সুযোগ পান নাই। বিদ্যার্জন ও সম্মান-জনক বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্বাহ হইতে তাঁহাদিগকে রাজসহায়ে বঞ্চিত করিয়া রাখায় তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ নরনারীই বর্তমানেও অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আছে। এই কারণেই তাঁহারা অহিন্দু জাতিসমূহের বারংবার ভারত-আক্রমণে সমবেত ভাবে কোন বাধা তো দেনই নাই, বরং স্বজাতি স্বদেশবাসী ও স্বধর্মাবলম্বীদের অত্যাচার অপেক্ষা বিজাতি বিধর্মী ও বিদেশীর অত্যাচার তাঁহারা প্রতিহিংসা-বশে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাস সন্তোষজনক প্রমাণ দেয় যে, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ দেশের শক্ত্যাধার শূদ্রজন-সাধারণ হইতে আপনাদিগকে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই কালক্রমে তাঁহারা সকলেই অধঃপতিত হন এবং তাঁহাদের প্রভুত্ব চিরতরে নষ্ট হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ কর্তৃক শূদ্রাদি নিম্নবর্ণের প্রতি উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যেমন তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, শূদ্রজাতির দোষগুলিরও তেমন নিন্দা করিতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার মতে প্রাচীন ভারতের শূদ্রজাতির উন্নতির আগ্রহ ছিল না, জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল না, উদ্যোগ ছিল না, মনে বল ছিল না, দাসত্বে অরুচি ছিল না, অপমান ও অসম্মানে বেদনাবোধ ছিল না, ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি প্রভৃতির প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এখনও ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষাও শূদ্রাদি নিম্নবর্ণগুলির পরস্পরের মধ্যে অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতা অত্যন্ত প্রবল—জঘন্য। এই সকল নৈসর্গিক কারণে শূদ্রজাতি এত দিন পরাধীন ছিল।

বিদেশী ইংরেজের অধিকারে সর্বপ্রথমে ধর্ম-জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভারতের সকল নর-নারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার এবং উন্নতি লাভের সমান সুযোগ উপস্থিত হয়। এক শ্রেণীর শূদ্রগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া সকল বিষয়ে আপনাদের জন্মগত ন্যায্য অধিকার ক্রমেই অধিকতর সংঘবদ্ধ ভাবে দাবী করিতে থাকেন। ইহার ফলে শূদ্রজাতির মধ্যে জাগরণ আরম্ভ হয়। বিশ্বময় সকল বিষয়ে সকল মানুষের সমান অধিকারমূলক গণতন্ত্রের প্রসার, স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক বেদান্তের একত্ব অভেদই সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শন ও নরনারায়ণ-সেবা-মাহাত্ম্য-প্রচার এবং বহু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইহার অনুসরণ, কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক-প্রজা আন্দোলন, অবনত ও অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নয়ন এবং অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ আন্দোলন, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের প্রসার প্রভৃতি শূদ্র-জাগরণ-আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

এখন শূদ্রগণ আপনাদের জন্মগত স্বত্ব ও

স্বাধিকার সম্বন্ধে ক্রমেই অধিকতর সচেতন হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ক্রমেই অধিকসংখ্যক উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া গুণে ও কর্মে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের সমকক্ষ হইতেছেন। পক্ষান্তরে ইদানীং নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিসমূহের অধিকাংশ নরনারীই গুণে ও কর্মে একেবারে শূদ্রে পরিণত হইয়াছেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্বাহ-প্রণালীতে এই শ্রেণীর সহিত শূদ্রদের কোন বিষয়ে কোন পার্থক্য এখন আর দেখা যায় না। এই কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতে এখন শূদ্র অত্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁহারাই দেশের মেরুদণ্ড—জাতির প্রাণশক্তি। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই সংখ্যা-বহুল শূদ্রগণের অপ্রতিহত প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পরন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ক্রমেই অধিক মাত্রায় গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে সর্বত্র সংখ্যাবহুল শূদ্রজনসাধারণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে সকল দেশেই যে শূদ্রগণের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভারতে শূদ্র-জাগরণ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ দরিদ্র অজ্ঞ অবনত অনুন্নত লাঞ্ছিত শূদ্রগণের উন্নয়নের আবশ্যকতা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করেন। হিন্দুসমাজ-দেহের মহাব্যাধি অস্পৃশ্যতা ও কর্মকৌলীন্য দূরীকরণের জন্যও তিনিই সর্বপ্রথমে চেষ্টা করেন। দেশের উন্নতি —জাতির অভ্যুদয় বলিতে তিনি দেশের আপামর জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া নিম্নে পতিত অবনত ও অনুন্নত জনগণের উন্নতি ও অভ্যুদয় বুঝিতেন। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "গরীব নিম্ন জাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। * * বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এঁরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র—দেশের বাহার।—কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ।" এই কারণে তিনি বহুকাল হইতে সকল বিষয়ে অধিকার-বঞ্চিত দেশের প্রাণশক্তিস্বরূপ নিম্ন পতিত অজ্ঞ দরিদ্র পদদলিত শূদ্রগণকে বিদ্যা ধর্ম সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে সমান অধিকার এবং সর্ববিধ উন্নতি-সাধনে সমান সুযোগ-দানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন— "আমি সমাজতন্ত্রবাদী।" কার্যতঃও তিনি যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদীর ন্যায় দেশের সকল সম্পদে সকল নরনারীর সমান অধিকার বিশেষ জোরের সহিত সমর্থন করিয়াছেন। দেশের জনসাধারণের উপর মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীর প্রাধান্য—সমষ্টির উপর ব্যষ্টির প্রভুত্বের তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টিকে ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্ব অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাঁহাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। * * বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।" স্বামীজীর মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের পতন ঘটিয়াছে—প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে। এখন স্পষ্ট

দেখা যাইতেছে যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্ম দর্শন বিদ্যা ও সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই দেশের আপামর জনসাধারণ ঐগুলি হইতে বঞ্চিত থাকায় তাঁহারা উন্নত হইতে পারেন নাই, দেশও উন্নত হয় নাই।

এই সকল কারণে স্বামী বিবেকানন্দ দেশের প্রাণশক্তি শূদ্র-জনসাধারণ হইতে নব ভারতের অভ্যুদয় কামনা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণসমূহকে সম্বোধন করিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিয়াছেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। * * অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।" যুগধর্মাচার্য স্বামীজী যোগদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের যে ছবি দেখিয়াছিলেন, ইহাই ভাবী ভারতের যথার্থ ছবি।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে শূদ্রজনগণের প্রাধান্য-স্থাপনের ফলে একটি সাংঘাতিক বিপদেরও আশংকা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশংকা ছিল যে, শূদ্র-জনসাধারণ যদি ব্রাহ্মণদের বিদ্যা ধর্ম সংস্কৃতি সত্য ত্যাগ পরার্থপরতা, ক্ষত্রিয়দের শৌর্য বীর্য সভ্যতা এবং বৈশ্যদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি গুণবর্জিত হইয়া শূদ্রধর্ম শূদ্রকর্ম শূদ্রভাব—অসত্য অন্যায় দুর্নীতি প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া দেশে প্রাধান্য লাভ করেন, তাহা হইলে ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ঐ সকল সম্পদ একেবারে বিনষ্ট হইবে এবং ইহার ফলে সমগ্র জাতির অধঃপতন ঘটিবে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে শূদ্রগণের প্রভুত্ব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিশেষত্ব—ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতির প্রতি তাঁহাদের ক্রমবর্ধমান উপেক্ষা দেখা যাইতেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণগুলির অধিকাংশ নরনারীই গুণে ও কর্মে শূদ্রস্তরে নামিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতের বিশেষত্বসমূহের প্রতি উপেক্ষা অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে।

এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভারতের কোন কোন প্রদেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আবরণে স্বেচ্ছাতন্ত্র চলিতেছে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য অসত্য উৎকোচ ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে অধিকাংশ ব্যক্তিই দ্বিধা করিতেছেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে; সে দলও আমাদের দেশে নাই।" কিন্তু তিনি আজ জীবিত থাকিলে দেখিতেন—ইতোমধ্যেই তাঁহার জন্মভূমিতেও সে দলের উদ্ভব হইয়াছে! বর্তমানে দেশের ব্যবসা-ক্ষেত্র হইতে সত্য ধর্ম ন্যায় নীতি প্রভৃতি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন ব্যবসা বলিতে বুঝায়—কণ্ট্রোল পারমিট ভেজাল ব্লাকমার্কেটিং ও স্মাগ্লিং! উচ্চ-নিম্ন উভয় শ্রেণীর হাজার হাজার লোক—যাঁহারা কোন দিন ব্যবসা করেন নাই—তাঁহারাও সুযোগ পাইয়া এই ব্যবসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ব্যাপক দুর্নীতি বন্ধ করিবার ভার যাঁহাদের উপর তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই ইহার সমর্থক বলিয়াই ইহা বন্ধ করা সম্ভব

হইতেছে না! সমাজ-ক্ষেত্রেও সকল বিষয়ে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য শহরে-বন্দরে চক্ষের সম্মুখেই দৃষ্ট হইতেছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে চলিয়াছে দলাদলি স্বার্থ ও প্রভুত্বের তাণ্ডব নৃত্য। আরও দেখা যাইতেছে যে, ইদানীং কারণে ও অকারণে সরকারী বে-সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকগণ দলবদ্ধ ভাবে ধর্মঘট করিয়া নানা বিষয়ে জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছেন না। ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি যেন দেশ হইতে একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে! ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলিও সঙ্গে সঙ্গেই ফলিতেছে। এখন দেশশুদ্ধ লোকের নানা বিষয়ে দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। বর্তমানে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্বাহ করাই অনেকের পক্ষে অত্যন্ত সমস্যাসংকুল হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া দেশ ও সমাজের পদস্থ পরিচালকগণের মধ্যে শূদ্রধর্ম শূদ্রকর্ম শূদ্রভাব শূদ্রনীতি শূদ্রমনোবৃত্তি অর্থাৎ অসত্য অধর্ম অসৎকর্ম অসৎনীতি প্রভৃতির ব্যাপক বিস্তারই এই শোচনীয় পরিস্থিতি-উদ্ভবের একমাত্র কারণ। এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য—ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সমদর্শন ত্যাগ সংযম প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায় যাহাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে, অথচ উহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে উহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে।" দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের দোষগুলি ত্যাগ করিয়া গুণগুলি—বিশেষ করিয়া ভারতের চিরকালের জাতীয় বিশেষত্ব—ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি দেশের জনসাধারণকে দান করিবার উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা এ পর্যন্ত করা হয় নাই। ইংরেজ অধিকারে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে দূরের কথা স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের মধ্যেও এই অমূল্য রত্নরাজি বিতরণ করিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজের অধীনতা এবং ইহার ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এই সম্পদসমূহ দান করিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় ছিল। অবশ্য অতি অল্পসংখ্যক ধর্ম-প্রচারক এই সম্পদরাশি জনসাধারণকে দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তাঁহাদের চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল নাই। বড় বড় শহরে শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এই সম্পদ দান করিবার অতি সামান্য চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু অগণন পল্লীগ্রামসমূহের জন-সাধারণ—বিশেষ করিয়া দরিদ্র অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এইগুলি বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার ফল যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে ইহা স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ধর্ম দর্শন বিদ্যা সংস্কৃতি প্রভৃতি আপামর জনসাধারণকে অকাতরে দান করিবার জন্য শিক্ষিত উচ্চবর্ণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চবর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এত দিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে অবাধ বিদ্যা-চর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও।" কিন্তু তাঁহারা স্বামীজীর এই আকুল আহ্বানে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহাদের অধিকাংশের শূদ্রবর্ণে অবনমনের ইহাও একটি কারণ।

দেশব্যাপী এই কল্পনাতীত শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে শূদ্র-যুগ বরণ করিয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ-নিম্ন—এমন কি অহিন্দু অনার্য নরনারীকেও ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সম্পদ—ধর্ম দর্শন বিদ্যা সংস্কৃতি সাম্য সত্য ন্যায় নীতি প্রভৃতি দান করিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষকে আর্য্যভাবাপন্ন করিলে, আর্য্যাধিকার দিলে, আর্য্যজাতির ধর্মগ্রন্থে ও সাধনে সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলে এই মহা বিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব।" তাঁহার এই অমূল্য উপদেশ সর্বাংশে কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহের পরিচালকগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

বাউল

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

বিশ্বেরে যে দিল নয়ন দেখে না তো নয়ন তাকে
আড়াল থেকে দেয় সে উঁকি আলোছায়ার
ফাঁকে ফাঁকে।
তারি তরে প্রাণ বিরাগী,
গান—সে-ও তার অনুরাগী,
তার বিরহের ব্যথায় জাগি' প্রেম চলে তার
সুদূর ডাকে
বাইরে রঙের মেলায় তো নয়—আলোছায়ার
ফাঁকে ফাঁকে।

তার বাঁশি কি ভালোবাসি? তাই কি রে মন
কেমন করে?
না না—ভালোবাসলে কি সে রইত বেসুর
বরণ ক'রে?
ভুলত কি হায় কথার মায়া
কায়া ছেড়ে জড়িয়ে ছায়া?
বিশ্বে তারে মিলল না যে—ভুলত কি আর
রূপসোহাগে?
খুঁজত তারে অপরূপের আলোছায়ার ফাঁকে ফাঁকে।

বন্ধু তারে জেনে—আজো বন্ধু যে নয় তারে নিয়ে
আর কেন মন গাঁথিস মালা ক্ষণিক আশার
আঁথর দিয়ে?
যা আছে তোর হৃদয়ছায়ে
দে সঁপে তার অভয় পায়ে
বিশ্বে যে তোর চায় মিতালি মর্ম্মে তারি ঢেউ যে লাগে
তার অকূলেই কর্ না বরণ আলোছায়ার
ফাঁকে ফাঁকে।

প্রসারণরত বিশ্ব

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

পৃথিবীর সমুদ্রতটে যত সংখ্যক বালুকণা আছে, এই বিশ্বে নক্ষত্রের সংখ্যাও তদ্রূপ, কোটী কোটী নক্ষত্র লইয়া একটী নীহারিকা গঠিত এবং সমগ্র বিশ্বে কোটী কোটী নীহারিকা বিদ্যমান। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইবার পর অধ্যাপক ডি সিটার এইরূপ অভিমত প্রচার করেন যে আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইবার কথা।

পৃথিবী হইতে পনের শত লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে (আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল অতিক্রম করে, এক বৎসরে যত দূরে যায় তাহা এক আলোক বর্ষ) ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা অবস্থিত। ইহা কিরূপ বেগে দূরে চলিয়া যাইতেছে তাহা নিরূপণ করা সম্ভব এবং ডাঃ হাবল্ ইহার গতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন্। দেখা গিয়াছে যে, নীহারিকা যত দূরে, তাহার অপসরণের বেগও তত বেশী। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার এই যে এই সমস্ত নীহারিকা

আমাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত নীহারিকার গতি সেকেণ্ডে পনর হাজার মাইল। হয়তো ইহা অপেক্ষা বেগশালী নীহারিকা আছে। এইরূপে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে অবশেষে নীহারিকাসমূহ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া যাইবে—দূরবীনের সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হইবে না।

এই অপসরণ হইতে একটা কথা মনে হইতে পারে যেন এই সমস্ত নীহারিকা পৃথিবীর উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াই একযোগে চলিয়া যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার অন্যরূপ। একটা ঘরে অনেক লোক বসিয়া আছে। এখন যদি ঘরটী দ্বিগুণ বড় হইয়া যায় তবে যে কোন দুই জন লোকের মধ্যে দূরত্বও দ্বিগুণ হইবে। ঘরের প্রসারণের ফলেই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইবে, যদিও প্রত্যেকে ভাবিতে পারে যে অপরে তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল। সেইরূপ এই বিশ্বের নীহারিকাসমূহ তাহাদের নক্ষত্রাদি লইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে, সুতরাং যে ছবিটী আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হয় তাহা একটী প্রসারণরত বিশ্বের ছবি। ব্যোম প্রসারিত হইতেছে বলিয়া নীহারিকাসমূহ দূরে চলিয়া যাইতেছে। যেমন একটী রবারের বেলুনকে ফুঁ দিলে ক্রমশঃ বড় হয়, তেমনি সৃষ্টিকর্ত্তা যেন এই বিশ্বরূপ বেলুনকে ফুঁ দিয়া ফাঁপাইয়া দিতেছেন—ফলে নক্ষত্রপুঞ্জ নিজ নিজ স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে দুইটী নীহারিকার মধ্যকার দূরত্ব তের সহস্র লক্ষ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়া যায়। পৃথিবীর উপরের পরিবর্ত্তনের তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডের এই বৃহৎ পরিবর্ত্তন অতিশয় দ্রুত সংঘটিত হইতেছে।

নিউটন বলিয়াছেন, বিশ্বের পদার্থসমূহের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে। মহাকর্ষ বুঝাইতে গিয়া আইনষ্টাইন আপেক্ষিকবাদ-সহায়ে প্রমাণ করিলেন যে পদার্থের মধ্যে বিকর্ষণও আছে এবং পদার্থের মধ্যে দূরত্ব যত বেশী বিকর্ষণও তত বেশী। ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডীয় বিকর্ষণ বলা চলে। দুই গ্রহের মধ্যে এই বিকর্ষণের প্রভাব অপেক্ষা আকর্ষণের প্রভাব বেশী বলিয়া বিকর্ষণ বোঝা যায় না। কিন্তু বহু দূরে অবস্থিত দুইটী নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে বিকর্ষণের প্রভাব অধিক বলিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পরের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়।

নক্ষত্রপুঞ্জ যত দূরে অবস্থিত থাকিবে বিকর্ষণও তত বেশী বলিয়া অপসরণের গতিও তত বৃদ্ধি পাইবে। এখন, পনের শত লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তাহা অপেক্ষা পাঁচগুণ দূরেও নক্ষত্রপুঞ্জ থাকা সম্ভব। কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্বের সঙ্গে গতিও বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে নক্ষত্রপুঞ্জের গতি আলোকের গতির সমান দাঁড়াইতে পারে। আপেক্ষিকবাদ অনুসারে আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা অধিক গতি অসম্ভব। সুতরাং বিশ্ব অনন্ত হইতে পারে না। কারণ অনন্ত হইলে নীহারিকা এতদূরে অবস্থান করিতে পারে যাহাতে ইহার গতি আলোকের গতি অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে। এই জন্য আইনষ্টাইন বলিলেন যে বিশ্ব সীমাবদ্ধ এবং ব্যোম (space) বাঁকা ও গোলাকার (spherical)। ফলে আলোক সোজা পথে চলিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে।

বিশ্ব সসীম কিন্তু ইহার কোন সীমানা নাই। যেমন পৃথিবীর উপরিভাগে সোজা চলিলে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়, কারণ পৃথিবী গোলাকার অথচ কোথাও সীমানা দ্বারা আবদ্ধ নহে, বিশ্বও তদ্রূপ। এডিংটন বলেন যে একটী রবারের বেলুনের উপরে এমন ভাবে কতগুলি কালির বিন্দু দেওয়া হইল যেন প্রত্যেকটী বিন্দুর

চারিদিকে বিন্দু থাকে এবং প্রতি বিন্দুর দূরত্ব প্রতি বিন্দু হইতে সমান হয়। এখন বেলুনকে ফুলাইয়া দিলে বেলুনের রবার প্রসারিত হয় বলিয়াই একটী বিন্দু 'অপরটি হইতে দূরে সরিয়া যায়। সেইরূপ ব্যোমের প্রসারণের ফলেই নীহারিকা দূরে চলিয়া যায়।

ডি সিটার এবং আইনষ্টাইন উভয়েরই কল্পিত বিশ্ব বাঁকা ও গোলাকার। পার্থক্য এই যে ডি সিটারের বিশ্বে নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ দূরে সরিয়া যায়; আইনষ্টাইনের বিশ্বে এইরূপ হইবার কথা নহে। ডি সিটারের বিশ্বে পদার্থ নাই বলিলেই চলে—সেইজন্য অপসরণ ঘটে। অপর পক্ষে আইনষ্টাইনের বিশ্বে পদার্থের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী। সেই কারণে ইহা স্থির। ডি সিটারের বিশ্বে পদার্থসমূহ এত দূরে অবস্থিত যে তাহাদের আকর্ষণ শূন্য, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডীয় বিকর্ষণের ফলে প্রসারিত হইয়া যখন প্রসারণের শেষ সীমায় পৌছিবে, তখন আর প্রসারণ ঘটিবে না। আবার ডি সিটারের বিশ্বে যদি পদার্থের পরিমাণ এইরূপ হয় যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সমান, তখন বিশ্ব স্থির। ইহাই আইনষ্টাইন-কল্পিত বিশ্ব। পদার্থের পরিমাণ আর একটু বেশী হইলেই আকর্ষণ প্রবলতর হইবে, ফলে বিশ্ব সঙ্কুচিত হইবে। আইনষ্টাইনের বিশ্ব নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী—পদার্থ সামান্য বেশী বা কম হইলে সঙ্কোচন বা প্রসারণ ঘটিবে।

সৃষ্টির আদি অবস্থায় সমস্ত বিশ্ব নীহারিকায় পরিব্যাপ্ত ছিল। তখন ইহার প্রতি ঘনফুটে প্রায় ত্রিশটি হাইড্রোজেন পরমাণু অবস্থান করিত। ইহাই ছিল আইনষ্টাইনের কল্পিত বিশ্ব—যে বিশ্ব ছিল স্থির, কারণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সমান। এই বিশ্বের ব্যাসার্দ্ধ ছিল ১০৬৮০ লক্ষ আলোকবর্ষ। কোন বিশেষ প্রাকৃতিক কারণে ঘনীভবন আরম্ভ হইলে নীহারিকা হইতে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি হইতে থাকে এবং বিকর্ষণ বেশী হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রসারণ সুরু হয়। প্রসারণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জ নির্দ্দিষ্ট বেগে অপসারিত হইতেছে। প্রতি ৩.২৬ আলোক বর্ষ দূরে প্রসারণের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩২৭ মাইল।

কসমিক রশ্মি নামে এক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি সুদূর নীহারিকা হইতে পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িতেছে। নীহারিকার প্রোটন ও ইলেকট্রন নিঃশেষিত হইয়া এই রশ্মি উৎপাদন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা সমপরিমাণ আসে। এইজন্য বিজ্ঞানী নিশ্চিত যে ব্যোম গোলাকার না হইলে এরূপ হইতে পারিত না। এইরূপ গোলাকার বিশ্বে আলোকের ব্যবহার বৈচিত্র্য-পূর্ণ। আইনষ্টাইন্ এবং ডি সিটারের বিশ্বের পরিকল্পনায় একটী বিষয় লক্ষিত হয়। আইনষ্টাইনের বিশ্বে আলোক পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে। ডি সিটারের বিশ্বে তাহা সম্ভব নহে। বিশ্বের প্রসারণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আলোক ৬৭০০লক্ষ বৎসরে এক বার বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিত। বিশ্বের সেই অবস্থা যদি আজও বর্তমান থাকিত তবে আজ যে আলোক ব্যোমপথে যাত্রা করিল ৬৭০০লক্ষ বৎসর পর তাহা আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিত এবং ৬৭০০লক্ষ বৎসরের অতীত ঘটনাবলী দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব হইত, অর্থাৎ বর্ত্তমানের সহিত ভূতকেও দেখা যাইত। প্রতি ১৩০০০ লক্ষ বৎসরে বিশ্বের ব্যাসার্দ্ধ দ্বিগুণ হইয়া

যাইতেছে। প্রথম যখন বিশ্ব প্রসারিত হইতে আরম্ভ করে তখন ইহার প্রসারণের বেগ ছিল অল্প, সুতরাং আলোক ঘুরিয়া আসিতে পারিত। যখন প্রসারিত হইয়া ইহার ব্যাসার্দ্ধ ১'০০৩ গুণ বৃদ্ধি পাইল তখন আর আলোকের পরিভ্রমণ করিয়া আসা সম্ভব হইল না। আবার ব্যাসার্দ্ধ ১'০৭৩ গুণ হইলে আলোক বিশ্বের অর্দ্ধেকও যাইতে পারিবে না। সুতরাং বিশ্বে এমন অনেক নক্ষত্র বা নীহারিকা রহিয়া গেল যাহা হইতে আলোক কোনদিনও পৃথিবীতে পৌছিবে না এবং আমাদের নিকট তাহা চিরকালই অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে।

একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিশ্ব যদি সসীম হয় তবে ইহার প্রসারণের জন্য ইহার বাহিরে স্থান না থাকিলে বিশ্ব কিরূপে প্রসারিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে সার্ জেমস্ জীনস্ বলেন যে পদার্থ-বিজ্ঞানের সমস্ত পরীক্ষা বিশেষভাবে প্রমাণিত করে যে বিশ্ব সীমাবদ্ধ এবং প্রসারণরত। যে দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া কোন কোন সমালোচক এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর জড়বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বরহস্যের কিনারা করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে স্থান বা ব্যোম তিন-বিস্তারবিশিষ্ট—যাহা ইউক্লিডের জ্যামিতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতি বিরাট এবং অতি ক্ষুদ্র বস্তুর ক্ষেত্রে ইউক্লিডের জ্যামিতি অচল। পদার্থকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখিলে তাহার অবস্থান নিরূপণ করা চলে না। প্রকৃত পক্ষে স্থান চারিবিস্তারবিশিষ্ট—সে ক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

প্রার্থনা

ব্রহ্মচারী রতন

হে বীর সন্ন্যাসী, হিমালয় চূড় হতে
কন্যাকুমারিকা উঠুক প্রেরণা লভি, তব
তেজোময় ধ্যানদৃষ্টিপাতে। দৃঢ়হস্তপরশনে
মুহূর্ত্তে চূর্ণিত হোক ধরণীর যত
অত্যাচারদর্প। ছিন্ন হোক অজ্ঞান তিমির।
নত হোক দর্পিতের গর্বোদ্ধত শির।
ঝঞ্ঝাসম পড় চাপি অত্যাচারী 'পরে।
অনাচার, পাপ যত—বীভৎসকালিমা
সমাজের, ভস্মে হোক তার অবসান।
আনো বজ্র, আনো শূল, শেল। তমোময়
জড়রাশিপরে করো ভৈরবনর্ত্তন।
যাহা ক্ষণিকের ছায়া, যাহা অন্যায়ের—
দ্বন্দ্বের প্রতীক—দূর হোক চিরদিন তরে।
চিরসনাতন সত্য উঠুক ফুটিয়া—
ভাস্বর অম্লান জ্যোতিরূপে। এই ঘৃণা-
দ্বন্দ্ব-লজ্জা-ভয়-ভরা কাপুরুষতা 'পরে
হানো মরণ-আঘাত। হুহুঙ্কারে চমকিত
করো দশ দিক। অন্যায় অত্যাচার করুক
অপেক্ষা চিরবিদায়ের—রুদ্ধশ্বাসে।
গ্লানিময় তমোরাশি ভেদি—উঠুক
নবীন ভারত - নব বীর্য্যবলে বাল-
লীলাপ্রায় করি প্রাচীন উত্থান।
তব বরহস্তপরশনে ভারতীর
লীলাপদ্ম হোক প্রস্ফুটিত।
দাও শক্তি মোরা তব উত্তরপুরুষ,
শিষ্য, পুত্রোপম। দাও শক্তি
মোহগ্রন্থি করিবারে ছেদ। শক্তি দাও
যাহা তুমি দিতে এসেছিলে—নবযুগ-
সন্ধিক্ষণে। সম্মুখের দৃষ্টি আবরিত—
পশ্চাতে বিরাট ব্যবধান। শুধু তুমি
জ্যোতিস্তম্ভ। সে আলোকে রামকৃষ্ণ-
রাজবর্ত্ম ধরি চলে গেছে বহু যাত্রী,
জ্যোতির্ম্ময় লোকপানে। আরো বহু যাবে।
সে আলোক অম্লান দীপ্তিতে বিচ্ছুরিত
রবে—কাল হতে কালান্তর ধরি। সে
বর্ত্ম না হবে পুরাতন। আমি এক
যাত্রী সেই পথে। নিয়ে যাও ধরি
মোর হাত, হে বিরাট! অনন্ত করুণাভরে।

কয়লার খনি ও শ্রমিক-জীবন

ডাঃ জর্জ গ্রেটন্‌

সম্প্রতি কমন্স সভায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ ইউরোপের পুনর্গঠন-পরিকল্পনায় আমেরিকার সাহায্যগ্রহণ-সম্পর্কে বলেন যে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বৃটেনকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ যে উৎপাদনবৃদ্ধি-প্রচেষ্টা বহুলাংশে নির্ভর করছে কয়লার উপর। স্যার স্ট্যাফোর্ড-ক্রিপ্‌সের এই আবেদন ব্যর্থ হয় নি, জাতীয় খনিশ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিরা ইতোমধ্যে তাদের বাৎসরিক সম্মেলনে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করেছে।

মানুষের সমস্ত রকম পেশার মধ্যে কয়লার খনিতে শ্রমিক-বৃত্তিই সবচেয়ে বিপজ্জনক। খনির মধ্যে নানারকমের দুর্ঘটনার ভয় ছাড়াও 'সিলিকোসিস্‌' (Silicosis) পীড়ার (ফুস্‌-ফুসের পীড়া) মত কঠিন পীড়ার আক্রমণের ভয় আছে। এই রোগের প্রতিরোধব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয় নি।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বৃটেনে খনি-শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বৎসরের খনিশ্রমিক-সম্মেলন শ্রমিকদের অসুস্থতা ও আঘাতের জন্য যে নূতন সাহায্যব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনাটি বর্তমান ক্ষতিপূরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত। শিল্পবিশেষের শ্রমিকগণ ও ন্যাশন্যাল কোল্‌ বোর্ড এই অতিরিক্ত সাহায্যব্যবস্থার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে। বৃটেনের খনিগুলি, জাতীয়করণের পর থেকেই ন্যাশন্যাল কোল্‌ বোর্ডের পরিচালনাধীনে আসে এবং সেই থেকে তারা কয়লা-উৎপাদন-বৃদ্ধির কাজে নানাভাবে উৎসাহ-দানের ও শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করে আসছে।

তার ফলে আজকাল প্রত্যেক শ্রমিক খনির মধ্যে কাজের সময় আহত বা অসুস্থ হলে অতিরিক্ত ২০ শিলিং বা ১৩ টাকা ৪ আনা অর্থ-সাহায্য পাবে। শ্রমিকদের বিধবা স্ত্রীও এই অর্থ-সাহায্য পাবার যোগ্য, কেবল ৬০ বৎসর বয়সের কম সন্তানহীনা বিধবারা এই সাহায্য পাবে না। এই নূতন শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থায় বাৎসরিক ব্যয় হবে আনুমানিক ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

দশ বছর আগেও বৃটিশ খনিশ্রমিকরা নিজেদের অবহেলিত এবং সমাজবহির্ভূত বলে মনে করে এসেছে, কিন্তু আজ তারা দেশের কর্মিদলের অগ্রণী, এবং শ্রমিকশক্তির উৎস।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের একটি কারণ এই যে জনসাধারণ যুদ্ধের সময় নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে উপলব্ধি করেছে যে মানুষের জীবনধারণের জন্য যা কিছু অত্যাবশ্যক সবই কয়লার উপর নির্ভরশীল। সমস্ত রকম শক্তি উৎপাদনে কয়লা অপরিহার্য, যে কোন জিনিষ তৈরী করতে হলে কয়লার প্রয়োজন। বৃটিশ চাষীরা কয়লার আনুষঙ্গিক পদার্থ—সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ এমোনিয়াকে মূল্যবান সার হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই বৎসর তার উৎপাদনপরিমাণ প্রায় ৮৫,০০০ টন। তা ছাড়া রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্যাদির মধ্যে কয়লাই বৃটেনের সবচেয়ে বেশী লাভজনক। সেই জন্য আজ বৃটেনের জনসাধারণ অন্ধকারময় খনিগর্ভ থেকে

যে মানুষটি অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়লা তুলে আনছে তাকে সমাদর করতে শিখেছে। দেশের সমৃদ্ধির জন্য যুদ্ধোত্তর প্রচেষ্টায় তাই খনিশ্রমিক আজ সকলের পুরোভাগে।

উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের সকল রকমে সাহায্য করা হচ্ছে, তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, খনির আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি করা হয়েছে, তা ছাড়া নানা রকমের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও স্বয়ংক্রিয় খননযন্ত্র-ব্যবহারের প্রচলন করে তাদের কঠিন কাজকে কিয়দংশে সহজ করা হয়েছে।

খনি-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নতির চিন্তা করছে 'মাইনস্ মেডিক্যাল সার্ভিস্'। খনির মধ্যস্থিত রোগের কারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে তারা ব্যাপক গবেষণা করছে এবং প্রত্যেক শ্রমিকের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেছে।

পূর্বে শ্রমিকদের সমাজে কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না, তার বিশেষ কারণ বোধ হয় তাদের বাইরের অপরিচ্ছন্নতা। সারাদিনের কাজের পর সাধারণতঃ তাদের অপরিস্কার অবস্থায় বাড়ি ফিরতে হয়। কারণ তখন খনিতে স্নানের ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। কিন্তু আজ বৃটেনের প্রায় প্রত্যেক কয়লা-খনিতে স্নানের সুবন্দোবস্ত আছে। এই রকম পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব অবহেলার নয়।

খনির অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য যানের বন্দোবস্ত আছে। ১০ বছর আগেও কাজ আরম্ভ করার আগে শ্রমিকদের খনির মধ্যে কয়েক মাইল হাঁটতে হত, এই অযথা পরিশ্রম আর তাদের করতে হয় না। তা ছাড়া প্রায় সমস্ত খনিতেই ক্যান্টিন বা ভোজনালয় আছে, এখানে তারা কঠিন পরিশ্রমের জন্য বর্ধিত হারে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট রসদ ছাড়াও প্রয়োজন মত অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

শ্রমিক ও তাদের পরিবারের বসবাসের সুব্যবস্থা করার জন্য সম্প্রতি নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী উত্তর ইংলণ্ডে একটি 'কোল টাউন' (Coal Town) নির্মাণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। বৃটেনের বিখ্যাত শ্রমিকনেতার নামানুসারে শহরটির নাম হবে "পিটার্লি" (Peterlee)।

অতীতে কয়লা বৃটেনের অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল। আজও তার জনসাধারণ কয়লার পূর্ব-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়।*

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

'তোমারে শোনাব গান'

শ্রী প্রণব ঘোষ, বি-এ

তোমারে শোনাব গান,
তারি লাগি বসে আছি দীর্ঘ দিনমান।
হে জীবন-নাথ,
স্মিত-হাস্যে করো তুমি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত।

বীণাতন্ত্রী মম,
উচ্ছলিয়া কলরোলে নির্ঝরিণী-সম,
সহস্র ঝঙ্কারে—
হৃদয় ভরিয়া দিবে গভীর ওঙ্কারে।

আমেরিকার চিঠি

ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, এম্‌-এ, ডি-লিট্

(২)

অপূর্ব শান্তি ও সৌন্দর্যের এই কেন্দ্র থেকে আপনাকে লিখছি—নীচে প্রশান্ত মহাসাগর দিগন্ত অবধি দূরপ্রসারিত, পাহাড়ের উপর অগণ্য ফুল-পল্লবের মধ্যে শান্ত এই আশ্রম। স্বামী প্রভবানন্দের সঙ্গে এখানে আছি—এটি তাঁদের নির্জনাবাস এবং মঠ। এঁরা যে কর্মে নিযুক্ত তাতে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধ্যানের একটি উজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পাই; সমগ্র মানবের কল্যাণে এঁরা নিযুক্ত। আমেরিকার নানা কেন্দ্রে এঁদের কাজ দেখলাম—San Franciscoতে স্বামী অশোকানন্দ বিশিষ্ট কর্মের শক্তি গড়ে তুলেছেন, সেখানে চতুর্দিকে প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে এবং একটি বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়বার জন্যে পাহাড় ও হ্রদের সন্নিকটে সুন্দর বহুপ্রশস্ত জায়গা পেয়েছেন। শ্রদ্ধাশীল একটি ভক্ত এই বহুমূল্য সম্পত্তি দান করেছেন। কিন্তু এই স্বর্গতুল্য জায়গা এবং প্রভবানন্দের এই নিভৃত কর্মের মন্দিরে এসে মুগ্ধ হতে হয়। Los Angelesএ এঁদের ধর্মকেন্দ্র এবং গ্রন্থ-প্রকাশনী-বিভাগ সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ—সেখানে শীঘ্রই যাব এবং আমার নিজের কাজের জন্যে কিছুদিন ঐ সহরের কাছেই থাকতে হবে; কিন্তু Santa Barbaraতে না এলে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা হতে বঞ্চিত হতাম। প্রভবানন্দ যেমন অমায়িক, শান্ত, তেমনি গভীর তাঁর স্বভাব—ধীরে ধীরে সকল বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে তিন দিন তিনি এখানে থাকেন—বাকি ক'দিন Los Angelesএ। এখানে চিরপুষ্পিত বসন্তকাল—গ্রীষ্মেও রাত্রে গায়ে গরম কাপড় দিতে হয় অথচ শীতকালে বরফ পড়ে না—সমানভাবে সূর্যালোক ও স্নিগ্ধ-পরিমণ্ডল সারা বৎসর ধ'রে উপভোগ করা যায়। Santa Barbara ধ্যানমন্দিরের সংসর্গে ভরা—এঁদের স্থানটি দূরে, কিন্তু শহরের চতুর্দিকে Franciscan ও Carmelite Monastery ও Nunnery বহুদিন থেকে আছে।

Aldous Huxley বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত তাঁর বই রচনা শেষ করে Italyতে গেছেন—Octoberএ বইখানি প্রকাশিত হবে—তাঁর সঙ্গে অল্পের জন্যে দেখা হল না। Gerald Heard এখন Hollywoodএ আছেন, তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। ওখানে Thomas Mann-এর সঙ্গেও দেখা হবে। Walt Disneyর সঙ্গে কাছেই Burbankএ দেখা করব। পূর্বে France এ যেমন Europeএর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, আর্ট এবং সভ্যতার বিবিধ উৎকর্ষ প্রকাশিত হত, California এখন অনেকটা সেই স্থান অধিকার করেছে—প্রকৃতির শোভা এবং মহিমাও South France এর মতো, য়ুরোপের নানা মনীষী San Francisco এবং Los Angeles অঞ্চলে আসেন—এখানে উৎকৃষ্ট বেদান্ত-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষের গৌরব এবং য়ুরোপের মুক্তির একটি উপায় নির্ণীত হল।

সামনে Pacific Ocean দেখে মনে হয় এই দিক দিয়ে মহাচীনের পথ এবং আমাদের ভারতবর্ষ! প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। পূর্বদেশে মন চলে যায়—সেইখানে আমাদের পুণ্যভূমি।*

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ তালুকদারকে আমেরিকার সেণ্টা বারবারাতে (ক্যালিফোর্ণিয়া) স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রম হইতে লিখিত।

'পিপাসার বারি তুমি সাহারায়'

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বব্যাপী তুমি চৈতন্য পরম!
জানিছ সবারে হে পুরুষোত্তম!
অণু হতে অণু তুমি পরমাণু,
নূপুরে ঝলিছে কোটী চন্দ্রভানু।
প্রতিটী মানুষ, প্রতি বিহঙ্গম—
পশ্চাতে তার, ওগো প্রিয়তম,
পরিচর্য্যা তব রয়েছে অম্লান।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু ও বিমান
ছিল না যখন—তখনও হে প্রিয়,
ছিলে মাত্র তুমি এক অদ্বিতীয়।
সেই এক হ'তে এলো প্রাণ-মন,
ইন্দ্রিয়-নিচয়, আলো ও পবন।
সূর্য্য দেয় তাপ—সে তোমারই ভয়ে।
মৃত্যু হানা দেয় আলয়ে আলয়ে!
তোমারই আদেশে বহে সমীরণ;
প্রদীপ্ত শিখায় জলে হুতাশন।
হে জ্যোতির জ্যোতি, চন্দ্র-তারা-রবি
তোমারই আলোকে আলোকিত সবই!

* * *

কুরুক্ষেত্রে তুমি গভীর-টঙ্কারে;
তুমি বৃন্দাবনে নূপুর ঝঙ্কারে।
নাচো মৃত্যু নাচ মহাকাল তুমি—
নন্দনবন হয় প্রেতভূমি।
বিষ্ণুরূপে পুনঃ আনো সে শ্মশানে
প্রাণ-গঙ্গা-ধারা বাঁশরীর তানে।
জীবনে মরণে কোথা তুমি নাই?
ব্রজমাঝে তুমি ব্রজের কানাই।

* * *

খ্যাতি-স্বাস্থ্য-রূপ-কামিনী-কাঞ্চন—
অবাস্তব এরা ছায়ারই মতন!
ছায়ার পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ক্লান্তিতে শুধু ভরি উঠে হিয়া।
তাই মানুষের পরিশ্রান্ত মন
অনিত্যের মাঝে খোঁজে নিত্যধন।
সেই নিত্য তুমি! তুমি যে গো মোর
আঁধারের পারে পাখী-ডাকা ভোর!
পিপাসার বারি তুমি সাহারায়!
সঙ্গীত-সুধা নীরন্ধ্র কারায়!
তুমি শক্তি মোর, প্রাণের আরাম,
প্রতি নিঃশ্বাসে লব তব নাম।
তুমি আলো, আশা, পরম আশ্রয়,
জীবনের তুমি আনন্দ, অক্ষয়!
তোমারই মাঝারে জানে মোর প্রাণ
সব বাসনার চির অবসান!
কল্যাণ শুধু তব করুণায়!
অমৃত তোমারই চরণ-ছায়ায়।

* * *

সর্ব্বশক্তিমান, নিখিল ভুবনে
ঘটিছে যা-কিছু সবার পিছনে
তোমারই ইচ্ছা। হে মঙ্গলময়,
যাহা তুমি করো—কিছু মন্দ নয়।
পদপ্রান্তে তব ভিক্ষাঝুলি হাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে অবনত মাথে।
জেনেছি সত্য এ জীবনে সার—
একমাত্র আশা করুণা তোমার!
তুমি জানো—থাকি একাকী যখন,
প্রাণহীন আমি মৃতের মতন।
শক্তি-সিন্ধু হ'তে এক বিন্দু যবে
কৃপা করি দাও—মহাকলরবে
মরা-গাঙে আসে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস,
ছিন্ন হ'য়ে যায় জড়তার পাশ।
দুর্ব্বলতা যত কোথা ভেসে যায়
এক নিমেষের করুণা-ধারায়।
তাই নমো, নমো, নমো শতবার।
তুমি আছ মোর—আমিও তোমার।

অসমীয়া নামসঙ্গীত

শ্রীনিরুপমা বসু, বি-এ

অসমীয়া নামসঙ্গীত ভাবসৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ফল্গুধারা, কিন্তু অনাদর ও উদাসীনতা ইহাকে ক্রমশঃ লোকদৃষ্টির অন্তরালে আকর্ষণ করিতেছে। অসমীয়া লোকসঙ্গীতে নামগানগুলির স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণবশিরোমণি আচার্য্য শঙ্করদেব ও মাধবদেব প্রবর্ত্তিত মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের মতে নামগান ব্যতীত ঈশ্বরোপসনার অন্য পথ নাই।

নামগীতকে অসমীয়া সঙ্গীতের একটী শ্রেণী বলা যাইতে পারে। নামগীতের ভিন্ন কোনও সুর নাই। বিভিন্ন রাগের সহিত কণ্ঠস্বরের নানা ভঙ্গীসহকারে গীত ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই নাম। অসমীয়া শিক্ষিত সমাজে বর্ত্তমানে এই নামসঙ্গীতগুলির আর তেমন আদর দেখা যায় না, কিন্তু অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পল্লীবাসীর মুখপরম্পরায় নানা পূজা পার্ব্বণ ও উৎসবের ভিতর দিয়া এই নামগীতগুলি চিরঞ্জীব হইয়া আছে—খাইতে নাম, শুইতে নাম, উঠিতে নাম, বসিতে নাম, আইনাম, বিয়ানাম, ধাইনাম, বিহুনাম, দেহবিচারের নাম, গোচারণের নাম, আরও কত নাম! এই নামগানের দ্বারাই ধর্ম্মপ্রাণ অসমীয়া পল্লীবাসী পরমেশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করে।

আসামের লক্ষীমপুর, শিবসাগর, নওগাঁও দরং প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের এবং বিভিন্ন সত্রের অধিকারীদের পুণ্যময় আবির্ভাব ও প্রয়াণ তিথিতে অথবা সংক্রান্তি (বিহু) পূজা, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে গ্রাম্য নামঘরে বাদ্যসহযোগে এই নামসঙ্গীতের আসর বসে। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই জাতীয় অসমীয়া নামসঙ্গীত প্রকৃতই অমূল্য। এই নামসঙ্গীতগুলি সরল ও অনাড়ম্বর আসামের পল্লীজীবনের স্বচ্ছ স্বর্ণমুকুর।

আসামের পল্লীবাসিনীদের প্রাণের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের সহিত মাঠ ঘাট বন কান্তার প্লাবিত করিয়া আইনামের মহিমা গীত হইতে থাকে—

"উজাই আহিলে আইরে সাতে ভনী
সাতারি পারেবত জুরি।
তৃণতরুলতা সবে মাথা দোঁয়ায়
আই আহিবরে শুনি॥"

আই অর্থ জন্মমাতা, অন্তরে তাঁহার অফুরন্ত করুণার নির্ঝর।—"আই মাতৃ ভগবতী, আইর মান দয়ালী নাই।"

গ্রামে কাহারও গৃহে বসন্তরোগের বা আইর আবির্ভাব হইলে ভক্তিমতী অসমীয়া মা বৌয়ারী ও ঝিয়ারী একত্র উপবিষ্ট হইয়া আইর পূজোপকরণসহ রোগীকে বেষ্টন করিয়া পুরোহিতের আই-মন্ত্র-পাঠান্তে নামগান জুড়িয়া দেয়—

"ছহর ফুরি আই আহে এ
মালতীরে ফুল।
আম পাতর চাতি মারি
হৃদয় জুর।
স্বর্গর পরা আই আহে এ
লগত আছে তরা
ছুখিয়ালৈ পেলাই দিছে
আয়ে ফুলর মলা।"

এই আইনামে শুধু যে শ্রবণ জুড়ায় তাহা নহে, সংসারের তাপক্লিষ্ট মানবমন এই নামরসে স্নাত ও শীতল হয়। এই জন্যই বোধ হয় আইর নাম শীতলা—

"আইর নাম শীতলা　　তুথীয়ার পুতলা
দি ঘোয়া বুকু জুরাই।"

এই সঙ্গীতগুলিতে আইর আগমন অভাবনীয় মঙ্গলের কারণ এবং তাঁহার বিদায়-গ্রহণ অতীব দুর্ভাগ্যসূচক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে —

"দেবী আইর ঘরখানি সুবর্ণরে কামি হে।
কিবা পূজা দিব লাগে ন জানিলো আমি হে॥
আই আহি উভটিলে দেখিলে জঞ্জাল হে।
আই পাপী ন দেখিলো, অভাগা কপাল হে॥"

অন্যত্র দেখা যায়—

"রাখা রাখা আই! রাখা মায়ার বাযে খায়।
তুমি মাতৃ না রাখিলে রাখোঁতা যে নাই॥
ন যাইবা ন যাইবা মাতৃ! আমাকে ছাড়িয়া।
তুমি তরু, আমি লতা, চলিবো বেড়িয়া॥"

এখানে গভীর ভক্তিরসে মন সিক্ত হইয়া আইর চরণে লীন হইতে চায়। কাব্য-মাধুর্য্যের দিক্ হইতে এই ধরনের নামগীতগুলি যথার্থই অনুপম ও শ্রুত্যভিরাম। যেমন —

"আয়ে স্নান করা　　সোণর পাণীচরা
বই চাই আনিছে বাই,
চরাই হালধীয়া　　আই বিনন্দিয়া
উপমা দিবলৈ নাই।"

আরও—

"আইরে পায়ে মচা,　　কপাহী গামচা
আইরে কলিকটা পীরা।
বর আইয়ে পাচিছে　　সরু আই আহিছে
ফুলঝরী নগরর পরা।"

আসাম বৈষ্ণবপ্রধান দেশ। তাই অসমীয়া লোকসঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক ঘোষা বা নাম-গীতগুলি অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণলীলার সৌরভে আসামের পল্লীগ্রাম বন প্রান্তর আকাশ বাতাস আমোদিত—

"নন্দর ঘরে কানাই তুমি আছিলাহা সরু
কোন সতে নন্দে তোমাক রাখাইছিলা গরু।"

এই পদটি বালক কৃষ্ণের প্রতি ভক্তগণের বাৎসল্যস্নেহের অভিব্যক্তি।

"ধর ধর কলীয়া কলৈ পলায়।
নধরিবি নধরিবি রাধার জোয়াই॥
*　　*　　*
বৃন্দাবনের মাঝে গোসাই আছিলা লুকাই।
ভালে তো গোপিনী কান্দে বিচরি নেপাই॥
সেই থিনিতে আছিলা তেঁও দেখা নিদিলা।
প্রাণর যদুরায়! কিয় দিলা ভকতক দুখ॥"

এখানেও ভক্তগণের হৃদয়ে বিরহবিধুরা ব্রজগোপীদের হৃদয়গন শ্রীকৃষ্ণের নূপুরনিক্বণ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণনামের কি সম্মোহিনী শক্তি! এই নামের বলে কুঁজী বুড়ীর কুঁজ গেল, বুড়ী ধামড়ীও যৌবন ফিরিয়া পাইল —

"গল কুঁজী গল,　　চন্দন পিন্ধিবলৈ গল।
কৃষ্ণর লগ পাই　　কুঁজীধামনী বাই
ষোলবছরীয়া হ'ল।"

উপরোক্ত গীতগুলি ছাড়াও শিব ও শ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক নামগীতগুলিও অতীব শ্রুতিমধুর। এই পদগুলিতে বিশেষ লক্ষণীয় ইহাদের একটি ঘরোয়া ভাব। যেমন—

"ধুমুর ধুমুর খুন্দে ভাঙর গুড়ি।
নন্দীয়ে ভৃঙ্গীয়ে উড়াল মারে
পার্ব্বতীয়ে আয়ে চাল জারে;
ধুমুর ধুমুর ঔ! খুন্দে ভাঙর গুড়ি।"

এখানে ভক্তগণ শিবের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক—ইহাতে শিবচরিত্রের মাহাত্ম্যও রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আবার —

"কি লাগি পগলা হলা মহাদেউ
কি লাগি পগলা হ'লা।
'রাম নামে পগলা হরি নামে পগলা
ভাঙ খাই পগলা হ'লা।"

শুধু ভাঙের নেশাতেই মহাদেব পাগল হন নাই, এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ঈশ্বরের নামকীর্ত্তনেও বিভোর হইয়া আছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তবৃন্দের ভাবাভিব্যক্তির কি অদ্ভুত প্রকাশ—

"রাম রাম রাম রঘুনন্দন।
বালিক বধিলা প্রভু কি কারণ॥
রামচন্দ্র গোসাই তুমি অকার্য্য করিলা।
সীতা মাতৃ ভগবতী বনতে এরিলা॥"

ভগবানের প্রতি ভক্তের দুইটীই গুরুতর অভিযোগ। একদিকে অপরের ভ্রাতৃবিরোধে অযাচিত হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক নির্দ্দোষ বালি-বধ, অপরদিকে অগ্নিপরীক্ষায় সতীত্ব প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও অপাপবিদ্ধা, শুদ্ধসত্ত্বা গর্ভবতী সীতাকে অন্যায়ভাবে বনবাসে প্রেরণ। ভক্তহৃদয় এই পদগুলি দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করিতেছে, কিন্তু এই অভিযোগ কঠোর নয় - করুণ ও কাতর।

আনুষঙ্গিক খোল, করতাল, মেঘমন্দ্রের ন্যায় করতালির রব এবং ভক্তবৃন্দের গগনস্পর্শী রাগ ও তাঁহাদের হৃদয়োৎসারিত ভক্তি-আবেগের অভাবে এই নামগীতগুলির প্রকৃত সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব। অসমীয়া প্রাণের সজীবতা এই দেশজ গানগুলিই রক্ষা করিতেছে।

রাখী

বিমল

ঝুলন পূর্ণিমা প্রাতে
অচেনা পথিক এক, রক্তডোর হাতে
মধুর হাসিটি হেসে কহে অভ্যর্থিয়া—
'দেহ কর, দিব আমি রাখীটি বাঁধিয়া।'
সাধ্য নাই হেন
অযাচিত এ সৌখ্যের স্বচ্ছ আমন্ত্রণ
করি প্রত্যাখ্যান; মোর বাহু পর
রেখে গেল পথচারী নির্মল ভাস্বর
অক্ষয় প্রীতির চিহ্ন। কে জানিত হায়
একটি মুহূর্ত্ত মাঝে হৃদয়ে হৃদয়
এমনি মিলিতে পারে, জাতি কুল মান—
ঐশ্বর্য, বিভব, বিদ্যা, যত ব্যবধান –
নিমেষে টুটিয়া যায়। চিত্ত অবগাহি
বিরাজে নির্মল স্নিগ্ধ প্রেম সর্বজয়ী।
রাখী আজ মোর কাছে
ক্ষণে ক্ষণে যেন উদ্‌ঘাটিছে—
বিশ্বের পরম সত্য অব্যক্ত অস্ফুট
আদি-অন্ত-শূন্য যাহা অব্যয় অটুট—
স্থূল সূক্ষ্ম চরাচরে, সর্বকালে যেই চিরন্তন—
ওতপ্রোত রহে ব্যাপি। দেহ প্রাণ মন—
পুঞ্জিত ক্ষুদ্রতা ভারে, নিরন্তর তারে
রাখিয়াছে ঘিরে।
রাখীর মিতালি সম
অকস্মাৎ হৃদয়ের গূঢ় অনুভবে সেই অনুপম
আমারে দিয়াছে ধরা। অহরহ সে বলিছে
তোমারি আপন-গড়া এ আড়াল মিছে
মানিনা যে তব প্রত্যাখ্যান
চাহ বা না চাহ, আমি করি যাব দান
আমার আপন সত্তা আনন্দ আলোক—
যে দান স্বীকারে তোর মোহ মৃত্যু শোক
নিমেষে ঘুচিয়া যাবে। বৃহৎ জীবন
জন্ম মৃত্যু পারে, নিত্য সত্যে হবে উদ্‌যাপন।

'কৃপা কর'—'কৃপা কর'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সাধনার পথে চলিতে চলিতে মানুষ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বলিয়া চলে—'কৃপা কর'—'কৃপা কর'। অনেক সময় সে ইহা গভীর প্রয়োজনবোধ হইতেই বলে, অনেক সময়েই কিন্তু সে ইহা অভ্যাসবশে আওড়াইয়া যায় মাত্র। বলিবার কোন ক্ষেত্র নাই, প্রয়োজনও নাই, তবুও সে বলিয়া যায়। 'কৃপা কর'—প্রার্থনা তখন একটি নিরর্থক বুলি মাত্র। ঐ বুলি দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হয়ই না—বরং ইহা হৃদয়ের কুটিলতা, দুর্বলতা বাড়াইয়া সাধনপথের গতি ব্যাহত করে।

কৃপার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "কৃপা-বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।" বাস্তবিকই তো অহরহ আমরা অন্তরে বাহিরে চতুর্দিকে ভগবানের অফুরন্ত কৃপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। ভগবান যে আছেন, তিনি যে আমাদের উপলব্ধির যোগ্য—এইটিই কি তাঁহার অসীম কৃপা নয়? তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিয়াছেন—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" সর্বগত আনন্দস্বরূপ তিনি যদি না থাকিতেন তাহা হইলে কে বাঁচিতে পারিত, বাঁচিয়া সুখ পাইত? অতএব তাঁহার অস্তিত্বের আনন্দরূপে পরিব্যাপ্তিটাই তাঁহার কৃপা। এই কৃপা যদি তিনি না করিতেন—অর্থাৎ তিনি যদি না থাকিতেন, আনন্দরূপে যদি তিনি আমাদের কাছে ধরা না দিতেন, তাহা হইলেই বিষম বিপদ ছিল। কিন্তু সে বিপদের তো দূরতম সম্ভাবনাও তিনি রাখেন নাই। তাঁহার অবাধ সত্তা, অকুণ্ঠিত আনন্দ সর্বকালের জন্য, সকলের জন্য তিনি সর্বদাই উন্মুখ রাখিয়াছেন। যে চাহিবে, সেই পাইবে। তবে কেন নিরর্থক ফুকরাইয়া মরি, 'কৃপা কর'—'কৃপা কর'?

ভগবান মানুষ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার অবতারচরিত্রে নানা বিচিত্র কর্ম সংসাধিত হয়, বহুবিধ অদ্ভুত সদ্‌গুণ, অমানব আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পায়। নরদেহধারী ঈশ্বরের এই সব কর্ম, গুণ, চরিত্র চিন্তা করিয়া—তাঁহার সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে পারে। এইটাও কি ভগবানের মানুষের উপর আর এক অসীম কৃপা নয়? সীমাবদ্ধ মানুষের মন ভগবানের ভূমা অস্তিত্ব ও আনন্দ সব সময়ে ধারণা করিতে পারে না—অবতারকে অবলম্বন করিয়া তাহার সেই সাধনা সহজ ও সরল হয়। তিনি যদি অবতার না হইতেন তাহা হইলে সত্যই বিপদ ছিল। কিন্তু না চাহিতে তিনি যুগ যুগ ধরিয়া এই অগাধ কৃপা মানুষকে করিয়া আসিতেছেন—ভবিষ্যতেও করিবেন। সে দিক দিয়া মানুষের কোনই বিপদ নাই, 'কৃপা' চাহিবার অবসর নাই।

'কৃপা কর'—'কৃপা কর' বলিয়া না চেঁচাইয়া, যে অনন্ত অবাধিত কৃপা অযাচিত ভাবে পাইয়াছি তাহা গভীর ভাবে আমরা হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার যদি চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে আমাদের অনেক দৈন্য ঘুচিয়া যাইত, অনেক শান্তি ও আনন্দ লাভ হইত। ভগবান যে সর্বদাই তাঁহার কৃপা দ্বারা আমাদের ঘিরিয়া রাখিয়াছেন ইহা

বুঝিতে গেলে আমাদের তরফে কিছু ত্যাগ-স্বীকারের প্রয়োজন। ভোগ-বাসনাকে শমিত করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়-মনের বহির্মুখীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, 'আমি' 'আমি'—কর্তৃত্বাভিমান কমাইতে হইবে। এই ত্যাগ-স্বীকারের জন্য যে টুকু উদ্যম, সাহস ও পুরুষকার দরকার তাহা আমরা প্রয়োগ করিতে চাই না, তাই বোধ হয় সহজ পন্থা অবলম্বন করি—'কৃপা কর—কৃপা কর'। পুঞ্জীভূত তামসিকতাকে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ভাবিয়া যদি বাঞ্ছিত ফল না পাই, তবে সে দোষ তো আমাদেরই। ধর্মসাধনায় আলস্য, দুর্বলতা, ফাঁকির কোন স্থান নাই। যদি চাহিয়াও না পাইয়া থাকি তো তাহা ভগবানের কৃপার অভাব বলিয়া নয়, আমাদেরই চাহিবার মধ্যে ফাঁকি আছে বলিয়া।

কৃপা তবে কখন চাহিব? নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা-যত্ন অবলম্বন করিয়াও অনেক সময়ে এমন হয়, তত্ত্বদর্শনের কতকগুলি বাধা আমি দূর করিতে পারি না। আমারই কোন দুর্লক্ষ্য ত্রুটী ইহার জন্য দায়ী সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ত্রুটীগুলি আমি নিজে ধরিতে পারিতেছি না। এইরূপ সঙ্কটকালে ভগবৎকৃপা প্রয়োজন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলে প্রকাশস্বরূপ তিনি হৃদয়ের তমঃ দূর করিয়া দেন—আবার নিঃসংশয়ে পথ চলিতে পারি। কিন্তু নিজেকেই চলিতে হয়।

উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিতে হইলে অহংকারের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, এমন কি সূক্ষ্মতম রূপ হইতে মুক্ত হওয়া চাই। 'আমি' 'আমি' করিয়াছি কি তিনি দূরে সরিয়া যাইবেন। এই 'আমি'-কে নিঃশেষে ধ্বংস করিবার জন্য ভগবৎকৃপার প্রয়োজন হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্যতম শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলিতেন—"মা শেষে 'আমি' মুছে দেন।" 'আমি'কে মুছিয়া দিতে 'মা'য়ের দরকার হয়। 'আমি' নিজে উহা পারে না। অর্থাৎ সাধন-জীবনের শেষাশেষি এমন একটা সময় আসে যখন পুরুষকারকে পিছে রাখিয়া কৃপার ভরসা করিতে হয়। "ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব" গানটী গাহিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে ঠাকুর বোধ করি এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। গঙ্গাজলে ডুবিয়া শরীরত্যাগকামী তোতাপুরীকেও শ্রীরামকৃষ্ণরূপী জগদম্বা কি এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন?

এইরূপ আরও কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এইগুলি হইতে বুঝা যায় ধর্ম-জীবনে কৃপার স্থান আছে বটে, কিন্তু যত্র তত্র, যখন তখন নয়। উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুভূতির ক্ষেত্রেই উহার প্রয়োজন ও ক্রিয়া। একটু প্রতিকূল অবস্থার ভ্রূকুটি দেখিয়া যে শুইয়া পড়ে এবং 'কৃপা'—'কৃপা' বলিয়া ডাক ছাড়ে সে কাপুরুষের ধর্মলাভ কঠিন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐরূপ ব্যক্তিকে মেদাটে ভক্ত বলিতেন। মেদাটে ভক্ত বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

উপনিষৎ কি বলেন নাই, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—দুর্বল ব্যক্তি আত্মসত্যকে লাভ করিতে পারে না? গীতায় কি শুনি নাই "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"—নিজেই নিজকে উদ্ধার করিবে? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার—"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।"—অগ্নিময়ী বাণীতে কি ইঙ্গিত দিয়া গেলেন?

কৃপাবাতাস বহিতেছে, অবিরাম, অকৃপণভাবে সত্যই বহিতেছে। বাকী শুধু পাল তুলিবার। ভগবান রহিয়াছেন, মানুষের অনুভবের মধ্যে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। বাকী শুধু তাঁহাকে চাহিবার, পাইবার।

সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীশচীনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ

বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মস্থল ভেদ ক'রে ধ্বনিত হচ্চে বিবিধ ভংগে অভিনব লীলাচ্ছন্দে নিত্যনিয়ত নব নব সুর। ধরিত্রীর চঞ্চল চরণাঘাতে মুখর নূপুর-নিক্কণের তালে তালে স্পন্দিত হচ্চে নয়ন-রঞ্জন অনন্ত নর্ত্তনের সম্মোহন রূপ। এই রূপ ও রসের সম্মিলিত অরূপ অনুরণনকে ভাষার বন্ধনে অপরূপ ক'রে তুলবার প্রয়াস চলচে যুগে যুগে। এ অনুধ্যান কুসুমকোরকের মতো বিকশিত হয়ে উঠলেই হয় সাহিত্য-সৃষ্টি।

সাহিত্য কি—তা বোঝা যতটা সহজ, সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে, ব্যাখ্যা ক'রে তার স্বরূপ অন্যকে বোঝান—ততটা সহজ নয়। বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ চিন্তাসূত্র অবলম্বন ক'রে সাহিত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। তবু খাঁটি সাহিত্য যে একই বস্তু, একই পদার্থ,—সে বিষয়ে বোধ হয় কারও সংশয়ের অবকাশ নেই।

স্থান আর পাত্র ভেদেও সাহিত্যের মূলগত স্বরূপ যে অভিন্ন, সে কথা সাধারণ ভাবে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, কালের চলার বেগে সাহিত্যের ভংগী যে বদ্‌লে যায়, সে কথাও সত্যি, যদিও এ ক্রমবিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় অতি সূক্ষ্ম ধারায়; বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা না করলে তা থেকে যায় বুদ্ধির অগোচরে।

সাহিত্য শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ—সহিতের ভাব। সাহিত্যরচনার মালমসলা মেলে বস্তুবিশ্বে ও জীবনদৃশ্যে। বস্তুবিশ্ব ও জীবনদৃশ্য থেকে লেখক যখন এই মালমসলা মনোজগতে নিয়ে নেন, তখনই তাঁর মনোরাজ্যের কল্পনার রঙে রসে জারিত হয়ে তা এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এইরূপে প্রথমতঃ ঘটে বস্তুজগতের সাথে লেখকের মনোজগতের সাহিত্য। দ্বিতীয়তঃ লেখক এই নতুন মানসী মূর্ত্তিকে ভাষার সাহায্যে রূপ দান করেন,—যে রূপের সাথে ঘটে পাঠকের পরিচয়—তাঁর সাহিত্য। এই ভাবে আগে বস্তুজগতের সংগে লেখকের মনোজগতের সাহিত্য, পরে ভাষার মারফতে তাঁর মনোময়ী মূর্ত্তির সংগে পাঠকের সাহিত্য। বস্তুজগৎ, লেখক ও পাঠক—সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়।

তাই লেখককে পাঠকের দিকে দৃষ্টি রেখে লিখতে হয়। যে রচনা পাঠকের মর্য্যাদা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না, তা সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। রচনার জন্যেই রচনা নয়, লেখকের আত্মরতির জন্যও রচনা নয়। রচনার উদ্দেশ্য মনস্তুষ্টি। আর পাঠকের মনস্তুষ্টি তাঁর আনন্দে। দেহের প্রত্যেক অংগপ্রত্যংগ যেমন আহার্য্য বস্তুর রস পান ক'রে পুষ্টিলাভ করে, মানুষের মনও তেমনি বেঁচে থাকে আনন্দের রসধারায় স্নান ক'রে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে: আনন্দ দান করাই যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে উৎকৃষ্ট বিয়োগান্ত নাটক পড়ে বা তার অভিনয় দেখে লেখকের মনে দুঃখবোধ হয় কেন? এর উত্তর হচ্চে—সুখেরই বিপরীত দুঃখ, দুঃখ আনন্দের বিরোধী নয়। সুখেও আনন্দ—দুঃখেও আনন্দ, বরং দুঃখের পুলকশিহরণ অনুভূত হয় তীব্রভাবে। নায়ক-নায়িকার মর্মভাঙ্গা দুঃসহ দুঃখে অশ্রুভারাক্রান্ত

বেদনাখিন্ন হৃদয় দুলে ওঠে শতদোলায়। নিজের চেতনাকে—আপন সত্তাকে তারই মধ্য দিয়ে করে সে নিবিড়ভাবে অনুভব। পক্ষান্তরে সুখের আবেগ মানুষকে করে তোলে চঞ্চল। এই চাঞ্চল্য তাঁর আত্মানুভূতির ব্যাঘাত ঘটায় বলে আনন্দবোধ তীব্র না হয়ে তরল হয়ে পড়ে। কারণ নিজেকে নিজের পরিপূর্ণরূপে জানাতেই আনন্দ।

মানুষ সুন্দরের পূজারী। কারণ, সুন্দরের দর্শনে সে পায় আনন্দ: আর সাহিত্য করে সুন্দরের সৃষ্টি। কিন্তু, সুন্দর কাকে বলি? কোনো কিছু স্বরূপতঃ একান্তভাবে সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। পারিপার্শ্বিকের সংগে,—স্থান কাল পাত্রের সংগে যদি সে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে মিলিয়ে নিতে পারে, তবেই হয়ে উঠে সে সুন্দর। ভালো শিক্ষককে তাই শিক্ষাগৃহে সুন্দর বলেই মনে হয়; কিন্তু পণ্ডিত হয়েও যদি তিনি অধ্যাপনায় ফাঁকি দিতে সুরু ক'রে দেন, তবেই তিনি হয়ে ওঠেন অসুন্দর।

সাহিত্যের মূলেও তাই লেখকের পক্ষে প্রকাশের আনন্দ—সৃষ্টির আনন্দ। প্রজাসৃষ্টির মূলেও স্রষ্টার নিজেকে বহুর মধ্যে অনুভব করবার আনন্দ—নিজের অস্তিত্ব-ধারাকে নানার মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে বহুর মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার আনন্দ। মানুষের বুদ্ধি আর অনুভূতিও নিজের মনের কথা অপরের মনকে জানাতে চায়—বোঝাতে চায়। সে জানে, বেশী দিন সে জগতে বেঁচে থাকবে না। কিন্তু তার চিত্তগুহা থেকে যে সব ভাবনা, কামনা, ধ্যান-ধারণা অভ্যুত্থিত হয়, তাদের সে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তার রচনার মধ্য দিয়ে। খাঁটি রচনা তার সে উদ্দেশ্য সফলও করতে পারে, কারণ তা শাশ্বত সার্ব্বজনীন।

লেখকদের রচনাগুলোকে দুটো ভিন্ন পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এক ধরনের লেখা জোগায় প্রাণের খাদ্যবস্তু, আর এক রকমের জোগায় মনের। একটি জ্ঞানের উৎস, আর একটি আনন্দের। প্রথমটিকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে জানতে হয়, দ্বিতীয়টিকে করতে হয় হৃদয় দিয়ে অনুভব। একটিকে একবার সম্পূর্ণরূপে জানলেই, তাকে দ্বিতীয়বার আর জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু অন্যটির অনুভূতির বিরাম নেই, একই জিনিষকে নানাভাবে নব নব রূপে বারবার অনুভব করেও শেষ করা যায় না। যেমন,—দিনের শেষে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়;—এ তথ্য যে একবার জেনেচে, তার আর তা দ্বিতীয়বার জানবার কৌতূহল নেই। তবু তাকে আবার নতুন ক'রে জানাতে গেলে, সে বিরক্ত না হয়ে পারে না। কিন্তু, অস্তাচলগামী সূর্য্যের রূপ মানুষের মনে যে বিশেষ ভাবের তরঙ্গ বইয়ে দেয়, তার অনুভূতির শেষ নেই। এই একটি তত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনায় সত্যের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি জাগিয়ে তোলে। চিরপুরাতন হলেও তারা চিরনূতন। যে রচনার উদ্দেশ্য জ্ঞানদান করা, তা ক্ষণকালের। এই ধরনের রচনাগুলো বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। কিন্তু যে রচনার উদ্দেশ্য অনুভূতির সৃষ্টি করা, তা চিরকালের। এগুলো সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

কেউ কেউ বলেন: সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলোকেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করা হয়। আবার কারো কারো মতে সাহিত্য জীবনের ছায়া। ছায়া যেমন কায়ার সত্যিকারের স্বরূপ নয়, তেমনি সাহিত্যের কল্পিত ঘটনাগুলোও বাস্তব জীবনে খুব কমই ঘটে থাকে। কিন্তু সাহিত্যকে বোধ হয়, 'না-জীবন' বললেই ঠিক বলা হবে। বাস্তবে দেখা যায়—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হ'য়ে যায়—অপূর্ণ রয়ে যায়। তার উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা বহু ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে না। তাই মানুষের বাস্তবলোকের ব্যর্থতাকে বিফলতাকে সাহিত্যের কল্পলোকে যে পরিপূর্ণরূপে সফল ক'রে তুলতে চায় তার রচনার মধ্য দিয়ে,—তা হয়ত কোনোদিন বস্তুজগতেও সত্যি হয়ে ফুটে উঠবে—এই আশায় মানুষ জীবনে যা পায় না, সাহিত্যে তাই পেতে চায়। সাহিত্য তাই বুঝি জীবনের পরিপূরক!

লুকোচুরি খেলা

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

আনমনে
চলেছিনু একা,
নাহি যায় দেখা
পথ কোথা হ'ল শেষ।

পথিক ছিল না পথে,
একা আমি
ছায়া মোর ছিল শুধু সাথে।

নীরবে চলেছিনু একা
ভাবনার জাল বুনে
কত কিছু এসেছিল মনে।
পর পর এক এক করি
কত রূপ ধরি।
কখনো সাজানো
কখনো বা এলোমেলো।

সহসা শুনিনু কানে
সুধামাখা সুরে
কে যেন বলিছে ধীরে—
"চেনো নাকি মোরে?
আমি যে গো রহি তব সাথে
ছায়াসম,
অন্তরতম।
চেনো না কি মোরে?"

কহিলাম—"কে গো তুমি, কোথা হ'তে
ডাকো মোরে?
প্রেমভরে—
মনে হয় অতি আপনার
তবে কেন দূরে রহ
কিবা হেতু তার?"

কহিল সে সেই মধুঢালা সুরে
"নহি দূরে,
আছি অতি কাছে তব।
কেন নাহি দেখা পাও
নিজেকে শুধাও।"

কহিলাম—"সে কি কথা তব?
দেখা নাহি দিলে
রহিলে আড়ালে
কোথায় খুঁজিয়া দেখা পাব?"

কহিল সে—"শোনো তবে পরিচয় মোর—
জোছনার স্নিগ্ধ আলো দিয়ে
গড়া মোর তনু।
মোর পদরেণু
যেথা পড়ে সেথা পদ্ম ফুটে ওঠে।
মোর দেহ হ'তে
যে সুরভি ছড়াইয়া যায়
ত্রিভুবন পাগল তার
কণাটুকু লাগি।
সদা জাগে যোগী
দেখা পেতে মোর।
আনন্দে হইয়া ভোর
সদা করি আনন্দের খেলা
এই মোর লীলা—

* * *

কায়া তব করিয়া আড়াল
আছি গো গোপনে।"

কহিলাম—"যদি তুমি আছো এত কাছে
তবে কেন কায়া মোর

ভেঙ্গে নাহি দাও ?
ভালবাসো বলিছ আমায়—
তবে কেন রয়েছো আড়ালে ?"
কহিল সে—"সেই তো আমার খেলা।
জেনে রেখো আজ
কায়া যদি ভেঙ্গে তব
বাহিরিয়া আসি,
দেখিবে আমার রূপ
অতি অপরূপ।
বিভোর হইয়া যাবে সেরূপ হেরিয়া।
লীলা মোর হ'বে অবসান
সেই ক্ষণে।
তুমিও মিশিয়া যাবে
মোর সনে।
আড়ালে রহিয়া তবে
কেমনে করিব মোর লীলা ?
তাই এই লুকোচুরি খেলা।"

অনাবিষ্কৃত ভূভাগে ছাত্র-অভিযান

হেলেন য়্যাষ্ট

বৃটেনের 'পাবলিক স্কুল এক্সপ্লোরিং সোসাইটি'র উদ্যোগে একটি ছাত্রদল নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপের দুরধিগম্য অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে অভিযান করে। ১৯৩২ সালে এই সমিতি গঠিত হওয়ার পর এটি নবম অভিযান এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে ষষ্ঠ অভিযান।

এই অভিযানকারী দলে ৭২ জন ছাত্র ছিল; তাদের মধ্যে অনেকেই মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। এরা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দ্বীপের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানকার গাছপালা ও জীবজন্তর নমুনা, ভূতত্ত্বসংক্রান্ত নানা খবর সংগ্রহ করে এবং দু'শ বর্গমাইল পরিমিত অনাবিষ্কৃত ভূভাগের জরিপ করে। এই অভিযানের ফলে ওই অঞ্চলের একটি বিশদ ম্যাপ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে যাতে ওখানকার নদ নদী, পর্বত ও অন্যান্য ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দেখান হয়েছে। জীবজন্ত, গাছপালা ও ভূতত্ত্বসংক্রান্ত নমুনাগুলি বৃটিশ মিউজিয়মকে দেওয়া হয়েছে।

এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও এই অভিযানের নেতা হলেন কমাণ্ডার মারে়্যা লেভিক্। যুদ্ধের পর এই প্রথম অভিযান। এঁরই নেতৃত্বে পূর্ব পূর্ব অভিযানগুলি চালান হয়েছিল। ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণ মেরুতে শেষ বার যে অভিযান করেন কমাণ্ডার লেভিক্ তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।' ছাত্রদের সঙ্গে বৃটেনের নৌবাহিনীর কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বৃটিশ ইন্‌জিনীয়ারিং কোরের কয়েকজন অফিসার, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কয়েকজন ছাত্র এবং দু'জন ডাক্তার ছিলেন। এদের সঙ্গে নানাবিধ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল।

এই অভিযানকারী দল ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে নোভাস্কোটিয়া জাহাজ থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের রাজধানী সেণ্টজন-এ অবতরণ করে। এই দ্বীপের গভর্নর সরকারী ভাবে এদের অভ্যর্থনা করেন। এখান থেকে এরা ট্রেণে ও মোটরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দুর্গম অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের সীমানায় এসে উপস্থিত হয়।

এর পর সুরু হয় এদের আবিষ্কার-অভিযান। ছাত্ররা প্রথমে নৌকায় করে একটি নদীপথ ধরে অগ্রসর হয়; তারপর একটি পর্বত অতিক্রম করে একটি স্থানে তাদের প্রধান তাঁবু ফেলে। এদের সঙ্গে বহু মোট-ঘাট ছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তাঁবু, রান্নার বাসনপত্র এবং ব্যক্তিগত জিনিষপত্র ছাড়াও এদের সঙ্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য নিতে হয়েছিল।

এই প্রধান আস্তানা থেকে অভিযানকারীরা কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন দিকে যাত্রা করে। ভৌগোলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ, জ্যোতিষ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান, বেতার পরীক্ষা, উদ্ভিদ্, পক্ষিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করা হয়। প্রত্যেক দলের সঙ্গে এক জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। চরম আবহাওয়া, প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি ইত্যাদি মাঝে মাঝে তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল। বিরাট হরিণের পাল তাড়াবার জন্য তাদের কখন কখন বন্দুক ব্যবহারও করতে হয়েছিল। বেতারের সাহায্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে এবং প্রধান ঘাঁটির সঙ্গে ক্যানাডা ও লণ্ডনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হত।

ন' সপ্তাহ পরে ছেলেরা সেণ্টজন-এ ফিরে এল। এই সময়ের মধ্যে সকলেরই স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যে সব ছাত্রের স্কুল আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং পড়ার ক্ষতি হচ্ছিল তাদের বিমান করে লণ্ডনে পৌছে দেয়া হয়।

আজ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ ছাত্র এই ধরনের অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে। অনেক ছেলে বিলাতের পাব্লিক স্কুলগুলির ছাত্র। এই স্কুলগুলি পূর্বে কেবলমাত্র ধনী ও বনেদী বংশের ছেলেদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। এখন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররাও এখানে প্রবেশাধিকার পায়। পূর্বে এই সমিতির নাম ছিল 'পাব্লিক স্কুল এক্সপ্লোরিং সোসাইটি'। এখন এর নূতন নামকরণ হয়েছে 'বৃটিশ স্কুল এক্সপ্লোরিং সোসাইটি'। এইভাবে বৃটেনে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের ছাত্র-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে।

যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের শিক্ষা ও তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অর্থ বা অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে এই ধরনের অভিযানের ফলে ছাত্রদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। ছেলেরা এতদিন বইয়ে যে সব য়্যাড্ভেঞ্চারের কাহিনী পড়ে এসেছে সেই সব তাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ছেলেদের য়্যাড্ভেঞ্চার-তৃষ্ণা নিবারণ করাই এই অভিযানব্যবস্থার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষকরা আশা করেন যে এর দ্বারা বৃটেনের ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক ও ভবিষ্যৎ আবিষ্কার-কের সৃষ্টি হবে।

এই ধরনের অভিযানগুলি ছেলেদের দেহ, মন ও চরিত্র সুগঠিত করতে সাহায্য করে। উদ্যম ও বন্ধুপ্রীতি, ধৈর্য ও আত্মসংযম, অধ্যবসায় ও সহনশীলতা—ছেলেদের চরিত্রে এই সব গুণের বিকাশের সুযোগ ঘটে।

রাজপরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে বৃটেনের এই 'স্কুল এক্সপ্লোরিং সোসাইটির' প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক হচ্ছেন ডিউক অব্ গ্লসেস্টার। কয়েক-জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এবং বৃটেনের নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই সমিতির কাজে সর্বপ্রকার সাহায্য করে থাকেন। *

* ব্রিটিশ ইন্ফরমেসন সারভিসেস্ এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

পূর্ববঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাখ্যানসম্বন্ধীয় কোন কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে তাঁহার পূর্ববঙ্গ-পরিভ্রমণের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে। বৃন্দাবনদাস-রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিত্রের আদি গ্রন্থ—বঙ্গভাষার আদি মহাকাব্য। এই গ্রন্থের আদিখণ্ডে লিখিত আছে—নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যার খ্যাতি যখন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত, তখন তিনি মাতার অনুমতি লইয়া এবং মাতার সেবার নিমিত্ত পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে আদেশ করিয়া শিষ্যবর্গসহ কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশে (পূর্ববঙ্গে) গমন্ করিলেন। পদ্মাবতীর (পদ্মানদীর) তরঙ্গ-শোভা ও পুলিন্-বন দেখিয়া তিনি শিষ্যগণসহ হৃষ্টচিত্তে নদীতে স্নান করিলেন। যত দিন তিনি পদ্মার তীরে ছিলেন প্রতিদিনই জলক্রীড়া করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ মহাপ্রভুর শুভাগমনে ধন্য হইল। অধ্যাপকশিরোমণি নিমাই পণ্ডিত পদ্মার তীরে আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং তাঁহার দিগন্তবিস্তৃত পাণ্ডিত্যের বহুমান করিলেন। পদ্মাতীরবর্তী লোকগণ তাঁহাকে 'মূর্তিমান্ বৃহস্পতি' এবং 'ঈশ্বরের অংশ' জ্ঞানে সম্মান করিলেন। বিদ্যাদান করিতে ও শিষ্য করিতে তাঁহার নিকট 'পঢ়ুয়া'গণ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল এবং তাঁহার 'টিপ্পনী' পঠন-পাঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া নিমাই পণ্ডিত কিছু কাল পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিলেন। সেই ভাগ্যে অদ্যাপি তথাকার স্ত্রী-পুরুষগণ শ্রীচৈতন্যসংকীর্তন করিতেছে। এইরূপে মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে বিদ্বদ্গোষ্ঠী রচনা করিলেন। পূর্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে 'পঢ়ুয়া'রা নিমাই পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে আসিতে লাগিল। তিনি এরূপ কৃপাদৃষ্টির সহিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে দুই মাসে সকলেই বিদ্যার্জন করিতে সমর্থ হইল এবং শত শত জন পদবী লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। এবম্বিধ বিদ্যারসে নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ রায় সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রদত্ত উপহার—বহু সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন, সুরঙ্গ-কম্বল, বসন, উত্তম পদার্থ, অর্থ-বিত্ত সাদরে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অনেক 'পঢ়ুয়া' প্রভুর সহিত নবদ্বীপে পড়িতে গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গে অবস্থান-কালেই তাঁহার প্রথমা ভার্যা লক্ষ্মীদেবী পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

তিনি যখন পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল বাইশ বৎসর এবং তিনি এক খানি সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা লিখিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের কোন কোন টোলে ঐ টীকাখানির পঠন-পাঠন হইত। তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশিক্ষা-কেন্দ্র নদীয়ায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রভূত খ্যাতি ছিল। কিন্তু উত্তরকালে তিনি যে ভারতের একজন প্রধান ধর্মাচার্য ও লোকোত্তর মহাপুরুষরূপে পূজিত হইবেন একথা তখন কেহই ভাবেন নাই। এজন্য যৌবনকালে তিনি যে সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেহ কিছু সযত্নে

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। 'তৃণাপেক্ষাও সুনীচ' তিনি স্বয়ং সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠা বর্জন করিয়া চলিতেন এবং কেহ তাঁহার জীবন-কথা লিখিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাকে নিষেধ করিতেন। ভাবসমাধি হইতে ব্যথিত হইয়া তিনি কৃষ্ণ-প্রসঙ্গেই কালাতিপাত করিতেন, সুতরাং নদীয়ার বাহিরে সংঘটিত তাঁহার বাল্যজীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে উপাদান বা বিবরণ সংগ্রহ করিবার কোন সুযোগ পাওয়া যাইত না। বাহিরের লোকগণের নিকট দিব্য ভাবসমূহ গোপন রাখাই ছিল তাঁহার স্বভাব। এজন্যই তিনি 'অন্তরঙ্গ সঙ্গে রস-আস্বাদন এবং বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম-সংকীর্ত্তন' করিতেন।

উপরে লিখিত কারণ বশতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গের ভ্রমণ-কাহিনীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। 'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থের শেষ আড়াই সর্গে শ্রীচৈতন্য পূর্ববঙ্গের যে সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন উহাদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 'প্রেমবিলাস' নিঃসন্দেহে ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিকতথ্যবহুল বৈষ্ণব গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিশটি সর্গ আছে—ইহা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও জানা ছিল। কিন্তু পরে নাকি উহাতে আরও আড়াই সর্গ সংযোজিত হইয়াছে। এই অতিরিক্ত আড়াই সর্গ মূলগ্রন্থের অঙ্গীভূত কিনা তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া এই আড়াই সর্গে প্রদত্ত বিবরণগুলি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এই সকল বিবরণের কতকগুলি নিঃসন্দেহে সু-প্রমাণিত ঐতিহাসিক তথ্য; ইহাদের লেখক যিনিই হউন না কেন, এগুলি সযত্ন বিবেচনা, সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও গভীর সতর্কতার সহিত আহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না থাকাই উচিত। এই আড়াই সর্গ মূল 'প্রেমবিলাসে'র অন্তর্গত ছিল না বলিয়া কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

'প্রেমবিলাসে' লিখিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীহট্ট পরিদর্শন করেন। এই বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য, কারণ তাঁহার পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ও পিতৃব্যগণ তখনও শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণের অন্যতম কারণ ছিল তাঁহার নিজ বংশের আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎকার। শ্রীহট্ট তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আদি নিবাস। কথিত আছে, তিনি প্রথমতঃ ফরিদপুর পরিদর্শন করেন। এই কথার সমর্থনকল্পে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে অদ্যাবধি এক জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে—শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণকালে কিছুকাল সেই গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। ফরিদপুর হইতে তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে গমন করেন। বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত নূরপুর ও সুবর্ণগ্রাম তিনি পরিদর্শন করেন। বিক্রমপুর হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ অতিক্রম করিয়া তিনি এগারসিন্দুর গ্রামে পদার্পণ করেন। তথা হইতে নিকটবর্তী বেতল এবং তৎকালীন সংস্কৃত শিক্ষার বৃহৎ কেন্দ্র ভিটাদিয়া গ্রামে উপনীত হন। ভিটাদিয়ার অন্যতম প্রথিতযশা পণ্ডিত পদ্মগর্ভ আচার্য বারাণসীতে উপনিষদ্ ও মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং নদীয়ানিবাসী জয়রাম চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পদ্মগর্ভ 'ভ্রমরদীপিকা', 'ব্রাহ্মণ' এবং প্রাকৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র 'পিঙ্গল'—এই গ্রন্থত্রয়ের টীকা রচনা করেন। পদ্মগর্ভের গুরু ছিলেন মাধ্বী সম্প্রদায়ের লক্ষ্মীতীর্থ। লক্ষ্মীতীর্থের শিষ্য ছিলেন স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরী। শ্রীচৈতন্যদেবের ভিটাদিয়া গ্রাম পরিদর্শনকালে পদ্মগর্ভের পুত্র লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী তথায় বাস করিতেন। লাহিড়ীর মাতা নদীয়ায় জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীচৈতন্য স্বভাবতঃই ভিটাদিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং লক্ষ্মীনাথের সহিত কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। ইহা সর্বজনবিদিত যে, লক্ষ্মীনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরুষোত্তম সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বারাণসীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পরবর্তী কালে স্বরূপ-দামোদর নামে প্রখ্যাত হন।

ভিটাদিয়া হইতে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণ (কাহারও মতে বড়গঙ্গা) গ্রামে উপস্থিত হন। তখন তাঁহার পিতামহ জীবিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য পরিবারস্থ বয়োজ্যেষ্ঠগণের সহিত সম্মিলিত হন এবং কথিত আছে তাঁহার পিতামহী কমলাদেবী-প্রদত্ত একটি কাঁটাল আস্বাদন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে অল্প কয়েক দিবস অবস্থানকালে তিনি তাঁহার পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের ব্যবহারের জন্য সংস্কৃত চণ্ডীর একটি অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়াও জনশ্রুতি আছে।

করুণা

শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত, বি-এস্‌সি

কোটি জনমের কত না কামনা
শত জীবনের বিফল বাসনা
মরমে মিশিয়া আছে ঘুমাইয়া
আমি তো সে কথা জানি না!

হয় না আমার স্মরণ-মনন
হয় না আমার কথা-নিবেদন
উঠে চলে আসি ক্লান্ত তিক্ত মন
হৃদয়ে দারুণ বেদনা

তোমার স্মরণ-মনন আশায়
একা যবে আমি বসি নিরালায়,
তারা নেচে ওঠে ঘিরিয়া আমায়
বারণ তাহারা মানে না।

কেঁদে কেঁদে মরি নয়নের জলে,
তুমি যে আমার তাও যাই ভুলে,
তুমি সবই দেখ থাকিয়া আড়ালে
এই কি তোমার করুণা?

প্রাচীনকালের বাস্তু-নির্ব্বাচন

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাসস্থান-নির্ব্বাচনে কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন তাহা জানিতে স্বভাবতঃ কৌতূহল হইয়া থাকে। গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসংহিতা, মৎস্যপুরাণ, বৃহৎসংহিতা, জ্যোতিস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং খনার বচনে স্থানে স্থানে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রামে বাস করাই তখনকার দিনের আদর্শ ছিল। অনন্যোপায় হইলে নগরে বাস করিতে হইত। মহর্ষি বৌধায়ান বলিয়াছেন, যে গ্রামে কাঠ, জল, ঘাস, সমিৎ, কুশ প্রভৃতি সহজেই পাওয়া যায়, যে গ্রামে ধনী এবং অনলস লোকের সংখ্যা বেশী, কর্ম্মঠ আচার-নিষ্ঠ পুরুষ যে গ্রামের শোভা বৰ্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং যে গ্রাম দস্যুজনের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য, সেই গ্রামে বাস করা উচিত (বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র—২।৩।৫১)। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (২।৭।১), দ্রাহ্যায়ণ গৃহ্যসূত্র (২।৪।১) এবং গোভিল গৃহ্যসূত্রেও (৪।৭।২২) একই কথা বলা হইয়াছে। আদর্শ গ্রামেই বাস করা উচিত, এই বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই।

বৌধায়ন বলেন, নগরে বাস করিলে ধর্ম্মকৃত্যে শিথিলতা আসে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। নগরের পথ-ঘাট পবিত্র নয়, অমেধ্য ধূলিকণায় শরীর কলুষিত হয়, সুতরাং নগরে বাস করিয়া সাধনপথে সিদ্ধিলাভ করা যায় না (২।৩।৫৩)। নদীতটে, শ্মশানে, শৈলে, অরণ্যপ্রান্তে এবং দুই নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে নাই (মৎস্যপুরাণ, (২৩০ অ)। ধনী পুরুষ, বেদজ্ঞ আচারপূত ব্রাহ্মণ, আচারনিষ্ঠ বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয়, স্রোতস্বতী নদী এবং বিদ্বান্ সুচিকিৎসক যে গ্রামে নাই, সেই গ্রামে কখনও বাস করিবে না। যেখানে সম্মান নাই, জীবিকানির্ব্বাহের কোন ব্যবস্থা নাই এবং বিদ্যালোচনার কোন ক্ষেত্র নাই, তেমন স্থানে বাস করা কখনও উচিত নয়। যেখানে ঋণদাতা উত্তমর্ণ নাই, সেই স্থানও বর্জ্জনীয়। এইগুলি চাণক্যশতক, মিত্রলাভ প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রের উপদেশ। বাস্তু-নির্ব্বাচনে এই সকল উপদেশের প্রতি সকল কালের সকল মানুষই লক্ষ্য রাখিতেছে এবং রাখিবে।

আজকাল বিলাসব্যসনী রাজা-জমিদার শ্রেণীর লোক অনেক সময় শুধু বিলাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শহরে বাস করিয়া থাকেন, ইহা সত্য হইলেও মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের একটা বড় অংশ জীবিকার্জ্জনের নিমিত্তই কষ্টেসৃষ্টে শহরে থাকিতে বাধ্য হন। সুতরাং নগর-বাস এখন আর নিন্দিত নহে, পরন্তু গ্রামস্থ প্রতিবেশীর কাছে অপর প্রতিবেশীর নগর-বাস একান্তই লোভনীয় এবং ঈর্ষ্যার বস্তু। অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শহরে বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় নীতিশাস্ত্রের কল্পিত আদর্শ গ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়া বর্ত্তমান কালে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

বসতবাটি নির্ম্মাণ করিতে প্রাচীনকালে আরও অনেক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার নিয়ম ছিল। এখনও গ্রামাঞ্চলে নূতন বাড়ী করিতে অনেকেই সেই সকল নিয়ম মানিয়া থাকেন। বঙ্গ ও আসামের অধিকাংশ গ্রামে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সেই সকল নিয়মাবলীর সশ্রদ্ধ অনুসৃতি এখনও চলিতেছে। সুতরাং সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ব্রাহ্মণের বাস্তুভূমি শ্বেতবর্ণ হইলেই ভাল, ক্ষত্রিয়ের লাল, বৈশ্যের পীত বা কৃষ্ণ। শূদ্রের সম্বন্ধে

কিছুই বলা হয় নাই। সম্ভবতঃ সকল প্রকার ভূমিই তাহার পক্ষে শুভ। উর্ব্বর ভূমির উপর বাস্তু নির্ম্মাণ করিতে হয়। বাস্তুভূমিতে নানাবিধ ওষধি, বনস্পতি, লতা প্রভৃতি থাকিবে। লেবু, সুপারী, কাঁটাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বৃক্ষে বাস্তু সুশোভিত হইবে। বাড়ীর পূর্ব্বদিকে বট, দক্ষিণে যজ্ঞডুমুর, পশ্চিমে অশ্বত্থ এবং উত্তরে প্লক্ষ (পাকুড়) থাকিলে ভাল হয়। বিপরীত দিকে এই সকল বৃক্ষের অবস্থিতি শুভ নহে। বাস্তু-ভূমির ভিতরে কোল প্রভৃতি কাঁটাযুক্ত গাছ এবং ছাতিম প্রভৃতি ক্ষীরযুক্ত গাছ থাকা ভাল নহে। বাস্তু-ভূমির পূর্ব্ব এবং উত্তর প্রান্ত অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইবে। দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তকে উচ্চ রাখিতে হইবে। বাড়ীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যদি সমান হয়, অর্থাৎ বাস্তুটি যদি চৌখস হয়, তবে বিশেষ শুভ। অগত্যা অনুরূপ বাস্তু নির্ম্মাণ করিতে হয় (মৎস্যপুরাণ, ২২৯ ও ২৩০ অ এবং বৃহৎসংহিতা ৫৩ অ)।

বাস্তুভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যোগ করিলে যত হাত হইবে, তাহার সহিত তিন যোগ করিয়া আট দ্বারা ভাগ করিতে হয়। ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইবে। এক, দুই, তিন বা চারি অবশিষ্ট থাকিলে অশুভ। পাঁচ, ছয় বা সাত অবশিষ্ট থাকিলে শুভ। যদি কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তবে বিশেষ শুভ বলিয়া জানিতে হইবে। এই গণনাকে বলা হয় বাস্তুর জাতিনির্ণয়।

বাস্তুর জাতিনির্ণয়ের পরেই গৃহারম্ভের ব্যবস্থা। এই সকল বিষয়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। গৃহারম্ভে নাগশুদ্ধি বিষয়ে সকল গৃহস্থই বিশেষ বিবেচনা করিয়া থাকেন। বলা হইয়াছে যে, বাস্তুভূমির নীচে একটি নাগ শয়ন করিয়া আছে। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বাস্তুনাগ পূর্ব্ব দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করে। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে দক্ষিণদিকে। ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া তাহাকে শয়ন করিতে হয়। নাগ সকল সময়েই বামপাশে শয়ন করিয়া থাকে। নাগের উদরভাগে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেই গৃহস্থের শুভ হয়। অন্য কোন অংশে গৃহ করিলে গৃহস্থকে কষ্ট পাইতে হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বাস্তুর দক্ষিণের ভিটায় গৃহ নির্ম্মাণ প্রশস্ত। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে পশ্চিমের ভিটায় এবং ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে উত্তরের ভিটায় ঘর করিলে ভাল হয়। এইরূপে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বের ভিটায় ঘর প্রস্তুত করিলে গৃহস্থের কল্যাণ হইয়া থাকে। নাগশুদ্ধি বিষয়ে সৌর মাসকেই গ্রহণ করিতে হয়।

"পূর্ব্বে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ, উত্তর বে'ড়ে দক্ষিণ ছে'ড়ে,
বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে।"

খনার এই বচন হইতে জানা যাইতেছে, বাস্তুর পূর্ব্বদিকে জলাশয় এবং পশ্চিমদিকে বাঁশ প্রভৃতি থাকিবে। বাস্তুর উত্তর সীমায় গৃহ নির্ম্মাণ করা ভাল। দক্ষিণের দিকে কিছুটা জমি ফাঁকা রাখিতে হইবে।

বৃহৎসংহিতার মতে (৫৩।১১৮) বাস্তুভূমির ঈশানকোণে দেবগৃহ, অগ্নিকোণে রন্ধনশালা, নৈঋর্তকোণে গৃহস্থালীর ভাণ্ডার ও বায়ুকোণে কোষাগার নির্ম্মাণ করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়।

প্রত্যেক ঘরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে ঘরের মাপে এক তৃতীয়াংশ ভূমি ফাঁকা রাখিতে হইবে। এই ত্রিভাগতুল্য ভূমির নাম বীথিকা। বাস্তুভূমির উত্তর ও পূর্ব্বের ভিটায় ঘর না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিমের ভিটায় ঘর না থাকিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে (বৃহৎসংহিতা, ৫৩।৩৭-৩৮)।

আলোচিত নিয়মাবলীর মধ্যে দুই তিনটি ব্যতীত অন্যান্য নিয়মের বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু বঙ্গ ও আসামের গ্রামাঞ্চলের গৃহস্থগণ এই সকল নিয়মের প্রতি পরমশ্রদ্ধাশীল।

মূলান্বেষণ

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

উপনিষদের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"সন্মূলাঃ সৌম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ"। * * "নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি।"—হে সৌম্য! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও নিখিল প্রাণিবর্গ সৎ হইতে সমুৎপন্ন। * * ইহা মূলশূন্য নহে, অর্থাৎ ইহার একটী কারণ আছে। কোন্ অনাদিকালে স্নিগ্ধশান্ত তপোবনের নিভৃত কুটীরে বসিয়া ঋষি উদ্দালক পাণ্ডিত্যাভিমানী তাঁহার পুত্রকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ইতিহাসের বিলীয়মান পৃষ্ঠায় ইহার কোনই নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষির এই অমোঘ বাণী যুগযুগান্ত ধরিয়া মানবসমাজে মনীষিবৃন্দের বহু চিন্তার খোরাক যোগাইয়া আসিতেছে। বিশ্ববরেণ্য বহু মনীষী, সাধক ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জীবনের সমস্ত সাধনা দ্বারা এই বাণীর অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াসে অনেক জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব-মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। অনেকে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেও আজ পর্য্যন্ত এই তত্ত্বানুসন্ধানের বিরাম ঘটে নাই, বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও এই বাণীর অন্তর্নিহিত গভীর রহস্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে—এইরূপ দম্ভোক্তি করিতে কেহই সাহসী হন না।

ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাক্ মহর্ষির এই শাশ্বত বাণী অনাদিকাল হইতেই মানব-মনে কয়েকটী প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিয়াছে। প্রশ্নগুলি—এই জগতের মূলীভূত সেই সদ্‌বস্তুর স্বরূপ কি? তাহা নিত্য অথবা অনিত্য? এক অথবা বহু? সদ্‌বস্তু হইতে কি ভাবেই বা অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশাল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে?

উপনিষদের ঋষি নিজেই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু ঋষিকথিত সমাধানসূচক বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত ও জটিল হওয়ায় মানুষের প্রকৃতি ও বুদ্ধির বিভিন্নতার ফলে ঐ সমস্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। সুতরাং এই চিরন্তন প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানাদেশে অনেক জ্ঞানতপস্বী নিজের সমগ্র জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনা করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজও সেই সাধনার শেষ হয় নাই, এখনও তত্ত্ব আবিষ্কারের শেষ সীমা-রেখা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ভারতীয় দার্শনিকগণ এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম আলোচনা করিতেই আমরা চেষ্টা করিব।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় বেদের প্রতি আস্থাশীল নহেন, সুতরাং উপনিষদ্‌বর্ণিত তত্ত্বের আলোচনায় এই নাস্তিকসম্প্রদায়ের মত পরিহার করিলাম।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণের প্রচলিত মত-সমূহ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ এবং সৎকারণবাদ।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সম্প্রদায় বলেন—অতি সূক্ষ্ম, নিরবয়ব পরমাণুই জগতের মূল কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণুসমূহ পরস্পর বিশ্লিষ্ট

অবস্থায় থাকে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে জীবের অদৃষ্ট অনুসারে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুর ভিতর স্পন্দন জাগে। তাহার ফলে একটী পরমাণুর সহিত আর একটী পরমাণুর সংযোগ হওয়ায় একটি দ্ব্যণুক জন্মে। ঐরূপ তিনটি দ্ব্যণুক মিলিত হইয়া একটি ত্রসরেণু সৃষ্ট হয়। এই ভাবে ক্রমশঃ স্থূলাকারে পরিণত হইয়া জাগতিক জন্যপদার্থসমূহের সৃষ্টি হয়। এই পরমাণু নিত্য, অর্থাৎ ইহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই এবং ইহা অনেক। ন্যায় ও বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে উপনিষদ্-বর্ণিত সৎপদার্থ বলিতে পরমাণুকেই বুঝায়। ইঁহাদের মতে যে বস্তুটি জন্মে, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা সম্পূর্ণ অসৎ অর্থাৎ কোন রকম সত্তাই তাহার থাকে না। উৎপত্তির পরেই তাহা সৎ বা অস্তিত্বশীল হইয়া থাকে। যে বস্তুটি কারণ হইবে তাহা নিত্যই হউক অথবা অনিত্যই হউক কার্য্য-বস্তুটি জন্মিবার পূর্ব্বে তাহা থাকে বলিয়া তাহা সৎ। যেমন—ঘটের কারণ কপাল (ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে মাটি দিয়া প্রথম ঘটের উপরের অংশ ও নীচের অংশ আলাদা তৈরি করা হয়। ন্যায়ের ভাষায় তাহাকে কপাল-কপালিকা বলে)। কপাল অনিত্য বস্তু হইলেও ঘট জন্মিবার পূর্ব্বে তাহা থাকে বলিয়া তাহা সৎ, কিন্তু জন্মিবার পূর্ব্বে ঘট থাকে না বলিয়া তখন তাহা অসৎ। ইহাদের মতে কারণ হইতে কার্য্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। অসৎ থাকিয়াও বস্তুটি জন্মে এবং জন্মিবার পরে সৎ হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় ইহাদিগকে অসৎকার্য্যবাদী বলে। এই মতে জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে; কিন্তু অনিত্য। এই মতের অপর নাম আরম্ভবাদ।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সিদ্ধান্ত অন্য রকম। কার্য্যটী কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, ফলতঃ অভিন্নই, কিন্তু কার্য্য ও কারণ ঠিক একই রকম নহে, কোন কোন অংশে কার্য্য ও কারণের অভেদ থাকিকেও পরস্পর কিছু কিছু ভেদও আছে। ঘটের কারণ মাটি, মাটি আর ঘট পৃথক্ বস্তু এই কথা বলা যায় না। কারণ মাটিরই বিশেষ একটী অবস্থার নাম ঘট। কিন্তু ঘট আর মাটি ঠিক একই রকম, ইহাও বলা যায় না। কারণ ঘটে করিয়া জল আনা যায়, কিন্তু কেবল মাত্র সাধারণ মাটি দ্বারা ঘটের মত জল আনা চলে না। সুতরাং ঘট আর মাটি ঠিক একই রকমের নহে। ফল কথা এই কার্য্যের সহিত কারণের ভেদও আছে, আবার অভেদও আছে, এই জন্য ইহাদিগকে ভেদা-ভেদবাদী বলা হয়।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মতে কার্য্য ও কারণ ফলতঃ অভিন্ন বলিয়া কারণের ন্যায় কার্য্যও উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ বা বিদ্যমান। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও বস্তু একেবারে অসৎ নহে, তখনও কারণের ভিতরে কার্য্যটী সূক্ষ্মরূপে থাকে। স্থূল-রূপে অভিব্যক্ত হইলেই তখন তাহাকে উৎপন্ন হইয়াছে বলা হয়। অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বে বস্তুটী থাকিলেও সূক্ষ্মরূপে থাকে বলিয়া তাহা দেখা যায় না অথবা ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু বস্তুটী যে প্রকৃতপক্ষেই থাকে ইহা নিশ্চিত। যাহা নাই তাহা জন্মিতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নরশৃঙ্গের উল্লেখ করা চলে। মানুষের শিঙ্ নাই, সুতরাং কোন দিনও মানুষের শিঙ্ গজাইতে পারে না। গরু ছাগল প্রভৃতি প্রাণীর ভিতরে শিঙ্ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়াই যথাসময়ে তাহাদের শিঙ্ গজায়। যাহার ভিতরে যাহা নাই তাহা হইতে সেই জিনিষ উৎপন্ন হইতেই পারে না। তিলের ভিতর তৈল থাকে বলিয়াই তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, কিন্তু বালুকণা হইতে তৈল হয় না, কারণ বালুকণায় তৈল নাই। মোট কথা—জন্মিবার পূর্ব্বে বস্তুটি

সূক্ষ্মরূপে না থাকিলে তাহা জন্মিতেই পারে না।

মাটি ও ঘটের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, যাহাকে কারণ বলা হয় তাহারই অবস্থাবিশেষের নাম কার্য্য। কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হয়।

ইঁহারা বলেন—জগতের মূল কারণ এক প্রকৃতি।* প্রকৃতিই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, মূলতঃ জগৎ ও প্রকৃতি অভিন্ন। এই প্রকৃতিই উপনিষদ্‌বর্ণিত সৎ, সুতরাং জগৎও মিথ্যা নহে, কিন্তু অনিত্য। কারণ জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। প্রকৃতির আবির্ভাব বা তিরোভাব নাই, সুতরাং প্রকৃতি নিত্য। এই মতের নাম সৎকার্য্যবাদ। পরিণামবাদ ইহারই অপর নাম।

বেদান্তশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া এই বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বহু বাদের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকেই যুক্তির সাহায্যে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে তাহার মধ্যে কয়েকটি মতের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে ঃ—

অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর বলেন—পরমসত্য, অদ্বিতীয় নির্গুণ শুদ্ধ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, তাহাই একমাত্র সদ্‌বস্তু। জগৎটি কার্য্য, কিন্তু তাহা সৎ বা অসৎ ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। এই মতে জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলা হয়। বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ—বস্তুর অযথার্থ অন্যথা-ভাব বা মিথ্যা রূপান্তর। ব্রহ্মই মায়ার সহ-কারিতায় নাম-রূপাত্মক জগৎরূপে প্রতীয়মান হন। আসলে কিন্তু ব্রহ্মের কোন রকম বিকার বা রূপান্তর ঘটে না; ব্রহ্ম চিরদিন একই রকম, তাঁহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন কখনও হয় না। তথাপি মায়ার বিচিত্র শক্তি-প্রভাবে একই ব্রহ্ম বহু রূপে প্রতিভাত হন, নাম-রূপবর্জ্জিত হইয়াও নানা নামে ও বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। তাঁহার ঐ সকল নাম বা রূপ সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং কাল্পনিক বলিয়াই মিথ্যা।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝিতে পারা যায়, দূর হইতে একটি ঝিনুক দেখিলে অনেক সময় রৌপ্য বলিয়া মনে হয়। সেখানে আসলে কিন্তু রৌপ্য নাই, অথচ রৌপ্য বলিয়াই তখন দর্শকের জ্ঞান জন্মে। কিন্তু কাছে যাইয়া বিশেষ ভাবে দেখিলে পরক্ষণেই বুঝা যায় যে, ইহা রৌপ্য নহে। রৌপ্য বলিয়া যখন জ্ঞান জন্মে তখনও ঝিনুকটি সেই অবস্থায় যাহা ছিল, পরক্ষণেও সেই অবস্থায় তাহাই থাকে, ঝিনুকের কোনই পরিবর্ত্তন অথবা অবস্থান্তর ঘটে না। অথচ মনের বিশেষ একটি অবস্থার ফলে মাঝখানে রৌপ্য বলিয়াই দর্শকের চিত্তে জ্ঞান জন্মে। দর্শকের চিত্তে দূরত্ব প্রভৃতি দোষের দরুন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে সে তখন প্রকৃত ঝিনুকের স্বরূপ জানিতে পারে না, তাহার নিকট ঝিনুকের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত হইয়া থাকে।

এই রকম ব্রহ্মেরও প্রকৃত পক্ষে কোনও নাম বা রূপ নাই। অথচ অনাদিকাল হইতে অলঙ্ঘ্যশক্তি মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মকে নাম-রূপ যুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই মনে হওয়া বা প্রতীতি হওয়াটাই জগৎ, সুতরাং ইহা মিথ্যা। অতএব অদ্বৈতবেদান্ত-মতাবলম্বীদের মতে জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বা অযথার্থ কল্পিতরূপ। মায়াই নিরুপাধিক শুদ্ধ ব্রহ্মের রূপকল্পনার হেতু। ব্রহ্ম চিরদিন নামরূপশূন্য হইলেও মায়াই নাম ও রূপে পরিণত হয়। যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেই এই মায়ার লীলাচাতুর্য্য ধরা যায়, তখন আর জাগতিক আসক্তি থাকে না। এই মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে, সদসদ্‌-ভিন্ন একটি অনির্বচনীয় বস্তু।

* বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্যসার নামক পুস্তকে প্রকৃতির বহুত্বও স্বীকার করিয়াছেন।

অদ্বৈতবেদান্ত-মতে মায়ার সহকারিতায় ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতীয়মান হন স্বীকার করায় অনেকে এই মতকে মায়াবাদ বলেন, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। যে মতে জগতের মূল কারণ কেবলই মায়া বলা হয় তাহার নাম মায়াবাদ। ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধমত। অদ্বৈতবেদান্ত-মতে মূল কারণ ব্রহ্ম, মায়া সহায়ক মাত্র। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্ত-মতকে মায়াবাদ বলা ভুল।

এই মতে কারণের সহিত কার্য্যের ভেদ নাই, সেই জন্য কার্য্য ও কারণ এক নহে। কারণটী সৎ, কিন্তু কার্য্যটীকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না, ইহা অনির্ব্বচনীয়। কার্য্যের প্রকৃত সত্তা নাই, সুতরাং তাহা সৎ নহে, অথচ উহার জ্ঞান হওয়ায় এবং লৌকিক ব্যবহার হওয়ায় বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎ বা অলীকও নহে, কিন্তু মিথ্যা। তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্ম সৎ পদার্থ, কিন্তু নাম রূপ না থাকায় দৃশ্য হয় না। বন্ধ্যাপুত্র অসৎ বলিয়াই দৃশ্য হয় না, কিন্তু জগৎ মিথ্যা, প্রকৃত সত্তা না থাকিলেও দৃশ্য হয়, সুতরাং অসৎ বা অলীক নহে। এই মতের নাম সৎ-কারণবাদ; বিবর্ত্তবাদ, ব্রহ্মবাদ ও অনির্ব্বচনীয়-বাদও এই মতেরই নামান্তর।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য বলেন—শুদ্ধ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। সেই ব্রহ্ম নিগুর্ণ নহেন, কিন্তু সগুণ। এই সগুণ শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব আবির্ভূত হয়। এই মতের সহিত শঙ্করমতের পার্থক্য অতি স্পষ্ট। মুক্তিতে জীবের সহিত ব্রহ্মের সর্ব্বথা ঐক্যও ইঁহারা স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণই ইঁহাদের মতে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব।

অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া আর একটী সিদ্ধান্তও প্রসিদ্ধ আছে। সিদ্ধান্তটি এই—অজ্ঞান বা মায়ায় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রতিবিম্বের নাম জীব। আর ইহার বিম্বস্থানীয় আসল চৈতন্য অজ্ঞানোপহিত অর্থাৎ অজ্ঞানের সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কেহ কেহ শুদ্ধ চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন এবং অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে জীব বলিয়াছেন। নিজের অজ্ঞানের ফলে জীব নিজেই জগৎ রচনা করিয়া জগতের উপাদন বা মূল কারণ হইয়াছে। যাহা কিছু দেখা যায়, অনুভব করা যায় বা ব্যবহার করা যায়, আসলে তাহার কোনই সত্তা নাই। জীব অজ্ঞানবশে নিজেই সমস্ত কল্পনা করিয়াছে। নিখিল বিশ্বে এই একই জীব সমগ্র শরীরে সম্বদ্ধ। দেহভেদে জীবের ভেদ-কল্পনা ভ্রান্তি মাত্র। সমস্ত জগতের মূল কারণ সেই জীবের সাক্ষাৎকার হইলেই মোক্ষ হয়। ইঁহাদের মতে আজ পর্য্যন্তও কাহারও মুক্তি হয় নাই। এই মতের নাম দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ। দৃষ্টিই অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষেই সৃষ্টি, দৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টি নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য বলেন, অশেষ কল্যাণকর অলৌকিক অনন্তগুণশালী অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ নারায়ণই জগতের মূল কারণ। জীব ও জগৎ,—এই দুইটী ভগবান্ নারায়ণের অংশ বিশেষ, তাঁহারই শরীর। বিরাট বিশ্ব-প্রপঞ্চ তাঁহার শরীর বলিয়াই তাঁহাকে বিরাট পুরুষ, বিশ্বরূপ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। জগৎ ব্রহ্মেরই অংশ, সুতরাং এই হিসাবে জগৎও ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় আর কিছুই নাই বলিয়াই তিনি অদ্বিতীয়। জীব ও জগৎ সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলরূপে প্রকটিত হয়, ইহাকেই সৃষ্টি বলে।

রামানুজাচার্য্যের মতে ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী, অবতার এবং অর্চ্চাবিগ্রহ,—এই চাররূপে ভগবান্ বিরাজমান। জীব ঈশ্বরের নিত্য দাস। জগৎ সত্য, কিন্তু অনিত্য। অনিত্য হইলেও জগৎকে মিথ্যা বলা যায় না। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জীব ও

জগৎরূপ বিশেষ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করায় এই মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য বলেন—প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। এই প্রকৃতি সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত প্রকৃতি নহে, ইহা মধ্বাচার্য্যস্বীকৃত বিংশতি প্রকার দ্রব্যের অন্তর্গত পঞ্চম দ্রব্য। সগুণ ঈশ্বর, অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন, পরমাত্মা নারায়ণের শক্তিস্বরূপা লক্ষ্মী এই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নারায়ণ এই লক্ষ্মীদেবীর সহায়তায় প্রকৃতি হইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং নারায়ণ জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতিই মূল বা উপাদান কারণ। জগৎ জড়, কিন্তু সত্য; তবে অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে। মাধ্বমতে মিথ্যা বলিলে অসৎ বা অলীক বুঝায়। জগৎ অলীক নহে সুতরাং মিথ্যাও নহে। এই মতে জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর—এই সমস্তই পরস্পর পৃথক্ তত্ত্ব। জীব ও ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ হইলেও প্রভেদ আছে বলিয়াই মাধ্বমতের দ্বৈতবাদ নাম হইয়াছে।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ নামে বেদান্তের আরও একটি মত প্রচলিত আছে। ইহা চৈতন্যদেবের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মতে কৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। জীব কৃষ্ণের শক্তি এবং জগৎ কৃষ্ণেরই মায়াশক্তির পরিণাম। জগৎ কৃষ্ণের মায়াশক্তির পরিণাম বলিয়া জগতের সহিত কৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ আছে, কারণ জগৎ অনিত্য, কৃষ্ণ নিত্য। আবার অভেদও আছে, কারণ কৃষ্ণের সত্তাই জগতের সত্তা, কিন্তু এই ভেদ এবং অভেদ এতই দুরবগাহ যে, মানুষের চিন্তা তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। জীব কৃষ্ণের অংশস্বরূপ; সুতরাং অংশের সহিত অংশীর অর্থাৎ জীবের সহিত কৃষ্ণের ভেদ সম্বন্ধই বিদ্যমান—ইহা বলদেব বিদ্যাভূষণের মত। শ্রীজীব গোস্বামীর মতে, জীবের সহিতও ভগবানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদীরা বলেন—ভগবানের ত্রিবিধ শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। অন্তরঙ্গা শক্তি তিন রকম—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ। এই তিন রকম শক্তির জন্যই ভগবানকে সৎ চিৎ এবং আনন্দ, বা চৈতন্য-স্বরূপ বলা হয়। তটস্থা শক্তিই জীব এবং বহিরঙ্গা শক্তিই মায়া। এই মায়ারই পরিণাম জগৎ। এই মতেও জগৎ মিথ্যা নহে, সত্যই, কিন্তু অনিত্য। জগতের মূল কারণ ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ।

বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের আরও অনেক রকম মতবাদ আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহা আলোচনা করা সম্ভব নহে। বেদান্তের যতগুলি মতবাদের উল্লেখ করা হইল তাহার মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অনুভূতি অনুসারে জগতের মূলকারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছে। জগতের এই মূল কারণ যাহা তাহাই উপনিষদ্‌বর্ণিত সৎ শব্দের প্রতিপাদ্য—ইহাই আচার্য্যদিগের অভিপ্রায়।

দার্শনিক সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম আলোচনা করিয়া মোটের উপর ইহা বুঝা গেল যে, এই বিরাট বিশ্বের মূল কারণ কিছু আছে এবং তাহা সদ্‌বস্তু। সেই সদ্‌বস্তু কাহারও মতে পরমাণু, কাহারও মতে প্রকৃতি, কাহারও মতে নির্গুণ চৈতন্যময় ব্রহ্ম, কাহারও মতে সগুণ ব্রহ্ম।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শক্তি-সাধনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

ভারতীয় অথবা হিন্দুসংস্কৃতিতে হিন্দুদিগের সমুদয় বিদ্যা, সমস্ত কলা ও সকল রীতিনীতি অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দ্বারা শক্তির উপাসনা সমর্থিত হয়। হিন্দু মনোরাজ্যের সিংহাসনে এই শক্তি বা মহাশক্তি আসীনা। প্রত্যেক আস্তিক হিন্দু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বা দুর্গাসপ্তশতীতে পড়িয়া থাকে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" জড় ও চেতনে কখনও গুপ্ত, কখনও ব্যক্ত থাকিয়া যিনি শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে বার বার নমস্কার।

শক্তি দ্বারাই সমগ্র সংসারচক্র সঞ্চরণশীল। শক্তির প্রভাবেই ক্ষুদ্র বীজ বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়, ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড হইতে বিরাট মনুষ্যশরীর গঠিত হয় এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনে নিখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাধারণ শক্তিরই যখন এমন অদ্ভুত প্রভাব, তখন অন্তর্জগতের নিয়ন্ত্রী আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

এই শক্তি কেবল প্রাচীনতমা নহে, নিত্যাও বটে। অধিকন্তু বৈচিত্র্য এই যে, ইহা সদা নবীনা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। ইহার কখনও হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম আবরণ বশতঃ ইহার কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি, কখনও বা লোপ দেখা যায়। এইজন্য পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"ভগবান্ সকলকার ভিতর কিরূপে বিরাজ কচ্ছেন জান? যেমন চিকের ভিতর বড় লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখ্‌তে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখ্‌তে পায় না; ভগবান্ ঠিক সেইরূপে বিরাজ কচ্ছেন।"

একই শক্তি কতবার গুপ্ত ও কতবার ব্যক্ত হইয়াছে—ইহা কে বলিতে পারে? অনন্ত কাল যাবৎ এই লীলা চলিয়া আসিতেছে। কত দেশ, মহাদেশ, জাতি ও ব্যক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, আর কত লুপ্ত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? কত দেশ, পাহাড় উৎপন্ন হইয়াছে, কত সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে উহার নির্ণয় কে করিবে? ভক্তবর নারদ যথার্থই বলিয়াছিলেন—শক্তির বলে সূঁচের ছিদ্রের ভিতর হস্তী অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, আবার বাহির হইতে পারে। এই সকল বিরোধী ধর্ম্মও শক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। সর্ব্বশক্তিমানের ভিতর এইরূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। এই শক্তি জড়রাজ্যে আবিষ্কারক, মনোরাজ্যে দার্শনিক ও ধর্ম্মরাজ্যে শুদ্ধ-বিগ্রহধারী অবতার। ইন্দ্রিয়বর্গ যাহা কিছু কাজ করে, মন যাহা কিছু সংকল্প-বিকল্প করে, কল্পনা যাহা কিছু অনুমান করে, সবই শক্তির কৃপায়—শক্তির সাহায্যে। দেবীসূক্তে বলা হইয়াছে—

"ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥"

আমারই শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহ করে এবং কথিত বিষয় শ্রবণ করে। যাহারা আমাকে অন্তর্য্যামি-

রূপে জানে না, তাহারাই জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। হে কীর্ত্তিমান সখা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদ্বেষী হিংস্রপ্রকৃতি ত্রিপুরাসুর-বধার্থ রুদ্রের ধনু আমিই জ্যাসংযুক্ত করি। ভক্তজনের কল্যাণার্থ আমিই যুদ্ধ করি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে অন্তর্যামিনীরূপে আমিই প্রবেশ করিয়াছি।

শক্তির এই তত্ত্ব যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা বলেন—বিশ্বের সর্ব্বত্র শক্তির পূজাই চলিতেছে, অন্য কাহারও নহে। প্রসিদ্ধিও আছে—শক্তি-পূজার ফল শীঘ্রই পাওয়া যায়। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, সকল দেবতা নিদ্রিত থাকেন, আর শক্তি সদা জাগ্রতা। এই জন্য ভক্তের কাতর ধ্বনি ভগবতী শীঘ্রই শুনিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জড়জগৎ ও মনোজগতে মানব যাহা কিছু অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলই শক্তির দ্বারাই লাভ করিয়া থাকে। জড় শক্তির উপাসনার প্রভাবে মানুষ শরীর-বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রোগ-বিজ্ঞান, শাস্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি অবগত হইয়া থাকে। মানসিক শক্তির অনুশীলনের প্রভাবে মানুষ মনোবিজ্ঞান, কাব্য, চারুকলা, সভ্যতা, রাজনীতি, সংযম, সদাচার প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে আধ্যাত্মিক শক্তির উপাসনা দ্বারা মানুষ ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, শম, দম, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করে। অবশ্য এবংবিধ উপাসনা বা অনুশীলন শ্রদ্ধা, বিধি মন্ত্রাদির সহিত অনুষ্ঠিত হওয়া চাই।

বলিদান ও স্বার্থত্যাগ ব্যতীত শক্তি প্রকট হন না। 'খপ্পরের' তর্পণ করিলেই শক্তি প্রসন্না হন। হৃদয়-রক্তের দান পাইয়াই মুণ্ডমালা-ধারিণী, করালবদনা, রক্তদশনা কালিকা দর্শন দিয়া থাকেন। নিজের দেহ, মন, ধন সমর্পণ করিবার পরই চামুণ্ডা ভক্তের নিকট আবির্ভূতা হন। শক্তি-পূজাপদ্ধতিতে এই স্বার্থত্যাগকেই 'বলিদান' বলা হইয়াছে। শ্রুতিও ঘোষণা করিয়াছেন — 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'। ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। স্বার্থত্যাগেই অন্তঃকরণে উদারতা, পবিত্রতা ও সাত্ত্বিকতার উদয় হয়। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত আবাহন, পূজা ও বলিদানেই মহাশক্তি প্রত্যক্ষা হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন।

চৈতন্যশক্তি সূক্ষ্ম, আর জড়শক্তি স্থূল। জড়ের নিয়ামিকা সূক্ষ্ম চেতনশক্তি। মৃত দেহেও নাক, কাণ, চক্ষু প্রভৃতি থাকে, পরন্তু সূক্ষ্ম-শক্তির অভাবে স্থূল বা জড় ইন্দ্রিয়নিচয় ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন করিতে পারে না। এই প্রকারে অগ্নি, জল, পৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি সকল পদার্থের নিয়ামিকা হইয়াই চেতন-শক্তি উহাদের দ্বারা বিশ্বের সকল ব্যাপার পরিচালন করে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড়পদার্থ পর্য্যন্তই পৌছিয়াছেন। প্রত্যেক জড়পদার্থে নিয়ামিকা চেতনশক্তির অনুভব, পূজন ও প্রত্যক্ষীকরণ ত ভারতীয় সংস্কৃতিরই দান। যখন পাশ্চাত্যদেশ-সমূহ অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল, তখন ভারতীয় ঋষি কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনারূপে প্রসিদ্ধা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। এই চৈতন্য নিত্য ও ব্যাপক। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন অণু বা পরমাণু নাই, যাহাতে এই শক্তি ব্যাপ্ত নহে। অধিকন্তু, শক্তি ব্যতীত কোনও অণু বা পরমাণুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই কথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও বলা হইয়াছে—

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।'

অর্থাৎ, দেবী নিত্যস্বরূপা, জগৎ তাঁহারই মূর্ত্তি। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন।

আকাশচুম্বিনী পর্ব্বতমালা, সাগরবাহিনী নদী, উষার রক্তিম ছটা ও সন্ধ্যার তিমিরাবগুণ্ঠন—সর্ব্বত্রই দেবীমূর্ত্তির প্রকাশ। অমাবস্যার ঘনান্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্মশানের কঠোর নিস্তব্ধতা, মহাকালের সংহারছায়ায়, মহাশক্তির ক্রীড়া অবলোকন করিয়া শক্তিসাধক বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। পথপ্রদর্শক গুরুর ভিতর, জগদ্বিমোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে, বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি ও সংসারের প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ব্যক্তিতে, প্রত্যেক গুণে, বরাভয়-করা ও মুণ্ডমালিনী দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। এই নিগূঢ় রহস্য বুঝিয়াই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ শক্তির কল্যাণদাত্রী উপাসনা প্রত্যেক ভারতীয়ের গৃহে প্রচার করিয়াছেন। এই জন্য শক্তি-উপাসনাকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট আবিষ্কার ও দান বলা হইয়া থাকে।

জগৎপ্রসবিনী শক্তির বিরাট নারীমূর্ত্তির কল্পনা সর্ব্বপ্রথম আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই করিয়াছেন। সর্ব্ব প্রথম তাঁহারাই নারীকে কামগন্ধহীন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। নারী মহাশক্তি জগদম্বারই সাক্ষাৎ প্রকাশ ইহা তাঁহাদেরই আবিষ্কার। ইহার অনুকূল ফলও প্রথমেই আমাদের মিলিয়াছে। ভারতেই সীতা, সাবিত্রী, মদালসা ও মৈত্রেয়ীর মত প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীমূর্ত্তিসমূহ আবির্ভূত হইয়া দেশকে পবিত্র করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন। এই বিশুদ্ধা সতীগণের কীর্ত্তিতে কেবল ভারত নহে, সমগ্র পৃথিবীও ধন্য এবং গৌরবান্বিত হইয়াছে। ভারতের প্রতি ধূলিকণা এই সকল স্বনামধন্যা দেবীগণের চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে।

নারীর ভিতর জগদম্বার প্রকাশ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াই ভারতের পূজ্যপাদ ঋষিগণ নারীকে বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা ও জগজ্জননীর হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তির জীবন্ত প্রতীক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনন্তকালব্যাপিনী সাধনায় যে ঋষিগণের এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈদিক ও ঔপনিষদিক নারীর উপাসনা ধীর, স্থির ও শান্ত ভাবের। বৈদিক নারী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন, অনেকে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনেকে ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া প্রখ্যাতা হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে যীশুখৃষ্টের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে নারীগণ হেয় এবং সম্পত্তি-রক্ষণেরও অনধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু ভারতের একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিও এরূপ ভুল ধারণা করিতে পারে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদেশী সংস্কৃতিতে এত প্রভেদ!

অবশ্য যীশুখৃষ্টের মাতা মেরীর পূজা প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যে কিছু কিছু নারীপূজার প্রচলন হইয়াছিল; পরন্তু এই কার্য্য 'মেরী'তেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখনও তথায় নারীকে প্রথম আসন দেওয়া হয়—ট্রামে, বাসে, রেলে প্রথমে নারীকে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, ইহা নারীর মাতৃভাবের পূজা নয়। ইহা তো কেবল অবলার প্রতি কৃপা প্রদর্শন বা সাহায্যদানমাত্র।

এদেশে বেদ হইতে তন্ত্রপর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রই নারীকে মাতা আখ্যা দিয়াছেন এবং মাতৃপূজার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক হিন্দু অপরিচিতা নারী-কেও মাতা বা মা-লক্ষ্মী বলিয়া গৌরব অনুভব করে। সর্ব্বপ্রথমে মাতাই পূজা পাইয়া থাকেন। মাতা বলিয়া সম্বোধিতা হইলে যে কোন নারী নিঃশঙ্কচিত্ত হইতে পারে। সজ্জন ব্যক্তি নারীকে মাতৃরূপে সম্বোধন করিয়া পুলকিত হন।

শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। যেমন অগ্নি ও উহার দাহিকা শক্তিকে পৃথক করা যায় না, তেমনি শক্তিমান্ ও শক্তি পৃথক হইতে পারে না। এই

তত্ত্ব ভারতীয়গণই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য নারীরূপে ঈশ্বরের উপাসনা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। পাশ্চাত্যগণ দেশমাতৃকার অন্তর্নিহিত চেতনাশক্তিকে মাতা বলেন না, তাহারা জড় পদার্থ দেশকেই মাতা বলিয়া সন্তুষ্ট হন। পরন্তু ভারতীয়গণের নিকট দেশ-মাতা ত মহাশক্তি জগন্মাতা এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করা নিজ নিজ অভ্যুদয় ও মোক্ষের জন্য অত্যাবশ্যক।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষানুভব ও উপদেশের প্রভাবে ভারতে আধুনিক যুগে নারীরূপে শক্তিপূজা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারী-প্রতীকে এতাদৃশ শুদ্ধ-সাত্ত্বিক পূজা আর কোথাও দেখা যায় না। জগন্মাতার ধ্যানে তন্ময় হইয়া ও তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় তাঁহার উপর নির্ভর করা এবং সর্ব্বদা 'মা, মা' বলিয়া ডাকা ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব সম্পদ। নিজের পরিণীতা পত্নীকে সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে পূজা করা, বেশ্যাকেও 'মা মা' বলিয়া সম্মান দেওয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই শক্তিরূপিণী জগদম্বার দর্শন লাভ করিবার উপায় ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত কামনা বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শক্তিময়ী জগদম্বিকার উপাসনায় রত থাকিলে যে কোন মাতৃভক্ত তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভে সমর্থ হন। জগন্মাতা এতই করুণাময়ী মহাশক্তিরূপিণী!

সুপ্রভাত

শ্রীশিবশম্ভু সরকার, এম্-এ

তোমার বেদনাভরা আনন্দের মুগ্ধ বাঁশি খানি
বারে বারে দেয় ডাক—ক্ষণে ক্ষণে জানায় নিশানি—
"উঠ, উঠ, উঠ বন্ধু!" স্মৃতির-বিভ্রম যায় টুটে—
আঁধার অন্তর চিরি তীব্র জ্বালা বাহিরায় ছুটে
অন্ধ আর্ত্তনাদে! বন্ধু, ভুলে গেছি—ভুলেছি
তোমারে—
প্রান্তর ছাড়িয়া তাই বাসা প্রাণ বেঁধেছে এ' ঘরে—
স্বপন-কুহেলি ঘেরা! পর্ণের এ স্নিগ্ধ আচ্ছাদনে
পরাণ ভুলেছে পথ—ভুলিয়াছে আপনার জনে!
তবু তুমি দাও ডাক—তবু তুমি দেখাও বর্ত্তিকা—
বারে বারে হান বাণী জ্বালাইতে নিবানো এ' শিখা—
প্রাণেরে করিতে তপ্ত—জড়তারে করি' পরিহার—
অসীম আনন্দাকাশে আপনার পাখা মেলিবার!

জানি তব দিব্য স্নেহ—দিশেহারা মহান্ আকৃতি
হিয়ারে রঙাতে চায় অনন্তের শান্ত অনুভূতি
অপার অশ্রান্ত ছন্দে। তাই তব অনির্ব্বাণ সুর
বিমুখ পরাণে ডাকে বার বার আকুল মধুর!
তবু ফুল ফোটে নাই—তবু এই তুচ্ছতারে ছাড়ি'
নিঃশব্দ নিশীথ রাতে অনিশ্চিতে দেয় নাই পাড়ি
পথের স্তব্ধতা ভাঙি! শুধু চায়—শুধু অসহায়—
আপনার মাঝে ঝড় উঠে নামে—ঢেউ মূরছায়!
যে পরাণ জাগে না বাঁশিতে—তারে কর বজ্রাঘাত
প্রলয়-শিখায় আনো নবজন্ম—নব সুপ্রভাত!

সমালোচনা

'পথের দাবী'র শেষ কথা—শ্রীরঘুনন্দন দাস প্রণীত। প্রকাশক—অমিয় লাইব্রেরী, ১৯ নৃপেন্দ্র বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ১৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

'পথের দাবী' বাংলার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' এবং ম্যাক্সিম্ গর্কীর 'মা'-এর মত ইহা একখানি অপূর্ব উপন্যাস। 'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র সব্যসাচী নামক এক মহান্ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার একটী প্রধান নায়িকা ভারতীর মুখে শোনা যায়, হিংসাই জীবন-পথের শেষ কথা নয়। সব্যসাচী সেই শেষ কথাটী কি জানিতে চাহিলেও শরৎচন্দ্র তাহা বলেন নাই। আলোচ্য গ্রন্থে অনুক্ত শেষ কথাটী বলার সুচেষ্টা করা হইয়াছে।

লেখক পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাধক। তিনি স্বীয় গুরু শ্রীঅরবিন্দের জীবনালোকে সব্যসাচি-জীবনের পরিণতি দেখাইয়াছেন। রেঙ্গুনে 'পথের দাবী সংঘে'র বিদ্রোহী সভ্য ব্রজেন্দ্রকে বিনাশ করিবার পর সব্যসাচী এক দেবীমূর্তির নির্দেশে হিংসা-পথ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সব্যসাচীর গুরুকরণ এবং গীতোক্ত আদর্শে জীবন-গঠন প্রভৃতি ঘটনা শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। লেখকের মতে ব্যক্তিগত চেতনাকে বিশ্ব-চেতনার সহিত সংযুক্ত করিয়া নিজদিগকে জগন্মাতার কর্মসম্পাদনের যন্ত্রমাত্ররূপে উপলব্ধি করাই 'পথের দাবী'র শেষ কথা। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় সব্যসাচীও স্বাধীনতা-সংগ্রাম হইতে বিরত হইয়া পরমার্থ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের অভাবনীয় পরিবর্তন ও পরিণতিতে ভারতীয় ভাবধারার এক নিগূঢ় রহস্যের অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বইখানি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সুপাঠ্য। ইহা অভিনব উপন্যাস-রচনার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

শিল্পকথা—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—দি কালচার পাবলিশার্স, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

গ্রন্থকার পণ্ডিচেরীস্থ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশিল্পী। তাঁহার বহুমুখী সাহিত্য-সাধনা আমাদের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সারগর্ভ রচনাবলী বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত ও পঠিত। আলোচ্য গ্রন্থ সতেরটী প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি ১৩৪০ হইতে ১৩৪২ সালের মধ্যে 'প্রবাসী', বিচিত্রা', 'পরিচয়', 'উদ্বোধন', 'উত্তরা' এবং 'ছন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'উপনিষদের সুন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রে ১৩৪২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন, উপনিষদের সৌন্দর্য রূপগত নহে, অরূপগত। রূপগত সৌন্দর্য অনিত্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু অরূপ-সুষমা নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত ও নিরাকার। এই সুষমার দর্শন হয় এক বৃহত্তর গভীরতর চেতনার বোধে। সেথানে দর্শন ও বোধ একার্থক। 'বাংলালিপি-সংস্কার' শীর্ষক শেষ প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, বাংলা হরফকে রোমান বা দেবনাগরীতে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনিষ্টকর। লিপি-সাম্যের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মিতালি বাড়িবে না। ফরাসী, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা রোমান অক্ষরে লিখিত হইলেও উক্ত

ভাষাত্রয়ভাষীদের মধ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লিপির পরিবর্তন হইলে 'অন্তরাত্মার পরিবর্তন, এমন কি ভাষার জন্মান্তর-গ্রহণ ঘটিবে। লেখকের যুক্তি সমীচীন। পুস্তকখানি পাঠকপাঠিকাকে চিন্তার খোরাক দিবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রাথমিক যুযুৎসু—প্রফেসর শ্রীসুবলচাঁদ চন্দ্র প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, 'নবযুগ বাণী ভবন', ১৫ জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৫; মূল্য এক টাকা।

'যুযুৎসু' শব্দের অর্থ যুদ্ধেচ্ছু। যে কৌশলের সাহায্যে বিনা অস্ত্রে আততায়ীর সম্মুখীন হইয়া তাহার সকল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহাকে কৌশলপূর্বক আপনার আয়ত্তে আনিতে পারা যায়, ইহারই নাম যুযুৎসু। জগতে যত প্রকার আত্মরক্ষার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে যুযুৎসু কৌশল উহাদের অন্যতম। এই কৌশল ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হয়। বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ সংহিতা ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে এই যুযুৎসু কৌশলের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান জগতে জাপানীদের মধ্যে এই কৌশল সর্বাপেক্ষা উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছে। এজন্য অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রচারকগণের দ্বারাই খুব সম্ভবতঃ এই যুযুৎসু কৌশল ভারতের বাহিরে শ্যাম চীন কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইহার চর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও রাজ্যের সুশাসনের নিমিত্ত জাতির সামরিক শক্তির, ক্ষাত্রবীর্যের সম্যক্ উদ্বোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয়বিধ সামরিক বিদ্যা অর্জনের দ্বারাই যুবশক্তি রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও সুশাসনের কার্যে উপযোগী হইতে পারে। এজন্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে শারীরিক ব্যায়াম, যুযুৎসু কৌশল, লাঠিখেলা, অস্ত্রচালনা ও অন্যান্য বিবিধ সামরিক বিদ্যা অনুশীলনের ব্যাপক পরিকল্পনা রাষ্ট্রের গ্রহণ করিতে হইবে। যুব-ভারতকে আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, ক্ষাত্রবীর্যে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষের শক্তি-সাধনার আহ্বান কি বিফল হইবে?

গ্রন্থকার প্রফেসার চন্দ্র পুস্তিকার প্রথম ভাগে যুযুৎসুর অবশ্য অনুশীলনীয় গুণাবলী, আট প্রকার ব্যায়াম ও আঠার প্রকার কৌশল, দ্বিতীয় ভাগে কথোপকথনচ্ছলে সাত প্রকার খেলার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি প্রত্যেক যুযুৎসুশিক্ষার্থী ও শিক্ষকের প্রভূত সহায়তা করিবে। পরিশিষ্টে যুযুৎসু-কৌশলশিক্ষারত বালকগণের একুশখানা মনোরম ছবি পুস্তিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি এল্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য—বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন কার্যকরী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যের (১৯৪৩-৪৫ সন) বিবরণী আমরা পাইয়াছি। গত ১৯৪৩ সনের মে হইতে ১৯৪৫ সনের মার্চ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল সেই বিষম অন্নকষ্টের সময়ে বাংলার বিভিন্ন স্থান—বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রগুলি হইতে সাহায্যের আবেদন পাইয়া বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন অর্থ, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের নেতৃত্বে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র পৃথক্ ও সমষ্টিগত ভাবে সেবাকার্য পরিচালন করিয়া বাংলার সহস্র সহস্র অনশন-ক্লিষ্ট পরিবারকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করেন। পূর্ববঙ্গের কলমা, সোনারগাঁ, বালিয়াটী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, কুমিল্লা এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মেদিনীপুর, সারগাছি, জামতারা, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলি বোম্বাই মিশন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অর্থ, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাহায্যস্বরূপ পাইয়া সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সনে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠও দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যের জন্য বোম্বাই মিশন হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন।

বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যার অনশন-পীড়িতের সেবার জন্য বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ৪,৬৬,৬১১৶৭ টাকা দানস্বরূপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি মিল হইতে বহু বস্তা কাপড় ও শাড়ী, কতিপয় বদান্য ব্যক্তির নিকট হইতে বহু কম্বল, সার্ট, হাফপেন্ট ও ছোট বেনিয়ান পাওয়া গিয়াছিল। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের নিকট মোট ৩,৮৭,১৬২৲ টাকা ও ৩৩টি সেবাকেন্দ্রে মোট ৬১,৬১০৲ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল এবং ১৩,০২৯৶১ টাকার বস্ত্র খরিদ করা হইয়াছিল। বাকী টাকা যাতায়াত, ডাকখরচ, মুদ্রণ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজে ব্যয়িত হইয়াছে।

বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন বোম্বাই, আমেদাবাদ, নদিয়াদ, পুণা, বেলগাঁও, ধারওয়ার, কারওয়ার, কাথিয়াবার, শোলাপুর, বরোদা ও অন্যান্য স্থানের সহৃদয় ব্যক্তি ও মিল-মালিকগণের আর্থিক ও অন্যবিধ বদান্যতার জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। তাঁহাদের সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য ব্যতীত অনশন-পীড়িতদের সেবারূপ বিরাট ও ব্যাপক কার্য কোন প্রকারেই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত না। দানসংগ্রহ-কার্যে বোম্বাই মিশন কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৪-৪৬ তিন বৎসরের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। ১৯৪৪ সনে লাইব্রেরীর পরিচালন-ভার রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে

আসিবার সময় পুস্তকের সংখ্যা ছিল ২১০০; ১৯৪৬ সনে সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪৯৬১ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে যথাক্রমে ৫০৪৯, ৭৯৫৩ ও ১১৫৫৮ খানা পুস্তক পাঠকপাঠিকাদিগকে পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। পাঠাগারে এই তিন বৎসরে যথাক্রমে ১০, ১৮ ও ২১ খানা মাসিক পত্র এবং ৪, ৪ ও ৭ খানা দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হইয়াছিল। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি তিন বৎসরে যথাক্রমে ৫০, ৫৭ ও ৬২ জন। উড়িয়া ও কলিকাতার বহু শিক্ষাবিদ্ ও প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া উহার কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ১৯৪৬-৪৭ সনের জন্য ২৮৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

লাইব্রেরীর পরিচালনাধীনে প্রতি শনিবার গীতা এবং প্রতি রবিবার মহাপুরুষগণের জীবনী ও শিক্ষা ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য তিন বৎসরে যথাক্রমে ৯৬, ৯৬ ও ৯৮টি আলোচনা-সভা আহূত হইয়াছিল। ১৯৪৪ সনে 'রবীন্দ্রনাথের দর্শন', 'সাহিত্যে গণজীবন' ও 'আধুনিক উপন্যাসের ধারা', ১৯৪৫ সনে স্বামী শর্বানন্দজী কর্তৃক 'হিন্দুসমাজে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা', 'জীবনের উদ্দেশ্য' ও 'ভারতীয় নারীর আদর্শ' এবং ১৯৪৬ সনে 'বৌদ্ধধর্ম', 'কালিদাসের মেঘদূত' এবং 'হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে পার্থক্য' সম্বন্ধে জনসভায় বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যীশু ও হজরত মহম্মদের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত এবং তাঁহাদের দিব্য জীবন-কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল দরিদ্র-নারায়ণসেবা। বালক-বালিকাদের মধ্যে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, পুরস্কার-বিতরণ, বিবিধ নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা এবং মহাপুরুষগণের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে বক্তৃতাদিও হইয়াছিল। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে যথাক্রমে রামনাম-সংকীর্তন এবং কালীকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে লাইব্রেরীর আয় ছিল যথাক্রমে ৮৭৫৷৷০, ১৬২৫৶৯ ও ২৪৩৪৮৩ এবং ব্যয় ৭৩৯৷৷/৩, ১১৩৭৷৷৶৬ ও ১১২৮৲।

লাইব্রেরীর ক্রমবর্ধমান কার্য-প্রসারের জন্য পাঠাগারে পাঠকদের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। এজন্য বর্তমান গৃহটির সম্প্রসারণ আশু প্রয়োজনীয়। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে ২৪০০০৲ টাকা খরচ লাগিবে। এতদ্ব্যতীত লাইব্রেরী-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকস্থ প্রাচীর এবং কর্মী ও ভৃত্যদের জন্য বহিরাবাস নির্মাণ করিতে আরও ১২০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইবে। লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ এই জনহিতকর কার্যে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন।

লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম— আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সনের কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। সেবাশ্রমটি ১৯১৪ সনে স্থাপিত হয়। এই তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহার বহুমুখী জনকল্যাণ-প্রচেষ্টা প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেবাশ্রম কর্তৃক এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিভাগযুক্ত একটি দাতব্য ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৪৬ সনে ১৫৫৭৪ জন নূতন রোগী ও ৬৫৪৮৫ জন পুরাতন রোগী এবং ১৯৪৭ সনে ১৩০৮২ জন নূতন রোগী ও ৭৬১২২ জন পুরাতন রোগী এই ঔষধালয়ে চিকিৎসা লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে গর্ভিণী ও শিশুদের মধ্যে ৫৫ মণ ২২ সের দুগ্ধ বিতরিত হয়। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সনে দুগ্ধপ্রাপ্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮০৮ এবং ৪০০০ ছিল। শিক্ষাদানও সেবাশ্রমের একটি বিশিষ্ট কর্মাঙ্গ। গত ৩২ বৎসর যাবৎ

সেবাশ্রম-পরিচালিত নৈশবিদ্যালয়ে নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক ও বালকগণ শিক্ষা লাভ করিতেছে। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সনে এই বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৫০ ও ৩৮ জন বিদ্যার্থী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। আশ্রমের অপরাহ্ণ বিদ্যালয়ে হরিজন বিদ্যার্থিগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হয়। এই বর্ষদ্বয়ে অপরাহ্ণ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ ছিল। আশ্রমসংলগ্ন লাইব্রেরীতে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ৪৫৩১ খানা পুস্তক এবং উহার পাঠাগারে ১৭ খানা সাময়িক পত্র ও ৫ খানা দৈনিকপত্র রক্ষিত হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে লাইব্রেরীর পাঠকসংখ্যা যথাক্রমে ৬৬৮৬ ও ১৪৭৩ ছিল। এই দুই বৎসরে সেবাশ্রম হইতে ৭ জন দুঃস্থ ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ২৬ জন দুর্গত ব্যক্তি সাময়িক সাহায্য লাভ করিয়াছেন। আর্থিক সাহায্যকল্পে এই দুই বৎসরে মোট ২৯৯৮/০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৪৭ সনে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রণবেশানন্দজী প্রতিপক্ষে একবার শ্রীমদ্‌-ভগবদ্‌গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বর্ষদ্বয়ে সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সেবাশ্রমকর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাসে একটি জনসভায় ইন্দোব্রিটিশ সম্প্রীতি মিশনকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভায় সম্প্রীতি মিশনের নেতা স্বামী অব্যক্তানন্দজী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। উত্তরোত্তর কর্মবিস্তৃতির তুলনায় সেবাশ্রমের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। অপরাহ্ণ বিদ্যালয়ের জন্য একটি স্থায়ী গৃহের আশু প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হইতেছে। সেবাশ্রমের একটি স্থায়ী ফণ্ডও অপরিহার্য। সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ বর্তমান কার্যক্রমের সুপরিচালনার জন্য ২৪৮০০৲ টাকার একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছেন। ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সনে সেবাশ্রমের মোট আয় যথাক্রমে ১৯৪০০৸৶৮ ও ১৮৯১৪৷৶৭ এবং মোট ব্যয় ১৬১২৩৷৴০ ও ১৬৮৫৪৶৯।

কনখল (হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৭ সালের কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। গত ৪৭ বৎসর যাবৎ এই সেবাশ্রম আর্তনারায়ণের সেবাকার্য পরিচালন করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রম হাসপাতালে ৭৫৬২১ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে যথাক্রমে ৭৪৫৭৫ ও ১০৪৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। অধিকাংশ রোগীই বিভিন্ন প্রদেশবাসী তীর্থযাত্রী। এই বৎসর পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে ৪০০০০ বাস্তুহীন নিরাশ্রয় নরনারী হরিদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন যুক্তপ্রদেশ সরকার ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু রোগক্লিষ্ট আশ্রয়প্রার্থীদের সেবার ভার মুখ্যতঃ ন্যস্ত হইয়াছে সেবাশ্রমের উপর। আলোচ্য বর্ষে সাত মাসের মধ্যে ৩৪৫৮৫ জন রোগী সেবাশ্রম হাসপাতলের বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হন। ইঁহাদের মধ্যে কঠিন রোগাক্রান্ত ১২০ জন রোগীকে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ভর্তি করা হয়। এই বৎসর সেবাশ্রমপরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ে ৪৬টি বালক ছিল। সেবাশ্রমের লাইব্রেরীতে ২৯৩৬ খানা পুস্তক আছে। রোগীদের জন্য পৃথক লাইব্রেরীতে ৮৫৮ খানা পুস্তক রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই দুই লাইব্রেরী হইতে ৩৩১৫ খানা পুস্তক পঠিত হইয়াছে। এই বৎসর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৫০০ দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়।

সেবাশ্রমের কয়েকটি অত্যাবশ্যক কাজের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার মোটামুটি বিবরণ প্রদত্ত হইল:—উন্নততর জলপরিস্রুতির জন্য ৮৫০০০৲, একটি গোশালা-নির্মাণের জন্য ১৭০০০৲, একটি

রন্ধনশালা, ভাণ্ডার ও ভোজনাগার প্রস্তুতির জন্য ১৫০০০৲, নৈশ বিদ্যালয়ের ভূমিক্রয় ও গৃহনির্মাণের জন্য ১৫০০০৲, রোগীদের অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম-রক্ষণাগার নির্মাণের জন্য ৫০০০৲, অতিরিক্ত ২০টি রোগিশয্যা ও তৎ-সম্পর্কিত আসবাবপত্রের জন্য ৪০০০৲, একটি Hospital Cooler-এর জন্য ৫০০০৲ এবং হাসপাতালের বহির্বিভাগে ১৬টি বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয় করিতে ৩২০০৲ টাকার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ২২টি রোগিশয্যার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেকটি রোগিশয্যার জন্য ৮০০০৲ টাকার প্রয়োজন। সর্বোপরি সেবাশ্রমের দৈনন্দিন কর্মপরিচালনার জন্য ৪৫০০০৲ টাকা আবশ্যক। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের সাধারণ তহবিলে মোট আয় ৫৩৮৪৫।৬ এবং মোট ব্যয় ৪২৯৫৭॥৬ এবং বিশেষ তহবিলের মোট আয় ৩৪৮১।০ এবং ব্যয় ২৯৪৪॥৵৩।

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৯-১৯৪৬ সনের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। ইহার কার্যাবলী শিলংস্থিত মূলকেন্দ্রে এবং বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে প্রসৃত। মূল কেন্দ্রে একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার আছে। আলোচ্য বৎসর কয়টিতে শিলং ও অন্যান্য স্থানে ধর্মালোচনা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবও এই কয়েক বৎসর সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মূলকেন্দ্রে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। শিলং-এর মথার পল্লীতে মিশনের একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মিশনের শেলাপুঞ্জিস্থিত শাখাকেন্দ্রে একটি অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৪৬ সনে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৫। চেরাপুঞ্জিতে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি বয়ন বিভাগ আছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষিবিদ্যা, মধুসংগ্রহ এবং গো-পালন শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সনে বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩৭। চেরাপুঞ্জিতে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পরিচালিত হইতেছে। চেরাপুঞ্জি হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরস্থিত নোঙ্গারেও একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মিশনের কয়েকটি অপরিহার্য প্রয়োজনের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। চেরাপুঞ্জির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও কর্মীদের বাসগৃহ অচিরেই সংস্কার করা দরকার। চেরাপুঞ্জির আশ্রমগৃহ ও বিদ্যালয়গৃহের এবং নোঙ্গারের বিদ্যালয়গৃহের নির্মাণ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই সকল কাজের জন্য অন্ততঃ ১০০০০৲ টাকা প্রয়োজন। মথারের বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি বিধান করা আবশ্যক। ইহার মধ্যে জমি-ক্রয় ও গৃহনির্মাণের জন্য অন্ততঃ ১২০০০৲ টাকা দরকার। চেরাপুঞ্জি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ জলের অভাবে কষ্ট পাইতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মিতভাবে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিতে ১০০০০৲ টাকার প্রয়োজন। শিলং আশ্রম শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত। সুতরাং শহরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপিত হইলে জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। এই উদ্দেশ্যে কার্য আরম্ভ করিবার জন্য ৪০০০৲ টাকা দরকার। শিলং আশ্রমের দৈনন্দিন ব্যয়ের তুলনায় আয় অত্যন্ত কম। তজ্জন্যও যথেষ্ট অর্থের আশু প্রয়োজন। আলোচ্য বৎসরসমূহে মিশনের মোট আয় ১৭৫৩৬৭।৵৮ এবং মোট ব্যয় ১৭১৩২০॥৵৯।

বিবিধ সংবাদ

ধুবড়ীতে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর প্রচার-কার্য—গত ২৩ শে আষাঢ় স্থানীয় হরিসভা-প্রাঙ্গণে ভোলানাথ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মণিভূষণ দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী "জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীতা" সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। পরে উক্ত প্রাঙ্গণে স্বামীজী যথাক্রমে ২৪, ২৫ এবং ২৬শে তারিখে "জাতীয় সমস্যা সমাধানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান", "শক্তি-সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ" ও "ভারতীয় শিক্ষা" সম্বন্ধে এবং ২৭শে স্থানীয় আশ্রম-প্রাঙ্গণে "জাতীয় সমস্যা সমাধানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান" সম্বন্ধে আলোকচিত্র-যোগে বক্তৃতা করেন।

পশ্চিম বঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা—পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির মতে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষাদানের কাল ৬ বৎসর অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১১শ শ্রেণী (শেষ শ্রেণী) পর্যন্ত হওয়া উচিত। এই মাধ্যমিক শিক্ষালাভকালে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি বাধ্যতা-মূলক বিষয়রূপে পড়াইতে হইবে বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন:—

বঙ্গভাষা—৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত; ইংরাজী—৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত; হিন্দী—৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং প্রাচীন ভাষাগুলি (সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি)—৭ম হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সুপারিশগুলি সম্বন্ধে বলেন যে, শিক্ষা কমিটি এখনও তাঁহাদের কাজ শেষ করেন নাই। বর্তমানে কমিটির বিভিন্ন সাবকমিটি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়-শিক্ষার পাঠ্য বিষয়গুলি রচনার কার্যে ব্যাপৃত আছেন। সাবকমিটিগুলির সুপারিশসমূহ শিক্ষা কমিটির সাধারণ অধিবেশনে বিবেচনা করিয়া পরে কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করা হইবে।

শিক্ষা কমিটি ইতঃপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) সম্বন্ধে তাঁহাদের রিপোর্ট দিয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাসঞ্চারী এমন এক শিক্ষা উদ্ভাবন করা মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হইবে, যে শিক্ষা কিশোর ছাত্রছাত্রীগণের বিভিন্নমুখী রুচি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হইবার সর্বনিম্ন বয়স ১১ বৎসর হইবে; তবে ১০ বৎসরের ছাত্রছাত্রীরা যোগ্যতা থাকিলে উহাতে ভর্তি হইতে পারিবে।

কমিটির অভিমত এই যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে একই পরিচালনাধীনে পৃথক বিভাগরূপে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ থাকিতে পারিবে। তবে ঐ জন্য পৃথক এক শ্রেণীর শিক্ষক রাখিতে হইবে এবং ঐ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ সাধারণ-ভাবে উক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষালাভের কাল—৬ বৎসর হইবে, অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

মাধ্যমিক শিক্ষা দুই প্রকারে হইবে। এক প্রকারের শিক্ষায় শুধু একই ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে। অপর প্রকারের শিক্ষায়

নানা ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে। কমিটি এইরূপ ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, যাহাতে প্রতি মহকুমায় অন্ততঃ একটি করিয়া যথোপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ও ব্যবস্থাসম্বলিত উচ্চ বিদ্যালয় থাকে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আবার সাধারণতঃ দুই প্রকারের হইবে, সিনিয়ার বনিয়াদি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়। খাস উচ্চ বিদ্যালয়গুলি একবিষয়ক ও বিবিধবিষয়ক—এই উভয় প্রকারেরই হইবে এবং উপযুক্ত এলাকাগুলিতে কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। ঐ সব কারিগরী বিদ্যালয়ে ব্যবসায়, বাণিজ্য ও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই কারিগরী বিদ্যালয়গুলিতে এক প্রকারের কারিগরী শিক্ষা বা বিবিধ প্রকারের কারিগরী শিক্ষা প্রদত্ত হইবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর পরে শেষ কয় বৎসর (তিন বৎসর) কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে কোন একপ্রকার শিক্ষার বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিবার সুযোগ পাইবে।

এগার বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে কোন ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা করিলে এক প্রকারের শিক্ষাদান বিদ্যালয় হইতে অপর প্রকার শিক্ষাদান বিদ্যালয়ে যাইবার (ট্রান্সফার) অনুমতি পাইবে। এই ভাবে এক প্রকারের বিদ্যালয় হইতে অপর ধরনের বিদ্যালয়ে যাইবার যাহাতে সুবিধা থাকে, তদুদ্দেশ্যে সকল প্রকারের বিদ্যালয়েই সাধারণ কতকগুলি পাঠ্য বিষয় থাকিবে।

সিনিয়ার শিক্ষাকাল (মধ্য অবস্থা) অন্তে একটি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকাল অন্তে সাধারণভাবে প্রকাশ্য একটি পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে এই পরীক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য কলেজী ও বৃত্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন মিটাইতে পারে। যে সব ছাত্রছাত্রী ঐ সাধারণ প্রকাশ্য পরীক্ষা দিতে পারে না অথবা দিবে না, তাহাদিগকে একটি করিয়া বিদ্যালয় শিক্ষা-সমাপ্তির সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট ঐ ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের নথীপত্র ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী গৃহীত টেষ্ট পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে এবং উহা ছাত্রছাত্রী যে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়াছে তাহারই প্রমাণরূপে গণ্য হইবে।

সহ-শিক্ষা

কমিটির অভিমত এই যে, বর্তমান অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকালে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা কোন সরকারী শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নহে। সেইজন্য কমিটি মনে করেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে একমাত্র যথোপযুক্ত বিধিব্যবস্থাধীনেই সহ-শিক্ষার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড

প্রথমতঃ শিক্ষামন্ত্রীকে সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধনের ব্যাপারে পরামর্শ-দানের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কয়েকটি ক্ষমতা সাপেক্ষ মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড অবশ্যই গঠন করা উচিত বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন।

কমিটির অধিকাংশ সদস্য এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, চূড়ান্তভাবে গৃহীত ভারতের শাসনতন্ত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে যদি সর্ববিধ ধর্মশিক্ষাদান নিষিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়গুলিতে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের পরিবর্তে ধর্মসম্বন্ধীয় সাধারণভাবের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলিত প্রার্থনা, ধর্মসঙ্গীত ও উপযুক্ত উপদেশমূলক অংশবিশেষগুলি ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে ধর্মভাব জাগরিত করিবার জন্য পাঠাভ্যাসের অনুমতি দেওয়া যাইবে।

নৈতিক শিক্ষাদানের প্রশ্ন সম্পর্কে কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রতি বিদ্যালয়েরই ছাত্রছাত্রীগণকে শারীরিক দিক হইতে উপযুক্ত, মানসিক দিক হইতে সর্বদা সচেতন এবং নৈতিক দিক হইতে সুদৃঢ়চরিত্র করিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে। এই সকলের জন্য সকল বিদ্যালয়েই সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে যাহাতে নিশ্চিতরূপে সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্ব এবং সুদৃঢ় ও নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা দরকার।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সমূহে শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে, তৎসম্পর্কে ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে :—

শিক্ষার প্রথম অবস্থায় বালকবালিকাগণকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত, গবর্নমেণ্ট এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষাব্রতিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এই নীতির ব্যত্যয় ঘটিলে শিশুর পক্ষে তথা সমাজের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে।

প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে,—যে কোনও একটি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা কোনও রাষ্ট্রের বা প্রদেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যে প্রদেশের বাসিন্দা, সেই প্রদেশে কোন একটি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার এবং তাহা প্রবর্তিত করার প্রচেষ্টায় অসন্তোষ এবং তিক্ততা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি হইবে এবং ভারতের জাতীয়তা বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

ইউরোপের দেশসমূহের ইতিহাসের প্রতি এ সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইংলণ্ড ইংরেজী ভাষাকে আয়ারল্যাণ্ডের উপর এবং জার্মাণী জার্মাণ ভাষাকে পোলদের উপর চাপাইতে চাহিয়াছিল। পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ তাহাদের কোন বিশেষ একটি ভাষা বৈদেশিক ভাষাভাষী অধিবাসীদের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রতি ক্ষেত্রেই ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে।

ইউরোপীয়গণ যে নীতি অবলম্বন করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে, ভারতের পক্ষে সে নীতি অবলম্বনের কোন যৌক্তিকতা নাই। প্রাদেশিক ভাষা মাত্রই ভারতীয় ভাষা। ভারতের কোনও প্রদেশ, সেই প্রদেশবাসী বালকবালিকাদিগকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের মৌলিক অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করিবে, তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, যদি কোনও প্রদেশ শাসন-সৌকর্যার্থ কোনও বিশেষ একটি ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা এবং পরস্পরের সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হওয়ার জন্য, নিজের স্বার্থেই ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের ঐ ভাষা শিক্ষা করা উচিত।

সুতরাং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি সাধারণভাবেই প্রযোজ্য ; কিন্তু বাস্তবের দিক দিয়া

বিচার করিলে দেখা যায়, এ সম্বন্ধে দুইটি প্রতিবন্ধক আছে।

প্রথমতঃ, শিক্ষার প্রথম অবস্থায় এই নীতি প্রধানতঃ প্রযোজ্য অর্থাৎ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে, অথবা ৬ বৎসর হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার জুনিয়ার বনিয়াদী স্তরে এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহার কারণ এই যে, বাধ্যতামূলক শিক্ষার স্তরে বালকবালিকাদিগকে এমন কোনও ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করা উচিত নহে, যে ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা নহে। জুনিয়ার বনিয়াদী শিক্ষার পরবর্তী উচ্চ স্তরের শিক্ষায়, ছাত্রদের পক্ষে প্রদেশে প্রচলিত ভাষা শিক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ক্ষেত্রে বালকবালিকাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত কম, সে সকল ক্ষেত্রে তাহাদের শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা প্রবর্তন করিলে শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। সুতরাং নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদের নিম্নতম সংখ্যা নির্দেশ করা বাঞ্ছনীয়। প্রাদেশিক অথবা ষ্টেট গভর্নমেণ্টসমূহ ঐ শ্রেণীর কোনও গ্রুপের উপর জোর করিয়া কোনও বিশেষ ভাষা চাপাইয়া দিতে বিরত থাকিবেন এবং তাহাদিগকে শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন।

ভারত গবর্নমেণ্টের অভিমত এই যে, উপরে যে নীতি বিশ্লেষিত হইল, প্রাদেশিক এবং দেশীয় রাজ্যের গবর্নমেণ্টসমূহ দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার জন্য সেই নীতি অবলম্বন করিবেন।

উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তন—ভারত-গবর্নমেণ্ট পূর্বাঞ্চলে যে একটি উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হিজলী বন্দিশালা প্রাঙ্গণেই সেই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়াছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া জানান যে, তিনি নিজে ভারত গবর্নমেণ্টের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের প্রধান সহ সম্প্রতি এতদুদ্দেশ্যে খড়্গপুর ও হিজলী অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। পরিদর্শন অন্তে খড়্গপুরের নিকট হিজলী বন্দিশালা অঞ্চলেই ঐ উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তন স্থাপন করা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়। ঐ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করার কাজ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ বিদ্যায়তনের কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক নিয়োগ করিবেন।

প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, গবর্নমেণ্ট উক্ত উচ্চতর কারিগরী বিদ্যায়তনের নিকটবর্তী একটি আদর্শ শহর গড়িয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ শহরটি প্রায় ১৫০ একর জমির উপর গড়িয়া তোলা হইবে। এই প্রস্তাবিত শহরে প্রায় ৪০০ পরিবারের স্থান সঙ্কুলান করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ শহরে বসতি করাইবার ব্যাপারে আশ্রয়প্রার্থীদের দাবীই অগ্রগণ্য করা হইবে। নগরটি গড়িয়া তুলিবার জন্য পরিকল্পনা সমাপ্ত হইয়াছে এবং এই নগর প্রতিষ্ঠার কাজ অতি সত্বর আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রধান মন্ত্রী হিজলীর নিকটে একটি বিমান-ঘাঁটিতে একটি আবাসিক সামরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, ঐ বিমানঘাঁটিটি ভারত গবর্নমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্ট উপরোক্ত উদ্দেশ্যে দেশরক্ষা বিভাগকে ঐ বিমানঘাঁটি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে ঐ বিমানঘাঁটি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। প্রস্তাবিত আবাসিক সামরিক কলেজটি আজমীর, বাঙ্গালোর ও ঝিলামে যেরূপ ধরনের সামরিক কলেজ আছে সেইরূপ হইবে। সামরিক কলেজ স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত ঐ অঞ্চলের কাছেই পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্ট ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর কেন্দ্রীয় কর্মস্থল স্থাপন করিতে চাহেন। এতৎসম্পর্কে পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিসভা

গত ১৩ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্নে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত কৈলাস নাথ কাটজু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

স্বামীজীর জীবনাদর্শের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ডক্টর কাটজু বলেন, "মানবসেবার মহান আদর্শই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একমাত্র সাধনা। আজিকার দিনে তাঁহার লোকসেবার সেই আদর্শ দেশবাসীকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতে হইবে। স্বামীজীর জীবনে বেদান্ত বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'জ্ঞানযোগ' 'ভক্তিযোগ' এবং 'কর্মযোগের' নীতি উপলব্ধি করিতেন। কিন্তু ভারতবাসীকে কর্মের পথেই অগ্রসর হইতে তিনি আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। 'কর্মেই আনন্দ, কর্মেই মুক্তি, কর্ম করিয়া যাও'—স্বামীজী একথাই বলিতেন। বেদান্তের মর্মবাণী তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নাই—বেদান্তে এই শিক্ষাই আমরা পাই। স্বামীজী কখনও বিশ্বাস করিতেন না যে, মানুষে মানুষে সত্যিকারের কোন পার্থক্য আছে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ সেবার কার্যে নিজেদের বিলাইয়া দিয়াছেন। বিদেশী শাসকের শাসনে দেশ যখন বিধ্বস্ত এবং জাতির প্রাণশক্তি যখন বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, সেই সময় স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে জাতিকে দেশাত্মবোধে জাগ্রত হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। স্বামীজী বাঙ্গলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও লেখায় ভারতের অগণিত নরনারী অপূর্ব প্রেরণা লাভ করিয়াছে। তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে গৌরবের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।"

বিচারপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাঙ্গলার যে সব সাধকের সেবা ও আত্মদানের ফলে ভারতের স্বাধীনতা আসিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দেশবাসীকে যে নূতন বাণী দান করিয়াছিলেন উহা মহাবীর্যের বাণী। তিনি বেদান্তের বাঙ্ময়ী মূর্তি ছিলেন। দেশে দেশে তিনি আর্যসভ্যতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। শিকাগোতে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা কখনই ভুলিবার নহে। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতাটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।"

বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী বলেন, "আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ধর্ম সত্য ত্যাগ ও সংযম ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এই গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় বিশেষত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানমূলে যুগোপযোগী পরিবর্তন স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া আছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের নরনারীগণ যদি স্বামীজীর প্রদর্শিত এই মহান আদর্শে আবশ্যকীয় পরিবর্তন বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের সকল সমস্যার সমাধান হইবে এবং ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে।"

বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, "দেশের বর্তমান সঙ্কট-মুহূর্তে আজ স্বামী বিবেকানন্দের মত এরূপ একজন নেতার প্রয়োজন যিনি আমাদিগকে পরিচালিত করিতে পারেন। একমাত্র তিনিই মানুষের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।"

শ্রীযুক্ত বিশ্বাস অতঃপর বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের জন্য উদারহস্তে অর্থ সাহায্য করিতে দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। এই কার্যে ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তিনি আশা করেন যে দেশবাসী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য সংস্কৃতে স্বামীজীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটির বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানান। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর রচিত "সমাধি" গান করেন এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "সখার প্রতি" কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সভায় নগরীর বিশিষ্ট নরনারী উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি সভার এক পার্শ্বে পুষ্পশোভিত করিয়া রাখা হয়। সভাপতি ডক্টর কাটজু প্রারম্ভে উহাতে মাল্যদান করেন।

উদ্বোধন
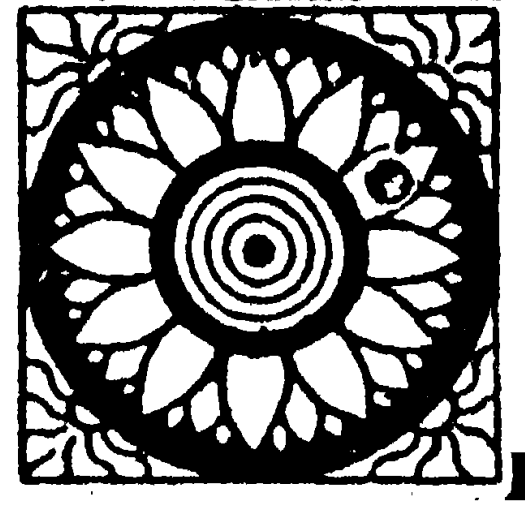
ব্যক্তি-অধিকারবাদ

সম্পাদক

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে পৃথিবীর সকল দেশেই রাজতন্ত্র-শাসন-পদ্ধতি (Monarchism) প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনুন্নত কয়েকটি দেশে ইহার প্রাধান্য বিদ্যমান। এই শাসন-তন্ত্রে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সম্মানিত। তিনি সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন এবং ব্যক্তিমাত্রেরই সকল অধিকার তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগ্রহাধীন। রাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তি বা জনসাধারণের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রাজদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত। এই নীতি উপেক্ষা করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্যের কয়েক জন মনীষী রাষ্ট্রক্ষেত্রে ব্যক্তি-অধিকারবাদ (Individualism) প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই মতবাদে রাজা রাষ্ট্র জাতি ও সমাজের অধিকার অপেক্ষাও ব্যক্তির অধিকারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত।

ঐতিহাসিকগণের মতে মনীষী লক্ (১৬৩২—১৭০৪ খৃঃ) কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ প্রথম প্রচারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগামী প্রচারক রুসো (১৭১২-১৭৭৮ খৃঃ) এক দিকে দার্শনিক প্লেটোর ন্যায় জনসাধারণের বা সমাজের অধিকার এবং অপর দিকে পণ্ডিত লকের ন্যায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার মাহাত্ম্য সমভাবে প্রচার করেন। রাষ্ট্রের অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তি-অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা তাঁহার মতবাদের বৈশিষ্ট্য। অনেকের মতে ইহা সম্ভব না হইলেও রুসো ইহাকে সম্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংস্থা বা সমাজ-পরিচালনের রীতিবিশেষ। সমাজ বা জনগণ ইহার শক্তির মূল উৎস। সুতরাং জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া সঙ্গত। জনসাধারণ বা সমষ্টি ব্যক্তি বা ব্যষ্টির সমবায়। এই কারণে ব্যক্তি-স্বাধীনতাই জনসাধারণের স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

এই মনীষীর মতানুসরণে ইংলণ্ডে মেজর জন্ কার্টরাইট্ (১৭৪০-১৮২০ খৃঃ) ব্যক্তি-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক উইল্‌হেম্ ভন্ হাম্‌বল্ (১৭৬৭-১৮৩৫ খৃঃ) নামক জনৈক শক্তিশালী জার্মান লেখক বিশেষ জোরের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রচার করিতে থাকেন। তিনি বলেন, মানুষের পক্ষে রাষ্ট্র একটি অপরিহার্য অমঙ্গল। মানুষের জীবন এবং ধন-সম্পদ

সংরক্ষণেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকা সঙ্গত। ব্যক্তির উন্নতির জন্ত তাহার চিন্তায় ও কার্যে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক।

ইংলণ্ডের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক টমাস্ পেইন্ (১৭৩৭-১৮০৯ খৃঃ) এবং তাঁহার মতাবলম্বী রিচার্ড কার্লাইট্ও (১৭৯০-১৮৪৩ খৃঃ) উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্তি-অধিকার প্রচার করেন। ইঁহারা উভয়েই ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের অত্যধিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন।

এই সময়ে বিখ্যাত লেখক বেন্থাম্ (১৭৪৮-১৮৩২ খৃঃ) প্রচারিত হিতবাদ (Utilitarianism) অর্থাৎ 'অধিকসংখ্যক লোকের অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান' ইংলণ্ডে ব্যক্তি-অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান মত বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই কালে ফরাসী দেশে 'ভূমি এবং ইহার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহই সকল সম্পদের মূল' এই মতবাদ (Physiocracy) উদ্ভূত হয়। এই মতবাদীদের (Physiocrats) সমবেত ধ্বনি—"ইহাতে (ভূমিতে ব্যক্তি-অধিকারে) হস্তক্ষেপ করিও না" (*Laissez faire*) দ্বারা হিতবাদী বেন্থাম্, তাঁহার মতাবলম্বী অর্থনীতির প্রচারক য়্যাডাম্ স্মিথ্ এবং শ্রমিক নেতা ফ্র্যান্সিস্ প্লেস্ প্রভৃতি প্রভাবিত হন।

পণ্ডিত বেন্থাম্, তদীয় শিষ্য জেম্স্ মিল্ এবং যশস্বী লেখক হব্স্ প্রচার করেন যে, মানুষ স্বার্থপর জন্তুবিশেষ। স্বাধীনতা ও ক্ষমতা-স্পৃহা তাহার মজ্জাগত। এই জন্য যাঁহাদেরই উপর দেশের শাসনভার অর্পিত হইবে, তাঁহারাই ক্রমে অধিকতর স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের জন্ত জনসাধারণের স্বাধীনতায় উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় হস্তক্ষেপ করিবেন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে জনসাধারণের ভোটমূলে পুনঃ পুনঃ শাসন-পরিষদের সভ্য পরিবর্তন করা আবশ্যক।

জেম্স্ মিলের পুত্র সুলেখক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ (১৮০৬-১৮৭৩ খৃঃ) সমাজতন্ত্রের (Socialism) প্রতি অনুরক্ত হইয়াও ব্যক্তি-অধিকার সংরক্ষণের আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন। তিনি অনেক যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অপরের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করিলে প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তায় ও আলোচনায় স্বাধীনতা থাকা দরকার। তিনি ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার অব্যাহত রাখিয়া গণতান্ত্রিক (Democratic) রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা তাঁহার কাম্য ছিল। ষ্টুয়ার্ট মিল্ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অন্যতম প্রথিতযশা পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩ খৃঃ) প্রচার করেন যে, এই দুইটি মতবাদ পরস্পরবিরোধী। তিনি ব্যক্তির জীবন সম্পদ ও স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্র-শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্পেন্সারের এই মতবাদকে অধ্যাপক হাক্সলি বিদ্রূপ করিয়া 'শাসন-তান্ত্রিক নাস্তিকতা' (Administrative Nihilism) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আধুনিক বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের মধ্যে বার্ট্র্যাণ্ড্ রাসেল্ তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থে পরিপূর্ণ ব্যক্তি-অধিকার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তি-অধিকার নষ্ট করিলে মানুষের সৃজনী শক্তির উৎস রুদ্ধ হইয়া মানব-সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। অধ্যাপক এইচ্ জে ল্যাস্কি রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার ব্যক্তি-অধিকার বা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে কোন কারণেও মানুষের স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। তিনি বলেন, ব্যক্তির কল্যাণসাধনই সকল মতবাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া সঙ্গত। অধ্যাপক এল্ টি হব্‌হাউস্ তৎপ্রণীত কয়েক খানি গ্রন্থে

লিখিয়াছেন যে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপরিহার্য। অন্যতম প্রসিদ্ধ লেখক লর্ড হিউ সেসিল্ ধর্মভিত্তির উপর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা প্রচার করেন। তাঁহার মতে ব্যক্তির উন্নতির জন্য মানুষমাত্রেরই বিবেকের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিতে অধিকার থাকা আবশ্যক।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা লেখকগণের মধ্যে অধিকাংশই সংঘবদ্ধ-গণ-অধিকারবাদী (Collectivists) এবং সমাজতন্ত্রবাদিগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া জন-কল্যাণের নামে ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার নষ্ট করা সমর্থন করেন না। তাঁহাদের লেখায় রাষ্ট্র ও ব্যক্তি, আইন ও স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অধুনা পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছাচারমূলক রাজতন্ত্র প্রচলিত। উন্নতিশীল দেশসমূহের অধিকাংশেই কমবেশী সমাজতন্ত্র-নীতিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। কেবল রাশিয়া এবং ইহার প্রভাবাধীন কয়েকটি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর একচ্ছত্র প্রাধান্যপূর্ণ সাম্যবাদী (Communist) রাষ্ট্র স্থাপিত। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি-অধিকারের উপর রাজশক্তির সার্বভৌম অধিকার বিদ্যমান। গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি-অধিকার অপেক্ষা জনগণের অধিকারের উপর গুরুত্ব বিশেষ ভাবে আরোপিত। এতদুভয় রাষ্ট্রেই জনগণের স্বার্থ-বিরোধী ব্যক্তি-অধিকার স্বীকৃত নহে। সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তি-অধিকার এরূপ সীমাবদ্ধ যে, রাষ্ট্রের অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ব্যক্তিও একটি সম্পদ-বিশেষরূপে পরিগণিত। ইহাতে ব্যক্তির শিক্ষা এবং ভরণ-পোষণের দায়িত্বও রাষ্ট্র কর্তৃক পরিগৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

ওগো কবীন্দ্র,
এ কী খেলা তব,
সুন্দর অভিনব।
কুসুমে কুসুমে বাজাইলে বাঁশী
বজ্রে গাহিলে গান,
শত শত যুগ কেটে যাবে তবু
হবে না তো তারা ম্লান।
উদয়াচলের কোমল আলোক অস্তাচলের বুকে
মুখখানি রেখে সুখে,
যাত্রাপথের কথা করে কানাকানি,
সন্ধ্যার সাথে পাছে হয় জানাজানি।
বহ্নি জালিয়া তাই পশ্চিম তীরে
স্নান-সমাপনে সূর্য দেবতা
ফিরে যান ধীরে ধীরে।
চির-দিনান্তের বাণী—
বাণীর বাঁধনে তুমি তারে দিলে আনি।
দূর-দিগন্তে অলাতচক্রে
ধূসর উষর সীমাহারা মরুপারে,
যে সঙ্গীত বারে বারে
মূর্চ্ছনা তোলে একক যাত্রি-প্রাণে,
তারি সুর বুঝি দোলা দিয়ে গেছে
অলক্ষ্যে তব গানে।

ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস
অনাদি কালের ইতিহাস
দূর সমুদ্রের গম্ভীরা বারে বারে
ব'লে যায় কথা বালিময় তীরে তীরে।
তুমি তটে বসি' পেতেছিলে তব কান,
নিভৃতে শুনেছ সে সব কাহিনী
শুনেছ সে সব গান।
যবে দুর্গম নভে হংস-বলাকা
পক্ষ বিধূনি চলে,
স্পন্দন তার তোমার রক্তে
যাত্রাপথের সন্ধান গেল ব'লে।
শত ঝঙ্কার মঞ্জীর ধ্বনি
যুগ-যুগান্তে উঠিয়াছে রণি'
আদিম কালের অরণ্য পল্লবে,
কত বসন্তের আহ্বানে তারা
মুঞ্জরিয়াছে সবে,—
সেই কাঁননের শাশ্বত নব স্বর
তব অন্তরে রাখিয়াছে স্বাক্ষর।
জটাজূট বাঁধি কাল বৈশাখী—
নেমেছে প্রলয়নৃত্যে,
ছন্দে তাহার দোলা রেখে গেছে
তোমার মুক্ত চিত্তে।

কত বসন্তের শ্যাম সমারোহে
ডুবায়ে প্রাণের দুই কূল,
বনবীথি তলে অশোক চাঁপার
রাঙা হ'তো যবে বনফুল।
আকাশে বাতাসে দখিন সমীরে
যে-গান উঠিত ধ্বনি,
তোমার বীণার তারে তারে সে যে
উঠেছিল অনুরণি'।
পল্লীর বাটে শান্ত কুটীর ছায়ে
নদীতটে তটে নির্জন বনবায়ে,
উচ্ছল ঐ নগরের কোলাহলে
উৎসব রাতে দীপমালা ওঠে জ্বলে।
সেই আলো আর সে কল-কাকলী
অন্তর তব ঘিরে
তোমার বাণীরে মুখর করেছে,
পরশি' গিয়াছে ফিরে।

নববিচিত্র মানবতীর্থে
তোমারই অভিসারে,
জীবন তোমারে ভালবেসেছিল
তুমি বেসেছিলে তারে।
বিশ্বকেন্দ্রে মর্মরন্ধ্রে
নিত্য উৎসারিত,
নব নব রূপে নবীন রেখায়
রূপায়িত লীলায়িত।

আকাশে বাতাসে অধরে ভূধরে
সদাই উছলে সৃষ্টির নবানন্দ,
তোমার মধুর একতারা খানি
বাজায়েছে সেই ছন্দ।
কত প্রভাতের উদয়ের ক্ষণ,
কত গোধূলির লগ্ন,
তোমার সঙ্গে অরূপ রূপেতে
হয়েছে নিবিড় মগ্ন।
বজ্রমাদল যথন আকাশে
বাজিয়াছে গুরু গুরু,
তোমার যাত্রা সেইখানে হ'ল সুরু,
তোমার যাত্রা সেইখানে হ'ল শেষ—
কম্প্র স্থিতির
নম্র মায়ার নেই যেথা কোন লেশ।
চির-আনন্দ চির-উজ্জ্বলময়,
তোমারি নয়নে সেই সে জ্যোতির্ময়
দিবসে নিশীথে ভিতরে বাহিরে
বাজায়েছে তার বাঁশী,
তুমি শুনেছিলে,
তাই বলেছিলে—
ক্ষণ-ভঙ্গুর জগতেরে ভালবাসি।

তাই চিরকাল ধ'রে
তোমার চরণ তলে,
জীবন-যাত্রী দিবে আর নিবে,
মেলাবে মিলিবে,
হেথা আসি দলে দলে,
বন্ধন মাঝে চেয়েছ মুক্তি
দুঃখের মাঝে হাসি,
সেইতো তোমার চরম মন্ত্র,
হে বৈরাগী, মনীষী।

নবযুগের সাধনা

স্বামী তেজসানন্দ

(প্রথম পর্ব্ব)

স্বাধীনতা-সংগ্রাম-বিজয়ে আজ দিকে দিকে যে বিপুল আনন্দ ও উল্লাস লক্ষিত হইতেছে, তাহার মূলে কত অতন্দ্রিত প্রচেষ্টা, কত কৃচ্ছ্র-সাধনা, কত আত্মবলিদান নিহিত রহিয়াছে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই গৌরব-মণ্ডিত শৌর্য্য-বীর্য্য-কাহিনী গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া আজ স্বতঃই স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিতেছে। অতীতের গর্ভ হইতেই ভবিষ্যতের জন্ম হয়। ভারত-ভারতীর অতুল ভাব-সম্পদ অতীতের সাধনা-সঞ্চিত শক্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র। ভারত-হৃদয়-গোমুখী হইতে সুদূর অতীতে যে কৃষ্টি-গঙ্গা জন্মলাভ করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কখনও ফেনিল উচ্ছ্বাসে, কখনও ধীর মন্থর গতিতে, বিভিন্ন চিন্তা ও কর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্য দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, বিচিত্র-ভাব-তরঙ্গভঙ্গ-মুখরিত সেই কৃষ্টিপ্রবাহই ভারতের জাতীয় জীবনকে নব চেতনায় পুনঃ উদ্বুদ্ধ করিয়াছে,—ভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়া জাতির ললাট-ফলকে স্বাধীনতার বিজয় তিলক পরাইয়া দিয়াছে। অতীতের শক্তি-সাধনা শ্রদ্ধাপূরিত হৃদয়ে স্মরণ করিবার পুণ্য দিন আজ পুনঃ সমাগত। অতীত মৃত নহে,—উহারই প্রাণদ প্রবল প্রবাহ আজও আমাদের প্রতি শিরায় শিরায় সঞ্চারিত; উহাই জাতিকে প্রাণবন্ত ও মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়া রাখিয়াছে। যুগে যুগে কত সিদ্ধ সাধক এই অকুণ্ঠ সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, কত অজ্ঞাত ভগীরথ বিজয়-শঙ্খ বাদনপূর্ব্বক সুমেরুসদৃশ শত সহস্র বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া অচ্যুত-চরণ-চ্যুত ভারত-ভাব-সুরধুনীকে অখণ্ড ব্রহ্মলোক হইতে ভারত-বক্ষে আনয়ন করিয়া জাতীয় জীবনকে অমূল্য সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন,—আজ যেন সেই মহারথিবৃন্দের অক্লান্ত সাধনা ও আত্মত্যাগ,—তাঁহাদের অমর অবদান—এই আনন্দ-হিল্লোলের মধ্যে বিস্মৃত না হই।

অতীতের শহীদ-বৃন্দের স্মৃতি-তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের কত বীর্য্যবান কৃতী সন্তানের ত্যাগ-সমুজ্জ্বল জীবন-আলেখ্যই না চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে! যাঁহারা অতীতের অবদানকে সাদরে শিরে ধারণ করিয়া লইয়াছেন, যাঁহারা ভারতের সার্ব্বভৌম সংস্কৃতির আদর্শকে ভিত্তি করিয়া জগতের বিভিন্ন কৃষ্টি-কেন্দ্রোত্থিত ভাবরাশি যথাপ্রয়োজন আহরণ করিয়া ভারতকে নবীন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, ইতিহাস তাঁহাদের পুণ্যকীর্ত্তি-গাথা বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোহিত কত মনীষী ভারতের সনাতন আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া ভারতের রাষ্ট্র-সৌধ ও কৃষ্টি-জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য আজও অক্লান্ত সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমান যুগের এই সকল ভারত-ভাগ্যবিধাতৃগণের কথা যতই আমরা চিন্তা করি, ততই যুগ-নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি-সাধনার অপূর্ব্ব ইতিহাস আমাদের নয়নের

সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। কি সাধনার বলে ভারত আজ ভারত, কি আদর্শ ভারতকে আজও বিশ্বমাঝে গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, বিবেকানন্দের বৈচিত্র্যবহুল সাধন-জীবন ও তাঁহার মর্ম্ম-স্পর্শী বাণী তাহাই আমাদিগকে আজ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে জাতির রাষ্ট্র-জীবনকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার মুখে, আজ আমাদিগকে তাঁহার সাধনা,—তাঁহার অমূল্য অবদান বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে। ভারত-কৃষ্টির মূর্ত্ত-প্রতীক বিবেকানন্দের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যে সাধনাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বোদ্যানে বিকশিত হইয়াছিল এবং মৃতপ্রায় জাতীয় জীবনে শক্তি-সঞ্চার করিয়া ইহাকে আত্ম-সম্বিদ্ প্রদান করিয়াছিল, তাহাই ভারতের সনাতন আদর্শ, তাহাই যুগ-ধর্ম্ম ও যুগ-সাধনা। ভবিষ্যৎকে যদি আরও উজ্জ্বল ও মহীয়ান করিয়া তুলিতে হয়, সমষ্টিগত জীবনকে যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে এই মহা-মনীষীর পবিত্র সাধক-জীবন বিশ্লেষণ করিলেই নবযুগের সাধনার প্রকৃত সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারত-ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রতীচ্যের ইতিহাস ও বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও দর্শন, রাজনীতি ও সমাজনীতি, শিল্প ও কলা তন্দ্রালস ভারতের অর্দ্ধনিমিলিত নয়নের সম্মুখে এক রঙ্গিন চিত্রপট খুলিয়া ধরিল, বাংলা তথা ভারতের যুবশক্তি তখন এক নূতন জগতের সহিত পরিচয় লাভ করিল। দিনের পর দিন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অলৌকিক শৌর্য্য-বীর্য্য-কাহিনী, মার্কিন দেশবাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রামে অপূর্ব্ব আত্মবলিদান, ফরাসী-বিপ্লবোত্থ সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের মর্ম্মস্পর্শী বাণী, পাশ্চাত্য মনীষার যুগান্তরকারী অত্যদ্ভুত আবিষ্কার, জড় প্রকৃতির উপর মানবের একাধিপত্য, এবং সর্ব্বোপরি নিখিল-দেবতা-দেউলে মানবের উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রতিভার প্রতিষ্ঠা ও আরাধনা, ভারতের বক্ষে এক বিপুল স্পন্দন ও নবচেতনা জাগাইয়া তুলিল। অলক্ষিতে ভারত-ভারতীর অন্তরে এক প্রচণ্ড অশান্তি ও বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং সদ্যজাগ্রত জাতির চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল। প্রতীচ্যের সব কিছুই যেন সুন্দর, মাধুর্য্যমণ্ডিত; পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের সম্মুখে যেন মুক্তির তোরণদ্বার সহসা উন্মুক্ত! পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ভারত-মনীষার এই নবানুরাগ অন্ধ অনুকরণে পর্য্যবসিত হইতে বিলম্ব হইল না। উন্মত্ত আবেগে প্রাচ্য জগৎ প্রতীচ্যের রজঃপ্রধান শক্তিসাধনায় মাতিয়া উঠিল—অন্তরের তীব্র উন্মাদনা ও অশান্তি প্রচণ্ড ধ্বংসের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। ভারতের যুব-শক্তি ভাবিতে শিখিল, ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন, দেবতা ও সমাজ, আচার ও নীতি সবই যেন এক উদ্দেশ্য-বিহীন কবি-কল্পনা, কতকগুলি কুসংস্কারের সমষ্টি মাত্র; বাস্তবের সঙ্গে যেন কোন সম্বন্ধ নাই! তাহা না হইলে, মুষ্টিমেয় বিদেশী বণিকের তুচ্ছ আক্রমণে যুগযুগান্তরের সাধনা-সৃষ্ট জাতীয় জীবন-সৌধ তাসের ঘরের মত এত সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িবে কেন?

এমনি ভাবে প্রতীচ্য-সংস্পর্শে ভারতের কোটি-কল্পসাধনা-লব্ধ অমূল্য সম্পদ যখন আর্য্যসন্তান-চক্ষে অতি হেয় তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল এবং এক প্রবল পরিবর্ত্তন-তরঙ্গ ভারত-বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সংস্কার-তুফানে আলোড়িত ও মথিত ভারত-সংস্কৃতির জঠর হইতে নূতন সাধনা লইয়া আবির্ভূত হইলেন—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহারও যৌবন-জীবনের উন্মাদ কল্পনা পাশ্চাত্যভাবে কথঞ্চিৎ রঙিন হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না। একদিকে প্রাচ্যের সর্ব্বংসহ

আস্তিক্যবাদ ও সার্ব্বভৌম সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং তৎপার্শ্বেই সঙ্কীর্ণতা-পঙ্কিল সমাজের পূতিগন্ধময় লোককণ্ঠাবরোধী নিষ্ঠুর আচার-প্রথা, আভিজাত্যের অহঙ্কার, দুর্ভিক্ষ ও দৈন্য, মহামারী ও অন্ধ-কুসংস্কারের নির্ম্মম অত্যাচার; আর অপর দিকে প্রতীচ্য-রাজ্যে ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম ও বেনের নাস্তিক্যবাদ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ এবং সর্ব্বোপরি জড়-বিজ্ঞানের দুন্দুভি-নিনাদ, বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অশৃঙ্খলিত গতি ও স্বাধীনতা, সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের উদার আদর্শের উপর সমাজ-জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃতিমন্থনোদ্ভূত অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য-সম্ভার!—এ দৃশ্য যুবক নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) হৃদয়ে এক তুমুল তুফান তুলিল; সন্দেহদোলায় তাঁহারও চিত্ত দুলিয়া উঠিল। ভারত-প্রতিভার জাগ্রত মহিমা-মূর্ত্তি সত্যসন্ধ নরেন্দ্রনাথ এ বিচিত্র দর্শনে বিস্মিত হইলেও সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইলেন না—ধীর পদসঞ্চারে সত্যের সন্ধানে অভিযান সুরু করিলেন। ভারতের নবযুগের সাধনেতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। বলা বাহুল্য, নরেন্দ্রনাথের এই অভিযান ভারতপ্রতিভারই বিশ্ব-কল্যাণ-বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ ভিন্ন আর কিছু নয়।

সত্যলাভের উন্মাদনায় নরেন্দ্রনাথ আবেগ-ভরা প্রাণে কত অনিদ্র রজনী কাটাইলেন, কত অশ্রুনীরে ভাসিলেন, দ্বারে দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন, কিন্তু কোথাও কোন সাড়া মিলিল না। ঈশানের জটারুদ্ধ নির্গমন:পথ-হারা ফেনিল অলকানন্দার মতই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়দুর্গে অবরুদ্ধ ভারতের প্রাণশক্তি আজ গভীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথের বেদনাতুর হৃদয়ের এই মর্ম্মন্তুদ ব্যাকুলতা ব্যর্থ হইবার নয়। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বরের দীন পূজারী সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জীবন্তমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অশরীরী আহ্বান-বাণী নরেন্দ্রনাথের মর্ম্মদুয়ারে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। যে মহাপুরুষের বিশাল হৃদয়ে ভারতের বিচ্ছিন্ন শক্তিনিচয় কেন্দ্রীভূত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে, যাঁহার বিশ্বগ্রাসী আত্মিক শক্তির দুর্জ্জয় আকর্ষণে আজও দিগদিগন্তর হইতে কত শত প্রাণ শান্তির উদ্দেশে তাঁহার আদর্শ পানে ছুটিয়াছে, সেই সাধকশিরোমণি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধানে সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলেন। তথায় দেখিলেন দীর্ঘসমুন্নতদেহ, আজানুলম্বিতবাহুযুগল, প্রশস্ত ললাটে মহিমার বিচ্ছুরিতদ্যুতি, নেত্রে শান্তোজ্জ্বলকরুণা, প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত আবেগে যেন তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতীচ্যশিক্ষা-দৃপ্ত নরেন্দ্রনাথের কম্পিতকণ্ঠে তাঁহার চিরপোষিত প্রশ্ন ধ্বনিয়া উঠিল, "আপনি ভগবান দর্শন করিয়াছেন?" এই সেই চিরন্তন প্রশ্ন যাহা যুগে যুগে কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে;—যুগে যুগে অগণিত ঋষিকণ্ঠে যাহার অনন্ত মীমাংসাও ঘোষিত হইয়াছে; এই সেই প্রশ্ন যাহা কতবার কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, যাহা আবার মানবহৃদয়ে নূতন রূপে নূতন ছন্দে যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রশান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, যেমন তোমাকে দেখিতেছি; তার চেয়েও স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" অতীত যুগে আর্ত্ত পথহারা মানবের কল্যাণে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠে ঠিক এমনিভাবেই একদিন অভয়-বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল,—

> "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি
> দিব্যানি তস্থুঃ।
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং
> তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা
> বিদ্যতেঽয়নায়॥"[১]

—হে মর্ত্ত্য ও দিব্যধামবাসী অমৃতের সন্তানগণ, আমি

১ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ২।৫ ; ৩।৮

অজ্ঞানান্ধকারের অতীত সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশ সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যাঁহাকে দর্শন করিলে মানব জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। তাঁহাকে জানা ভিন্ন এ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

বিংশ শতাব্দীর উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া কে তুমি দিব্যপুরুষ আজ ভোগমদিরামত্ত জগতের মাঝে পথভ্রান্ত পথিককে ভারতগৌরব আর্য্য ঋষিগণের সেই অমৃতবাণী আবার বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে শুনাইতেছ? কে তুমি আত্ম-সম্বিৎভরা প্রাণে সন্দেহাকুল আত্মবিস্মৃত মানবকে স্বর্গীয় আলোকের সন্ধান দিতেছ? নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে নরেন্দ্রনাথ উৎকর্ণ হইয়া সে আশ্বাস-বাণী শুনিলেন। নরেন্দ্রনাথের নিষ্পলক মুগ্ধ দৃষ্টি পূজারীর পবিত্র মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ হইল। নয়নে নয়নে বিদ্যুৎ ছুটিল,—নীরবে নিমিষে কত কথা হইল—কত জানাজানি হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথের তপ্ত হৃদয় এক অসীম তৃপ্তি ও ভরসার অমিয়ধারায় অভিষিঞ্চিত হইয়া গেল; তাঁহার শুষ্ক বিচার বুদ্ধি প্রেমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। জড়বিজ্ঞানের গর্ব্বোদ্ধত শির আজ ভারতকৃষ্টির সৌম্য গম্ভীর ধ্যানমূর্ত্তির পদ-প্রান্তে আপনিই লুটাইয়া পড়িল। সন্ধ্যারতির শুভ শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত ভাগীরথীবক্ষে লহরীমালার শীর্ষে শীর্ষে দিগন্তের প্রতিফলিত পীতাভ লোহিতরশ্মি দিন-যামিনীর শুভ সন্ধিক্ষণ জ্ঞাপন করিয়া দিল। এই পবিত্র গম্ভীর গোধূলি-লগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যচক্ষে দেখিলেন, সপ্তর্ষি-মণ্ডলের জ্ঞানবৃদ্ধ ধ্যানমগ্ন ঋষি মানবকল্যাণ-সাধনে দেহ ধারণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ-রূপে তাঁহারই পদপ্রান্তে আজ লুণ্ঠিত। শ্রদ্ধানত শিষ্যশিরে বরহস্ত প্রদান করিয়া প্রেমিক পুরুষ প্রেমভরে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" ভারতের প্রতি শিরায় শিরায় এক নব চেতনার বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল। ভারতের ঘোর অমানিশার যুগে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত নরেন্দ্রনাথ গভীর নিস্তব্ধ নিশিতে দিব্য সাধনায় ডুবিয়া গেলেন। তমিস্রারজনীর সেই আঁধার-যবনিকা ভেদ করিয়া এই লোক-কল্যাণচিকীর্ষু সাধকের সাধনার রহস্য কে উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে?

সত্যলাভের আকুল আগ্রহ নরেন্দ্রনাথকে আজ পাগল করিয়া তুলিয়াছে। কখনও নির্জ্জন গিরি-কন্দরে, শ্বাপদসঙ্কুল ঘনবনানীর অন্তরালে পর্ণকুটীরে, কখনও গঙ্গাতীরে শ্মশানালয়ে, কখনও ভিক্ষাশনে অসহায় ছিন্নবাসে এই অদ্ভুত সাধক আলোর সন্ধানে অফুরন্ত কৃচ্ছ্রসাধনায় নিমগ্ন। তীব্র বিষয়বৈরাগ্য, বন্ধনমুক্তির উন্মাদনা ও অন্তরের আকুলি-বিকুলি, বিশ্বের সমগ্র প্রলোভন ও বাধাকে তাঁহার নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। মনের স্তরে স্তরে জন্মজন্মার্জ্জিত পুঞ্জীভূত বিরুদ্ধ সংস্কার মর্দ্দিত ফণীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বিষাক্ত ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে আজ সংকল্পচ্যুত করিতে উদ্যত। নরেন্দ্র-নাথ সুমেরুবৎ নির্ব্বিকার, অটল, অচল। এক ধ্রুব লক্ষ্য—সত্যানুসন্ধান;—প্রকৃতির মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া সত্যকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁহার মর্ম্মের তীব্র বেদনা ও অক্লান্ত সাধনা প্রাণপ্রিয় সখার উদ্দেশে আকুল উচ্ছ্বাসে তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"বিদ্যাহেতু করি প্রাণ-পণ অর্দ্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্ম্মতরে করি কতমত গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়;
নদীতীর পর্ব্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জ্জন?"[২]

সুদীর্ঘ সাধনায় নরেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন, বৈরাগ্যবিহীন শাস্ত্রবিচার ও অসংস্কৃত মন-বুদ্ধি মানুষকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। কালতরঙ্গে কত ইতিহাস ও পুরাণ, কত দর্শন

২ স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "সখার প্রতি" কবিতা।

ও বিজ্ঞান বুদ্ধির কুহেলী-লীলায় বুদ্‌বুদের মত ক্ষণে ক্ষণে জন্মলাভ করিতেছে,—কত সাধনার জটিল রীতিনীতি ও কত পন্থার সৃষ্টি হইতেছে। হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ করিয়া বুদ্ধিজীবী অন্ধমানব ক্ষুদ্র বুদ্ধির বর্ত্তিকা হস্তে অনাদি অনন্ত প্রেমসিন্ধুর সন্ধানে অনির্দ্দেশ্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিষয়-বাসনা-বিজড়িত মন-বুদ্ধি মানুষকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া কত জটিল বন্ধুর পথেই না চালিত করিতেছে! হায় মানব! তুমি জান না, তোমারই হৃদয়-মণিকোঠায় তোমার অমূল্য প্রেমসম্পদ নিহিত রহিয়াছে; তোমার প্রেমাস্পদ তোমারই হৃদিমন্দিরে চিরভাস্বর দিবাকরের ন্যায় আপন মহিমায় চির প্রতিষ্ঠিত। জড় বুদ্ধির যবনিকা টানিয়া দিয়া চক্ষুষ্মান্ হইয়াও আজ তুমি অন্ধ! চির উজ্জ্বল, চির সুন্দরকে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছ না। পুঁথিপুস্তকে, মন্দিরে, গির্জ্জায় প্রেমাস্পদের বৃথা অন্বেষণ! কস্তুরীমৃগ আপন সৌরভে আপনি আকুল; সুরভির সন্ধান সে জানে না—অন্ধের মত বনে বনে পাগল-পারা হইয়া সৌরভসন্ধানে ছুটিয়া বেড়ায়। তাই সন্ন্যাসীর অন্তরের কথা 'সন্ন্যাসীর গীতি' কাব্যে ধ্বনিয়া উঠিল,—

"অন্বিষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর?
পাবে না তো হেথা, কিংবা এর পর;
শাস্ত্র বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ;
নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসি,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥"[৩]

পথের সম্বলের সন্ধান দিয়া বলিলেন,—

"যত দূর যত দূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্ত্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—
বারম্বার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা, জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে
সম্বল।"[৪]

বহির্জগতে ব্যর্থকাম বাল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অন্তরের মণিকোঠায় আজ সঞ্চিত প্রেমের সন্ধান পাইয়া আত্মহারা। আজ তাঁহার অন্তর্মুখী নির্ম্মল চিত্ত ধীরে ধীরে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ রাজ্যের সমগ্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত নির্ব্বিকল্প সমাধি-সাগরে বিলীন, এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে হৃদয় মন পূর্ণ। দিব্যানন্দরস-স্পর্শে চিত্তবৃত্তি স্থির শান্ত সমাহিত। শুধু এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্ফূর্ত্তি,—

"কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদি কলয়তে বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥"[৫]

কেবল আনন্দ! আনন্দ! তার দিক নাই, দেশ নাই, সীমা নাই, আলম্বন নাই, রূপ নাই, নাম নাই! কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায় এক 'ভাবাতীত' ভাবে অবস্থিত। ধন্য বিবেকানন্দ! অক্লান্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আজ তুমি ভোগমত্ত অন্ধ পথভ্রান্ত মানবকে নবযুগের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, বেদ-বেদান্ত যাহার পরিচয় দিতে স্বতঃই কুণ্ঠিত হইয়া উঠে,—সেই অপ্রাকৃত অমৃতের সন্ধান প্রদান করিলে,—

"একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-
কাল-হীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন, 'নেতি-নেতি' বিরাম যথায়!"[৬]

৩ স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "Song of the Sannyasin" (সন্ন্যাসীর গীতি)।

৪ "সখার প্রতি" কবিতা।

৫ বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮

৬ বিবেকানন্দ-রচিত "সৃষ্টি"।

"জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা লয়।...
...ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্ব্বগুণভেদ।"
"কোটি সূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ।"[৭]
"অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ
বোঝে যার।"[৮]

দিব্য চক্ষে বিবেকানন্দ আরও দেখিলেন, সৃষ্টির উল্লাসে স্তিমিত চিৎসিন্ধুভেদি,—

"আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার,
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্য পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ-ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু;...
...আমি আদি কবি,
মম শক্তিবিকাশ রচনা,
জড় জীব আদি যত।
মম আজ্ঞা-বলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জ্জে মেঘ অশনি-নিনাদ;
মৃদুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে;
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু;
তোলে মুখ শিশির-মার্জ্জিত
ফুল্ল ফুল রবি-পানে!"[৯]

অদ্বৈতানুভূতি এই সীমান্তরেখায় জড়-চেতনের ভেদ আজ চিরতরে তিরোহিত। 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্',—সেই এক চিৎ-সিন্ধু হইতে অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, উহাতেই স্থিতি, আবার উহাতেই বিলয়।[১০] এই অদ্বয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবস্তুতে মিথ্যা নামরূপের কল্পনাই, সিন্ধুবক্ষে ফেনোর্ম্মিবৎ সৃষ্টির বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে,—পরমার্থতঃ এক নিরুপাধিক অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবাদি দ্বিতীয় বস্তুর পৃথগস্তিত্ব নাই।

"সৃষ্টির্নাম ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দবস্তুনি।
অব্ধৌ ফেনাদিবৎ সর্ব্বনামরূপ-প্রসারণা॥"[১১]
"তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারী চ কশ্চন॥"[১২]

ব্যুত্থিত বিবেকানন্দ হর্ষপুলকভরে দিব্য নয়নে বিশ্বপানে চাহিলেন। দেখিলেন, শত শতাব্দীর ঘোর তমিস্রা কোথায় সহসা বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রভাতসূর্য্যের কণক-কিরণে বিশ্ব-চরাচর নবীন উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে। বিহগকুল কলকণ্ঠে সুধাবর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষ-বল্লরী সুদীর্ঘ যামিনীর বেদনা ভুলিয়া মৃদু মর্ম্মর-রবে আপন প্রাণের কথা আনন্দে জ্ঞাপন করিতেছে। নৈশ শিশির-সিঞ্চিত ফুলদল কোমল পাপড়ি মেলিয়া স্বর্গীয় হাসিতে ভুবন ভরিয়া দিয়াছে,—আকাশ, ভুবন, জল, স্থল মধুময় হইয়া উঠিয়াছে—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"[১৩]

দিকে দিকে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্র মধু বর্ষিত হইতেছে। সিদ্ধ সাধকের স্নিগ্ধ শান্ত প্রাণে আজ বিশ্বপ্রেম উথলিয়া উঠিয়াছে। সে অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়া বিশ্ববাসীকে সে সম্পদের অধিকারী করিবার জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে মর্ম্মের কথা বিশ্বদুয়ারে ঘোষণা করিলেন,—

৭ বিবেকানন্দের "গাই গীত শুনাতে তোমায়"—কবিতা।
৮ বিবেকানন্দ-রচিত—"প্রলয়"।
৯ "গাই গীত শুনাতে তোমায়"—কবিতা।

১০ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ভৃগুবল্লী, ৩।৬।১
১১ শঙ্করাচার্য্যকৃত বাক্যসুধা, ১৪
১২ অষ্টাবক্র-সংহিতা, ১৫।১৬
১৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৬।৩।৬

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার,
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার —
—মন্ত্র তন্ত্র প্রাণ-নিয়মন—মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ, ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম,—প্রেম, প্রেম,—এই
মাত্র ধন।

জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত প্রেত আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী, কীট, অনুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।
'দেব', 'দেব'— বল আর কেবা? কেবা বল
সবারে চালায়?
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে! প্রেমের
প্রেরণ!!

* * *

অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও,' যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু
হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে
ঈশ্বর।"[১৪]

১৪ স্বামী বিবেকানন্দ রচিত "সখার প্রতি" কবিতা।

"ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নাম যে গো ধরো!"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আলো আর আঁধারের মিলনের ক্ষণে
আমারে সঁপিয়া দিয়া তোমার চরণে
নূতন জীবন পাবো। আমার নিকট
তুমি হবে চিত্রকর—আমি তব পট।
মর্ম্মর-পাথর আমি—সম্মুখে আমার
তুমি রবে মহাশিল্পী। আমার তোমার
মাঝখানে রহিবে না কোন ব্যবধান;
আমার নয়ানে রবে তোমার নয়ান।
এ বিশ্বাস আছে মোর—তব করুণায়
নির্ভর করিয়া যদি কেহ কিছু চায়
ব্যর্থমনোরথ তারে কখনো না করো।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম যে গো ধরো!
তুমি শক্তি নাহি দিলে আমি নিরাশ্রয়!
তোমার শক্তিতে আমি দুর্ব্বার দুর্জ্জয়!

হাইড্রোজেন অক্সিজেন ও অঙ্গারক বাষ্প

ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্‌-এস্‌সি, পিএইচ্‌-ডি

আমাদের বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর্গন, নিয়ন জেনন ও ক্রুপ্টন দিয়া তৈরী। ইহাতে জলীয় বাষ্পও আছে এবং প্রতি দশ হাজার ভাগে এক ভাগ করিয়া অঙ্গারক বাষ্পও আছে। আজকাল নানা রঙের বিজলীর বাতিতে নিয়ন জেনন ইত্যাদি বাষ্পের ব্যবহার হয়; আর্গন বাতির উজ্জ্বল আলো প্রতি সভ্য দেশেই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বাতাসে আর্গন আছে শতকরা প্রায় একভাগ, নাইট্রোজেন ৭৮ ভাগ ও অক্সিজেন ২১ ভাগ। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড করিয়া চাপ দিতেছে। অক্সিজেন যে চাপ দেয় তাহার পরিমাণ ৩ পাউণ্ড মাত্র। বাকী অক্সিজেন পৃথিবীর নানা মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া আছে। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের অক্সিজেন ছাড়া চলে না, সারা পৃথিবীর জলের আশী ভাগ এই অক্সিজেন —তবু বায়ুমণ্ডল ছাড়া অক্সিজেন কোন রকমে গ্রহণ করা যায় না।

মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে—অক্সিজেনের মত এত শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্য কি করিয়া অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত না হইয়া মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আছে? বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ যদি শতকরা একুশ ভাগ না হইয়া পঞ্চাশ ভাগ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর উপর সহজদাহ্য যাবতীয় দ্রব্য এমন অবস্থায় থাকিত যে একটি বিদ্যুৎপাতেই বনে আগুন লাগিত। যদি একুশ ভাগ না হইয়া অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগ হইত তাহা হইলে হয়তো আমাদের জীবন এত অল্প পরিমাণ অক্সিজেনের ব্যবহারে অভ্যস্ত হইত, কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতার আনুষঙ্গিক অনেক জিনিষেরই সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিত না। আগুন এমনি একটি জিনিষ। বাতাসের অক্সিজেন, পৃথিবীর অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র, তবু তাহা যদি কোন রকমে পৃথিবীর কোন অংশ গ্রাস করিয়া লয়, তবে পৃথিবীর উপর সমস্ত জীবন লয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রাণিজীবনে এবং সমগ্র উদ্ভিদজগতে, অক্সিজেন ও অঙ্গারক বাষ্পের একটি অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। অনেকেই ইহার সহিত পরিচিত, কিন্তু অঙ্গারক বাষ্পের প্রয়োজনীয়তা লোক সাধারণতঃ উপলব্ধি করে না। অঙ্গারক বাষ্প ভারী এবং ভাগ্যক্রমে সেজন্য পৃথিবীর ঠিক উপরি ভাগেই থাকে। অঙ্গারক বাষ্পের মধ্যে অক্সিজেন ও অঙ্গার বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়। আগুন জ্বালিলে, কাঠের মধ্যে অক্সিজেন, অঙ্গার ও হাইড্রোজেন যে অবস্থায় থাকে তাহা হইতে তাহারা তাপদ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়; অঙ্গার অক্সিজেনের সহিত অতি দ্রুত মিলিত হইয়া অঙ্গারক বাষ্প তৈয়ার করে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া তৈরী করে জল। যেটিকে আমরা ধোঁয়া বলি তাহা বেশীর ভাগ অসংযুক্ত অঙ্গারের টুকরা। যখন কেউ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, তখন সে অক্সিজেন টানিয়া লয়, এই অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশিয়া সমস্ত শরীরের ভিতর চালিত হয়। অল্পতাপে এই অক্সিজেন শরীরের

প্রতি জীবকোষের খাদ্যকে ধীরে ধীরে জ্বালাইতে থাকে, তাহার ফলে জলীয় ও অঙ্গারক বাষ্প তৈয়ার হয়। মানুষ যখনই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাহা ঠিক হাপরে আগুন জ্বালানোর মতই। অঙ্গারক বাষ্প মানুষের ফুসফুসে আসিয়া জমা হয়, এবং তাহাকে কাজ সুরু করায়। পরের বার সে নিঃশ্বাস লইবার পূর্ব্বেই এই অঙ্গারক বাষ্পকে প্রশ্বাসে বাহিরের বাতাসে পরিত্যাগ করে। প্রত্যেক প্রাণীই অক্সিজেন গ্রহণ করিতেছে ও অঙ্গারক বাষ্প বাহিরে পরিত্যাগ করিতেছে। অক্সিজেন জীবনের জন্য আরো প্রয়োজন কারণ রক্তের ও শরীরের অন্যান্য অংশের ভিতর আরো অন্যান্য জিনিষের উপর ইহার কাজ আছে, যাহা না হইলে জীবনের সমস্ত কার্য্যই বন্ধ হইয়া যায়।

অপর পক্ষে, ইহা জানা আছে যে প্রত্যেক উদ্ভিদজীবনই—বাতাসের ভিতর যে সামান্য অঙ্গারক বাষ্পটুকু আছে—তাহার উপর নির্ভর করে। নিঃশ্বাস লইয়া উদ্ভিদেরা অঙ্গারক বাষ্প টানিয়া লয়। আলো এই অঙ্গারক বাষ্পকে উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত করে। সোজা কথায় গাছের পাতাগুলি হইতেছে তাহাদের ফুসফুস এবং আলো ও বাতাসে এই দুর্দ্দান্ত অঙ্গারক বাষ্পকে অঙ্গার ও অক্সিজেনে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ক্ষমতা আছে। অন্য কথায় উদ্ভিদেরা প্রশ্বাসে অক্সিজেন উদ্গিরণ করে, অঙ্গারটুকু হাইড্রোজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া উদ্ভিদশরীর গঠন করে। এই হাইড্রোজেন আসে শিকড়গুলি মাটি হইতে যে জল গ্রহণ করে তাহা হইতে। কেমন করিয়া কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই সকল জিনিষ লইয়া তৈরী হয় শর্করা জাতীয় দ্রব্য, তুলাজাতীয় পদার্থ এবং অন্যান্য অসংখ্য রাসায়নিক দ্রব্য ফুল ও ফল? উদ্ভিদেরা নিজেরা খায় এবং পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীকে খাওয়াইবার মত খাদ্য প্রস্তুত করে। একই সময়ে, যে অক্সিজেন আমরা নিঃশ্বাসে গ্রহণ করি তাহা বাহির করি। এই অক্সিজেন ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত জীবন পাঁচ-মিনিটে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। উদ্ভিদের প্রতি মানুষ চিরকৃতজ্ঞ। প্রত্যেক উদ্ভিদ—বন, ঘাস শ্যাওলা—প্রতিপ্রকারের উদ্ভিদ জীবন তাহাদের শরীর অঙ্গার ও জল হইতে তৈরী করে। প্রাণীরা অঙ্গারক বাষ্প উদ্গিরণ করে, উদ্ভিদেরা উদ্গিরণ করে অক্সিজেন। এই প্রকার অক্সিজেন-অঙ্গারক বাষ্প বিনিময় যদি না ঘটিত, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ অবশেষে বায়ুমণ্ডলের সমস্ত অক্সিজেন অথবা অঙ্গারক বাষ্প খরচ করিয়া ফেলিত এবং ইহাদের পরিমাণ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত, পৃথিবীর প্রত্যেকটি উদ্ভিদ ও প্রত্যেকটি প্রাণী ধ্বংস হইত। বর্ত্তমানে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সামান্য পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্পও প্রাণিজীবনের জন্য প্রয়োজন, উদ্ভিদেরাও সামান্য অক্সিজেন গ্রহণ করে।

যদিও আমরা হাইড্রোজেন গ্রহণ করি না, হাইড্রোজেনেরও প্রয়োজন আছে। হাইড্রোজেন না থাকিলে জল থাকিত না, জান্তব ও উদ্ভিজ্জ প্রত্যেক বস্তুতেই জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী ও দরকারী। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, অঙ্গারক বাষ্প ও অঙ্গার, ইহাদের প্রত্যেকটি এবং বিভিন্ন মিশ্রণ হইতেছে প্রাণিজীবনের একান্ত ভিত্তি, তাহাদের উপরই পৃথিবীর জীবন নির্ভর করিতেছে। একই গ্রহে, একই সময়ে, জীবনের প্রয়োজনের অনুপাতে যে তাহারা থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা খুব কম। কেন, বিজ্ঞান তাহা বলিয়া দিতে পারে না। যদি বলা হয় আকস্মিক ঘটনা, তাহা হইলে গণিতশাস্ত্রকে অস্বীকার করিতে হয়।

যে অদৃশ্য শক্তি, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া বিচিত্র প্রাণিজগৎ রচনা করিয়াছে, সে শক্তির বিরাট মহিমময় অস্তিত্ব কি মানুষ অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে না? সে শক্তির অস্তিত্বকে কি সে বলিবে যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস?

অভিনেতা জন্ মিল্স্

বৃটিশ চিত্রজগতে জন্ মিল্সের আবির্ভাব বিস্ময়কর। তাঁর ন্যায় সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় কেবল দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে স্বল্পকালের মধ্যে 'তারকা'র মর্যাদা লাভ করা যে কোন চিত্রতারকার পক্ষে গৌরবের বিষয়।

জন মিল্স্ যখন তাঁর প্রথম চিত্র 'দি মিড্‌শিপ্‌মেইড'-এ আত্মপ্রকাশ করেন, তখন এই নবাগতের ভবিষ্যৎ সফলতা সম্বন্ধে সমালোচকরা স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারেন নি। কিন্তু অভিনয়চাতুর্যের সঙ্গে মিল্সের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস তাঁকে এক দিন জয়যুক্ত করল।

১৯০৮ সালে ইংলণ্ডের পূর্ব উপকূলে লণ্ডন থেকে ৮০ মাইল দূরে সাফোক্ প্রদেশে মিল্স্ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের দিকে তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায় এবং যৌবনের প্রারম্ভেই রঙ্গমঞ্চে যোগ দেবার জন্য তিনি সুযোগ ও সুবিধা সন্ধান করতে লাগলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডে মঞ্চে যোগ দেওয়ার কোন সহজ পথ নেই। সে জন্য একজনকে হয় কোন নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের পরিচয় এবং প্রতিপত্তি তৈরী করে নিতে হবে, নয়ত তার চাই অসাধারণ দেহসৌষ্ঠব কিংবা অভিনয়, নৃত্য, গীত সম্বন্ধে বিশেব শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য, যদিও এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

তরুণ মিল্সের বাহ্যতঃ এসব কোন গুণই ছিল না, সেই জন্য সহসা এক দিন অভিনেতার স্বপ্নরাজ্য থেকে নেমে এসে তাঁকে বাস্তব জীবনে সামান্য কেরাণীর কাজ গ্রহণ করতে হল।

কিন্তু মিল্সের অদম্য উৎসাহ তাঁকে সংকল্পচ্যুত করল না। মাত্র ২১ বছর বয়সে পরিচয়হীন, সম্পদহীন মিল্স্ তাই অনিশ্চিত জীবনের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিলেন। লণ্ডনে এসে সামান্য সেলস্‌ম্যানের কাজ নিয়ে তিনি প্রথমে অর্থ উপার্জনে মন দিলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই নৃত্যশিক্ষার জন্য স্কুলে ভর্তি হন এবং আশানুরূপ ফল লাভ করেন।

তিনি ক্রমে নৃত্যশিল্পে এতদূর পারিদর্শিতা লাভ করেন যে অতি সহজেই তিনি বিভিন্ন নৃত্যনাট্যে অভিনয় করবার সুযোগ পেতে লাগলেন এবং একদিন 'জার্নিজ এণ্ড্' নামে প্রথম মহাযুদ্ধের বিষয় নিয়ে লেখা বিখ্যাত নাটকের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার তাঁর সৌভাগ্য হয়। এই নাটকটি প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়েছিল।

ইংরাজ অভিনেতা এবং চিত্রপ্রযোজক নোয়েল কাওয়ার্ড সিঙ্গাপুরে এই নাটকটির অভিনয় দেখে এই তরুণ অভিনেতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হন। পরে নোয়েল কাওয়ার্ডের সহায়তায় জন মিল্স্ মঞ্চজগতে বিশেষ ভাবে পরিচিত হন এবং কাওয়ার্ড রচিত "ক্যাভালকেড্" নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি তীক্ষ্ণ শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেন।

ছায়াচিত্রে "ক্যাভালকেড" রূপায়িত করার সময় আমেরিকার হলিউড থেকে জন মিল্সের

ডাক আসে কিন্তু তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করতে স্বীকৃত হলেন না। এই ভাবে তাঁর দিন অতিবাহিত হতে লাগল—কখনও চলচ্চিত্রে, কখনও বা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে। সত্যিকারের কৃতকার্যতার আনন্দ তিনি কোথাও পাচ্ছিলেন না। তাঁর এই অস্থিরতা এমনি করে তাঁকে কিছু দিন নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়ালো।

১৯৩৯ সাল। ইউরোপের যুদ্ধ অনেক শিল্পীকেই ঘর ছাড়া করেছিল, তেমনি করল জন মিল্‌স্‌কে। অভিনয় ছেড়ে সৈনিকের মারণাস্ত্র তুলে নিতে হল তাঁকে। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রয়াল ইঞ্জিনীয়র্সে যোগ দান করেন কিন্তু কিছুকাল পরে অসুস্থতা বশতঃ সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ফিরে এসে তিনি মেরি হেইলিবেল্‌ নামে এক অভিনেত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। অভিনয় ছাড়াও মেরির নাটকরচনার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং বিবাহের পর মিল্‌স্‌ মেরি-রচিত প্রথম নাটক "মেন্‌ ইন্‌ শ্যাডো"-তে অভিনয় করেন। এই সময় তাঁরা যুক্তভাবে নাট্যশিল্পের মধ্যে নবতম উৎসাহে আত্মনিয়োগ করলেন।

বিবাহের পর মিল্‌স্‌ বিভিন্ন নাটকে বহু অভিনয় করেন এবং "গ্রেট এক্সপেক্টেশন" চিত্রে সুনাম অর্জন করে সহসা 'তারকা'-পর্যায়ে উন্নীত হন। মিল্‌স্‌ সম্প্রতি এইচ্‌ জি ওয়েল্‌সের "মিঃ পোলি" নামক চিত্রটিতে অভিনয় করা ছাড়াও তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। মিল্‌সের জীবনে আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। হয়ত একদিন চিত্রজগৎ তাঁকে সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকের ভূমিকায় দেখতে পাবে।*

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস-এর সৌজন্যে প্রকাশিত—উঃ সঃ

হৃদয়-দেবতা

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ

তুমি যে কি চাও
বুঝিতে নারি।
ওঠে তব বাণী
তপত হিয়ায়
শুনিতে শুনিতে
শূন্যে মিলায়,—
সে কি বারতা
হৃদয়-দেবতা
বুঝিয়াও যেন
বুঝিতে নারি!

মরম মাঝে
ক'রে অধিষ্ঠান
করগো পূত
তপত পরাণ,
কও গো কথা
আমার সাথে
শুনিব আমি
পরাণ ভরি'।

নাথ-মঠ

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

শৈব নাথগণ শৈবধর্মকে নাথধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শৈব-ধর্মের অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন গোরক্ষনাথ * * * মীনচেতন ও গোরক্ষ-বিজয়ের কাহিনী অনুধাবন করিলে সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, খাঁটি নাথপন্থ গোরক্ষ নাথেরই সৃষ্টি" (গোপী-চাঁদের সন্ন্যাস—৬৬-৬৭ পৃঃ)। শৈবধর্মের প্রাবল্যের যুগ হইতে ভারত ও ভারতের বাহিরে শৈব নাথ-মঠ, শিলালিপি ও শিলামূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখনও ইহাদের অনেকগুলি বিদ্যমান থাকিয়া শৈব নাথদের অতুল কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। এমন একদিন ছিল যখন ইহাদের প্রায় সবগুলিই নাথদের ছিল। কিন্তু কালক্রমে বহু-সংখ্যক তীর্থের তীর্থগুরুত্ব হইতে নাথগণ বিচ্যুত হইয়াছেন। এখনও ভারতে ও ভারতের বাহিরের বিভিন্ন মঠে নাথাচার্যগণ মঙ্গলদেবতার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। নিম্নে কতকগুলি নাথ-মঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

নেপালে মৎস্যেন্দ্র নাথের মন্দির ও স্মৃতিফলক

ইহার অন্য নাম বাঙ্গমতী অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। ৭৯২ নেপালাব্দে (১৬৭২ খৃঃ) নেপালরাজ শ্রীনিবাস কর্তৃক এই মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণদ্বার স্থাপিত হয়। ইহার শিলালিপিতে আছে—

"শ্রীলোকেশ্বরায় নমঃ
মৎস্যেন্দ্রং যোগিনাং মুখ্যাঃ শাক্তাঃশক্তিং বদন্তি যং।
বৌদ্ধাঃ লোকেশ্বরং তস্মৈ নমো ব্রহ্মস্বরূপিণে॥
নেপালাব্দে লোচনাচ্ছিদ্র সপ্তে
শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞা
স্বর্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন
সার্দ্ধং শ্রীলোকনাথস্য গেহে।"

(Inscription from Nepal in Indian Antiquary, Vol IX)

অর্থাৎ যোগিশ্রেষ্ঠগণ যাঁহাকে মৎস্যেন্দ্র, শাক্তগণ যাঁহাকে শক্তি এবং বৌদ্ধগণ যাঁহাকে লোকেশ্বর বলেন, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ লোকেশ্বরকে প্রণাম করি। ৭৯২ নেপালাব্দে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রাজা শ্রীনিবাস কর্তৃক লোক-নাথের মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণদ্বার স্থাপিত হইল।

এখানে দেখা যাইতেছে নেপালরাজ শ্রীনিবাস নাথযোগী মৎস্যেন্দ্র নাথকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক হাড্‌সন বলেন—"Sree Narendra Dev became Raja of Bhagatpattana. He was a disciple of Budhu Datta Acharya and brought Arya Avalokiteswara from Putatak Parvata (in Assam) to the city of Lalitpattana in Nepal. The reason for inviting this nobility to Nepal was a drought of twelve years of great severity. * * * In the above, Avalokiteswara is the same as Matsyendranath whose arrival in Nepal is referred to in the fifth century

of Christ by the well-known memorial verses. The identification with Padmapani rests on the Sastras of Nepal and China". (R. A. S. J. Vol. VII, part I, page 137)

অর্থাৎ নরেন্দ্রদেব বাঘপত্তনের রাজা হন। তিনি বন্ধুদত্ত আচার্যের শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দূর করার জন্য আর্যাবলোকিতেশ্বরকে তিনি আসামের পূতলক পর্বত হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া নেপালের ললিত-পত্তনে আনেন। * * * এই অবলোকিতেশ্বরই কি মৎস্যেন্দ্র নাথ—খৃঃ অব্দ ৫ম শতাব্দীতে যাঁহার নেপাল-আগমন-বার্তা বিখ্যাত স্মৃতিফলকের শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে? পদ্মপাণি ও মৎস্যেন্দ্র নাথ যে একই ব্যক্তি তাহা নেপাল ও চীনের শাস্ত্রানুসারে প্রতিপন্ন হয়।

ধর্মজগতে মৎস্যেন্দ্র নাথের স্থান অতি উচ্চে। বুদ্ধদেব যেমন হিন্দুর নিকট ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত, মৎস্যেন্দ্র নাথও তেমনই বৌদ্ধদের নিকট বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। মৎস্যেন্দ্র নাথ বাঙ্গালী ছিলেন। ইহা বাঙ্গালী হিন্দুদের গৌরবের কথা। রাজা নরেন্দ্রদেব কর্তৃক তিনি নেপালের ললিত-পত্তনে আহূত হইয়াছিলেন। তিনিই যে মৎস্যেন্দ্র নাথ বা অবলোকিতেশ্বর তাহা হুয়েনসাঙ্গ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—"The temple of Avalokiteswara called Matsyendranath by the common people, is situated in the centre of the village. The image which it contains is made of mud and covered with silver plates. It remains half of the year only in this temple, during the other six months it is kept at Lalitpattan." (Indian Antiquary Vol. IX, page 169)

অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরকে লোকে মৎস্যেন্দ্র নাথের মন্দিরও বলিয়া থাকে। মন্দিরটী গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মন্দিরস্থিত বিগ্রহ মৃন্ময়, কিন্তু রৌপ্যমণ্ডিত। বৎসরের অর্ধেক অর্থাৎ ছয়মাস কাল বিগ্রহ এই মন্দিরে থাকেন, এবং বাকী ছয়মাস ললিতপত্তনে থাকেন।

আসামের পূতলক পর্বত হইতেই কি মৎস্যেন্দ্র নাথ নেপাল গিয়াছিলেন? পূতলক পর্বত চারিটী বলিয়া কয়েকজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে একটি তিব্বতের রাজধানী লাসানগরীতে, একটি চীনের পূর্বপ্রান্তে, আর একটি ভারতের দক্ষিণে কন্যাকুমারিকার নিকট, চতুর্থটি সিন্ধু নদীর মোহানায় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। এই চারিটী স্থানই মৎস্যেন্দ্র নাথের বিহারভূমি ছিল। (Language, Literature and Religion of Nepal and Tibet—Hudson) কথিত আছে বৌদ্ধ জগতের পূজ্য নাগার্জুন এই অবলোকিতেশ্বর বা মৎস্যেন্দ্র নাথের কৃপায় চণ্ডিকাসিদ্ধ হন এবং মহারাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন ভারত সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন। (হুয়েনসাঙ, সিয়ুকী)

তিব্বতে মৎস্যেন্দ্র নাথের মূর্তি

চীন পর্যটক হুয়েনসাঙ বলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ নেপাল ও তিব্বতের জাতীয় দেবতা। লাসানগরীর কষিতকাঞ্চন-নির্মিত মৎস্যেন্দ্র নাথের মূর্তি আজিও দর্শকের যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করে। যদি কেহ মৎস্যেন্দ্র নাথকে দেখিবার মানসে যথারীতি উপবাস করিয়া এক মনে তাঁহাকে আহ্বান করেন তবে মৎস্যেন্দ্র নাথ

প্রতিমা হইতে জ্যোতির্ময়রূপে দর্শকের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। হুয়েনসাঙ্ আরও বলেন, তিনি যখন ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন সে সময় সমগ্র ভারতে মৎস্যেন্দ্র নাথের মূর্তি পূজিত হইতে দেখিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে কাশ্মীরের উদয়নের ও মান্দ্রাজের তিলোদকের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। চীন সাম্রাজ্যের চুসান দ্বীপপুঞ্জের পুটোদ্বীপের মৎস্যেন্দ্র নাথের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার অপরাপর দেব-মূর্তিও ভারতীয় হিন্দুর। ইঁহার মূর্তি আজও বালি ও জাভা দ্বীপে দৃষ্ট হয়। হুয়েনসাঙ্ প্রণীত এবং রেভারেণ্ড বিল অনূদিত সিয়ূকী গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৯, ৪১, ৬০, ১২৮, ১৬০ ২১২ পৃষ্ঠায় এবং ২য় খণ্ডের ১০৩, ১১৬, ১২৯, ১৭২, ১৭৩, ২১৪, ২২৫ ও ২৩৩ পৃষ্ঠায় এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ আছে।

জাপান ও চীনে মৎস্যেন্দ্র নাথ

জাপান ও চীনে আজও মৎস্যেন্দ্র নাথ 'কানসাইন' নামে পূজিত হইতেছেন। "It is well-known that Avalokiteswara is venerated in China and Japan as God or Being who hears the cries of men (Kwon-shai-yin). I need not remark that the worship of any divinity on abstract grounds is foreign to the principles of Buddhism. Nevertheless we find the worship of Amitabha and Kwan-shai-yin most universally prevalent in the countries above named." (J. R. A. S. 1882. Vol XV. page 333)

গোরক্ষনাথের মূর্তি

নেপালের পূর্বতন রেসিডেণ্ট হাডসন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলের ১৮শ খণ্ডে গোরক্ষনাথের তিনটি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। একটি চিত্র নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডুর ইন্দ্রচোক স্থানের মন্দিরের বিগ্রহ দৃষ্টে গৃহীত। অপর দুইখানি চিত্র তিব্বতের পুথি হইতে সংগৃহীত। সিকিম দেশের বিহারে তিনটি মূর্তি আছে। ইহার মধ্যস্থ মূর্তি শুভ্রবর্ণ অমিতাভ (ধ্যানী বুদ্ধ), দক্ষিণে গৌতমবুদ্ধ, এবং বামে গোরক্ষ-নাথ। ডক্টর তমোনাশ দাশগুপ্ত বলেন- "হাডসন সাহেব J. R. A. S. অষ্টাদশ খণ্ডে মৎস্যেন্দ্র নাথের একটি এবং গোরক্ষনাথের তিনটি চিত্র দিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্র নাথের আকৃতি চতুর্থ ধ্যানী বোধিসত্ত্বের অনুরূপ। পঞ্চরথী গ্রন্থের আলোচনায় ইহার অনেকটা শৈব ভাব লক্ষিত হয়। উড়িষ্যার জগন্নাথ দেবের ন্যায় নেপালে মহাসমারোহের সহিত ইহার রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। * * * মৎস্যেন্দ্র নাথ, গোরক্ষ-নাথ প্রভৃতি নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যগণ এক একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। (প্রবর্তক—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪)।" প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন —"নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৎস্যেন্দ্র নাথ" (বিশ্বকোষ)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন —"নেপাল ও তিব্বতের বহু দেবমন্দিরে ও তীর্থ-স্থানে এখনও বহু নাথের পূজা অর্চনা হইয়া থাকে। এখনও গোরক্ষনাথ সমস্ত গোর্খাজাতির শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পূজিত হন। গোরক্ষ পাহাড়ের গোরক্ষ মন্দির এখনও সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর পুণ্য-পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত।" (Modern Buddhism—Introduction)। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেন—"নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেব' মচ্ছীন্দ্র নাথের একটি উৎসব নেপালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" (প্রবাসী —ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৮ বাং)। অধ্যাপক অক্ষয়

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"নেপাল অঞ্চলে গোর্খা নামক একটি জাতি আছে, তাহারা তাহাদের সাহস ও বীর্য্যের জন্য সর্বত্র সুপরিচিত। তাহারা বলিয়া থাকে যে, গোরক্ষনাথজী নেপালে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যার স্থান তাঁহারই নামে গোর্খা বলিয়া পরিচিত এবং সেই স্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণ তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য বলিয়া তাঁহার নামানুসারে গোর্খা বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করে। তাহা হইতেই গোর্খা জাতির উৎপত্তি। * * * ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই তাঁহার নামানুসারে অনেক স্থানের ও অনেক মন্দিরের নামকরণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে লিখিত আছে যে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তাঁহার নামানুসারে নানাস্থানের নাম শুনিতে পাওয়া যায় (পল্লীশ্রী—২য় সংখ্যা, ১৩৩১)।" "মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সাধু এবং আদি নাথের শিষ্য ছিলেন। গোরক্ষ নাথ মৎস্যেন্দ্র নাথের শিষ্য। নাথপন্থীদের মতে মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ নাথ উভয়েই বিষ্ণুর অবতার ছিলেন (মানসী ও মর্মবাণী—পৌষ, ১৩২৯)।" বোম্বাই-এর সাতারা জেলায় মচ্ছেন্দ্র গড় নামক একটি গিরি দুর্গ আছে। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে মৎস্যেন্দ্র নাথের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। নেপালে তারাদেবীর মন্দির আছে। প্রবাদ আছে যে, মৎস্যেন্দ্র নাথের একটি অশ্রু বিন্দু হইতে যে হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই হ্রদে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম জন্মে। সে পদ্মের ভিতরে তারাদেবীকে পাওয়া যায়। তারাদেবী শক্তিদেবী এবং দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। এই শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বঙ্গদেশই অগ্রণী ছিল। ডক্টর শহীদুল্লাহ অনেক প্রমাণ-প্রয়োগে দেখাইয়াছেন যে মৎস্যেন্দ্র নাথ বা অবলোকিতেশ্বর বাঙ্গালী ছিলেন। বাখরগঞ্জে তাঁহার বাড়ী ছিল (শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৫১ বাং, ৩৭৯-৩৮৪পৃঃ)।

যোগীদের শিবমন্দির

হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে ইহার অনতিদূরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে এই মন্দির অবস্থিত। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' দেখা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা বলিতেছেন—"* * * আর একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম ৺মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া ধনীকে এই কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময়ে সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া এককালে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলাম। * * * আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে ঐ জ্যোতিঃ যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমার যেন গর্ভ-সঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে। ক্রমে তিন, চার মাস অতীত হইল, তখন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সত্যসত্যই অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন (৬৮-৭৪ পৃঃ)।" তারপর ১২৪২ সনের ৬ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়। এই যুগীদের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের কৃপায়ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব।

স্বামী শিবানন্দের পত্র

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীশ্রীগুরুদেবশ্রীচরণ ভরসা—

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
হাওড়া

শ্রীমণি,

তোমার পত্র আজ কয়েক দিন হয় আসিয়াছে। আমার শরীর ভাল না থাকায় উত্তর দেওয়া হয় নাই। শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই।

যে বিষয় জানিতে চাহিয়াছ অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথা আছে—যার শেষ জন্ম সে এই ঘরে আসিবে—তুমি বহু চেষ্টা করিয়াও ইহার অর্থ বুঝিতে সক্ষম হও নাই। আমি যাহা বুঝি তাহাই তোমাকে লিখিতেছি :

প্রথমতঃ শেষ জন্ম কি? প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন্ম কি? ভক্তেরা এ সকল চিন্তা কখনই মনে আনে না। ভক্ত কি করে? ভগবানকে ভক্তি করে, ভালবাসে, কি ক'রে পবিত্র থাকবে—এই চিন্তাই কেবল করে। আর কেবল তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে চেষ্টা করে। জীবন-মরণের কথা তারা মনেও করে না; সব প্রভুর ইচ্ছা—এই তাদের বিশ্বাস। "যার শেষ জন্ম সে এই ঘরে আসবে",—এর অর্থ আমি এই বুঝি যে, যে কায়মনোবাক্যে অন্তরের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করে, তারই তাঁর ঘরে আসা, আর তারই শেষ জন্ম। যদি কোন ভক্তের দীক্ষাগ্রহণ বা সন্ন্যাসগ্রহণের পর অসদাচার গোচর হয়, আপাতদৃষ্টিতে উহা খুব খারাপ, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস—তার এই জীবনেই কোন সময়ে অনুতাপ আসিবে, যদি ঠিক সে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। যদি অনুতাপ দুর্ভাগ্যবশতঃ না আসে, তবে জানিতে হইবে—তার পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস নাই এবং তার শেষ জন্ম নয়। দীক্ষা যাঁরা দেন, তাঁরা দাতা—পরম দয়াল। ইহা তাঁদের পরম দয়ালুতা ও উদারতা। দীক্ষিত যদি তাঁদের সেই দয়া ও উদারতা ধারণা করিতে না পারে, তবে তার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। তবে ইহা ঠিক যে, তারা এ জীবনে যদিও কৃতকার্য্য না হয়, অন্য জীবনে হইবে নিশ্চিত। কারণ তুমি যে যে গুরুর নাম করিয়াছ, তাঁদের বীজ অমোঘ, তাহা কখনই ব্যর্থ যায় না। এ বীজ ফলবান হইবেই হইবে—এ জন্মে বা অপর জন্মে। তাঁদের জগতে কোন কামনাই নাই। কেবল অহেতুকী দয়া তাঁদের একমাত্র কার্য্য জীবনে থাকে। এইমাত্র বলিলাম, তুমি যেরূপ হয় বুঝিবে। সাধন-ভজনের আশা মেটে নাই—এমন লোক যদি দৃষ্টিতে আসে, জানিবে তারা ভাল লোক। ঠাকুর বলিতেন, "সখি, যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি"—ইহা খুব ভাল কথা। সাধন-ভজনের আশা সিদ্ধ হলেও মেটে না। অবশ্য ভাবের তফাৎ আছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি জানিবে। যাহা লিখিলাম, বেশ করিয়া পড়িবে ও চিন্তা করিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী—
শিবানন্দ

কোরাণে ত্বলাক্ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম্-এ

কোরাণেও হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় বিবাহকে নানা বিধি-নিষেধের দ্বারা মানব-জাতির নৈতিক কল্যাণ ও চরিত্রগত উন্নতির জন্য ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। কোরাণে বিবাহ সমাজ-কল্যাণের জন্য একজন পুরুষের সহিত অন্য একজন স্ত্রীলোকের যৌন-মিলন। —তবে এই মিলনের ভিত্তিকে নানা ভাবে দৃঢ় করিয়া সমাজের কল্যাণ-সাধন উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ নহে। ইসলাম ধর্ম্মে বিবাহ একদিকে যেমন আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, অন্যদিকে তেমনই দেহের সঙ্গে দেহের মিলন। ইহা এই দুই মিলনের কোনটির গুরুত্ব অবহেলা করে নাই। সেই জন্যই কোরাণে রহিয়াছে "ফ্অন্কিঃহুঅ মা ত্বাব লকুম্ মিন্-অল্-নিসা' মস্. ন র. সুস. র রুব্'অ; ফ-ইন্ খিফ্তুম্ অল্ল ত'অদি লরঅ ফ-ওআরিঃহদতন্—তোমার মনঃপূত দুই, তিন বা চারিজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পার; কিন্তু যদি তোমার ভয় হয় যে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে মাত্র বিবাহ কর। (৪;৩)।" এই শ্লোক হইতে প্রমাণ হয় যে, কোরাণ প্রকৃত পক্ষে কথনই বহু-বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদ হুবহু মানিয়া লয় নাই; কারণ পয়গম্বর বা শ্রেষ্ঠ মনীষী ব্যতীত কোন ব্যক্তিই দৈহিক সুখ-দান বা প্রেম-বিনিময়ে একের বেশী স্ত্রীলোকের প্রতি সমতা রক্ষা করিতে পারে না; তবে যাহারা কোরাণের সেই গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাদের পাশব প্রবৃত্তির ব্যাপকতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য বহু-বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দ্দেশ কোরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহ-বিচ্ছেদও তাই সমাজকল্যাণের জন্যই সর্বশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং দৈহিক ও আত্মিক মিলনের উভয় দিক দিয়াই যখন কোন স্ত্রী কোন বিশেষ পুরুষের নিকট একেবারে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন সমাজ-বন্ধনের শিথিলতা দূর না করিয়া পরস্পরের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য কোরাণে বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কোরাণে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই সমান এবং যখন তাহাদের মধ্যে মনো-মালিন্য বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়, তখন উভয়ই পরস্পরের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রতিশব্দ ত্বলাক্ এবং ইহার শব্দগত অর্থ (বিবাহ)-গ্রন্থি-চ্ছেদ। কোন পুরুষ যখন তাহার স্ত্রী হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করে, তাহাকে ত্বলাক্ বলে এবং যখন কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামী হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করে, তাহাকে খুল্'অ বলে খুল্'অ এর শব্দগত অর্থ (কোন জিনিষ) ছিনাইয়া লওয়া।

কোরাণ বিবাহ-বিচ্ছেদকে কখনই সাধারণ ধর্ম্ম হিসাবে মানিয়া নেয় নাই। যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপেই বনিবনাও হয় না, তখনই কেবল পরস্পরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের নিমিত্তই কেবল বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হইলেও, এই অবস্থা হইতে দূরে থাকার চেষ্টাকে কোরাণে তক্ওআ বা

সাধুতা বলা হইয়াছে। পয়গম্বর মোহম্মদ তাঁহার পুত্র-প্রতিম জয়দকে তাহার স্ত্রী জয়নাবের সহিত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৈকল্য হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "অম্‌সিক্ অলয়ক জওজকর অত্তকি আল্লাহ্—(স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করিয়া) তাহাকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখ ও ভগবৎ-পথে চালিত কর (৩৩ ; ৩৭)।" অন্যত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রতি তাচ্ছিল্য-ভাব প্রদর্শন করিয়া বিবাহের বিধি-নিষেধ-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, '...যদিও তোমরা তাহাদিগকে (তোমাদের ভার্য্যা-গণকে) অপছন্দ করিতেছ কিন্তু ভগবান ইহার মধ্যেও প্রভূত কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন (৪ ; ১৯)।" এই পরস্পরের মনোমালিন্য হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিয়া কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "যদি তোমরা তাহাদের উভয়ের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে মনোমালিন্য লক্ষ্য কর, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একজন করিয়া বিচারক নির্দ্দিষ্ট কর—যদি তাহারা উভয়েই আপসের প্রত্যাশী হয়, তাহা হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাদের মিলন স্থায়ী করিবেন (৪ ; ৩৫)।"

বিবাহ যেমন একটি সামাজিক বন্ধন এবং পারস্পরিক সুখ-সুবিধা এবং সমাজ-কল্যাণের জন্য মানুষকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদও পারস্পরিক সুখ-সুবিধা ও সমাজ-কল্যাণের জন্যই কোরাণে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যখন একান্তই বিবাহ-বিচ্ছেদের দরকার তখন বিবাহ-বিচ্ছেদেরও আদেশ রহিয়াছে। সেই জন্যই কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "......আর যদি স্বামী ও স্ত্রীতে সদ্ভাব-স্থাপনের কোন উপায় না থাকে এবং পরস্পরের বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তবে ভগবান নিজের (অদৃশ্য) ভাণ্ডার হইতে উভয়কে নিরাকাঙ্ক্ষ করিয়া দিবেন এবং ভগবান নিয়তই পরম দাতা ও জ্ঞানী (৪ ; ১৩০)।"

কোরাণের ধর্ম্মে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার এবং বিবাহ-ঘটিত ব্যাপারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ দ্বারা নিজেকে অপর হইতে দূরে রাখিতে পারে। তবে যদি কোন স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বামী হইতে প্রাপ্ত বিবাহের পণ বা ভরণ-পোষণ হিসাবে প্রাপ্য সকল সম্পত্তি তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু কোন পুরুষ যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করে, তাহা হইলে বিবাহের যৌতুক-সামগ্রীর কোন কিছুই স্ত্রীর নিকট হইতে দাবী করিতে পারিবে না। কোরাণে এই সম্বন্ধে নির্দ্দেশ রহিয়াছে, "বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী দুই বার মাত্র করা যাইতে পারে, তৎপর তাহাদের (সকল সময়ের জন্য) একত্র বসবাস করিতে হইবে, অথবা সদ্ব্যবহারের সহিত পরস্পর হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ, তাহা আবার ফিরাইয়া নেওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ভয় থাকে যে ভগবান তাহাদের প্রতি যে সকল সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন উহাদের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারিবে না—এমতাবস্থায় তাহাদের উভয়ের ভগবানের নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিবার ভয় থাকিলে এবং স্ত্রীও যদি নিজেকে মুক্ত করিবার বিনিময়ে কিছু প্রত্যর্পণ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের কোন ত্রুটি নাই (২ ; ২২৯)।" স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরস্পরের প্রতি দাম্পত্য প্রণয়ে কর্ত্তব্য-বিচ্যুতি ঘটিবার ভয় থাকিলে, তাহারা উভয়ই বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করিতে পারিবে। যদি স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী

করে, তাহা হইলে তাহার যৌতুকাদি ফিরাইয়া নিবার কোন অধিকার নাই; আর যদি স্ত্রীই প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করে, তাহা হইলে তাহাকে তাহার স্বামী হইতে প্রাপ্ত যৌতুকাদি ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ-ঘটিত দাবীর ব্যাপারে কাহার প্রকৃত দোষ, এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া মীমাংসা করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে উভয়ের দ্বারা মনোনীত কোন বিচারকের উপর। বিচারক বিবাহ-বিচ্ছেদ-ঘটিত ব্যাপার-বিষয়ে ত্রুটির বিচার করিবেন, এবং আবার যদি পরস্পরের মিলনের সম্ভাবনা থাকে উহার ব্যবস্থা করিবেন; অথবা যদি স্বামীর ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে সে আর দেয় যৌতুকাদি প্রাপ্ত হইবে না; আর যদি স্ত্রীর দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বামী হইতে প্রাপ্ত যৌতুকাদি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

ইসলামের বিবাহ-বন্ধন বা বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন খামখেয়ালী ব্যাপার নহে। স্বামী ইচ্ছা-মাত্রই তাহার স্ত্রী হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করিতে পারিবে না, স্ত্রীরও ইহাতে স্বীকৃতি থাকিতে হইবে। সেই জন্য উভয়ের আত্মীয় বা স্বজন হইতে বিচারক নির্দ্দিষ্ট করিয়া ইহার সুমীমাংসা করিতে হইবে।

দাম্পত্য কলহ হওয়া মাত্রই মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। এই দাম্পত্য কলহের আবার যাহাতে নিষ্পত্তি হইতে পারে উহার অনেক রকম ব্যবস্থা কোরাণে রহিয়াছে। কোরাণের নির্দ্দেশ—ঋতুকালে স্ত্রী-সঙ্গ অন্যায় এবং এই ঋতুকালে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা উত্থাপন করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। এই ঋতুকাল অতীত হওয়ার পরও যদি দাম্পত্য কলহের অবসান না হয়, তাহা হইলে তখন স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করিতে পারে, কিন্তু এই দাবী করা মাত্রই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে না। কোরাণের আদেশানুযায়ী কোন স্ত্রীলোককে ত্বলাক্ দিতে হইলে, 'তাহার সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ' ঘটাইবার পূর্ব্বে প্রায় তিন মাস কাল বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহার পরও যদি তাহাদের পরস্পরের মনোমালিন্যের অবসান না হয়, তখন তাহাদের মধ্যে চির জীবনের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ হইবে। কোরাণের ত্বলাক্ নামক অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "হে পয়গম্বর, যখন তোমরা তোমাদের ভার্য্যাগণকে ত্বলাক্ দিতে ইচ্ছা কর, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট কালের (ইদ্দৎ) সূচনাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করিবে এবং এই দাবীর পর হইতেই এই নির্দ্দিষ্ট কালের হিসাব রাখিবে এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যকালে তাহাদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না…।" এই ইদ্দতের কাল প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত। কোরাণে এই ইদ্দৎ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "পরিত্যাজ্যা স্ত্রীগণকে (বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ-ভাবে ঘটিবার পূর্ব্বে) তিন (মাসিক) ঋতুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে (২; ২২৮)।" এই তিন মাস কাল পর্য্যন্ত একই গৃহে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করিয়াও যদি তাহাদের পরস্পরের মনোমালিন্যের অবসান না হয়, তাহা হইলে তাহারা চির জীবনের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারিবে। ইদ্দতের সময় সাধারণতঃ প্রায় তিন মাস কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সকল স্ত্রী গর্ভবতী, তাহাদের জন্য ইদ্দতের সময় প্রসব-কাল উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত (৬৫; ৪)। বিবাহের দাবী উত্থাপন করার পরও যাহাতে প্রকৃতই বিবাহ-বিচ্ছেদ না ঘটে, তাহার জন্য এই কয়েক মাস অপেক্ষা করিয়া পরস্পরের

দাম্পত্য কলহের নিবৃত্তির অবকাশ দেওয়া হইয়াছে।

এই দাম্পত্য কলহ যাহাতে স্থায়ী হইয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, তাহার সমর্থন কোরাণ সহজ ভাবে কখনই করে নাই। এবং পুনরায় যাহাতে স্বামি-স্ত্রীর পরস্পর মিলন হইতে পারে তাহার নানা উপদেশই কোরাণে রহিয়াছে। সম্পূর্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবার পরও যদি স্বামি-স্ত্রী পুনরায় পরস্পর মিলনের কামনা করে, উহারও বিধি কোরাণে আছে। এই সম্বন্ধে কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমাদের স্ত্রীগণকে ত্বলাক্ দেওয়ার পর এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট (তিন মাস) কাল (ইদ্দৎ) অতীত হওয়ার পর পুনরায় তাহাদিগের স্বামিগণের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইতে বাধা দিও না, যদি তাহারা বিধি অনুযায়ী পরস্পর মিলিত হইতে চায়। এই উপদেশ ভগবান ও পরলোকে বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য। বস্তুতঃ ইহাই তোমাদের জন্য অধিকতর ন্যায্য ও পবিত্র (২; ২৩২)।"

কোরাণের বিধি অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়ার পরও আবার স্বামি-স্ত্রীতে মিলন হইতে পারে, কিন্তু এই ভাবে পুনর্ব্বার মিলিত বিবাহ-বন্ধন দুই বারের বেশী ছিন্ন করা যায় না। দুই বার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবার পর কোন স্বামী আবার তাহার স্ত্রীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। দুই বার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর আবার স্বামি-স্ত্রীতে পরস্পর মিলিত হওয়ার সাধারণতঃ কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্য দুই বারের বেশী ত্বলাক্ দেওয়ার সাধারণভাবে কোন বিধি কোরাণে নাই। কোরাণে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই দ্বিতীয় বার বিবাহের বিধি রহিয়াছে এবং যদি কোন স্বামী বা স্ত্রীর তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী বা স্বামীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে সে অন্য একটি বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু তাহার সহিতও সকল সময় সদ্ব্যবহারই করিতে হইবে, তাহা না হইলে সেখানেও আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পরস্পরের সুখ-সুবিধা ও সমাজকল্যাণের জন্য কোরাণের বিবাহ পরস্পরের যৌন-মিলন মাত্র। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ এক জনকে ছাড়াইয়া দুই বা ততোধিক হইতে আপত্তি নাই কিন্তু ইহা সকল সময় কোরাণের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কোন খামখেয়াল বশতঃ করিলে চলিবে না। তাই দুই বারের বেশী ত্বলাকের নিয়ম নাই, তবে যদি কেহ তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী বা স্বামীর সহিতও দাম্পত্য প্রণয় স্থায়ী রাখিতে না পারে, তাহা হইলে সে আবার প্রথম পক্ষের স্ত্রী বা স্বামীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। কোরাণে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, "সুতরাং যদি কেহ তাহার স্ত্রীর নিকট (তৃতীয় বার) বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করে, তাহ হইলে সে আবার বিধি অনুযায়ী তাহার স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইবে না, যে পর্য্যন্ত না সে অন্য একজন স্বামী গ্রহণ করে, এবং যদি সেই (পরবর্ত্তী) স্বামী আবার তাহার প্রতি বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করে, তখন প্রথম বারের স্বামি-স্ত্রী উভয়েই আবার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে (২; ২৩০)।" উল্লিখিত এই বিধি বেশ অর্থপূর্ণ। যাহাতে কোরাণের বিবাহ-বিচ্ছেদকে কোনরূপে খাম-খেয়াল মনে না করা হয় এইজন্যই এরূপ বিধি। দুই বার বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়া গেলে আর সাধারণতঃ পুনরায় মিলনের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং তৃতীয় বার আবার তাহাদের তখনই মাত্র পরস্পরের মিলনের সম্ভাবনা থাকে যখন তাহাদের এক জন অন্য স্বামী বা স্ত্রীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও তাহার সহিত দাম্পত্য প্রণয় স্থায়ী রাখিতে পারে না। ইহা হইতে তাহার শিক্ষা হয় যে, যে কারণে একজন হইতে তাহার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, অনুরূপ কারণে অন্য একজন হইতেও তাহার আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। কেবল মাত্র তখনই তাহার দোষ-ত্রুটির পরিমাপ সঠিক জানিতে পারিয়া, সে আবার প্রথম বারের স্বামী বা স্ত্রীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে এবং এই পরবর্ত্তী বারের সমাজ-বন্ধন আর শিথিল না হওয়ারই সম্ভাবনা।

পার্থসারথি

শ্রীসাহাজী

অহিংসাবাদী একশ্রেণীর বৌদ্ধগণ শ্রীকৃষ্ণকে মারের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন![1] সেজন্ত তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ গীতার স্থায় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যখন বলিয়াছেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ, লোকান্
সমাহর্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ।

*　　*　　*　　*

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব
সব্যসাচিন্॥[2]

তখন বৌদ্ধদের দোষ দিতে যাওয়া অন্যায় নয় কি? অথচ মহাভারত পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহার ন্যায় বাস্তব অহিংসাবাদী জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

সত্য বটে, জরাসন্ধের তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য তিনি পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন; সত্য বটে, জীবনে তাঁহাকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথা সত্য নয় যে, তিনি যুদ্ধপ্রিয় বা যুদ্ধ-পিপাসু ছিলেন। তিনি ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ, ক্ষত্রিয় জাতির রণকণ্ডূয়নপ্রবৃত্তিই শুধু নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন এই মাত্র; নতুবা, উহার উচ্ছেদ-সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার গীতোক্ত 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' উক্তিই সে কথার প্রমাণ। সমাজস্থিতির জন্য অহিংস ব্রাহ্মণের যেমন প্রয়োজন, সহিংস ক্ষত্রিয়েরও ঠিক তেমনি প্রয়োজন; উভয়ের কেহই তাই ছোট বড় নন। মহামতি এমার্সনের Each thing is right in its place —উক্তি এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণকেও আমরা সেই কথাই বলিতে শুনি:

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ॥
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়ম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥

১ শুধু বৌদ্ধরাই যে তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা নয়; পশ্চিম ভারতেও বহু লোকের মুখে কিষণজী নরকমে গিয়া এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। শুধু রাসলীলার দৃশ্য নয়, সম্ভবতঃ হিংসার প্রশ্রয়দাতা বলিয়াও তাঁহার এই দুর্নাম।

২ কৃষ্ণ তদানীন্তন ভারতের সর্বময় নেতা; কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তিস্থাপনার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তিনি ব্যর্থকাম হন; সুতরাং তাঁহার ঐ অসামর্থ্যই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধজনিত লোকক্ষয়ের সর্বপ্রধান কারণ, কাজেই উহার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহার। এইরূপে ঐ যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব তিনি তাঁহার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লন। এরূপ অবস্থায়, এক জন অন্যায়পূর্বক আর এক জনের সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, কোনক্রমেই উহা তাহার প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবেন না এবং তিনি নেতা হইয়া তাহা দাঁড়াইয়া দেখিবেন, ইহা সম্ভব নয়। সেই জন্যই বিবদমান পক্ষদ্বয় যখন পরস্পর যুদ্ধের দ্বারা নিজেদের বিবাদ-মীমাংসা করিয়া লইতে অগ্রসর হন, তখন তিনি তাহাদের সমর্থন না করিয়া পারেন না। তবে সমর্থন করিলেও উহার প্রতিবাদ করিতে তিনি কিন্তু ক্ষান্ত হন না এবং সেইজন্যই ঐ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অসম্মত হন।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

গীতা, ১৮

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

গীতা, ৩

এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া অহিংসার মাহাত্ম্য যে তিনি বুঝিতেন না, তাহা নয়; এবং দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিবারণের জন্যও তিনি কম চেষ্টা করেন নাই, বরং সেজন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন বলিলেই ঠিক বলা হয়। অর্ধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর পাণ্ডবদের জন্য তিনি পাঁচখানি মাত্র গ্রাম চাহিয়া সন্ধিভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেজন্য স্বয়ং দৌত্য পর্যন্ত স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

কুরুসভায় দৌত্য করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া মহাত্মা বিদুর পর্যন্ত সে সময়ে অনুযোগ করিয়াছিলেন।[৩] দেখা যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ, দুর্যোধনের নিকট হইতে জীবিকালাভ করিয়া থাকেন,

৩ পাণ্ডবদের দৌত্যকার্যে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে কৃষ্ণের দুইটি উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়: একটি রাজনীতির এবং অন্যটি মানবতার দিক। দৌত্যকার্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও ঐ দুইটি উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাণ্ডবসভায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, দুর্যোধন সাধু কি অসাধু, সে বিষয়ে এখনও যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহাদের সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্যই তাঁহাকে কুরুসভায় যাইতে হইবে। এবং দেখা যায়, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। দুর্যোধন তখন প্রবল পক্ষ এবং প্রবলের পক্ষ অবলম্বনে কাহার না আগ্রহ হয়? একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে যে তখন অসম্ভব হয় নাই, উহাই তাহার কারণ। এবং মনে হয়, কৃষ্ণ ঐভাবে তাঁহার অসাধুতা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করাও পাণ্ডবদের পক্ষে সে সময়ে সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য, দৌত্যকার্যের এইটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জানিয়া শুনিয়াও একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য অন্যায়কারীর পক্ষই সমর্থন করিয়াছিলেন; অথচ ন্যায়কারীর পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য মাত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ক্ষত্রিয় জাতির নৈতিক জ্ঞানের সে সময়ে কিরূপ অভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের পতন তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল।

পক্ষান্তরে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মনুষ্যকে যুদ্ধ করিয়া করিয়া মরিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা এবং তাহা নিবারণের জন্য প্রাণপণ না করা অত্যন্ত নৃশংসতার কার্য। কাজেই, মানবতার দিক দিয়া কৃষ্ণ সে সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য আসমুদ্র হিমাচল সমুদয় ভারতবর্ষ আজিও যদি তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেন, তাহা হইলে উহা বস্তুতঃই বাড়াবাড়ি নয়। তবে একথা অবশ্য খুবই সত্য যে, অন্যায়কারীকে সৎপথে আনিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াও যখন তিনি কিছুতেই সফলকাম হইতে পারেন নাই, অন্যায়কে আরও অধিক প্রশ্রয় দেওয়া তখন আর তিনি সংগত মনে করেন নাই। কেননা, জগতে অহিংসার যেমন ক্ষেত্র আছে, হিংসারও তেমনি ক্ষেত্র আছে। অহিংসার ক্ষেত্রে হিংসা করিতে যাওয়া যেমন অন্যায়, হিংসার ক্ষেত্রে অহিংসা করিতে যাওয়াও তেমনি অন্যায়। মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার লোক। পাঁচ হাজার বৎসর পরে উদ্বুদ্ধ ভারত পুনরায় আজ মহাভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার উচিত পুনরায় মহাভারত-অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া। অন্ততঃপক্ষে মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ব যে সত্তসত্বই এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্মই যে ভারতের বর্তমান দৌর্বল্যের সর্বপ্রধান কারণ, সেকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার প্রভাব হইতে এখনও আমরা মুক্ত হইতে পারি নাই।

সুতরাং শান্তিপক্ষে কদাচ সম্মত হইবেন না। কাজেই কুরুসভায় আগমন করা তাঁহার উচিত হয় নাই।

কিন্তু বিদুরের ঐ কথায় তিনি তখন যে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সুন্দর। তিনি তখন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, অশ্বকুঞ্জর-সমবেত বিপর্যস্ত পৃথিবীকে যিনি মৃত্যুনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ হয়। সুতরাং সংগ্রামে বিনাশোন্মুখ কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয় সেজন্য তিনি প্রাণপণ করিবেন।

একথা অবশ্য সত্য যে, তাঁহার সেই প্রাণপণ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; কিন্তু তথাপি সৎপ্রসংগে বিফলপ্রযত্নকারীও যে মহাফল লাভ করিয়া থাকে বিদুরকে সেকথাও তিনি তখন বুঝাইতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ: মানুষ আপন শক্তি অনুসারে কর্তব্য কর্ম করিবার চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা সম্পাদন করিতে না পারে তথাপি সে তাহার সম্পাদন-জনিত পুণ্যলাভে সমর্থ হয়। জ্ঞাতি-গণের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইলে যে মিত্র যাইয়া সর্বপ্রযত্নে মধ্যস্থতা না করেন জ্ঞানিগণ তাঁহাকে মিত্র বলিয়া গণনা করেন না।

সুতরাং ঐ প্রকার বিফল প্রযত্ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না; বরং ঐ যুদ্ধ নিবারণের জন্য তিনি কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সেই কথাই প্রতিপন্ন হয়।

সত্য বটে তাঁহার সেই প্রযত্ন সফল হয় নাই, কিন্তু সেজন্য তিনি দায়ী নন, দায়ী তদানীন্তন ভারতের অসুরভাবাপন্ন ক্ষত্রিয়-সমাজ। তাঁহাদের সেই অতি মূঢ়তার কথা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ভারতীয় ক্ষত্রিয়-সভ্যতার পতন তাঁহাদেরই সেই মহাপাপের ফল। সেই মহাপাপের ফলে শুধু যে তাঁহারাই মরিয়াছেন তাহা নয়, সেই সংগে ভারতকে চিরদিনের জন্য মারিয়াছেন।

কুরুসভায় গমনের প্রাক্কালে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভও পরাজয়ের তুল্য; কেননা, তাহাতে বহু ব্যক্তির বিনাশ নিবন্ধন বহু অনর্থের উৎপত্তি হয়। তখন তাঁহার ঐ বাক্যের অভিনন্দন করিয়া তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন: হে ধর্মরাজ! আপনার বুদ্ধি ধর্মানুগত; বিনা যুদ্ধে যাহা লাভ হয়, আপনি তাহারই বহুমান করিয়া থাকেন; কিন্তু কৌরবদের বুদ্ধি বৈরাচরণেই নিরত।

ইচ্ছা করিলে বলভদ্রের ন্যায় তিনিও যে তীর্থযাত্রা করিতে না পারিতেন, তাহা নয়। পলায়ন করিলে অথবা অর্জুনের সারথ্য অস্বীকার করিলে যুদ্ধ যদি বন্ধ হইত, তাহা হইলে শতবার পলায়নে অথবা শতবার সারথ্য অস্বীকারেও তাঁহার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয় তখন উহার মধ্যে না থাকিয়াই যতটা সম্ভব উহার উগ্রতা এবং স্থায়িত্ব কমাইবার চেষ্টা করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য নয়? দেখাও যায়, তিনি যে শুধু কর্ণকেই তাঁহার জন্মরহস্য জানাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হন, তাহা নয়; পরন্তু কুন্তীকে পর্যন্ত তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, ঐ প্রকার চেষ্টা অল্প-বিস্তর পরেও তিনি বহুবার করেন। অধিক কী, আবর্তসংকুল ঐ মহাযুদ্ধের মধ্যে ক্রমে তিনি এরূপ জড়িত হইয়া পড়েন যে, শেষ অবধি নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলেন, কিন্তু তথাপি ভ্রাতৃবিরোধজনিত যুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্বক নররক্ত-স্রোত বৃদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই। অহিংসার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদাহরণ সে যুগের কেন, এ যুগের ইতিহাসেও অত্যন্ত দুর্লভ। পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে[৪] অহিংসার

৪ ১ম ভারতযুদ্ধ খৃ পূ ৩১০১ অব্দের ঘটনা এবং বর্তমান

যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন, তথনকার যুগের লোকে উহার মর্যাদা সম্যক বুঝিতে না পারিলেও উহার সুফল আজ কিন্তু আমরা উপভোগ করিতেছি[৫] এবং কতটা উপভোগ করিতেছি, তাহা রণোন্মত্ত বর্তমান ইয়োরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সেদিন—সেই পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হইয়াও হিংসার প্রতিবাদ-কল্পে অকুতোভয়ে যেভাবে নিজেকে তিনি উন্মত্ত রণ-দৈত্যের কবলে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। অথচ, কী দুঃখের বিষয়, যুদ্ধবিদ্বেষী এমন মহাপুরুষকেও আমরা যুদ্ধপিপাসু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি। পুরাণের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের ঐ প্রকার মিথ্যা ধারণার একমাত্র কারণ। বায়ুপুরাণ ঠিকই বলিয়াছেন:

যো বিদ্যাৎ চতুরো বেদান্ সাংগোপনিষদো দ্বিজাঃ।
ন চ পুরাণং সংবিদ্যাৎ নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥

যাহা হৌক, কথাটা কিঞ্চিৎ খুলিয়া বলা আবশ্যক। দুর্যোধন এবং অর্জুন আসন্ন যুদ্ধে তাঁহাকে বরণ করিতে গেলে তিনি তখন স্পষ্টই বলেন, তাঁহার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্বুদ গোপ-সৈন্য একদিকে, অন্যদিকে নিরস্ত্র একাকী তিনি; ইহার মধ্যে যে পক্ষের যাহা হৃদ্যতর, সেই পক্ষ তাহাই গ্রহণ করিবেন।

বলা বাহুল্য, অর্জুন সমরপরাঙ্মুখ জানিয়াও কৃষ্ণকেই বরণ করিয়া লন; ফলে, দুর্যোধন তখন এক অর্বুদ নারায়ণী সেনা লাভ করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। এইরূপে দুর্যোধন কৃতকৃত্য হইয়া প্রস্থান করিলে পর কৃষ্ণ যখন অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করেন, সমরপরাঙ্মুখ জানিয়াও কেন তিনি তাঁহাকে বরণ করিলেন, তখন অর্জুন উত্তর করেন: সত্যবটে কৃষ্ণ নিজেই ধার্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিতে সমর্থ এবং তাঁহার কীর্তিও ত্রিলোক-বিখ্যাত, তথাপি অর্জুন একাকী তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া অসীম যশোলাভ করিবেন, এই আশাতেই সমরপরাঙ্মুখ জানিয়াও তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। সুতরাং আসন্ন যুদ্ধে তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহার সারথ্যকার্য করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই বাক্যে সম্মত হন। কিন্তু সারথ্যকার্য কিরূপ বিপৎসংকুল, সেকথা বস্তুতঃই ভাবিয়া দেখিবার মতন। সারথি অবধ্য,—যুদ্ধের সাধারণ বিধি যদিও এইরূপ, তথাপি কার্যক্ষেত্রে সারথির জীবনই কিন্তু অধিক বিপজ্জনক দেখা যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সারথ্য করিতে গিয়া সূতজাতীয় কত ব্যক্তিকে যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখা যায়, আচার্য দ্রোণ এবং ভীষ্মের ন্যায় প্রসিদ্ধ যোদ্ধারাও সারথিবধে কুণ্ঠিত হন নাই। কৃষ্ণকে অসংখ্য শরাঘাতে জর্জরিত করিতে কী ভীষ্ম, কী দ্রোণ, কী কর্ণ, কী শল্য, কাহারই বাধে নাই। এরূপ অবস্থায়, ভারতযুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য করিবেন, অথচ অস্ত্রধারণ পূর্বক নররক্ত-স্রোত বৃদ্ধি করিবেন না বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কম সাহসিকতার কথা নয়।

বৎসর ১৯৪৮; সুতরাং মধ্যবর্তী ব্যবধানকালের পরিমাণ ৫০৪৯ বৎসর, এইমাত্র।

৫ 'ভোগ করিতেছি' না বলিয়া 'উপভোগ করিতেছি' বলিলাম এইজন্য যে, আমরা মাত্রা ঠিক রাখিয়া ভোগ করিতে পারি নাই এবং পারি নাই বলিয়াই আজ আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় জাতির অতিবৃদ্ধিই নিবারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু আমরা ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনি। ভোগকে সেইজন্যই আমরা উপভোগ করিয়া তুলিয়াছিলাম।

জীবনে যিনি কোনদিন অস্ত্র ধারণ করেন নাই, অস্ত্র ধারণ করিতেও যিনি জানেন না, তাঁহার পক্ষে অহিংস থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু যিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং সর্বাধিক বলশালী হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন, 'এই যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না', তাঁহার অহিংসা, তাঁহার সাহসিকতা, তাঁহার শক্তিমত্তা যে কত বেশী একমুখে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে তাঁহাকে পূজা করিতে অগ্রসর হইয়া মহামতি ভীষ্ম তখন যাহা বলিয়াছিলেন—'আমাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং নিখিলবেদবেদাংগপারদর্শী তাঁহাকেই আমি এই সম্মান প্রদান করিতেছি', বর্তমান প্রসংগে পাঠকগণকে তাহা আমরা স্মরণ করিতে বলি।

অবশ্য, যদি কেহ বলেন, অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া হিংসা-কার্যে সহযোগিতা করা তাঁহার পক্ষে কি অন্যায় হয় নাই? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সে কথার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। মানুষের জন্যই আদর্শ, আদর্শের জন্য মানুষ নয়। ভারতবর্ষ বহু আদর্শের উত্থান-পতন দেখিয়াছে; সুতরাং আদর্শের মূল্য তাহার অজানা নাই। একজন অন্যায়পূর্বক অন্যের ন্যায্য সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, শত প্রকারে বুঝাইলেও তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন না; অথচ, নেতৃস্থানীয় প্রধান পুরুষ তাহা দাঁড়াইয়া দেখিবেন ইহা সম্ভব নয়। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ঠিকই বলিয়াছিলেন: যে পক্ষে ধর্ম, সেই পক্ষেই কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেরই জয় হইবে।

কর্ণপর্বে অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বলিতেছেন: 'আমি নিবারণ করিলে অর্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবেন। যুধিষ্ঠির নিরন্তর প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর, এবং জনার্দনেরও বিরোধে বাসনা নাই। অতএব হে মহারাজ! সমরে ক্ষান্ত হন।'

আবার উদ্‌যোগপর্বে কর্ণ নিজেই স্বীকার করিতেছেন: 'এই যে পৃথিবীর প্রলয়-দশা সমুপস্থিত হইয়াছে, রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি এবং আমি, এই চারিজন ইহার কারণ।'

এই পর্বের অন্যত্র স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের মুখেও আমরা শুনিতে পাই: 'হে সঞ্জয়, মন্দবুদ্ধি দুর্যোধন ও ক্ষুদ্রাশয় কর্ণ ব্যতীত অস্মৎপক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবদের বিদ্বেষ করেন না।'

অশ্বত্থামা, কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র, ইঁহারা সকলেই পাণ্ডবদের শত্রুপক্ষ, অথচ তাঁহাদেরই মুখে এই কথা। সুতরাং কৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদের যুদ্ধে অনিচ্ছার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কী হইতে পারে? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ইহা হইতেই অনুমিত হয়। অথচ, সর্বত্রই ধারণা, যুদ্ধের তিনি একজন মস্ত বড় সমর্থক। প্রকৃত কথা এই যে, কৃষ্ণ যখন সর্বত্র ঈশ্বর বলিয়া পরিগৃহীত হন, ঐরূপ মনোভাব তখনকার। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য হয় না—Even a sparrow falls not unknown by Him, সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে হয়, তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং কৃষ্ণ সেই ঈশ্বর; অতএব, ঐ যুদ্ধের তিনিই কারণ। কী গীতা, কী মহাভারত, উভয়ত্রই আমরা ঐ প্রকার মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এইরূপে দেবতা করিতে গিয়া তাঁহাকে আমরা এমনি করিয়াই দৈত্য করিয়া বসিয়া আছি যে, আসল মানুষটির আজ খোঁজ পাওয়া ভার।

কুরুক্ষেত্রে স্বামী তুরীয়ানন্দ*

স্বামী অতুলানন্দ

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সূর্যগ্রহণের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ ব্রহ্মচারী গুরুদাস মহারাজের সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেবার কুরুক্ষেত্রের মেলায় প্রায় অর্ধ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়া দেখিলেন, স্থানীয় ধর্মশালাগুলি নরনারীতে পরিপূর্ণ। অস্থায়ী যে সকল তাঁবু ও ছাউনী করা হইয়াছিল সেগুলিতেও তিল ধারণের স্থান ছিল না। অগত্যা তাঁহারা দুই জন একটী বৃহৎ বটবৃক্ষের তলায় কম্বল পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সাধুদ্বয়ের মুখমণ্ডল শ্রান্ত, ক্লান্ত ও শুষ্ক দেখিয়া জনৈক ভক্তিমতী নারী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কিছু খেয়েছেন কি?' সাধুদ্বয় অনাহারে আছেন জানিয়া মহিলাটী দ্রুতপদে তাঁহার আস্তানা হইতে আটার রুটী কয়েকখানি, একটু দুধ ও তরকারী আনিলেন। সাধুদ্বয় আনীত আহার্য সানন্দে ভক্ষণ-পূর্বক স্ব স্ব পুঁটুলি মাথায় দিয়া গাছের তলায়ই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ উঠিয়া বসিলেন। গুরুদাস মহারাজ একটু পূর্বে উঠিয়া নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশের দিকে বিস্মিত নয়নে তাকাইতেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ উঠিয়া বসিতেই গুরুদাস মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন. 'কি হয়েছে মহারাজ?' হরি মহারাজ বলিলেন, 'গুরুদাস, এখন তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী।' গুরুদাস মহারাজ উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, তাই ত আমি হতে চাই।' এই বলিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'সন্ন্যাসীর গীতি' হইতে নিম্নলিখিত অংশটী আবৃত্তি করিলেন—

সুখতরে গৃহ করো না নির্মাণ।
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে ধীমান্॥
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ।
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস॥
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও।
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও॥
হউক কুৎসিত কিংবা সুরন্ধিত।
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত॥
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে।
কোন্ খাদ্য পেয়ে অপবিত্র করে॥
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মত।
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য প্রবাহিত॥
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান॥
গাও গাও গাও এই গান॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক্ ঠিক্। আমরা জগন্মাতার সন্তান, আমাদের ভয় কি। তিনিই দেন এবং তিনিই নেন। তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক।' তারপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য-কীর্তনোদ্দেশ্যে বলিলেন, 'তিনি ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। ঐশ্বর্যে ও দারিদ্র্যে তিনি সমান থাকতেন। তিনি জানতেন, তিনি সাক্ষিস্বরূপ নিত্যমুক্ত আত্মা।

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫) প্রকাশিত স্বামী অতুলানন্দজীর প্রবন্ধ হইতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী কর্তৃক সংকলিত।

সুখ বা দুঃখ তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। দুনিয়াটা ছিল তাঁর কাছে একটা রঙ্গমঞ্চ। কি সুন্দর ভাবেই না তিনি ঐ রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় ক'রে গেলেন! পরার্থেই ছিল তাঁর জীবন-ধারণ। তাঁতে স্বার্থপরতার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁর নিজের কোনও মতলব বা স্বার্থ ছিল না। ঠাকুরের বাণী ও সাধনপ্রচারই ছিল তাঁর জীবনব্রত। আমাদের ঠাকুর বলতেন, 'সে যথেচ্ছ চলতে পারে, তাতে তাঁর কোন দোষ হবে না।' স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হইতেন। একটু থামিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ আবার বলিলেন, 'কিন্তু আমাদিগকে সাবধান হ'তে হ'বে। মায়ার অসীম শক্তি, আমরা সহজেই মায়ার দ্বারা আবদ্ধ ও মোহিত হই।' তখন গুরুদাস মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'মা আমাদের রক্ষা করবেন।' হরিমহারাজ বলিলেন, 'তুমি ঠিক ব'লেছ, এটা কখনও ভুলো না। তাঁকে সদা বিশ্বাস কর। মা ব্যতীত জীবনের মূল্য কি? মাতৃচিন্তা ব্যতীত জীবন মিথ্যা ও মূল্যহীন। একমাত্র তিনিই সত্য।' একটুকু থামিয়া আবার বলিলেন, 'এখন একটুকু ঘুমোতে চেষ্টা কর। কাল আমরা আরও ভাল জায়গা পেতে পারি।'

হরি মহারাজ বা গুরুদাস মহারাজ সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিলেন না। মধ্য রাত্রির কিছু পরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বট গাছের পাতায় বৃষ্টি-পড়ার শব্দ শোনা গেল। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গুরুদাস মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, 'গুরুদাস, আমাদের অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে।' উভয়ে উঠিয়া স্ব স্ব কম্বলাদি সহ আশ্রয়ের সন্ধানে চলিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ সকল স্থানই জনাকীর্ণ। হরি মহারাজ কোনও স্থানে ঢুকিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সুতরাং যাত্রিগণের উচ্চ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহারা এক দিকে খোলা চটীতে ঢুকিলেন। যাত্রিগণ তথায় শায়িত অবস্থায় সেই বিনিদ্র রজনীতে গল্প গুজবে মত্ত ছিল। প্রতিবাদ এত তীব্র হইয়াছিল যে, মনে হইয়াছিল যেন যাত্রীরা সাধু দুইজনকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের চীৎকার থামিয়া গেল এবং সাধুদ্বয় মাথা গুঁজিবার একটু জায়গা পাইলেন। একটা বাক্সের মধ্যে চারিপাশে জিনিষ থাকিলে আর একটি জিনিষ মাঝখানে ঢুকাইয়া দিলে যেমন হয় তেমনি সাধুদ্বয় যাত্রিপরিপূর্ণ স্থানের মধ্যে বৃষ্টি হইতে বাঁচিবার এবং শুইবার একটু জায়গা পাইলেন। ঘরটির তিন দিকে দেওয়াল এবং এক দিক খোলা এবং একটি ছাদ। কঠিন মেজের উপর কম্বল পাতিয়া সাধুদ্বয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভোরে উঠিয়া দেখিলেন, আকাশে সূর্য উঠিয়াছে। ঘরের অর্দ্ধেক যাত্রী অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। হাতমুখ ধুইয়া তাঁহারা কম্বলের উপর বসিয়া পরস্পর আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুদাস মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাত্রিগণ তীব্র আপত্তি করা সত্ত্বেও আপনি গত রাত্রে চটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারলেন কিরূপে?' স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ সহাস্যে বলিলেন, 'তুমি এখনও আমাদের (ভারতীয়দের) চেন নি। আমরা খুব জোর চীৎকার করি বটে, কিন্তু এর পেছনে কিছু নেই। পাশ্চাত্যে তোমরা সব ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ কর। এখানে তুমি দেখবে, দুজন লোকে কথা বলে এবং এমন ভাবভঙ্গী দেখায় যে, যেন উভয়ে পরস্পরকে তখনই খুন করবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই তারা একত্রে বসে এমন ভাবে তামাক খাবে, যেন তারা পুরোন বন্ধু! এই হোলো আমাদের ধারা। এই লোকেরা শিক্ষিত নয়, কিন্তু তাদের সৎ হৃদয় আছে। যখন তারা দেখলে যে, আমরা সত্যই বিপন্ন তখন তারা আমাদের জন্য জায়গা করে দিলে নিজেদের অসুবিধা সত্ত্বেও।

আমি তাদের বল্লাম যে, তুমি বিদেশী, বিদেশে এসেছ এবং তুমি সন্ন্যাসী। তৎক্ষণাৎ তারা কৌতূহলী হয়ে উঠলো এবং তোমার সম্বন্ধে সব জান্তে চাইলে। তখন তারা বল্লে, আপনারা আসুন। আপনাদের জন্য জায়গা করে দি। সর্বত্র তুমি এরূপই দেখবে। ভারতের সর্বত্র সন্ন্যাসীরা সমাদৃত হন, বিশেষতঃ গরীব লোকদের দ্বারা। তারা খুব সরল ও সদয়। আমাদের কিয়দংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মত তারা কুটিল ও কপট নয়। স্বামিজী দরিদ্রদের ভালবাসতেন, তাঁর হৃদয় তাদের জন্য ব্যথিত ও বিদীর্ণ হোত। তিনি বল্তেন, তারা আমার উপাস্য দেবতা। সেইজন্য আমাদের মিশন তাদের মধ্যে এত কাজ করে। সমগ্র ভারতে দরিদ্রনারায়ণদের সেবার জন্য আমাদের মিশনের শাখাকেন্দ্র আছে। আমরা তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও ঔষধপথ্যাদি দিয়ে থাকি। আমরা দরিদ্ররূপী নারায়ণের সেবাই করি।'

একটু পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলিলেন, 'আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গীতা প্রচার করেছিলেন।' তারপর তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবের সহিত উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছিলেন। গুরুদাস মহারাজ সংস্কৃত পদ্যের মাধুর্য ও ছন্দোময়তায় মুগ্ধ হইলেন। স্বামীজীর আবৃত্তি শেষ হইতেই একজন ভদ্রলোক আসিয়া কর্কশ বাক্যে বলিলেন, 'আমরা সাধু। আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি।' তিনি গুরুদাস মহারাজকে ইংরাজ গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছিলেন। তাই গুরুদাস মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাহেব কোন হ্যায়?' হরি মহারাজ তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলাতে তিনি তখনই শান্ত হইয়া ভদ্রভাবে বলিলেন, 'আপনারা উভয়ে আমার অতিথিরূপে এখানে থাকৃতে পারেন। আমি আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দেবো।' লোকটি একটি ভৃত্যকে ডাকিয়া আমাদের কম্বলের নীচে কিছু খড় বিছাইয়া দিতে বলিলেন। তৎপরে আমাদিগকে নমস্কার করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

লোকটি চলিয়া যাইতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, 'দেখ, মায়ের খেলা। এখন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পারি। তুমি কি মনে কর, এইভাবে থাকৃতে পারবে?' গুরুদাস মহারাজ—'হাঁ মহারাজ, আমার বিশ্বাস, আমি পারবো।' একটু পরে একটি চাকর তাঁহাদের জন্য মোটা আটার রুটি ও গুড় আনিল। প্রত্যহ প্রাতে চাকরটি এইরূপ খাবার আনিত। সন্ধ্যায় সে রুটি ও ঝোল আনিত। এইভাবে নয় দিন কাটিল। ভদ্রলোকটি কখনও কখনও আসিয়া তাঁহাদের সংবাদ লইতেন। ঘরের মধ্যে অন্যান্য যাত্রী থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের কম্বল ভালরূপে পাতিবার জায়গা পাইলেন। যাত্রীরা ঘরের মধ্যে মাটির উনুন করিয়া রান্না করিত। ঘরের ধূমনির্গমনের জানালাদি না থাকায় ধোঁয়ার সময় সাধুদ্বয়ের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইত, এবং চোখ জ্বালা করিত। কিন্তু কাহার নিকটই বা তাঁহারা ইহার প্রতীকারার্থ অভিযোগ করিবেন? গুরুদাস মহারাজ এই প্রকার জীবন-যাপনে অনভ্যস্ত থাকায় মাঝে মাঝে তাঁহার জ্বর হইতে লাগিল। জ্বর হইলেও তিনি চলিতে ফিরিতে পারিতেন। যেদিন তাঁহার জ্বর হইত সেদিন তিনি রুটী খাইতে পারিতেন না; সেদিন হরি মহারাজ তাঁহার জন্য এক কাপ দুধ কিনিতেন। হরি মহারাজের পূত সঙ্গলাভের জন্য গুরুদাস মহারাজ এই কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় অনেকে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সহিত আলাপ করিতে এবং তাঁহার উপদেশ লইতে আসিত। তিনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া সমাগত ধর্মপিপাসুদের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তাঁর ক্লান্তিবোধ

হইত না। ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। প্রাতঃকালে স্নানাহার-সমাপনান্তে গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ যাত্রীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সাধু ও তীর্থস্থানগুলি সাগ্রহে দর্শন করিতেন। যতীশ্বর—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, বাণগঙ্গা—যেখানে ভীষ্মদেব শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, দ্বৈপায়ন হ্রদ ও সন্নিহিত তালাও প্রভৃতি প্রাচীন পুণ্যস্থানগুলি তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। একটী বিশাল বটগাছে বড় বড় ডালে কয়েকটী কঠোরী সাধু পাখীর মত পাতার বাসা বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন। সেইবার কুরুক্ষেত্রের মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসিব্রহ্মচারীর সমাগম হইয়াছিল। সাধুদের মধ্যে কেহ উলঙ্গ, কেহ কৌপীনমাত্র-পরিহিত, কেহ গেরুয়াধারী, কেহ ধুনিভস্মলিপ্ততনু, কেহ পাগড়ীধারী, কেহ জটাজূটমণ্ডিত, কেহ মুণ্ডিতমস্তক, কেহ বা শ্বেতাম্বর। জটাধারীদের মধ্যে কাহারো জটা পৃষ্ঠোপরি বা বক্ষোপরি লম্বমান, কাহারো বা শিরোপরি সর্পবৎ কুণ্ডলীকৃত। শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও পণ্ডিতগণ বৃক্ষতলে বা স্ব স্ব তাঁবু বা তৃণ-কুটিয়ার সম্মুখে বসিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ বা শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেছিলেন। জনৈক সাধু চিরমৌনব্রত, আর একজন অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন রক্তবস্ত্রপরিহিত সাধু গাছের ডালে ভর করিয়া নয় দিবস একপদে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ গুরুদাস মহারাজকে ঐ সকল দেখাইতে লাগিলেন। বিশাল তীর্থক্ষেত্রটী নয় দিন যাবৎ সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্মালাপে মুখরিত এবং ধর্মভাবে পরিপ্লুত ছিল।

সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সময় ধরণী অন্ধকারাবৃত হইলে স্নানের শুভযোগ আসিল। হ্রদগুলি সুবৃহৎ হইলেও যাত্রীর ভিড় এত অধিক ছিল যে, তাঁহাদের পক্ষে স্নান করা কঠিন হইয়া উঠিল। স্বামী তুরীয়ানন্দজী গুরুদাস মহারাজকে লইয়া অতি কষ্টে তিন ডুব দিলেন। হাজার হাজার যাত্রীর একত্রে ভক্তিভরে স্নান এক অদ্ভুত দৃশ্য! জগতের অন্যত্র কোথাও এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যায় না। ইহা দেখিলে নাস্তিকও আস্তিক হইয়া যান। এইরূপ ধর্মমেলা দেখিলে ধর্মহীনের হৃদয়েও ধর্মভাব জাগ্রত হয়। এই জন্যইত আমাদের মুনিঋষিগণ তীর্থদর্শনাদির এত বিধান দিয়াছেন। স্নানান্তে স্নানাদি ধর্মানুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে গুরুদাস মহারাজ প্রশ্ন করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলিলেন, 'ইহা নির্ভর করে ভক্তিবিশ্বাসের উপরে, মনোভাবের উপরে। খাঁটি ভক্তি থাকলে সুফল অবধারিত। ইহা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। সারকথা—সর্বভূতে মাকে দেখতে হবে। তা হলেই আমরা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ হতে পারব।' তৎপর তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে এই শ্লোকটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন—

'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

অর্থাৎ যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনারূপে অধিষ্ঠিতা তাঁহাকে নমস্কার। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে বলিলেন, 'মা-ই সর্বভূতে অবস্থিতা, তিনিই সর্বভূত। তিনিই নদী, তিনিই পর্বত, তিনিই সব। এটি দিব্য দর্শন, অলৌকিক অনুভূতি! আমাদের ঠাকুরের এটী লাভ হয়েছিল। তিনি গঙ্গা দেখতেন না, তিনি গঙ্গায় ব্রহ্মদর্শন করতেন।'

কুরুক্ষেত্রে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ অহরহ এই দিব্য দর্শনে আবিষ্ট ছিলেন। নয় দিন পর মেলা শেষ হইল। গুরুদাস মহারাজ বেলুড় মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ কুরুক্ষেত্রে আরও কয়েক দিন থাকিয়া জনৈক ভদ্রলোকের অতিথিরূপে অনুপশহর গেলেন।

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, ভাগবত-রত্ন

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বনে যাইতেছেন—তাঁহার দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি ছিল তাহা তিনি দুই স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় নিজ অংশ বুঝিয়া লইলেন: তিনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা বোঝা গেল। মৈত্রেয়ী ছাড়িবার পাত্রী নহেন—তিনি স্বামীকে বলিলেন—"আচ্ছা, আপনি তো আমাদিগকে এই ধন সম্পত্তি দিলেন—ইহা দ্বারা কি অমৃতত্ব লাভ হইবে?" ঋষি প্রশ্ন শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন ও বলিলেন, "অমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেন"—বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। মৈত্রেয়ী তদুত্তরে বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহি"—ভগবন্, যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ না হয় তাহা লইয়া আমি কি করিব? যদি আপনি এই অমৃতত্বের সন্ধান জানেন তো বলুন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য আত্মতত্ত্বের কথা মৈত্রেয়ীকে বলিলেন। এই সংসারে মানুষ ভালবাসে স্ত্রীকে, পুত্র-কন্যাকে, বিত্ত, যশ ও প্রতিষ্ঠাকে—এই ভালবাসার মূলে আত্মা তাহা ঋষি বুঝাইয়া দিলেন। উপনিষৎ হইতে আর একটী উপাখ্যান লওয়া যাক্—নচিকেতা একটী পরমসুন্দর শিশু; তাহার পিতা উদ্দালক ঋষি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞের পর দান-পর্ব—রাজা কল্পতরু হইয়াছেন। পুত্র নচিকেতা রাজার নিকটেই ছিল; সে দেখিল তাহার পিতা কয়েকটী পীতোদক জগ্ধতৃণ গাভী ঋত্বিক্‌দিগকে দান করিতেছিলেন। ইহাতে শিশু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বাবা, আমায় দান কর না কেন?" রাজা রাগিয়া বলিলেন, "তোমাকে যমের হাতে দান করিলাম।" নচিকেতা যমালয়ে গেল। যমরাজ তখন বাড়ীতে ছিলেন না। নচিকেতার অভ্যর্থনা হইল না—তিন দিন সে অনাহারে যমালয়ে রহিল। যমরাজ আসিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি পাদ্য অর্ঘ্য ভোজ্য প্রভৃতি লইয়া ব্রাহ্মণ-বালকের সহিত দেখা করিয়া অতীব নম্রভাবে বলিলেন, "আপনি তিন রাত্রি আমার বাড়ী অভুক্ত ছিলেন। আমার নিকট তিনটী বর গ্রহণ করুন।" নচিকেতা প্রশ্ন করিলেন,

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

যাহারা মরিয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে মানুষের মনে অনেক সন্দেহ আছে—কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর মানুষ থাকে, আবার কেহ কেহ বলেন, মরণের পর কিছুই থাকে না। আপনি ইহার মীমাংসা করিয়া দিন, কারণ আপনি মৃত্যুর রাজা এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিবার যোগ্য ব্যক্তি। যমরাজ প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "এ প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া কি হইবে? ইহার বদলে অন্য কোন বর চাও। তৎপরিবর্ত্তে শতবর্ষপরমায়ু-সম্পন্ন পুত্র-পৌত্রাদি কামনা কর; হস্তী, অশ্ব, গাভী সুবর্ণ সুবিস্তৃত পার্থিব রাজ্য প্রার্থনা কর।"

কিন্তু নচিকেতা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন ও বলিলেন, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"—বিত্ত, ধন-সম্পত্তি মানুষকে তৃপ্তি দিতে

পারে না। তখন যমরাজ প্রীত হইয়া তত্ত্বোপদেশ দিলেন ও বলিলেন,

"স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥"

দেখ নচিকেতা, আমি তোমায় বহু প্রলোভন দেখাইলাম। যে কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তিতে শত শত মানুষ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে আমি তোমায় সেই পাশে বাঁধিতে চাহিলাম, কিন্তু তুমি কিছুতেই বাঁধা পড়িলে না। তুমি এই প্রশ্ন করিবার যোগ্য ব্যক্তি।

আমরা ভোগসর্ব্বস্ববাদী—ঐহিক সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে বেশ সচেতন। আমরাও অধ্যাত্ম ও দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা করি কিন্তু সে প্রশ্নের সহিত আমাদের জীবনের যোগ নাই অর্থাৎ শূন্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ঐ প্রশ্ন করি। উত্তর জানিলেও উহা জীবনে অনুষ্ঠান করি না। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ॥" আমাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কেবল মাত্র intellectual luxury বা মানসিক বিলাসমাত্র। মোটকথা, যদি মানুষের মনে ঐহিক ভোগ-বিলাসের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য না জন্মে তাহা হইলে এই সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব তাহার হৃদয়ে কোনও অনুভূতি বা প্রেরণা জাগাইতে পারে না। যমরাজ বলিলেন,

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করাই অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; শুনিয়াও অনেকে তাহা ধারণা করিতে পারে না, কারণ ইহার উপদেষ্টা দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ।

যাঁহারা শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি লইয়া জীবন কাটাইতেছেন ও ইহার ঊর্দ্ধে যে একটী চিন্তারাজ্য আছে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন, তাঁহারা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং তাহা তাঁহাদের জীবনে রেখাপাত করিতে পারিবে না।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক লোক আপনাদিগকে ধীমান বলিয়া মনে করে ও অন্যকে পথ দেখাইতে যায়—তাহা কেবল একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখার মতই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এইজন্য বলিতেন, 'চাপরাশ থাকা দরকার, চাপরাশ না পেলে তার কথা কেউ মানে না।' এইজন্য যিনি অধ্যাত্ম উপদেশ দিবেন তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি হইবেন। জীবনে বিবেক-বৈরাগ্য সাধন করিয়া যিনি কামনা-বাসনাশূন্য হইয়াছেন তিনিই যোগ্য গুরু। আবার শিষ্যও উপযুক্ত হওয়া চাই। এইজন্য বেদান্ত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন শিষ্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবেন। এই সাধনচতুষ্টয়—বিবেক বৈরাগ্য ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। ষট্‌সম্পত্তি বলিতে বুঝায়—শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান। পূর্ব্বে যে দুইটী উপাখ্যান বলা হইয়াছে তাহা হইতে বোঝা যায় মৈত্রেয়ী ও নচিকেতা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। আমাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কথার কথা মাত্র—এ প্রশ্নের সহিত হৃদয়ের যোগ নাই। ব্রজগোপীদের ভাষায় বলা যায়—

"তোদের শ্যাম কথার কথা
মোদের শ্যাম অন্তরের ব্যথা।"

অভক্ত ভক্ত

শ্রীরমেশচন্দ্র দে, এম্-এ

হায়রে ভক্ত, অভক্ত সম কেনো এই ব্যবহার ?
আমি যতো চাই ধরিবারে তোরে ততো তোর সঞ্চার।
যতো তোর পাছে ছুটিতেছি আমি,
ততো পলাইয়া যাস্ তুই নামি,
বাহাদুর বটে ছোট্ ছোট্ ভাই, আমিও পিছনে ছুটি,
ছুটে ছুটে দেখি যদি পায়ে তোর পড়িতে পারি বা
লুটি'।

তর্ক বুঝির্বা ওঠে তোর প্রাণে আমি যে ক্ষমতাহীন
সাধ্য থাকিলে কেন তোরে গিয়া ধরি নাই এতো
দিন ?
সত্যি, সত্যি সাধ্য পাইবে,
সাধ্য থাকিলে তবে কী ভাইরে,
না ধরিয়া তোরে ছাড়িয়া দিতাম না লহি বক্ষোমাঝে
পাসনি কী, ভাই, শুনিতে কখনো কী ব্যথা সেখানে
বাজে ?
বড়ো আনন্দ লাগে, ভাই, প্রাণে খেলিবারে
সনে তোর
চির অনন্ত হ'য়ে থাক্ ওরে লীলা-খেলা এই ঘোর।
ছোট্ ছোট্ যতো পারিস্ ছুটিতে
ততো পায়ে তোর পারিবো লুটিতে,
ততো অব্যক্ত স্পর্শ লভিবো অজানায় তোর ততো,
লবো চুম্বন, লবো আশ্লেষ, চরণের ধূলি কতো।

আমাতে তোমাতে ভেদ কিছু নাই, আমি
হয়েছি তুই,
একজন কালো, আলো একজন, স্বর্গ-মর্ত্ত ভুঁই।
একজন সৎ, অসৎ অন্য,
দোঁহে মিলে তবে দুজনে ধন্য,
একক ধন্য নহেতো কেহই, একক কেহই নয়,
যে অলক্ষ্য সেতু মাঝখানে খুঁজিয়া দেখিতে হয়।
রঙ্গ-মঞ্চে নেমেছি দু'জনে দর্শক ত্রিভুবন,
দেবতা-যক্ষ, মানব-রক্ষ, চরাচর ভূতগণ।
সকলেরি পাছে আমি ছুটে চলি,
সকলেরি কানে আমি কথা বলি,
সকলেরি প্রাণে আমি ফুটে উঠি, ভীত যে পালায়ে
যাক্'
হোক্ অভক্ত ভক্ত আমার, লীলা তাঁর মনে
থাক্।

ভগবান্ বুদ্ধ

শ্রীসুষমা সেনগুপ্তা, এম্‌-এ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক মহাপুরুষ হিমালয়ের পাদমূলে কপিলাবস্তু নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজপুত্ররূপে। অদ্ভুত তাঁর জীবন-কাহিনী। শিশু রাজকুমার দিন দিন শশিকলার মত বৃদ্ধি পেয়ে যেদিন সমস্ত রূপ-যৌবন নিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন পূর্ণচন্দ্রেরই মত, জগৎ সেদিন তার সামনে তুলে ধরল পরিপূর্ণ ফেনিলোচ্ছল জীবনরসে ভরা সুরাপাত্র। পার্থিব অতুল ঐশ্বর্য, রূপসী যুবতী ভার্যা, শিশুপুত্র, রাজসিংহাসন সমস্তই রাজপুত্র হেলায় দূরে সরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন—রাজ্য, রাজসিংহাসন, প্রজাদের ভালবাসা, প্রিয়ার প্রেম, সন্তানের আকর্ষণ কিছুই রোধ করতে পারল না তাঁকে। কিসের সে আকর্ষণ, কী সে দুর্বার মোহ—যা এক মুহূর্তে রাজকুমারকে পথের ভিখারী করে? কি সে ঐশ্বর্য, কি সে ধন—'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি'? কুমার শাক্যসিংহ দেখেছিলেন জগতে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মানুষের কষ্ট তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তিনি অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, এত দুঃখ এত দৈন্য এত কষ্টের মাঝে কি করে মানুষ অনিত্য তুচ্ছ ভোগের উপকরণ নিয়ে তুষ্ট হয়ে থাকে? এর বাইরে কি কিছু নিত্য বস্তু, কিছু সত্য বস্তু, কিছু চির আনন্দের উপাদান কোথাও নেই? এ দুঃখ-দূরীকরণের কি কোনই উপায় নেই? জগতের দুঃখে পাগল হয়ে বেরিয়েছিলেন কুমার সিদ্ধার্থ—হয় তিনি এর কোন উপায় বের করবেন, নয় তো ফিরবেন না কোনদিন।

সুরু করলেন তিনি কঠিন তপশ্চর্যা, নানা কঠিন ব্রত উপবাস। পরিব্রাজকের বেশে দেশে দেশে ঘুরে নানা গুরুর কাছে গ্রহণ করলেন নানা উপদেশ, করলেন নানা শাস্ত্রপাঠ, কিন্তু অন্তরের জ্বালা তাতে প্রশমিত হোল না। যা তিনি খুঁজছিলেন তা তাঁর মিলল না।

তারপর তিনি গয়ার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বোধি-দ্রুমের তলায় বসলেন গভীর ধ্যানে, অন্তরের অন্তস্তলে প্রসুপ্ত যে ধ্যানী মহাচৈতন্য আছেন সেখান থেকেই জ্ঞানের আলোক পাবার আশায়। শুদ্ধ জ্ঞান তো বাইরের জগতে খুঁজে বেড়াবার জিনিষ নয়। শুদ্ধ জ্ঞান লুকিয়ে আছে প্রতি মানবের অন্তরে, অজ্ঞানের তমসায় আবৃত হয়ে; তাই অন্ধ মানব তার খোঁজ পায় না। সেই জাল ছিন্ন করতে পারলেই জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে মানবের সমগ্র সত্তা উদ্ভাসিত হয়ে যায়—এ সত্য ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত করেছে যুগে যুগে বারবার। বুদ্ধের জীবনেও সেই সত্য আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

দীর্ঘ ছয় বৎসর একাগ্র সাধনার ফলে তাঁর অন্তরে একবার দিব্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে উঠ্‌ল। এ আলো যার অন্তরে একবার জ্বলে উঠে সে তো কেবল নিজের আনন্দ নিয়ে, নিজের মুক্তি নিয়ে নিজে তৃপ্ত হতে পারে না, যে আলো তার নিজের মনের আঁধার ঘুচিয়েছে, তা জগৎকে বিতরণ করবার জন্য সে পাগল হয়ে ওঠে। তাই তিনি এর পর বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব নাম ধারণ করে, আবার ফিরে এলেন জগতে—যে জগৎ

থেকে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে তিনি ছুটে পালিয়েছিলেন মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে। বুদ্ধ পালিয়েছিলেন নিজের মুক্তির জন্য নয়, তিনি জগতের দুঃখে অধীর হয়ে জগতের দুঃখমোচনের জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন; তাই জ্ঞান লাভের পরই তাঁর প্রথম কাজ হ'ল—দুঃখীর দুঃখ-মোচন করা, আর্তের চোখের জল মোছান, মানুষকে সেই বাণী দেওয়া যাতে সে পার্থিব দুঃখের সাগর পার হয়ে অমৃতের পারে পৌঁছাবে। পার্থিব রাজত্ব যিনি ছেড়ে গিয়েছিলেন তিনি আবার ফিরে এলেন রাজারই বেশে মানবের অন্তরে পেতে প্রেমের সিংহাসন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিল, তারপর পড়িল, কিছুকালের জন্য পড়িয়া রহিল—আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে,—এইরূপে উত্থানের পর পতন ও পতনের পর উত্থান চলিবে। প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে এইরূপ উত্থান-পতন হইয়া থাকে। জাতিবিশেষের অধঃপতন হইল—বোধ হইল যেন উহার জীবনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু ঐ অবস্থায় উহা ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে, ক্রমে নব বলে বলীয়ান্ হইয়া আবার প্রবল বেগে জাগিয়া ওঠে। তখন এক মহাতরঙ্গের আবির্ভাব হয়—সময়ে সময়ে উহা মহাবন্যার আকার ধারণ করে; আবার সর্বদাই দেখা যায়, ঐ তরঙ্গের শীর্ষদেশে এক মহাপুরুষমূর্ত্তি চতুর্দ্দিক স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। একদিকে তাঁহারই শক্তিতে, সেই মহাজাতির অভ্যুত্থান, অপরদিকে আবার যে শক্তি হইতে ঐ তরঙ্গের উদ্ভব, তিনিও তাহাদেরই ফলস্বরূপ। উভয়েই যেন পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতেছে—তাঁহাকে এক হিসাবে স্রষ্টা বা জনক, আবার অপর হিসাবে সৃষ্ট বা জন্য বলা যাইতে পারে। তিনি সমাজের উপর তাঁহার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেন, আবার তিনি যে শক্তির আধাররূপে অভ্যুদিত হন, সমাজই উহার কারণ। ইঁহারাই জগতের মহামনীষিবৃন্দ, ইঁহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য, ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা, শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহের বার্ত্তাবহ—ঈশ্বরাবতার।"

বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্য্যধর্ম আপনার গভীর দার্শনিক তত্ত্বের নিগূঢ় সত্যকে হারিয়ে এক আড়ম্বরপূর্ণ জটিল ক্রিয়াকর্মসমন্বিত নীরস কর্মবিধিতে পরিণত হ'ল। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি অসম্ভব রকম বেড়ে উঠল, তাঁরাই হয়ে উঠলেন সমাজের ও ধর্মের একমাত্র রক্ষক ও পরিপোষক। ধর্ম-বৈষম্য ও জাতিভেদের কঠোরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল, নিম্ন বর্ণের ওপর উচ্চ বর্ণের প্রভুত্ব ও অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলল। জড় ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি অত্যধিক বাড়াবাড়ি শুরু হল—ও সেই সঙ্গে যাগযজ্ঞাদিতে পশুবধ ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল। এই সব নানাকারণে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তারই ফলে দেশে নানা বেদবিরোধী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন যে জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই এর মধ্যে প্রধান।

বুদ্ধ বেদের অপৌরুষেয়তা ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। বৈদিক ক্রিয়াকর্মের জটিল কর্ম-পদ্ধতিকেও মুক্তির সোপান বলে স্বীকার করেন নি। তিনি জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস করতেন। ইহজন্মের কর্মফলেই মানুষ বারংবার জন্মগ্রহণ করে, এবং জন্মগ্রহণ করে রোগ শোক জরা মৃত্যু প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কষ্ট ভোগ করে—কামনা-বাসনাই মনুষ্যকে নানা কর্মে নিয়োজিত করে, তার ফলেই মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। কাজেই চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ কামনা-বাসনার বিনাশই মুক্তির একমাত্র উপায়। বৌদ্ধেরা এই মুক্তির নাম দিয়েছেন নির্বাণ। এই নির্বাণ লাভের জন্য যে পথের নির্দেশ তাঁরা দিয়ে

গেছেন তাকে বলা হয় "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।" সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ সঙ্কল্প, প্রভৃতি অষ্টাঙ্গিক মার্গ—এক কথায় কায়মনোবাক্যে সম্যক্‌রূপে সত্যকে, সৎকে গ্রহণ করা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক বা তিনটি পেটিকা। প্রথম ভাগের নাম 'সূত্র'—তাতে আছে বুদ্ধের উপদেশ ও প্রচারাদি, দ্বিতীয় ভাগের নাম 'বিনয়' —বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় বিধি-নিষেধ তার বিষয়বস্তু, তৃতীয় ভাগের নাম 'অভিধর্ম' —বৌদ্ধ ধর্মের মূল দার্শনিক তত্ত্বসমূহ।

বৌদ্ধধর্ম এলো একটা প্লাবনের মত। ভাসিয়ে নিয়ে চললো স্রোতের মুখে কুটোর মত যাকে সামনে পেল তাকে—হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত, শুধু তাই কেন, হিমালয়ের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে চললো তার অভিযান তিব্বত, চীন জাপানে—সমুদ্র পার হয়ে গেলো বর্মা, মালয়, সিংহল সুমাত্রা, যবদ্বীপে। ইহা সশস্ত্র অভিযান নয়, প্রেমের অভিযান।

ভগবান তথাগতের ডাকে দলে দলে লোক প্রাসাদ ছেড়ে, প্রমোদালয় ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো—প্রেমিক ছাড়লো প্রিয়াকে, ছেলে ছাড়লো মাকে, গৃহী ছাড়লো তার গৃহ—কত ঘর যে ভাঙ্গলো তার ইয়ত্তা নেই। সংঘের পর গড়ে উঠতে লাগলো সংঘ—আসতে লাগলো তাতে দলে দলে ভিক্ষুক ভিক্ষুণী, শ্রাবস্তীপুরীর পথ পাটলীপুত্রের পথ মহানগরীগুলির সব পথ ধ্বনিত হয়ে উঠল এই বাণীতে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। জনগণের কাছে সহজবোধ্য করবার জন্য তথাগত তাঁর ধর্ম প্রচার করলেন দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় নয়, প্রচলিত পালি ভাষায়।

যদিও বৌদ্ধধর্ম এসেছিল প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরুদ্ধে কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণরূপে সনাতনহিন্দুধর্মবিবর্জিত এক নতুন ধর্ম বলে যদি আমরা মনে করি, তাহলে ভুল করা হবে। বৌদ্ধধর্ম সনাতন হিন্দুধর্মেরই একটি সম্প্রদায়বিশেষ। নিষ্কাম কর্মসাধনার ভাবটাই এ ধর্মে প্রবল। ভগবান্ বুদ্ধ জাতিভেদবিরোধী ছিলেন, ধর্মের নামে নিজ স্বার্থসিদ্ধিরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্মের মধ্যে সামাজিক দিক দিয়ে খুব বড় জিনিষ তাঁর সাম্যবাদ। তিনি সকল মানুষকে সমান চক্ষে দেখতেন, যে সম্প্রদায় যে জাতির লোকই তার কাছে আসুক না কেন সমানভাবে তিনি তাকে দীক্ষা দিতেন। সৎ জীবন যাপন করতে কারো তো বাধা নেই।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। এ বিষয়ে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—আমি জানি না। তিনি বলতেন—সচ্চরিত্র হও, অপরের কল্যাণ সাধন কর। তোমরা যদি বিশ্বাস কর ঈশ্বর শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ, তবে নিজেরা আগে শুদ্ধ ও সাধুস্বভাব হতে চেষ্টা করে দেখ না কেন? নিজের মুক্তি, নিজের নির্বাণ নিজের হাতে—একথাই তিনি বারবার বলে গেছেন। যীশুখৃষ্ট বলে গেছেন—"আমাকে অনুসরণ কর, তবেই তোমরা স্বর্গরাজ্যে পৌছাবে"; কিন্তু বুদ্ধ বলেছেন—"কেহই তোমাকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে না—আপনার সাহায্য আপনি কর—নিজ চেষ্টা দ্বারা নিজে মুক্ত হও।" তিনি বলতেন—বুদ্ধ অর্থ অনন্ত জ্ঞান; আমি চেষ্টা করে তা লাভ করেছি, তোমরাও চেষ্টা করলেই লাভ করতে পারবে।

বুদ্ধদেব আস্তিক বা নাস্তিক কিছুই ছিলেন না; এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা

হইতে পারে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু অপরে ভক্তিযোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্ম্মের কথা ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়া দেও উহা তাহাই আবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।"

ভারতে এই ধরনের ভাবের একটা ক্রমিক ধারা চলে আসছে। জাতির ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমরা তা দেখতে পাই। গীতায় শ্রীভগবানের বাণী নিষ্কাম কর্মসাধনার নির্দেশ দিয়েছে। বুদ্ধের পর শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বর্তমানে গান্ধীজী একই পথের নির্দেশ দিয়েছেন—স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হবে, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্ম করতে হবে, লোভ আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে, সর্ব জীবে সমভাবাপন্ন হতে হবে, সর্বজীবে প্রেম বিতরণ করতে হবে—জীবনের আদর্শ, জীবনের কর্ত্তব্য এ ছাড়া আর কিছু তো হতে পারে না। কোন দেশে, কোন ধর্মেই এর বাইরে মানব জীবনের গতিপথের কোন নির্দেশ দিতে পারে নি।

কবির ভাষায় বলতে গেলে—

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ।"

পৃথিবী আজ আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত। ক্ষমতা, মদমত্ততা, স্বার্থান্ধতা, তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে চলেছে গভীর তমসার আবর্তের মুখে। বিশ্বশুদ্ধ নরনারী ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধচিত্তে অপেক্ষা করে আছে কবে কালবৈশাখীর ঝড় নেমে আসে তার মাথার উপর প্রলয়ের ঘোর তাণ্ডব নর্ত্তনে। আবার যুদ্ধ, আবার মারামারি, হানাহানি কেউই চায় না। তবু সে আসছে—আসছে—সবাই চেয়ে আছে পশ্চিমাকাশের পানে, "ঐ বুঝি কালবৈশাখী, সন্ধ্যা আকাশ দেয় ঢাকি।"

মনে পড়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথা। অর্জুনও চাননি যুদ্ধ। শেষ মুহূর্তেও ঠেকাতে চেয়েছিলেন ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রাণপণে কিন্তু তাঁর রথের সারথিবেশে দেখা দিলেন স্বয়ং নারায়ণ, আশ্বাস দিলেন তাতেই হবে অধর্মের লয়, আসবে নবযুগ, ধর্মের যুগ।

আজ আমাদের সে আশ্বাস, সে সান্ত্বনা কে দেবে—কোথায় অশ্ববল্গাধারী নারায়ণ? তুমিই কি নিয়ে যাচ্ছ আমাদের এই সর্বনাশা মৃত্যুর গহ্বরে—না তোমার যারা বিরোধিতা করে এসেছে দম্ভভরে, সেই অসুরেরই এই পৈশাচিক লীলা? কে আমাদের বলে দেবে?

আজ এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চারদিক খুঁজে বেড়াই আলোর সন্ধানে। অন্ধকারের মধ্যে দীপশিখার মত জ্বলে ওঠে বুদ্ধের, চৈতন্যের, যীশুর, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, গান্ধীর মূর্তি। তাঁরা এনেছেন যুগে যুগে প্রেমের বাণী, অমৃতের বাণী। অন্তরের অন্তরে আমরা অনুভব করি শান্তি আসতে পারে কেবল প্রেমের পথে, ক্ষমা, সহিষ্ণুতার পথে, অহিংসার পথে। নিষ্ঠুরতর কঠিনতর হিংসার অনল জ্বেলে কিছু কালের জন্য ভস্মীভূত করা যায় একের সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপ, কিন্তু সে আগুন ফিরে গিয়ে নিজেরই ঘর পোড়ায়, আবার ধিকি ধিকি করে জ্বলে ওঠে অন্য দিকে আরও নিষ্ঠুর হিংসার পরিকল্পনা। হিংসায় হিংসার নিবৃত্তি হয় না, হতে পারে না—হিংসার নিবৃত্তি হবে কেবল ত্যাগে, ভালবাসায়, প্রেমে, অহিংসায়।

বুদ্ধের বাণী ও তৎপরবর্তী মহাপুরুষদের প্রেমের বাণী আজ আমাদের স্মরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।

রাম মহারাজের জীবন-কথা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত

সালটা ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৬ এর মধ্যে হইবে—তখন আসন্ন মহামারী ও তৎসংক্রান্ত কঠোর আইনের ভয়ে কলিকাতাবাসিগণ অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়াছেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায় সর্ব্ববিপদবারণ শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যহ বৈকালে শহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লী হইতে হরিসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ঐ সময়ে মাচু (রাম মহারাজের ডাক নাম) প্রত্যহ কোন না কোন একটি সঙ্কীর্ত্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় বহুদূর চলিয়া যাইতেন। পরে বেশী রাত্রে গায়কগন গান বন্ধ করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলে তিনি দেখিতেন বাটী হইতে কতদূরে চলিয়া আসিয়াছেন, তখন সেখান হইতে বাটী ফিরিতে তাঁহার আরও বেশী রাত্রি হইয়া যাইত।

এই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাবের নানাপ্রকার বাহ্য বিকাশ হইতে থাকে। মাঝে মাঝে কীর্ত্তনের দু একটি পদ লইয়া আস্তে আস্তে গান করিতে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে কিছু দিনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। সঙ্গে একটি শ্লেট ও পেন্সিল থাকিত, তাহাতে লিখিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিত। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আভ্যন্তরীণ ধর্ম্মপ্রবণতা এত বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, সাংসারিক কার্য্যকলাপ নিজ হইতে বন্ধ হইয়া গেল, এমন কি নিজের প্রাত্যহিক খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্তও ঠিক থাকিত না। এইরূপে কিছুদিন চলিতে থাকে। তাঁহার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। সেই সময় বেলুড় মঠের সবে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব-বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন মাচুর কাছে প্রস্তাব করি—শ্রীমৎ স্বামীজীর কাছে একবার যাওয়া যাক্ না কেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ ও প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা তাঁহার নিকট শোনা যাইবে। তিনি তাহাতে সম্মত হন। একদিন অপরাহ্ণে আমরা দুই ভাই বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলাম। তখন স্বামীজী মঠের একতলায় দক্ষিণের হল ঘরটিতে সন্ন্যাসীদের লইয়া একটি ক্লাশ করিতেছিলেন। আমরা গঙ্গার সম্মুখস্থ বড় বারান্দায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকি। পরে ক্লাস শেষ হইলে আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সে সময় মাচু বোধ হয় মৌনী ছিলেন, আমিই সকল কথা স্বামীজীকে বলি। মাচু মধ্যে মধ্যে শ্লেটে লিখিয়া কিছু কিছু বলিতে থাকেন। পূজনীয় স্বামীজী মাচুকে কথা বলিতে নির্দ্দেশ দিলে তিন জনের মধ্যেই কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। সকল কথাবার্ত্তা আমার স্মরণ নাই। মোটের উপর পূজনীয় স্বামীজী মাচুকে বলেন, "এখন যেমন বাটীতে আছ তেমনি থাক, মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া সন্ন্যাসীদের সঙ্গ কর। আমাকেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার, ক্রমে ক্রমে ভগবদিচ্ছায় সকলই ঠিক হইয়া যাইবে।"

তখন হইতে মাচুর বাহ্যভাব অনেকটা শান্ত হয় এবং তিনি প্রায়ই বেলুড় মঠে যাইতে

থাকেন। মধ্যে মধ্যে ২।১ দিন মঠেই বাস করিতেন। এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর বোধ হয় ১৮৯৮ কি ১৮৯৯ সালে মাতু আমাকে একদিন বলেন, "আমি আর গৃহে থাকিব না।" আমাদের মাতাঠাকুরাণীর তখন মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া সাধারণ সংসারী লোকের যাহা হইয়া থাকে আমারও তদ্রূপ অত্যন্ত দুঃখ হইল এবং আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

অবশেষে মাতু আমার অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে চির বিদায় লইলেন ও বেলুড় মঠে চলিয়া গেলেন। আমি মধ্যে মধ্যে মঠে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। সেই সূত্রে তৎকালীন মঠস্থ সন্ন্যাসিগণের সহিত আলাপ-পরিচয়ের আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তৎপর ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করিবার সময় মাতু আমাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি দিতেন। তবে বেশী চিঠি পত্র দিতে আমাকে নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন যে আমার চিঠি পাইলে আমাদের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার মন চঞ্চল হয় এবং চাঞ্চল্য ২।১ দিন থাকে।

একবার তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে কালাবাবুর কুঞ্জে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া একেবারে মরণাপন্ন হন, ঔষধ খাইতে অস্বীকার করেন, আর ঐরূপ দুর্ব্বল শরীরে নানা দেবালয়ে ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে জ্বরের প্রাবল্যহেতু তিনি বেহুঁশ হইয়া কোথাও পড়িয়া থাকিতেন। পূজার সময়েই জ্বরের প্রকোপ বেশী হইত, সেইজন্য ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালে পূজার সময় আমি শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি ও অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য অপর কোন স্থানে যাইতে অনুরোধ করি। দুইবারই তিনি ধীরভাবে আমার অনুরোধের অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

অর্দ্ধেক শতাব্দী আগে করেছিলে যে ভবিষ্য বাণী,
সত্য হয়ে আজ তাহা বিদূরিল অন্ধকার গ্লানি
হে বিবেক স্বামী, ভারত স্বাধীন আজ ;—গর্বোদ্ধত
উন্নত মস্তকে মানবসমাজে সাধে তার ব্রত।
আত্মতত্ত্ব ভারতের বিশ্বমাঝে প্রচারিত করি
গ্লানি তার সর্ব আগে তুমি দেব, নিয়েছিলে হরি।
তোমার সে কীর্তি-গাথা শক্তি লভি সঙ্গোপনে চুপে
আজিকে নিয়েছে প্রাণ ভারতের বক্ষে নব রূপে।
বিবেক আনন্দ নামে মূর্তি ধরি নর নারায়ণ,
অসাড় দেশের প্রাণে আনিলে যে নব জাগরণ
মন্ত্রে তার মুখরিত বিধুনিত বিন্ধ্য-হিমাচল—
জয় হিন্দ ধ্বনি তুলি দিকে দিকে নির্ঘোষে মাদল।
ত্যাগ, প্রেম, দিব্যজ্ঞান ভারতের এ মহিমা আজ
জড় বিশ্বে দিবে প্রাণ নব তন্ত্রে জানি মহারাজ।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

মাইকেল গ্রান্ট্

গত ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষ দেখেছে একনায়কত্বের বিষময় পরিণাম, কি করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে মানুষের মূল অধিকার হরণ করা হয়েছে, আর দেখেছে রক্তক্ষরী সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধ। আজ যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় থাকত এবং আন্তর্জ্জাতিক আইন দিয়ে তার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হত, তাহলে এ কথা সুনিশ্চিত যে স্বৈরাচারীরা পৃথিবীকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে পারত না। পৃথিবীর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের শান্তি এবং সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য সকলে তাই ঐকান্তিক চেষ্টা করছে।

কয়েকটি দেশে আবার নূতন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। এক জায়গায় সরকারী মতবিরুদ্ধ খবর প্রকাশ করলেই সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। আবার কোথাও যুদ্ধপূর্ব পত্রিকাগুলির পুনঃপ্রকাশ একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন দেশে পত্রিকা-প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট-সমর্থক রাজনৈতিক দলকে। আর কোন দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তারা "দেশের মর্যাদাহানিকর" কোন বিবরণ প্রকাশিত হলে পত্রিকার লেখক এবং প্রকাশকদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার প্রস্তাব করে সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইনের "সংস্কার" করতে চেয়েছিলেন।

এমনও দেশ আছে যেখানে দেশের সমস্ত মুদ্রাযন্ত্রগুলি গভর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত, সম্পাদকীয় বিভাগ সেন্সাসের চাপে রুদ্ধশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিকরা যাঁদের একদিন নাৎসীরা বন্দী করে রেখেছিল তাঁরা আজ হয় কর্মচ্যুত না হয় সাংবাদিক সংঘ থেকে বিতাড়িত এবং কোন কিছু লিখবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই দেশের আভ্যন্তরীণ স্বরূপ জানবার কোন উপায় নেই। দেশের মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষ কি অন্যায় করে চলেছে তা পৃথিবীকে জানতে দেওয়া হয়নি, সেইজন্য বৈদেশিক দূতালয়ে প্রকৃত খবর সংগ্রহের জন্য যারাই এসেছে তারাই বন্দী হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদদাতাদের সেখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি. তাদের বলা হয়েছে "গুপ্তচর", তারা নাকি "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা এবং শান্তির পক্ষে অনিষ্টকর"। সরকারী অধীনস্থ কর্মচারীদের সতর্ক করে বলা হয়েছে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যেন কোন কথা প্রকাশ না পায়। বিদেশী সাংবাদিকদের সমস্ত খবর বাইরে প্রেরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয়। এমনকি তাদের নিজেদের লোকেরাও যাতে সত্য কথা না জানতে পারে সে জন্য কর্তৃপক্ষের মতবিরুদ্ধ পত্রিকাগুলির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এই সব পত্রিকা থেকে কিছু না কিছু সত্য খবর বাইরে বেরুবার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু সমাজের ক্ষতিকর প্রচারকে বন্ধ করতে হলে চাই সত্য কথার অবাধ প্রকাশ। সেই জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে সমগ্র পৃথিবীর অবাধ সংবাদ পরিবেষণের স্বাধীনতা রক্ষার প্রস্তাব এসেছে। এই প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা এসেছে বৃটেনের বিদগ্ধ দেশবাসীদের কাছ থেকে। মিলটন্, জন স্টুয়ার্ট মিল্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রণ, শেলী এবং কীট্‌স্

—তাঁরা তাঁদের কথায়, রচনায় এবং আজীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথাই প্রচার করে গিয়েছেন।

অনেকে তাই আজ স্পষ্ট করে জানাতে চান যে, যা সত্য তা সর্বজনগ্রাহ্য, কোন গভর্ণমেণ্টেরই তা খর্ব করার অধিকার নেই। তাই তাঁরা রাষ্ট্রসংঘের কাছে আনীত প্রস্তাবে সংবাদ ও মতামতের অবাধ প্রচার সমর্থন করেছেন, উপরন্তু এও বলেছেন যে তাতে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার থাকবে না। বিতর্কে এই নিয়ে অনেকেই নিষ্ফল আপত্তি জানিয়েছিলেন।

অনেক প্রতিনিধি এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে বলেন "কোন গভর্ণমেণ্টেরই অন্যের মতামত বিচার করবার অধিকার নেই, কারণ আজ যা প্রকাশযোগ্য নয় বিবেচিত হবে কাল তা হয়ত বিনা দ্বিধায় স্বীকৃত হবে।" বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী বলেন "মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।"

বৃটেনে লাইসেন্স্‌ না দিয়ে যে কোন দলীয় লোক সংবাদ-পত্র এবং সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র প্রকাশ করতে পারে, অবশ্য তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আট হন্দরের বেশী কাগজ চারমাসের মধ্যে ব্যবহার না করা হয়। ইংরাজ বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন মতাবলম্বী সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়ে সাধারণের বিচার-ক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং যা সত্য তা স্বতঃই প্রকাশ পাবে।

পৃথিবীর মধ্যে বৃটেনেই সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ইংরেজ প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ কপি সংবাদ-পত্র প্রত্যহ ক্রয় করে। এই সংখ্যা থেকে বুঝতে পারা যায় যে বৃটেনে অনেকেই একাধিক সংবাদপত্রের গ্রাহক।

বিখ্যাত ন্যুরেমবার্গ বিচারের অন্যতম মিঃ বার্কেট্‌ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-হরণকারী যুদ্ধাপ-রাধীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে বলেছিলেন, "আমি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চেষ্টা করা মানুষমাত্রেরই প্রধানতম কর্তব্য। যত দিন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে ততদিন পৃথিবীর চারদিকের ভয়াবহ ঘটনা-স্রোতের মধ্যে থেকেও মানুষ মুক্তির আশা করতে পারবে।"*

* নিউদিল্লীস্থ ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন্‌ সার্ভিসেস্‌ এর সৌজন্যে প্রকাশিত—উঃ সঃ

অরূপ

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

সব রূপে আছ তুমি, তাইত অরূপ,
কভু হেরি দীন-মাঝে, কভু মহাভূপ।
কিরূপে ডাকিব তোমা, ভেবে নাহি পাই,
সবখানে আছ তুমি, যে দিকেই চাই।

প্রমাদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ সকলেই একবাক্যে সাধন-জীবনের একটি প্রবল অন্তরায় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই অন্তরায়টির নাম প্রমাদ। ইহার চলতি অর্থ অনবধানতা, বিমূঢ়তা, বিস্মৃতি অর্থাৎ সাদা কথায় একপ্রকার ভুল। ভুল নানা রকমের আছে—ভুল জিনিষটি দোষাবহও বটে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রমাদ বলিতে যে ধরনের ভুল সাধনজীবনে শাস্ত্রকাররা ইঙ্গিত করেন তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা দরকার। কতকগুলি ভুলের ক্ষমা আছে, শুধরাইবার উপায় আছে—সেই ভুল হইতে মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ বরং সত্যের দিকে আগাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রমাদরূপ ভুলের ক্ষমা নাই—প্রমাদজনিত আধ্যাত্মিক ক্ষতি সহজে পূরণ হইবার নয়—প্রমাদের বশীভূত হইলে মানুষ পড়িয়াই যায়, ক্বচিৎ কখনো সে আর উঠিতে পারে। তাই প্রমাদ বিষয়ে এত সতর্কতা।

না জানিয়া আগুনে হাত দিয়াছ, হাত পুড়িয়া গেল—আপসোস করিলে, ভবিষ্যতে হুশিয়ার হইয়া গেলে। এই ভুলের ক্ষমা আছে, এই ভুল হইতে তোমার সত্যকারের শিক্ষা হইল। ইহা প্রমাদ নয়। কিন্তু আগুন জানিয়াও অপরের সতর্কতা গ্রাহ্য না করিয়া খেয়াল বশে আগুনে যদি হাত দাও উহার নাম প্রমাদ। চিত্তের অস্থিরতা বা তামসিকতা হইতে এই ভুল হয়। এই ভুল শুধরানো মুশ্‌কিল। জীবনভোর হাত পোড়াইয়াই চলিতে হইবে, শিক্ষা আর হইবে না। প্রমাদের ইহা একটি লৌকিক উদাহরণ। একটি নৈতিক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। অনেক সময় আমরা কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা বা মিতালি করিয়া ঠকি। লোকচরিত্র ভাল জানি না বলিয়া বা সাংসারিক অনভিজ্ঞতার জন্য যদি এইরূপ ঠকি তো সেই ভুল একেবারে নিন্দনীয় নয়। সেই ভুল হইতে লোকচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের একটা মূল্যবান জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে কোন ব্যক্তির দুষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে বেশ ভাল করিয়া আমি জানি, অপরে তাহার সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট সাবধানও করিয়া দিয়াছে—তবুও আমি একপ্রকারের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া উক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ ত্যাগ করিলাম না। ফলে আমাকে হয়তো পরে যথেষ্ট ক্ষতি, অপমান সহ্য করিতে হইল। জীবনে এমন একটা দাগা খাইলাম যে তাহার আর কোন চারা হওয়া অসম্ভব। ইহা নৈতিক প্রমাদ। নিজের বুদ্ধিবিভ্রমের জন্য এই ভুল সম্পূর্ণ জানিয়া শুনিয়াও আমিই করিয়াছি। তাই এই ভুলের ক্ষমা নাই।

অধ্যাত্মজীবনে প্রমাদ নানা পথে আসে। গুরু ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছ ইন্দ্রিয়-সংযম সাধন-জীবনের প্রথম সোপান। ইন্দ্রিয়লালসার প্রশ্রয় দিবে আবার আধ্যাত্মিক উন্নতিও করিবে ইহা হয় না। আলোক ও অন্ধকার যেমন একসঙ্গে থাকে না তেমনি রাম ও কাম একত্রে দুটীর ভজনা করা চলে না—তুলসীদাসজী বলিয়াছেন। বার বার এ কথা শুনিয়াছ, নিজেও প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছ, তবুও মোহবশে ইন্দ্রিয়সংযমে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলে না। ইহা প্রমাদ। এই প্রমাদের ফলে ধীরে ধীরে এক দিন দেখিতে পাইবে, তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়িয়াছ। ধ্যান-ধারণা সকলই নিষ্ফল

হইবে—আধ্যাত্মিক উন্নতি সুদূরপরাহত হইবে। কিন্তু যখন ইহা আবিষ্কার করিবে তখন আর ফিরিবার পথ থাকিবে না। নিজে প্রমাদ করিয়াছ, সারা জীবন কাঁদিয়াও উহা আর শুধরাইতে পারিবে না।

শুনিয়াছ, ঘটী যেমন নিত্য মাজিলে ঝকঝকে থাকে সেইরূপ মনকে নির্মল রাখিবার জন্য নিত্য নিয়মিত ধ্যান জপ প্রার্থনা পূজা পাঠাদি করিতে হয়। কিছুদিন করিলে—হঠাৎ এক সময়ে নানা কাজে জড়াইয়া পড়িলে। ভগবদুপাসনার মাত্রা কমিয়া আসিতে লাগিল। ভাবিলে, হাতের কাজটা একটু কমিলে আবার বেশী করিয়া উপাসনা করিব। হায়রে, বুঝিলে না তুমি প্রমাদের বশীভূত হইতেছ। মনের বহির্মুখী বৃত্তি, কর্তব্যের নাম করিয়া তোমাকে ভুল পথে লইয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ দেখিবে "কর্তব্যই" বাড়িয়া যাইবে, ভগবানের নামচিন্তা কমিয়া কমিয়া এমন অবস্থায় গিয়া পৌছিবে যখন আর নিয়মিত উপাসনায় তোমার ইচ্ছা হইবে না। পূর্বে জপধ্যানাদি করিয়া চিত্তের যেটুকু প্রশান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলে তাহা দূরে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। হয়তো জীবনে আর উহা ফিরিয়া পাইবে না।

গীতা বার বার অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্বের সকল সাধককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"। নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবেই নৈষ্কর্ম্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্তে একরাশি রজস্তম মল লইয়া কর্মবিরহিত ধ্যানযোগ সাধন করিতে যাওয়া উচিত নয়। তাহাতে বিপরীত ফল হয়। তুমি শ্রীভগবানের এই সতর্ক বাণী গ্রাহ্য না করিয়া নিজেকে উচ্চাধিকারী ঠাওরাইয়া সব কাজ ছাড়িয়া নির্জনে গিরিগুহায় একান্ত ধ্যান-ভজন করিতে গেলে। কিছুদিন মন্দ লাগিবে না কিন্তু পরে দেখিবে জীবন বিরস হইয়া গেছে—প্রশান্ত ভগবদানন্দের পরিবর্তে চিত্তে এক শুষ্ক বিমূঢ় ভাব আসিয়া হাজির হইয়াছে। হয়তো বা পাগল হইয়া যাইতে পার। ইহার জন্য দায়ী কে?" তুমি নিজেই।

পড়িয়াছ—"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ"—বিষয়ের সঙ্গ হইতে বিষয় ভোগ করিবার বাসনা জন্মে—অতএব বিষয় হইতে সাবধান। প্রথম প্রথম এই উপদেশ মত চলিয়াছিলে, কামকাঞ্চন হইতে দূরে থাকিতে। ক্রমশঃ নিজকে শক্তিমান মনে করিতে লাগিলে, বিষয়সঙ্গে সাবধানতা কমিয়া গেল—পুরুষের মধ্যে নারায়ণ—বা নারীর মধ্যে জগজ্জননী দর্শনের নাম করিয়া পুরুষ ও নারীর পরস্পর মেলামেশা বাড়িয়া চলিল। ফলে বিষয়সর্প যদি একদিন দংশন করে—বহু শ্রমায়ত্ত চিত্তের সত্ত্বাবস্থা যদি তমসাচ্ছন্ন হয়—তবে সে জন্য দায়ী কে? তোমারই প্রমাদ নয় কি?

লৌকিক প্রমাদের কুফল লৌকিক জীবনেই সীমাবদ্ধ—তাহাতে মানুষের ধর্মজীবনে কোন ক্ষতি প্রায়ই হয় না, মানুষের মনুষ্যত্ব এবং চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রমাদ মানুষের ধর্মকে, মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে—চিরজীবনের মত তাহার হৃদয়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দেয়। তাইতো প্রমাদ হইতে সাবধান হইবার জন্য সাধকদের প্রতি এত সতর্ক বাণী।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন—স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ—নিত্য শাস্ত্রপাঠে প্রমাদ করিও না। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্—সত্যনিষ্ঠায় যেন প্রমাদ না হয়। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্—ধর্মানুশীলনে প্রমাদ হইতে সাবধান।

কঠোপনিষদে দেখি—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—সাধনপথে চলা মানে ধারালো ক্ষুরের উপর দিয়া চলা, একটু অসাবধান হইলেই অনর্থ হইবে। অতএব "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।" শরীর

মনের তমোভাব দূর করিয়া আধ্যাত্মিক চেতনায় জাগিয়া চল। সর্বদা হুশিয়ার।

মুণ্ডক উপনিষৎ বলেন—"অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং" লক্ষ্যভেদ করিবার সময়ে হিসাবের একটু এদিক ওদিক গোলমাল হইয়া গেলে যেমন তীর আর লক্ষ্য বিঁধিতে পারে না—তেমনি ব্রহ্মনিষ্ঠায় যদি অনবধানতা আসে তাহা হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা দুষ্কর—অতএব ব্রহ্ম-সাধনায় অপ্রমত্ত হও।

শঙ্করাচার্য তাঁহার বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে প্রমাদের বিষময় পরিণাম অতি পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্র এবং সাধুবাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া বুদ্ধির বিভ্রমবশতঃ সাধনে প্রমাদ করিলে "প্রচ্যুতকেলিকন্দুকবৎ"—অর্থাৎ সিঁড়ির উপর হইতে একটি বল যদি গড়াইয়া দেওয়া যায় উহা যেমন গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নীচে আসিয়া পড়ে—সেইরূপ সাত্ত্বিক ভগবৎচেতনা হইতে সাধকের মন নামিতে নামিতে বিষয়াসক্তির নিম্নতম স্তরে আসিয়া হাজির হইবে। এ জীবনে আর সেই মনকে উর্দ্ধগামী করা প্রায় অসম্ভব।

প্রমাদ জিনিষটি তমোগুণ হইতে আসে। অতএব প্রমাদকে বর্জন করিতে হইলে তমোগুণ যাহাতে চিত্তে না আসে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তমোগুণের স্বভাব একটা আবরণ—আবছায়া সৃষ্টি করা, ঘুমাইয়া পড়া। অতএব যাহাতে আদর্শকে ঢাকিয়া ফেলে এমন কোন মেঘ চিত্তের সামনে না আসিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আদর্শ যেন সর্বদা প্রাণে জলজল করে। আদর্শ পিছনে পড়িয়া যাইতেছে এমন যদি কখনও মনে হয়, বুঝিতে হইবে চিত্তে তমঃ ঢুকিয়াছে, এখনই প্রমাদ উপস্থিত হইবে—তার পরই বিনাশ। সর্বপ্রযত্নে তখন ঐ তমোভাবকে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

প্রমাদহীন, নিত্যজাগ্রত, জীবনের মহিমা ভগবান বুদ্ধদেব কী সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—ধম্মপদ গ্রন্থের অপ্পমাদবগ্গো অধ্যায়টি পড়িয়া দেখ—"অপ্রমাদই অমৃতত্বের সোপান। প্রমাদ মৃত্যুর দ্বার-স্বরূপ। যাহারা জাগিয়া থাকে তাহারা মরে না—যাহারা অসতর্ক তাহারা মরিয়াই আছে।

"প্রমাদহীন ধীর জ্ঞানী সর্বদা ধ্যানশীল, প্রযত্নবান হইয়া নির্বাণরূপ শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রেয়ের সাধনায় যে সর্বদা উদ্বুদ্ধ, সর্বক্ষণে দৃষ্টি যাহার সতর্ক, নিন্দনীয় কাজ হইতে যে বিরত, প্রত্যেকটি কাজ ভাবিয়া চিন্তিয়া করে, নিজেকে সর্বদা সংযত করিয়া রাখে এবং নিষ্পাপ জীবন যাপন করে তাহার মহত্ত্ব দিন দিনই বাড়িয়া চলে।"

অকুণ্ঠিত সংযম সহায়ে প্রমাদশূন্য অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধক নিজের আশ্রয়ের জন্য এমন একটি দ্বীপ সৃষ্টি করুন যাহাকে কোন বন্যাই (সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাত, প্রলোভন) প্লাবিত করিতে না পারে।

"অপ্রমাদই জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

"যে সর্বদা জাগিয়া থাকে, তাহার আনন্দের সীমা নাই।"

"যে ভিক্ষু অপ্রমাদ সাধন করিয়া আনন্দ পায় এবং প্রমাদকে সমূহ বিপদ বলিয়া মনে করে সে অগ্নির মত ছোট বড় সমস্ত বন্ধনকে দগ্ধ করিয়া অগ্রসর হয়। সে ভিক্ষুকে আর পশ্চাতে ফিরিতে হয় না। সে পরম শ্রেয় নির্বাণের কাছে হাজির হয়।"

স্মরণে

ব্রহ্মচারী গণপতি

ভারতের যুগস্রষ্টা হে সন্ন্যাসী তুমি,
জীবনের মাঝে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠি'
করিলে প্রকাশ মোরে অভিনবরূপে।
প্রতিক্ষণে তব, সঞ্জীবনী শক্তি
অনুভবি',
করিনু কঠোর পণ বিলাইতে সব
আপন বলিয়া আছে যাহা কিছু,
জীবন যৌবন বিদ্যা অর্থ যশ-আদি।
আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী চ'লে যায় দূরে
সকলের মাঝে দেখি আমারি স্বরূপ।
কোথাও নাহিত কিছু আমিই কেবল।
স্ত্রী পুরুষ ক্লীব জড় প্রাণী
চন্দ্র সূর্য তারা,
পশু পক্ষী কৃমি কীট
কী এ সকল?
অবভাস শুধু!

একের বহুতে বিকাশ,
আমারি বিকাশ সব—
মনেতে প্রকাশ শুধু মনেতে বিলয়
সত্য নহে নামরূপ।
দ্রুতগামী মন মম
চলে ছুটে হেথা সেথা,
এই আছে হেথা,
চ'লে যায় চন্দ্রলোকে এইক্ষণে,
ছুটে চলে
পরক্ষণে
কোটী সূর্য যথা
সহস্র যোজন দূরে;
কিন্তু নাহি দেখি অন্য কিছু
দেখি শুধু
আমারি স্বরূপ!
হার মানে চঞ্চল এমন।

যেখানে চলে সে ছুটে
চলি ছুটে আমি
পিছে পিছে তার
দেহাত্মবুদ্ধিহীন হ'য়ে।
চঞ্চল মন হ'য়ে যায় অচঞ্চল
গতিহীন নীরব নিস্পন্দ!
চিদাত্মায় মনের বিলয়
সব একাকার।
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে
সাক্ষী সেই আমি
সদাপূর্ণ কাম,
চিদানন্দরূপে শুধু
অনুভবগম্য
সদাই তুরীয়ে আছি, অনাদি
অনন্ত সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী ধ্রুবানন্দজীর দেহত্যাগ—গত ২৯শে শ্রাবণ বেলা ২টার সময় স্বামী ধ্রুবানন্দজী হুগলী জেলায় তৎপ্রতিষ্ঠিত দহরকুণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি নানা রোগে ভুগিতেছিলেন।

স্বামী ধ্রুবানন্দজী ১৯১১ সনে কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করেন। তিনি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৬ সনে তিনি সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। ধ্রুবানন্দজী তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল কোয়ালপাড়া জয়রামবাটি (বাঁকুড়া) এবং আরামবাগের (হুগলী) জনসাধারণকে নানাভাবে সেবা করিয়াছেন। তিনি সাধন-ভজনশীল সেবাপরায়ণ এবং অমায়িক ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

কাঁকুড়গাছি যোগোত্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব উৎসব—গত ১১ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগোত্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যাবির্ভাব উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সমস্তদিনব্যাপী আনন্দোৎসবে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, অর্চনা, ভোগারতি, ভজন-সঙ্গীত, নারায়ণ-সূক্ত, উপনিষদ্, চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। চোরবাগানের সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের গায়কগণ সুমধুর কালীকীর্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। লাউডস্পিকার-যোগে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক বেদের বিভিন্ন সূক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এবং আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্বামী পুণ্যানন্দজী নিত্যাবির্ভাব-উৎসবের তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। রহড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক কয়েকটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গীত হয়। বেলুড় মঠের বহু সাধু এবং প্রায় তের হাজার ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-সংবরণের এক সপ্তাহ পর এই পুণ্য তিথিতে তাঁহার পূত দেহাস্থির কিয়দংশ স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যগোষ্ঠী এবং মহাত্মা রামচন্দ্র প্রমুখ গৃহী শিষ্যগণ কর্তৃক মহাসমারোহের সহিত এই পীঠস্থানে সমাহিত হয়। এই মহাপবিত্র ঘটনার স্মৃত্যর্থ প্রতি বৎসর নিত্যাবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্যানফ্র্যান্সিস্কো বেদান্ত সমিতি—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী গত সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন:—

(১) "ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাবলী", (২) "কেন, কোন্ সময়ে, কোথা হইতে?", (৩) "ধ্যান সমাধি ও আলোকপ্রাপ্তি", (৪) "অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত"।

এতদ্ভিন্ন সিয়েটল বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী "প্রত্যাহার-অভ্যাসের উপায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং স্বামী অশোকানন্দজী প্রতি শুক্রবার বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সমাগত ভক্তগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ—১৯৪৭ সনের কার্য-বিবরণী—প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আধুনিক ভাবে শিক্ষাদান এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। এই আদর্শে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাণী শিরে বহন করিয়া এই বিদ্যাপীঠ পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

আলোচ্য বর্ষে এই প্রতিষ্ঠানে ১৭৬ জন শিক্ষার্থী ছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রগণ এখানে শিক্ষালাভ করে।

এই প্রতিষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকানুযায়ী চতুর্থ হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে হিন্দী শিক্ষাদানেরও সু-বন্দোবস্ত আছে। এই বৎসরে ৯ জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সকলেই কৃতকার্য হইয়াছে। স্বাস্থ্য প্রত্যেক ছাত্রেরই ভাল। একজন এম-বি ডাক্তার দ্বারা ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হয়। এখানে নানারূপ শরীর-চর্চার ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মধ্যে হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, লাঠি, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, হাঁটা-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। ২০ জন ছাত্রের স্বাস্থ্যোন্নতি আকর্ষণীয়। শারীরিক উন্নতির জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এখানে পাক্ষিক বিতর্ক-সভার অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা হয়। ছেলেদের স্বহস্ত-লিখিত "বিবেক" নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র, ত্রৈমাসিক "কিশলয়" ও "বিদ্যাপীঠ" নামে দুইটি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারণের জন্য এখানকার গ্রন্থাগারে ধর্ম বিজ্ঞান রাজনীতি গল্প প্রভৃতি বিষয়ক ৫০০০ খানি বই আছে। বিদ্যাপীঠ-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বৎসরে ৪০০০ রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭২টী গরু আছে। এই গরুগুলি প্রত্যহ প্রায় ২২ মণ দুধ দিতেছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এই আশ্রমে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। লণ্ডন বেদান্তকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অব্যক্তানন্দজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্কৃতি ও শুভেচ্ছা মিশনের সভ্যগণ এই আশ্রমটী পরিদর্শন করেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ তাঁহাদের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করে এবং এক সভায় তাঁহাদের সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ অধ্যয়ন ভিন্ন আবশ্যকীয় নানা কার্য করিয়া থাকে। তাহারা প্রতিদিন বাসস্থান ও বাসন স্বহস্তে পরিষ্কার করে এবং বাগানের নানা কাজে লিপ্ত থাকে। ধাম অনুযায়ী ভোজনাগারে নিস্তব্ধতার মধ্যে ভোজন সমাপন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রপরিচালিত একটী নৈশবিদ্যালয়ে আশ্রমের ঠাকুর-চাকরদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, সূতাকাটা, প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা, চামড়ার ব্যাগ চিত্রণ এবং উদ্যান-রক্ষার নিয়মিত শিক্ষা ছাত্রগণ পাইয়া থাকে।

আধুনিক যে সকল শিক্ষা-প্রণালীর উদ্ভব হইতেছে উহাও এই প্রতিষ্ঠানে কার্যে পরিণত করা হয়। এখানে ছাত্র-পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও সমবায় ভাণ্ডার বিদ্যমান। শাকসব্জী-উৎপাদনে একদল ছাত্র অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া বাগান হইতে সব্জী বিক্রয় করিয়া ৭৫৲ টাকা পাইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা কয়েক জন ছাত্র উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করে। সন্ধ্যা-আরাত্রিকও তাহাদেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেক ধামের নির্বাচিত সেবকগণকে লইয়া 'সেবক-সমিতি' গঠিত। ছাত্রগণের অন্তরে সেবার ভাব জাগ্রত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিদ্যাপীঠের পবিত্র আবহাওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সংসর্গে থাকিয়া ছাত্রগণ নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি লাভ করে। ছেলেদের ধর্মভাব বৃদ্ধি করিবার জন্য এখানে মহাপুরুষগণের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বুদ্ধ শঙ্করাচার্য শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী, দোল, কালী ও সরস্বতী পূজা, শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামিজী ও মাতা সারদেশ্বরী দেবীর বার্ষিক জন্মোৎসব এখানে নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপিত হয় এবং প্রতি একাদশীর দিন রামনাম সংকীর্তন হইয়া থাকে।

বর্তমান ভারতের নাগরিকগণের যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সেই স্বদেশপ্রাণতা ও সেবাদর্শ জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেক ধামে নৈশভোজনের পর বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীতে শ্রীশ্রীঠাকুর,-স্বামীজীর এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ প্রভাতে ও সায়াহ্নে স্তোত্রপাঠ ও ভজন করিয়া ছাত্রগণ প্রার্থনায় রত হয়। জনকয়েক ছাত্র ধ্যানাদি অভ্যাস করে।

গত বৎসর পুরস্কারবিতরণী সভা অতি জাঁক-জমকের সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বিহারের শিক্ষামন্ত্রী আচার্য বদ্রীনাথ বর্ম ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর অনেকে বক্তৃতা দ্বারা ছাত্রগণের অন্তরে নূতন উদ্দীপনা জাগ্রত করেন। সঙ্গীত আবৃত্তি কুচ-কাওয়াজ এবং শারীরিক প্রদর্শনী দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২১ জন মেধাবী ছাত্রকে তাহাদের আর্থিক অসচ্ছল অবস্থা হেতু শিক্ষাদানে সাহায্য করা হয়। ইহার জন্য খরচ হয় বাৎসরিক প্রায় ৩০০০৲ টাকা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে একটী আবাসগৃহ, একটী প্রার্থনাঘর, গরীব মেধাবী ছাত্রদের জন্য একটী তহবিল একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য প্রায় ৪০০০০৲ টাকা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষ সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Letters of Swami Vivekananda—স্বামী পবিত্রানন্দ কর্তৃক অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী (আলমোড়া) হইতে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই, ৫০১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৸০ আনা।

এই চতুর্থ সংস্করণে স্বামীজীর লিখিত ৩১৮ খানি পত্র আছে।

হিন্দুধর্ম—স্বামী নির্বেদানন্দ প্রণীত। ২০, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস হইতে স্বামী সন্তোষানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। পাইকা হরপে মুদ্রিত, বোর্ড বাঁধাই, ২৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের বহুপ্রশংসিত "Hinduism at a Glance" পুস্তকের বাংলা অনুবাদ।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সামাজিক অযোগ্যতা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিল—গত আশ্বিন মাসে পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দুদের সামাজিক অযোগ্যতা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিল (১৯৪৮ খৃঃ) সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়াছে।

এই বিলের বিধান অনুযায়ী কোন দলিল-পত্র বা আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কোন হিন্দু কোন বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই—

(ক) কোন আইন মতে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরি গ্রহণে অযোগ্য হইবে না।

(খ) কোন মন্দিরে যাইয়া পূজার্চনা করিতে অথবা সর্বসাধারণের প্রমোদশালায় বা ভোজনালয়ে প্রবেশ করিতে বাধা পাইবে না।

(গ) কোন স্কুলে কলেজে বা অপর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাহাকে ভর্তি করিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

এই বিধানগুলি যাঁহারা লঙ্ঘন করিবেন, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাঁহাদের ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ২০০৲ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

পরিষদে শ্রীযুক্ত নিশাপতি মাঝি কর্তৃক আনীত প্রস্তাব অনুসারে হিন্দুদের অংশ-বিশেষের কতকগুলি সামাজিক অযোগ্যতা ও অস্পৃশ্যতা এই বিলে অপসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় প্রশ্নপত্রের উত্তরদান-ব্যবস্থা।—জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের আই-এ, আই-এস্‌সি, বি-এ, বি-এসসি, বি-কম্‌, এল-টি এবং বি-টি পরীক্ষার্থিগণ তাহাদের প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলা ভাষায় লিখিতে পারিবে। বাংলা ভাষায় উত্তরদান-কালে তাহারা ইংরেজী চল্‌তি শব্দও ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা পরীক্ষাদান-কালে বা যে সমস্ত বিষয়ের উত্তরদানের জন্য প্রশ্নপত্রে ভাষার নির্দেশ থাকিবে সেখানে বাংলা ভাষায় উত্তরদান চলিবে না। কোন প্রশ্নপত্রের উত্তর একাধিক ভাষায় লেখা চলিবে না; বাংলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই বাংলায় লিখিতে হইবে। তবে কোন বিষয়ের এক পেপার ইংরেজীতে লিখিয়া অপর পেপারগুলি বাংলায় লিখিবার অধিকার ছাত্রদের থাকিবে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি, বার্নপুর (বর্ধমান)—গত ২৩শে ভাদ্র করাচী রামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মঙ্গলাচরণ করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ধর্ম ও বর্তমান ভারতের সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া ইংরেজীতে এক সারগর্ভ ভাষণ দেন। করাচী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র কি অবস্থার মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে তিনি উহার মর্মস্পর্শী বর্ণনা করেন। তাঁহার বিশ্বাস—খণ্ডিত ভারত আবার মিলিত হইবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলেন যে, সিন্ধু-প্রদেশের বেশীর ভাগ মুসলমান এখন পুনর্মিলনের পক্ষপাতী, কিন্তু অবস্থাধীনে তাঁহারা কিছু করিতে পারিতেছেন না।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত—স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কি হইবে তাহা লইয়া সম্প্রতি

আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। যে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত লক্ষ লক্ষ প্রাণে দেশপ্রেমের প্রেরণা জাগাইয়াছে, যাহা গাহিতে গিয়া সহস্র সহস্র স্বদেশপ্রেমিক বিদেশী শাসকের হস্তে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন —ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিয়াছেন, যে বন্দে মাতরম্ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি অধিবেশনে ও শত সহস্র জনসভায় গীত হইয়াছে, তাহাই যে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইবে, ইহাই আশা করা সঙ্গত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ইহা লইয়াও মতভেদ রহিয়াছে। যাঁহারা বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, এই সঙ্গীত সামরিক কুচকাওয়াজ ও ব্যাণ্ডের সঙ্গে বাজান সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ আপত্তি যে যুক্তিসহ নহে, ইহার প্রমাণ হিজ মাষ্টারস ভয়েস কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এন ১৬৯৮৫ ও এন ২৭৮৯৩ রেকর্ড। প্রথম রেকর্ডখানার এক পৃষ্ঠার সংগীত বিখ্যাত সুরশিল্পিগণের পরিচালনায় কয়েকজন খ্যাত নামা গায়ক-গায়িকা অর্কেষ্ট্রা সহযোগে ঐকতানে গাহিয়াছেন। অপর পৃষ্ঠার সংগীত সুরানুযায়ী ব্যাণ্ডে বাজান হইয়াছে। দ্বিতীয় রেকর্ডখানির এক পৃষ্ঠায় পূর্বোক্ত রেকর্ডের ঐকতান সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছে এবং অপর পৃষ্ঠার সংগীত সুরানুসারে অর্কেষ্ট্রাতে বাজান হইয়াছে। দুইটি রেকর্ডেই বন্দে মাতরম্-এর যে অংশ কংগ্রেসানুমোদিত তাহাই গানে ও বাদ্যে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। যাঁহারা বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত ব্যাণ্ডে ও অর্কেষ্ট্রাতে ফুটাইয়া তোলা সম্ভব নহে বলিয়া মনে করেন, এই রেকর্ড দুইটি শুনিলে তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইবে।

বাঙ্গালী সেনা-বাহিনী গঠন—ভারত-সরকারের পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারে সৈন্যবাহিনীর জন্য যথন দুইটি ব্যাটালিয়ান মাত্র গঠন করার প্রস্তাব হয়, সেই সময় আট শতের কিছু সংখ্যক বেশী প্রাক্তন সৈন্যকে মাত্র তালিকাভুক্ত করা হয়।

এই সৈন্যগণকে লইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালী ব্যাটালিয়ান গঠিত হয়। ইহাদের শিক্ষাকাল কমাইয়া দুই মাস করা হইয়াছে। এখন সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট তিনটি ব্যাটালিয়ানের তালিকাভুক্তির কাজ আরম্ভ হইবে।

জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গের সেচ-বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদারকে বে-সরকারী এবং অ-সামরিক লোক এবং সৈন্য-সংগ্রহের জন্য যে সকল রিক্রুটিং মিলিটারী কর্তৃপক্ষ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের জন্য লিয়াসন অফিসাররূপে কাজ করার ভার দেওয়া হইয়াছে।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরটিও ভারত-সরকারের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ থাকিবে। জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বিভাগে উহা বিভক্ত থাকিবে। তন্মধ্যে সিনিয়র বিভাগে কলেজের ছাত্র লইয়া তিন ব্যাটালিয়ন এবং স্কুলের ছাত্র (জুনিয়র) লইয়া ৩৩টি ট্রুপ্ গঠিত হইবে। প্রত্যেক ট্রুপে ৯০ জন থাকিবে। কলিকাতা এবং জেলা-শহরের ছাত্রদিগকে লইয়া ব্যাটালিয়ন এবং ট্রুপ গঠিত হইবে।

ন্যাশনাল কাডেট কোরের সদস্যদের শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অফিসাররূপে ২৭ জন কলেজের অধ্যাপকের শিক্ষা-গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা সিনিয়র বিভাগে থাকিবেন।

সিনিয়র বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট মিলিটারী ষ্টাফ্ অফিসারগণের শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইয়াছে। জুনিয়র বিভাগের অফিসাররূপে যে ৬৬জন শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অবশেষে ভারত-সরকারের অপর একটি

পরিকল্পনা—ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। উহা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। এই বাহিনী অল্পবিস্তর নাগরিকগণের দ্বারাই গঠিত হইবে। জীবিকা-নির্বাহের জন্য স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করিয়া যাইতেছেন এমতাবস্থায়ও তাঁহারা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে পাহারা দিবার জন্য বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী দল গঠন করিয়াছেন। শিক্ষা-গ্রহণান্তে ইতোমধ্যেই প্রথম দলের ৩৩০ জন স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। দ্বিতীয় দল ৬৫০ জনকে লইয়া গঠিত। তাহারা কাঁচড়াপাড়ায় শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। শিক্ষাকাল দুই মাস। বেশীর ভাগ গ্রামের লোককেই রক্ষী দলে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

৭৫ জনকে লইয়া একটি সাঁওতাল প্ল্যাটুন গঠিত হইবে। রক্ষী দলের তৃতীয় দলের লোক হিসাবে তাহাদের শিক্ষাদান করা হইয়াছে।

রক্ষী দলগুলির মধ্যে প্রথম দলের কয়েক জন বঙ্গীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। এই দলের শিক্ষাপ্রাপ্ত ৬০ জন লোককে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ নিয়োগ করিতে পারেন। প্রকাশ যে, সীমান্ত অঞ্চলে চোরাই রপ্তানী বন্ধের কার্যে তাহাদের নিয়োগ করা হইবে।

আঞ্চলিক সৈন্য-বাহিনী গঠন—ভারতীয় পার্লামেণ্ট হইতে সম্প্রতি দুইটি বিল পাশ হইয়াছে। একটি আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী বিল এবং দ্বিতীয়টি ভারতীয় নৌ-বাহিনীর শৃঙ্খলা-সংশোধন বিল। এই বিল সম্পর্কে দেশরক্ষা-সচিব বলেন যে, ১৫ই আগষ্টের পর ভারতবর্ষে যে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে দেশে একটি "দ্বিতীয় আত্মরক্ষা ব্যূহ" গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গিয়াছিল। প্রথমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া উক্ত বাহিনী গঠন করা হইবে। কালক্রমে যদি উক্ত সৈন্যদল-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় তবে তাহাও করা হইবে।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত শহরের ফৌজ এবং গ্রামাঞ্চলের ফৌজের মধ্যে কোন তফাৎ থাকিবে না, দেশের যুবশক্তিকে এই সৈন্য বাহিনীতে প্রবেশ করিবার সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া হইবে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, দেশবাসী ইহাতে সাড়া দিবে।

ইংলিশ প্রণালী সন্তরণ—ইংলণ্ডের শ্রপ্‌শায়ার প্রদেশে 'ডলে' নামক একটি ছোট অখ্যাত শহর আছে। অনেকেই হয়তো এই শহরটির নাম জানেন না, কিন্তু এইখানেই একশ' বছর পূর্বে সেই বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারুর জন্ম হয়, যিনি ২১ মাইল দীর্ঘ দুস্তর ইংলিশ প্রণালী প্রথম পার হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব। ১৮৭৫ সালে ওয়েব প্রথম ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া দুঃসাধ্যসাধন করেন। ইহার ৮ বছর পরে এই দুঃসাহসী মানুষটি নায়গারা প্রপাতের ঘূর্ণীজলে সাঁতার কাটিতে গিয়া জলমগ্ন হন।

আজ পর্যন্ত মাত্র ২৮ জন সাঁতারু প্রণালী পার হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজটি সহজ নয় এবং সাঁতারুদের পক্ষে ইহা চূড়ান্ত পরীক্ষা। ওয়েব প্রণালী পার হইয়াছিলেন মাত্র ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে। ইহার দীর্ঘকাল পরে ১৯১১ সালে দ্বিতীয়বার প্রণালী পার হইবার চেষ্টা সফল হয়। এই বৎসর বৃটিশ সাঁতারু ই এইচ, টেমি দুইবার বিভিন্ন সময়ে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স সাঁতার কাটিয়া পার হইয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানা দরকার যে, ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সের পথে প্রণালী পার হওয়া ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক কঠিন।

এই বৎসর আরও ৮ জন সাঁতারু প্রণালী

পার হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে চারি জন মিশরীয় সাঁতারু ২৯ শে আগষ্ট ফ্রান্স হইতে রওনা হন, কিন্তু তিন জন মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসেন, একজন ১৭½ ঘণ্টায় প্রণালী পার হইয়া ইংলণ্ডের তীরে পৌছান।

এই বৎসর প্রণালী পার হওয়ার সর্বশেষ চেষ্টা করিয়াছেন বৃটেনের টম্ ব্লোয়ার। তিনি ২৫ মিনিট কম সময় নিয়ে ইংলণ্ড-ফ্রান্স সাঁতারের ১৫ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'উদ্বোধনে' স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত "স্বামী তুরীয়ানন্দের কথা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে স্বামী প্রভবানন্দ সম্পর্কীয় ঘটনাটি (২৬৭ পৃষ্ঠা) যথাযথ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে স্বামী প্রভবানন্দ হলিউড (আমেরিকা) হইতে উক্ত ঘটনার প্রকৃত বিবরণ যেরূপ জানাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"শ্রীশ্রীমহারাজ সদলবলে মাদ্রাজ হতে এসে পুরীতে শশী-নিকেতনে অবস্থান করছিলেন। শ্রীশ্রীহরি মহারাজও শ্রীশ্রীমহারাজের সন্নিধানে। কলকাতা হতে জনৈক ভক্ত একটি পার্শেল পাঠিয়েছেন। পূজনীয় অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) আমাকে একখানা রসিদ দিয়ে বললেন, "যাও রেলওয়ে স্টেশনে"। আমি যাত্রা করলুম। যেতে যেতে ভাবছি, তাইত, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলুম, রসিদ নিয়ে কাকে দিতে হবে বা কি করতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় ব্রহ্মচারী শ—র সঙ্গে দেখা। তাকে রসিদটী দেখিয়ে বললুম, ভাই—তুমি ত এসব কাজ কর; কি করতে হবে বল ত? শ—বলল, "রসিদটী স্টেশন মাষ্টারকে দেবে। তারপর পার্শেলটী এলে স্টেশন মাষ্টার পাঠিয়ে দেবেন।" বাস্, আমিও স্টেশন মাষ্টারকে রসিদটী দিয়ে ফিরলুম। যখন ফিরেছি, দেখলুম, শ্রীশ্রীমহারাজ, শ্রীশ্রীহরি মহারাজ উদ্গ্রীব হয়ে পার্শেলটীর জন্য অপেক্ষা করছেন। শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে দেখে বকুনি আরম্ভ করলেন। সেই জীবনে প্রথম বকুনি। এখন এর স্মৃতি খুবই মধুর লাগে। সারাদিন এইভাবে বকুনি চলল। রাত্রে শ্রীশ্রীমহারাজ ও শ্রীশ্রীহরি মহারাজ আহারে বসেছেন বাইরের বারাণ্ডায়। আমি পাখা নিয়ে পোকা তাড়াচ্ছি। শ্রীশ্রীমহারাজ পুনরায় পার্শেলের কথা উল্লেখ করলেন। শ্রীশ্রীহরি মহারাজ হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "অবনী, তুমি বুঝতে পারছ মহারাজ কেন তোমাকে বকছেন?" আমি উত্তরে বললাম, "না মহারাজ, আমি ত কি দোষ হয়েছে বুঝতে পারছি না।" তখন শ্রীশ্রীহরি মহারাজ বললেন, "দেখ, শিষ্য তিন প্রকার। উত্তম শিষ্য গুরুর মনে চিন্তা উদয় হবার পূর্বেই গুরুর মন বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। মধ্যম শিষ্য গুরুর অব্যক্ত মনোভাব বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। আর অধম শিষ্য গুরু আদেশ ব্যক্ত করলে তা পালন করে। মহারাজ চান যে তোমরা উত্তম শিষ্য হও।" আমি চুপ করে আছি। শ্রীশ্রীমহারাজ তখন বললেন, "হরি ভাই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, তাই এরা আমার কথা শোনে না। আপনি এদের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানে স্মৃতিমন্দির

অর্থের জন্য আবেদন

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মস্থান। দেশ-বিদেশের অসংখ্য রামকৃষ্ণ-ভক্তের নিকট উক্ত গ্রাম মহাতীর্থ। এইগ্রামের উন্নতি বিধান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৈতৃক বাসভবনের সংরক্ষণ এবং জন্মস্থানটির উপর একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষ গত বৎসর উক্ত বাসভবন সহ প্রায় ৪৫ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া তথায় মঠ ও মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। চুনার পাথরের একটি ছোট মন্দিরের নক্সা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত মন্দির-নির্ম্মাণে আনুমানিক ব্যয় হইবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। তন্মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষার পরেই কাজ আরম্ভ হইবে।

একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি বিদ্যালয় এবং একটি অতিথি-ভবনও তথায় শীঘ্রই নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এইজন্য আরও পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন।

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা আবশ্যক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলী এবং মিশনের দানশীল পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা যেন উক্ত সদনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা পূর্ব্বক অবিলম্বে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেন। সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন,
পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া
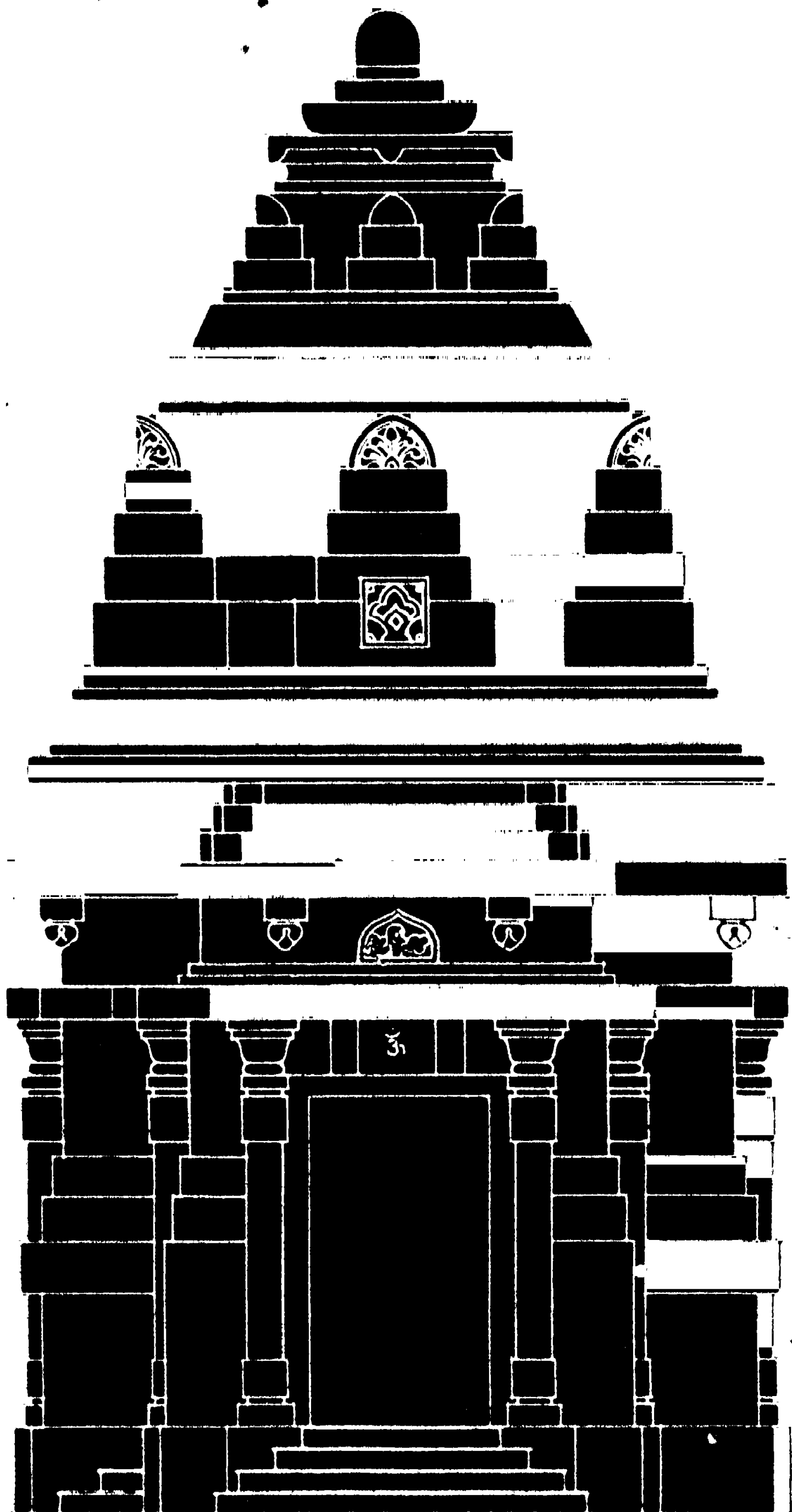
উদ্বোধন

সমাজতন্ত্রবাদ

সম্পাদক

(১)

'উদ্বোধন' পত্রের গত কার্তিক সংখ্যায় আমরা "ব্যক্তি-অধিকারবাদ" (Individualism) সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এই মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে বহু ধারায় "সমাজতন্ত্রবাদ" (Socialism) প্রবাহিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে এবং উপসংহারে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সমর্থিত সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

মূলনীতি

দেশের ভূমিজ ও শিল্পজ প্রমুখ সকল সম্পদ একটি রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকারে জনসাধারণের হিতার্থে পরিচালন করাই সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ। এই মতবাদে ভূমি ও উৎপাদক মূলধনে (productive capital) ব্যক্তিগত অধিকার (private ownership) স্বীকৃত নহে, পরন্তু দেশের জনসাধারণের অধিকার স্বীকৃত। সংঘবদ্ধগণ-অধিকারবাদও (Collectivism) মূলতঃ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদুভয় মতবাদিগণই ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তি-অধিকার রক্ষণ-ব্যবস্থার তুলনায় সমষ্টিগত ভাবে ব্যক্তি-অধিকার সংরক্ষণ-ব্যবস্থাকেই ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করেন। সমাজতন্ত্রবাদ ও সংঘবদ্ধগণ-অধিকারবাদে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তি-অধিকার অনেক বিষয়ে সংকোচিত করা হইলেও সমষ্টিগত ভাবে ব্যক্তি-অধিকার যে সকল বিষয়ে অত্যন্ত প্রসারিত করা হইয়াছে ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

উৎপত্তি

সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার একনিষ্ঠ প্রচারক—ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত রুসোর (১৭১২-১৭৭৮ খৃঃ) গ্রন্থাবলীতে সমাজতন্ত্রবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, মানব-সভ্যতার উষাকালে সকল নরনারী স্বাধীন ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ধন-বৈষম্য ছিল না। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া তাহার প্রয়োজন মিটাইত। কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) সৃষ্ট হইলে মানুষের অধঃপতন ঘটে এবং তাহাদের মধ্যে নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

ব্যাবিয়ফ, মোরলি ও ম্যাবলির মত

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে রুসোর এই সাম্যবাদ ব্যাবিয়ফ (১৭৯৬ খৃঃ) নামক জনৈক ফরাসী

সাম্যবাদী কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার মতবাদ রুসো অপেক্ষা মার্কসের মতবাদের অনেক নিকটবর্তী। ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্য নষ্ট করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার কাম্য ছিল। পরবর্তী কালে ব্যাবিয়ফের মতানুসরণকারিগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রমিকদের সহায়ে সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করিবার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণ সাম্য-মৈত্রী স্থাপন অপেক্ষা ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উপরই সমধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর মোরলি ও ম্যাবলি নামক দুই জন ফরাসী লেখক রুসোর ধন-সাম্যবাদের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইঁহাদের মতবাদ কার্যে পরিণত করিবার বিশেষ কোন পরিকল্পনা ছিল না। এ জন্য আধুনিক সমাজ-তন্ত্রবাদিগণ উভয়ের মতকে "কাল্পনিক সমাজ-তন্ত্রবাদ" (Utopian Socialism) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সেণ্ট সাইমনের মত

এই আদর্শের অনুসরণে ফ্রান্সের খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রবাদী সেণ্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫ খৃঃ) প্রচার করেন যে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে ভূমি মূলধন এবং সর্ববিধ উৎপন্ন দ্রব্য সর্বসাধারণের সম্পত্তি (common property) বলিয়া পরিগণিত হওয়া সঙ্গত। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষ তাহার কৃতিত্ব অনুসারে যে কাজ করিবে তদনুপাতে পুরস্কার পাইবে। সাইমন রাজনীতিক রাষ্ট্রের স্থলে অর্থনীতিক সাম্যমূলক রাষ্ট্র প্রবর্তনই প্রচলিত অসাম্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তন সাধনের উপায় বলিয়া প্রচার করেন। তিনি প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা অকস্মাৎ একেবারে বর্জন না করিয়া অর্থনীতিক সাম্যমূলক রাষ্ট্র সহায়ে ক্রমশঃ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে রাজা ও অভিজাত শাসকগণের স্থলে বৈজ্ঞানিকমনা ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ কর্তৃক দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া সঙ্গত। সাইমন এইরূপ রাষ্ট্র-সহায়ে দেশের সর্ববিধ উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমাজে সাম্য আনয়নের আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন। এই মনীষীই আধুনিক সমাজ-তন্ত্রবাদের মূলনীতি অনেকটা স্পষ্ট ভাবে প্রথম ব্যক্ত করেন।

ফোরিয়ারের মত

সাইমনের সমসাময়িক ফরাসী লেখক এফ্. সি এম্ ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭ খৃঃ) মানবজাতির জীবনযাত্রা-প্রণালী নূতন করিয়া পরিচালন করিবার জন্য এক অভিনব পন্থা নির্দেশ করেন। এক একটি স্থানে পাঁচ শত পরিবার লইয়া একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাম্যমূলক সমাজ গঠনের ব্যবস্থা তাঁহার পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। তিনি ইহাকে এক প্রকার গোষ্ঠী (Phalansteries) নামে অভিহিত করেন। তাঁহার মতে এই গোষ্ঠীভুক্ত নরনারীগণ যদি সমবায় (co-operative) ভিত্তিতে কৃষি ও কুটিরশিল্পাদি পরিচালন করে এবং স্ব স্ব কার্য অনুসারে পারিশ্রমিক পায়, তাহা হইলে তাহাদের সকল সমস্যা দূর হইবে এবং তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা পরিচালন করিতে পারিবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক শ্রমিকের একঘেয়ে কাজ না করিয়া বিভিন্ন কাজ করা উচিত। ফোরিয়ার কারখানায় উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যাদির একটি অংশ মূলধনীদিগকে (capitalists) ডিভিডেণ্টরূপে দিতে বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যাহাতে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশি না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ

দিয়াছেন। তাঁহার মতে মূলধনীদের অনর্জিত আয়ের (unearned income) উপর উত্তরোত্তর বর্ধনশীল (highly progressive) শুল্ক ধার্যের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। তিনি বলেন, এই উপায় অবলম্বন করিলে শান্তিপূর্ণ ভাবে ধনতন্ত্রপদ্ধতি ক্রমে বিনষ্ট করা সম্ভব হইবে।

প্রাউধনের মত

অতঃপর পি জে প্রাউধন (১৮০৯-১৮৬৫ খৃঃ) নামক জনৈক খ্যাতনামা ফরাসী সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ইহার সমর্থক রাষ্ট্র উভয়ের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সামাজিক অসাম্যের মূল কারণ। প্রচলিত অভিজাত রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্রের স্থলে শ্রমিক রাষ্ট্র স্থাপন করাই মানবসমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার উপায়।

গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রবাদ

ফোরিয়ার ও প্রাউধনের মতবাদের সামঞ্জস্যে ফ্রান্সের লুই ব্লেন্ (১৮২২-১৮৮২ খৃঃ) "গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রবাদ" (Guild Socialism) ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠনের এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। এই মতবাদকে মধ্যযুগের যোদ্ধা গোষ্ঠীকে জায়গীর দান-প্রণালীর (Feudalism) এক নূতন সমাজতান্ত্রিক সংস্করণ বলা যায়। ইহাতে প্রচলিত রাজনীতিক সমাজতন্ত্রবাদের উপর জোর না দিয়া অর্থনীতিক সমতা ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা সমাজ গঠনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

মুর, জেরার্ড, টম্‌পেইন, রিকার্ডো, ওয়েন প্রভৃতির মত

যখন ফরাসীতে এই সকল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে, তখন ইংলণ্ডে মুর, জেরার্ড উইন্‌ষ্ট্যান্‌লি, টম্ পেইন, রিকার্ডো, টোমাস্ স্পেন্স, হ্যারিংটন্, এভারাণ্ড, উইলিয়ম্ ওগিল্‌ভি, উইলিয়ম্ গড্‌উইন্ প্রভৃতি নানা ধরনের সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করেন। মুরের সাম্যবাদ জেরার্ড উইন্‌ষ্ট্যানলির গ্রন্থে সমধিক অভিব্যক্ত। এই সাম্যবাদ "ইউটোপিয়াবাদ" (Utopianism) নামে অভিহিত। এই নামটি এরূপ একটি ভাবকে দেওয়া হয়, যাহা অন্ততঃ চিন্তায়ও মানুষকে তাহার প্রাত্যহিক অপূর্ণ জীবন হইতে মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন যাপন করিতে প্ররোচিত করে। দার্শনিক প্লেটো এই মতবাদের প্রবর্তক। প্রচলিত অসাম্যপূর্ণ সমাজের স্থলে সাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এই মতবাদের আদর্শ। উইন্‌ষ্ট্যানলি সমাজতন্ত্রবাদকেই মুরের এই আদর্শ (utopia) বলিয়া প্রচার করেন। টম্‌পেইন বিশেষ জোরের সহিত গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রবাদের (Democratic Socialism) গুণকীর্তন করেন। তিনি ধনিকদের আয়ের উপর অত্যধিক শুল্ক ধার্যের পক্ষপাতী ছিলেন। রিকার্ডো আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের অন্যতম মুখ্য বিষয় "অতিরিক্ত মূল্য" (Surplus Value) নীতির প্রবর্তক। মূলধনী (capitalist) শ্রমিক সাহায্যে কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিয়া প্রকৃত খরচের উপর যে মুনাফা বা লাভ করেন, উহাই 'অতিরিক্ত মূল্য' নামে অভিহিত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আবশ্যকীয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হইলে জনসাধারণকে শিল্পদ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না এবং কতকটা দিতে হইলেও উহা রাষ্ট্র কর্তৃক তাহাদের হিতার্থেই ব্যয়িত হইবে; ইহাই এই মতের মূল কথা। এই মতবাদ "রিকার্ডিয়ান সমাজ-তন্ত্রবাদ" (Ricardian Socialism) নামে পরিচিত।

অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীতে রবার্ট ওয়েন,

চার্লস্ হল্, উইলিয়ম টমসন্, টোমাস হজস্কিন্, জন ফ্র্যান্সিস্ ব্রে নূতন ধরনের সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করেন। ইহা ক্রমে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইঁহাদের প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর রাজনীতিকগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবী করেন। রবার্ট ওয়েন গ্রামবাসীদের পারস্পরিক সহযোগিতা মূলে ফোরিয়ারের গোষ্ঠীর (Phalansteries) ন্যায় সাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি ফোরিয়ারের মত সমর্থন করেন নাই। ওয়েন শিল্প-বিপ্লব (industrial revolution) ঘটাইয়া ধনিকদের শোষণ হইতে কৃষক ও শ্রমিকগণকে মুক্ত করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সমবায় ভিত্তিতে ব্যাপক ভাবে কৃষি ও শিল্প পরিচালন করাই জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিবার উপায়। ওয়েন কারখানার মূলধনের দাবীও সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু মূলধনের জন্য ডিভিডেণ্ড না দিয়া নির্দিষ্ট সামান্য সুদ দিতে বলিয়াছেন। তিনি প্রচার করিয়াছেন যে, ধনিক শ্রেণীকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্রমশঃ একেবারে উচ্ছেদ করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। মার্কসপন্থিগণ ফোরিয়ার ও ওয়েনের মতবাদকে কাল্পনিক (utopia) বলিয়া বিদ্রূপ করিলেও আধুনিক সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে উভয়ের প্রভাব আছে।

খৃষ্টান সমাজতন্ত্রবাদ

এই সকল সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর খৃষ্টপন্থিগণ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তথাকার গির্জাসমূহের কার্যপ্রণালীকে সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদানের চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বাইবেলের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। এই মতবাদ "খৃষ্টান সমাজতন্ত্রবাদ" (Christian Socialism) নামে অভিহিত। 'তুমি তোমাকে যেমন ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকেও তেমন ভালবাস'—খৃষ্টের এই উপদেশ পালন এবং সকলের প্রতি তদনুকূল ব্যবহার—এই মতের বৈশিষ্ট্য। এই ভাবাদর্শে প্রচলিত বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া খৃষ্ট-প্রচারিত সাম্যমূলক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনই এই মতবাদীদের আদর্শ। এই মতবাদে রাজনীতি ও অর্থনীতি অপেক্ষা খৃষ্ট-উপদিষ্ট সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। এজন্য অনেকের মতে ইহাকে সমাজতন্ত্রবাদ না বলিয়া খৃষ্টপন্থীদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃভাব স্থাপনের চেষ্টা বলাই সঙ্গত। লোড্‌লো, মরিস্, কিংস্‌লে প্রভৃতি খৃষ্টান সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারক। আধুনিক সমাজতান্ত্রিকগণের দৃষ্টিতে ইহা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ বলিয়া পরিগণিত।

কার্ল মার্লো, রড্‌বারটাস প্রভৃতির মত

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রবাদের কয়েকটি প্রবল স্রোত জার্মানীতে প্রবাহিত হয়। তথাকার সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কার্ল মার্লো ওরফে অধ্যাপক উইন্ কেল্‌বেক্ (১৮০০-১৮৫৯ খৃঃ), কে জে রড্‌বার্টাস্ (১৮০৫-১৮৭৫ খৃঃ) ও ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেলি (১৮২৫-১৮৬৪ খৃঃ) প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কার্ল মার্লো প্রচার করেন যে, দেশের সকল সম্পদ জনসাধারণের সম্পদে পরিণতকরণ, পারস্পরিক সমবায় নীতিমূলে কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্য উৎপাদন এবং সমভাবে বিতরণ, লোক-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন শ্রেণীর অসমতা দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার উপায়। রড্‌বার্টাস্ একটি সাম্যবাদী (Communistic) জাতীয় রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন। তিনি সকল নরনারীকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দান

করিতে এবং সকলকে তাঁহাদের শ্রমের অনুপাতে মজুরী দিতে বলিয়াছেন। ল্যাসেলি শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া "জার্মান সামাজিক গণতন্ত্র" (German Social Democracy" নামে একটি দল গঠন করেন। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন এই দলের আদর্শ।

জার্মান জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ

পরবর্তী কালে জার্মানীর সর্বাধিনায়ক (Dictator) হিটলার কর্তৃক "জার্মান জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ" (German National Socialism) প্রবর্তিত হয়। তিনি জার্মানীর সকল সম্পদ তথাকার রাষ্ট্র-পরিষৎ রাইকের (Reich) সম্পূর্ণ স্বত্বাধীন করিয়া জনসাধারণের হিতার্থে নিয়োজিত করেন। জার্মানীতে প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্মসম্প্রদায়গুলিকেও রাইকের সম্পূর্ণ অধীনে জার্মান "ইভেন্‌জ্যালিক্যাল গির্জা" (German Evangelical Church) বা "জার্মানীর জাতীয় গির্জার" (German National Church) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জার্মানীতে প্রচলিত খৃষ্টধর্মকে জার্মানকরণই (Germanization of Christianity) ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে জার্মান জাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া বিশ্বময়—বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্যে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব স্থাপন জার্মান জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের একমাত্র আদর্শ ছিল।

নতুন পথের যাত্রা

শ্রীচিত্ত দেব

নতুন পথের যাত্রা এবার
হলো কি শুরু
দুশো বছরের পুরনো যাকিছু
সব ভেঙেচুরে দিয়ে?

নতুন পথের সন্ধান খুঁজে
চল্লিশ কোটি ভারতবাসী
জীবন মর্মতলে
নিভৃতে।

পুরনো পথের পঙ্কিলতা
আজো যদি চোখে সয়
তাহলে ব্যর্থ হবে-যে
মরণবিজয়ী শহীদের যত সাধনা
সকলি বিফল হবে
সন্ধানী যারা প্রথম দিনের
সয়েছে অশেষ যাতনা।

ফাঁসির কাষ্ঠে, বন্দুকের মুখে
অন্ধ হাজতে, আন্দামানেতে বাস
সত্যাগ্রহে, অনশনব্রতে, তাদের যা কিছু
মৌন প্রতিবেদন
ব্যর্থ হবে-যে তাহলে।

'পরাধীন দেশ—দেহটা পরের বশ
অনন্ত প্রাণ—মানুষ চিরস্বাধীন'
এ মহাসত্য
প্রকাশিত হোক্ আজ।
দুঃখ বেদনা মৃত্যুর ইতিহাস

সোনার আখরে লিখা হোক্ তার
প্রতিকার-শেষ-কথা
স্বাধীন দেশের উৎসব বেদীমূলে।
পুষ্পাঞ্জলি যেন।

সাবধানে পথ চলতেই হবে
যাত্রামন্ত্র মিলিত কণ্ঠে করতেই হবে গান
সহজ নয়কো অপরের তরে
আপনারে করা দান।

অন্নবস্ত্রের হাহাকার আজ ঘুচাতেই হবে
ভাগ্যের পরে নির্ভর করা ব্যর্থ শোক
ভুলতেই হবে
মনকে সহজ করে
সবল দেহের একাকীর যা আরাম।

চোখের উপর চল্লিশ কোটির একজনও
যখনি বাড়াবে হাত
ভিখিরির দলে ফেলে দেওয়া তারে
চলবে না।
থাম্‌তে হবেই
নতুন যাত্রাপথের যাত্রী সেও হবে
সাথে টেনে নিয়ে তারেও
যাত্রা আবার শুরু হবে।

ভারত স্বাধীন, ভারত স্বাধীন।
অন্ধ পথিক, খঞ্জ কাঙালী, বোবা
কালা যত আছে
তারা যেন বোঝে আগে
অনুভব করে স্বাধীনতা কি জিনিষ।

পেটের জ্বালায় মানুষ আজো কি
কুকুরের মতো বেঁচে রবে
এ-স্বাধীন দেশে
এ নতুন মহাভারতে ?

সুন্দর এই পৃথিবীর রূপ
সত্য হয়ে যে ওঠে
মানুষেরা যদি মানুষেরে ভালবাসে···
একের দুঃখে অপরের চোখে
দেখা দেয় যদি বেদনা-অশ্রুজল
বাড়া-ভাতে ভাই স্নেহের দাবিতে
বাড়ায় হাত
একে অপরের মুখে দেয় তুলে তুলে।

স্বাধীন হয়েছে দেশ।
সুন্দরের পথ সহজ হয়েছে যদি
সব কাঁটা যদি ছেড়েছে পথের মায়া
চলতি পথের সব বাধা যদি ঘুচেছে আজ
নতুন পথের যাত্রা হোক্-না শুরু।

অগণিত দিন দুখ সয়ে সয়ে
যারা হয়েছিল বোবা
তাদের মুখেতে ফুটিয়ে তুল্‌তে
স্বাধীন প্রাণের ভাষা
নতুন লেখনী তুলে নিক হাতে
ভাষাবোধ যার আছে
ঘোষণা করুক
কাজে ও কথায়
নতুন পথের যাত্রা হয়েছে শুরু।

নবযুগের সাধনা

স্বামী তেজসানন্দ

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

সুদীর্ঘ সাধনায়, "ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়"—বিশ্বভ্রাতৃত্বের এই নিগূঢ় তত্ত্ব স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরে প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে অতুল প্রেমের অধিকারী করিয়া তুলিল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, সেই এক অখণ্ড চৈতন্য আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' রূপে ওতঃপ্রোতভাবে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান,—সকলই 'সূত্রে মণিগণা ইব' এক অখণ্ড অদ্বয় চৈতন্য-সূত্রে গ্রথিত।—

"ঊর্দ্ধে অধো নাহি যার বাহির অন্তর।
মধ্য পার্শ্ব কোন কিংবা দিক্ পূর্ব্বাপর॥
যে আছে ব্যাপিয়া ব্যোম বিশ্বচরাচরে।
অনন্ত অখণ্ড এক দিব্যরূপ ধরে॥
'আমি' সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব সুমঙ্গল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল॥"[১]

তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন, বিশ্ববুকে প্রতিনিয়ত যে মহাশক্তির খেলা চলিতেছে, যে দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্য নিত্য নানা নামরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা সর্ব্বদ্বন্দ্বের সমন্বয়ভূমি এক চৈতন্য-সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। এই শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতিসুন্দরী কখনও কুসুমিত যৌবনে হাসিতেছে —সংসারকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দিতেছে, আবার পরক্ষণেই প্রলয়ের তুফান তুলিয়া সমগ্র সৌন্দর্য্যকে ধ্বংসের কুক্ষিগত করিতেছে। এই দিব্যানুভূতি স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-গম্ভীর স্বরচিত কবিতায় কি অপূর্ব্ব ছন্দেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে সৌন্দর্য্যের বিচ্ছুরিত বিকাশ,—

"ফুল্লফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে
আশে পাশে।
শুভ্র শশী যেন হাসি রাশি, যত স্বর্গবাসী
বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয় পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয়
খুলে।
নদ নদী সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত বা
কমল দোলে॥"

আবার অপর দিকে পরক্ষণেই ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি,—

"মেঘমন্দ্র কুলিশ নিস্বন, মহারণ ভূলোক
দ্যুলোক ব্যাপী।
অন্ধকার উপরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে
প্রলয়বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভয়ে, রক্তক্ষয় করাল
বিজলি জ্বালা।
ফেনময় গর্জ্জি মহাকায়, ঊর্ম্মি ধায়, লঙ্ঘিতে
পর্ব্বত চূড়া॥
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বিচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে
যায় বেগে॥"[২]

এই বৈচিত্র্যই সৃষ্টির প্রাণ;—সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু এক অচিন্ত্য শক্তিরই অফুরন্ত লীলা।

১ শঙ্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তবিন্দুঃ (পদ্যানুবাদ), ৫

২ "নাচুক তাহাতে শ্যামা"—স্বামী বিবেকানন্দ রচিত কবিতা

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, মহাশক্তি মহামায়ার লীলা-নাট্যেরই নিত্য নব পটপরিবর্ত্তন মাত্র। প্রশান্ত সরসীবক্ষে অগণিত ফেন-তরঙ্গ-বুদ্‌বুদের উত্থান-পতনের মত, অসীম চিৎ-সমুদ্রে, অনন্ত কোটি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি প্রলয়রূপে, সেই মহাশক্তিরই চিরন্তন অভিনয় চলিয়াছে। এই মহাশক্তিই কখনও সুন্দর হইতে সুন্দর; আবার কখনও ভীষণ হইতেও ভীষণ। ইহাই কখনও নবপল্লবিত বৃক্ষবল্লরীর শ্যামল শোভায়, কখনও মেঘমুক্ত নীলাম্বরপটে, রজতশুভ্র রাকাচন্দ্রের স্নিগ্ধ বিমল হাসিতে, কখনও অনন্ত বিতত লবণাম্বুরাশির বিরাট নীলসৌন্দর্য্যে ও অভ্রভেদী তুহিনাচলের ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিতে মানবহৃদয়ে অভিনব আনন্দের সৃজন করিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত, নন্দিত ও পুলকিত করিতেছেন; আবার কখনও এই শক্তিই পঞ্চভূতের প্রলয়নৃত্যে বিশ্বগ্রাসী মহাপ্লাবনে, ঝঞ্চামহামারী-মহারণের দুন্দুভিনিনাদে সকলকে স্তম্ভিত, ত্রস্ত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন। বিবেকানন্দের সাধনা তাঁহাকে শিখাইয়াছে, ভীষণ ও মধুর, সুন্দর ও কুৎসিত, দুঃখ ও সুখ, আলোক ও আঁধার—এই সর্ব্বদ্বন্দ্বময়ীরূপে প্রতিভাত এক অচিন্ত্য শক্তিই প্রতিনিয়ত নূতনকে পুরাতন, পুরাতনকে নূতন করিয়া তুলিতেছেন; সৃষ্টি ও ধ্বংসরূপে এই অনাদি অব্যক্ত চিৎশক্তিই ক্ষণে ক্ষণে নিমেষে নিমেষে, আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আচার্য্য শঙ্কর যাঁহাকে—

> "সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো
> ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
> সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো
> মহাদ্ভুতাঽনির্ব্বচনীয়রূপা॥"[৩]

বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, উহাই সেই মহাশক্তি মহাকালীর প্রকৃত পরিচয়। পদতলে নির্ব্বিকার নির্গুণ চৈতন্য-ঘন পরমশিব নির্ব্বিকল্প-সমাধি ভঙ্গে শবরূপে শায়িত। তাঁহারই বিশালবক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী, কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী, বিগলিত-চিকুরা, কুণপগণশিরোমালিনী, দীর্ঘদেহা, মহাকালী, আদ্যাশক্তি ভীষণ মধুর মূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজিতা। দক্ষিণে বরাভয়করে বিশ্বপ্রসাধনী জগজ্জননী মাতৃশক্তি বিশ্ববাসীকে আশীষ ও অভয় দানে নিত্য নিরতা; আবার মধ্যে অসি মুণ্ডহস্তে ধ্বংসের উল্লাসে সেই শক্তি সদা উন্মত্তা;—সর্ব্বাঙ্গ রুধিরলিপ্ত!—যেন সিন্ধুবক্ষে অনন্ত ঊর্ম্মির লীলা-চঞ্চল উন্মদ নর্ত্তন—আবার পরক্ষণেই তথায় গভীর প্রশান্তি—নির্ব্বিকল্প শিব শান্তমূর্ত্তি! একেরই বিচিত্র বিকাশ, নানারূপে, নানা নামে, চিৎ-শক্তির লীলা-প্রতিভায়, সর্ব্বভাবে, মাতৃভাবে তাঁরই আগমন।—

> "হয়ে বাক্য মন অগোচর সুখে দুঃখে তিনি
> অধিষ্ঠান,
> মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তারি
> আগমন।
> রোগ শোক দারিদ্র্য যাতনা, ধর্ম্মাধর্ম্ম
> শুভাশুভ ফল,
> সবভাবে তারি উপাসনা, জীবে বল কে বা
> কি বা করে?"[৪]

হায় মানব! মহাশক্তি মায়ের এই নগ্ন ভৈরবরূপের প্রত্যক্ষীকরণে তুমি আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত! স্নিগ্ধ হিমশীতল প্রফুল্ল কিরণোজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের প্রকৃত প্রাণ, প্রদীপ্ত-প্রখর-কর-মণ্ডিত সূর্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে তুমি স্বতঃই কুণ্ঠিত! অজ্ঞ মানবের এই নৈসর্গিক দুর্ব্বলতাকে রূপায়িত করিয়া স্বামীজি বলিতেছেন,—

> "দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত
> সুধার ধার।
> মন চায় হাসির হিল্লোল, প্রাণ সদা লোল,
> যাইতে দুঃখের পার॥

৩ শঙ্করাচার্য্যকৃত "বিবেকচূড়ামণি", ১০৯

৪ "সখার প্রতি"

ছাড়ি হিম শশাঙ্ক ছটায়, কেবা বল চায়,
মধ্যাহ্ন তপনী জ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও,
তবু লাগে ভালো॥
দুঃখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর
দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল,
তবুও নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্র মুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়
মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার
খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥"[৫]

হে মানব! সত্যই কি তুমি এই মহাশক্তির পূর্ণাঙ্গ উপাসনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্ম-সম্বিদ লাভ করিতে চাও? যদি চাও, তবে সেই প্রলয়ঙ্করী মূর্তিকে প্রসন্নচিত্তে বরণ করিয়া তাঁহার রুধির-লিপ্ত রাঙ্গা চরণে প্রেমের পূত অর্ঘ্য অর্পণ করিতে পারিবে কি? কোমল ও মধুর ভাবের অন্তরালে তাঁহার যে রুদ্র সংহার-মূর্তি প্রদীপ্ত শত সূর্যের মত প্রচণ্ড প্রভায়, নিত্য প্রকাশিত, সেই অট্টাট্টহাস দিগম্বরী মাকে সাদরে গ্রহণ করিবার সাহস তোমার আছে কি? যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তবে তোমার শক্তি-উপাসনার সমগ্র আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে জানিবে। কাপুরুষের হৃদিমন্দিরে মাতৃ-পূজার বোধন সম্ভব নহে।—

"মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়
কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি
বিতরিছ জনে জনে॥"[৬]

যে প্রেম, যে কোমলপ্রাণতা মহামায়ের এই ধ্বংস মূর্তি—দুঃখ, দারিদ্র্য, দৈন্য, মহামারী—দর্শনে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, সে প্রেম, সে কোমলতা, প্রকৃত প্রেম প্রকৃত ভালবাসা নহে; উহা দুর্বলতার নামান্তরমাত্র। এই একাঙ্গী মাতৃ-উপাসনায় প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হইবার সৌভাগ্য তোমার কখনই ঘটিবে না। যেখানে অগণিত নরনারী রোগ-শোকে জীর্ণ-শীর্ণ, কালের ক্রীড়নকরূপে আকুল আর্তনাদ দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে; যেখানে বুভুক্ষিত নরনারী তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ, তোমার সাহায্যের প্রতীক্ষায় ক্ষীণ দুর্বল হস্ত প্রসারিত করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতেছে; যেখানে অস্পৃশ্য ঘৃণিতের প্রতি অত্যাচারে সমাজের আবহাওয়া বিষায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তোমার মৃত্যুরূপা মায়ের পবিত্র মন্দির সেইখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামীজি বলিয়াছেন; "দুঃখভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁর প্রেতভূমি চিতা মাঝে।"[৭] তোমার হৃদয়ের প্রেমার্ঘ্য লইয়া সেই মাতৃ-মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছ কি? নিরন্ন দুঃখী ও আর্তের সেবায় আত্মবলিদান করিবার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে কি? যে দিন প্রলয়ের বিষাণ বাদনেও তোমার চিত্ত কম্পিত হইবে না, মৃত্যুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে তোমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিবে, সেই দিন, সেই শুভ লগ্নে স্বার্থসাধশূন্য তোমার শুদ্ধ হৃদিমন্দিরে শ্যামা মায়ের পূজার প্রকৃত আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে,—মায়ের পূর্ণাঙ্গ আরাধনা আরম্ভ হইবে। স্বামীজি তাই গাহিয়াছেন,

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে
বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা
তারই কাছে আসে॥"[৮]

৫ "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতা
৬ "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতা
৭ "নাচুক তাহাতে শ্যামা"—কবিতা
৮ বিবেকানন্দ-রচিত, "Kali the Mother" (পদ্যানুবাদ—"মৃত্যুরূপা কালী")

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের এই শক্তিসাধনা একদিন পদদলিত ভারতের দুর্বল প্রাণে অমিত বীর্য্য সঞ্চার করিয়াছিল; সুপ্তিমগ্ন মৃতপ্রায় আর্য্য সন্তান বীর পূজায়ীর বজ্রনির্ঘোষে শতশতাব্দীর জড়তা ভঙ্গ করিয়া আত্মসম্বিদ লাভ করিয়াছিল। শক্তি-বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়াছিল। ঈশানের বিষাণবাদনে দিকে দিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। তাঁহারই উদাত্ত আহ্বানে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্য-সন্তানগণ ভারতের অতীত যুগের গৌরবোজ্জ্বল কৃষ্টিকাহিনী স্মরণ করিয়া আত্ম-গরিমায় উন্নতশির হইতে শিখিয়াছিল; কতশত অমূল্য প্রাণ অকুণ্ঠ চিত্তে দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মদান করিবার জন্য দিব্যোন্মাদনায় ছুটিয়াছিল! সে শৌর্য্যবীর্য্য, সে অলৌকিক আত্মোৎসর্গ, সে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ আজও ইতিহাসে অমর অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

হে ভারত! স্বাধীনতাসংগ্রামের বিজয়-উল্লাসে আত্মবিস্মৃত হইও না। সম্মুখে বিস্তীর্ণ বিপদসংকুল দুর্গম গিরিকান্তার, সুদূরপ্রসারী বন্ধুর পথ। চারিদিক হইতে অনন্ত বিঘ্ন, অনন্ত বাধা রক্ত-লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সংগ্রাম-জয়ে যে আত্মঘাতী আত্মপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তুমি জানিও, তাহাই বহুলায়াসলব্ধ-স্বাধীনতা-সম্পদ রক্ষার পরম পরিপন্থী। এখনও ভারতের কোটি কোটি নরনারীর পরিধানে বস্ত্র নাই, মুখে অন্ন নাই, রোগ-শোক-মহামারী পল্লী ও নাগরিক জীবনের শান্তি ও সৌন্দর্য্যকে ধ্বংসের কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে; অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবিয়া ভারত-ভারতী যুগযুগান্তের কত কুসংস্কার ও আচার-আবর্জ্জনা বহুমূল্য রত্ন-পেটিকার মত সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখনও হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, বর্ব্বরোচিত অস্পৃশ্যতা সমাজ-শরীরকে জর্জ্জরিত ও শতধা বিভক্ত করিয়া জাতির জীবনী শক্তিকে সর্ব্বদা শোষণ করিতেছে। ধর্ম্মের নামে কত ব্যভিচার, কত বর্ব্বরতা চলিয়াছে। এখনও বিদেশী শিক্ষার বিষময় ফলে জাতির নৈতিক জীবন শিথিল ও মেরুদণ্ড-হীন। এখনও কত বিদেশী বণিক লুব্ধ দৃষ্টিতে ভারতের পানে চাহিয়া রহিয়াছে,—ভারতের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা সম্পদ হরণের সুযোগ খুঁজিতেছে! অন্তর্বহিঃ শত্রু, ধর্ম্মে ধর্ম্মে দলাদলি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রেষারেষি, রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির সংঘর্ষ প্রতিনিয়ত ভারতের সংহত শক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছে। হে ভারতসন্তান! ভারতকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার যে মহান দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা সম্পাদনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হও। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত নবযুগের শক্তি-সাধনায় দীক্ষিত হইয়া ভারতের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য প্রস্তুত হও। ভারত অতীতকালে যত মহান্, যত গৌরবমণ্ডিত,যত মহিমান্বিত ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা গরীয়ান, তদপেক্ষা মহীয়ান, অধিকতর জ্যোতিষ্মান করিবার জন্য তোমাকে আজ, আবার বীর বিবেকানন্দের মত, মহাপ্রাণ মহাত্মা গান্ধীর মত, মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া কঠোর কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের জাতীয় জীবন কি উপাদানে গঠিত, তাহা আজ আমাদিগকে জানিতে হইবে,—তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তারপর সেই বজ্রদৃঢ় অটল বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অতীতের গরিমা ও মহত্ত্বকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া অতীত ভারতাপেক্ষাও বৃহত্তর, মহত্তর ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে।

মৃত্যুরূপা মহাকালীর উপাসনায় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা করিয়াছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের জ্বলন্ত বিগ্রহ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে

বসিয়া। আজ এস, আর্য্য সন্তান, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বংশধর। যিনি গুরুবলে বলীয়ান হইয়া নবযুগের প্রারম্ভে ভারতবাসীকে ভীষণের পূজায়,—মৃত্যুরূপা মহাশক্তির উপাসনায়—আহ্বান করিয়াছিলেন, এস, আজ আমরা তাঁহারই অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই ভারত মহাশ্মশানে ক্ষুধিতের কাতর ক্রন্দন, ব্যাধি-পীড়িতের অসহায় হাহাকার, পদদলিতের অক্ষম কাতরতা দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করি। হে বীর-প্রসবিনী ভারতমাতার কৃতী সন্তানগণ, "যাও যেখানে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি মড়ক, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া,—যাও সেখানে ছুটিয়া যাও। তাণ্ডব নৃত্যপরায়ণা মৃত্যুরূপা মাতার চরণে হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত উৎসর্গ কর। প্রেতের অট্টহাসি, শিবার চীৎকার শুনিয়া রমণীর অঞ্চলতলে ভীরুর মত আত্মগোপন করা আর তোমার শোভা পায় না। শিয়রে মহাসর্ব্বনাশ নিষ্পলকনেত্রে তীব্র দৃষ্টিতে তোমার দিকে চাহিয়া; প্রেমের স্বপ্ন দেখিবার অবসর তোমার আছে কি ?··· এসো যুগযুগান্তের নিরাশা জড়ত্বপাশ জীর্ণ-বস্ত্রের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া; কোটি কণ্ঠে একবার এই ভীষণকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাক দেখি;—সেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে পাগল পূজারী যে ভাবে, যে নগ্ন সরলতা লইয়া ডাকিয়াছিলেন—ডাক দেখি একবার! মৃত্যুরূপা মাতা প্রসন্না হইবেন;—সাধনায় সিদ্ধি মিলিবে।"[৯]

এস, আজ এই নব্যভারতের মন্ত্রগুরু বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আবার সিন্ধুরোলে সেই গান গাই, যাহা ভারতের প্রকৃত সাধনা,—যাহা ভারতকে একদিন উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়াছিল; যাহা আবার ভারতকে বিশ্বমাঝে গৌরবাসন প্রদান করিবে, তাহাকে বিশ্ববিজয়ী করিয়া তুলিবে—

"ভাঙ্গ বীণা প্রেম সুধা পান, মহা আকর্ষণ
দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান,
প্রাণপণ যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার,
প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"[১০]

৯ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকৃত "বিবেকানন্দ-রচিত"
১০ স্বামী বিবেকানন্দের "নাচুক তাহাতে শ্যামা"

সোনার প্রসূন

শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাস

আজ সকালে তরুণ তপন নীল গগনের
সুদূর হতে কোন্ জীবনের নতুন খবর আন্‌লো,
ঘুম ভাঙ্গানো স্মৃতির স্বপন অতল দহের
অচিন্ কোন শ্বেত কমলের কুঁড়ির সুবাস টান্‌লো।
মন মাতানো পরশরতন চিৎ সায়রের
গহীন্ জলে উৎসারণের অসীম শরণ মাগলো;
সব ভোলানো খুসীর আমেজ দীন দুনিয়ার
মাটির তলে উত্তরণের সুরের বাহার সাধলো।
অতিমানস মায়ের আসন মানস-জীবন
মর্ম্মমূলে সন্দীপনের পরম তৃষা পূরলো;
এই ধরণী বুকের দহন চিরন্তনের—
সুখের সাধে, রূপান্তরের সোনার প্রসূন ফুটলো।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য-অপচয় নিবারণ

জর্জ মার্টিন

বর্তমানে পৃথিবীর চারিদিকেই কঠিন খাদ্য-সংকট। সেই জন্য খাদ্যের অপচয় নিবারণের প্রয়োজনীয়তা আজ সব চেয়ে বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। খাদ্য ও কৃষি সংঘের (United Nations Food & Agriculture Organisation) সাম্প্রতিক বিবরণীতেও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বৃটেনে উৎপন্ন খাদ্যবস্তুর অপচয় বন্ধ করে তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করার চেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে এবং ১৯১৭ সালে মহাযুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট একটি খাদ্যবিষয়ক অনুসন্ধান সমিতি (Food Investigation Organisation) গঠন করেন।

খাদ্যগুণ বৃদ্ধির উপায়, খাদ্য দ্রব্যাদির সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা এবং খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে নানারকম ব্যাপক গবেষণা করাই এই সমিতির কাজ। তা ছাড়া অন্যান্য সমস্যা যথা—খাদ্যের উৎকর্ষবৃদ্ধি, সমস্তরকমের অপচয় নিবারণ, সংরক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং সেই সঙ্গে মৎস্য পালন সমিতির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সমিতি সামরিক ও বেসামরিক লোকের ব্যবহারের জন্য নানারকম শুষ্কখাদ্যের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপৃত ছিল। সেইজন্য গবেষণার কাজ যুদ্ধের সময় বেশীদূর অগ্রসর হয়নি এবং যুদ্ধশেষে নূতন উদ্যমে সমিতি কাজ আরম্ভ করে।

দেশবাসীর মুখে পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য জোগানই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রী দপ্তরের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। কারণ এতে গবেষণার কাজে দ্রুততা বেড়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যাপকতা লাভ করেছে। তা ছাড়া সরকারী আনুকূল্যে গবেষণার ফলাফল সাধারণ্যে সহজেই গৃহীত হবে। অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান খাদ্য-সংরক্ষণ, সরবরাহ কিংবা প্রস্তুতি-প্রণালী নিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করছে, তাদের সঙ্গেও সমিতি একত্র কাজ করার সুযোগ নেবে।

সমিতির ১৯৪৬ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তাদের কাজ ইতোমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তু বিশেষতঃ মাংস কি ভাবে পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করা যায় তারই উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

কৃষি-গবেষণা কাউন্সিলের সহযোগিতায় সমস্ত রকম শাকসব্জি, বিশেষতঃ আলু নিয়ে গবেষণার কাজে বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। কেম্ব্রিজের Low Temperature Station for Research নামে যে গবেষণাগার আছে সেখানে এই সব বিষয়—যথা মাংস ও অন্যান্য জান্তব খাদ্যবস্তু, ফল এবং শাকসব্জি নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে, তা ছাড়া ডিটন্ ল্যাবোরেটরীতে (Ditton Laboratory) প্রধানতঃ ফল ও শাকশব্জির সরবরাহ, সংরক্ষণ ও টিন-বদ্ধ করার কৌশল নিয়ে কাজ চলছে।

লণ্ডনের কভেণ্ট গার্ডেন্ সব্জি বাজারে এবং স্মিথফিল্ড্ মাংস-বাজারে আরও দুটি ছোট ছোট ল্যাবোরেটরী আছে, এখানে পচনশীল

খাদ্য দ্রব্যাদির প্রত্যহ পরীক্ষা করা হয় এবং সংরক্ষণের নূতন নূতন উপায় নির্ধারণ করা হয়। এই ল্যাবোরেটরী দুটি যুদ্ধের সময় বন্ধ ছিল, কিন্তু ১৯৪৬ সাল থেকে আবার কাজ আরম্ভ করেছে।

বর্তমানে মাংস দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্য বৃটেনের বর্তমান খাদ্যব্যবস্থায় মৎস্য দ্বারা অনেকখানি অভাব পূরণ করা হয়েছে এবং এ্যাবার্ডিনের টোরি গবেষণা কেন্দ্রে (Torry Research Station At Aberdeen) আজ মৎস্য সম্বন্ধীয় ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। এই কেন্দ্রটি কেবল মৎস্য সংরক্ষণ, সরবরাহ, টিন-বন্ধ করার বিভিন্ন কৌশল এবং মৎস্য থেকে অন্যান্য খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করার সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত।

যুদ্ধের পূর্বে মৎস্য জমাট করে সংরক্ষণের উপায় নিয়েও এখানে গবেষণা হয়েছে এবং এই ভাবে হেরীং ও শ্বেত মৎস্য ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করা আজকাল সম্ভব হয়েছে।

শুষ্ক ও লবণযুক্ত মৎস্যের সংরক্ষণপ্রণালী ও ব্যবহার নিয়েও অনেক পরীক্ষা হয়েছে। খাদ্যে পরিমিত প্রোটিন বা মাংসজাতীয় উপাদানের অভাব হলে শুষ্ক মৎস্য তা পূরণ করবে, বিশেষতঃ যে সব দেশে মৎস্যের বিভিন্ন প্রথায় সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রণালীর কোন উন্নতি হয়নি।

কেন্দ্রটি বিভিন্ন কলোনী এবং ভারতবর্ষের মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞদের উন্নত ধরনের মৎস্য চাষ, আধুনিক মৎস্য সংরক্ষণ কৌশল এবং শুষ্ক করণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দিয়েছে।*

* নিউদিল্লী ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন্ সার্ভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। - উঃ সঃ

উন্মেষ

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা নামুক, আসুক সন্ধ্যা নেমে
　　ফিরিব না আজ গৃহে,
হে পথিক, আমি পড়েছি তোমার প্রেমে
　　আরো চলো যাই
　থলি-থালি ফেলে দিয়ে।

রজনী গভীর, আকাশ অন্ধকার
　　ফিরিব না তবু গৃহে
হে প্রেমিক, মোরে টানো টানো অনিবার
　　একাকী যেয়ো না
　মোরে চলো সাথে নিয়ে।

উদিছে প্রভাত, পূবে দেখা যায় রবি
　　একী গৃহ—এই গৃহ?
হে পরম, আজি দেখালে একী এ-ছবি!
　　এতদিন কেন
　এ-ছবি লুকালে প্রিয়?

ব্রত

শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

ব্রত কি, উহার ফল কি এবং কেন ও কি ভাবে উহা কর্ত্তব্য—ইহাই এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়। ব্রত কর্ম্মবাচী পদ, ইহা সমস্ত নিরুক্তগ্রন্থ হইতে জানা যায়—'ব্রত ইতি কর্ম্মনাম' (বাররুচনিরুক্ত-সমুচ্চয়)। ভগবান যাস্ক তাঁহার স্বকৃতনিঘণ্টু-ভাষ্যে ব্রতবিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন, যথা 'ব্রতমিতি কর্ম্মনাম বৃণোতীতি সতঃ'। ব্রতকে তিনি নিবৃত্তকর্ম্মবাচীও বলেন এবং তাহার নিরুক্তি দেখাইয়াছেন বারয়তীতি সতঃ'। বেদের এই সর্ব্বমান্য ব্যাখ্যানগ্রন্থ হইতে জানা যায় 'যে কর্ম্মের দ্বারা সৎপদার্থের বরণ এবং অসৎপদার্থের বারণ হয়' সেই কর্ম্মই ব্রতপদবাচ্য।

যাস্কের এই বাক্যকে স্পষ্ট করিয়া বলা যাক্—ব্রত মানে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য। অভ্যাসের দ্বারা ইষ্টের বরণ এবং বৈরাগ্যের দ্বারা অনভীষ্ট-পদার্থের বারণ হয়। ব্রতকে অভ্যাসবৈরাগ্য বলিলে দোষ হইবে না, কারণ ব্রতের যে ফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে তাহা অভ্যাসবৈরাগ্যেরও ফল। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য অন্যভাবেও করা যায়, যথা প্রাণিপীড়নের অভ্যাস, এবং মাঙ্গলিক কার্য্যে বৈরাগ্য, কিন্তু এই অভ্যাসবৈরাগ্য ব্রত-পদ-বাচ্য নহে; কেননা ইহাদের অর্থ উপদেশ পারম্পর্য্য দ্বারা রক্ষিত নহে, আর পীড়াদির ফল এবং ব্রতের ফল শাস্ত্রে ভিন্নভাবে উপদিষ্ট আছে। কর্ম্মমাত্রই ব্রত নহে, কিন্তু প্রোক্তলক্ষণ কর্ম্মই ব্রত।

যোগসূত্রভাষ্যে (২।৩০) স খল্বয়ং ব্রাহ্মণঃ··· ইত্যাদি একটী অতি প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত আছে। তাহাতে জানা যায় যে ব্রতশব্দ অহিংসাপ্রধান যোগ-সাধনবাচী। অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত যম-সাধনও ব্রতপদবাচ্য। যোগসূত্রে (২।৩১) বলা হইয়াছে যে যমসাধন যদি জাত্যাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয় তবে তাহা মহাব্রত হয়। অতএব সামান্য-ভাবেও যমের সাধন ব্রতপদবাচ্য। যম মানে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ। সত্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে যে ব্রতপদের প্রয়োগ হইতে পারে তাহা বৈদিকগ্রন্থ হইতে জানা যায়, যথা—'এতৎখলু বৈ ব্রতস্য রূপং যৎসত্যম্' (শত-পথ ব্রাহ্মণ ১২।৮।২।৪), 'বীর্য্যং বৈ ব্রতম্' (শতপথ) ইত্যাদি। সত্যাদি সাধন রূপ শাস্ত্রীয় নিয়মই যে ব্রত-পদ-বাচ্য তাহা অন্যান্য বৈয়াকরণ আচার্য্যগণেরও অভিমত; যথা অষ্টাধ্যায়ীর ৩।২।৮০ সূত্রবৃত্তিতে কাশিকাকার বলেন 'ব্রত ইতি শাস্ত্রতো নিয়ম উচ্যতে'। অতএব শাস্ত্রের দ্বারা শিষ্ট পদার্থের বরণ এবং শাস্ত্রগর্হিত পদার্থের বারণরূপ কর্ম্মই ব্রত।

ব্রতপদের ইহা তাত্ত্বিক অর্থ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে ইহা নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদে আছে 'অন্নং বহু কুর্ব্বীত তদ্ ব্রতম্'। এস্থলে ব্রত অর্থে নিরন্তর কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্বভাব বুঝাইতেছে। স্বভাবাত্মক কর্ম্ম যে ব্রত-পদার্থ হয় তাহা মনু-সংহিতা ভাষ্যকার মেধাতিথিও বলেন 'ব্রতানি শীলিতং কর্ম্ম উচ্যতে'। কোন কর্ম্মকে ব্রত বলিলে উহা হইতে আমি চ্যুত হইব না এই অর্থই বুঝায়। সুতরাং ব্রতের অর্থ হইল নিয়ম। ব্রত একাঙ্গহীন হইলেও লুপ্ত হয়, অতএব সর্ব্বাঙ্গসাধক ব্যাপারই ব্রত।

কেবলমাত্র কর্ম্মই যে ব্রতবাচ্য তাহা নহে, দ্রব্যকেও গৌরবে ব্রত বলা হইয়াছে ; যথা— 'অন্নমপি ব্রতমুচ্যতে, যদাবৃণোতি শরীরম্' (নিরুক্ত)। অন্ন বিপরিণত হইয়া শরীর হয়—অর্থাৎ শরীর অন্নাবৃত, অতএব অন্নই ব্রত। যাঁহার দ্বারা কোনও পদার্থ আবৃত হয় তাহাও ব্রত—ইহাও ব্রতসম্বন্ধীয় একটি তথ্য। কেবল উপাদান কারণ নহে, যে সিদ্ধির যে হেতু তাহাকেও ব্রত বলা যায়। এই নিয়মের বিনিগণনা স্বরূপে বলা যায়—(১) দুষ্টব্যক্তিকে দণ্ডদান রাষ্ট্রিকদের ব্রত, (২) মেধাবী ছাত্রকে বিদ্যার সুযোগ দান করা অধ্যাপকদের ব্রত, (৩) দ্রব্যের ন্যায্য বিভজন ব্যবসায়ীদের ব্রত ইত্যাদি। দ্রব্যে ক্র-পদ-প্রয়োগের অন্য উদাহরণও আছে। যথা—পতিব্রতা স্ত্রী 'পতিরেব ময়া পরিচরণীয়······ইতি নিয়মো যস্যাঃ সা পতিব্রতা পতিভক্তা' (মেধাতিথি)। যে বস্তু একান্তভাবে লক্ষ্য ও সেব্য তাহাও ব্রত। লক্ষ্য বস্তু যদি শাস্ত্রগর্হিত না হয় তবেই উহা ব্রত, অন্যথা নহে। এইজন্যই পুণ্যকর্ম্মকেই ব্রত বলা যায়, সর্ব্বকর্ম্মকে নহে। অতএব ব্রতশব্দ পুণ্যকর্ম্মবাচী রূপেই কোশসমূহে ব্যাখ্যাত হয়।

প্রোক্তলক্ষণ ব্রতের শাস্ত্র যে অব্যর্থ ফলের কথা বলেন তাহা জ্ঞাতব্য। 'অমানুষ ইব বা এতদ্-ভবতি যদ্ ব্রতমুপৈতি' (শত ১৷৩৷২৩)। দৈবী সম্পত্তির অধিকারী হইতে গেলে যে সাধন অনুষ্ঠেয় তাহাই ব্রত—ইহা এই উক্তি হইতে জানা যায়। এই জন্যই সাধক সর্ব্বগ অগ্নিনামক পরমাত্মার নিকটে প্রার্থনা করেন 'অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্, ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি' (যজুঃ ১৷৫)। মোক্ষসাধক এই ব্রতের অধিপতি যে পরমাত্মাই তাহাও বেদ বলিয়াছেন। ব্রতের জন্য সাধকের এইরূপ আগ্রহের কারণ—'ন বা হ অব্রতস্য দেবা হবিরশ্নন্তি' (কৌষিতকী, ৩৷১)।

এই সুমহান্ ব্রতের ফল কি? বেদ বলেন 'ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি' (যজুঃ, ১৯৷৩০)। তত্ত্ববোধিনী রুচি এবং নিশ্চল লক্ষ্যকেই বেদ দীক্ষা বলেন'। অতএব যাহার ফলে সম্যগ্-জ্ঞানাধিগম হয় তাহাই ব্রত। ইহা মোক্ষসাধন পক্ষীয় অর্থ। ঋষিগণ প্রজাবান্ হইবার জন্যও ঐশব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এই বিষয়ে ঋঙ্মন্ত্র 'বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনুষু বিভ্রতঃ প্রজাবন্তঃ সচেমহি'। ব্রতকারী যে নাশপ্রাপ্ত হন না বা বিয়োগী হন না ইহাও উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে—'তব ব্রতে বয়ং ন রিষ্যেমঃ'।

প্রত্যেক পদের গৌণ অর্থও আছে। মহাভারত বলেন চক্ষুঃশ্রোত্র-আদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহার সিদ্ধি হয়, কিন্তু বর্ত্তমানে আহার শব্দের অর্থ অন্নগ্রহণ মাত্র। সেইরূপ কালবশে ব্রতের অর্থও সংকীর্ণ হইয়াছে, যথা—বেদার্থ বাঙ্ময়ে ব্রতকারীরই ঐশযোগ হয় বলা হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতে আছে 'ব্রতের দ্বারা হরিতে প্রীতি হয় না' (৭৷৭)। ভাগবতের (১১৷১২) 'ব্রতানি যজ্ঞা···' শ্লোকে যে ব্রত পদ আছে তাহার অর্থ 'একাদশ্যু-পবাসাদীনি' (ভাগবতামৃতবিন্দু) গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা ব্রতের যে অর্থ দেখাইয়াছি সংজ্ঞাবাচী পদে উহার ব্যভিচার হইতে পারে, যথা—'বৈড়ালব্রতিকঃ' (মনু) বিড়ালব্রতেন আচরতি; এস্থলে সদসৎ যে কোন কার্য্যসিদ্ধির উপায়মাত্রকেই ব্রত বলা হয়। মহাভাষ্যে আছে 'ব্রতং নাম তদ্ ভবতি, যদভ্যবহারার্থমুপাদীয়তে'। ব্যাপক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বলা যায়, ন্যায্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহাই ব্রত, এবং সেই প্রয়োজনীয় বস্তুটীও কচিৎ ব্রতপদের অর্থ হইতে পারে। উৎপীড়িত শ্রমিকগণ দ্বারা ধনিকগণকে উৎখাত করাও ব্রত, কিন্তু বিলাসমত্ত ধনিকর্তৃক শ্রমিকপীড়ন ব্রত নহে।

বেদে যে স্থলে পরস্পরের মিলনের কথা আছে বা অনুসরণের নির্দেশ আছে তাহা ব্রতবিষয়ক, যথা—'তব ব্রতে মে হৃদয়ং সন্দধামি'। ইহাতে জানা গেল যে তোমার ব্রতেই (বরণবারণলক্ষণক) যোগ দিব, কর্ম্মমাত্রে নহে। পিপ্পলাদসংহিতায় আছে 'অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রঃ' (৫৷১৯৷১৮), অর্থাৎ পিতার ব্রতের অনুসরণ পুত্র করিবে, কর্ম্মমাত্রের নহে—ইহাতে কর্ম্মাপেক্ষা ব্রতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অব্রতীদিগকে অযোগ্য বলা হয় এবং তাহাদের সিদ্ধান্তের কোন মূল্য নাই যথা—'অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাং। সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে'। ইহাই ব্রতের চরম মাহাত্ম্য।

ওক্‌ল্যাণ্ডে স্বামী তুরীয়ানন্দ *

অনুবাদক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ক্যালিফর্নিয়ায় বেদান্তপ্রচারে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের স্থান গ্রহণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সাধারণ বক্তৃতা ও ক্লাশগুলির দ্বারা স্বামী তুরীয়ানন্দের আরও ব্যক্তিগত এবং ঘনিষ্ঠ শিক্ষাদানের পথ পরিষ্কৃত হয়। মহাজ্ঞানী স্বামীজী যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত বৈদান্তিক ভাব ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তদ্ব্যতীত সাধারণ লোক স্বামী তুরীয়ানন্দের একাগ্র ও একনিষ্ঠ জীবন বুঝিতে পারিত না। ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষার্থিগণের ধারণা যেরূপই হউক না কেন, যে কোন প্রকারে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। তাঁহার নিকট অন্য সব ছিল অসার বাগাড়ম্বর মাত্র।

পূর্ব ওকল্যাণ্ডে মিঃ এফ্ এস্ রোডহ্যামেলের গৃহে সাত সপ্তাহ ধরিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ দুইটী সাপ্তাহিক ক্লাশ করিয়াছিলেন—শুক্রবার সন্ধ্যায় ও শনিবার সকালে। সেই সময় শুক্রবারের রাত্রি-গুলি তিনি রোডহ্যামেলের বাড়ীতে অতিবাহিত করিতেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দকে অতিথিরূপে পাইয়া মিঃ রোডহ্যামেল এবং তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার দ্বারা মিঃ রোডহ্যামেলের গৃহে যে অদ্ভুত আবহাওয়া সৃষ্ট হয় তাহা বহু বৎসর যাবৎ প্রাণপ্রদ ও বাস্তব ছিল। মিঃ রোডহ্যামেল বলেন, "এইরূপ দিব্য আবহাওয়া বিরাট ব্যক্তিত্ব দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সকল দিনের পুণ্য স্মৃতি বিশ পঁচিশ বৎসর পরেও আমার মনে জাগরূক আছে। তাহা কোন বিশেষ ঘটনার স্মৃতি নহে। যে স্বর্গীয় প্রভা মনকে পূর্ববৎ এখনও সংসারে অনাসক্ত করে ইহা যেন তাহারই স্মৃতি! ইহা বিস্মৃত হইবার নহে। আমার গৃহের এক দিক হইতে অন্য দিক পর্যন্ত পায়চারি করিতে করিতে হরি মহারাজ 'হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ' উচ্চারণ করিতেন। ওঁ-এর ম শব্দটীর উপর তিনি এমন টান দিতেন যাহাতে ইহা ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইত।"

মিঃ রোডহ্যামেলের গৃহস্থিত ভোজনালয়ের দক্ষিণ জানালাটী বিশেষ ভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের পুণ্য স্মৃতিমণ্ডিত। এই জানালার পার্শ্বে বসিয়া প্রত্যহ সকালে প্রাতরাশের আধঘণ্টা পূর্বে তিনি গীতার সংস্কৃত শ্লোকাবলী অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার সুগভীর সুললিত কণ্ঠস্বরে সমগ্র গৃহ আন্দোলিত হইত। সেই মধুর ধ্বনিতে যে ছন্দ সৃষ্ট হইত তাহাতে গৃহের প্রত্যেকেই পুলকিত চিত্তে সাড়া দিত। তিনি একটী চেয়ারে মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া বসিতেন, তাঁহার মস্তক উন্নত, এবং একদিকে একটু হেলান থাকিত, চক্ষু অর্ধনিমীলিত এবং দৃষ্টি জানালার বাহিরে সুদূর দক্ষিণে প্রসারিত। আবৃত্তির সময় তাঁহার শরীর তালে তালে দুলিত। এই সকল সময়ে গৃহের শিশুরা তাঁহার পদতলে বসিয়া শিশুসুলভ বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে (জুন, ১৯২৩) প্রকাশিত মিঃ এফ এস রোডহ্যামেলের প্রবন্ধের অনুবাদ।

থাকিত। তাঁহার প্রেমপূর্ণ ও চুম্বকবৎ আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করিত। মাঝে মাঝে তিনি শিশুদের প্রতি সহাস্য বদনে তাকাইতেন এবং নামিয়া তাহাদের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেন। কিন্তু তাঁহার আবৃত্তি পূর্ববৎ চলিত, বন্ধ হইত না। কখনও বা তিনি প্রাতরাশ প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত আবৃত্তি করিতেন, কখনও বা উঠিয়া রান্নাঘরে যাইতেন এবং গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী রোডহ্যামেলের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রাতরাশ পাক-প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি আমেরিকার পাক-প্রণালী দেখিতে পছন্দ করিতেন এবং কী ভাবে ভারতে বিবিধ উপাদেয় আহার্য ও পানীয় প্রস্তুত হয় তাহা বিস্তৃতভাবে গৃহকর্ত্রীকে বলিতেন। যখন আহার প্রস্তুত হইত তখন রান্নাঘরকে তিনি প্রিয়জ্ঞান করিতেন। তিনি রান্নাঘরে পায়চারি করিতে করিতে কখনো আবৃত্তি, কখনো বা গল্প করিতেন, কদাচিৎ কখনো বা বালকসুলভ ক্রীড়াপ্রিয়তার বশে থালাগুলিতে আহার্য সাজাইতেন। যখন সকলে টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া প্রাতরাশ খাইতেন, তিনি কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক বলিয়া উহাদের অনুবাদ করিয়া বুঝাইতেন। নির্দোষ আমোদ এবং গল্প দ্বারা তিনি আহারের সময়টি আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। তিনি বস্তুতঃ উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

সান্ধ্য ও প্রাতঃকালীন ক্লাশের প্রাক্কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্ব ওকল্যাণ্ডের রাস্তাগুলিতে দীর্ঘ ভ্রমণ করিতেন। মিঃ রোডহ্যামেল ভ্রমণ কালে তাঁহার সঙ্গী হইতেন। মিঃ রোডহ্যামেল বলেন, "সেই ভ্রমণ সাধারণ নহে, বিস্মৃত হইবার নহে। তাহাতে পরিব্রাজক-জীবনের আস্বাদ পাইয়াছি। স্বামীজী যখন গল্প বলিতেন তখন এক নূতন জগতের চিত্র আমার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিত। যে জড় জগতে আমরা ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা হইতে উপরোক্ত জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুদূরে যেথায় চক্রবাল ভাবজগৎকে পর্দার মত আবৃত করে তথায় যেন শুভ্র, সুদীপ্ত মন্দির-চূড়া দেখা যাইত। একই যাদুপ্রভাবে গেরুয়াধারী বেদান্তচর্চারত সন্ন্যাসিগণ বনরাজিমূলে দৃষ্টিগোচর হইতেন এবং অসংখ্য প্রকার রঙিন ফুলের বাগানে ফুল-গাছের ফাঁকে ফাঁকে গেরুয়া রঙ উঁকি মারিত। শান্ত, সমীরণ-স্নিগ্ধ ও অরুণালোক-স্নাত প্রাতে বা অস্তগামী সূর্যের মৃদু কিরণোদ্ভাসিত সন্ধ্যায় স্বামীজীর পূতসঙ্গে যখন বেড়াইতাম তখন মনে হইত আমি যেন হিমালয়ের শীতল ছায়ায়, বা মন্দিরময় তীর্থে বা আশ্রমে আছি। এই সকল আশ্রমের কথা ভাবিলে মন স্বতঃই অন্তর্মুখী ও ধ্যানপ্রবণ হইত। যদিও সান-আন্তোনিও উপত্যকায় অবস্থিত শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে বাস করিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, তথাপি তাঁহার এই অদীর্ঘ সৎসঙ্গেই সেই অভাব মিটিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সরল বন্ধুভাবে মিশিলেও আদর্শ আশ্রমের অভিজ্ঞতা উপলব্ধ হইত।"

ক্লাশেও তিনি আশ্রমের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন। ক্লাশে ছাত্রসংখ্যা ২০ হইতে ৩০ পর্যন্ত হইত। শাস্ত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি সমাগত নরনারীগণের কুশল সংবাদ গ্রহণান্তে একটী বড় আরাম-কেদারাতে বসিতেন। কখনও বা তিনি স্বীয় কক্ষে উপবিষ্ট থাকিতেন যতক্ষণ না ছাত্রছাত্রীগণ সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেন। তারপর তিনি সংযত ও সমাহিত চিত্তে আবৃত্তি করিতে করিতে পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিতেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব না

আসা পর্যন্ত আবৃত্তিরত থাকিতেন। শ্লোকাদি আবৃত্তির দ্বারা ক্লাশের উদ্বোধন ও সমাপ্তি হইত। তিনি সাধারণতঃ অন্তর্মুখী হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করিতেন। ছাত্রছাত্রীগণও তৎশ্রবণে অনুরূপ উচ্চারণ শিখিয়াছিলেন। কখনও বা তিনি 'হরি' বা 'তৎসৎ' এর সহিত ওঙ্কার সংযোগ পূর্বক উচ্চারণ করিতেন। ক্লাশের সময় তাঁহার পার্শ্বে বেতের টেবিলের উপর বৃহৎ সংস্কৃত গীতা খানি থাকিত। কিন্তু তিনি কখনও তাহা ক্লাশের সময় খুলিতেন না।

ক্লাশের পরে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করিতেন। ছাত্রগণ চলিয়া গেলে মিঃ রোডহ্যামেলের পরিবারবর্গ এবং দুই একজন অতিথি তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেন। তাঁহার গল্প-ভাণ্ডারটী ছিল বিশাল ও বিচিত্র। গল্প বলিবার সময় তাঁহার সহজ ও শ্রেষ্ঠ ভাবটী প্রকাশ পাইত। এই সময় তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার কথা বলিতেন। যিনি জগন্মাতাকে সাক্ষাৎ ভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তাঁহার পক্ষেই এইরূপ প্রাণমাতান প্রসঙ্গ করা সম্ভব। দার্শনিক চিন্তার নিছক মানসিক পরিতৃপ্তি হইতে তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথে পরিচালিত করিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "দর্শনশাস্ত্র বা গীতা পাঠই প্রগাঢ় ধর্মসাধন নহে। জগন্মাতাকে জানাই মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাই ধর্মের সার ও শেষ কথা। অন্য সকল বিষয় অবান্তর।" তিনি আবার বলিতেন, "তোমার সকল দুঃখ কষ্টের কথা মাকে জানাও। তিনিই সব দুঃখ দূর করিবেন।" একজন প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী, কিরূপে তিনি সকল দুঃখ দূর করিবেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে তাঁহার কাছে টানিয়া লইয়া। যখন তুমি মাকে জানিবে তখন কোন কিছুতেই লাভ ক্ষতি হইবে না।"

আর একজন—মা কি সত্যই কাহারো জীবনের খুঁটিনাটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? স্বামী—নিশ্চয়ই। কেন নয়? প্রশ্ন—কিরূপে? উত্তর—বোধশক্তি বা বিবেক দানে। যখন সব কিছুই তাঁহাকে নিবেদন করা হয় তখন প্রত্যেক বস্তুকে নূতন আলোকে দেখা যায়। তখন তুমি জানিবে, এই জীবন কত অনিত্য, কত অসার।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকার ধর্মশিক্ষার্থিগণের আধ্যাত্মিক অক্ষমতা ও সম্ভাবনা সমূহ উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং প্রশ্নোত্তর, পরামর্শ এবং ধর্মসাধনে সাহায্যদানে তাঁহাদিগের সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি শুধু ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন না, তিনি উচ্চ শ্রেণীর ধর্মাচার্যও ছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও উদাহরণ সমভাবেই নূতন প্রেরণা দিত, এবং বৃহত্তর ভাবভূমিতে আরূঢ় করিত।

শিশু ও খেলা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম-এ

শিশুর জীবনে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে খেলার মধ্যে সে অপরিসীম আনন্দ লাভ করে। খেলার প্রতি শিশুর তীব্র আকর্ষণ সম্বন্ধ গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে খেলার সম্বন্ধ খুবই নিবিড় এবং খেলা শিশুর একটা সহজাত সংস্কার। তবে এ কথা ঠিক যে, খেলার প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র শিশুর জীবনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মনুষ্যজীবনের পক্ষে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত লাজারাস্ বলেন, মানুষের জীবন কায়িক ও মানসিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। যখন এই শক্তিগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের মন ও শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠে, তখন আমরা খেল্‌তে চাই, কারণ খেলার ভিতর থেকে যে আত্মহারা আনন্দ আমরা লাভ করি, সে আনন্দ নিয়ে আসে অদ্ভুত কর্ম্মপ্রেরণা এবং অদম্য উৎসাহ।

শিশুজীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাতত্ত্ববিশারদ ফ্রোএবেল-এর নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। শিশুদের শিক্ষার জন্য তিনি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেছেন। তিনি বলেন, খেলা থেকে শিশু যে আনন্দ লাভ করে সে আনন্দের ভিতর দিয়ে শিশুর জীবন সহজভাবে বিকশিত হয়ে উঠে। এই সত্যটিকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তাঁর কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী।

চিন্তাশীল মনীষী বল্ডউইন আরও একটু এগিয়ে গেলেন। তিনি মনে করেন, খেলার সহজাত স্পৃহা নিয়েই শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং খেলা থেকে যে শক্তি সে অর্জ্জন করে সে শক্তির উপর তার আগামী জীবন বিশেষভাবে নির্ভর করে। তা'ছাড়া জন্ম থেকেই শিশুর মধ্যে কতকগুলো অনিয়ন্ত্রিত শক্তি দেখা যায়। মনীষী কার্লগ্রস-এর মতে এই শক্তিগুলো তখনই সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারে, যখন শিশু খেলার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ লাভ করে। যে মৌলিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে শিশুর খেলা-স্পৃহা বেড়ে উঠে, সে সংস্কারটি হল অনুসন্ধিৎসা। তা'ছাড়া এই মৌলিক সংস্কার থেকে অন্যান্য যে সব সংস্কারের উদ্ভব হয় সে সংস্কারগুলোর প্রভাবও শিশুর খেলার মধ্যে ফুটে উঠে।

মানুষের মন কখনও নিশ্চল হতে চায় না। চলার গতির মধ্যে মন অদ্ভুত আনন্দ পায়। নূতন পৃথিবীতে এসে শিশু যখন ধীরে ধীরে আত্মবোধশক্তি লাভ করে, তখন মনের গতিশীলতার মধ্যে সে প্রাণের আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে শিশু-মনের গতিশীলতা কতকগুলো বিশেষ স্তরের ভিতর দিয়ে বিবর্ত্তিত হতে থাকে। প্রথমতঃ নিশ্চল অবস্থা থেকে শিশু যখন চলতে শিখে তখন সে কারও বাধা পছন্দ করে না। মনের আনন্দে সে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে ভালবাসে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার মধ্যে সে অনুভব করে অপরিসীম আনন্দ। যে সব জিনিষ সে দেখে সেসব জিনিষের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, স্থান এবং দূরত্ব লক্ষ্য করবার বাসনা তার মনে ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠে। ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি বেড়ে যায়। মনে মনে কল্পনার জাল বুনে সে যথেষ্ট আনন্দ পায়। শিশুর কায়িক এবং মানসিক শক্তি খেলার প্রকার-

ভেদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূতের গল্প কিংবা জানোয়ারের গল্পে সে অদ্ভুত আনন্দ লাভ করে। এখানে সে তার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করবার সুযোগ পায়।

তারপর যাদের সান্নিধ্যে শিশু বাস করে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সে অনুসরণ করতে চায় এবং তাদের কথাগুলো উচ্চারণ করবার জন্য সে সচেষ্ট হয়ে উঠে। এর প্রধান কারণ হল এই যে, শিশুর জীবনে একটা সহজাত ছন্দবোধ বর্ত্তমান। এই ছন্দবোধ শিশুর ক্রীড়া-স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

শিশু-মনের গতিশীলতা যখন তৃতীয় স্তরে এসে পৌঁছে, তখন শিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠে। খেলা অথবা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীদিগকে পরাজিত করবার জন্য সে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-স্পৃহা শিশুর জ্ঞানার্জ্জনের বাসনা তীব্র করে তোলে এবং শিশুমনে এক প্রবল কর্ম্মপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

নিয়মবদ্ধ খেলার ভিতর দিয়ে শিশু শিখে কর্ম্মনিষ্ঠা, একতা, বাধ্যতা এবং কার্য্যতৎপরতা। এইজন্য খেলাকে ভিত্তি করে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী হ'ল খেলার ছলে শিক্ষা দান করবার একটা সাধু প্রচেষ্টা। পুতুল-খেলা শিশুর কাছে খুবই প্রিয়। এই পুতুল-খেলার ভিতর দিয়ে গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করতে শিশু সমর্থ হতে পারে। পুতুল-গণনার সাহায্যে শিশুকে অঙ্ক শিখান খুবই সহজ।

খেলার প্রতি শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করে চিন্তাশীল মনীষী স্পেন্সার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, খেলার প্রতি শিশুর আকর্ষণের প্রধান কারণ হল শক্তির আধিক্য। তিনি বলেন, শিশুর শরীরে প্রয়োজনের চাইতে যেটুকু শক্তি বেশী থাকে, সেটুকু শক্তি খেলার ভিতর দিয়ে শেষ হয়ে যায়। তবে স্পেন্সারের অভিমতকে অনেকক্ষেত্রে সমর্থন করা যায় না, কারণ যে অতিরিক্ত শক্তির উপর তিনি জোর দিয়েছেন সে শক্তিকে অনেক সময়ে শিশুর ক্রীড়া-স্পৃহার প্রধান কারণ বলে মেনে নেওয়া অসম্ভব মনে হয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখি, অত্যধিক শক্তি না থাকা সত্ত্বেও শিশু খেলায় প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। খেলা-স্পৃহা মানুষের সহজাত সংস্কার। মনীষী শিলার বলেন, খেলার ভিতর দিয়ে মানুষ পূর্ণ মানবত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়।

স্রোতের ফুল

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

বনে
নিরজনে
কত ফুল সনে
ফুটেছিনু আমি
গন্ধহীন, রূপহীন
ফুল হ'য়ে।

ভ্রমর আসে নি কভু
আমার সকাশে।
নিরাশে
সমীরণ গেছে দূরে।
উপেক্ষিত
লজ্জিত
ছিনু ফুটে এককোণে

দিন শেষে
পড়েছিনু খসে
স্রোতস্বিনী বুকে—
কুলু কুলু রবে
ফুল বন ছুঁয়ে
যে নদীটি চলেছিল বেয়ে।

কেউ তো ভাবেনি মোর কথা
মোর ব্যথা
মোর নীরবতা
দেয়নি তো সাড়া
ধরিত্রীরে।

অর্ঘ্যের অযোগ্য আমি।
মালাকর মোরে নাহি চায়
মালা তার করিতে রচনা।
রহি অজানা
রূপের মেলায়—
পড়ে থাকি ধূলিকণা সাথে।

দিন শেষ আজ
নদীর স্রোতের সনে
চলেছি ভাসিয়া
হয়তো বা
সাগরের পানে।

* * *

অপরাহ্ন বেলায়
এসেছিলে
নদী জলে
সিনান করিতে।
আমি চলি ভাসিতে ভাসিতে
অনন্তের পানে।

জলে নামি করিয়া সিনান
দেবতারে অর্ঘ্য দিতে
হাত জোড় করি
তাকালে যখন
হেরিলে আমায়।
কত করুণায়
তুলি নিলে স্রোত হ'তে
করপুটে তব।
পরশ তব পাইনু যখন
বিদ্যুত খেলিয়া গেল দেহেতে আমার।

হেরি চারিধার
ভাবিনু চকিতে
'কোথা হ'তে এত রূপ
এলো দেহে মোর—
স্পন্দন পাইনু যার
প্রতিটি শিরায় ?'

কাঁপিয়া উঠিল মন
সে রূপ-শিখায়।
অঙ্গ মোর ভরে গেল
কোন্ এক দিব্য লালিমায়।
অঙ্গের লাবনী হেরি
বক্ষ মোর দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

বাতাস আকুল হ'লো
সুবাসে আমার।
কেড়ে নিতে চায়
যতটুকু পায়
সে সুবাস দেহ হ'তে।

সুধারসে বক্ষ মোর
ভরে গেল কানায় কানায়
প্লাবনের জলসম।

* * *

রূপ রস গন্ধে আমি
হইয়া গরবী
তোমার অঞ্জলি মাঝে
রহিনু মাতিয়া।
মন্ত্র উচ্চারিয়া
তুমি মোরে অর্ঘ্য দিলে
তাঁহার উদ্দেশে।

তোমার অঞ্জলি হ'তে
ছিন্ন হ'য়ে যবে
নদী বক্ষে পড়িনু আসিয়া
হেরিনু ফিরিয়া—
আমার আমিত্ব সব
ফেলেছি হারায়ে।
কুসুমত্ব মুছে গেছে
রূপ রস গন্ধ মোর
সব মিশে গেছে
অনন্তের সনে।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের দর্শনে

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন ভবানীপুরে থাকি, কাজেই গদাধর আশ্রমে যাতায়াতের বেশ সুবিধা ছিল। এই আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বামী কমলেশ্বরানন্দজীর ভালবাসা প্রাণকে অধিকার করে বসেছিল। গদাধর আশ্রমে তাঁর সংগৃহীত অসংখ্য বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির সমাবেশ। শ্রদ্ধেয় মহারাজের সহিত কাজেই শাস্ত্রীয় আলাপের বেশ সুবিধা হ'ত। তিনি বেদাদি সম্বন্ধে অতি আগ্রহভরে নানা শিক্ষাই দান করতেন। এই ভাবে আশ্রমের পবিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে কখন কখন ২।৪ দিন এক টানাই কেটে যেত। একদিন কমলেশ্বরানন্দজী বল্‌লেন, "উ-বাবু, বয়স হ'য়ে যাচ্ছে ত, দীক্ষা নিন। কার উপর ভক্তি হয় বলুন। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আছেন, পূঃ শরৎ মহারাজ আছেন, পূঃ খোকা মহারাজ আছেন। যাঁর উপর ভক্তি হয় বলুন, আমি তাঁকে আপনার জন্য চিঠি লিখে দেব। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর ত ভালবাসা একটু একটু হ'য়েছে, এখন দীক্ষা নিলেই ভাল হবে।" মনে অনেক চিন্তা এল। দীক্ষা গ্রহণ করলে নিয়মমত সাধন ভজন করার দরকার এবং তজ্জন্য মনকে স্থির করাও আবশ্যক। কিন্তু কতকগুলি সাংসারিক প্রতিকূল অবস্থার জন্য কি করে মন স্থির হবে এই সব কথা শ্রদ্ধেয় কমলেশ্বরানন্দজীকে নিবেদন করলে তিনি বল্‌লেন,

"য ইচ্ছতি হরিং স্মর্তুং ব্যাপারান্তগতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ॥"

সংসারের প্রতিকূলতার মধ্যেই তাঁকে ভজন করে নিতে হবে। নচেৎ সংসার অনুকূল হবে, তখন ভজন করব মনে কর্‌লে সংসারও অনুকূল হবে না, ভজনও হ'য়ে উঠ্‌বে না। অতএব দীক্ষা লওয়া সম্বন্ধে মন স্থির করে ফেলুন।" অনেক চিন্তার পর মন স্থির করা গেল এবং পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজের নামে পত্র দিবার জন্যই তাঁকে অনুরোধ কর্‌লুম। তিনিও সানন্দে স্বীকৃত হলেন। পরদিন আশ্রমে এসে শুনলুম হঠাৎ স্বামী কমলেশ্বরানন্দজী গত রাত্রিতে পুরীধাম যাত্রা করেছেন। দুঃখভারাক্রান্ত মনে আশ্রমে অবস্থান কচ্ছি, মনের অবস্থাটি মুখের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। জনৈক স্বামীজি আমাকে তদবস্থায় দেখে সহানুভূতিপূর্ণ ভাবে আমাকে আমার মানসিক উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। সমুদয় অবগত হ'য়ে তিনি আমার দীক্ষার জন্য একখানি অনুমোদনপত্র পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নামে লিখে আমার হাতে দিলেন।

এই অভাবনীয় ব্যাপারে আনন্দবিহ্বল প্রাণে বেলুড় মঠে যাত্রা করলুম। প্রাতে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে উপস্থিত হলুম। ঘরে ২।১ জন ভক্ত ও সাধু উপস্থিত ছিলেন। অতি সুগঠিত তাঁর পাদপদ্মযুগল, বাহুদ্বয় ও বিশাল বক্ষ, পরম পবিত্র ভাবব্যঞ্জক চক্ষুদ্বয় ও মুখমণ্ডল, এবং গৌরকান্তি বিমুগ্ধ নেত্রে দর্শন কর্‌তে লাগলুম। ক্রমশঃ দীক্ষার প্রস্তাব কর্‌লুম। তিনি আমার প্রতি করুণাপরবশ হ'য়ে আমাকে দীক্ষাদানে স্বীকৃত হ'লেন ও তাঁর পার্শ্বস্থিত টেবিলের উপর হ'তে পঞ্জিকা খানি গ্রহণ করে দীক্ষার দিন স্থির করে দিলেন। আমি যেদিন গিয়েছিলুম

তার দু'দিন পরে ১৯২৫ সালের ১০ই জুলাই আষাঢ় কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি। গদাধর আশ্রমের মহারাজের পত্রখানি আমার হাতেই ছিল, তখন পর্য্যন্তও দেওয়া হয়নি। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন—আমার হাতে উহা কি, তখন যেন চমক ভাঙ্গল, চিঠির বর্ণনা দিয়ে তা' তাঁর শ্রীহস্তে অর্পণ করলুম। তারপর যথানির্দ্দিষ্ট দিনে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে দীক্ষা দান করলেন।

বাস্তবিকই গুরুহীন জীবন কাণ্ডারীহীন নৌকার মত, কূলে পৌছাতে পারে না। গুরু ত মানুষ নন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। গুরু হ'য়ে গেল ত তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসতে পাওয়া গেল। গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নেই। গুরুর কৃপাবলে সব গেরো এক মুহূর্ত্তে খুলে যায়। গুরুর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সদ্গুরু লাভ হ'লেই জীবের উদ্ধার।" শ্রীশ্রীমা বলেছেন, "ঠাকুরই সব, তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।" পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যে ব্যক্তির আত্মা হ'তে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু বলে।" পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলেছেন, "গুরুতে আশ্রিত শিষ্যের কোন অমঙ্গল হ'তে পারে না।" স্বয়ং শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন, "গুরু, ইষ্ট একই, গুরু স্বয়ং ভগবান, মানুষ কখনও গুরু হ'তে পারে না। যখন কোন সদ্গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন, তখন স্বয়ং ভগবানই সেই গুরুহৃদয়ে আবির্ভূত হ'য়ে শিষ্যের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করেন।" পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী বলেছেন, "সহস্রারস্থিত পরমশিব ইষ্টের নিগুর্ণরূপ কুণ্ডলিনীর সহিত সহস্রারস্থিত শিবের মিলন যিনি করাইয়া দেন, তিনিই গুরু। পরিশেষে গুরু ইষ্টে লয় হন। অর্থাৎ গুরু ও ইষ্ট সহস্রারস্থিত পরমশিবের প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি হয়।" পূজনীয় লাটু মহারাজ বলেছেন, "শ্রীগুরুতে যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস আছে, তার অনিষ্ট হবার যো নাই। গুরুর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। গুরু ও ইষ্ট একই জান্‌বে। গুরুই সচ্চিদানন্দ। যে ভগবানকে দেখেছে, সেই গুরু হ'তে পারে।"

৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন, "গুরু কৃপাদৃষ্টি দ্বারা জীবাত্মাকে মায়ামেঘ হ'তে মুক্ত করেন।" যোগী গম্ভীরনাথজীর উপদেশে আছে "শিষ্যের গুরুই সর্ব্বস্ব। গুরু শিষ্যের জ্ঞানদাতা ও মুক্তিদাতা। অদ্বৈতপ্রসবিনী মোক্ষবিধায়িনী বিদ্যাশক্তিই ঈশ্বরের গুরুশক্তি। ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠতমা অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত যুক্ত হইয়াই গুরু।" শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলেছেন—

"গুরু কৃষ্ণরূপে হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

অতএব দেখা গেল যে সকল মহাপুরুষই গুরুর মহিমা এক বাক্যে স্বীকার করছেন ও গুরুরূপে ভগবানের জীব-উদ্ধারকারিণী শক্তি সম্বন্ধে তাঁরা সকলেই একমত।

পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজের মধ্যে এই শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাই পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ স্বামী বলেছিলেন, "মহাপুরুষ মহারাজকে দেখেছ ত? তাঁর শেষ জীবনে তিনি যেন করুণার অবতার হ'য়ে গিয়েছিলেন। অমন দয়া, প্রেম, ভালবাসা ও কৃপার ভাব আর কারো দেখিনি। তাঁকে দেখে আমার চোখ খুলে গেছে। ······যেন স্বয়ং ঠাকুরই তাঁর শরীর আশ্রয় করে জীবোদ্ধার করে গেলেন। মহাপুরুষজীর সেই ভাবটিই আমার ভিতর ঢুকে গেছে।····· তাঁর দেহত্যাগের পর ঠাকুর যেন আমার ঘাড় ধরে মহাপুরুষজীর সেই অসমাপ্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।"

দীক্ষান্তে নিয়মিত ভাবে মঠে আসা যাওয়া হ'তে লাগ্‌ল। তাঁকে যেরূপ ভাবে দেখ্‌তুম বা

তাঁর যে যে বাণী শুনতুম, তারই দু একটীর আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে। অতি গম্ভীর মহাপুরুষ মহারাজকে সদা প্রফুল্ল ও আনন্দময়রূপেই দেখেছি। আত্মানন্দে বিভোর এই মহাপুরুষকে গম্ভীর মূর্ত্তিতে দেখেছিলুম সেই দিন, যে দিন পূজনীয় শরৎ মহারাজ মহাসমাধি লাভ করেন। দাহক্রিয়ার অন্তে আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ অনবরত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দান করতে লাগ্‌লেন। তাঁর তখনকার অবস্থাটি ঠিক যেন 'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ' এর ন্যায়। আর একদিন তাঁর ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি দেখেছিলুম এক সূর্য্য গ্রহণের দিন। তিনি মঠের পূর্ব্ব বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট, মন কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে যেন চলে গেছে। সেই অন্তর্মুখীন ভাব ও গম্ভীর বদন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সে দৃশ্য ভুল্‌বার নয়।

একদিন ছিপ দিয়ে মাছ ধরার কথায় বল্‌লেন, "এ বিষয়ে আমি বৌদ্ধ। এমন করে মাছ ধরা খুব অন্যায়। মাছ যদি খেতেই হয় ত জাল দিয়ে ধর, খাও, ব্যস।" একদিন মঠে পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণাদি সাঙ্গ হ'য়ে যাওয়ার পর তিনি মঠের পশ্চিমের বারান্দায় বেঞ্চের উপর উপবেশন করলেন ও যখন শুন্‌লেন যে প্রসাদদানাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'য়ে গেছে—তখন বল্‌লেন, "মহারাজ ভাগ্যবান লোক ছিলেন, হবে না? বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। মহারাজ ভাগ্যবান ছিলেন।" এই কথা বলে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি যে কে ও কত বড় তা স্বামীজী প্রদত্ত তাঁর পবিত্র 'শিবানন্দ' নাম হ'তে কিছুটা অনুমান করা যায়। তিনি শিবস্বরূপ। শিব পরমাত্মারূপী নির্গুণ পুরুষ। সেই নির্গুণ পুরুষ স্বীয় স্বরূপভূত আনন্দে আনন্দিত—তাই তিনি শিবানন্দ। মহামায়ারচিত এই জগৎরূপ ইন্দ্রজালের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিলেন, তবে লীলার আসরে এসেছিলেন বলে জীবের ন্যায় ব্যবহার করতেন। তিনি তারকনাথ, ব্যবহারক্ষেত্রে তিনি জীবত্রাণরূপ কাজই করে গেছেন। নচেৎ স্বরূপতঃ তিনি শিবানন্দ, তিনি অচিন্ত্য, অরূপ, অনন্ত, অমৃত ও অব্যক্ত। মায়াতীত মহাপুরুষ—মায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির প্রভাব হ'তে চিরমুক্ত। তথাপি মায়ার শক্তি উপলব্ধি ক'রে তিনি মধ্যে মধ্যে গাইতেন—'এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে' ইত্যাদি। যাতে অপরেও মায়ার প্রভাব হ'তে মুক্ত হ'তে পারে তাই ছিল তাঁর প্রাণের ইচ্ছা। তাই তিনি বল্‌তেন, "দেখিস্, মায়ায় যেন মুগ্ধ হস্‌নে।" তাঁর গুরুশক্তি এখনও তাঁর সন্তানগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করছে। বিদায় কালে তিনি তাঁর শক্তিকে শিষ্যহৃদয়ে সংক্রামিত ক'রে দেবার জন্য বল্‌তেন, "এসো বাবা, তোমার মনে প্রাণে হৃদয়ে—ঠাকুর সর্ব্বদা রয়েছেন জেনো। তুমি যেখানে যাও, ঠাকুর তোমার সঙ্গে যাবেন, রক্ষা করবেন, কোন সন্দেহ নেই।" সদ্‌গুরু শিষ্যকে এইরূপেই রক্ষা করেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ' এই পবিত্র নামের মহতী শক্তিতে তাঁর যে কি গভীর বিশ্বাস ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জনৈক ভক্তের ছেলের দীক্ষা হওয়ায় বল্‌লেন, "ছেলেকে দীক্ষিত করিয়ে বেশ ভালই করেছ। আমাদের বাবা 'রামকৃষ্ণ' নাম ভরসা। তাই আমরা এই নাম সকলকে দিয়ে থাকি। এ নাম ডঙ্কামারা নাম—এর জন্য তন্ত্রমন্ত্র খুঁজ্‌তে হবে না। এই ডঙ্কামারা নাম যে নেবে মা তাকেই কৃপা কর্‌বেন।" একবার একদিন বৈকালে জনৈক ভক্ত তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ এক দিব্য ভাবের আবেশে বল্‌লেন, 'ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়' এই তোমার মন্ত্র, এই তোমার

দীক্ষা। আমাদের বাবা গোপন মন্ত্র আর কিছু নেই। জান ত, রামানুজাচার্য্য কি করেছিলেন? গুরুপ্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র প্রকাশ করলে তাঁর বিশেষ অপরাধ হবে জেনেও তিনি ঐ মন্ত্রের মুক্তি-দায়িনী শক্তিতে আস্থাবান হ'য়ে জীব উদ্ধারের জন্য জনমণ্ডলীর সাম্‌নে তাঁর ইষ্ট মন্ত্র প্রকাশ করেছিলেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় শ্রীশ্রীমার উপরও তাঁর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। একদিন প্রাতে বলেছিলেন, "আমরা মায়ের বাচ্চা, এ মা কি সংসারের মা? এ মা জগতের মা, জগদ্ধাত্রী, জগজ্জননী।" তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির পার্শ্বেই মায়ের ছবি রাখবার উপদেশ দিতেন। বাড়ীর মেয়েদের সম্বন্ধে বল্‌তেন, "তারা কি সংসার নিয়েই থাক্‌বে? তাদেরও ত ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে হবে। তোমাদের যেমন অধিকার, তাদেরও সেইরূপ অধিকার। সুবিধা মত তাদের একদিন নিয়ে এস। তারা আদ্যা শক্তির অংশস্বরূপিণী বলে জান্‌বে।" তাঁর একদিনের উপদেশ—"তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার স্ত্রী তোমাদের গৃহদেবতার (শ্রীশ্রীকালী) পূজা অবশ্যই কর্‌তে পার্‌বে, তোমার ভাই-এর যদি উপনয়ন হ'য়ে থাকে ত সেও পারে। সেই আরও ভাল।"

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কয়েকটি উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হল:

১। গৃহীর পক্ষে সংসারের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি তাঁরই সংসার, তিনিই সব হয়েছেন এই ভাবে, তাঁর সেবার ভাবে ক'রে যেতে হবে।

২। সংসারে রোগ শোক দুঃখ জ্বালা হয়েই থাকে। এসব ধীরভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে সহ্য কর্‌তেই হবে। ঠাকুরের কথা—শ, ষ, স, যে সয় সে রয়। বিপদের একমাত্র ঔষধ সহ্য করা। সহ্য কর, আবার যথাসম্ভব চেষ্টাও করে যাও, দেখ্‌বে তাঁর কৃপায় সব পাবে।

৩। ঠাকুরই স্বয়ং ভগবান, কৃপা ক'রে আমাদের জন্য নরদেহ ধারণ করেছিলেন একথা সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে। তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু, তাঁকে লাভ করাই, তাঁর স্মরণ-মননে দিনই যাপন করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। অবশ্য তিনি যখন সংসারে রেখেছেন, তখন সংসারের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে। তবে তিনিই তোমার আপনার বস্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হবে।

৪। শরীর নশ্বর, শরীরীর বিনাশ নেই। না জানার জন্যই আত্মীয়ের মৃত্যুতে লোকের দুঃখ শোক হয়।

৫। তিনি যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থায় থেকে তাঁর চিন্তা কর্‌তে পারলেই মঙ্গল।

৬। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের নিত্য গায়ত্রী যথারীতি জপ কর্‌তে হবে। ইষ্ট-গায়ত্রী ইষ্টমন্ত্র-জপের পর করবে। সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নেই, যতটুকু পার করবে।

৭। জপে বসার পূর্ব্বে আচমনটা রাখা ভাল, অবশ্য তাঁর চিন্তা ক'রে বস্‌লেই শুদ্ধ হওয়া যায়। আসন, মুদ্রা প্রভৃতি কর্‌বার প্রয়োজন নেই। যে আসনে বসে জপ ধ্যানের সুবিধা হয়, অর্থাৎ আসনপিড়ি হ'য়ে বসে করাই ভাল। আচমন কর আর না কর, তাঁকে স্মরণ করে ধ্যানজপে বস্‌বে।

৮। ধ্যান জপ উভয়ই সমান। কোনটা ছোট, কোনটা বড় নয়। যখন যেটা ভাল লাগে। জপের সময় ইষ্টমূর্ত্তির চিন্তা কর্‌বে, তা হ'লেই ধ্যানের কাজ হ'য়ে যাবে। ধ্যান-জপের সময় গৈরিক পর্‌তে পার, কিন্তু তারপর উহা ছেড়ে রাখ্‌বে।

৯। জপের দ্বারাই কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ হয়। জাগরণের লক্ষণ—জপে আনন্দ বোধ হওয়া।

১০। বীজ ও নাম একই। নাম যাঁর, বীজ ও তাঁর। নাম এবং বীজ অভেদ।

১১। শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি সম্মুখে রেখে তৎপ্রতি চেয়ে তাঁর চিন্তা করলে নিশ্চয়ই ধ্যান হবে।

১২। ঠাকুরকে এবং আমাদের নিত্য অন্ততঃ একবার করেও স্মরণ করবে শত কাজের মধ্যেও। তা হ'লেই সব হ'য়ে যাবে।

১৩। তাঁর যে প্রিয় সে যে আমাদেরও অতি প্রিয়। তোমাদের এত স্নেহ করি, ভালবাসি, তোমরা তাঁর ভক্ত বলেই; অন্য কিছুর জন্য নয়।

১৪। আমি একজন ভক্ত, জ্ঞানী, অপরের চেয়ে উচ্চ স্তরের ব্যক্তি এই সব ভাব যেন মনে উদয় না হয়। তা হ'লেই সর্ব্বনাশ!

১৫। গীতা পাঠ আবশ্যক। প্রয়োজন হ'লে মধুসূদন সরস্বতীর টীকা—অভাবপক্ষে শ্রীধর স্বামীর টীকা পাঠ করা যেতে পারে। আর বেশী শাস্ত্র পড়ার কি আবশ্যক?

১৬। একাদশী তিথিতে উপবাস না করলেও কিছু কম খাওয়া ভাল। এতে শরীরের দিক দিয়ে যেমন উপকারিতা আছে, মানসিক দিক দিয়েও সেরূপ আছে।

১৭। ঠাকুর সকল প্রার্থনাই শুনেন—স্ফুট, অস্ফুট সমস্ত কথাই তিনি শুনে থাকেন। তবে সব পূরণ হয় না—তার কারণ, কোন্‌টীতে আমাদের মঙ্গল হবে, তা' ত আমরা বুঝি না। যেটিতে জীবের কল্যাণ হয়, অর্থাৎ তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, তা তিনি পূরণ করেন।

১৮। মা-কালীর পূজায় পশুবলি না দিয়ে অনুকল্পে কলা, কুমড়া ইত্যাদি বলি দিতে পার। মা তাতে অপ্রসন্ন হবেন না। শ্রীশ্রীমায়ের পূজা দক্ষিণাকালিকার ধ্যান করেই করবে। তাঁর মধ্যেই সবই আছে জানবে। তিনি মহামায়াও বটেন, আবার মায়ামোচন করেনও বটে।

১৯। ঠাকুর হৃদয় দেখেন, তিনি বাহ্য আচরণ দেখেন না। ঠাকুরকে নিত্য পূজা করবার যদি বাসনা হয়, ভাল কথা। তবে বাবা, আমাদের ভক্তির পূজা। অত বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন নেই, ফুলচন্দন দিয়ে তাঁর শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দেবে ও ভাবের সঙ্গে প্রার্থনা করবে, তা হলেই হ'য়ে গেল। ভক্তি বিশ্বাসই আসল। পূজা যদি ভক্তিহীন হয় তবে তা কিছুই নয়। তোমাদের হৃদয়, মন সবই তাঁর চরণে সমর্পণ করেছ, তোমাদের ভাবনা কি? যে তাঁর চরণে সমুদয় সমর্পণ করতে পারে তার আবার ভাবনা কি?

শুনিতে কি পাও ভাই?

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়

কামনার কারাগারে শৃঙ্খলিত তুমি বন্দী আজি,
তোমার ও বন্দী আত্মা শৃঙ্খলের কঠিন পেষণে
অহরহঃ জর্জরিত, বক্ষে লয়ে বেদনার রাজি
কাঁদ তুমি ওরে বন্ধু, ব্যর্থতার বিষের দহনে।
ক্ষণতরে শান্ত হতে কণ্ঠ ভরি' কামাসব পিয়া,
তাই বুঝি পেতে চাও বিলাসের সম্ভোগ-আশ্লেষ?
বিশ্লেষে বিচারি' বন্ধু, বেশ ক'রে দেখরে ভাবিয়া—
সুধা নহে, শুধু বিষ অতৃপ্তির অগ্নি-পরিবেশ।

বনান্তের বেলা-পারে বিভাম্লান বেলা নেমে আসে,
দেবতা-দেউল মাঝে ওই জ্বলে দীপ আরতির;
বসন্তের আজি দিনে দক্ষিণের বিলোল বাতাসে
ভেসে আসে বন্দনার মিঠাসুর মন্দির-গম্ভীর।
মর্ম্মের মূরতি তব বাঁচিবে কি সে বায়ু-পরশে?
নিভিবে কি জ্বালা তব শঙ্খধ্বনি, আরতির গানে?
রাঘবের পূতস্পর্শ অহল্যার উদ্ধার-মানসে
প্রাণের প্রতিষ্ঠাখানি দিয়াছিল যেমন পাষাণে?

* * *

শঙ্খধ্বনি অশ্রু আনি' মর্ম তব করিবে মধুর;
শুনিতে কি পাও ভাই!—
অ-রতির আরতির সুর?

স্মৃতি ও মেধা

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

মনের দুরধিগম্য জগতে কিছু নাই। যাবতীয় গম্যমান বস্তুর মধ্যে গমনে মনের ক্ষিপ্রকারিতা সর্ব্বাধিক। মন ইন্দ্রিয়পথে বহির্জগতে বিচরণের সময় সর্ব্বদাই অভ্যন্তরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে। সেই সংযোগের সূত্র ধরিয়া বহির্জগৎ অভ্যন্তরের মধ্যে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করিতে থাকে। বিশাল বিশ্ব যেন পথ বহিয়া আর এক শূন্যময় আঁধারের মধ্যে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া উঠে। মনই সেই পথ এবং পথশেষের দ্বার হইল ইন্দ্রিয়-সকল।

জগৎ বহুরূপী। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুসারে ইহা রূপময়, শব্দময়, গন্ধময়, স্পর্শময় ও স্বাদময়। এই সকলই জ্ঞেয় বস্তু এবং ইহার অতিরিক্ত জ্ঞানও ভাবময়। মনুষ্য তাহার সামর্থ্যমত জগতের এই কয়টি অবস্থা সম্বন্ধে পরিচিত। ইহার বাহিরে কিছু থাকিলে মানুষ তাহা ধরিতে অক্ষম। কেহ যদি ইন্দ্রিয়বিশেষ হইতে আজন্ম বঞ্চিত থাকে, সেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য জগৎ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অন্ধ। সেই দ্বারের মধ্য দিয়া বিশ্ব সংসার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই দরজার অনুরূপ আর একটি সংসার নির্ম্মাণ করিতে পারে না। সেখানে প্রবেশপথ সকল সময় বন্ধ থাকে। জন্মান্ধ বা জন্মবধিরের কল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বিষয়টি অনুমিত হইবে।

অন্ধের রূপ দর্শন হয় না। তাহার ব্রহ্মাণ্ড শব্দস্পর্শগন্ধ ও স্বাদময়। সেইরূপ বধিরের ভাণ্ডারেও শব্দের অভাব। শব্দগ্রাহক যন্ত্রটিই তাহার বিকল। দর্শন প্রভৃতি অপরাপরগুণে গুণান্বিত অনুমান লইয়াই সে বিচরণ করে। এই সকল অনুমান আভ্যন্তরীণ এবং মনোরাজ্যে সীমাবদ্ধ। মন সক্রিয় ইন্দ্রিয়পথে বহুরূপী জগৎকে অহরহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে থাকে। ইহা তাহার আশৈশব কার্য্য। বয়সাধিক্যে অন্তর্জগৎ ক্রমে বিপুলায়তন হইয়া উঠে। সে ইহারই মধ্যে বিচরণ করে। ইহা তাহার অভিজ্ঞতা। সেই অন্তর্জগতের পাথেয় লইয়াই তাহার বহির্জগতে যাওয়া আসা। ভিতর দেশে বাহির বিশ্বের প্রতিফলনই স্মৃতি। ইহা বাস্তবের আলেখ্য এবং ভাবময়। অনুভূতির মধ্যে তাহার সত্তা। বাহিরের বস্তু যে ইন্দ্রিয়পথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ আর একটি জগৎ গড়িয়া তোলে, তাহা কেবল ভাবের ভিত্তিতেই গঠিত। এক এক সময় সে ভাব এত প্রবল ও আন্তরিক হইয়া উঠে যে, বাস্তবের সহিত তাহার পার্থক্য ভুলিয়া যাইতে হয়। ভাবুকের সেখানে স্বপ্নও সত্যে, চিন্তাও বাস্তবিকতায় একাকার হইয়া যায়। অনেক সময় বাস্তবের ঘটনাকে চিন্তা বা স্বপ্নে দৃষ্ট মনে করে। কখনও বা স্বপ্ন অথবা চিন্তিত বিষয়কে বাস্তব মনে করিয়া সমস্যায় পতিত হয়।

এই জাতীয় অবস্থা হয় তাহাদের যাহারা প্রায়ই বাহ্যিক জগৎ ছাড়িয়া দিয়া সাধ করিয়া ভিতরে স্মৃতির মধ্যে প্রবেশ করে। প্রবেশের গভীরতা অনুসারে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ক্ষীণ এবং ক্রমে নিরুদ্ধ হইতে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় বহির্বিভাগে ইন্দ্রিয়ের কাজ ও মানসপাতে স্মৃতির পট-পরিবর্ত্তন একযোগেই চলিতে থাকে। দর্শন বা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির ক্রিয়া না হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় না। বস্তুবিশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে বা

শব্দবিশেষ কর্ণগোচর হইলে স্মৃতি বলিয়া দেয় উহা কোন বস্তু বা কিসের শব্দ। তাহাই জ্ঞান। কবে কোন্‌দিন ঐ জাতীয় পদার্থের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, মনের মধ্যে তাহার চিত্র অঙ্কিত হইয়া আছে। উহার পুনরুন্মীলনই জ্ঞান। তাহা স্মৃতির কাজ। স্মৃতি সেই সময় একটিমাত্র চিত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় না। পর পর সেই জাতীয় এবং তাহার পারিপার্শ্বিক তথ্যসম্বলিত অনেক চিত্রই দেখাইবার আগ্রহ প্রকাশ করে; কিন্তু মন আবার বহির্বস্তুর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে জ্ঞান হওয়ামাত্রই বাহিরে চলিয়া আসে। কতগুলি সমধর্ম্মের ছবি মনের মধ্যে রূপায়িত হইতে না হইতেই আবার মিলাইয়া যায়। মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হয়। স্মৃতি এই ভাবে ইন্দ্রিয়ের সহিত একত্র হইয়া যৌথ কারবার করে।

মনের ফলকে পূর্ব্বপ্রতিফলিত দৃশ্যের যথাসময়ে বা দ্রুত পুনরাবির্ভাবের নাম মেধা। স্মৃতির কার্য্য স্মরণ। মেধা স্মরণেরই নামান্তর মাত্র। যাহার মধ্যে স্মরণকার্য্যের ক্ষিপ্রকারিতা অধিক তাহাকেই মেধাবী বলে। ইহার অভাব হইলেই দুর্মেধ বা মেধাহীন আখ্যা পায়। পরিস্ফুট ও স্পষ্ট চিত্রই পরিষ্কার দেখা যায়। যে চিত্র অস্পষ্ট, যাহার ছাপ ভাল করিয়া উঠে নাই, সে ছবি দেখিতে বা বুঝিতে বিলম্ব লাগে। অনেক সময় বহু সময় ক্ষেপণ করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং মনের পাতে অঙ্কিত বিষয়ের স্পষ্টতার উপর তাহার উদ্ধার কার্য্য অর্থাৎ স্মরণ বা মেধার প্রাখর্য্য নির্ভর করে। ফুটাইয়া লিখিতে পারিলেই পড়িবার সময় লেখা সহজবোধ্য হইয়া উঠে। ভিতরের ফলকতলে বাহিরের ছাপ উঠাইবার সময় মনের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাইলেই ছাপটি গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। তখন তাহাকে সহজেই দেখিতে পারা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্যের সঙ্গে মনোযোগিতাই মেধাশক্তির কারণ। যে যত অমনোযোগী তাহার মেধা তত ক্ষীণ। স্মৃতি তাহার দুর্ব্বল।

যাহারা মেধাহীন বলিয়া জগতে কুখ্যাত, তাহাদের মধ্যে এমন বড় দেখা যায় না যে তাহাদের মেধাশক্তি সকল বিষয়েই সমানভাবে নিষ্ক্রিয়। এক বিষয়ে স্মরণশক্তি ক্ষীণ দেখা গেলেও বিষয়ান্তরে তাহার তীব্রতা লক্ষিত হয়। ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় অনেকে পাঠ্য বিষয় মনে রাখিতে পারে না, কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী ঠিক মনে করিয়া রাখে। কবে কোন্ দিন বায়স্কোপ দেখিয়াছিল, তাহার ঘটনাও কিছুমাত্র ভুলিয়া যায় না। শৈশবকালের ঘটনাও মানসপত্রে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছে। তাম্র বা শিলা স্তরের কঠিন গাত্রে সাধারণ লেখার ছাপ পড়ে না; কিন্তু খোদাই করিয়া লিখিলে সকল লেখাই স্থায়ী ভাবে ফুটিয়া উঠে। মনোযোগের তীক্ষ্ণাগ্র লেখনী না পাইলে এ লেখা ফোটে না। এখানে আবার রুচির প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। রুচিকর হইলেই মনোযোগ, অরুচিকর হইলে আর মন বসে না।

ইহা কেমন করিয়া হয়? বস্তুবিশেষে কাহারও রুচি, আবার বিষয়ান্তরে মন তাহার মোটেই বসিতে চায় না। কদাচিৎ বসিলেও ভিন্ন প্রকার ছাপ উঠাইয়া লয়। ইহার কারণ কি? ইহা দ্বারা মনের জাতিধর্ম্ম সূচিত হয়। মুখ্যতঃ সকল মন একই উপাদানের হইলেও তাহার সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন প্রভাব বিদ্যমান। শিশুকালে মন যখন অন্তর্দিক হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহার চিন্তনীয় বিষয়ের কেন্দ্র ও চিন্তার বিস্তৃতি সম্মুখস্থ আদর্শ-অনুরূপে গড়িয়া উঠে। সে আদর্শ পিতামাতা ও পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তির। আর একটু বয়স হইলে সহচর ও প্রতিবেশীর প্রভাবের দ্বারা তাহা সংশোধিত হয়। মন সেই সময় অতিশয়

কোমল। বাহিরের ছাপগুলি স্মৃতিরূপে বসিতে গিয়া এমন ভাবেই বসিয়া যায় যে তাহার সাহায্যে সে তাহার স্বরূপ গড়িয়া তোলে। পরিণত বয়সে সে স্বরূপ বর্জ্জন করিবার আর উপায় থাকে না। মূর্তি গড়িবার সময় মাটির মধ্যে যে উপাদান মিশাইয়া দেওয়া হয়, গঠন হইয়া গেলে আর তাহাকে বাদ দেওয়া যায় না। ইহাই মনের স্বাভাবিক ধাত। এই ধাতের মধ্যে অনেক সময় বাহ্যিক প্রভাবের সহিত একটা স্বাতন্ত্র্য মিশ্রিত থাকে। ইহা কখন অব্যক্ত কখনও বা পরিস্ফুট ভাবে দেখা দেয়; তাহাই ব্যক্তিটির মনের নিজস্ব রূপ। সেই রূপ লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত জানিতে গেলে জন্মেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কথা আসিয়া পড়ে।

যাহাই হোক, মনের ধাত অনুসারে তাহার রুচি সূচিত হয় এবং রুচি অনুসারে তাহার আগ্রহ ও একাগ্রতা। একাগ্রতা পাইলেই স্মৃতির পাতের অক্ষরগুলি পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। দেখিবামাত্রই উদ্ধৃত হয় ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্মৃতির আধার মন এবং মনের সাহায্যেই ছাপগুলি প্রতিফলিত হয়। ইন্দ্রিয়-পথের মধ্য দিয়া মনের আলোক বহির্বস্তুর উপর পতিত হইয়া ভিতরদেশে তাহার একটি আলোকচিত্র অঙ্কিত করে। এই চিত্রগ্রহণ জন্মের পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেও মানুষ নূতন চিত্র উঠায়। তখনও জ্ঞান সঞ্চয় করে। কিন্তু সে জ্ঞান তাহার কিসে লাগিবে? সে তো সমস্তই শেষ করিয়া মহা-যাত্রার অপেক্ষা করিতেছে। হয়তো পরজন্মে কাজে লাগিবে। মোট কথা ইন্দ্রিয়পথগুলি যতক্ষণ খোলা থাকিবে, মনের স্বাভাবিক অবস্থা যদি ক্ষুণ্ণ না হয়, তবে জ্ঞানের কার্য্যও অবাধে চলিতে থাকিবে। তবে স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়পথ উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও ঐ কার্য্যে বাধার উৎপত্তি হয়। মনের পূর্ব্বা-ঙ্কিত চিত্রোন্মোচনে শক্তির অভাবই স্মৃতিভ্রংশ। জ্ঞানলাভের সময় বাহিরের কার্য্য ভিতরের কার্য্য সমানে চলিতে থাকে। কি ভিতর কি বাহির একের কার্য্য বন্ধ হইলেই মূল কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রিয়া স্থগিত থাকে। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পূর্ব্বলিখিত পত্রগুলি দেখিতে না পারিলে জানার ক্রিয়া সম্ভব নহে।

মনের মধ্যে কত পত্র সঞ্চিত থাকিতে পারে? তাহাতে কতগুলি চিত্রের ছাপ ধরে? ছাপ যখন ধরে, সঞ্চয় যখন করে, মন তাহা হইলে একটি আধারবিশেষ। কিন্তু সেই আধারটি কত বড়? এদিকে তাহার অবয়বের পরিমাণ দূরের কথা, সামান্য সত্তাটুকু পর্য্যন্ত সমস্ত দেহের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ব্যাপারটা তবে কিরূপে হয়? ছাপগুলি তাহা হইলে অঙ্কিত হয় কোথায়? সমগ্র দেহের মধ্যে মনকে যদি খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তাহার অবয়বের অস্তিত্ব যদি না মেলে, মন তবে অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু। সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ড কেমন করিয়া স্থান করিয়া লইতে পারে? আধেয় বড় হইলে ক্ষুদ্র আধারে ধরে কি করিয়া?

ইন্দ্রিয় যাহাদের ভোগ করে সে সকলই বস্তুময় নহে। তাহাদের মধ্যে গুণময় ও ভাবময় পদার্থ বিদ্যমান। আবার বস্তুময় থাকিলেও ইন্দ্রিয় কখনও বস্তু গ্রহণ করে না। সে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও স্বাদ গ্রহণ করে। এইগুলি গুণ। মন একটি আধার বটে, কিন্তু আধার সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ অভিজ্ঞতা সেইরূপ কোন প্রকার জাগতিক পদার্থময় আধার নহে। ইহা ধারণ করিতে সক্ষম বলিয়াই আধার। একটি পুরা পাঁচফুট লম্বা মানুষকে একইঞ্চি

পরিমিত কিম্বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র একখানি কাগজের টুকরার মধ্যে ধরিয়া রাখা যায়। কাগজখানি দেখিবার সময় মানুষটি তাহার পূর্ণাবয়ব সমেত স্বাকার লইয়াই ধরা দেয়। ছবি দেখিয়া মনের মধ্যে যখন দর্শন ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন মানুষ বা বস্তুটিকে চিত্রপরিমিত ক্ষুদ্র আকারে দেখা যায় না। সে তাহার যথার্থ রূপ ও পরিমিতি লইয়াই দেখা দেয়। প্রকাণ্ড আকার যেমন ক্ষুদ্র কাগজের মধ্যে হুবহু নকল করা যায় সেইরূপ বিরাট জগৎও সূক্ষ্ম মনের মধ্যে যথাযথ প্রতি-ফলিত হয়।

এক টুকরা কাগজের মধ্যে একখানি চিত্রই সম্ভব হয়; তাহার মধ্যে আর একখানি চিত্র বসাইতে গেলে দুইখানিই নষ্ট হইয়া যায়। কোনটিকেই আর বুঝা যাইবে না। সূক্ষ্ম মনের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য চিত্র কেমন করিয়া স্থান করিয়া লইতে পারে? কাগজের মধ্যে একখানা ছবি উঠাইলে তাহা যেমন মুছিয়া যায় না, মনের মধ্যে সেরূপ হয় না। তাহার মধ্যে একটি রূপ যেমন প্রতিফলিত হয়, আবার তেমন বিলুপ্ত হইয়াও যায়। স্মৃতি ও বিস্মৃতি পাশাপাশি থাকে। ছায়াচিত্রের একখানি সাদা পর্দ্দার মধ্যে কত গ্রন্থ, কত নাটকের কত অনন্ত দৃশ্য ফুটিয়া উঠে; আবার প্রদর্শনী না থাকিলে যেমন সাদা পর্দ্দা সেই সাদা পর্দ্দাই পড়িয়া থাকে—ইহাও তদ্রূপ। এককালে একটি রূপ লইয়া একাদিক্রমে অনন্ত দৃশ্য ইহার মধ্যে খেলা করিয়া বেড়ায়। তবে পর্দ্দার মত ইহা একেবারে সাদা থাকিতে পারে না। একটাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। তাহাই স্মৃতির খেলা।

তোমারে যখন দেখি

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল

তোমারে যখন নয়ন ভরিয়া দেখি,
মনের গহনে সঙ্গীত জাগে সে কি?
উষার গগনে প্রভাতের আলো খেলে,
বনে বনে ফুল আপনি নয়ন মেলে।
গোধূলির রংয়ের সন্ধ্যা আকাশ ছায়,
তিমিরের কোলে ফুলদল ঝরে যায়।

মহাশিল্পীর ভাঙ্গিয়া গড়ার খেলা,
ক্ষয়ের আড়ালে মহা মিলনের মেলা
যাত্রার শেষে অসীমে করিয়া নতি,
প্রলয়ের বুকে লভিছে চরমগতি।
এই আসা যাওয়া মাটির ধূলির বুকে;
উদ্ভাসি উঠে বেদনার ধূপে ধূপে।

নিখিলের বুকে যে প্রাণের খেলা চলে,
লতায় পাতায় কানাকানি ক'রে বলে
নিমেষ হারায়ে বিশ্বেরে লও চিনে,
মূক ধরণীরে শেষ বিদায়ের দিনে।
শুক্‌নো যূথীর যাত্রার শেষ গান,
পরম দিনের কল্যাণময় দান।

নবযুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ইদানীং জগৎ জুড়িয়া মারমার, কাটকাট ধ্বনি। বাসনায় বাসনায় সংঘর্ষ, মতে মতে বিরোধ ও হানাহানি। পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংঘাতে মত্ত হইয়া সমগ্র জগৎ উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে জগৎকে শুনাইতে হইবে প্রাচীন ভারতের সাধনার বাণী। আর্য্য ঋষিদিগের তপস্যালব্ধ যে বাণী শুনিয়া ভারতবর্ষ একদিন অন্তরে পাইয়াছিল এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সন্ধান ও বাহিরে পাইয়াছিল কৃষ্টির এক চরম উৎকর্ষ। যুগে যুগে এই পুণ্য ভারতভূমিতে বহু সিদ্ধপুরুষ, অবতার ও মানব-মুক্তিদাতার আবির্ভাব হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতাই ভারতের জাতীয় সম্পদ। ত্যাগই ভারতের সনাতন আদর্শ। সমগ্র জগতের সমক্ষে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানের আলোকসম্পাত করিয়াছিলেন, আজ জগতের যত কিছু আবর্জ্জনা ও অন্ধকার তাঁহাদেরই জীবনযাত্রার পথে পুঞ্জীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধুনা ভারতগগন নানা জটিল সমস্যা ও বিরুদ্ধ মতবাদে সমাচ্ছন্ন। যেদিন হইতে ভারতবর্ষ ত্যাগ, প্রেম ও সত্যের মহিমা ভুলিয়া আত্মঘাতী জড়বাদমূলক সভ্যতার আপাতমনোরম চাকচিক্যের মোহে মুগ্ধ হইয়াছে সেদিন হইতে ভারতের জাতীয় জীবনের অধঃপাতের সূচনা। প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা আর্য্য ঋষিবৃন্দ আত্মসাক্ষাৎকারের পর উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। মহাপুরুষগণের পূত আদর্শ ও বাণীর অনুসরণই বিশ্বমানবের মধ্যে মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয় তবে উহা আগামী ৫০ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে। মানবজাতিকে তরবারিবলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। যে সকল দেশ হইতে 'পাশববলে জগৎ শাসন' রূপ ভাবের উদ্ভব, সেই দেশগুলিতেই প্রথম অবনতি আরম্ভ হয়, সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জড়শক্তির লীলাক্ষেত্র ইউরোপ যদি আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তাহার সমাজ স্থাপন না করে, তবে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্ম্মই ইউরোপকে রক্ষা করিবে। আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দকে মহাত্মা গান্ধী প্রাচ্যের ধর্ম্মগুরু ও মনীষিদিগের বাণী বহন করিয়া নিজ নিজ দেশে লইয়া যাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির ভাবময় বিগ্রহ ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের কর্ম্মময় মূর্ত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ বস্তুতঃ অভিন্ন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—"রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ।" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে একটি অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীতে জড়বাদ ও ভোগসর্ব্বস্বতার স্রোতে যখন দেশ প্লাবিত, জাতির দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও যখন ভারতগগন বহু বিরুদ্ধ মতবাদে সমাচ্ছন্ন, সেই সঙ্কটময় যুগসন্ধিক্ষণে

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। তাঁহাদের জীবনাদর্শ সমস্ত যুগসমস্যার সমাধানের পথ দেখাইয়াছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহাদের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন—"ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় যে একটা কত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সেটা আজ পর্য্যন্ত আমরাই অর্থাৎ ভারতীয়েরাই পুরোপুরি উপলব্ধি করি নি।" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যে ভারতের আত্মিক সাধনার মহান্ আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। একাধারে বুদ্ধের ত্যাগ, শঙ্করের জ্ঞান, চৈতন্যের প্রেমের অভিনব সমাবেশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনকে উদ্দেশ করিয়া গাহিয়াছেন—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একখানা পত্রে লিখিয়াছেন—"বেদ-বেদান্ত আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত এবং অবতারাদি বোঝা যায় না।" মহাত্মা গান্ধীর ভাষায়—"Ramakrishna was a living embodiment of godliness. His sayings are not those of a mere learned man but they are pages from the book of life. They are revelations of his own experiences." এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবনে আধ্যাত্মিক শক্তির যেরূপ বিকাশ হইয়াছিল এরূপ আর কোন যুগেও কখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন—

"I have no doubts about Sri Ramakrishna. I give you the testimony as a modern man full of doubts that Sri Ramakrishna was a genuine soul and a great soul and a perfect guru for us.……There is no commentary of the Bhagavad Gita or Upanishads which can surpass the sayings of Sri Ramakrishna. He was the Upanishad in flesh and blood, he was the Bhagavad Gita in flesh and blood."

যুগাবতার ও মহাপুরুষদিগের লীলা সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য। তাঁহারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ইহলোক হইতে তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেও থাকিয়া যায় তাঁহাদিগের সাধনা, শিক্ষা ও আদর্শ। সেই শিক্ষা ও আদর্শ উপযুক্ত আধারকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রতিধ্বনিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কোন দেশের, কোন জাতির কি কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ নহেন, তাঁহারা সমগ্র বিশ্বের।

সম্প্রতি এই দারুণতম অবসাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব বোধ হয় ব্যর্থ হইল, অথবা তাঁহাদের যুগের অবসান ঘটিয়াছে। কারণ, যে দেশে যে জাতির মধ্যে তাঁহাদিগের আবির্ভাব ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অভিনব সাধনা, আজ সেই দেশের, সেই জাতির যাত্রাপথে কত আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। আমরা বলি—তাঁহাদের যুগের অবসান হয় নাই, তাঁহাদের আবির্ভাবও ব্যর্থ হয় নাই। স্বাধীন ভারতে সবেমাত্র তাঁহাদের যুগের সূচনা হইয়াছে।

তাঁহারা যে মহৎ কর্ম্মব্রতের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও বাস্তবে পরিণত হয় নাই। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ 'কর্ম্মযোগী' পুস্তকে লিখিয়াছেন—"দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ সুরু হইয়াছিল, তাহা শেষ হওয়া তো দূরের কথা লোকে তাহার মর্ম্ম এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ যাহা পাইয়াছিলেন, যাহা বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন সে জিনিষ এখনও বাস্তবে মূর্ত্ত হয় নাই।"

গভীরতম অবসাদের মধ্যে ভবিষ্যতের নিবিড়তম সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"The greater the destruction, the free-er is the chance of creation." ক্রমবিবর্ত্তনের ইহাই অব্যর্থ বিধান ও ইতিহাসের অমোঘ নির্দ্দেশ। দুর্গতি ও বিনাশের মধ্য দিয়াই আমরা নব সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছি। ক্রমবিবর্ত্তনের এই অভ্রান্ত ধারায় ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় অনিবার্য্য। সাময়িক পতনের পরই এক নূতন জাগরণ—ইহা ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়—"Human history is not a series of secular happenings ; it is a meaningful process, a significant development." ইদানীং ভারতের চারিদিকেই এক নব জাগরণের সূচনা দেখা যাইতেছে। এই জাগরণের দ্বারাই নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবে আমাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সমাজ ও সাহিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ই নব ভারতের আদর্শ। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রকৃত ভাবে বুঝিতে হইলে উহা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকেই বুঝিতে হইবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মনীষী রোমাঁ রোলাঁকে লিখিয়াছিলেন—"ভারতকে যদি জানিতে চান তবে বিবেকানন্দকে জানিতে চেষ্টা করুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহান আদর্শ ও দিব্য জীবনের মধ্যেই ভারতের সনাতন আত্মিক সাধনা শরীরী হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মহিমময় চরিত্রে ও উদার বাণীতে নূতন ভারত ও এক নূতন জগতের ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে সুর গাহিয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া যে অনাগত ভবিষ্যতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, মহাত্মা গান্ধী যে মহান কর্ম্মব্রত লইয়া দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মবলিদান করিলেন—এ সমস্ত কিছুর পশ্চাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনালোকের প্রভাব সক্রিয়। নেতাজী এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবেই আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম।" মনীষী রোমাঁ রোলাঁ পাশ্চাত্য জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়া এক অভিনব জীবনাদর্শ তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেরণায় এক বিচিত্র সেবাধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবকে সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে, নরকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করা তাঁহাদের এক অভিনব শিক্ষা। এই সেবাধর্ম্ম বিশ্বপ্রেম-জ্ঞাপক। ইহাতে কোন ভৌগোলিক সীমা অথবা ব্যক্তিগত, সমাজগত বা বর্ণগত কোন পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। এই বিশ্বজনীন উদার অসাম্প্রদায়িক সেবাধর্ম্ম অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শে অভিনব আকারে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহাদের জীবনে বহু সুরে বাঁধা বিভিন্ন তার থাকিলেও সব কয়টির সম্মিলনে বাজিয়া উঠিয়াছে সেবা ও সমন্বয়ের এক অপূর্ব্ব সুর। এই বিচিত্র সুর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগতের বড় বড় চিন্তানায়ক মনীষীদের অন্তরে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন সৃষ্টি করিয়াছে। এই অভিনব সেবাধর্ম্মের ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিশ্বমৈত্রীর এক চরম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যথার্থ শান্তিলাভের জন্য কালে সমগ্র জগৎকেই এই উদার সার্ব্বভৌম আদর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার তথা ভারতের যুবকবৃন্দের উপর গুরুভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমাদের একান্তভাবে স্মরণীয় স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান—"ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে;' ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।"

এই দুর্গতি ও বিনাশের মধ্যেও অধুনা চারিদিকেই এক জাগরণের সূচনা দেখা যাইতেছে। অভাবনীয় উপায়ে ভারতবর্ষ বহুকালের পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে। জাতির মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। বিশাল ভারত আবার জাগিতেছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দের আত্মপ্রত্যয়ের মন্ত্র প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে ধ্বনিত হউক—"বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা দিগ্‌দিগন্তে ঘোষিত হইয়াছে—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে।...আনন্দিত হও। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে; কিছুতেই উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না, উহা সীমাহীন, সর্ব্বগ্রাসী।" ভারতের এবারকার অভ্যুদয় তাহার সমস্ত পূর্ব্ব অভ্যুদয়-গৌরবকেও ম্লান করিয়া দিবে। স্বামীজি আরও বলিয়াছেন—"The Leviathan is rising again, the future greatness of India shall surpass all her past risings. I hear the murmur of the tidal wave that is coming." সত্যদ্রষ্টা ঋষি দিব্যচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই পরম সত্য পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

মায়ের কোল

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

দুঃখ-ত্রয় নিদাঘ-তাপে
চিত্ত-তপ্ত-মরু।
অঙ্কুর-পাতে শুষ্ক হেথায়
স্নেহ-ভকতি-তরু।

প্রাবৃট্-জলদে আঁধার-রাতে
দামিনী যেন দোলে।
কাঁদন-হারা শিশুর-পারা
লহ-মা এবার কোলে।

আমেরিকার চিঠি

ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, এম্-এ, ডি-লিট্

(৩)

ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় হঠাৎ দেশের চিঠি পেলে আশ্চর্য লাগে—সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে আত্মীয় কণ্ঠস্বর শোনার মতো। নিজের মধ্যে এবং বহিঃসংসারে আত্মস্বরূপের একটি অখণ্ড যোগ আমরা অনুভব করি, একথা সত্য কিন্তু বুঝতে পারি তৎসত্ত্বেও আমরা দেশ ও কালের মানুষ—যেখানেই থাকি না কেন দেখি নিতান্ত বাঙালিত্ব কিছুতেই ঘোচে না। শুধু কথার নয়, মনের একটা ভাষা আছে যেটা মার্কিনে বাঙালিতে এক নয়—এমন কি, বাঙালি এবং অন্য ভারতীয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম অস্পষ্ট অথচ যথার্থ মনের শ্রুতি ঠিক একই সুরের নয়।

বাঙালিত্বের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করব না কিন্তু স্বীকার করি যে এদেশের বেদান্তকেন্দ্রগুলিতে বাঙালির প্রাধান্য দেখে কিছু খারাপ লাগে না। স্বামীদের মধ্যে অনেকেই যে বাংলাদেশের সাধু পুরুষ এবং তাঁরা পারিবেশিক সংস্কৃতি এদেশে বহন করে এনেছেন এতে খুব ভালোই লাগে। হিন্দি বা ইংরেজিতে কথা না বলে হঠাৎ খাঁটি বাংলায় তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে বড়ো তৃপ্তি হয়—বিশেষ করে এই জন্যে যে কেবল মাত্র ভাষা নয়, গভীরতর ভাষার বিনিময় সেই বাংলাতেই সহজতর। যে পুণ্যতার পরিমণ্ডল তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তা যেন আরো কাছে পাওয়া যায়।

স্বামী প্রভবানন্দের সঙ্গে কিছুদিন কাটল—এমন সহজ, মিতভাষী, উচ্চমার্গের পুরুষ সংসারে দুর্লভ। তীক্ষ্ণ তাঁর বুদ্ধি, বিচারশক্তি নিয়ত উদ্যত, অথচ ব্যবহারে কত গভীর মাধুর্য! তাঁর মনীষা যেমন আশ্চর্য তেমনি তাঁর গঠনশক্তি এবং উদ্যোগপরতাও বিস্ময়কর। তিনি যে-ভাবে তিনটি স্বতন্ত্র স্থানে তাঁর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছেন তাতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর প্রভাব পাশ্চাত্য ধর্মক্ষেত্রে, মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে এবং চিন্তাশীল নানা সমাজে ছড়িয়ে গেছে। ভারতীয় তপঃশক্তি এবং জ্ঞানদর্শনের যে এঁরা উৎকৃষ্ট পরিচয় দিচ্ছেন এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ নেই।

Huxley বা Gerald Heard সামান্য পার্থক্য রক্ষা করে এঁদের প্রবর্তিত বেদান্তব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন—সমস্ত পৃথিবীর মানুষকেই একদিন ভারতবর্ষের চিরন্তন ধর্মের উৎসে পৌঁছতে হবে একথা ক্রমেই পাশ্চাত্য জগৎ স্বীকার করে নিচ্ছেন। যা চিরমানবিক, জ্ঞান ও চৈতন্যের শ্রেষ্ঠযোগে যা অমলিন, তা কোনো বিশেষ দেশে প্রকাশ পেয়ে থাকলেও তা সর্ব দেশের—আজকের এই চরম দুর্যোগের দিনে ভারতীয় তপস্যার বাণী সকলকেই মুক্তির সন্ধান দেবে।

প্রথম দিন হতেই প্রভবানন্দকে ভক্তি করেছি—তিনি বহুদূর থেকে Santa Barbara ষ্টেশনে এসে যখন আমাকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিলেন সেই বন্ধুত্বের মুহূর্ত কখনও ভুলব না। ঘন পাইন অরণ্যের মধ্য দিয়ে নির্জন শৈলাবাসে উপস্থিত হলাম—পাহাড়ের নীচেই প্রশান্ত মহাসমুদ্র। মনে হল পূর্ব সমুদ্রের দূর তট থেকে ভারতবর্ষের

প্রভাব আমাদের কাছে এসে পৌছচ্ছে। খানিক পরে বাগানের একটি প্রকোষ্ঠে বেদমন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পেলাম। তখন আরতির লগ্ন। নানা আলোচনায় নির্জনে তাঁর সঙ্গে কেটেছে; পরের রবিবারে Hollywood মন্দিরে আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে তাঁদের ধর্মসভায় তাঁর হয়ে অভিভাষণ দিতে বাধ্য করেন। আশ্রমের উপাসক-উপাসিকা সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই কম বয়সী এদেশীয় সাধক। তাঁদের চরিত্রের দীপ্তি ও মহিমা বেদান্তকেন্দ্রগুলিকে পুণ্যতর করে তুলেছে। সকলেরই মনে আনন্দ, চারিদিকের পরিবেশও সুন্দর। এই বিভ্রান্তির জগতেও সকল দুর্যোগের অতীত, শোকাতীত পরম সান্নিধ্য অনুভব করে ধন্য হওয়া যায়—নানা দেশের সাধক এই কেন্দ্রটিতে এসে তার পরিচয় দিচ্ছেন মনে হল।

আপনি লিখেছেন ভারতবর্ষের দান বিশুদ্ধ ধর্মসাধনা—সেই কথা যে কত সত্য তা নিয়ত অনুভব করি। কেন না আমাদের ধর্মের সংজ্ঞা সংকীর্ণ নয়—সমস্ত জীবন-কর্মের মূলে ধর্মকে রক্ষা করে তার বিচিত্র শুভ্র প্রয়োগকেই আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক জীবন বলে অভিহিত করেছে। সেই অন্তর্নিহিত মূলের ধর্মসাধনা এবং কর্মশাখায় একই শুভ্রতার প্রকাশ, কোনোটাকেই বাদ দিলে চলবে না—মুক্তির এত বড়ো নির্দেশ কোথায় আছে? য়ুরোপে আমেরিকায় এই ভারত-প্রদর্শিত সত্য যাঁরা আজ নিয়ে আসছেন সেই ধর্মসাধকেরাই আমাদের দেশের যথার্থ প্রতিনিধি।

এদেশের বিজ্ঞানীরা বিশেষ জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, কিন্তু অন্য সকল বিষয়েই বিশেষ অজ্ঞ। Millikan এর সঙ্গে Pasadenaয় বহু তর্ক করেছি। Cosmic Ray-র ব্যাখ্যায় যাঁর মন এবং ভাষা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই একই গুণী কী করে মহাত্মাজির বিষয়ে, ভারতীয় মৈত্রীসাধনা বা ধ্যানধর্মসাধনার বিষয়ে শিশু বা অজ্ঞের মতো কথা বলেন তা বুঝতে পারি না। সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সমস্যার মহৌষধ Atom bomb; বিশেষ করে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে কোনো দোষ নেই। বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই অন্ধ শক্তির অনির্ধারিত প্রয়োগ যে বিজ্ঞান নয়, অন্ধতা মাত্র—বিজ্ঞানের অর্থ কার্যকারণ নির্ধারণ করে আয়ত্তাধীন শক্তির প্রয়োগ—একথা ইনি মেনেও মানতে চান না। অথচ একথা স্বীকার না করে পারেন না যে আণবিক অস্ত্রে Philadelphia ধ্বংস করতে গিয়ে সমস্ত Pennsylvania ধ্বংস করা এমন কি নিজেরাও ধ্বংস হয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। শুধু মাত্র প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে এমনতর অস্ত্রের চর্চা করাকে কি বিজ্ঞান বলে? —জ্ঞান বা ধর্মের কথা তো বাদই দিলাম। Einstein বলেছিলেন, দেখবে, Shapley এবং অন্য দু-একজন ছাড়া এদেশের কোনো বৈজ্ঞানিককেই কাছে পাবে না; এখন বুঝছি কেন তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে আমার এই পরিক্রমা সার্থক হয়েছে মনে করি; বিশেষ করে দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানের রাজ্যে বহু মুক্ত মনের সন্ধান পেয়েছি। Harvardএর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ Sarokin আশ্চর্য মেধাবী ব্যক্তি। তাঁর চিন্তার সাহস ও নূতনত্বে এদেশের নানা মহলে সাড়া পড়ে গেছে,—তাঁর নূতন বই এতই চমৎকার যে আপনাকে না পাঠিয়ে পারলাম না। ভারতীয় এবং অন্যান্য পূর্বদেশীয় সংস্কৃতি ও ধর্মজীবন হতে বহু তত্ত্ব তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ মনোধারার সঙ্গে মিলিয়েছেন। এই সেতুবন্ধনের কাজ মুক্ত মনের সাধ্য; এই যুগের প্রধান একটি দায়িত্ব সেইখানে।

Hollywoodএ তারকারাজির মধ্যে Charlie

Chaplin এবং Gary Cooperএর সঙ্গে আমার বিশেষ দেখাশোনা হয়েছে—এমন কি একটি নূতন film যখন তৈরী হচ্ছে' তখন নিভৃতে দেখবার সুযোগ তাঁরা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে দেশে গিয়ে গল্প হবে, বিশেষ করে অদ্ভুত এবং একান্ত ভালো মানুষ Chaplin-এর বিষয়ে। তাঁকে দেখে যে আজও সেই ইংরেজ ছেলের কথা মনে পড়ে, গরীবের বন্ধু, পথের পথিক Chaplin—এই শুনে তাঁর চোখে জল এল। আমাকে অনেক ছবি ও জিনিষপত্র দিয়েছেন। এখন তিনি ইংরেজি Clown—চিরাচরিত এলিজাবেথান ও Dickens-রাজ্যের Clownএর একটা ছবি তৈরী করছেন।

যেখানেই যাই আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে এবং দীর্ঘকাল এদেশে অধিবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করা আমার কর্তব্য মনে করি। এই অধিকতর দায়িত্ব নিতে গিয়ে আমাকে কাজের বাহিরে অসাধ্য পরিশ্রম এবং রাত্রি জেগে ভ্রমণ করতে হয়; আবার পরদিনে অশ্রান্ত বক্তৃতার পালা—কিন্তু এর চেয়ে আনন্দ কমই আছে। Iowaয় পরলোকগত অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসুর পত্নীর কাছে গিয়েছিলাম,—আজ সন্ধ্যাবেলা Harvardএর কাছে Needhamএ গিয়ে ৺আনন্দ কুমারস্বামীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলাম। এই রকম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সন্তানেরা দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করে আমাদের নাম উজ্জ্বল করে গেছেন। Antioch Collegeএ প্রসিদ্ধ বাঙালি অধ্যাপক "Bengali Chatterjee" ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করছেন,—Ohio ভ্রমণকালে তাঁর কলেজে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে এসেছি।*

* আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহর হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ তালুকদারকে লিখিত পত্রাংশ।

বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা

রায় বাহাদুর শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ

মহামায়ার বাৎসরিক পূজা শারদীয় বোধন বাঙ্গালী জাতির একটী পরম বৈশিষ্ট্য। কোন জাতীর কোন উৎসব-আয়োজনে এতটা প্রাণঢালা আনন্দের রেশ বড় একটা দৃষ্ট হয় না। বাংলার নগরের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, বাংলার বাহিরে, প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে আজ এই মহীয়ান্ প্রতীকের শেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এ প্রতীকের তুলনা হয় না। এই সর্ব্বশক্তি-বিকশিতা, সর্ব্বজয়া, মাতৃমূর্ত্তি বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও মেলে না। একবার চেয়ে দেখুন, কি অপূর্ব্ব কল্পকলা, কত তপস্যা, কত ধ্যানের মহিমা এই অপরূপ রূপে সন্নিবেশিত হয়েচে। এই সিংহবাহিনী, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী দশভুজারূপ মানব-সমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্ত্ত প্রকাশ। পশুরাজ সিংহ এঁর বাহন, রণোন্মত্ত অসুর এঁর পদানত। দেবীর বোধনে শুধু নরলোক কেন, পশু ও অসুর-লোকও তাদের নিজ নিজ পূর্ণ সামর্থ্যে জেগে উঠেচে—এই মহা সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলিত ঐক্য এই মূর্ত্তিতে সূচিত হচ্চে।

বামে বীণাপাণি ও কার্ত্তিকের নিখিল বিদ্যা ও সামরিক বল, দক্ষিণে সকল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী কমলা ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। পটভূমিকায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই জাগরণের সহায়তা করচেন। এই ধ্যানমূর্ত্তির পূজক আমরা, এমন পূর্ণাঙ্গ-

শোভিতা সুসমঞ্জসা ঐক্যবদ্ধা জাগরিতা মহাশক্তির পূজাধিকার আমাদের বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কতকালের কত যুগের বাংলার প্রাণধারা এই পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েচে। কত সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দেবাবতার বাংলার এই মাতৃপূজাকে তাঁদের সাধনায় বার বার সার্থক করে গেছেন। দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সাধক রামপ্রসাদের মাতৃ-গানের রেশ একদিন সারা বাংলাকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর সেই গানে, তাঁর সেই মাতৃরূপ-বর্ণনায় বাংলার যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় এমনটী আর কোথাও মেলে না। এই গানেরই সুর একশত বৎসর পরে মূর্ত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এই দেশের কি এমন সৌভাগ্য, কি এমন সুকৃতি যে যুগে যুগে এই সব পুণ্যশ্লোক সাধকশ্রেষ্ঠ এই দেশে জন্ম পরিগ্রহ করে বাংলার নাম সার্থক করে গেছেন—আত্মিক রাজ্যে বাংলার উচ্চাসন সৃষ্টি করে গেছেন?

রামপ্রসাদ মাতৃভাবে তন্ত্র করে, মনোযন্ত্রে বাদ্য করে—যাঁকে হৃদিপদ্মে নাচিয়ে গেছেন,—যে এলোকেশীকে হৃদয়ে ধরে—"গয়া গঙ্গা কাশী বৃথা" মনে করেচেন,—ধ্যানাসনে বসে—"মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে", "মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া"—এই সব বিশ্বতত্ত্ব তারস্বরে রটিয়ে গেছেন, —"সেই তিমিরে তিমিরহরা" ব্রহ্মময়ী মাকে আজ বাংলার অন্ধ আঁখি দেখ্‌তে পায় না। তাই না চতুর্দ্দিকে এত হাহাকার, এত আর্ত্তনাদ!

বাংলার এই জাগ্রত সাধনা, এই অপরিমেয় কৃষ্টি আমরা সব ভুলে বসে আছি। তাই না আমাদের এত দুর্দ্দশা, এত হীনাবস্থা! মহাশক্তির পূজার সেই সাত্ত্বিকতা, সেই সজাগ প্রাণধারা ফিরিয়ে আনতে হ'বে। আজ আমাদের জীবনধারা, আমাদের সকল কাজ, আমাদের সকল অনুষ্ঠান তামস অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত। যে দিকে তাকান যায়, সেই দিকেই এই ঘোর তমসা দৃষ্ট হয়। শক্তির পূজক আমরা, আমাদের এ অবস্থা ত সাজে না। মহাশক্তির পূজারী যারা তারা ত চির আলোকে বিরাজ করবে, চিরানন্দে থাকবে—তা হচ্চে কই? আমাদের পূজার বিঘ্ন কোথায়? বিঘ্ন আমাদের অন্তরে। পূজায় আমাদের প্রাণ নেই বলেই আমাদের এই প্রাণহীন অবস্থা।

আমাদের সত্যে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে,—তবেই না আমাদের পূজা সার্থক হবে—জীবন সার্থক হবে, কর্ম্ম সাফল্য-মণ্ডিত হবে।

মা,—যে তুমি স্থূলে ব্যষ্টিতে চিতিশক্তিরূপে নামরূপবিশিষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছ, সেই তোমাকে প্রণাম। আবার তুমি যে মহতী চিতিশক্তিরূপে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় রূপে প্রকাশ পাচ্ছ সেই ঈশ্বরী মূর্ত্তিকে প্রণাম। আবার অনন্ত স্থূল সূক্ষ্মের অতীত, অব্যক্ত কারণরূপিণী চিতিশক্তিকে প্রণাম। সর্ব্বশেষে বাক্য মনের অতীত, নির্গুণ সগুণের অতীত নিরঞ্জন স্বরূপকে লক্ষ্য করে নমো নমঃ বলে প্রণাম করি। মা, আমাদের প্রণাম সার্থক হোক্‌—আমাদের পূজা সার্থক হোক্‌—মা, আমাদের অন্তর আলোকিত করো—আমাদের মানুষ করো, তোমার পূজার যোগ্য করে নাও।

পৃথিবীতে স্নেহপদার্থ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের অভাব

জর্জ মার্টিন

গত ২৩শে মে থেকে সাময়িক ভাবে বৃটেনের সাপ্তাহিক বরাদ্দ মাখনের পরিমাণ ৩ আউন্স থেকে ৪ আউন্স করা হয়েছে। সেই জন্য মনে হতে পারে যে স্নেহপদার্থের যুদ্ধকালীন বরাদ্দপরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, কিন্তু তা নয়। ১৯৪৬ সনে স্নেহপদার্থের অভাব হওয়ায় বরাদ্দপরিমাণ ৮ আউন্স থেকে কমিয়ে ৭ আউন্স করা হয়েছিল এবং ৮ আউন্স বরাদ্দব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করা হয় গত ফেব্রুয়ারী মাসে। এই এক আউন্স মাখনবৃদ্ধির অনুপাতে বরাদ্দ নকল মাখনের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৃটেনে ১৯৪৮ সালের জন্য নির্ধারিত স্নেহপদার্থপরিমাণ ১১,৬৭,০০০ টন, তুলনায় ১৯৪৭ সালে আমদানি হয় ১১,৫৬,০০০ টন এবং ১৯৪৬ সনে হয় ৯,৯৩,০০০ টন। এই বৎসরের নির্ধারিত পরিমাণের সঙ্গে ১৯৪৬ সনের আমদানি-পরিমাণের তুলনা করবার আগে স্মরণ রাখতে হবে যে গত মহাযুদ্ধের সময়-কালীন কষ্ট-সঞ্চিত স্নেহপদার্থ থেকে ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সনের অভাব পূরণের জন্য অনেকখানি গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তা যাই হোক, যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ (বাৎসরিক প্রায় ১,২৯৬,০০০ টন) স্নেহদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি হত, বর্তমানে সেই পরিমাণ আমদানি-সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য পরিষদের সাম্প্রতিক বিবৃতি থেকে জানা যায় যে স্নেহপদার্থের এই রকম গুরুতর অভাব আরও কিছুকাল ধরে থাকবে। ১৯৪৭ সনে পৃথিবীর স্নেহপদার্থের সমগ্র রপ্তানি-পরিমাণ হয় কেবল মাত্র ৩,৪,০৩০০ মেট্রিক টন, তুলনায় যুদ্ধপূর্ব রপ্তানি-পরিমাণ ছিল ৫,৮০০,০০০ মেট্রিক টন। কেবল যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা এবং ফিলিপাইনসে যুদ্ধপূর্ব রপ্তানি-পরিমাণের তুলনায় ১৯৪৭ সনের রপ্তানি-পরিমাণ বেশী হয়। অথচ অন্যান্য সরবরাহকেন্দ্র থেকে রপ্তানি অনেক কম হয়, বিশেষতঃ মাঞ্চুরিয়া এবং ভারতবর্ষ থেকে অনেকাংশে রপ্তানি হ্রাস পায়, যদিও এই দুই দেশ থেকেই যুদ্ধপূর্বকালে রপ্তানি হত সবচেয়ে বেশী এবং ইউরোপ তথা পৃথিবী এই রপ্তানির উপর একান্ত নির্ভরশীল।

এই রকম নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও ১৯৪৮ সনে মোট স্নেহদ্রব্যের রপ্তানি-পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় কিন্তু তা কোন উপায়েই ৩,৯০০,০০০ টনের বেশী হবে বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষ এবং মাঞ্চুরিয়ার সরবরাহ-অবস্থাও আশাপ্রদ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্নেহদ্রব্যের যুদ্ধপূর্ব রপ্তানি-অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সহজে সম্ভব নয়, ফলে যে সব এলাকা বাহিরের আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভর করছে তাদের দুর্ভোগ আরও কিছুদিন সমানভাবে চলতে থাকবে।

বস্তুতঃ স্নেহদ্রব্যের উৎপাদন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুপাতে বিশেষ হ্রাস পায় নি, তা হলেও ইউরোপে স্নেহদ্রব্যের সরবরাহে প্রচুর ঘাটতি হয়। তার প্রধান কারণ যুদ্ধপূর্ব সময়ে

ইউরোপই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমদানির উপর নির্ভর করে এসেছে। ইউরোপের যুদ্ধপূর্ব মোট সরবরাহপরিমাণ ছিল ৮,১০০,০০০ টন, তার মধ্যে ঘরোয়া উৎপাদন-পরিমাণ ৩,৯০০,০০০ টন এবং আমদানি-পরিমাণ ৪,২০০,০০০ টন। ১৯৪৭ সনে ঘরোয়া উৎপাদন পরিমাণ হয় ২৫,২০,০০০ টন, আমদানি হয় ২,৩২০,০০০ টন। ইউরোপের সর্বত্র স্নেহদ্রব্যের ব্যবহার সমানুপাতে হয়নি, কোন কোন দেশে স্নেহদ্রব্যের ব্যবহার যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় শতকরা ৮৫ ভাগ হয়, আবার কোথাও হয় শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র। পৃথিবীতে স্নেহদ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধির সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি হয়েছে কিন্তু তার আশু সমাধান বর্তমানে সম্ভব নয়।

গত বৎসর ইউরোপে আশানুরূপ ফসল হয় নি, ফলে গবাদি পশুর পুনঃপ্রতিষ্ঠা আংশিক ব্যাহত হয় এবং জান্তব চর্বি ও দুগ্ধজ উৎপন্ন বস্তুর অভাব দেখা দেয়। বৃটেনে যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশু বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও গত বৎসর গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বরে ছিল ৯২,৩৮,০০০, সেই তুলনায় ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বরে হয় ৯২,১৮,০০০। দুগ্ধ উৎপাদনও সামান্য কম হয়, কিন্তু তরল দুগ্ধের ব্যবহার-পরিমাণ বজায় রাখবার জন্য দুগ্ধ থেকে অন্যান্য দ্রব্য এবং এমন কি মাখন ও পনির তৈরী বহুলাংশে হ্রাস করা হয়।

যদিও বৃটেনে ১৯৪৬-৪৭ সনের দুগ্ধ উৎপাদন পরিমাণ গত যুদ্ধপূর্ব পরিমাণ থেকে শতকরা ৭ ভাগ বেশী, তবু খাদ্য ও কৃষি সংঘের মতানুসারে সমগ্র ইউরোপের উৎপাদনপরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ কম। যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় ইউরোপে গাভীর সংখ্যা শতকরা ১৭টি এবং গাভীপ্রতি গড় দুগ্ধ উৎপাদন পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সেজন্য ইউরোপে তরল দুগ্ধের ব্যবহার হ্রাস করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ইউরোপে ১৯৪৬-৪৭ সনে যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় তরল দুগ্ধের ব্যবহার শতকরা ৯ ভাগ বেশী হয়, যদিও সমস্ত দেশের ব্যবহার-অনুপাত সমান নয়। উদাহরণ স্বরূপ—ফ্রান্সে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ দুগ্ধের ব্যবহার কম হয়, সুইডেনে শতকরা ১২ ভাগ, এবং সুইজারল্যাণ্ডে ৩ ভাগ কম হয়, অথচ এক বৃটেনেই শতকরা ৪৫ ভাগ তরল দুগ্ধের ব্যবহার বেশী হয় এবং নরওয়ে ও বেলজিয়ামে শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বেশী হয়। পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপে দুগ্ধের ব্যবহার চিরকালই সামান্য। গত যুদ্ধের সময় তা আরও কম হয় এবং ১৯৪৬-৪৭ সনে যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ কম হয়।

সংক্ষেপে ইউরোপের তথা পৃথিবীর স্নেহদ্রব্য এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের সরবরাহ-অবস্থার পরিচয় এই।*

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

শোক ও সান্ত্বনা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

নিবিড় সুখ, নিরায়াস স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভয়-বাধা-সঙ্কোচহীন সুদৃঢ় নিরাপত্তা লইয়া ক্ষুদ্র সংসারটি কী সুন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু নিষ্ঠুর কালের কঠিন স্পর্শে একটি মুহূর্তে বালুকার সৌধের মত হঠাৎ ধসিয়া গেল। স্বামী মরিয়া গিয়াছেন। কত জন্মের কত পুণ্য, কত প্রতীক্ষায় পাওয়া ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল আশা, সকল পরিপূর্তির কেন্দ্র—জীবনের কাম্যতম, আরাধ্যতম, প্রিয়তম যিনি—সেই স্বামী আর নাই। রোরুদ্যমানা পতিহারা বালিকাকে কি সান্ত্বনা দিব? তাহার হৃদয়ের গভীর বেদনা দুটা মুখের কথায় কি দূর হইবার?

দম্পতীর একমাত্র পুত্র—বিদেশে পড়িত। নিজেরা কত কষ্ট সহ্য করিয়া ছেলের শিক্ষার খরচ যোগাইয়া আসিতেছিলেন। ছেলেটিকে বেড়িয়া উভয়ের প্রাণে কত আবেগ, কত আশা, কত ভরসা পুঞ্জিত হইয়াছিল। খবর আসিল টাইফয়েড। ঘরসংসার ফেলিয়া উভয়ে ছুটিলেন। একমাস যমে মানুষে লড়াই-এর পর পিতা-মাতার বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া প্রাণের মানিক চিরদিনের মত অন্ধকারে লুকাইয়া পড়িল। পুত্রের দেহসৎকার করিয়া শূন্য সংসারে উভয়ে যখন ফিরিয়া আসিলেন সমস্ত আকাশ বাতাস তখন যেন জনক-জননীর এই প্রচণ্ড দুঃখে ছম ছম করিতেছে।

প্রাণ দিয়া যাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম তাহার মন পাইলাম না। প্রাণে প্রাণে যোগ হইল না—নিদারুণ অসামঞ্জস্য প্রাণকে জ্বালাইয়া মারিতে লাগিল। জীবনে বহিয়া চলিলাম মর্মন্তুদ দুঃখের ভার। কিসে এ বোঝার লাঘব হইবে? হৃদয়ের জ্বালা কিসে মিটিবে?

সারাজীবন সৎপথে থাকিয়া নিরলস পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছি। সংসারের দুঃখ কিন্তু ঘুচিল না। একটার পর একটা বিপদ আসে। আঘাতে আঘাতে দেহ মন প্রাণ অবসন্ন। কোথায় আলোক, কোথায় আশা, কোথায় বিশ্রাম?

ক্ষুদ্র মানুষের জীবন—কিন্তু বিধাতাপুরুষ কী বিচিত্র শোকসন্তাপে নিরবধি ইহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংঘটন, বিফলতা, দারিদ্র্য, নির্যাতন, ধনহানি, অপমান, অসংখ্য বিপদ, অপরিমেয় মনঃপীড়া। সান্ত্বনা কোথায়? শোক অতি স্বাভাবিক কিন্তু সান্ত্বনা একান্তই দুর্লভ। তবুও মানুষ মানুষের কাছে সান্ত্বনা খুঁজিয়া বেড়ায়। মনে হয়, এই বিপুল ব্যথার ভার একক বহিবার শক্তি বুঝি আমার আদৌ নাই। একটু সহানুভূতি, একটু সমবেদনা পাইলে হৃদয়ের ভারকে তাই বুঝি খানিকটা হাল্কা করিতে পারি। কিন্তু হায়রে, প্রাণের ক্ষত কি মনের প্রলেপে ভরাট হয়? মন তো শুধু জানে বাক্যবিন্যাস। তাহার দ্বারা শোকার্তের মন বুঝিতে পারে কিন্তু প্রাণ মানে না। শোকের দহন নিভে না।

মন কি বলে? "দুঃখ করিও না বাছা—এ জীবনের কর্ম শেষ করিয়া তিনি উন্নততর জীবনের পথে চলিয়া গিয়াছেন—তুমিও জীবনের বাকী দিনগুলি তাঁহার পটের দিকে চাহিয়া, তাঁহার খড়ম পূজা করিয়া, হবিষ্য করিয়া কাটাইয়া দাও। মৃত্যুর

পরে আবার তাঁহার সহিত মিলন হইবে—আবার নবজন্মে নূতন করিয়া সুখের সংসার পাতিবে। দুঃখের পর আবার সুখ আসিবে।" "মা, তোমার হৃদয় দুলাল ভগবানের পায়ে কমলের মত ফুটিয়া আছে। সে আবার তোমার কোলে ফিরিয়া আসিবে। হয়তো এই জন্মেই আসিবে।" "দুঃখ করিও না বৎস, সংসারের ধারাই এই। আবার বুক বাঁধিয়া প্রেমের আসন সজ্জিত কর। প্রেম কখনো ব্যর্থ হইবার নয়।" "হৃদয়ের বল হারাইও না। খাটিয়া যাও—সুদিন আসিবে—এজন্মে না হউক পরজন্মে সুখ নিশ্চিত। এ সংসার কর্মক্ষেত্র —কর্ম করিয়া যাও, ফলের দিকে তাকাইতেছ কেন?"

মনের সান্ত্বনা দিবার সবচেয়ে বড় কৌশল কর্মবাদ। ব্যাধি, মৃত্যু, বিফলতা, বিপদ-আপদ, দারিদ্র্য—সকলই ঘটিতেছে তোমার কর্মফলে। কর্মের জমাখরচের খাতায় কোথাও একটু ভুলচুক নাই। অতএব শোকের জন্য দায়ী তুমি নিজেই। ভগবানকে দোষ দিও না। তিনি ন্যায়বান—কখনও কাহারো প্রতি অবিচার করেন না। তিনি মঙ্গলময়—এই সকল দুঃখকষ্টের আঘাত দিয়া তিনি তোমার কর্মক্ষয় করিয়া দিতেছেন। ভাবী মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

সংসারে সকলেই দরদী সাজিতে চায় – কিন্তু মীরা অতি দুঃখে গাহিয়াছিলেন, "দরদ ন জানে কোই"। দরদ জানিবার সামর্থ্য আছে কাহার? পরলোকবাদ, নীতিবাদ, কর্মবাদের বুলি আওড়াইয়া দরদী হওয়া যায় না। দরদীর পন্থা সম্পূর্ণ আলাদা। দরদীর স্পর্শ মনের স্পর্শ নয়—প্রাণের স্পর্শ। সে স্পর্শে বিক্ষুব্ধ শোকসিন্ধুর উদ্বেল তরঙ্গরাজি নিমেষে শান্ত হইয়া যায়—সেই স্তিমিত সলিলবক্ষে তখন চকিতে প্রতিবিম্বিত হয় বিশোক সত্যের মৃত্যুহীন মহিমা। সে স্পর্শে জ্বালাময় বহ্নির সহস্র লেলিহান শিখা মুহূর্তে সঙ্কুচিত হয়—বহ্নি তখন মূর্তি পরিগ্রহ করে নির্মল ভাস্বর আলোকের—যাহা হইতে বিকীর্ণ হয় সর্বশোকহর অক্ষয় জ্ঞানের স্নিগ্ধ প্রভা।

* * *

"শোকসংবিগ্ন-মানস" অর্জুন রথের কোলে বসিয়া পড়িয়াছেন। হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়াছে—মাথা নীচে ঝুঁকিয়া গিয়াছে—সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা—ঠোঁট কাঁপিতেছে—মুখ দিয়া কথা সরিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা দেওয়ার ধারা কিরূপ? গায়েও হাত বুলাইলেন না, মন-যোগানো মিষ্ট কথাও বলিলেন না। করিলেন তিরস্কার—নির্মম তীব্র শাসন। হা রে পাণ্ডিত্যা-ভিমানী বালক, বড় যে নীতি কথা শিখিয়াছিস। তুই তো শুধু ভাটিতেই নৌকা বাহিয়াছিস, উজান-ভাটি দুই পথেই যাঁহারা আনাগোনা করিয়াছেন তাঁহারা কি দেখিয়াছেন শোন্। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, এই দুই-দুই ছাড়াইয়া তবে তত্ত্বের এলাকা—তোর, আমার, আরও সকলের জীবন-সত্যের নির্ণয়—এই জগৎ-সত্যের প্রকাশ। মনটাকে একবার সত্যে তুলিয়া ধর—আবির্ভাবও ফুরাইবে, তিরোভাবও ফুরাইবে, পাওয়া ফুরাইবে, অপাওয়াও ফুরাইবে। শোকের আর অবসর কোথা? পঞ্চপুত্রের নির্মম হত্যায় শোকবিহ্বলা পাঞ্চালীকে, অভিমন্যু-বিরহ-বিবশা কল্যাণী উত্তরাকে এই উপায়েই শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। নীতিকথা শুনাইয়া নয়—সত্যে দৃষ্টি উন্মুখ করিয়া। শ্রীকৃষ্ণ কি হৃদয়হীন ছিলেন?

শ্রাবস্তি নগরে সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে। মৃতপুত্র বুকে লইয়া পাগলিনী জননী তথাগতের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে—আমার এই জীবন-সর্বস্বকে বাঁচাইয়া দাও। এই শোকাগ্নি তথাগত কি উপায়ে নির্বাপণ করিলেন? নিজের বিশাল সহানুভূতি দ্বারা জননীর প্রাণকে স্পর্শ করিয়া জগৎ-ধারার অপরিবর্তনীয় সত্য সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া। সত্যে সকল দ্বন্দ্ব,

সকল মোহের নিষ্কৃতি—সূর্যালোকে সকল অন্ধকারের যেরূপ তিরোধান—সেইরূপ। যাঁহারা দরদী তাঁহাদের সান্ত্বনা তাই প্রথমতঃ অপরিমিত স্বচ্ছ সহানুভূতি দ্বারা শোকার্তের প্রাণকে আকর্ষণ করা—দ্বিতীয়তঃ সেই বিবশ প্রাণকে একটি প্রকাণ্ড ঝাঁকা দিয়া সত্যে উদ্বুদ্ধ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহাই করিয়াছিলেন। সদ্য পুত্রহারা বৃদ্ধ মণি মল্লিক শোকের মর্মস্পর্শী কাহিনী সংক্ষেপে শুনাইয়া হেঁটমুখে বসিয়া আছেন, শুষ্ক বেদনা! চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ ঠাকুর তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ভাবে আত্মস্থ হইয়া গান ধরিলেন—"জীব সাজ সমরে।" সুর ভাবকে মূর্তি দিল—ভাব সত্যকে প্রকাশ করিল। অনন্ত ভূমা জীবনকে দেখিয়া পুত্র-পিতা, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র জীবন লজ্জায় মুখ লুকাইল। মণি মল্লিক শোক ভুলিলেন।

বেদের মত মানুষের হিতৈষী আর কে আছে? জননীর সহানুভূতি বেদের কল্যাণকামনার কাছে অকিঞ্চিৎকর। মানুষের জন্মিবার পূর্ব হইতে তাহার কিসে মঙ্গল হইবে সেই ভাবনায় বেদ আকুল। আয়ু, আরোগ্য, মেধা, বীর্য, বিদ্যা, যশঃ, সুখ, সম্পদ, পুষ্টি, তুষ্টি—কল্যাণের যত ক্ষেত্র আছে সব ক্ষেত্রের পূর্ণ সফলতার জন্য কত না সতর্ক ব্যবস্থা! সেই বেদই আবার শোকে সান্ত্বনা দিবার সময়ে কী কঠোর! ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" জীবন-সত্যকে যদি জানিতে পার তবেই শোককে অতিক্রম করিবে—অন্য কিছু মন-চাহা মিষ্ট কথা জানিনা।

* * *

পারাবারহীন গভীর দুর্লঙ্ঘ্য শোকসমুদ্র। রাম-শ্যাম-মালতী-মাধবীর মন-গড়া মিষ্ট সান্ত্বনা-বাক্যের লঘু ভেলায় এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। মনের দরদীর কাজ নয়। প্রাণের দরদীরা যে পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন সেই পন্থা অনুসরণ কর। লোকাচার থাক্, কর্মফল থাক্, ভালবাসা-ঘৃণা তুচ্ছ হউক। জীবন—মৃত্যু?—তাহাও না হয় পিছে পড়িয়া রহুক। সেই সত্যকার দরদীদের চিরন্তন সহানুভূতির নিবিড় স্পর্শ প্রাণে প্রাণে অনুভব কর। প্রাণের গহন সত্তায় সত্য জাগিয়া উঠিবে। সত্যই নির্ভয়, সত্যই বিশোক, সত্যই প্রকৃত আশ্রয়—যথার্থ সান্ত্বনা।

অন্য সান্ত্বনা নাই।

ভারতের ঋষি

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ

ওগো ভারতের ঋষি!
নবযুগ যদি মাগে পুরাতন,
অচেতন চাহে লভিতে চেতন,
নবীনের সহ প্রবীণ কেতন
উড়াইবে হাসি হাসি।
এস ভারতের ঋষি!

ভারতে তোমার শক্তি
মননে বচনে রয়েছে জীবিত,
ভবনে ভবনে আজিও পূজিত,
কোরকে কুসুম নহে নিদ্রিত
জাগায় তাহার ভক্তি।

চির শাশ্বত সত্য—
জড় বিদ্যায় জড়ের বিলাস,
আত্মবিদ্যায় আত্ম-বিকাশ,
জগৎসভায় এই ইতিহাস
চরম পরম তথ্য।

মানো কল্যাণবাণী,
'শান্তি কিংবা হিংসা প্রধান'
এই কলহের হবে সমাধান,
সুধী জন যদি করে প্রণিধান,
পলাইবে হানাহানি।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম

শ্রীবেলা দে

কাব্যকে শোভিত, শ্রীমণ্ডিত, মনোরম এবং রুচিসম্মত করবার শ্রেষ্ঠ উপাদান প্রেম। আবার সেই প্রেম যদি কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা দেশকে উদ্দেশ না করে সারা বিশ্বকে অবলম্বন করে তবে কাব্য অধিক শোভিত এবং লোক-রুচিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশ্বপ্রেম—এই সার্বজনীন প্রীতি যে-কাব্যে আছে অথবা যে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই এই বিশ্বপ্রেম, সে কাব্য সব সমাজে এবং সব লোকের কাছে স্থান পায়। মানুষ সাধারণতঃ নিজেকেই চেনে, নিজেকেই জানে—পরকে ভালবাসতে জানে না। স্বার্থ-পরতাকে ত্যাগ করতে মানুষ সহজে পারে না। তাই কাব্যে বিশ্বপ্রেম একটা প্রয়োজনীয় বস্তু। এই থেকে মানুষ ক্ষণকালের জন্যও তার সেই স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হতে পারবে। তাই বিশ্বপ্রেম আবার স্বদেশপ্রেমের অনেক উপরে। বাঙ্গালীর এই বিশ্বপ্রেম বহু পুরাতন। পাশ্চাত্যে বিশ্বপ্রেম সৃষ্টি হবার অনেক আগে এখানকার লোকেরা বিশ্বপ্রেমিক হতে শিখেছে। বোধ করি বাংলা দেশে যত প্রেমের কবি জন্মেছেন জগতের কোথাও তত জন্মান নি। এখানকার অধিকাংশ কাব্যই প্রেমরসসিক্ত। গীতিকবিতার বর্ণনীয় বিষয়—মানবহৃদয়ের মধুর ভাব, বাংলার শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের শ্যামলতা, স্বচ্ছ নদনদীর কলগান, বনবনান্তের বিহঙ্গম-বিহঙ্গমার কলরব—এই সকলের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠা স্বাভাবিক। তাই কবিগণ প্রথমে স্বদেশকে ভালবাসতে শেখেন। এই স্বদেশপ্রেমই পরে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার সেই "গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি········ছোট ছোট গ্রামগুলি···

পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা গেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল নিশীথ শীতল
স্নেহ···" প্রভৃতির

সংস্পর্শে এসে তাঁর দেশকে ভাল বেসেছিলেন। কবির অন্তর শেষে স্বদেশপ্রেমের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের পানে ছুটেছে! সারা বিশ্ব তাঁর স্বদেশ, সমগ্র মানবজাতি তাঁর স্বজন। তাই কবি গেয়েছেন—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি

সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরদেশী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

কবির এই বিশ্বপ্রেম জাগে জীবনের প্রথম প্রভাতে। তখন থেকেই তিনি বিশ্বকে ভালবাসতে শিখে ছিলেন—

"আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।"

কবি আপন পর ভাবতে পারেন না—সকলেই তাঁর আপন জন, তাই সকলকেই তিনি সমান ভাবে ভালবাসতেন। তাই তিনি বহুবার বলে গেছেন—

"বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?"

আবার তাঁর মনে হয়—"ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশ দেশান্তরে।"

কবির ইচ্ছা হয় তিনি সকলের মধ্যে বাস করেন। সকল দেশের লোক তাঁর কাছে থাকুক—
"......ইচ্ছা করে আপনার করি
সেখানে যা কিছু আছে,..... ।"

রবীন্দ্রনাথ মর্ত্যলোকে বাস করে স্বর্গ সুখ তুচ্ছ করেছিলেন। তাঁর মর্ত্যলোক বড় আদরের ধন। তাই তিনি মর্ত্যের সীমায় বসে একদিন স্বর্গের দেবতাগণকে বলেছিলেন—
"......স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি !"

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম জেগে ওঠবার পর তাঁর কল্পনা যে দিক্ দিয়ে ছুটেছে শেষে কিন্তু বাংলার গণ্ডী ছেড়ে দেশ দেশান্তরে চলে গেছে। কোনও কবি বিশ্বকে এমন করে ভাল বেসেছিলেন কি না জানি না—তাই তো কবি গাইলেন—
"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি !
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যতো, মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মম হাসিছে গলাগলি।"
আবার—"পেয়েছি এত প্রাণ, যতই করি দান
কিছুতেই যেন আর ফুরাতে নারি তারে !"

তাঁর কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই যেন বিশ্বপ্রেম। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে বিশ্বমানবিকতা নানা ভাবে ফুটে উঠেছে তা তাঁর সাহিত্যকে বিশ্বের নিকট অমর করে রাখবে।

যোগিগুরু ধর্মনাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথমজুমদার

নাথযোগী ধর্মনাথ বা ধরমনাথ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের শিষ্য।[১] জনশ্রুতি এই যে ধর্মনাথ পেশোয়ার হইতে কাথিওবার রাজ্য হইয়া তপস্যার স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে কচ্ছ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি রুক্মাবতীর পূর্ব তীরে র্যান্ নামক স্থানে (মাণ্ডবীর প্রায় দুই মাইল উত্তরে) স্বীয় তপস্যার স্থান নির্দিষ্ট করেন। ধর্মনাথের সঙ্গে শরণনাথ ও গরীবনাথ নামক দুইজন সাধক ছিলেন। কাঁহারও কাঁহারও মত এই যে ধর্মনাথের সঙ্গে কেবল মাত্র গরীবনাথই ছিলেন। এই সময় উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের পিতা এখানে রাজত্ব করিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন চাবাড় রাজপুত রাজা রামদেব তখন এখানকার রাজা ছিলেন। ধর্মনাথ যোগীদের নিয়মানুযায়ী একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষের নিম্নে ধুনি জ্বালিয়া গরীবনাথকে ভিক্ষার জন্য নগরে পাঠাইয়া দিতেন। সে স্থানের লোক ধর্মহীন ছিল। ছুতার জাতীয় একটি স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে ভিক্ষা দেয় নাই। তাই গরীবনাথ বনে গিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ময়দা ক্রয় করিতেন এবং উক্ত স্ত্রীলোকের দ্বারা রুটী প্রস্তুত করাইয়া গুরুর নিকট নিবেদন করিতেন। এই ভাবে বার বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন গরীবনাথ নিদ্রিত ছিলেন। বাতাসে তাঁহার গায়ের কাপড় উড়াইয়া নিল। ধর্মনাথ সে সময় গরীবনাথের দেহের বিভিন্ন কীটপূর্ণ ক্ষত-স্থান দেখিয়া জানিতে পারিলেন যে এই স্থানের লোক অধার্মিক। বনে গিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহের ফলেই গরীবনাথের এ অবস্থা হইয়াছে। ইহা জানিয়া ধর্মনাথ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উক্ত ছুতার স্ত্রীলোকটিকে নগর ত্যাগ করিতে বলিলেন। তৎপর ধর্মনাথ নিজের ভিক্ষাপাত্র উপুড় করিয়া অভিশাপ দিলেন—"পত্তন সব দত্তন" অর্থাৎ পত্তন ধ্বংস হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হউক। জনশ্রুতি আছে যে, ক্ষণকাল মধ্যে ৮৪ পত্তন ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের উপর বর্তমান র্যান্ গ্রাম অবস্থিত।

ধর্মনাথ ক্রোধে পত্তন ধ্বংস করিয়া সন্তপ্ত হন এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর তপস্যা

1, Hodgson's Essays—(Trubner's reprint, Vol. II., P 40

করিবার সংকল্প করেন। তিনি ধিনোধর পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া বজ্রসুপারি আসনে ঊর্ধ্বপদে হেঁট মুণ্ডে প্রস্তরাসনে দ্বাদশ বৎসর তপস্থায় মগ্ন ছিলেন। স্বয়ং ভগবান নয়নাথ চৌরাশীসিদ্ধা সেখানে আসিয়া ধর্ম-নাথকে তপোভঙ্গ করিতে অনুরোধ করেন। ধর্মনাথ বলিলেন 'আমি সর্বপ্রথম যেদিকে চাহিব সেদিকটা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।' ভগবান গোরক্ষনাথ তাঁহাকে উত্তর পূর্ব কোণে সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলেন। ধর্মনাথ তদনুসারে সেদিকে দৃষ্টিপাত করায় অসংখ্য জীব সমেত সাগর শুকাইয়া গেল এবং উক্ত র‍্যান্ নামক ভূগর্ভের সৃষ্টি হইল। এভাবে অসংখ্য জীব নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ধর্মনাগ বলিলেন যে তাঁহার তপস্থার ফল নষ্ট হইতেছে। গোরক্ষনাথ পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন; কিন্তু ধর্মনাথ পর্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ফলে পর্বত দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইটি বৃহৎ অধিত্যকার সৃষ্টি হইল। নাসিকার স্থান ঠিক থাকাতে তাহা নাসিকার আকার ধারণ করিল। ঐ পর্বত আজিও নাসিক বা নাসিকাপর্বত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তৎপর সিদ্ধাদের পর্বত অবতরণকালে সিদ্ধি পানের ইচ্ছা হইল। জলাভাবের জন্য গোপীচাঁদ সিদ্ধ কুণারি দ্বারা পর্বতগাত্রে আঘাত করিয়া জল পাইলেন। ঐ গহ্বর আজিও বর্তমান আছে। একটি দণ্ড দ্বারা আঘাত না করিলে আজিও ইহা হইতে জল পাওয়া যায় না। ইহার জল লবণাক্ত ছিল। তাই সিদ্ধাদের যোগবলে উত্তম জল হইল। ইহা আজিও সিদ্ধবিড় নামে খ্যাত। এখানে সর্বশ্রেণীর লোক আজিও পূজা দিয়া থাকেন। ধর্মনাথ পর্বতের পাদদেশে নামিয়া সেখানে মন্দিরের স্থান নির্দেশ করেন এবং তথায় অন্নসত্র স্থাপন করেন। যে অন্নভিক্ষা না পাওয়াতে তিনি পত্তন ধ্বংস করিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার জন্য সেখানে অন্নসত্র স্থাপন করেন। তারপর তিনি কোথায় গেলেন কেহ জানে না। সাধারণের বিশ্বাস তিনি অমর এবং সূক্ষ্ম দেহে লোকহিতের জন্য আজও বিচরণ করিতেছেন।

ধর্মনাথ ১৪৩৮ খৃঃ অব্দে কচ্ছ প্রদেশে উপস্থিত হন এবং ১৪৫০ খৃঃ অব্দে পত্তন ধ্বংস করেন। আবার এখানকার নাথযোগীদের বংশ-তালিকায় দেখা যায় ধর্মনাথ সংবৎ ৭৯০সনে (৭৩৬ খৃঃ অব্দ) কচ্ছ প্রদেশে আগমন করেন। ধিনোধরে ধর্মনাথের মন্দির আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাত ফুট, দেওয়ালের উচ্চতাও সাত ফুট হইবে। এখানে মর্মর নির্মিত ধর্মনাথের মূর্তি আছে। এখানে পিত্তলের শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য দেবীর মূর্তিও আছে। ধর্মনাথ কর্তৃক জ্বালিত ঘৃতপূর্ণ দীপ আজিও জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহা কখনও নিভিতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় এখানে পূজা হয়। অন্য একদিকে ধর্মনাথের প্রজ্বলিত ধুনি আজিও জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহাও কখনও নির্বাপিত হইতে দেওয়া হয় না। গোকুল অষ্টমী ও নবমীর দিন ধুনিতে প্রচুর কাষ্ঠ দেওয়া হয় এবং ভাত, ময়দা ও চিনি দ্বারা প্রসাদ প্রস্তুত করা হয়। পর্বতের উচ্চ চূড়া ১২৬৮ ফুট। সেখানে ধর্মনাথের মন্দির আছে। ইহা ব্রহ্মক্ষত্রি শেঠ সুন্দরজী শিবাজী ১৮৭৭ সংবৎ অব্দে নির্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরমধ্যে ত্রিকোণাকার একটি গর্ত আছে। প্রবাদ আছে যে এখানে মাথা রাখিয়া ধর্মনাথ তপস্যা করিতেন। সিন্দুর ও ঘৃত দ্বারা ইহা লেপিয়া রাখা হইয়াছে। মাড়োয়ার ও যোধপুরে ধর্মনাথের মন্দির আছে। যোধপুরের মহারাজা এখানকার পৃষ্ঠপোষক।

পণ্ডিত লিওনার্ড সাহেবের মতে গোরক্ষনাথ ধর্মনাথের সতীর্থ। ধর্মনাথের শিষ্য গরীবনাথ। এই গরীবনাথ জাটদিগকে বিতাড়িত করিয়া বেরার রাজ্যে রায়ধনকে ১১৭৫-১২১৫ খৃঃ অব্দ মধ্যে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩] কচ্ছভাষায়ও এ-সম্বন্ধীয় প্রমাণ আছে। যথা—

"গরবো গরীবনাথ। আযো মুখ আবাজ।
কুড়াজত কচি ভিন্নো রায়ধনকে রাজ॥" *
(Ind. Ant. Vol. VII. P-49)

*Indian Antiquary of 1878 February. History of the Kanphatas of Cutch. By D. P. Khakar অবলম্বনে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিত।

২ Note on the Kanphata Yogi. Indian Antiquary, Vol. VII, P. 298-300.

৩ Indian Antiquary, Vol, VII. P. 49

সমালোচনা

দেশ-বিদেশের মহামানব (১ম ভাগ) —স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বজবজ, ২৪ পরগনা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৬৮; মূল্য ৩৲ টাকা।

গ্রন্থখানি রাজর্ষি আখনাটন, দাদুদয়াল, গৌড়পাদ, সক্রেটিশ, শঙ্করাচার্য, কনফুসিয়াস্, তুলসীদাস, লাল্লেশ্বরী, কমলাকান্ত, রামমোহন, প্লেটো, মোক্ষমুলর, মাইষ্টার একহার্ট, জ্ঞানেশ্বর, এমার্সন, ক্রীষ্টিন, কাইসারলিং, নরসিংহ মেহ্তা, উইলিয়ম জোন্স, মনিয়ার উইলিয়ম, হাক্সলি, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি ২৬ জন মহাপুরুষ ও মনীষীর জীবনী ও বাণীর সুন্দর সংগ্রহ। এই সকল জীবনীর অধিকাংশই পূর্বে 'উদ্বোধন', 'প্রবর্ত্তক', 'মাসিক বসুমতী', 'দেশ' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকগুলি জীবনী দুষ্প্রাপ্য এবং বাংলা ভাষায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। জীবনী ও বাণীগুলির উপাদানসংগ্রহে গ্রন্থকারের শ্রমশীলতা, যত্ন ও উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়।

মহাজ্ঞানী ও মহাজনগণের অমূল্য জীবনকথা ও বাণী অফুরন্ত প্রেরণার আকর—দুঃখ-দ্বন্দ্ব-নৈরাশ্য-সংকুল সংসারে অব্যর্থ আলোক-বর্তিকা-স্বরূপ। তাঁহারা যে পথে গমন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় ও বরেণ্য হইয়াছেন, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করিলে নিজেদের জীবনকে সুন্দর, মহৎ ও কল্যাণপ্রদ করিতে পারি। তাঁহাদের জীবনী পাঠ, অনুধ্যান ও অনুবর্তনের ইহাই সার্থকতা। এদেশের মহাজন ও মনীষিগণের জীবনী ও বাণীর সহিত পরিচিত হওয়া যেমন সকলেরই বিশেষতঃ যুবসম্প্রদায়ের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, তেমনি বিদেশীয় মহামানবগণের বিষয় জানাও তুল্যরূপ প্রয়োজনীয়। তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা দ্বারা মন সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সার্বভৌম উদার দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা, সৌভ্রাত্র, প্রেম ও সহযোগিতা স্থাপনের পথ সুগম হয়। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে গ্রন্থখানির উপযোগিতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তরল সাহিত্য ও কুরুচিপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস-প্রকাশনাধিক্যের যুগে এরূপ একখানা সুন্দরগ্রন্থ যুব-সম্প্রদায়ের অশেষ কল্যাণসাধন করিবে। গ্রন্থখানির ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল; বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীও সুন্দর। দুরধিগম্য তত্ত্বগুলি সহজবোধ্য করিবার সযত্ন প্রয়াস করা হইয়াছে। আশা করি, প্রত্যেক সাধারণ এবং স্কুল-কলেজের পাঠাগারে গ্রন্থখানি স্থান পাইবে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এরূপ একখানা গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

মাষ্টার মহাশয়ের কথা—শ্রীলব রচিত। প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড। ১৪এ, কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে ব্যানার্জী ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত। ৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ আনা।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসহচর পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীম (মাষ্টার মহাশয়) 'কথামৃত' লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত এই বইখানি ভক্তগণের মনোরঞ্জন বিধান করিবে বলিয়া আশা করি। সংসারের নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে আজ সকলে ক্লিষ্ট ও অবসন্ন। সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় লিখিত উপদেশ ও আশ্বাসবাণী সত্য সত্যই তাহাদের মনে আশার সঞ্চার করিবে। ইহাতে ভক্ত ও সাধকের মনের অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান আছে। বইখানি পড়িলে অজ্ঞাতসারে মন পূজনীয় "মাষ্টার মহাশয়ের" ঘরে চলিয়া যায় ও সেখানে ভক্তবৃন্দসনে তাঁহার মুখনিঃসৃত মধু পান করিতে থাকে। মুদ্রণে কিছু কিছু ভুল আছে। ৪৮ পৃষ্ঠায় বেলঘরের তারক বাবুকে 'স্বামী শিবানন্দজী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভুল। 'মহাপুরুষ' স্বামী শিবানন্দজীরও পূর্বাশ্রমেরনাম ছিল তারক, কিন্তু তিনি ছিলেন বারাসতের তারক। বেলঘরের তারকও শ্রীরামকৃষ্ণের একজন গৃহীভক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী হন নাই। প্রসঙ্গটি হয়ত বেলঘরের তারক সম্বন্ধে হইয়াছিল। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে এই সকল ভুল থাকিবে না। পুস্তকখানি 'কথামৃতের' অনুকরণে লিখিত হওয়ায় পাঠক-পাঠিকার পক্ষে আকর্ষণীয় হইবে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের অন্যান্য সংখ্যার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম। ইহার সমস্ত আয় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাপূজায় ব্যয়িত হইবে বলিয়া গ্রন্থকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৪৭ সনের কার্য-বিবরণী—গত ৮ই কার্তিক, রবিবার, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের উনচত্বারিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য-বিবরণী পরিগৃহীত হইয়াছে :

কেন্দ্রসমূহ—আলোচ্য বর্ষে মিশনের সর্বশুদ্ধ ৬৬টি কেন্দ্র এবং ৮টি শাখাকেন্দ্র জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সেবা এবং অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম ধর্ম প্রচার করিয়াছেন।

সেবাকার্য—মিশন ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৪৮ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থীদের সেবাকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। ৫,৬২৬ খানা বাসন, ১৫,৪০১ খানা কম্বল, বস্ত্র ও পোষাক বিতরিত হইয়াছে। মার্চ মাসে আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় যখন খুব বেশী ছিল তখন দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্র হইতে দৈনিক ২৩,৬৩৮ জনকে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। চিকিৎসা-কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ২৭৫ জন আশ্রয়প্রার্থী রোগী চিকিৎসিত হন। কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের অর্থসাহায্যে এই কার্য নিষ্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত মিশন লেডি মাউণ্টব্যাটেন ফণ্ড এবং জনসাধারণের দান হইতেও প্রভূত সাহায্য পাইয়াছেন। গবর্নমেণ্টের সাহায্যের পরিমাণ—৩০,৭৬৫৲ টাকা এবং লেডি মাউণ্টব্যাটেন ফণ্ড ও জনসাধারণের দানের পরিমাণ ৩১,৬১৩৲ টাকা।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় মিশনের সেবাকার্য এখনও চলিতেছে। তথায় ২৬টি বিপন্ন বালকের জন্য দুইটি ছাত্রাবাস খোলা হয় এবং দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে চাল বিতরিত এবং ৯৫,০০০৲ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদত্ত হয়। আগামী দুই মাসের মধ্যে সেবাকার্য বন্ধ করা হইবে। সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পর্যন্ত শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার ও হবিগঞ্জের দাঙ্গা-পীড়িত লোকগণকে ৮,৫০০৲ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে।

অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চট্টগ্রামের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে মিশন ১০,৪৪৯৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৬,৫১৭। এতদ্ব্যতীত শাখাকেন্দ্রসমূহ সাক্ষাৎভাবে আরও অন্যান্য ছোটখাট সেবাকার্য করিয়াছে।

চিকিৎসা-বিভাগ—মিশন ৫টি সাধারণ ও ১টি শিশুমঙ্গল হাসপাতাল পরিচালন করিয়াছেন। এ গুলিতে মোট ৪০৭টি বেড্ ছিল এবং ১২,৬৪৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে দিল্লীর যক্ষ্মা হাসপাতালসহ ৪৫টি চিকিৎসালয়ে সর্বশুদ্ধ ১২,১২,৮৭৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

দরিদ্রের সাহায্য—দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে ৭৯০ মণ চাল, ১,০৮২ খানা কম্বল, ধুতি ইত্যাদি বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১,০৩৬ জন ব্যক্তিকে সাময়িক সাহায্য বাবদ ৪৪,৮২৫৷৵০ দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ১০০ জনের অধিক ছিল ছাত্র।

শিক্ষাবিস্তার ও প্রচার—মিশন কর্তৃক ২টি কলেজ, ৫টি আবাসিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭টি অনাথাশ্রম পরিচালিত হইয়াছে। এ গুলিতে মোট ৫,৭২৮ জন বালক এবং ১,৮২১ জন বালিকা ছিল। ৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬,৮৯৫ জন বালক এবং ৩,৫৬৯ জন বালিকা, ১৩টি নৈশ বিদ্যালয়ে ৫০৭ জন ছাত্র, ২টি শিল্পবিদ্যালয়ে ৩০৪ জন বালক শিক্ষালাভ করিয়াছে। মিশন ৪০টি বিদ্যার্থী ভবন পরিচালনা করিয়াছেন।

এগুলিতে মোট ২,৯৪২ জন ছাত্র বাস করে। মিশনের মূলকেন্দ্র ৯টি বিদ্যালয়কে মোট ৪৩২৲ টাকা মাসিক সাহায্য করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়-গুলিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫৭০।

মহিলাদের মধ্যে সেবাকার্য—মিশন কাশী সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগ, শিক্ষাদান বিভাগসহ মাতৃ-মঙ্গল হাসপাতাল ও দুঃস্থিত মহিলা নিবাস, মান্দ্রাজের সারদা বিদ্যালয়, কলিকাতার ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিচালন করিয়াছেন।

ভারতের বাহিরে প্রচারকার্য—মিশন মরিশস্, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের কার্য পরিচালন করিয়াছেন।

আয়-ব্যয়—১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষে মিশনের আয় ছিল ৪৪,৭৭,৮৬৪।৶৬ পাই এবং ব্যয় ৪৫,৩৭,৯২১৴৮ পাই।

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন হোম্ অব্ সার্ভিস্-এর ৪৭তম বার্ষিকী:—গত ১৭ই আশ্বিন এই প্রতিষ্ঠানের ৪৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি সভা আহূত হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তপ্রদেশের স্বাস্থ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চন্দ্রভানু গুপ্ত। ঐ দিবস তিনি মহিলাবিভাগের 'বীরেন দত্ত স্মৃতি আউট্ ডোর ডিস্পেন্সারী' গৃহেরও উদ্বোধন করেন। সভায় এই প্রখ্যাত সেবাকেন্দ্রের ১৯৪৭ সনের কার্যবিবরণী পঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ইহার ইনডোর সাধারণ হাসপাতালে ২৪৩৯জন রোগীর চিকিৎসা হয় এবং আউট্ ডোর ডিস্-পেন্সারীতে ৮৯৯০৭ জন নূতন রোগী এবং ২২০৮৫৫ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হন। উভয় আরোগ্যশালার রোগিসংখ্যা গড়ে দৈনিক ছিল ৮৫১·৪। এই বৎসর ১৫৩৯ জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৫৮৩ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য দান করা হয়। আলোচ্য বর্ষের মোট আয় ৮৭৫৮৪॥১১ পাই এবং মোট ব্যয় ১০৩৭৩১৶৫ পাই। সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা এবং ভারতীয় থিওসফিক্যাল্ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রোহিত মেহ্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত মেহ্তা রামকৃষ্ণ মিশনের সাংস্কৃতিক অবদানের উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই সুমহান্ প্রতিষ্ঠানের উচ্চাদর্শই মানবজাতিকে কল্যাণমার্গে আস্থিত করিতে সমর্থ। সভাপতি মহোদয় ও সেবাশ্রমের বহুধা-বিস্তৃত সেবাকার্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি এই লোককল্যাণকর সেবাকেন্দ্রের কয়েকটি অপরিহার্য প্রয়োজনের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্বয়ং ৩০০০৲ টাকা দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। স্বামী তেজসানন্দজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন ধর্মনিরপেক্ষ সেবা-প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে, সুগভীর আধ্যাত্মিক আদর্শই ইহার বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মূল উৎস।

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও সেবাশ্রম:— আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪১-১৯৪৭ সনের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। ১৩৪৯ সনের বাত্যার সময় হইতে ৫ বৎসর যাবৎ এই আশ্রম দুর্গতগণের সেবাকার্য পরিচালন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কাঁথি, হলুদবাড়ী, খেজুরী, মাঝিরচক এই চারিটী সেবাকেন্দ্রের কার্য কাঁথি সেবাশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল। আশ্রমের কর্মীদের তত্ত্বাবধানে মহকুমার বহু পুষ্করিণীর সংস্কার, অনেক কুটীর নির্মাণ এবং বিদ্যালয়সমূহে সাহায্য করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সনের নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত দুর্গতদের সাহায্যকল্পেও এই সেবাশ্রম যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আশ্রমপরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯৪১

হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত মোট ১২,৬৬১৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন এবং ৩১৪৩ জন রোগীকে কুইনাইন বিতরণ করা হইয়াছে। ধর্মপ্রচার-বিভাগ হইতে আলোচ্য কয়েক বৎসরে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ১০০টী ধর্ম-বক্তৃতা এবং ৪৩৮টী আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠাগারে ১৮১৫ খানা পুস্তক আছে। এই কয় বৎসরে পঠিত পুস্তকসংখ্যা ১১৪৬০। আশ্রম কর্তৃক একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, দুইটি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় ও দুইটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে। বিদ্যার্থি-ভবনে আলোচ্য বর্ষসমূহের প্রতি বৎসর গড়ে ১১টি ছাত্র স্থান পাইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫টি অবৈতনিক, ৫টি আংশিক বৈতনিক। মঠ বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি-পূজা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি, প্রতি একাদশীতে শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্ত্তন ও প্রতি পূর্ণিমায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ১৩৪৯ সনের বাত্যায় এই আশ্রম বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মন্দির, নাটমন্দির, অতিথি-ভবন ও বিদ্যার্থি-ভবন প্রভৃতি নির্মাণ-কল্পে সাহায্য দানের জন্য এই আশ্রম বদান্য ব্যক্তিদের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে জনসভা—গত ১৪ই কার্তিক সন্ধ্যায় পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী হলে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী ‘স্বাধীন ভারতে পরিবর্তন’ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, “আবহমান কাল হইতে ভারত সত্য, ধর্ম, ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। স্বাধীন ভারতেও এই পরিবর্তন অপরিহার্য। বর্তমানে ইহা আমাদের উপর হঠাৎ আরোপিত হওয়ায় আমরা জাতীয় জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। এইজন্য আমাদের সম্মুখে বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—প্রত্যেক জাতিরই জাতীয় জীবনের একটি বিশেষত্ব থাকে, ভারতের বিশেষত্ব ধর্ম। ভারতবাসী যদি তাহাদের বিশেষত্ব ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সর্ববিধ পরিবর্তন গ্রহণ করে তাহা হইলে যে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।” রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস স্বামীজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের জন্মোৎসব—গত ২৪শে কার্তিক শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা দিবসে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের জন্মোৎসব এই আশ্রমে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে সমস্ত দিবসব্যাপী পূজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, ভজন, কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহাত্মা রামচন্দ্রের জীবনী পাঠ ও আলোচনা হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত নর-নারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত। মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে স্বামী বিশোকাত্মানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। ৩৬২ পৃষ্ঠা, বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ৪৲ টাকা।

ইহাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবনী ও উপদেশ লিপিবদ্ধ।

বিবিধ সংবাদ

চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ১৬ই কার্তিক শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা উপলক্ষে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দজী সভায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্ "তন্ত্রসাহিত্যে ও তান্ত্রিক সাধনায় বাংলার দান" এবং ডক্টর নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী "শক্তিপূজা ও শক্তিতত্ত্ব" সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে শক্তিপূজার মূল রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মণ্ডপের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বসু কর্তৃক ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়। বহু ভক্ত-সুধী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ডিঙ্গাখোলা (হাওড়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সমিতি—গত ১৪ই কার্তিক এই প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত গৃহের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং পরে প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় আরতির পর সমিতিপ্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ প্রামাণিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত ধর্মসভায় শ্যামপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত বনমালী জানা, ডাক্তার বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক, শ্রীযুক্ত রামপদ বাগ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা দেন। ঐ দিবস রাত্রিতে শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৭।১৮ই কার্তিক স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক "জন্মভূমি" ও "সোনার বাংলা" নামক নাটক অভিনীত হয়।

পরলোকে শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাক—ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাক মহাশয় গত ১০ই কার্তিক ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জস্থ নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়বলে তিনি মানিকগঞ্জ বারের সর্বশ্রেষ্ঠ মোক্তাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মোক্তারী ব্যবসায়ে মাসিক প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া তিনি উহা নিজের ভোগ-বিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় বা সঞ্চয় না করিয়া দেশের বহু গরীব ছাত্রের আহার, বাসস্থান ও পড়াশুনার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থপরতা অসাধারণ ছিল। রজনীবাবু মোক্তারী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং পরে দেশের শিল্পোন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করিয়া ঢাকেশ্বরী কটন মিলস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। রজনীবাবু রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবানের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা।

স্বাধীন ভারতে সামরিক জীবনের আদর্শ—গত আশ্বিন মাসে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলেন, "পূর্বে ভারতীয় সেনাদলকে 'বেতনভুক' বলা হইত। কিন্তু উহার যৌক্তিকতা আমি কোন দিনই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সেনাদলে

কাজ করাকে একটা 'পেশা' বলিলেই বরং ভাল হইত। চিকিৎসক যেমন চিকিৎসা করিয়া আনন্দ পান এবং রোগীর রোগ নিরাময় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করেন, তেমনই পেশা হিসাবে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করা হইত। সৈন্যগণ পেশা হিসাবে সৈনিক-জীবন অবলম্বন করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জন করিয়াছেন এবং দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। উহাকে বলা যায়, পেশাদারী সৈনিক বৃত্তি।

"আজ আপনাদের আনন্দ অপেক্ষাকৃত বেশী। যদি আপনারা অন্যদের তুলনায় বা পূর্বাপেক্ষা কম বেতনও পান বা অর্থের মূল্য যদি হ্রাস পাইয়াও থাকে, তথাপি আপনারা এই ভাবিয়া আনন্দবোধ করিতেছেন যে আপনারা কেবলমাত্র একটি পেশা হিসাবেই সৈনিকের জীবনযাপন করিতেছেন না—আপনারা আপনাদের দেশবাসীরও সেবা করিতেছেন। ভারতের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও প্রত্যেক অফিসারের উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে আজ যে নূতন আনন্দের পরিচয় পাইতেছি, কয়েক বৎসর পূর্বেও তাহা পাই নাই।

"পূর্বে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা বোধ ছিল। সৈন্যগণকে ৯০ ডিগ্রী মোড় ঘুরিতে বলিলে বা মার্চ করিয়া অগ্রসর হইতে বলিলে তাঁহারা নিখুঁতভাবেই তাহা করিতেন। কিন্তু গত বৎসর আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে সিনিয়র অফিসাররা কিছুটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—কেননা, তাঁহারা দেখিতে পান যে, সৈন্যগণ ৯০ ডিগ্রী মোড় না না ঘুরিয়া ৮৮ ডিগ্রী মোড় ঘুরিতেছেন। নবলব্ধ স্বাধীনতার চিন্তায় তাঁহারা আর দুই ডিগ্রীর কথা বিস্মৃত হইয়াছেন দেখা গেল। সৈন্যদের মধ্যে কিছুটা শৈথিল্য দেখিয়া অফিসাররা উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। সৈন্যদের মধ্যে কেহ বলিতেছেন 'জয়হিন্দ', কেহ বলিতেছেন 'নমস্তে'—মোট কথা, কোন্ ঘটনা উপলক্ষে কি সম্ভাষণ জানাইতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"সমস্ত ব্যাপারেই কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা যে নূতন আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তাহার জন্যই এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সমস্ত ব্যাপারেই এখন একটা স্থিতাবস্থা আসিয়াছে এবং আমি ভারতের প্রত্যেক সৈন্যের মুখই পূর্বাপেক্ষা সুন্দর দেখিতেছি, কারণ মনে আনন্দ থাকিলেই সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। তাহাদের মন এখন সুস্থ। অফিসারদের প্রতি, সৈন্য-বাহিনীর প্রতি, সৈনিক বৃত্তির প্রতি এবং দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে আর কোন প্রকার মতভেদ নাই। প্রত্যেকেই এখন অত্যন্ত আনন্দিত। এই আনন্দের জন্য আমরা কি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে পারি না?

"বর্তমানে ভারতবর্ষে সমস্ত বৃত্তির মধ্যে সৈনিক-বৃত্তিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। সকলেই যে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করিতে চাহে তাহা নহে, তবে সকলেই সৈন্যবাহিনীকে ভালবাসে। অপরের প্রীতি লাভ অপেক্ষা আনন্দের আর কিছুই নাই। আপনাদের বেতন ছাড়া ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ। পূর্বতন সৈন্যাধ্যক্ষ, সামরিক অফিসার এমন কি সুবেদারগণ পর্যন্ত এইরূপ ভালবাসা লাভ করেন নাই। কিন্তু আজ সকলেই আপনাদের ভালবাসে। সুতরাং আপনারা গবর্নমেন্টের নিকট হইতে যে অর্থ পাইয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেকটি স্বর্ণের—রৌপ্যের নহে। ইহা জনসাধারণের প্রীতির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সেই কারণেই আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।

সৈন্যগণ আজ দেশের মধ্যে কিরূপ জনপ্রিয় তাহা বর্ণনা করিয়া রাজাজী বলেন, "আপনারা জানেন না যে, কত লোক সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার জন্য আমার অথবা প্রধান মন্ত্রীর নিকট

অর্থ দিতে প্রস্তুত। আমি আপনাদের জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি, কারণ আজ দেশের জনসাধারণের মনোভাবই এইরূপ। বাজেটে কর নির্ধারণ এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিবর্তে গবর্নমেণ্ট আজ যদি বলেন যে, সৈন্যবাহিনীর ভালর জন্য জনসাধারণ ইচ্ছানুযায়ী অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে, তবে দেশরক্ষার জন্য এযাবৎ যাহা করা হইয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী রাজস্ব আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব।

"আমি আপনাদের অনেককে কথা বলিবার কায়দা রপ্ত করিতে দেখিয়াছি। পূর্বের ন্যায় কেবলমাত্র পরস্পরকে হত্যা করিয়াই বর্তমানে যুদ্ধ চলে না। আধুনিক কালে কথা বলিয়া, লিখিয়া এবং আমরা কি করিতে পারি তাহা অপর পক্ষকে জানাইয়াই যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। এই ভাবে প্রতিপক্ষকে অনেকটা সন্ত্রস্ত করা যায়। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধে কথা বলার এবং লিখিবার উপকারিতা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। পূর্বকালে আজ্ঞা পালনের জন্যই লোকে জন্মগ্রহণ করিত, কিন্তু আজকাল কেহ অন্ধভাবে কাহারও আজ্ঞা পালন করে না। আপনাকে প্রথমে বুঝাইতে হইবে যে, কি কারণে অপরে আপনার আজ্ঞা পালন করিবে। সুতরাং কথা বলার এবং ব্যাখ্যার দ্বারা আপনারা এখানে যাহা শিক্ষা করেন তাহা অনাবশ্যক নহে। দেশরক্ষার ব্যাপারে ইহা অস্ত্রশস্ত্রের অংশবিশেষ। সেই কারণেই আমি বলিতেছি যে, যদি আমি যুবক হইতাম, তবে আমি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র অথবা শিক্ষকরূপে যোগদান করিতাম।

"আমি আপনাদের সমস্ত কর্তব্যে সাফল্য কামনা করি। আমি আশা করি যে, কোন যুদ্ধ যেন না হয় এবং আমাদের যেন কোন যুদ্ধ করিতে না হয়। আমাদের অস্ত্র রাখিতে হইবে কিন্তু যুদ্ধ করিবার জন্য ইহা ভাল নয়। আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে কিন্তু আমাদের ধৈর্য হারাইলে চলিবে না। যে কোন দেশের সর্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিই সেই দেশের সৈন্য। অসামরিক ব্যক্তিগণই অনেক সময় যুদ্ধ চায়। শক্তিসম্পন্নগণই এই মনোভাব দমন করিতে পারে। আমি আপনাদের শক্তি কামনা করি।"

সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা—একটি জাতীয় সামরিক বিদ্যালয় (ন্যাশনাল ওয়ার একাডেমি) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এক সংবাদে প্রকাশ, যতদিন পর্যন্ত না ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ততদিন দেরাদুনস্থিত ভারতীয় সামরিক শিক্ষালয় (ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমি) একটি অন্তর্বাহিনী শাখা যোগ করিয়া রাখা হইবে। আগামী ১লা জানুয়ারী (১৯৪৯) হইতে সশস্ত্র বাহিনী শিক্ষালয় নামে ঐ শিক্ষালয়ের পুনরায় নামকরণ করা হইবে। অন্তর্বাহিনী শাখাটি ঐ শিক্ষালয়ে নিম্নতর শাখাস্বরূপ হইবে।

স্থল নৌ ও বিমান এই তিন বাহিনীর শিক্ষার্থীদিগকে দুই বৎসর কাল অন্তর্বাহিনী শাখায় সম্মিলিতভাবে শিক্ষাদানের পর পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। নৌ ও বিমান বাহিনীর শিক্ষার্থিগণ উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যাইবে। স্থলবাহিনীর শিক্ষার্থিগণ সামরিক শাখায় প্রবেশ করিবে এবং আরও দুই বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিবে।

শিক্ষাদান ব্যবস্থা দুইভাগে বিভক্ত থাকিবে। প্রথমভাগে ইংরাজি, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, আধুনিক ভাষা, কারখানার কাজকর্ম, নাগরিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় ভাগে শরীরচর্চা, ড্রিল, অস্ত্রশস্ত্র চালনা, প্রাথমিক যুদ্ধবিদ্যা, তিনটি বাহিনীর সংগঠন ও পরিচালনা, মানচিত্র পাঠ ও নৌবিদ্যা, বেতার, টেলিফোন ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থী-

দের বয়স অন্যূন ১৫ ও অনধিক ১৭ বৎসর হওয়া চাই।

মোট ৪৭৫ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হইবে। উহাদের মধ্যে ৫০ জন নৌবাহিনীর জন্য, ৩২৫ জন স্থলবাহিনীর জন্য, ৫০ জন বিমান বাহিনীর জন্য এবং ৫০ জন দেশীয় রাজ্য বাহিনীর জন্য। অন্তর্বাহিনী শাখায় জানুয়ারী মাসে একবার এবং জুলাই মাসে আর একবার শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে।

অন্তর্বাহিনী শাখায় প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে শিক্ষার্থীদিগকে ম্যাট্রিক অথবা অনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। পরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে তাহাদিগকে আবার পরীক্ষা দিতে হইবে। কমিশন যাহাদিগকে নির্বাচন করিবেন তাহাদিগকে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য বাহিনীর নির্বাচনী বোর্ডের নিকট পাঠানো হইবে। নির্বাচনী বোর্ডের নিকট কেহ প্রত্যাখ্যাত হইলে, নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যেই তাহাকে পুনরায় নির্বাচনী বোর্ডের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার ফি বাবদ ৭৫৲ দিতে হইবে। পরীক্ষার্থী যদি শতকরা ৩৫ নম্বর পায় তবে তাহার প্রদত্ত ফি ফেরৎ দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে:—ইংরেজী ৩০০ নম্বর, সাধারণ জ্ঞান ও চল্‌তি সংবাদ ৩০০ নম্বর, অঙ্ক ৩০০ নম্বর। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে পরীক্ষার্থীদের শতকরা ৫০ নম্বর পাওয়া চাই। নৌ ও বিমান বাহিনীর শিক্ষার্থীদের উত্তম দৃষ্টিশক্তি থাকা দরকার। নির্বাচনী বোর্ড যে সকল শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করিবেন তাহাদের আবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

শিক্ষাধীন থাকা কালে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন, আহার ও বাসস্থানের জন্য ব্যয় লাগিবে না। তাহা ছাড়া প্রতি শিক্ষার্থী মাসে ৭৫৲ করিয়া পাইবে। ইহা ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেওয়া হইবে। অতঃপর অভিভাবকদিগকে শিক্ষার্থীদের পকেট খরচ বহন করিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণ যদি শিক্ষালয় হইতে সরিয়া পড়ে তবে গবর্নমেণ্ট তাহাদের জন্য যে ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা অভিভাবকগণ গবর্নমেণ্টকে ফেরৎ দিবেন এই মর্মে তাঁহাদিগকে অঙ্গীকারপত্র দিতে হইবে।

বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনী—সরকারী দপ্তরখানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এই প্রদেশে যে বাঙ্গালী সেনাবাহিনী (মিলিসিয়া) গঠন করা হইতেছে অধিক সংখ্যায় তাহাতে যোগদান করিবার জন্য এবং এই সম্পর্কে অন্যান্য প্রদেশের যুবকবৃন্দের তুলনায় পশ্চাতে পড়িয়া না থাকিতে বাঙ্গালী যুবকগণকে আহ্বান জানান।

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, বহু আশা লইয়া তিনি বাঙ্গালীদের একটি সেনাবাহিনী বা মিলিসিয়া গঠন করিবার অনুমতি দিবার জন্য গত বৎসর ভারতের দেশরক্ষা সচিবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রস্তাবিত ঐ সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য এযাবৎ যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত কম বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রধান মন্ত্রী জানান যে, বিহার ও উড়িষ্যা নির্দিষ্ট তারিখ ১৫ই আগষ্টের মধ্যেই স্ব স্ব প্রদেশে নিজেদের মিলিসিয়া বা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ এই ব্যাপারে এখনও পশ্চাতে পড়িয়া আছে; বাঙ্গালী মিলিসিয়াতে এপর্যন্ত যে সংখ্যক লোক সংগৃহীত হইয়াছে তাহা মোট পরিমাণের অর্ধেক মাত্র।

প্রধান মন্ত্রী দুঃখের সহিত জানান যে, প্রস্তাবিত দুইটি বাঙ্গালী মিলিসিয়ার জন্য এযাবৎ মাত্র ৭৮০ জন লোক পাওয়া গিয়াছে। তবে বঙ্গীয় জাতীয় রক্ষী দলে যোগদানের জন্য যুবকদের নিকট হইতে

যে অপ্রত্যাশিত সাড়া মিলিয়াছে তাহাতে প্রধান মন্ত্রী বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, ঐ বাহিনীর পরবর্তী দলে শিক্ষালাভার্থে ইতোমধ্যেই ১২ শত লোক প্রার্থী হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে ঐ বাহিনীর সামরিক শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

যাদবপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলনী সমিতির গবেষণাগার—গত আশ্বিন মাসে যাদবপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলনী সমিতির নূতন গবেষণাগারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়।

সেখানে মনোরম গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ৩৭ বিঘা সমন্বিত জমিতে একটি দ্বিতল গৃহে ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলনী সমিতির ঐ গবেষণাগার স্থাপিত হইবে। ইহার জন্য আনুমানিক ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ হইবে। এই পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোটামুটি অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

কলিকাতার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি মূল বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে সাতটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ডাঃ রায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, "বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলনী সমিতির অবদান অসামান্য। ইহা সার সি ভি রমন্, সার কে এস কৃষ্ণনের ন্যায় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের জন্ম দিয়াছে। আমাদের রাজনীতিবিদ এবং বিজ্ঞানিগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যদি ভারতকে জাতিপুঞ্জ-পরিষদের মধ্যে যথাযথ স্থান গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাকে অতি দ্রুত ব্যাপকভাবে মূল ও ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বর্তমানে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, একমাত্র এই প্রকার গবেষণাই যে কোন দেশে যুদ্ধ অথবা শান্তির সময়ে সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারে। আশা করা যাইতেছে যে, ভারতে একটি নবযুগের সঞ্চার হইতে চলিয়াছে, যখন জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে মূল ও শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণাগুলিকে কাজে লাগান হইবে।

আমি আশা করি যে, ভারতে শীঘ্রই বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইবে এবং মানবসমাজের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা হইবে।"

স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান—বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা দানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার স্থলে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রভাষা অথবা স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার অনুরোধ জানাইয়া ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ এবং প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহারা আরও অনুরোধ করিয়াছেন যে, এই পরিবর্তনকালে উচ্চতর শিক্ষায় ইংরাজীকে অবশ্য পাঠ্য বিষয় করিলেও সেখানে যেন সাহিত্যের বদলে কেবল ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রথম ডিগ্রীকোর্সের সময় যাহাতে ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রভাষার জ্ঞান পরীক্ষা করা হয় সেই মর্মেও বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাদপ্তর একটি প্রেসনোটে জানাইয়াছেন যে মাধ্যম নির্ণয়ের জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, ভারত সরকার তাহাদের সুপারিশ মানিয়া লইয়াছেন, এবং শিক্ষা দপ্তরের অভিমতে জাতীয় শিক্ষার মঙ্গলের জন্য যতশীঘ্র সম্ভব, এইসব সুপারিশ কার্যকরী করিতে হইবে।

আমেরিকায় মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি-গ্রন্থাগার—মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের ইথাকাস্থিত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মহাত্মা গান্ধী নিহত হইবার পর ভারতীয় ছাত্রগণ গান্ধী

স্মৃতি গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাহেন। কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা এই প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারের একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ৫ জন সদস্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। ইহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দুইজন সদস্যও আছেন। উক্ত কমিটি সাহায্য ও উপদেশের জন্য ভারতবর্ষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০০০ ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সর্বোচ্চ ১০০ ডলার ও সর্বনিম্ন ২৫ সেন্ট অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। বহু ভারতীয় প্রকাশক এই গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। মার্কিন সংবাদপত্র ও বেতার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই কমিটির প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া ব্যাপক প্রচারকার্য চালান। সংগৃহীত অর্থ পুস্তক ক্রয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করা হইবে। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৪৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী এই গ্রন্থাগার খোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি গ্রন্থাগার কমিটির অফিস ৩০১নং ব্রায়ান্ট এভেনিউ, ইথাকা, নিউইয়র্ক—এই ঠিকানায় অবস্থিত। নিউইয়র্কের কমিউনিটি চার্চের ডাঃ জন হোম্‌স্‌ মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুগামী। গত বৎসর ভারত পরিদর্শনের সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। 'গান্ধীজী-সম্পর্কিত তাঁহার ৪০০ পুস্তক ও পুস্তিকা তিনি স্থায়ী ভাবে ও নিরাপদে রাখিবার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াইডেনার গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী পৌষ মাসে 'উদ্বোধনে'র ৫০শ বর্ষ শেষ হইবে; আগামী মাঘ মাস হইতে ৫১শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক পৌষ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে তাঁহাদের দেয় **৫১শ বর্ষের চাঁদা** ৪৲ টাকা মনি-অর্ডার করিয়া পাঠান, নচেৎ ভিঃ পিঃতে পত্রিকা লইলে তাঁহাদের রেজিষ্টারী খরচ অনর্থক।০ বেশী পড়িবে। যাঁহারা মনি-অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের সকলের নিকটই পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়, আগামী মাঘ-সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠান হইবে। যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে ৫১শ বর্ষে উদ্বোধনের গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই মাসের মধ্যেই পত্র দ্বারা জানাইবেন। অন্যথা মনে করিব যে ভিঃ পিঃতে তাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছুক আছেন। **ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক চিঠিতে কিংবা মনি-অর্ডার কুপনে নাম ও ঠিকানার সহিত গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন।**

উদ্বোধন কার্য্যালয়,
বাগবাজার, কলিকাতা

বিনীত
কার্য্যাধ্যক্ষ
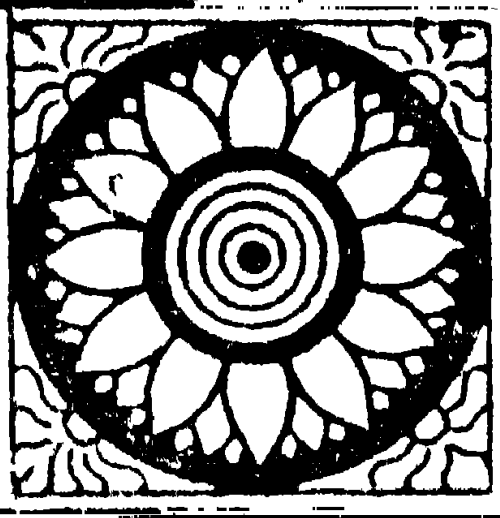
উদ্বোধন

সমাজতন্ত্রবাদ

সম্পাদক

(২)

মার্ক্সের সাম্যবাদ

ঐতিহাসিকগণের মতে কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-১৮৮৩ খৃঃ) প্রবর্তিত সাম্যবাদ (Communism) সমাজতন্ত্রবাদেরই একটি শাখা। ইহা অত্যুগ্র বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ নামে অভিহিত! আধুনিক সকল প্রকার সমাজতন্ত্রবাদই এই মতবাদ দ্বারা কম-বেশী প্রভাবান্বিত। মার্ক্স জার্মান ছিলেন এবং জার্মানীতেই তাঁহার মত প্রথম প্রচার করেন। অল্পকাল পরই রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হইবার আশংকায় তিনি বার্লিন হইতে প্যারিসে পলাইয়া যান এবং তথায় প্রাউধন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিকগণের সঙ্গে মিলিত হন। পরে মার্ক্স লণ্ডনে যাইয়া তাঁহার অভিনব সাম্যবাদ প্রচার করিতে থাকেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ও তাঁহার শিষ্য এন্‌জেল্‌ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "সাম্যবাদী বিজ্ঞপ্তি" (Communist Manifesto) বাহির করেন। ইহাতে তাঁহার মতবাদ ও কর্ম-প্রণালীর মূলতত্ত্ব বর্ণিত। পরে ইহারই পরিবর্ধিত সংস্করণরূপে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিট্যাল' (Capital) প্রকাশিত হয়।

সাম্যবাদের মূলনীতি

মার্ক্সের দার্শনিক ও অর্থনীতিক সাম্যবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) জড়পদার্থ চৈতন্যশক্তির সৃষ্ট নহে, পরন্তু চৈতন্যশক্তিই জড়পদার্থের সমবায়ে সৃষ্ট। (২) জড়পদার্থের নিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবিচ্ছিন্নত্বও (continuity) সর্বদা ভঙ্গ হইতেছে। ইহা এক মুহূর্তে যাহা, পর মুহূর্তে তাহা থাকে না। (৩) মানুষের ইতিহাস সমাজ ও জীবনের পরিবর্তন কোন ভাব বা আদর্শ-বিশেষ (idea বা ideal) দ্বারা হয় না, পরন্তু অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও শারীরিক প্রয়োজন দ্বারা হইয়া থাকে। ইহাই জড়বাদী মার্ক্সের ইতিহাস ও সমাজ বিবর্তনের জড়বাদমূলক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of the evolution of history and society) নামে অভিহিত। (৪) ভূমিজ ও শিল্পজ দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার অসমতার জন্যই প্রচলিত রাষ্ট্রিক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অসাম্যপূর্ণ হইয়াছে এবং ইহাই শ্রেণীস্বার্থ সৃষ্টির মূলকারণ। (৫) বিত্তহীন নিম্নশ্রেণীর (Proletariat) সঙ্গে বিত্তশালী অভিজাত (Bourgeoisie) শ্রেণীর স্বার্থ-সংঘাতই শ্রেণীসংগ্রামের মূলে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এই দ্বন্দ্ব দূর করিবার একমাত্র পথ। (৬) কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা একটি রাষ্ট্রের স্বত্বাধীনে অর্থনীতিক সমতা-ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করাই মানব-

জাতির মধ্যে সাম্যস্থাপনের একমাত্র পন্থা। (৭) সংঘবদ্ধ শ্রমিক বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া বলপূর্বক অভিজাত ও মূলধনিক (Capitalist) শ্রেণীর একেবারে উচ্ছেদসাধন এবং সার্বভৌম শ্রমিক-রাষ্ট্র (Dictatorship of Proletariat) প্রতিষ্ঠা সাম্যবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায়।

উল্লিখিত প্রথমটি মার্ক্সের নিছক জড়বাদ-মূলক দার্শনিক মত। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তি-বিচার এবং সকল ধর্ম ও নীতি বিরুদ্ধ। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ ইহার বিপরীত মত অর্থাৎ 'চৈতন্যশক্তি হইতেই যে জড়পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে' ইহাই সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় দার্শনিক মত অতিস্পষ্ট ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ। এই মতবাদ বহু যুক্তিদ্বারা ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ সন্তোষজনক ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।* মার্ক্সের তৃতীয় মতটি অর্থাৎ ইতিহাস ও সমাজ বিবর্তনের জড়বাদমূলক ব্যাখ্যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে একেবারেই যুক্তি-বিচারসহ নহে। এই কারণে পৃথিবীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর তাঁহার প্রথমোক্ত তিনটি নিছক জড়বাদমূলক মত কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু মার্ক্সের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ মত অর্থাৎ অর্থনীতিক সাম্য-স্থাপন পরিকল্পনার মূলনীতি বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-তন্ত্রবাদ (Scientific Socialism) নামে অভিহিত হইয়া প্রায় সকল শ্রেণীর সমাজ-তান্ত্রিকগণ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার এই অর্থনীতিক সাম্যবাদ দ্বারা পৃথিবীর অনেক দেশের বিত্তহীন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী এবং নির্যাতিত দরিদ্র অবনত ও অনুন্নত জনসাধারণের উন্নতি-কামী ব্যক্তিগণ ক্রমেই অধিকতর প্রভাবিত হইতেছেন। কিন্তু মার্ক্সের শেষোক্ত সপ্তম মত অর্থাৎ তাঁহার উল্লিখিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য শ্রমিক-বিপ্লব সহায়ে বলপূর্বক অভিজাত ও ধনিকগণকে একেবারে উৎসন্ন করিয়া গণতন্ত্রবিরোধী একতান্ত্রিক শ্রমিক-প্রাধান্য স্থাপনের যে উপায় তিনি নির্দেশ করিয়াছেন ইহা অধিকাংশ সমাজতন্ত্রবাদীই ন্যায়-নীতি এবং শান্তি-শৃঙ্খলাবিরোধী মনে করিয়া গ্রহণ করেন নাই। এমন কি মার্ক্সের এই মতবাদ লইয়া মতদ্বৈধ-প্রযুক্ত রুশ দেশেও তাঁহার মতানুসরণকারিগণ পর্যন্ত "মেন্‌সেভিক্" (Mensheviks) এবং "বল্‌সেভিক্" (Bolsheviks) নামক দুই দলে বিভক্ত হন।

মেন্‌সেভিক ও বল্‌সেভিক

মেন্‌সেভিকগণ রাশিয়ায় প্রচলিত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে ক্রমে সাম্যবাদী (Communistic) রাষ্ট্রে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু বল্‌সেভিকগণ মার্ক্সের বৈপ্লবিক কর্মপ্রণালী সমর্থন করেন। পরিশেষে রাশিয়ায় শেষোক্ত দলই জয়যুক্ত হইয়া বিপ্লবসহায়ে তথায় একচ্ছত্র (dictatorial) শ্রমিকরাষ্ট্র স্থাপন করে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ

মার্ক্স ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে আহূত "আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘের" (International Working Men's Association) অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। পরে চারি বৎসরের মধ্যে এই সংঘের উদ্যোগে জেনেভা লসেন্ ব্রাসেল্‌স্ ও ব্যাসল নগরীতে চারিটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সভা আহূত হয়। ইহার ফলে মার্ক্সের অর্থনীতিক সাম্যবাদ পৃথিবীর

* উদ্বোধন, ৪১শ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৪৬, ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "মার্ক্সের দার্শনিক জড়বাদের বিরুদ্ধে যুক্তি" নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বহু দেশে ছড়াইয়া পড়ে। সকল দেশের শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা বিপ্লবসহায়ে ধনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উচ্ছেদ করিয়া সার্বভৌম শ্রমিকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মার্ক্স কার্যতঃ এই সংঘের একচ্ছত্র পরিচালক (Dictator) হন। পরে তাঁহার এই একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বহু লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইহার ফলে আভ্যন্তর ও বাহ্যিক নানা কারণে এই সংঘ বিশ্লিষ্ট হইয়া কয়েকটি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে বিভক্ত হয়।

সংশোধনবাদ

জার্মানীর গোঁড়া মার্ক্সপন্থী কার্ল কট্‌স্কি মার্ক্সের সাম্যবাদের কয়েকটি মূলনীতির দোষ প্রদর্শন করিয়া "সংশোধনবাদ" (Revisionism) নামক একটি অভিনব মতবাদ প্রবর্তন করেন। শ্রমিক-নেতা এড্‌ওয়ার্ড বার্নষ্টিন্ সংশোধনবাদের পক্ষসমর্থনে অনেক যুক্তি দেখান। সংশোধনবাদিগণ বহু যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা মার্ক্সের দার্শনিক জড়বাদ, ইতিহাস ও সমাজ বিবর্তনের জড়বাদমূলক ব্যাখ্যা, শ্রেণী-সংগ্রাম, অর্থনীতিই সকল বিষয়ের নিয়ামক (Economic Determinism) এই অভিমত, শ্রমিক-বিপ্লব সহায়ে একতান্ত্রিক (Dictatorship) শ্রমিক-রাষ্ট্র স্থাপন-প্রণালী প্রভৃতির দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ফেবিয়্যান্ সমাজতন্ত্রবাদ

জার্মানীতে যখন সংশোধনবাদ প্রচারিত হইতেছিল, তখন অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "ফেবিয়্যান্ সংঘ" (Fabian Society) নামে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দল গড়িয়া উঠে। এই মতবাদিগণ মার্ক্সের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিট্যাল্' সম্বন্ধে প্রচার করেন যে, ইহা এক অদ্ভুত ডিম্ব বিশেষ, ইহার এক ভাগ ভাল, অপর ভাগ গ্রহণযোগ্য নহে। ইঁহারা মার্ক্সের জড়বাদ, অর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণ (Economic Determinism), শ্রেণী-সংগ্রাম, সার্বভৌম শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহ দ্বারা বলপূর্বক ধনিকদের উচ্ছেদ প্রভৃতির নিন্দা করেন বটে কিন্তু মার্ক্সের অর্থনীতিক সাম্যবাদের মূলনীতি গ্রহণ করেন। ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ ইহার প্রসার সাধন ফেবিয়্যান্ সম্প্রদায়ের কর্ম-প্রণালী। ইঁহারা মার্ক্সের মতবাদকে "কাল্পনিক সাম্যবাদ" (Utopian Communism) বলিয়া বিদ্রূপ করেন। মার্ক্সপন্থিগণ আবার ফেবিয়্যান্ সমাজ-তন্ত্রবাদকে "রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদ" (State Capitalism) বলিয়া ঠাট্টা করিতে দ্বিধা করেন না। খ্যাতনামা লেখক সিড্‌নী ওয়েব, বার্নার্ড শ প্রভৃতি ফেবিয়্যান্ সমাজতন্ত্রবাদেরই প্রচারক।

বৈপ্লবিক শ্রমিক-অধিকারবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্গত "বৈপ্লবিক শ্রমিক-অধিকার-বাদ" (Syndicalism) নামে একটি মতবাদের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায় তথাকার ট্রেড-ইউনিয়নের অন্তর্গত। তৎকালে ফরাসী দেশে প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-পরিচালকগণের দুর্নীতি ও শ্রমিক-সমস্যা সমাধানের অসমর্থতা এবং শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে অভিজাত ধনিকগণের শোষণের প্রতিকার উদ্দেশ্যে এই দল গঠিত হয়। মূলধনী এবং জমিদারগণকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া বিপ্লব-সহায়ে "শিল্প-সংঘ" (Industrial Unions) স্থাপন এবং এই সংঘসমূহের সমবায়ে অর্থনীতিক সাম্যভিত্তিতে শাসন-কার্য-পরিচালন ও সমাজ-গঠন বৈপ্লবিক শ্রমিক-অধিকারবাদিগণের আদর্শ। এই

মতবাদিগণ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহারা চূড়ান্ত শ্রেণী-সংগ্রাম (Class war in its extremest form) সমর্থন করেন। এই মতাবলম্বিগণ সর্ববিধ রাজনীতিক ও গণতান্ত্রিক নীতি অস্বীকার করিয়া শ্রমিকদের সহায়ে প্রত্যক্ষ শিল্প-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া শাসকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর। ব্যাপক শ্রমিক-ধর্মঘটই (Labour Strike) ইহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগৃহীত।

বিবর্তনী, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদ

এতদ্ভিন্ন আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের অন্তর্গত "বিবর্তনী সমাজতন্ত্রবাদ" (Evolutionary Socialism), "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ" (Democratic Socialism) বা "সমাজতন্ত্রপন্থী গণতান্ত্রিক" (Social Democrats) এবং "মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদ" (Radical Socialism) নামে তিনটি দল আছে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ রাজনীতিক উপায়ে ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাই প্রথমোক্ত মতবাদের আদর্শ। শেষোক্ত দুইটি মতবাদিগণ বিধিসঙ্গত গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রস্থাপন করিতে আগ্রহান্বিত। এই তিনটি মতবাদের কর্মপ্রণালীতে সামান্য পার্থক্য আছে।

স্বাধীন ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ

বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্রগুলি আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি—বিশেষ করিয়া ইহার সাম্য-মূলক অর্থনীতি অল্পাধিক গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের সমাজতন্ত্রবাদী দলগুলির মধ্যে অত্যুগ্র মার্ক্সপন্থী সাম্যবাদিগণ (Communists) শ্রমিক-বিপ্লবসহায়ে বলপূর্বক ধনিকগণকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া একতান্ত্রিক (Dictatorial) শ্রমিক-রাষ্ট্র স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলগুলি তাঁহাদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করিয়া গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্রমশঃ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহান্বিত। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শান্তিপূর্ণ বৈধ উপায়ে ক্রমেই অধিক-মাত্রায় সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আধুনিক কর্ম-প্রণালী। ভারতের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে গণ-তন্ত্রমূলক সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই জন্য সমাজতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক আকার প্রদান অপরিহার্য।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রবাদ

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী বক্তৃতাবলী ও পত্রাবলীর বহু স্থানে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি সমর্থন করিয়া-ছেন। সকল বিষয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমান অধিকার—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে সকলকে সমান সুযোগ দান তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল। তিনি কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের 'একচেটিয়া ভোগাধিকারের' অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। দেশের আপামর জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া নির্যাতিত দরিদ্র অনুন্নত কৃষক শিল্পী ও শ্রমিক-শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অভ্যুদয় তাঁহার জীবনের অন্যতম আদর্শ ছিল। স্বামীজী বলিয়াছেন, **"সমষ্টির উন্নতিতেই ব্যষ্টির উন্নতি, সমষ্টির সুখেই**

ব্যষ্টির সুখ। সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।" তিনি পাহাড় পর্বত হাট বাজার পল্লী হইতে নব ভারতের অভ্যুদয় কামনা করিয়াছিলেন। ইহা অতি স্পষ্ট সমাজতন্ত্রবাদ। স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন—"আমি সমাজতন্ত্রবাদী।" তৎপ্রচারিত বেদান্তেও সমাজতন্ত্রবাদ বিশেষভাবে সমর্থিত। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, বেদান্ত-মতে মানুষ কেবল মানুষের ভাই নয়, অধিকন্তু আত্মার দিক দিয়া সম্পূর্ণ এক ও অভেদ—সকল নরনারী একই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত এবং সকল জ্ঞান শক্তি ও পবিত্রতার আধার আত্মার বহুরূপ। মানুষে মানুষে পার্থক্য কেবল তাহাদের আত্মশক্তি বিকাশের তারতম্যে। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাম্য মানুষ কল্পনা করিতেও যথার্থই অসমর্থ। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের এই কল্পনাতীত সাম্যকে রাষ্ট্র অর্থনীতি সমাজ প্রভৃতি মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা যে যে-কার্যই করুক না কেন, যে যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। * * যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে—'তুমিও যেমন, আমিও তেমন; তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সে ঈশ্বর আছেন'। আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।"

স্বামীজী-প্রচারিত বেদান্তবেদ্য সমাজতন্ত্রবাদের দার্শনিক ভিত্তি যেমন দৃঢ় এবং যুক্তি-বিচারসম্মত তেমন ইহাতে শারীরিক ও মানসিক এবং ঐহিক ও পারত্রিক সর্ববিধ উন্নতি সাধনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপিত। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদসমূহের দার্শনিক ভিত্তি একেবারেই দৃঢ় ও যুক্তি-বিচারসহ নহে, এবং ইহাতে কেবল শারীরিক ও ঐহিক উন্নতি সাধনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। গভীর পরিতাপের বিষয়—ভারতবাসী বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্যকে তাহাদের জীবনের মুখ্য আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াও ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহারক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। এই জন্য বেদান্ত অধিকাংশ নরনারীর নিকট এখনও নির্বস্তুক (abstract) ও কাল্পনিক (utopian) তত্ত্বমাত্রেই পর্যবসিত। কিন্তু যদি পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিগুলিকে ভারতবাসীর জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্টতর বেদান্তবেদ্য সমাজতন্ত্রবাদকে তাহাদের জীবনে প্রয়োগ করা কেন সম্ভব হইবে না? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা বৈদান্তিক সমাজতন্ত্রবাদ ভারতবাসীর সমধিক উপযোগী এবং ইহা তাহাদের পক্ষে কার্যে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। ইহা তাহাদের কর্ম-জীবনে প্রয়োগ করিতে পারিলে ভারতের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় বৈশিষ্ট্য—ধর্ম ও সংস্কৃতি অব্যাহত থাকিবে। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিকে বৈদান্তিক ভাবাপন্ন করিলে অর্থাৎ জড়বাদের স্থলে চেতনবাদ বা আত্মবাদ অবলম্বন করিলেই ইহা ভারতের জনসাধারণের পক্ষে কার্যে পরিণত করা অত্যন্ত সহজ হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের চূড়ান্ত একত্ব অভেদত্ব সাম্য মৈত্রী ও সমদর্শনকে ধর্ম রাষ্ট্র অর্থনীতি সমাজ প্রভৃতি মানব-জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। সমাজতন্ত্রবাদের কার্যকরী মূলনীতিকে ভারতীয় ভাবাপন্ন করিয়া উহা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই স্বামীজীর এই অমূল্য উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রী—

এক রবিবার বেলা ২॥• টার সময় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার প্রবল আগ্রহে কলিকাতার বাসা হইতে রওনা হইয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে 'উদ্বোধন' অফিসে উপস্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মা তখনই ফিরিয়াছেন, একটু দেরীতে দেখা হইবে। কিন্তু আমার দেরী সহিল না। আমি দেখা করিতে যাইতেছি দেখিয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ (তিনি সিঁড়ির কাছে ছিলেন) আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমার তখন যুবা বয়স, হঠাৎ উত্তর দিলাম, "মা আপনার একারি?" মহারাজকে একবারে ধাক্কা দিয়াই উপরে গেলাম। গিয়া দেখি, মা পাখা করিতেছেন। আমি প্রণাম করিলে মা কুশল-প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, "খুব যে ঘেমেছ!" উত্তর দিলাম, "পথে রৌদ্র ও গরম ছিল।" মার নিকট হইতে পাখাখানি লইয়া তাঁহাকেও বাতাস করিলাম এবং আমিও খাইলাম। কিছুক্ষণ পর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কোথায় গিয়েছিলেন?" মা বলিলেন, "কালীঘাট।" তারপর বলিলেন, "কিছু প্রসাদ খাও, পরে কথা কইব।" প্রসাদ খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, মানুষ ও দেবতার মধ্যে স্বরূপে তফাৎ কি?"

মা—মানুষই দেবতা হয়। কর্ম্ম করলে সবই সম্ভব হয়।

আমি—কি রকম কর্ম্ম?

মা—ঠাকুরের বিধি-নিষেধ মেনে, অভীষ্ট দেবতায় নিষ্ঠা রেখে ডাকলে সবই হয়ে যায়।

আজ আর কথা বলিতে পারিলাম না, কারণ দুই একজন স্ত্রীভক্ত আসিতেছেন। আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় বলিলাম, "মা, আজ বড় অন্যায় করে এসেছি—সিঁড়ি দিয়ে আসবার সময় মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে এসেছি। কি করে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব? আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" মা বলিলেন, "ছেলেদের আবার অপরাধ কি? আমার ছেলেরা এমন নয় যে অপরাধ করবে, তুমি এজন্য ভেবো না।" নামিয়া আসিতেই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এই রকম উৎকণ্ঠা চাই" এবং আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর বলিলেন, "তোমায় কেউ কোন বাধা দেবে না।" তাঁহার আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া লইলাম। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে দেখিলেই খুব হাসিতেন।

আর এক রবিবার মার কাছে উপস্থিত হইলাম। সেদিন ভক্তেরা কেহ আসিয়াছেন, কেহ আসিতেছেন। আমি প্রণাম করিলে মা বলিলেন, "একটু বস।" তিনি কিছু প্রসাদ দিলেন। উহা খাইতে খাইতে তাঁহাকে বলিলাম, "মা, একটী দিন অবসর হয় না যে অনেক ক্ষণ ধরে মনের সকল কথা জিজ্ঞাসা করব।"

মা—আমার ত সকল ছেলেরই কথা শুনতে হয়। তবে দুএকটী জিজ্ঞাসা কর, উত্তর দিচ্ছি।

আমি—মা, যারা খুব গরীব, কাশী কি অন্য কোন ধামে যেতে পারে না, তাদের ঐরকম ফল আর কিসে হয়?

মা—কেন, তারা দক্ষিণেশ্বরে কিংবা বেলুড়ে গেলে সে ফল হয়, যদি সে রকম বিশ্বাস থাকে। যাঁর জন্য কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে আছেন।

আমি—মা, আমাদের কি উপায় হবে?

মা—তোমাদের কি ভয়? যারা ঠাকুরের কৃপা

পেয়েছে কিংবা তাঁর কোন সংস্রবে এসেছে, তাদের জন্য ঠাকুরই সব করবেন।

অন্য দু'এক দিনের সামান্য প্রশ্নোত্তর এখানে দিতেছি ঃ—

আমি—মা, আমাদের জপধ্যান কি পদ্ধতিতে করতে হবে?

মা—যেভাবে ও যেমন ইচ্ছা হয়, ঠাকুরে একটু মন রেখে করবে। তাতেই সব মিলবে। তোমাদের ভাবনা কিসের?

আমি—মা, ভাবনা নেই, তবু আপনার শ্রীমুখের আদেশ পাবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি।

মা—তোমাদের জন্য সকলেই আছেন। ঠাকুর আছেন, আমাকেত দেখতেই পাচ্ছ।

আমি—মা, স্বামিজীকে ও ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

মা—ভক্তি করে ডাক, সকলকেই পাবে। আমি বলছি, তোমরা ধন্য যে এমন সময় জন্মেছ। তাঁর লীলাখেলা দেখার সময় এখন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখলে সবই সহজ।

আমি—মা, মানুষের ইচ্ছামতই কি সব কাজ হয় এবং আশা পূর্ণ হয়?

মা—সদ্ ইচ্ছাগুলিই পূর্ণ হয়। দেখনা, তোমার নিজের শৈশবের আশা পূর্ণ হচ্ছে কিনা।

আমি—সেকি, মা?

মা—আমাকে গোপন করো না। তাহলে আমি বলে দেব।

আমি—থাক্, মা।

নব মহাভারত

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়

জ্ঞান-কর্ম-বিশ্বাসের যে মিলিত সাধনা দ্বাপরে
পরিস্ফুট হ'য়েছিল বাসুদেব-পার্থের জীবনে,
প্রতিফলি' তাহা এক লোকোত্তর পুরুষপ্রবরে
নবতম রূপ নে'ছে ভারতের মহাসন্ধিক্ষণে।
জড়বাদিতার সপ্তরথি-ব্যূহ-বেষ্টনে দাঁড়ায়ে
শৃঙ্খলিতা ভারতের সে আগ্নেয়ী তপস্বী সন্তান,
জড়তার মহামুক্তি সূচিয়াছে বিশ্বেরে জানায়ে;
মৃত্যুজয়ী দুঃসাহসে সিদ্ধিলক্ষ্যে দ্রুত আগুয়ান্।
যুগে-যুগে যে সমস্যা প্রয়াসেরে করেছে বিকল
পূর্ণতর সমাধান সে সন্ন্যাসী রেখে গে'ছে তা'র;
যে কুহেলী জমেছিল সারা রাতে সারা পৃথ্বীতল
অরুণ-উদয়ে যেন মুহূর্তেকে হ'য়েছে বিদার।
গুরুর মানসাশিস্ শ্রেষ্ঠতম শিষ্যের জীবনে
উচ্ছ্বসি' উঠিল যেন শতধারে সার্থকতা নিয়া;
আগ্নেয় উচ্ছ্বাসবৎ মহত্তর শক্তির স্ফুরণে
স্তম্ভিত বিস্ময়াবেগে সারা পৃথ্বী রহিল চাহিয়া।
প্রত্যক্ষ এ প্রাক্‌ক্ষেত্রে, তাপতীর্ণ এ মহাভারতে
কৃষ্ণার্জুন ভিন্ন নয়, দুই নয়—একক চরম;
উভয়ের একান্বিত সত্তা ল'য়ে কেন্দ্রানুগ পথে
রথী ও সারথি একা তপোদীপ্ত সে ঋষি স্বয়ম্।
মোর কল্পভুবনের শুভ্র জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝ
মহাসন্ন্যাসীর সেই উদ্ভাসিত মহিমামণ্ডিত
গরিষ্ঠ গৈরিকোজ্জ্বল মূর্তি সদা নিরীক্ষিয়া আজ
বাঙলার আমি কবি হ'য়ে উঠি আবেগ-কম্পিত।
সম্মুখে-পশ্চাতে-উর্ধ্বে-পার্শ্বভাগে চাহি যেই পানে
স্নিগ্ধান্বিত নেত্রপাত হেরিতেছি অবিরাম তার;
সে দৃষ্টি উঠেছে ফুটি' নিরন্তর নিখুত নয়ানে
লক্ষিছে উদগ্রাগ্রহে ভারতের গতির প্রকার।
যে বিপুল জীবনের সুবিশাল জলধি-প্লাবন
পূর্বাশার প্রান্ত হ'তে প্রান্তে আজ ল'য়ে উন্মাদনা
দুষ্প্রহত বেগভরে প্রধাবিছে প্রতি নিত্যক্ষণ
তা'র শ্রেষ্ঠ মূল উৎস সন্ন্যাসীর প্রাণের দ্যোতনা।
সে বেগে অদূরাগত সাফল্যের দীপ্ত সম্ভাবনা
নিশ্চিত প্রমূর্ত হ'য়ে মুক্ত প্রাতে আবার হাসিবে;
জয়যুক্ত হ'বে—হ'বে স্বামীজীর জীবন-সাধনা,
ঋষি ব্যাস নব মহাভারতের নব সৃষ্টি দিবে।

ব্রাড্‌লির মতে ব্রহ্ম ও জগৎ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লির দার্শনিক মতবাদ সত্যই অপূর্ব! তিনি বিকাশ বা বৈচিত্র্য হিসাবে জগৎকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি, তবে জগৎ যে অসম্পূর্ণ ও দুঃখ-দৈন্যে ভরা একথা তিনি স্বীকার করেছেন। ব্রহ্ম তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বোত্তীর্ণ পরমসত্য অথচ বিশ্বের প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে অনুস্যূত। ব্রহ্ম এক ও উপলব্ধির স্বরূপ। জাগতিক সত্য বা সত্তাগুলি চরমসত্যেরই বিকাশ। সকল-কিছু আপেক্ষিক সত্তাই পরিশেষে পরমসত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মিশে যাবে। প্রলয় বা মুক্তিতে এক পরিপূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যে বিশ্ববৈচিত্র্য সমষ্টিমূর্তিতে সূক্ষ্ম আকারে আত্মগোপন কোরে থাকবে। আর সেজন্যে সে নিজের সত্তাকেও একেবারে বিসর্জন দেয় না, অথচ ব্রহ্ম থেকে পার্থক্যের মালিন্যও সে কিছু রাখ্‌তে চায় না। সুতরাং ব্রাড্‌লির দার্শনিক পরিপ্রেক্ষণে ব্রহ্মের স্বরূপ এরকমের দাঁড়ায় যে, আধার ও আধেয়ের পরস্পরের মধ্যে ভেদভাব কিছু না থাকলেও অথবা সমরসের সাগরে সব একাকার হোলেও আভ্যন্তরিক ভেদ কিছু-না-কিছু থাকেই। বিশ্ব-বৈচিত্র্যকে ব্রহ্মচৈতন্যে মিশিয়ে দিলেও তা একেবারে সত্তাহীন হোয়ে মিশে যায় না। কাজেই ব্রাড্‌লির মতে ব্রহ্ম এক ও সমরস অথচ বহুর সমষ্টিরূপে এক ও অদ্বিতীয়।

ব্রাড্‌লির মতে ব্রহ্ম অনুভূতিস্বরূপ। জাগতিক প্রত্যেকটি জিনিসের পিছনেও অনুভূতির স্পর্শ থাকে, সে স্পর্শ থাকার জন্যে পার্থিব বস্তু 'আছে' বোলে আমরা বুঝ্‌তে পারি। পার্থিব এই অনুভূতির রূপ দু'রকম: (১) প্রত্যভিজ্ঞান ও চিন্তা, (২) ইচ্ছা ও বাসনা। এ দুটি ছাড়া সৌন্দর্যানুভূতির দিক আছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতিকেও অস্বীকার করা যায় না। সুখ-দুঃখ পৃথিবীর ধূলির জিনিস বোলে অনিত্য কিন্তু সমষ্টিরূপের অপরিহার্য অংশরূপে ব্রহ্ম ছাড়া আবার অনাগত বস্তুও নয়।

ব্রাড্‌লির ব্রহ্মে কোন পরিবর্তন নেই, পরিবর্তন জাগতিক পরিবেশের অলংকার। তবে হেরাক্লিটাস বের্গসোঁ, আলেকজাণ্ডার, নাগার্জুন চলমান পরিবর্তনকে নিত্যসত্তা বলেছেন, ব্রাড্‌লি কিন্তু তা সমর্থন করেন নি। তিনি জগৎ ও মানুষের মধ্যে ক্রমবিকাশ স্বীকার করেছেন, তবে বিকাশকে তিনি বলেছেন অনিত্য; নিত্য তাঁর কাছে একমাত্র দেশ-কালের গণ্ডীহীন ব্রহ্ম। বিশ্ববৈচিত্র্যই পরি-বর্তনের অধীন, তাই বিশ্ববৈচিত্র্যের বিকাশের একটি ইতিহাস আছে। পরিবেশের পরিবর্তন বা ঘটনা-পারম্পর্যই ইতিহাস সৃষ্টি করে। ব্রহ্মে এসকলের বালাই নেই; অথচ ঐতিহাসিক বিকাশ বা ঘটনাকেও তিনি একেবারে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। তাই ব্রাড্‌লি বলেছেন: পরমসত্যস্বরূপ ব্রহ্মে কোন ঋতু বা পরিবেশ-পরিবর্তনের মালিন্য নেই, অথচ সহসা ফল-ফুলে কার্য-কারণতার সৌন্দর্য নিয়ে ব্রহ্ম নিজেকে মহিমান্বিত করার আকুলতাকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেন না। আমাদের পৃথিবীর মতো সে মায়াতীত ব্রহ্মরাজ্যে শীত-গ্রীষ্মের ধারাবাহিকতা আছেও বটে—আবার নেইও বটে। এখানে ব্রাড্‌লি ব্রহ্মের প্রসংগে রূপ ও হেঁয়ালির অবতারণাই করেছেন। তিনি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো জিনিসের মিলন করতে চেয়েছেন,

কিন্তু মিলন করার যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক কোন কারণ দেখাতে পারেন নি।

বিশ্ব-বৈচিত্র্যের কথাপ্রসংগে তিনি একথাও বলেছেন: শুদ্ধচৈতন্যের পরমসত্তায় জগৎ তার সব-কিছু নিয়ে মিশে গেলেও নিজস্ব স্বভাবকে একেবারে হারিয়ে সে নিঃস্ব হোতে চায় নি। অথচ কেন নিঃস্ব হোতে চায় নি, আর কি ভাবেই বা তার পৃথক সত্তাকে বজায় রেখে এক হোয়ে থাকে তার উত্তর দিতে গিয়ে ব্রাড্‌লি বলেছেন 'বর্ণনার অতীত'। বলা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়, কারণ পরমসত্য একমাত্র অনুভূতির স্বরূপ। ব্রাড্‌লি এদিক দিয়ে তন্ত্র ও রামানুজের সিদ্ধান্তই যেন গ্রহণ করেছেন, কেননা তন্ত্র ও রামানুজের মতে ব্রহ্ম নিগুর্ণ নন, তিনি সর্বদা শক্তিবিশিষ্ট। আবার যেখানে ব্রাড্‌লি বলেছেন: জগৎ ও ব্রহ্ম একসংগে অখণ্ডভাবে থাকে অথচ তার উপমা বা উদাহরণ ভাষা দিয়ে দেওয়া যায় না, সুতরাং বর্ণনার অতীত, সেখানে কাণ্ট ও শংকরের সংগেও তাঁর কিছুটা মিল পাওয়া যায়। শংকর জগৎ বা মায়াকে যেমন 'অনির্বচনীয় বলেছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধেও বাক্য ও মনের অতীত ('অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌') বলেছেন। কাণ্টের ব্রহ্মও চিরদিন অপরিজ্ঞেয়, সুতরাং অনির্বাচ্য। তবে কাণ্টের দুর্বলতা হোল ব্রহ্মকে তিনি কোন দিনই জ্ঞাত বলতে চান নি, অথচ এদিক দিয়ে ব্রাড্‌লি ও শংকরের সিদ্ধান্তের ভেতর বেশ মিল আছে; ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে দুজনেই বরং বেশ হুঁশিয়ার। তাঁরা বলেছেন—ব্রহ্ম অনুভূতির গোচর—'অনুভূতিমাত্রগোচরম্‌'। তবে শংকর ও ব্রাড্‌লির সংগে মিতালি মাত্র অনুভূতির ক্ষেত্রেই, অন্য জায়গায় শংকরমতের বৈশিষ্ট্য বেশী। বিশেষত অখণ্ডতা বা অদ্বিতীয় সত্তার ক্ষেত্রে ব্রাড্‌লি তাঁর ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলেছেন, কিন্তু সে অদ্বিতীয়তা দ্বৈতভূমিকে স্পর্শ করেছে; অথবা আরো পরিষ্কার কোরে বলা যায়—ব্রাড্‌লি রামানুজের মতো বিশিষ্টাদ্বৈতকেই বরণ করেছেন। ব্রাড্‌লির ব্রহ্ম সকল কিছুর মায়া ত্যাগ কোরে মায়ানির্মুক্ত হোতে পারেন নি, তিনি বিশ্ববৈচিত্র্য সূক্ষ্মরূপ-বিশিষ্ট 'ব্রহ্ম'। এদিক দিয়ে শংকরের যুক্তির আলোকে ব্রাড্‌লি নিষ্প্রভ। শংকর তাঁর নিষ্কল চৈতন্যে বিশিষ্টতার কোন বালাই রাখেন নি; জগৎ সেখানে থাকে না, জগৎ বরং ব্রহ্মমাত্রেই অবশিষ্ট থাকে, অথবা জগৎ থাকে মিথ্যা অর্থাৎ পরিশুদ্ধ হোয়ে জ্ঞানীর কাছে, আর সত্য বা অপরিশুদ্ধ ভাবে অজ্ঞানী সাধারণের কাছে। ব্রাড্‌লি আর একটি বড় ভুল করেছেন তাঁর অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্মে খণ্ডতার প্রশ্রয় দিয়ে। তিনি বলেছেন: ব্রহ্মের ছোট বড় বিকাশ আছে, বিকাশেরও তারতম্য আছে। এ থেকে উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা প্রশ্নকে অজ্ঞাতসারে তিনি গ্রহণ করেছেন বল্‌তে হবে—যাতে কোরে তাঁর সম্পূর্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মও অসম্পূর্ণতার কালিমায় মলিন হয়েছেন। তবে জার্মান দার্শনিক কাণ্টের চেয়ে ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লির দার্শনিক চিন্তার স্থান যে আরো অনেক উচ্চে একথা স্বীকার করতে হবে। কাণ্ট তাঁর ব্রহ্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বরং অকৃতকার্যই হোয়েছেন; বোঝার চেয়ে অবোঝা বা জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারকেই তিনি টেনে এনেছেন। কিন্তু ব্রাড্‌লি তাঁর ব্রহ্মকে বলেছেন: জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ মানুষ সে অতীন্দ্রিয় সত্যেরও নাগাল পেতে পারে, বোধে বোধ করতে পারে—তা সে যে রকমই হোক। তবে অনুভূতিরও তারতম্য আছে, কারণ তা না হোলে শংকর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রভৃতি আচার্যদের সত্যানুভূতিতে রূপভেদ থাকত না। অনুভূতি যদি এক বা একটিমাত্র হোত তাহলে সমাধির রাজ্য থেকে ফিরে এসে সকলের কথা বা সিদ্ধান্তই এক সুরে বাঁধা থাকৃত। কিন্তু আসলে তা হয় না। অথচ অদ্বৈত বেদান্ত বলেছেন: অনুভূতির দুই নেই, অনুভূতি একই। কাজেই অনুভূতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের স্থান থাক্‌লে তাকে সন্দিগ্ধ অচল অনুভূতি বোলেই মনে করতে হবে। এ সমস্যার সমাধানের জন্যে বোধ হয় ব্রাড্‌লি অনুভূতির তথা ব্রহ্মেরও স্তরভেদ (degrees) স্বীকার করেছেন, নচেৎ পরমার্থ সত্য হিসাবে ব্রহ্ম অখণ্ড ও অবিভাজ্য। তাতে বিকাশের কম-বেশী বা স্তরভেদ নেই, এমনকি বিকাশও নেই; সমরসেরই কেবল উপলব্ধি। কিন্তু ব্রাড্‌লি এ অখণ্ড অনুভূতির সত্যিকার রূপকে চেষ্টা কোরে ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, তিনি অখণ্ডের ছদ্মবেশে বরং খণ্ডতা তথা দ্বৈতবাদেরই প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর অদ্বৈতবাদ গুণ ও গুণীর পার্থক্য দিয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে রূপান্বিত বল্‌তে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণে*

অনুবাদক শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্, সাহিত্যরত্ন

২৮ আগষ্ট, ১৯০২

(১)

প্রিয় মিসেস্ এইচ,

তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ স্বামিজী সারা শীতকাল ধরিয়া অসুখে ভুগিতেছিলেন। কাশীধাম হইতে তিনি যখন ফিরিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছিলাম। তথাপি কেহ কখনও ভাবে নাই যে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। তাঁহার অনেক কিছু করিবার ছিল। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু আমরা ভাবিয়াছিলাম যে তিনি জাপানে যাইবেন। এইরূপে কর্মিগণকে প্রস্তুত করিয়া তারপর তাহাদের তত্ত্বাবধান না করাই কি তাঁহার ন্যায় একজন মহাপুরুষের প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায় ছিল? অনন্তর তিনি আত্যন্তিক আরোগ্যলাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন—ইহাতে অত্যধিক গরমের তিন মাস কোন জল পান না করিয়া তাঁহাকে শুধু দুগ্ধপানে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। লণ্ডনে তিনি যেরূপ সুস্থ, প্রসন্ন ও দীপ্তিমান্ থাকিতেন সেরূপই হইলেন। এই কয়মাস তিনি সকলকে প্রত্যুষে সাড়ে তিন অথবা চারটায় জাগিয়া গঙ্গাস্নান করিতে এবং মন্দিরে ধ্যান করিতে জেদ করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্নায়ুগুলি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং প্রধানতঃ শরীরেরই একটুকু উন্নতি হইয়াছিল। মন অথবা স্নায়ুর যে অবস্থাই হউক না কেন, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মুখের অদ্ভুত দিব্যজ্যোতি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে বিরত হয় নাই। দেহাবসানের প্রায় দশদিন পূর্বে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। আটদিন পূর্বে আমি ফিরিয়া আসি, এবং তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি অনুভব করছি যে ক্রমশঃ মৃত্যুর সমীপবর্তী হচ্ছি এবং একটা মস্ত কৃচ্ছ্রসাধন ও ধ্যান আমাকে করতে হবে। মন্দিরে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছি।"

যখন তিনি কথা বলিতেছিলেন, তখন একটা টিক্‌টিকি চীৎকার করিয়া উঠিল। এদেশের লোকদের একটা কুসংস্কার আছে যে টিক্‌টিকি যাহা উত্তর দেয় তাহাই সত্য হয়, কিন্তু স্বামিজী আরও অন্ততঃ তিন চারি বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন এ সম্বন্ধে আমি এতদূর নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি কখনও এই আকস্মিক বিপৎপাতের কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই দিন ছিল রবিবার, এবং তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করেন শুক্রবার রাত্রিতে।

বুধবার প্রাতঃকালে আমি পুনঃ মঠে গমন করিয়া তিন ঘণ্টা অবস্থান করি। এখন আমার মনে হয়, তিনি জানিতেন যে আমি তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। এরূপ আশীর্বাদ! যদি আমি একটুকু জানিতে পারিতাম! তাঁহার সেবা ও যত্নের আবশ্যকতা ভাবিয়া, পাছে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এই ভয়ে আমি কোন কথার অবতারণা করি নাই; এবং পাছে তাঁহার ক্লান্তি ও অবসাদের

* 'প্রবুদ্ধ ভারতে' (জুলাই, ১৯৪৮) প্রকাশিত ভগিনী নিবেদিতার ইংরেজী পত্র তিনটির বঙ্গানুবাদ।

কারণ হই এই আশঙ্কায় তথায় বেশীক্ষণ অবস্থানও করি নাই। প্রতি মুহূর্ত কিরূপ মূল্যবান ইহা যদি কেবল জানিতাম, কিন্তু আহা, কিরূপ অসহনীয়! অতএব আমি চলিয়া আসিলাম। শুক্রবার কলিকাতায় সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি সুস্থ বোধ করিতেছেন না। মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তিনি মন্দিরে ছিলেন, এবং তৎপর তিন ঘণ্টা শিষ্যগণকে সংস্কৃত পড়াইলেন, এবং সারা বৈকাল অনেকের সহিত কথা বলিলেন। সাড়ে চারিটায় তাঁহার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিল। তিনি এক পেয়ালা গরম দুধ ও জল পান করিয়া দুই মাইল ভ্রমণে বাহির হইলেন। মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সান্ধ্য ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার জন্য সকলকে দূরে সরাইয়া দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তিনি উত্তর-পশ্চিম-মুখী হইয়া ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন। ঘণ্টা খানেক পর তিনি ঘুরিলেন এবং জনৈক সেবককে পদসংবাহন ও ব্যজন করিতে বলিয়া শয়ন করিলেন। তৎপর তিনি শান্তিতে নিদ্রিত হইলেন।

হঠাৎ একটা কম্প হইল,—যেন ঘুমন্তাবস্থায় একটা ক্রন্দন, একটা গভীর নিঃশ্বাস, অতঃপর দীর্ঘ স্তব্ধতা, আর একবার নিঃশ্বাস, এবং ইহাই সব! আমাদের প্রিয়তম আচার্যদেব চিরদিনের জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জীবনের মধুর গীতি সমাপ্ত হইল, পৃথিবী নীরব এবং মুক্তির উষা সমাগতা। কিরূপ নিষ্কাম ভাবে কোন্ অত্যাবশ্যক উপায়ে তাঁহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করি! যদি বিষম বিলম্ব হয় তাহাতেও আনন্দিত। ইহা সম্পাদনের জন্য শক্তি, বিশ্বাস এবং জ্ঞান ভিক্ষা করি—অন্য কোন আশীর্বাদ চাই না। আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা নাই। আমাদের প্রিয়জন মরেন নাই—তিনি সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছেন। আমি শোক করিতেও পারি না, কেবল কাজ করিতে চাই।

ভবদীয়া
নিবেদিতা

(২)

কলিকাতা
১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০২

প্রিয় মিস্ এম্,

যে শুক্রবার স্বামিজী দেহত্যাগ করেন সেদিন তিনি কলিকাতার পুরাতন বন্ধুবর্গের সহিত, লোকে সচরাচর যেরূপ মধুরভাবে কথা বলে, তেমনি কথাবার্তা বলিতেছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেদিন অপরাহ্নেই তিনি সেবকগণকে বলিয়াছিলেন, 'যদি কেউ আমাকে কখন অনুকরণ করে, তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিও। আমাকে অনুবর্তন করিওনা।' কিন্তু তোমার প্রার্থিত যথার্থ বাণী শ্মশানেই পাওয়া গিয়াছিল। দুইটার সময় আমরা তথায় দাঁড়াইয়াছিলাম এবং বিছানার উপরিভাগ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত দেখিয়া আমি স্বামী সা—কে বলিলাম, 'ইহা কি অগ্নিসাৎ করা হইবে? এটিই স্বামিজীকে শেষবার পরিধান করিতে দেখিয়াছি।' এবং তিনি ইহা আমাকে তথায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি গ্রহণ করিলাম না, কেবল ভাবিলাম, 'তোমার জন্য অঞ্চলের একটুকরা যদি কাটিয়া লইতে পারিতাম!' কিন্তু আমার নিকট ছুরি অথবা কাঁচি কিছুই ছিলনা, এবং কাজটি শোভনীয় হইত কিনা তৎসম্বন্ধে সংশয়েরও অবকাশ

ছিল। অতএব আমি কিছুই করি নাই। ছয়টার সময় আগুনের দ্বারা যেন সজোরে আকৃষ্ট হইয়া আমি নীচের দিকে তাকাইলাম এবং বস্ত্রখণ্ডের অঞ্চল হইতে আমি যে দুই বা তিন ইঞ্চি পরিমিত অংশ পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, উহাই জলন্ত শ্মশানের বুক হইতে তথায় আমার পায়ের নিকট সরাসরি উড়িয়া আসিল।

ভবদীয়া

নিবেদিতা

(৩)

কলিকাতা

১৬ জুলাই, ১৯০২

প্রিয় মিস্ এম্,

স্বামিজীর একখানা জীবনী লিখিবার জন্য লোকে আমাকে পরামর্শ দেয়, কিন্তু আমি মনে করি জীবনী লিখিবার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার জীবন-চরিত এত সরল, এত মহৎ, এত ভারতের হৃদ্‌স্পন্দন-যুক্ত, এবং এত অভ্রান্তরূপে **অবতারের** কাহিনী হইবে! যদি তুমি বল ইহা তুমি চাও, তবে যে কোন সময়ে আমি ইহা লিখিতে আরম্ভ করিব। অন্তিম দৃশ্য অভাবনীয় রূপে ও আদর্শের দিক দিয়া কিরূপ মহিমময় হইয়াছিল ইহা কি বুঝিতে পার? স্বামিজীগণও কিরূপে নিস্পন্দভাবে উপাসনা করেন, সান্ধ্য ধ্যানের শেষে শরীরটাকে জীর্ণ-বস্ত্রের মত নীরবে পরিত্যাগ করিবার জন্য! "হর, হর, হর" উচ্চারণ করিয়া এরূপ মহনীয় মৃত্যুকে বরণ করাই আমার কাম্য! বহুদিন পূর্বের তাঁহার বাণীর কথা স্মরণ হয় এবং ইহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্তই সুব্যবস্থিত রাখিয়া সবুজ জয়মাল্য ও অম্লান ঢাল হস্তে তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি মনে করি, ক্ষুদ্র শিষ্যত্ব হইতে মহৎ শিষ্যত্বকে বাছিয়া লইবার অন্যতম লক্ষণ হইতেছে গুরু-চরিত্রের ব্যক্তিগত দিক অপেক্ষা নির্ব্যক্তিক দিকটাকে বিশ্লেষণ করিবার শক্তি অর্জন করা।

যাহা হইবার কথা ছিল তাহা অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয় কত বিভিন্ন, এবং আমার যে ভিন্নরূপ করা উচিত তৎসম্বন্ধে সাধুগণ খুব নিশ্চিত এবং তথাপি ইহাপেক্ষা অন্যরূপ আমি করিতে পারি না। আমার যদি প্রত্যক্ষ পরিচালন ও পথপ্রদর্শন থাকিত! তুমি কি জান না, মঠ এই কয়দিন শোকে ও পূজায় মগ্ন আছেন এবং পীড়ার সময় যে সকল কথা বলা হইয়াছিল উহাদের মোহাবেশ হইতে প্রত্যেকেই অপসৃত হইতে ইচ্ছা করেন? ইহা চিন্তা করিয়া আমি বদ্ধ ও ভীত অনুভব করিতেছি, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া লইবেন। স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছা আমার সংগৃহীত সমস্ত অর্থ দ্বারা একখণ্ড ভূমির উপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নামে একটি গৃহ নির্মিত ও উৎসৃষ্ট হয়। এজন্য অবশ্য আমি যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি উহাই তাঁহার হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আমার বার্ষিক বৃত্তির উপরও আমি কিছু জমা রাখিব, কারণ গৃহের জন্য আমার এখনও অনেক কিছু করিবার আছে এবং ইহা অসমাপ্ত রাখা বিজ্ঞজনোচিত হইবে না। আমি ইহাও অনুভব করিতেছি, আমার গৃহে কোন মহিলাকে রাখিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাঁহাদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য আমাকে সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চিত রাখিতেই হইবে। তার পর, যদি

আমাকে কিছু কাজ করিতেই হয়, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত আমাকে কিছু যাতায়াত-খরচের অর্থও জোগাড় করিতে হইবে।

আগামী শনিবার বক্তৃতা দিতে আমাকে কয়েক দিনের জন্য যশোহরে যাইতে হইবে।

আমাদের জন্য এবং সর্বোপরি কর্মের জন্য সুস্থ হও। এই বিশ্বাস জাগ্রত রাখিও যে ইহাই আমাদের নির্ধারিত কর্ম—ইহা ছাড়া অন্য কিছু নহি। হিতকর কার্য সম্পন্ন করিবার মধ্যে কোন মিথ্যাচার নাই।

ভবদীয়া

নিবেদিতা

কেন ?

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

রবির কিরণ হেরি
শুধায় বালক—
"এ আলোক
কোথা হ'তে এলো ?"

জনক তাহার
এ কথা শুনিয়া
একটু ভাবিয়া
কহিল—"সূর্য্যদেব
এই আলো করে বিতরণ।"

বালক কহিল—
"সূর্য্যদেব এত আলো
পাইল কোথায় ?"
জনক ভাবিল—
"হায়,
কেমনে জবাব এর দিব ?"

বালক যুবক হ'ল।
বিজ্ঞানের পুঁথি সব
করিল মন্থন।
তবু তার মন
জিজ্ঞাসু হইয়া বলে—
"সূর্য্যদেব এত আলো
পাইল কোথায় ?"

বিজ্ঞান কহিল তায়
"নাহি জানি জবাব ইহার—
সূর্য্যদেব কোথা হ'তে
এত আলো করিল সঞ্চার।"

যৌবন পৌঁছিল যবে
জীবন সায়াহ্নে
বার্দ্ধক্যের বেশে,
সেই 'কেন' এসে
দাঁড়াইল নবরূপ ধরি।
তবুও জবাব তার
আসিল না কিছু—
রয়ে গেল পিছু
সব 'কেন' স্তূপাকার হ'য়ে।

জীবন-সন্ধ্যা যবে
পড়িল লুটায়ে
রজনীর কোলে—
আসিল জবাব
"কেন বৃথা 'কেন' নিয়ে
কর আলোচনা ?
রহিবে অজানা
যতদিন চিনিবে না মোরে।
এসে আজ মরণের দ্বারে
যাহা তুমি ভাবিছ মরণ
তাহা শুধু
মায়া-আবরণ।
জীবন-মরণ-দোলা
সে তো মোর লীলা !
সব 'কেন' হ'বে অবসান
সেই লীলা সনে।"

চিনির নূতন ব্যবহার-প্রণালী

ট্রেভর আই উইলিয়াম্‌স্‌

যদিও বৃটেনের খাদ্যব্যবস্থায় চিনির ব্যবহার এখনও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তবু সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে চিনি কেবল মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবেই গণ্য তা নয়, রাসায়নিক শ্রম-শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও তার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য।

আজকাল প্রধানতঃ কয়লা এবং খনিজ তৈল থেকেই রং, ভেষজ, প্লাষ্টিক এবং অন্যান্য অনেক রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় কার্বনযুক্ত পদার্থ তৈরী হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় কয়লা এবং খনিজ তৈল দুই-ই ক্ষয়িষ্ণু, প্রকৃতি তা পূরণ করছে না। এমন একদিন হয়ত আসবে যেদিন এই দুই পদার্থের ব্যবহার সংযত করতে হবে। তা ছাড়া কয়লা এবং খনিজ তৈল এবং তার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি সমস্ত রকম কার্বনযুক্ত পদার্থ তৈরী করার পক্ষে উপযোগীও নয়।

চিনির সেই সুবিধা আছে। এর শেষ নেই, বরং বাৎসরিক উৎপাদন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে—যদিও তারও একটা সীমা আছে। উপরন্তু চিনির রাসায়নিক গঠন জটিল হওয়া সত্ত্বেও তা অতি সহজেই প্রয়োজন মত নানাভাবে রূপান্তরিত করা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য কাঁচামাল দিয়ে তা প্রায় অসম্ভব বল্‌লেই হয়।

সম্প্রতি বৃটেনের গবেষকরা মানুষের এই অন্যতম প্রধান খাদ্য নিয়ে অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। স্যার নর্ম্যান হ্যাওয়ার্থ বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এই পদে থাকাকালীন গত ২৩ বছর ধরে চিনির ধর্ম নিয়ে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেন, তাঁর সঙ্গে থেকে অনেক তরুণ বৈজ্ঞানিকও এই গবেষণার কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। এই গবেষণার পূর্ণ বিবরণ ইতোমধ্যে সমস্ত বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পত্রিকায় যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে, বিজ্ঞানীরাও তার পরিচয় পেয়েছেন। এই গবেষণার ফলাফল অদূর ভবিষ্যতে সাধারণের ব্যবহারিক জীবনেও কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকদের এই গবেষণার মর্যাদা স্বরূপ স্যার নর্ম্যান হ্যাওয়ার্থের অন্যতম সহকর্মী ডাঃ লেসলি উইগিন্‌স্‌ সম্প্রতি পুরস্কৃত হয়েছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ ৫,০০০ ডলার। পৃথিবীর যে কোন বৈজ্ঞানিকই তাঁর বৈশিষ্ট্যের জন্য এই পুরস্কার লাভের অধিকারী। আমেরিকার চিনি গবেষণা মন্দির (Sugar Research Foundation of America) থেকে প্রতি বৎসর চিনি-সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চিনিকে সাদা স্ফটিক খণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন 'লেভুলিনিক এসিড' (Levulinic Acid). এর থেকে অনেক রকম আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তৈরী করা যায়, যথা নূতন ধরনের সাল্‌ফোনামাইড ভেষজ (Sulphonamide, M & B type), বেদনা নিবারণ ও রক্তচাপ হ্রাস করার জন্য বিশেষ ঔষধ উপকরণ, সাবানের মত একরকম পদার্থ এবং আরও অনেক কিছু।

কিছুদিন আগে চিনি থেকে নারিকেলের গন্ধযুক্ত সুগন্ধি দ্রব্য বা এসেন্স তৈরীর উপায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সামান্য আবিষ্কার থেকেই হয়ত

একদিন অন্য কোন যৌগিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাবে, যার ফলে স্থগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ক্ষেত্রে যুগান্তর দেখা দেবে।

স্পেনের ত্রিনিদাদ শহরেও চিনির ব্যবহার প্রণালী নিয়ে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা নানারকম গবেষণার কাজে ব্যাপৃত আছেন। কলোনিয়াল দপ্তরের সাহায্যে সেখানে সম্প্রতি একটি ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে—উদ্দেশ্য; অতি ক্ষুদ্র রোগোৎপাদী জীবাণু, মদ তৈরীর জন্য ঈষ্ট (Yeast) এবং দুগ্ধ অম্লকারী জীবাণু প্রভৃতির ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করা। এই ল্যাবরেটরী গঠনের পর চিনি-শিল্প বিশেষভাবে উন্নত হবে বলে আশা করা হয়।

চিনি বিশুদ্ধকরণের পর সর্বদা ঝোলা গুড়ের ন্যায় এক রকম পদার্থ পাত্রের তলদেশে পরিত্যক্ত হয়, তাতে অনেকখানি চিনির অংশ নানা রকম ময়লার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। প্রথম অবস্থায় তা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু এক প্রকারের জীবাণু আছে যারা এই চিনিকে অন্য প্রয়োজনীয় পদার্থে রূপান্তরিত করতে পারে। এ কথা সকলেই জানেন যে সাধারণ ঈস্টের সাহায্যে চিনি থেকে সুরাসার (Alcohol) তৈরী হয়। অন্য রকমের জীবাণু দিয়ে আবার সুরাসার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের পদার্থ তৈরী করা যায়। এক রকমের 'পেনিসিলিয়াম' ছত্রাক সাহায্যে চিনি এবং অন্যান্য পদার্থ সংমিশ্রিত তরল দ্রব্য থেকে পেনিসিলিন উৎপন্ন করা যায়।

গবেষণার আর একটি চমকপ্রদ ফল এই—ঝোলা গুড়ের উপর 'ছাতা' জন্মিয়ে তা দিয়ে প্রোটিনযুক্ত খাদ্যবস্তু তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রধানতঃ মাংস থেকেই প্রোটিন গ্রহণ করা হয়, কিন্তু আজ তা এখনও দুর্লভ ও ব্যয়বহুল এবং সেখানে আরও কয়েক বছর ধরে এই অভাব অনুভূত হবে বলে মনে হয়। যদি চিনি এবং যৌগিক নাইট্রোজেন সংমিশ্রিত দ্রব পদার্থের মধ্যে ঈষ্ট জন্মানো যায় তা হলে ঈষ্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে অনায়াসে বহু পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। এই প্রকার ঈষ্টের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে এর মধ্যে ভিটামিন 'বি' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব।*

* নিউদিল্লী ব্রিটীশ ইনফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

কাণ্ডারী করো পার !

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

কাণ্ডারী করো পার !
অসীম অকূল বীচি-সংকুল
এই ভব-পারাবার।

বোঝাখানি ল'য়ে ব'সে আছি কূলে,
শংকা-মুখর হিয়াখানি দুলে,
দয়া ক'রে লও তরণীতে তুলে
বিলম্ব নয় আর,
কাণ্ডারী করো পার !

কাল ব'য়ে যায়, প'ড়ে আসে বেলা,
অচিরে ভাঙ্গিবে দিবসের মেলা,
করোনা করোনা আর মোরে হেলা
সমুখে অন্ধকার,
কাণ্ডারী করো পার !

কড়ি কিছু মোর নাই সঞ্চয়,
জমিয়েছি শুধু কলুষ-নিচয়,
তাই এতো ভয় এতো সংশয়
প্রাণ করে হাহাকার,
কাণ্ডারী করো পার !

শুধু এই আশা আছি বুকে ধ'রে,
তুমি তো ফেলিতে পারিবে না মোরে,
আমি যে তোমার, তুমি যে আমার
সব চেয়ে আপনার ;
কাণ্ডারী করো পার !

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ কাশীতে অবস্থান কালে শেষের দিকে, অনবরত 'মায়া' শব্দ ব্যবহার করিতেন। কোন ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণসমীপে আসিয়া প্রণাম করা মাত্র, তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতেন "মায়া, মায়া।" তাঁহার এই ভাব পুরাতন ভক্তেরা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু নূতন ভক্ত অবাক্ হয়ে মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কোন ভক্তের আসার কি উদ্দেশ্য তৎসম্বন্ধে মহারাজ বিড় বিড় করিয়া বলিতেন। ভক্ত চলিয়া গেলে মহারাজ অমনি বলিতেন, "শালা মায়া ফেলে দিয়ে চলে গেল।" কোন দুঃখের খবর শুনাইলে মহারাজ অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত ঐ ভক্তের কথা শুনিতেন, কখনও বা বলিতেন, "মায়া একবার ফেলে দিলুম আবার তুলে নিলুম, সব সময় কি ঐ ভাবতে হবে ?"

মহারাজ ভক্তদের বিবাহ না করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন কাটাইয়া দিতে এবং বাপ মায়ের সেবা করিতে বলিতেন। তিনি সন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। এ যুগে সন্ন্যাস ঠিক ঠিক বজায় রাখা শক্ত, বরং বিবাহ না করিয়া পবিত্র ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিতে বলিতেন। পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে বিবাহ করা ভাল মনে করিতেন। বিবাহ করিবে না অথচ অপবিত্র হইবে ইহা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

তিনি লৌকিকতা আদৌ পছন্দ করিতেন না। সাধুর পক্ষে লৌকিকতা খুব খারাপ। যাহা সত্য মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিতেন।

তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কথা বলিতেন। মেয়েদের মায়ের কাছ থেকে মন্ত্র নিতে বলিতেন। জনৈক ভক্তের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলে ভক্তটী মহারাজের কাছে দীক্ষার কথা বলায় তিনি বিরক্ত হইলেন ও ভিক্ষা ছাড়িয়া দিলেন। তার পর সেই ভক্তের বাড়ীতে খুব বিপদ হইয়া গেল; তখন মহারাজ বলিলেন, "যদি মায়ের কাছে দীক্ষার কথা বলতাম তা হলে আমার উপর দোষ পড়ত, ত্যাগীর নিকট দীক্ষা নিলে খুব সাবধানে থাকতে হয়।"

সাধুদের ঈশ্বরে নির্ভর সম্বন্ধে তিনি খুব উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন—"ভগবানের উপর নির্ভর করতে না পারলে শান্তি পাওয়া যায় না। নির্ভর কি অমনি হয়? কত সাধু-সঙ্গ ধ্যান-জপ করলে তবে নির্ভর আসে। নির্ভরের জন্য কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করে ছিল বলে বেঁচে গেল। শশী মহারাজের গুরুভক্তি ছিল অতুলনীয়। কলকাতা থেকে গরমের দিনে এক পয়সার বরফ নিয়ে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। গুরুভক্তিতে এত গরমেও বরফ গলে নি। স্বামিজী বলেছিলেন—'শশী আমার জন্য সব করতে পারে'। তিনি গুরুভাইদের জপ-ধ্যান করার সুবিধা করে দিয়ে নিজেই সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করতেন।"

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ ধ্যান-জপের কথা খুব বলিতেন। গৃহস্থদের বখেড়া অনেক। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা বেশী; তবু তাহারা যতটুকু করে ততটুকুই ভাল। ত্যাগীরা বাপ-মাকে ফাঁকি

দিয়ে এসেছে; সে জন্য তাঁদের সব সময় ভগবানের স্মরণ মনন করা উচিত। ধ্যান-জপ না করে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেন, ইহাতে অপকার হয়। জনৈক সাধুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"সন্ন্যাস নিয়েছ ত কি হয়েছে? সন্ন্যাসীরও বাপ-মায়ের সেবা করা উচিত। বাপ-মা কত বড় গুরু! সাধুর বেশী ঘোরাঘুরি ভাল নয়, আমাদের ঠাকুর কেবল বৈদ্যনাথ, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ ছাড়া অন্য তীর্থে যান নি। বেশী ঘোরাঘুরিতে মন উচাটন হয়। তার চেয়ে একস্থানে স্থিরভাবে ভগবানকে ডাকা ভাল। আমারও মধ্যে মধ্যে ঘোরতর ইচ্ছা হত। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু দেখলে বুঝতে পারতেন। তাই বলতেন—'যা, কলকাতায় ঘুরে আয়।' কলকাতায়ও কিন্তু মন বসত না। ঠাকুর ছাড়া এত স্বাধীনতা কোথায় পাব?"

"বাপ-মায়ের ছেলেমেয়ের নিকট খুব সাবধানে থাকা উচিত। ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের নকল করে। বাপ-মা মানুষ না হলে ছেলে মেয়ে কখনও মানুষ হতে পারে না। ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়ার সময় দেখাবে যেন শত্রু। অন্য সময় স্নেহ করবে।"

লাটু মহারাজের অসুখের সময় অনেক ভক্ত তাঁর শ্রীচরণ-সমীপে আসিত। আমরা তাহাদিগকে বাধা দিলেও তিনি শুনিতেন না। তিনি বলিতেন—"দুটো ভগবানের কথা বলে আনন্দ পাই, এতে বাধা দিও না। শরীর চিরস্থায়ী নয়, দুদিন বাদে ছুটে যাবে। তা বলে তোরা দুঃখ করিস্ নে। ভগবানের কথা শুনতে ক'টা লোকের আগ্রহ হয়? এতে ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রয়োজন। সাধু-সঙ্গ না হলে ইহা অসম্ভব। সৎসঙ্গ বহু ভাগ্যে হয়। সৎসঙ্গের মহিমা প্রথম বোঝা যায় না, উহা একটু একটু করে বাড়ে, শেষে বুঝতে পারবে।"

ডাক্তার কাঞ্জিলাল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন। তখন হোমিওর উপর তাঁহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। লাটু মহারাজের কথায় তাঁহার হোমিওপ্যাথির উপর বিশ্বাস হয়, শেষে তিনি বড় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়াছিলেন। লাটু মহারাজের হোমিওর উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল প্রথম হইতে। কাহারও পেট একটু খারাপ হইলে তিনি অমনি নাক্স্ ৩০ ব্যবহার করিতেন। বেশ উপকার হইত। লাটু মহারাজ পায়খানার মধ্যে আপন মনে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "পবিত্র হও, পবিত্র হও।" ভক্তের সংযম বিশেষ দরকার। সৎসঙ্গ এবং জপধ্যানেও সংযম আসে।" কেহ অন্যায় কাজ করিয়া পা ছুঁইতে যাইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং সব সময় ছুঁইতে দিতেন না। বলিতেন—"ছুঁয়ে শালারা আমার অসুখ করিয়ে দিয়ে গেল।"

"নিবেদিতার ভক্তি অতুলনীয়। স্বামিজী যখন কাশ্মীরে ঘোড়া থেকে নামতেন, নিবেদিতা অমনি জুতার ফিতা খুলে দিত। আমি নিবেদিতার ভক্তি পরীক্ষার জন্য চা খাবার সময় 'ম্লেচ্ছ ছুঁয়ো না' এই সব বলতাম, সে তাতে বিরক্ত হতো না। স্বামিজীর কৃপায় সে কত বড় কাজ করে গেল! তার শরীর খুব অসুস্থ, টেলিগ্রাম এলো। আমি গণেনকে বললাম— শীঘ্র দার্জ্জিলিং চলে যাও। নিবেদিতা গণেনকে খুব ভালবাসত। গণেন গেলে পর নিবেদিতার শরীর যায়। স্বামিজী প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে আসলে রামলাল দাদা স্বামীজীকে মান্য করে কথা বলাতে এবং 'আপনি অমুক করেছেন, তমুক করেছেন' এই সব বলাতে, স্বামিজী দাদাকে বল্লেন, "দাদা এত 'করেছেন—চেন' লাগাচ্ছেন কেন। আমি সেই বিলে আছি।" 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—এই বলে ভক্তির সহিত প্রণাম করলেন।"

"শ্রীশ্রীঠাকুর রামলাল দাদাকে জনৈক ভক্তের বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন। ভক্ত তাঁকে আদর করেন নি। এমন কি, পান, এক ছিলিম তামাকও দেন নি। ঠাকুর বললেন—'তোকে এরূপ করল কেন?' রামলাল দা বললেন, 'তাতে কি হয়েছে।' ঠাকুর কিন্তু বললেন—'না, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া উচিত। তার উপর আমার ভাই-পো, ব্রাহ্মণশরীর—মান্য করা উচিত ছিল। তা না হলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন।'

"ছুটো কড়া কথা কেউ বল্‌লে গায়ে কি লেগে থাকে? কিছু মনে করতে নেই। ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। সাধুদের বল্‌তেন—'উপলক্ষ্য ভুলিস না। সৎলোক উপলক্ষ্য ভুলে যায় না। তা না হলে দুর্দ্দশায় কষ্ট পাবে।"

শশী মহারাজ মান্দ্রাজ হইতে মহারাজের জন্য ভাল ভাল আম পাঠাইয়া দিতেন। একবার মহারাজকে সদলবলে মান্দ্রাজে শ্রীরামেশ্বর দর্শনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন "তোর সব খরচা আমি দেব।" কিন্তু মহারাজের নানাকারণে যাওয়া হইয়া উঠে নাই। লাটু মহারাজ স্বামীজির নীচেই শশী মহারাজের ভালোবাসার স্থান দিতেন।

লাটু মহারাজ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তিল-ভাণ্ডেশ্বর সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। এঁকে পূজো করলে মনটা বেশ জমে যায়। তিলভাণ্ডেশ্বরের সাধুদের খুব শ্রদ্ধা দেখেছি। ওরা মাধুকরী করে খেয়ে ৺বাবার পূজো অর্চ্চা করে। এটা কি কম ভাগ্যের কথা?"

লাটু মহারাজ জনৈক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন, "ও সন্ন্যাস নিয়েছে তো কি হয়েছে? ছুটো শিং গজিয়েছে? মার (গর্ভধারিণীর) সেবা করা উচিত। মা দুঃখ করলে ক্ষতি হয়। আমাদের ঠাকুর বৃন্দাবনে থাকতে পারলেন না। সব ঠিক ছিল। কিন্তু মায়ের কষ্ট হবে বলে থাকতে পারলেন না। এসব আদর্শ ভুললে চলবে না।"

লাটুমহারাজ বলিতেন "যোগবিনোদ গুরুর খুব সেবা করেছে। ওর কল্যাণ হবে। গুরুর জন্য তাঁর বিধবা মেয়েদের বিষয়ের ব্যাপারে অনেক হাঙ্গাম পোয়াতে হত। এজন্য অনেকে না বুঝে তাকে দোষ দিত। এটা ঠিক নয়। আমি একবার রামদত্তের অসুখের খবর পেয়ে কাঁকুড়গাছিতে তাঁর সেবাতে গেলাম। গুরুসেবা কি কম ভাগ্যের কথা? গুরুসেবায় অসম্ভব সম্ভব হয়।"

কোন ভক্ত যদি মাতাল বা চরিত্রহীন হইত তাহা হইলেও তিনি খুব আদর করিয়া কথা বলিতেন। এসব প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশিতে দেখিয়া কতো লোক অপছন্দ করিত, বারণ করিত। কিন্তু তিনি কখনও সঙ্কোচ করিতেন না বা বিরক্ত হইতেন না। এজন্য বাবুরাম মহারাজ বলিতেন "তোদের লাটু মহারাজ অহেতুক পতিতপাবন।"

জনৈক ভক্ত অফিস হইতে আসিয়া মহারাজের কাছে থাকিতেন। তাঁহার পরীক্ষা অতি নিকটে পড়াশুনা বিশেষ হয় নাই। পরীক্ষার আগের দিন ভক্তটিকে মহারাজ বলিলেন, "বইটই একটু দেখতে পারিস্?" ভক্তটি বললে "তা হয়ে ওঠে না।" ভক্তটি সেবার লাটু মহারাজের কৃপায় পাশ হইয়া গেলেন। মহারাজ Merchant officeএর চাকরী পছন্দ করিতেন না। বলিতেন "কোন pensionএর ব্যবস্থা নেই, Government এর চাকরীতে কেমন আছে! বুড়ো বয়সে কোন ভাবতে হবে না। খাওয়া পরার ভাবনা না থাকলে শ্রীভগবানের নাম বেশ করা যায়। ৺কাশীতে দেখছি যতো পেন্সন-হোল্ডারের দল বসে বসে বাজে গল্পে সময় কাটাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এরকম করলে ভগবানের কাছে দোষী হতে হয়।"

একদিন দেখিতে পাইলাম মহারাজের শরীর সব-স্থাল হইয়া গিয়াছে, মহাবীরের মতো শুইয়া আছেন। তাঁহার শরীরে মহাবীরের ভাব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব যে না দেখিয়াছে সে আর বুঝিবে কি?

কোন ভক্ত মহারাজের শ্রীচরণদর্শনে আসিলে তাহাকে প্রসাদ দিতে বলিতেন। আবার যাহার আধার খুব ভাল তাহাকে পুনরায় আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন। যদি কোন ভক্ত আসিত এবং তাহার আধার ভাল নয় আগে টের পাইলে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া থাকিতেন। ভক্তটি কিছুক্ষণ থাকিয়া পরে চলিয়া যাইত। ভক্তটির কথা মহারাজকে বলায় বলিতেন "দিক্ করতে এসেছিল, কে বৃথা energy (শক্তি) ব্যয় করে?" জনৈক ভক্ত ঠাকুরের ভোগের আগে আমরা ক'জন আছি এবং কি কি জিনিষপত্র লাগিবে এই হিসাব করায়, মহারাজ খুব বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ঠাকুরের ভোগ হল না আর তোরা আগে থেকে হিসেব করছিস? এ খুব পাপ। বাইরের দিকটায় বেশী ঝোঁক দিলে ঠাকুরসেবায় ত্রুটি হয়।"

লাটু মহারাজ নৌকায় চড়িতে ভয় পাইতেন। বোধ হয় সাঁতার জানিতেন না বলিয়া তাঁহার এই ছেলেমানুষি। নইলে তাঁহাদের আবার ভয় কি?

লাটু মহারাজের কাছে জনৈক ভক্ত রোজ সন্ধ্যার সময় আসিতেন। কিছু খাবার আনিয়া বলিতেন "প্রসাদ করে দিন বাবা।" দরদীর প্রাণ—খুব বুঝিতেন। না খাইলে পাছে ভক্তটি মনে ব্যথা পায় এ বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখিতেন।

গীতা-ভাগবত পাঠ শোনাইলে, মহারাজ বলিতেন "লোককে শোনাচ্ছি এই ভাব আনা খুব খারাপ। শ্রীভগবানকে শোনাচ্ছি এই ভাবে ভাগবতপাঠ শোনালে কর্ম্ম ক্ষয় হয়, এবং অহঙ্কার অভিমান নাশ হয়।" তাঁহার ভাব ছিল "ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা করবে তাতেই অহং নাশ হবে।'

সেবাশ্রমের জনৈক সাধুকে মহারাজ বলিয়াছিলেন "তুমি ছত্রে একবেলা ভিক্ষা কর, রাত্রে আমার নিকট থাকবে। তুমি আমার কাছে থেকে সাধন ভজন কর।" ঐ সাধুটি তখন নানা কারণে থাকিতে পারেন নাই। এখন কিন্তু সাধুটি দুঃখ করেন! তবে মহারাজের শরীর যাইবার আগে কয়দিন প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াছিলেন। যখন মহারাজের শরীর যায় এই সাধুটি কাছে ছিলেন। তিনি হরি মহারাজকে খবর পাঠাইলেন। হরি মহারাজ তখনই চলিয়া আসিলেন ও গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন যে, শরীর সামান্য গরম আছে। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরি মহারাজ লাটু মহারাজকে বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং মাঝে মাঝে আসিতেন। লাটু মহারাজ আমাদের কথায় কথায় বলিতেন "হরি মহারাজের ভাইরা আমাকে খুব গালাগালি দিতেন। আবার যখন তিনি সন্ন্যাস নিয়ে আমেরিকায় গেলেন তখন তাঁরা আরও চটে গেলেন।" লাটু মহারাজের প্রেরণাতেই অনেকটা হরি মহারাজ গৃহত্যাগ করেন।

"শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের খুব সেবা করেছেন। আমরা তখন বাইরে বাইরে থাকতুম। আর আমার স্বভাবই ছিল অন্য ধরনের। মেয়েদের, মায়েদের হাঙ্গামা পোয়াতুম না। মেয়েদের মায়েদের মন যোগানোর ধৈর্য্য ছিল না বাপু! আমি শরৎ মহারাজকে বলেছিলাম তুমি তো শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনেক সেবা করেছো। তিনি যাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেন সেই পারে। এখন তাঁর দয়ায় তোমাদের মহিমা বুঝতে পারছি। আগে কি আর আমরা সেটা বুঝতে পারতুম? দেখা হলে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা।" এই সব কথা পত্রে জানাইয়াছিলেন। মহারাজ রাত্রিতে আদৌ ঘুমাইতেন না। হঠাৎ ঘরে কেহ গেলে বলিতেন, "কে

রে?" আর একদিন এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন "আমাকে watch করিস না। আমার যা খুসী তাই করবো। ইচ্ছা হলে ধ্যান-জপ করবো, না হলে নাই করবো; তাতে তোর কি?" এ ভাব কি সহজে বোঝা যায়? সাধক ছাড়া ইহার মর্ম্ম আর কে জানিবে?

মহারাজ ৺বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার প্রসাদ খুব ভক্তি করে গ্রহণ করিতেন। কোন ভক্ত ৺কাশীতে আসিলে ৺অন্নপূর্ণার প্রসাদ আনাইয়া দিতেন। ৺বিশ্বনাথের প্রসাদ পাইয়া মহারাজ বলিতেন "৺বিশ্বনাথ নিজে মা অন্নপূর্ণার প্রসাদ পান। ৺বিশ্বনাথের প্রসাদ হয় মোটা চাল আর রুটির।" অন্নকূটের প্রসাদ ভক্তদের ধারণ করিতে বলিতেন। বলিতেন "অন্নকূটের প্রসাদ ধারণ করলে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট থাকে না।" অন্নকূটের প্রসাদ ডাকে পার্শ্বেল করিয়া আমেরিকায় পাঠাইয়াছেন। ৺বিশ্বনাথের প্রসঙ্গ তাঁর অতি প্রিয় ছিল।

সুহৃদ *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশ

জীবনের জয়গান গাহি যৌবনের রক্তিম উষায়
এসেছিনু দূর হ'তে ছুটে, জননীর পূজা আঙ্গিনায়;

হে সুহৃদ সহতীর্থ মোর পথপ্রান্তে তব দরশন,
বহাইল হৃদিতটে মোর সুপ্রীতির স্নিগ্ধ পরশন;
তারপর গেছে কতকাল, গাহ তুমি আনন্দ সঙ্গীত
সেবকের প্রেমানন্দে মাতি, শুনে সবে মায়ের ইঙ্গিত;
এবিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সপ্তলোকে আছেন জননী,
অবিচ্ছিন্ন অবিরাম তাঁর বিকাশের অপূর্ব্ব সরণী

চেতনার ঊর্দ্ধোত্থিত বেগে ফুটে উঠে জ্যোতিপুষ্প সম,
একসুরে অজানা আহ্বান, স্থিতিবুকে গতি নিরুপম;
সেই কথা ভাবময়ী মাতা চিন্ময়ের বক্ষ হ'তে আসি,
এ ধরার মৃন্ময় আধারে কুসুমিত করে ভালবাসি;
জন্ম জন্ম মোরা সহোদর তত্ত্ব ছাড়ি তথ্যের জগতে;
জননীর সাথে চলি মোরা 'সূর্য্যমুখী' অন্ধকার হতে।

* গুজরাটী কবিবন্ধু পূজালালের জন্মদিনে।

প্যারিস-যাত্রীর পত্র*

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার

শ্রীচরণকমলেষু

শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন এই—গুরুদেব, ৩রা Sept সন্ধ্যা ৮॥ ঘটিকায় এডেন হইতে জাহাজ ছাড়িয়া ৭ই Sept. বেলা ১১টার সময় সুয়েজ খালের মুখে পৌঁছে। লোহিত সাগরের জল শেষের দিকে ঘোর নীল ছিল। লোহিত সাগরের একদিকে আরব, অন্যদিকে আফ্রিকা। জাহাজ হইতে কোন কূল দেখা যায় নাই। মাঝে মাঝে সমুদ্রের মধ্যে ২।১টা পাহাড় ছিল। Gulf of Suez-এর দুইধারে পোড়ামাটির রংয়ের পাহাড় ছিল। সুয়েজের মুখে আমাদিগকে বেলা ১১টা হইতে ভোর ৫।টা পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। সুয়েজে সামরিক আইন জারী থাকায় আমাদিগকে নামিতে দেওয়া হয় না। এখানে ছোট ছোট নৌকায় করিয়া জাহাজের দুই পার্শ্বে বহু দোকান আসিতে থাকে। তাহারা নৌকার মাস্তুলের উপর বসিয়া দড়ির সাহায্যে মাল বেচিতে থাকে। বেশীর ভাগ জিনিসই চামড়ার— পিরামিড ও Sphinx-এর ছবিওয়ালা খুব সুন্দর সুন্দর গালিচা ছিল। জাহাজ হইতে রাত্রিবেলা সুয়েজ শহর খুবই সুন্দর দেখায়। ভোর বেলা জাহাজ ধীরে ধীরে সুয়েজের ভিতর প্রবেশ করে। সুয়েজ খালের বামদিকে মিশর সাম্রাজ্য—ডান দিকে আরব। সুয়েজ খালটি ৮৭॥ মাইল লম্বা—এর মধ্যে ৬৬ মাইল খনন করিতে হইয়াছে। বাকী স্থানে পূর্ব্বেই হ্রদ ছিল। ইহা প্রস্থে ২৯৫ ফুট হইতে স্থানে স্থানে ৩৯০ ফুট পর্য্যন্ত এবং একেবারে নীচের প্রস্থ আগাগোড়া ১৪৮ ফুট। গভীরতা ৩৭ ফুটের উপর। ৩০ হাজার টনের বড় জাহাজও যাইতে পারে। আমাদের জাহাজ ২১ হাজার টনের।

ডান পার্শ্বে আরব দেশে খালের সমান্তরাল-ভাবে ছোট্ট একটি রেললাইন চলিয়া গিয়াছে—ওর সাথে টেলিগ্রাফের তারও আছে। ডান দিকে তাকাইলে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালু আর বালু—মাঝে মাঝে বালুর বেশ বড় বড় পাহাড়ের মত। কোথাও গাছপালার শ্যামলতা নাই। কেমন একটা আদিম নিষ্ঠুরতার আশঙ্কায় মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

বাম দিকেও খালের সঙ্গে চলিয়াছে ঝাউ গাছের সারি—পীচের রাস্তার দুই ধারে। মিশর গভর্ণমেণ্টের রেল লাইন সুয়েজ হইতে পোর্ট-সৈয়দ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেল লাইনের পাশেই মোটরের রাস্তা—এই রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় ঝাউগাছের সারি আগাগোড়া পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাস্তায় মিলিটারী ট্রাক, taxi—প্রায়ই চলিতেছে। ডান দিক হইতে বাম দিকে চোখ ঘুরাইলে চোখে বেশ শান্তি পাওয়া যায়। এই রাস্তার আরও বাম দিকে কৃত্রিম জল সেচনের

* পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট লিখিত।

দ্বারা মিশর গভর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি ফসলের সৃষ্টি করিয়াছে। তার পরে ধূ ধূ মরুভূমি। সুয়েজের ভিতরে আমাদের জাহাজ খুবই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। খালের মাঝে ২টা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। সেখানে অনেক জাহাজ নোঙ্গর করা। খালে একটিমাত্র জাহাজ যাইতে বা আসিতে পারে। খালের বাম পার্শ্বে—হ্রদের পার্শ্বে এবং আরও নানা স্থানে ছোট ছোট আধুনিক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ডান পার্শ্বে ধূ ধূ মরুভূমি !

রাত্রি ৮॥ টার সময় আমরা পোর্ট সৈয়দে পৌছিলাম। এখানে Passport-examination-এর পর আমাদিগকে শহরে নামিতে দিল। আধুনিক শহর। বড় বড় দোকান সাহেবী ফ্যাসানে সাজান। মাত্র ২।১টা রাস্তা ঘুরিয়া দেখিলাম, পুলিশ দূরে যাইতে বারণ করিল। রাত্রি ১০॥ টায় জাহাজে ফিরিলাম। এখানে একটা মাড়োয়ারীর দোকান দেখিলাম। সব জিনিষের দাম ভারতবর্ষ হইতে চড়া। লোকগুলিও honest নয়।

৯ই Sept ভোরে জাহাজ পোর্ট সৈয়দ ছাড়ে। বেলা প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল ঘোলা—পদ্মার জলের মত ছিল। দূরে বহুদূরে —ঝাঁকে ঝাঁকে পাল তোলা নৌকা দেখা যাইতেছিল। বেলা ১০টার সময় আমরা গভীর সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। জলের রং নীল। জাহাজ দৈনিক গড়ে ৩৭৫ চলিতেছে।

আজ ১০ই Sept। আমরা ক্রীট দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতেছি। বিকাল বেলার দিকে ঘণ্টাখানেকের জন্য সমুদ্রে খুব বাতাস ছিল। জাহাজ ডাইনে বামে বেশ দুলিতেছিল। সময় সময় ঢেউয়ের জল জাহাজে আহত হইয়া জাহাজের ৪ তলার ডেক ভিজাইয়া দিতেছিল।

১১ই Sept সন্ধ্যাবেলা আমরা ইটালী ও সিসিলির মধ্য দিয়া গেলাম। দুই স্থানেই পর্ব্বতশ্রেণীর, পাদদেশে সমুদ্রের ধারে ধারে ছোট ছোট শহর। ইটালী ও সিসিলির মধ্যে সমুদ্র ১½ মাইল মাত্র চওড়া, কিন্তু খুব গভীর। এখানেই Scylla & Charybdis নামক ভীষণ দুইটি ঘূর্ণাবর্ত্ত রহিয়াছে। Lighthouse-এর ইঙ্গিতে আমাদের জাহাজ প্রায় প্রতি মিনিটে দিক এবং গতিবেগ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই জায়গাটা ছোট জাহাজের পক্ষে খুবই মারাত্মক; রাত্রি ৯৷টার সময় আমরা Stromboli আগ্নেয়গিরির নিকট দিয়া যাইতে লাগিলাম। এই আগ্নেয়গিরিতে অবিরাম অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। পাহাড়ের একটিমাত্র শৃঙ্গ। উহা হইতে মাঝে মাঝে ভীষণ রক্তবর্ণের লাভা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। আমরা উহার খুব নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। গলিত লাভাস্রোত পর্ব্বতশিখর হইতে রক্তনদীর ন্যায় সমুদ্রে পতিত হইতেছে। রাত্রিবেলা কালো আকাশ ও সমুদ্রের বুকে লাভাস্রোত বিভীষিকার ন্যায় মনে হইতেছিল। পাহাড়ের মাথায় অগ্নিগহ্বরের ভিতরটা অনেকখানি দেখা যাইতেছিল। ১২ই Sept আমরা কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মাঝখান দিয়া সোজা মার্সাই অভিমুখে চলিলাম। এখানে বেশ শীত অনুভব হইতেছে।

আজ বেলা (১৩ই সেপ্টেম্বর) ১০টার সময় জাহাজ মার্সাই পৌছিল। জাহাজ হইতে মার্সাই বন্দর দেখিতে খুবই সুন্দর। বিকালের দিকে বন্দরে নামিব। এখানকার আবহাওয়া বেশ সুখকর। আশা করি আগামী ২০।২১ তারিখে লণ্ডনে পৌছিব। সেখান হইতে আমাকে Paris যাইতে হইবে—গভর্ণমেণ্টের ইহাই নির্দ্দেশ। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

C/o. Prof. Lemoigne
Services des Fermentations
Institute Pasteur
28, Rue du Docteur Emile Roux
Paris 15°

৺বিজয়া, ১২ই অক্টোবর

শত কোটি প্রণামান্তে নিবেদন এই—গুরুদেব, আমি গত ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে Paris আসিয়াছি। আমি গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মার্সাই বন্দর হইতে আপনার শ্রীচরণে একখানা পত্র দিয়াছি। আশাকরি তাহা পাইয়াছেন। আমরা মার্সাইতে ২৪ ঘণ্টা ছিলাম। একদিন মোটরে অনেকে মিলিয়া শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলাম। মার্সাই শহর ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত বিরাট শহর। উঁচু নীচু পাহাড়ে বাড়ীঘর সমস্ত ছবির মত। জাহাজ ভিড়িবার বহু dock রহিয়াছে। আমার সবচেয়ে ভাল লাগিল—শহরের একটি বিশিষ্ট রাস্তা যা সমুদ্রের একেবারে উপর দিয়া বহুদুর পর্য্যন্ত গিয়াছে—Bombay এর Marine Drive এর চেয়ে অনেক সুন্দর। এখানকার সব চেয়ে উঁচু এবং সুন্দর পাহাড়টির উপরে মেরী মাতার মন্দির। মন্দিরটি ভারী সুন্দর এবং খুব উঁচু। এখান হইতে তিন দিকে বিশাল নগরী এবং অন্য দিকে অসীম সমুদ্র। স্থানটি মন্দিরের উপযুক্তই বটে। এখানে আরও একটি প্রকাণ্ড গির্জ্জা দেখিলাম—গঠনপরিপাট্য অনেকটা বেলুড় মঠের মত—এটি নাকি Napoleon এর তৈরী।

১৪ই সেপ্টেম্বর জাহাজ ছাড়িয়া ২০শে ভোরে আমরা Tilbury বন্দরে পৌছি। ইহাই London এর সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী বন্দর। জিব্রাল্টার প্রণালীতে ঢুকিবার সময় আমাদের জাহাজ এক ঝাঁক মাছকে বিশেষ বিরক্ত করে। প্রায় ১০ মিনিট যাবৎ জাহাজের একপাশে মাছগুলির কি উল্লম্ফন! হাজার হাজার মাছ জল হইতে লাফাইয়া শূন্যে উঠিয়া আবার জলে পড়িতেছে! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।...

Tilbury হইতে বেলা ৩টার সময় আমরা ট্রেনে (special) উঠি এবং ৪টার সময় লণ্ডন পৌছি। পথের দুই ধারে গোচারণ ভূমি, শস্যক্ষেত্র এবং পল্লী ছিল। রেল লাইনের দুই ধারের পতিত জমিতে এরা শাকসব্জীর চাষ করিয়াছে। শাকসব্জীর ক্ষেতে খানিকটা জায়গা জুড়িয়া ফুলও রহিয়াছে।

লণ্ডনে যা দেখিলাম তার মধ্যে St. Paul Cathedral-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতবড় গীর্জ্জা এখন পর্য্যন্ত আর দেখি নাই। এদের গীর্জ্জায় বড় বড় দেশভক্ত বীরসন্তানদের মূর্ত্তি রহিয়াছে—যাতে ছেলেপিলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। গীর্জ্জার উপরে উঠিলাম, প্রায় ৩৫০ এর বেশী সিঁড়ি। উপরে Whispering Gallery রহিয়াছে। প্রকাণ্ড dome বা গম্বুজ—গম্বুজের দেয়াল ঘেঁসিয়া বেঞ্চি পাতা আছে। দেয়ালের নিকট মুখ রাখিয়া কেহ কথা বলিলে সেই কথা সমস্ত দেয়াল ঘুরিয়া আসে এবং বহু দূরেও কেহ দেওয়ালে কান রাখিলে উহা শুনিতে পায়। St. Paul Cathedral এর উপর হইতে সমস্ত London শহর দেখা যায়। জার্ম্মাণীর বোমায় এর বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। তবে এই কয় বৎসরে ইংরাজরা তাহা প্রায় সারিয়া আনিয়াছে। আমি লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে ছিলাম। বোমাবিধ্বস্ত স্থানগুলি এরা অতি তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিতেছে। বাহির হইতে বোঝা কঠিন যে জার্ম্মানবোমায় লণ্ডন এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

London এর Thames নদী আমাকে নিরাশ করিয়াছে। আমি ঢাকার (পূর্ব্ববঙ্গের) ছেলে। আমাদের দেশের অনেক খালও Thames অপেক্ষা বেশী চওড়া! কলিকাতার গঙ্গা এর ৬।৭ গুণ চাওড়া হইবে।

আমি ২৮শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকাল ৪-১৮ মিঃ Paris পৌঁছি। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী একজন এদেশী যুবক ভক্তকে ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর কৃপায় আমার কোন অসুবিধা হয় নাই। আমি ২৷৩ দিন যাবৎ Institute এ যাইতেছি এবং French শিখিবার জন্য একটি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। কয়েক মাস Laboratory-তে কাজ করিবার পর আমাকে Factory-তে যাইতে হইবে। গত রবিবার দিন আমি "Centre Vedantique Ramakrishna"—at Gretz ওখানে গিয়াছিলাম এবং দুপুর বেলা ওখানে প্রসাদ পাইয়াছি। যে বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তা ঐ শহরটির মধ্যে সবচেয়ে বড় বাড়ী। প্রায় ৩০ খানা ঘর আছে। Modern comforts-এর সব ব্যবস্থা আছে—Hot & cold water, Central heating, Kitchen, dining room, Reception Room, Library, আরও কত কি! মাটির নীচের তলায় বহু ঘর রহিয়াছে। বাড়ীর চারিদিকে বন, উপবন, ফুলের বাগান, টেনিস্ লন্, Kitchen-garden, ফলের বাগান রহিয়াছে। Area 1000 × 700 meters—আমার মনে হয় বেলুড় মঠের অর্দ্ধেকেরও বেশী হইবে। কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাইন গাছের সারি! আমি ঐ দিন তন্ময় হইয়া চারিবার ঘুরিয়া দেখিলাম। স্বামিজী বলিলেন বাড়ীটা মেরামত করিতেই শুধু লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইয়াছে। কোন এক ভাগ্যবানের বাড়ী ছিল, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন!

যে ভক্ত যুবকটি আমাকে ষ্টেশনে receive করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁর স্ত্রীও ঐদিন ওখানে ছিলেন। এঁরা ভক্ত এবং ব্রহ্মচারী। মাত্র তিন বৎসর এঁদের বিবাহ হইয়াছে। ফুলের মত রূপ—এঁরা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য নিয়াছেন যদিও এখনও গৃহস্থালী করিতেছেন। ভক্তটির বয়স ২৩ বৎসর—Indian Embassy-তে কাজ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর এঁদের অগাধ বিশ্বাস!

মোটের উপর Paris হইতে মাত্র ৪০ মাইল দূরে এমন সুন্দর যায়গায় আমাদের নিজস্ব এমন সুন্দর এবং এত বড় একটি আশ্রমকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। যাইবার সময় ট্রেনে ঐ আশ্রমে গিয়াছিলাম। আসিবার সময় স্বামীজী ঐ আশ্রম পরিদর্শনকারী জনৈক ফরাসী ভদ্রলোকের গাড়ীতে আমার Paris-এ আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; আশ্রমটি Paris হইতে ৪০ মাইল দূরে। আসিবার রাস্তাটি ভারী সুন্দর! দুই ধারে ফলের বাগান, বন, শস্যক্ষেত্র। লণ্ডনের মত এর আশে পাশে কল কারখানা নাই। কারখানার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শহর রহিয়াছে। এই শহরটি ভারী সুন্দর। কি বিরাট পার্কসমূহ রহিয়াছে! এখানকার লোকজন খুবই প্রাণবন্ত এবং মিশুক। মোমের পুতুলের মত এঁদের চেহারা, আর বিদেশীর সহিত আচরণে এঁরা খুবই ভদ্র এবং বিনয়ী। এখানে Colour-bar মোটেই নাই। বহু Negro রহিয়াছে—তারা একসাথে খাওয়া দাওয়া পড়াশুনা খেলা ধূলা করিতেছে। ফরাসী দেশ আয়তনে ইংলণ্ডের দ্বিগুণ এবং লোকসংখ্যা লণ্ডনের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। এদের খাওয়া পরার চিন্তার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। উপরন্তু এরা বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ নহে। এদেশে সকল প্রকার জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-পাতিই তৈরী হয়। মোটর গাড়ী, রেল ইঞ্জিন, Camera, typewriter সবকিছুই এদের আছে। তবুও বোধ হয় কোন কূট রাজনৈতিক চালের জন্য এদের জীবনযাত্রা এখন ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। কোন গভর্ণমেণ্টই এখানে stable হইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মঘট প্রায়ই লাগিয়া আছে, বাহিরে রপ্তানি বন্ধ—কাজেই জাতীয় আয় কমিয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া Postage, Tariff প্রভৃতি বাড়াইয়া দিয়াছে। চোরা কারবারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। Honest লোকেরা গরীব হইতেছে।

পেট্রোলের বদলে যে alcohol দ্বারা মোটর গাড়ী চালান যায় আমি সেই Power Alcohol সম্বন্ধে এখানে কাজ করিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার Professor ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে আমার বিষয় বুঝাইতে পারেন। আমার কোন degree হইবে না। আমি Power Alcohol সম্বন্ধে Specialist হইয়া ফিরিতে পারিব—আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে।

আজ ৮বিজয়া। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার কুশল সংবাদ দানে সুখী করিবেন। ইতি—

কোরানে স্বর্গের বর্ণনা

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম-এ

কোরানে স্বর্গ অর্থে ফির্‌দৌস্‌, জন্নৎ, জন্নাৎ, জন্নাতু-ল্‌ ফির্‌দৌস্‌, জন্নাতু-ল্‌ 'অদন্‌ বা জন্নাতু-ল্‌ ন'য়িম্‌ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরানে যেখানেই স্বর্গের বর্ণনা রহিয়াছে, এই সকল শব্দ বা সংযোজিত শব্দকে বিশেষ বিশেষ গুণবাচক শব্দাদি দ্বারা গুণান্বিত করিয়া স্বর্গের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ফির্‌দৌস্‌ শব্দের ব্যবহার আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায়ই দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; সেইজন্য ইংরেজী Paradise শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। ফির্‌দৌস্‌ এর সাধারণ অর্থ উদ্যান বা মনোরম স্থান বিশেষ অর্থে ইহা স্বর্গ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু কোরানে ফির্‌দৌসের ব্যবহার খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। জন্নৎ-এর সাধারণ অর্থ উদ্যান, ইহার বহুবচন জন্নাৎ। কিন্তু ইহার শব্দগত অর্থ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বহির্ভূত এক পবিত্র স্থান। সাধারণতঃ জন্নাৎ অর্থেই স্বর্গের বর্ণনা কোরানের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়।

স্বর্গের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইহার প্রকৃষ্ট রূপ, সত্তা এবং স্বর্গীয় সুখের উপযুক্ত লোকের গুণাদির বর্ণনাসহ কয়েকটি উক্তি কোরান হইতে উদ্ধৃত হইল :—(১) "সৎ ও পবিত্রাত্মাদের জন্য তাঁহাদের প্রভুর সমীপে উদ্যানসমূহ (জন্নাৎ) রহিয়াছে। উহাদের পার্শ্বে স্রোতস্বতীসমূহ প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে তাহারা পবিত্র সঙ্গী অজবাজ ও ভগবৎপ্রসন্নতার প্রাচুর্য্য সহ চিরকাল বাস করিবে। ভগবান তাঁহার ভক্তদের সকল সময়ই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহারা বলিয়া থাকে, 'হে আমাদের প্রভু, আমরা প্রকৃতই তোমার প্রতি আস্থাসম্পন্ন হইয়াছি; অতএব, আমাদের অপরাধসমূহ মার্জ্জনা কর এবং আমাদিগকে নরকাগ্নির নিগ্রহ হইতে রক্ষা কর।' যাহারা পরম সহিষ্ণু, সত্যবাদী, ভগবদ্‌-আজ্ঞাবহ, ভগবৎ-প্রীত্যর্থে দানকারী এবং অতি প্রত্যূষে প্রার্থনার সময় ভগবৎসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহাদিগকেও রক্ষা কর। (৩; ১৫-১৭)।"

(২) "পুরুষ অথবা নারী, যে কেহ যদি ভগবদ্‌-বিশ্বাসী হয়, এবং সৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা অবশেষে স্বর্গে (জন্নৎ) পৌছিবে এবং তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইবে না (৪; ১২৪)।"

(৩). "সত্যান্বেষিগণ উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে (ফী জন্নাতিন্‌ ব 'উয়ূনিন্‌) অবস্থান করিবে। দেবদূতগণ তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'পরম সুখ ও শান্তিতে ইহাদের মধ্যে প্রবেশ কর।' তাহাদের অন্তর হইতে আমরা (ভগবান) সকল প্রকার অনিষ্ট-চিন্তা দূর করিয়া দিব এবং তাহারা পরস্পরের সম্মুখে পরমানন্দের সহিত ভ্রাতৃভাবে অবস্থান করিবে। কোন প্রকার অবসাদ তাহাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং তাহারা

কখনই এই অবস্থা হইতে সরিয়া যাইতে আদিষ্ট হইবে না (১৫ ; ৪৫-৪৮)।"

(৪) "তাহাদের অর্থাৎ সত্যান্বেষীদের জন্য চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহ (জন্নাতু-ল্ 'অদ্নিন্) রহিয়াছে এবং তাহাদের পার্শ্বে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে তাহারা স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত হইবে এবং পাতলা ও ভারী রেশমী সবুজ পোষাক পরিধান করিয়া এবং এই সকল পরিচ্ছদসহ উচ্চাসনে বিশ্রাম করিবে (১৮ ; ৩১)।"

(৫) "যাহারা ভগবদ্-বিশ্বাসী ও সৎকাজে লিপ্ত, তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ স্বর্গীয় উদ্যানসমূহ (জন্নাতু-ল্ ফির্দৌস্) অবস্থিত রহিয়াছে (১৮ ; ১০৭)।"

(৬) "যাঁহারা সকল প্রকার সত্য ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহাদের প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে, তাহারাই বস্তুতঃ আদমের উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে স্বর্গ (ফির্দৌস্) প্রাপ্ত হইবে এবং চিরকাল তথায় বাস করিবে (২৩ ; ৮-১১)।"

(৭) "তাহাদের অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও ভক্তদের জন্য নির্দ্দিষ্ট উপজীবিকা তাহাদের জ্ঞাত আছে (ম'লূমুন্)—যথা পুণ্যকর্ম্মের ন্যায্য ফলসমূহ। তাহারা আনন্দময় উদ্যানে (জন্নাতি-ন্ ন'য়িম্) শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিবে, উচ্চাসনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিবে, স্বচ্ছ স্রোতস্বতী ও প্রস্রবণ হইতে পানীয় তাহাদের নিকট বিতরিত হইবে এবং পানকারীদের নিকট এই পানীয় অতি আরাম-দায়ক হইবে, কিন্তু ইহা হইতে তাহাদের কোন নেশা হইবে না, বা তাহারা কোন প্রকার অবসাদজনিত পীড়া অনুভব করিবে না। তাহাদের পার্শ্বে সলজ্জ দৃষ্টি-বিশিষ্টা দীর্ঘাক্ষীগণ অবস্থান করিবে—তাহাদের চক্ষু এইরূপ পবিত্র ও বিনম্র, যেন পক্ষীর ডিম্ব আচ্ছাদিত অবস্থায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। (৩৭ ; ৪১-৪৯)।"

(৮) "বস্তুতঃ যাহারা সত্যান্বেষী তাহারা উদ্যানসমূহ ও আরামদায়ক স্থানে (জন্নাতিন্ ন ন'য়িমিন্) অবস্থান করিবে। তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে নরকাগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাহারা পরমানন্দ ভোগ করিবে। সেখানে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, 'তোমরা যে সকল সৎ কাজ করিয়াছ, তাহাদের প্রতিদানস্বরূপ এখন তোমরা পানাহার করিতে থাক।' তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উচ্চাসনে অবস্থান করিবে এবং আমরা তাহাদিগকে উজ্জ্বল, দীপ্তিময় চক্ষুবিশিষ্টা সঙ্গীদের (হূরিন্ 'অয়ানিন্) সহিত মিলিত করিব। যাহারা বিশ্বাসী ও নিজেদের পরিবারবর্গের মধ্যে যাহারা এইপথে চালিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত তাহাদের পরিবারবর্গকে পুনরায় মিলিত করিব. তাহাদের কোন কাজেরই প্রতিদান হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিব না, যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ কাজের জন্যই পুরস্কৃত হইবে। ফল এবং মাংস যাহাই তাহারা ইচ্ছা করিবে, তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিব। তাহারা তাহাদের নিজেদের মধ্যে পানপাত্র বিতরণ করিবে—যে পাত্রের মধ্যে কোন অসারতা বা দুঃখ-কষ্টের চিহ্নমাত্র নাই। তাহাদের চারিদিকে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পবিত্র ও শিশুস্বভাব দাসগণ নিযুক্ত থাকিবে। তাহাদের কেহ কেহ আবার নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিবে, 'বস্তুতঃ আমরা আমাদের আপন লোকদের জন্য চিন্তাযুক্ত ছিলাম ; সেইজন্য ভগবান আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র

হইয়াছেন এবং উষ্ণ জ্বালার শাস্তি হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই ভগবানকে দয়াশীল জানিয়া ডাকিয়া আসিয়াছি। এখন প্রকৃতই দেখিতে পাইতেছি যে তিনি পরম দয়ালু ও মহান্ (৫২ ; ১৭-২৮)"।

এই সকল উক্তি ও এইরূপ কোরানের অন্যান্য উক্তি হইতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোরানের স্বর্গ কোন এক সুরম্য স্থানে অবস্থিত এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য ভগবান তথায় সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অকাতরে বিতরণ করিতে থাকিবেন এবং মানব পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ন্যায় এই সকল পুরস্কার তাহাদের পুণ্য কর্ম্মের প্রতিদান স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করিলে সকলেরই বোধগম্য হইবে যে, পরম দয়ালু ভগবান কখনও কেবল কোন কাজের প্রতিদানে দয়ালু হইতে পারেন না। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে ভগবানের অসীম দয়াকে যে অনেকটা সীমাবদ্ধ করা হয়। স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ কখনই পার্থিব সুখ ও আনন্দের মত কামনা-বাসনায় জড়িত হইতে পারে না। বস্তুতঃ স্বর্গ ও স্বর্গীয় সুখ পরম প্রীতিকর ও আরামদায়ক অবস্থার নামান্তর মাত্র এবং এই স্বর্গীয় সুখ যে মৃত্যুর পর পরজীবনেই কেবল লাভ করা যাইবে তাহা নহে, পরন্তু মানব যদি ভগবদ্-অনুগ্রহে ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা নিজকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে এই স্বর্গীয় সুখ এই জীবনেই লাভ করিতে পারে। কোরানে সেই পরম ভাগ্যবানকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "হে পরমশুদ্ধ ও শান্ত আত্মা (নফ্‌সু-ল্ মুত্‌মঈন্নতু), তুমি তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন কর, কারণ তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমি আমার (ভগবান) ভক্তদের সহিত মিলিত হও এবং এইরূপে আমার স্বর্গে (জন্নতী) অবস্থান কর (৮৯ ; ২৭-৩০)।" বস্তুতঃ যাঁহারা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকল কাজের মধ্যেই ভগবৎ-হস্তের ইঙ্গিত রহিয়াছে জানিয়া সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ও শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকেন, এবং ভগবানও তাঁহাদিগকে পরম ভক্ত জানিয়া তাঁহাদের প্রতি সদা সন্তুষ্ট। এইরূপ মানব এই পার্থিব জীবনেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্দ্ধে উঠিয়া, ভগবদ্‌গুণে গুণান্বিত হইয়া স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সৎ বা সৎপথে চালিত হইতেছেন, তাঁহারাও স্বর্গীয় সুখের আভাস এই জীবনেই অনেকটা পাইতে পারেন। এই স্বর্গীয় সুখ কত আনন্দময়, তাহার কতকটা আভাস পান বলিয়াই তাঁহারা পরম স্বর্গীয় সুখের জন্য ভগবানের নিকট আপনাদিগকে বিলাইয়া দিতে সচেষ্ট ও যত্নবান হন। সেই জন্যই কোরানে উক্ত হইয়াছে, "বিশ্বস্ত ও ভক্তদের জন্য পরজীবনের নির্দ্দিষ্ট জীবিকা তাহাদের জ্ঞাত আছে।"

কোরানে স্বর্গের বর্ণনাদি বস্তুতঃ রূপক। ইহা কোন সুরম্য স্থান নহে। কোরান বলিয়াছেন যে স্বর্গীয় উদ্যান প্রশস্ততায় পৃথিবী ও আকাশের তুল্য (৫৭ ; ২১)। এই কথাটি লক্ষ্য করিয়া পয়গম্বর হজরৎ মোঃহম্মদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "যদি স্বর্গই প্রশস্ততায় পৃথিবী ও আকাশের তুল্য হয়, তাহা হইলে নরকের অবস্থান কোথায়?" ইহার উত্তরে পয়গম্বর বলিয়াছিলেন, "যখন দিন আসে, রাত্রি কোথায় যায়?" এই উত্তর হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে স্বর্গ ও নরক রাত্রি ও দিনের ন্যায় অবস্থান্তর-মাত্র এবং স্বর্গের বর্ণনা যে নিছক রূপক মাত্র, তাহা অনেকবারই কোরানে বলা হইয়াছে।

"পুণ্যাত্মাদের জন্য যে উদ্যানের কথা বলা হইয়াছে তাহা রূপক মাত্র (১৩ ; ৩৫।৪৭ ; ১৫)।" অন্যত্র দেখা যায় "তাহাদের সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ কি যে চক্ষু জুড়ান আনন্দ (কু্‌রাতি-অ'ঈনিন্‌) লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা এখন কেহ বুঝিতে পারিবে না (৩২ ; ১৭)।" বস্তুতঃ কামনা-বাসনায় জর্জ্জরিত মানবের পক্ষে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তির সম্যক অনুভব অসম্ভব। আবার, যাহারা ভগবানের অস্তিত্বে আস্থাবান নহে, তাহারা তো এই সকল রূপক বর্ণনাকে একেবারেই বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। তাহাদের সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "ইহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা তোমার (অর্থাৎ হজরৎ মোহম্মদের) এই সকল রূপক স্বর্গের বর্ণনা শুনিবে; কিন্তু অবশেষে যখন তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে, তখন অন্যের নিকট বলিবে, 'এই সকল কি অদ্ভুত কথা বলে!' এই সকল লোক এইরূপই, কারণ নিজেদের কামনা-অনুযায়ী চালিত হয় বলিয়া তাহাদের মনকে ভগবান মোহরবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন (৪৭ ; ১৭)।"

রূপক ছলে নানারকম পার্থিব রূপের দ্বারা স্বর্গের প্রকৃত রূপের আভাস দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা কখনই পার্থিব চিন্তা-ধারার অনুযায়ী নদী, প্রস্রবণ, সুসজ্জা, উচ্চাসন ও পানাহারের সকল বিষয়সম্ভারে পূর্ণ কোন সুরম্য স্থান নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা একটি আনন্দময় অবস্থামাত্র; যখনই মানব তাহার সকল কামনা-বাসনাকে সংযত করিয়া ভগবৎসমীপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে, তখনই সে এই স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিতে পারে, ইহা মৃত্যুর পরই হউক অথবা এই জীবনেই হউক। নদী ও প্রস্রবণ-বর্ণনায় বলা হইয়াছে, ইহারা চিরস্থায়ী, পানাহারের বর্ণনায় বলা হইয়াছে ইহা কোন নেশা বা অবসাদ বহন করে না। সুন্দরী হুর ও বালক-সুলভ দাসের পরিচর্য্যারও উল্লেখ স্বর্গে আছে। কিন্তু ইহাদের কোনটাই পার্থিব নহে। সুন্দরী হুর এবং বালকসুলভ দাস সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও সরলতার প্রতীক মাত্র। পানাহারের নেশা ও অবসাদ ব্যতিরেকে ইহারা অন্যান্য সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই আনন্দবর্দ্ধক। নদী ও প্রস্রবণের প্রশস্ততা ও মধুরতা বস্তুতঃ স্বর্গীয়। পৃথিবীর সকল বস্তুই স্বর্গে রূপান্তরিত হইত, যদি ইহাদের সকল সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা ও পঙ্কিলতা দূরীভূত হইত।

এই পার্থিব মানব সৌন্দর্য্য পবিত্রতা সরলতা প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণের সহিত সঙ্কীর্ণতা মলিনতা পঙ্কিলতা প্রভৃতি নারকীয় দোষের একত্র সমাবেশ। মানব যতই স্বর্গীয় গুণের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকিবে, ততই হীন প্রবৃত্তি হইতে দূরে থাকিবে, এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান উৎকর্ষের কোন সীমা নাই। স্বর্গ বস্তুতঃ মানবজীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির সু-উচ্চ অবস্থা মাত্র। যতই সে স্বর্গীয় পথে অগ্রসর হইবে, ততই সে ইহার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। সেইজন্য কোরানে উক্ত হইয়াছে, "যাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি আগ্রহশীল, তাহাদের জন্য সু-উচ্চ বাসস্থান একটির উপর আর একটি স্থাপিত রহিয়াছে (৩৯ ; ২০)।" অন্যত্র রহিয়াছে, "তাহাদের এই দক্ষিণ হস্তের (অর্থাৎ সৎকার্য্যের) আলোকবর্ত্তিকা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে (৬৬ ; ৮)।"

বস্তুতঃ মানবাদর্শ পরম শান্তিলাভ এবং সেই শান্তি তখনই লাভ করা যাইবে, যখন মানব ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিয়া, ভগবৎস্বরূপ প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া সেখানে চিরস্থায়ী ভাবে বাস করিবে। সেইজন্যই কোরানের অনেক স্থানেই স্বর্গকে দারু-স্‌ সলাম' বা শান্তিধাম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার অন্য নাম লিকা 'আল্লা অর্থাৎ ভগবৎসান্নিধ্য এবং কোরানে মানবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, "হে মানব, যে পর্য্যন্ত না ভগবানের নিকট পৌছিতে পার, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অদম্য চেষ্টা করিতে হইবে (৮৫ ; ৬)।" এই ভগবৎস্বরূপ প্রকৃষ্টভাবে লাভ করা এই পার্থিব শরীর নিয়া কখনই সম্ভব নহে। তাই স্বর্গকে কোরান পরকালের পর্য্যায় রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কনখলে স্বামী তুরীয়ানন্দ*

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

নাগালে তপস্যা করিবার সময় স্বামী তুরীয়ানন্দের জ্বর হয়। অসুখ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার অবস্থা অতিশয় উদ্বেগজনক হইয়া উঠে। সেইজন্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাসে তাঁহাকে কনখল সেবাশ্রমে আনা হয়। তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দ এবং ব্রহ্মচারী গুরুদাস ৭ই এপ্রিল কাশী হইতে কনখলে উপস্থিত হন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দের জ্বর ছাড়িয়া গেলেও শরীর শীর্ণ ও দুর্বল ছিল। সেবাশ্রমে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুদাস একাকী হরি মহারাজের ঘরে গেলেন। গুরুদাস মহারাজ যাইয়া দেখিলেন, হরি মহারাজ শয্যায় আসীন। তাঁহার শরীরে তেমন পরিবর্তন হয় নাই, কেবল তাঁহার দাড়ি ও মাথার চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার তালুতে টাক পড়িতেছে। তাঁহাকে দুর্বল দেখাইতেছিল, রুগ্ন নহে। তাঁহার মুখে ও চোখে প্রশান্ত ভাব। তাঁহার স্বর ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ়। তাঁহার দৈহিক দুর্বলতার পশ্চাতে প্রবল মানসিক শক্তি লক্ষিত হইতেছিল। প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে এবং এমন কি, কণ্ঠস্বরেও ইহা প্রকাশমান ছিল।

পরস্পর অভিবাদনসূচক কয়েকটি বাক্যালাপের পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হরি মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বাবুরাম মহারাজ শীঘ্রই আসিবেন। তখন হরি মহারাজ একটু শান্ত হইয়া গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "তোমাকে খুব দুর্বল ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। কলকাতার কোন ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নাও নি কেন? তোমার সমস্যা ত খাদ্যেরই। আমাদের দেশের খাদ্য তোমাদের সহ্য হয় না। আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের প্রকৃত যত্ন করতে পারি না, তাই আমরা রোগে এত ভুগি। সবল হও, দুর্বল হয়ো না। কিন্তু শরীরের দিকে বেশী নজর দিও না। আমি গত ছয় মাস ধরে খুব ভুগছিলাম, কিন্তু ওদিকে খেয়ালই করি নি। আমার কোন ভয়ও ছিল না। আমি মহাযাত্রার জন্য সদা প্রস্তুত। কিন্তু মা এখনও সেটি হতে দেন নি। আমি আরও গভীর ভাবে এখন বুঝতে পারছি, তিনিই সব করছেন। আমরা তাঁর হাতে যন্ত্র মাত্র। তাঁর ইচ্ছা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না। আমরা যেন এটি কখনও না ভুলি।" গুরুদাস মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমাদের দুর্বল করেন কেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "তিনিই জানেন। দুর্বলতায় ভালও হতে পারে। কিছুই একেবারে মন্দ নয়। কিন্তু আমরা এসব কিছুই বুঝতে বা বিচার করতে পারি না।" স্বামী প্রেমানন্দ এ সময় ঘরে আসিলেন। গুরুভ্রাতৃ-যুগলের সপ্রেম সম্মিলন এক অতি সুন্দর দৃশ্য! হাস্যমুখে গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "স্বামী প্রেমানন্দ আপনাকে বেলুড় মঠে নিয়ে যেতে এসেছেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "না, এখন নয়। শরীর সুস্থ করবার জন্য ডাক্তার আমাকে পাহাড়ে যেতে বলছেন। তিনি আমাকে সমতল

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (১৯২৫ মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যা) প্রকাশিত স্বামী অতুলানন্দের প্রবন্ধের অনুবাদ।

প্রদেশে যেতে দেবেন না। এখন ওখানে খুব গরম। আর আমার বিশ্রামও হবে না। সারাদিন লোক ভিড় করবে আমার কাছে।"

বৈকালে গুরুদাস মহারাজ হরি মহারাজকে বলিলেন, তিনি প্রতীক-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বই পাইয়াছেন। হরি মহারাজ বলিলেন, "প্রতীক-তত্ত্ব সম্বন্ধে এত মাথাঘামাও কেন? আমাদের ঠাকুরের শিক্ষা খুব সহজ ও সরল। ইহা সুগম পথ। একদিন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বললেন। তখন ঠাকুর উত্তর দিলেন,' মশায়, আপনি যা বললেন তা খুব সুন্দর হতে পারে, কিন্তু আমি এসব বুঝি না। আমি জানি কেবল জগদম্বাকে, আর জানি আমি তাঁর সন্তান।' ঠাকুরের কথায় পণ্ডিতের চোখ খুলল। তিনি সানন্দে বলে উঠলেন, 'মশায়, আপনি ধন্য।' ঠাকুরের সরলতা এমন ভাবে তাঁর হৃদয়স্পর্শ করল যে, তিনি কাঁদতে লাগলেন।'

সন্ধ্যায় তিনি আমেরিকা এবং সেখানকার ভক্ত ও বন্ধুদের কথা গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "মা আমাকে কৃপা করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ছিলেন। তোমরা সকলে আমার পরমাত্মীয় ও পরম প্রিয়। প্রায়ই আমি তোমাদের সান্নিধ্য অনুভব করি। আমি চোখ বন্ধ করে মনে মনে এক একটি বন্ধুকে ডাকি। অবশ্য তারা তা জানে না। এটা আমার কল্পনা মাত্র। কিন্তু এরূপ কল্পনা তৃপ্তিদায়ক। সবই ত মানসিক। আত্মস্বরূপে আমরা সব এক।" গুরুদাস মহারাজের প্রতি বিভিন্ন লোকের ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "এগুলি আমাদের মনেরই প্রক্ষেপণ। ভালমন্দ আমাদের মনেই আছে। সর্বত্র ভাল দেখতে চেষ্টা করাই ভাল। যখনই আমরা মায়ের সান্নিধ্যে থাকি তখন সবই মঙ্গল। তাঁর অভাবেই সকল কষ্টের উদ্ভব।"

গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কাশ্মীর যাইবেন কি না। স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "সংকল্প করা অনাবশ্যক। কারণ, মা পূর্বেই জানেন কি ঘটবে। আমরা সংকল্প করি, কারণ আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই। সংকল্পশূন্য অবস্থায় থাকতে হলে গভীর বিশ্বাসের প্রয়োজন। কাশ্মীর হক, বা কলকাতা হক তাতে কি যায় আসে? মা সর্বত্রই আছেন।" পরদিন প্রাতে গুরুদাস মহারাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, "কেউ কেউ মনে করে, আমি একলা থাকতে চাই। তা সত্য নয়। আমি অনুকূল সঙ্গ চাই।" গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "কিন্তু আপনি কোলাহল-পূর্ণ স্থান পছন্দ করেন না।" স্বামিজী উত্তর করিলেন, "কোলাহলের জন্য আমি আদৌ ভাবি না, যদি সকলের মন একভাবে ভাবিত হয় এবং তাহা ধর্মভাবে। লোকসমাগম আমি পছন্দ করি, কিন্তু সকলে যদি ধর্মপ্রসঙ্গ করে। যা আমি জানি তা আমি শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি। কারণ তাতে এই তৃপ্তি পাই যে, আমি কিছু কাজে লাগছি। অপরকে সেবা করার চেয়ে মহত্তর সুখ আর কি হতে পারে? আমেরিকায় আমি কি সুখেই ছিলাম! কিন্তু এখন আর কোন কাজের ভার নিতে ইচ্ছা হয় না। কোন কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে মনে হয় যেন আমি বদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমি সদা মুক্তভাবে থাকতে চাই, তাতে যা' হবার হোক।"

পরদিন সকালে একজন যুবক জয়রামবাটী হইতে আসিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে সন্ন্যাস দিয়া তাঁহার হাতে একখানি চিঠিতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছেন আবশ্যক বিরজা হোমাদি করিবার জন্য। তিনি কনখলের পথে বহুস্থানে নামিয়া

দেখিয়াছেন যে, বাংলার বাহিরের খাদ্য তাঁহার সহ্য হয় না। ইহা শুনিয়া হরি মহারাজ বলিলেন, "কখনও কখনও এই ভেবে আমি আশ্চর্য হই, যৌবনে এত কষ্টে কি করে জীবন কাটিয়েছি। এখন এরূপ করা খুব শক্ত মনে হয়। কিন্তু মনের জোরে এখনও সেরূপ করতে পারি। সত্যই এদিকের খাদ্য খুবই নিকৃষ্ট। তখনকার দিনে ওসব বিষয়ে আদৌ ভাবতাম না। খাদ্য, স্বাস্থ্য বা শরীরের বিবেচনা তখন মনে স্থান পেত না। আমাদের একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল, এবং সেই লক্ষ্যের জন্যই জীবনধারণ করেছিলাম। আমরা খুব ধ্যান করতুম। দিনে একবার মাত্র খেতুম, কয়েকটি বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে যে কখানি রুটি এবং একটু ঘোল পেতুম তাতেই আমাদের দিন কাটত। এরূপ সামান্য আহারেই সন্তুষ্ট থাকতাম। আমি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছিলাম। বোধ হয় বৃদ্ধ বয়সে অধিকতর ভাল খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে ধারণাও কাল্পনিক। আমরা খাদ্যকে অখাদ্য মনে করি। সেইজন্য তা থেকে যথেষ্ট পুষ্টি গ্রহণ করতে পারি না। যে সকল দিনে আমরা শরীরের কথা ভাবি না সেগুলিই সুখের দিন।"

একজন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ধ্যানের পক্ষে কোন বিষয়টি উত্তম?" স্বামিজী উত্তর দিলেন, "যে বিষয়টি তোমার ভাল লাগে। সবই একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়, পরে সব ঠিক হয়ে যায়।" গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি বলিলেন, "গুরু শিষ্যকে স্নেহে আবদ্ধ করবেন। কিন্তু তিনি তাকে বদ্ধ না রেখে মুক্ত রাখবেন। যিনি অপরকে বদ্ধ করেন তিনি নিজেই বদ্ধ হন। গুরু শিষ্যকে হৃদয়ের (প্রেমের) দ্বারাই শাসন করবেন, মস্তিষ্কের (বুদ্ধির) দ্বারা নয়। শিষ্যের মোহনাশ এবং দৃষ্টি সাফ করাই গুরুর কাজ।" শিষ্যের গুরুর প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে বলিলেন, "শিষ্য প্রেমেই গুরুর আদেশ পালন করবেন, ভয়ে নয়। ভয় হতে যে আনুগত্য হয় তা দাসত্ব। যারা ক্ষমতার কাঙাল, তারা আনুগত্য আদায় করে তারা শাসন করতে চায়। এটা ক্ষুদ্রতা, নীচতা।" পরদিবস তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বলিলেন, "তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল। অনেকের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কিন্তু খুব কম লোকেই উহা স্বীকার করে। অনেকে স্বামিজীর বাণীকেই নিজের বাণীরূপে প্রচার করেন। কিন্তু স্বামিজী ছিলেন 'নির্ভীক'।" এই বলিয়া তিনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২।৪) এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে মানুষ ভয়শূন্য হয়।"

গুরুদাস মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'জ্ঞানিগণের কি পুনর্জন্মের ভয় থাকে না?' স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "তাঁদের ত পুনর্জন্ম হয় না। আর যদি জন্ম হয়ও তাকে জন্ম বলতে পার না। কারণ, তখনও তাঁরা মুক্ত। শিব শিব, ওঁ তৎ সৎ ওঁ। তাঁরা নির্ভয়। কারণ, তাঁরা অনাসক্ত। মাকে জানলেই আসক্তি দূর হয়। এই দুনিয়া তখন কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য একটা মাটির পুতুলের মত তুচ্ছ।" এই কথা বলিবার পর স্বামী তুরীয়ানন্দের মন কোন্ অতীন্দ্রিয় লোকে চলিয়া গেল। তাঁহার দৃষ্টিও কোন্ ঊর্ধ্বলোকে নিবদ্ধ হইল। তিনি নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল এক দিব্যপ্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কেহই কথা বলিতে পারিলেন না।

তৎপরদিবস তিনি তাঁহার আমেরিকার অভিজ্ঞতা এবং তথায় স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিলেন। তৎ-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "সবই মায়ের কৃপা।

শিব, শিব! মা ব্যতীত সবই দুঃখময়। যখন আমরা তাঁর জন্য কাঁদি, যখন আমাদের হৃদয় তাঁর জন্য আকুল হয় তখনই তিনি আসেন।" একজন আমেরিকান শিষ্যার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "সেও ছিল নির্ভরশীল। সে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে না কেন? আমি ত তাঁরই দাস। তাঁর কাছে সবাই আসুক, তা হলে অভীঃ লাভ করবে।" পাশ্চাত্য কবি ও দার্শনিকগণের সম্বন্ধে গুরুদাস মহারাজ মন্তব্য করিলেন যে তাঁহারা প্রাচ্য ভাবধারার নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্যে বলিলেন, "আমাদের শিবই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। যখন নারদ তাঁকে উমার মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন, 'উত্তম। এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান করতে পারব।' এটাই ব্যবহারিক দর্শন।"

কয়েকদিন পরে যখন হরি মহারাজ একটু চলিতে ফিরিতে সমর্থ হইলেন তখন তিনি গুরুদাস মহারাজের ঘরে গেলেন। গুরুদাস মহারাজের টেবিলের উপর ঠাকুরের একটী ফটো দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তিনি একাকীই দণ্ডায়মান। তিনি অতুলনীয়। কেশব সেন একদিন তাঁকে কোন ফটোগ্রাফারের নিকট নিয়ে যান এবং তাঁকে মুহূর্তের জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াতে অনুরোধ করেন। ঠাকুর তাঁর কথা শিশুর মত মানলেন, এবং ফটোগ্রাফটি তোলা হল।" স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বেশী চিঠিপত্র পান কি না। গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "বেশী না।" তখন তিনি বলিলেন, "আমরা যেমন দিই তেমন পাই। যদি আমরা অপরকে ভালবাসি, তারাও আমাদের ভালবাসবে।"

বৈকালে গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘরে যাইয়া তথায় স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিলেন। হরি মহারাজ তখন খই খাইতেছিলেন। গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আপনার জন্য একটু নুন নিয়ে আসি।" গুরুদাস মহারাজ ফিরিয়া আসিতে হরি মহারাজ বাইবেল হইতে নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন, 'তোমরাই পৃথিবীর লবণ। কিন্তু লবণ যদি উহার লবণত্ব হারায় তবে কিরূপে উহা লবণীকৃত হইবে?' যীশু খ্রীষ্টের বাক্যগুলি কি শক্তিশালী! তিনি বলেছিলেন, 'শৃগালদের গর্ত আছে, আকাশচারী পাখীদেরও বাসা আছে। কিন্তু ঈশ্বর-সন্তানের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই।' তিনি ছিলেন যথার্থ সন্ন্যাসী।"

গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "ভারতে বাস করে আমি বাইবেল আরও ভালরূপে বুঝতে পারছি। বাইবেলোক্ত ঘটনা এখানে নিত্যই ঘটছে। এখানে সন্ন্যাসিগণ কিরূপে জীবন যাপন করেন তা দেখে আমি যীশুর জীবন আরও স্পষ্টরূপে মানসপটে চিত্রিত করতে পারি। ভারতবাসে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হয়।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "হাঁ, তুমি সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে ইহা দেখছ।" তারপর গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে লেডি মিণ্টোর বেলুড় মঠ পরিদর্শনের কথা বলিলেন। লেডি মিণ্টো বেলুড় মঠের সাধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের কি বাণী?" একজন সাধু উত্তর দিয়াছিলেন, "তিনি হিন্দু শাস্ত্র মতেই উপদেশ দিতেন।" তাহা শুনিয়া হরি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, "তাঁর উপদেশই শাস্ত্র। শাস্ত্রাতিরিক্ত অনেক কথাও তিনি বলেছেন। তবে তিনি বিনয়পূর্বক বলতেন, তাঁর সব উপদেশ শাস্ত্রেই আছে।"

গুরুদাস মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের বাণী কি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ হতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন নয়?" হরি মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, শঙ্কর কেবল মুক্তি বা নির্বাণ লাভের পথ নির্দেশ করলেন। আমাদের ঠাকুর প্রথমে মানুষকে মুক্ত করতেন এবং তৎপরে তাকে শিক্ষা দিতেন,

কিরূপে সংসারে থাকতে হবে। তাঁর দিব্য স্পর্শে মানুষের সকল বন্ধন ছুটে যেত, মানুষ মুক্ত হত। কিন্তু যাঁরা তাঁর উপদেশ পালন করেন, তাঁরাও মুক্ত হবেন। তাঁর বাক্যের মুক্তিপ্রদা শক্তি ছিল। প্রথমে মুক্ত হও। নাম, রূপ এবং সমগ্র বিশ্বকে বিসর্জন দাও। তার পর সর্ব বস্তু ও ব্যক্তিতে মাকে দর্শন কর। তার পর তাঁর খেলার সাথী হও। আমরা নির্বাণের জন্য ব্যস্ত নয়। আমরা প্রভুর সেবা করতে চাই। আমরা বুড়ী ছুঁয়েছি, আর আমাদের চোর হ'তে হ'বে না।* জীবন যখন যন্ত্রণাদায়ক হয় তখন আমরা জগদম্বার সন্ধান ও স্মরণ করি। মায়ের শরণে ও স্মরণেই প্রকৃত শান্তি, বিমল আনন্দ। প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য বিষয় অবলম্বন করে ঠাকুর শিক্ষা দিতেন। সেই জন্য সর্বদা তাঁর কথাই আমাদের মনে পড়ে। গাছপালায়, পত্রপুষ্পে, কীটপতঙ্গে, নরনারীতে—সর্ববস্তুতে তিনি মাকে দেখতে শিক্ষা দিয়েছেন। জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমরা মাতৃক্রোড়েই অবস্থিত। প্রথমে ইহা অনুভব কর এবং তারপর এই সত্য সর্বক্ষণ স্মরণ কর। তাহ'লে জগৎ আমাদের মলিন করতে পারবে না। মাতৃহীন জীবন কী কষ্টকর! তাঁকে পেলে জীবন মধুময় হয়। তখন আমাদের অভীঃ লাভ হয়।"

এমন সময় ডাক্তার ঘরে আসিলেন। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে পরীক্ষাপূর্বক বলিলেন, "যদি ইনি একটু সাবধানে থাকেন শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। ইনি এখনও দুর্বল, সুস্থ হতে সময় নেবেন।" ডাক্তার চলিয়া যাইতেই গুরুদাস মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর এত দুর্বল হওয়াতে তাঁহার মন দুর্বল হইয়াছে কিনা। তিনি বলিলেন, "না। মনের একটা অবলম্বন আছে।" গুরুদাস মহারাজ—"সেই অবলম্বন কি মা?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, ঠিক বলেছ। সাধারণ লোকে মনকে দেহের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আমি দেখেছি, আমার মন আমার দেহ থেকে পৃথক্। তারপর আর কিরূপে দেহকে মনের সহিত অভিন্ন ভাবতে পারি? আমার সঙ্কটময় অবস্থা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু আমার সেজন্য কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা হয় নি।"

আমেরিকার শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ যে গীতাব্যাখ্যা করিতেন, গুরুদাস মহারাজ শ্রবণান্তে ঐগুলির সার লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইগুলি উক্ত দিবস অন্য সময় তিনি হরি মহারাজকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি উহা শ্রবণে আনন্দিত হইলেন। তারপর তিনি গুরুদাস মহারাজকে তাঁহার কেদারনাথ-যাত্রার অভিজ্ঞতা এইভাবে বর্ণনা করিলেন: তিনি এবং অন্য দুই জন সাধু কয়েকদিন এই তীর্থযাত্রায় অনাহারী ছিলেন। তৎপর তাঁহারা তুষার-ঝড়ের মধ্যে পড়েন এবং ধ্যানে দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অচিরে এক জীর্ণ কুটির তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উহাতে সাধুত্রয় রাত্রি যাপন করেন। পর দিবস তাঁহারা একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা পান। গুরুদাস মহারাজ যখন আবার তাঁহার ঘরে আসিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতে লাগিলেন, "যা-আমরা জানি তা আমাদের অন্ততঃ একবার কার্যে পরিণত করা উচিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকটী বিষয় তিন বার করে অভ্যাস করতেন। অভ্যাসের দ্বারা, সাধনের দ্বারা নূতন জ্ঞান লাভ হয়। কিছু সাধন কর, কিছু অভ্যাস কর। সাধন স্বভাবগত হলেই সিদ্ধি। বন্ধন ও মুক্তি দুইই মনে। আত্মা মনের অতীত।"

গুরুদাস মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "অনুভূতিবান্

* ঠাকুর বুড়ী-চোর খেলার গল্প বলিতেন। উক্ত খেলায় বুড়ীকে ছুঁইলেই আর চোর হইতে হয় না। এই জগৎরূপ ক্রীড়াক্ষেত্রেও একবার ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিলেই মানুষ সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে চিরতরে মুক্তি পায়।

পুরুষ কি অন্যায় কাজ করতে পারেন?" হরি মহারাজ বলিলেন, "কেহ কেহ বলেন, 'হাঁ, সিদ্ধ পুরুষেরাও প্রারব্ধ কর্মবশে অন্যায় কর্ম করে বসেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ইহা পাপ নয়। তাঁরা অনাসক্ত। তাঁদের বেলায় কোন নূতন কর্ম সৃষ্ট হয় না। তাঁরা স্বেচ্ছামত কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হতে পারেন। তাঁরা সদা মনের অধীশ হন, মনাধীন হন না। যদি মুক্ত পুরুষদের সঙ্গ করতে না পার, তাঁদের চিন্তা কর। যাঁরা মনোজয়ী তাঁদের সঙ্গলাভের জন্য যত্নবান হও। মনই মনকে বশ করে। পাঠে, গানে, ধ্যানে—বহু উপায়ে মনকে বশীভূত করা যায়। মনের গতি লক্ষ্য করলে মন সংযত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনের উপর প্রভুত্ব কর। আমরা যেন সত্য ও শুভ বাক্য শ্রবণ করি। আমরা যেন শুদ্ধ ও সুন্দর বস্তু দর্শন করি। আমরা যেন দেহমনকে আত্মবশে রাখতে পারি। ওঁ তৎ সৎ।"

লাটু মহারাজের কথা উঠিল। সমবেত স্বামীজীদের মধ্যে একজন বলিলেন, তিনি নিরক্ষর ছিলেন। গুরুদাস মহারাজ বলিলেন, "কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিকতা অলৌকিক। তিনি শাস্ত্র অনুভব করেছেন। তিনি শাস্ত্রার্থজ্ঞ।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, "তিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নন, তিনি শাস্ত্রমূর্তি, বেদমূর্তি। তিনি ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবা করেছেন।" সন্ধ্যার দিকে একদল তীর্থযাত্রী হরি মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলেন। তন্মধ্যে একজন মন্তব্য করিলেন, "গুরু ব্যতীত ধ্যানাভ্যাস বিপজ্জনক।" হরি মহারাজ তাঁহার সঙ্গে একমত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'গুরুর যথার্থ উপদেশ ব্যতীত প্রাণায়াম অনিষ্টকর হতে পারে, ধ্যান নয়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানপদ্ধতি বর্ণিত।" আর একজন তীর্থযাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, "পাশ্চাত্য জড়বাদী, ভোগপরায়ণ। কিন্তু ওদেশে অনেক ভাল জিনিষ আছে। ওখানে খাদ্য এদেশের চেয়ে অধিকতর পুষ্টিকর। পাকাদি সব বিষয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল ব্যবস্থা আছে। তারা সবল ও স্বাস্থ্যবান্। মেয়েদের অনেক বেশী স্বাধীনতা আছে, তারা সবাই শিক্ষিত। পাশ্চাত্যে গোপনীয়তা সুরক্ষিত। তাদের পোষাকও কর্মজীবনের উপযোগী। এদেশে সব কিছুই নিষ্ক্রিয়তার, নিশ্চেষ্টতার অনুকূল। আমরা তাদের মত উদ্যমশীল নই। পশ্চিম দেশে প্রত্যেকেই অনুচ্চ স্বরে কথা বলে এবং চাকরেরা আমাদের দেশের চেয়ে ভাল ব্যবহার পায়। এমন কি, সামান্য ভৃত্যও ভদ্র ব্যবহার পায়। ওদেশে কোন কর্মই নিন্দনীয় নয়। মানুষ মানুষই,—তার বৃত্তি যাই হোক না কেন। কিন্তু সে সামাজিক নীতি বা শাসন মানতে বাধ্য। ওদেশে কেহ অস্পৃশ্য নয়, অস্পৃশ্যতা ঘৃণার্হ। ভাবুন, আমাদের দেশের নিম্ন জাতির লোকের সহিত আমরা কিরূপ ব্যবহার করি!"

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে একটি তরুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের পরামর্শ চাহিল। স্বামীজী উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর চিন্তা কর। তিনিই তোমাকে সুমতি দেবেন।" জনৈক ব্রহ্মচারী স্বামীজীর খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। যাত্রিগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজী বাইবেলের এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিলেন, 'মানুষ শুধু আহার গ্রহণ করিয়াই বাঁচে না; কিন্তু ঈশ্বর-মুখ-নিঃসৃত বাক্য পালন করিয়াই বাঁচিয়া থাকে।' তারপর তিনি গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "সক্রেটিশ সম্বন্ধে যে ছোট বইখানি তুমি আমাকে দিয়েছিলে সেটি খুব সুন্দর! ইহা তত আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ না হলেও সম্ভবতঃ ইহা সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ইহা মানুষ গড়ার শিক্ষা। যা স্বীয় জীবনে পালন করতেন তাই তিনি শিক্ষা দিতেন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁকেই ডুনিয়া বধ করল!"

এক ব্যক্তি অপরের নিকট দুর্ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে হরি মহারাজ বলিলেন, "তার দ্বেষ ছিল না। উহাই অদ্ভুত, উহাই খাঁটি খ্রীষ্টানভাব। ইহা ব্রহ্মময়ীর কৃপা। তিনিই লোকটির হাত ধরে আছেন। সর্বদা মনে রেখো, মা আমাদের ভাগ্যে ঘটে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই মা করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মা তাকে রক্ষা করবেন। অবশ্য মাঝে মাঝে সেও ইহা অনুভব করত। কিন্তু সে ভাবত, ইহা তার দুর্বলতা মাত্র। অন্যের দুর্ব্যবহারে আমরা নিজেদের হতভাগ্য মনে করব কেন? প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে দুর্বল হয়, এবং তখনই আমাদের দুর্ভোগ ঘটে। যখন আমরা মায়ের কাছে থাকি, অন্যাবস্থায় যা দুঃখকর তা তখন তদ্রূপ হয় না। যারা আমাদের অনিষ্ট বা অন্যায় করে তাদের সম্বন্ধে আমাদের মন্দ ভাব পোষণ করা উচিত নয়। মায়ের উপর বিশ্বাস হারাবে না। বিশ্বাসই প্রকৃত বন্ধু ও রক্ষক। প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে হতাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু তা সকলে প্রকাশ করে না।"

পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, "যখন আমি তোমার কোন পত্র পাই তখন তোমার মানসিক অবস্থার একটি ছবি আমি মানসনেত্রে দেখি এবং অধিক চিন্তা না করেই যেন দিব্য প্রেরণার বশে উত্তর দিয়ে থাকি।" পরবর্তী দিবস স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ তাঁহার ঘরে গেলেন। পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য সম্বন্ধে কথা উঠিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। তিনি কোন আপস না করেই সর্বোচ্চ সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদান কিছু চাইতেন না। অপরে এক ফোঁটা দেয় এবং তৎপরিবর্তে এক বাল্‌তি চায়।" স্বামী প্রেমানন্দ মন্তব্য করিলেন, "আমরা দু'জন মহাপুরুষকে দেখেছি—আমাদের ঠাকুর ও স্বামীজী। তাঁদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না।" স্বামী তুরীয়ানন্দ ঐ মত সমর্থনপূর্বক কহিলেন, "যখন আমি সর্ব প্রথম ঠাকুরকে দেখি তখন তিনি শীর্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল ভাস্বর ছিল। তিনি কলকাতায় এলেন একটা ঘোড়ার গাড়ীতে। যখন তিনি গাড়ী থেকে নামলেন তখন তিনি মাতালের মত টলছিলেন। তখন তিনি সমাধিস্থ। আমি ভাবলাম ইনি কি পুনরাবির্ভূত শুকদেব? একবার তিনি সমাধি হতে ব্যুত্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কে? আমি কোথায়?' তারপর তিনি কিছু খেতে চাইলেন। কিন্তু খাবার পূর্বেই পুনরায় সমাধিস্থ হলেন।"

ঠাকুর যে সকল বাংলা গান গাহিতেন তাহাদের কয়েকটী স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ উভয়ে একসঙ্গে গাহিলেন। তন্মধ্যে একটী গান সাধক কমলাকান্তের। গানটী এই—

"মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হ'লো কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো
মিশে গেল।
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে।
সুখদুঃখ সমান হলো আনন্দ-সাগর উথলে॥"

স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের গান করিবার ভাবভঙ্গীগুলি অনুকরণ করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর খুব সুন্দর গান করতে পারতেন। অপরে সুরপূর্ণ অথচ ভাবশূন্য গান করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।"

বৈকালে হরি মহারাজ ভগিনী নিবেদিতার 'গুরুকে যেমনটি দেখিয়াছি' নামক ইংরাজি পুস্তকখানি পড়িতেছিলেন। গুরুদাস মহারাজ তাঁহার ঘরে ঢুকিতেই তিনি বইখানি একপাশে রাখিয়া বলিলেন, "মাকে সর্বভূতে দেখা, সকলকে সমানভাবে

ভালবাসা এবং সকলের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করাই প্রত্যক্ষানুভূতি। জ্যোতির্ময় পুরুষকে সকলের মধ্যে দর্শন করাই দিব্য জীবন।"

পরদিন প্রাতে হরি মহারাজের শরীর ভাল ছিল না। তাঁহার একটু জ্বর এবং দাঁতের ব্যথা হইয়াছিল। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই গুরুদাস মহারাজকে বলিলেন, 'মা দয়া করেই দুঃখ দেন। এতে আমাদের কর্মক্ষয় হয়, কল্যাণ হয়। আমরা এত সুখপ্রিয় যে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। একমাত্র তাঁর উপরেই আমাদের নির্ভর করা উচিত, অন্য কিছুর বা কাহারো উপর নয়।" গুরুদাস মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বাহ্য অভাবের জন্যও কি তাঁর উপর নির্ভর করা উচিত?' তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই। প্রত্যেক বস্তুর জন্য। আমাদের শরীর, মন, প্রাণ মাতৃচরণে উৎসর্গীকৃত। তাহলে আর কার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? তিনি এগুলি রক্ষণ বা গ্রহণ করুন—একই কথা। আমাদের ভাববার কি আছে? যা একবার সমর্পণ করেছি তা আবার ফিরিয়ে নি কিরূপে? যিনি ইহা বুঝতে পারেন তিনিই ধন্য।"

রবীন্দ্রনাথের ভগবান

শ্রীমনোজ রায়

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা একটা বিশিষ্ট নিত্যকর্ম্ম ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন ছোট। সব কিছু ভাল ক'রে বোঝার বয়স তখনও তাঁর হয়নি। তথাপি বাড়ীতে বেদ, উপনিষদ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার মূলে রবীন্দ্রনাথের মনে ভক্তি ভাবের সৃষ্টি হ'ল। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভক্তি কি, ভগবান কি, ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। প্রচলিত সংস্কারমুক্ত স্বকীয় মতবাদের সঙ্গে বৈদিক ও ঔপনিষদিক মতের সংমিশ্রণে সত্য ও ধর্ম্মের উপলব্ধি তাঁর জীবনের একটা ধারা হ'য়ে দাঁড়াল। ভগবান কি, তাঁর উপলব্ধি, ভগবানের সান্নিধ্যলাভের বাসনা, সত্যপথে চলবার আগ্রহ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চল্লো কবিতার প্রকাশে ও ছন্দের তালে।

রবীন্দ্রনাথের ভগবানে আস্থা তাঁকে পুনঃ পুনঃ দুঃস্থ মানবের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত করল। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, ধর্ম্মের পথে চলা কঠিন এবং দুঃখজনক, অথচ তারই প্রতি তাঁর লোভ। তিনি তাঁর কবিতায় দুঃখ বরণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে দুঃখ বহন করবার শক্তি প্রার্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমিকে চিত্তে স্থাপিত করে সমগ্র পৃথিবী ও সমস্ত মানবকে ভালবেসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মবিহার করতে চেয়েছেন। তাঁর জীবনে উপনিষদের শিক্ষার প্রভাব তাঁর কবিতায়—গানে—ছন্দে ফুটে উঠেছে।

সে যুগের দার্শনিক, ভাবুক ও ধর্ম্মগুরুদের অভিমত ছিল—মর্ত্তে কেবল দুঃখ। বৈরাগ্যের দ্বারা সকল বিষয়ে আসক্তিহীন হ'তে পারলে

তবেই না পার্থিব দুঃখের পরিসমাপ্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের ধারণা তা নয়। সংসারই তাঁর মতে ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র। মানুষ সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের ভেতর দিয়ে ক্রমে পবিত্র হ'তে পবিত্রতর হ'য়ে ওঠে। কবির দৃষ্টিপ্রদীপে—এ বিশ্ব, এ সৃষ্টি—এ জগৎ মায়া নয়—কল্পনা নয়—ব্রহ্মের জাগ্রত প্রকাশ। তাঁরই লীলা ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দ্দিকে।

ভালবাসতে না জানলে, প্রেমের দান-প্রতিদান করতে না শিখলে, কি ভাবে ভগবানকে ভালবাসা চলে? কি ক'রে তাঁকে প্রেমদান চলে? যেখানে ভাব নেই—ভালবাসা নেই—প্রেম নেই—হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই—আপনাকে হারিয়ে ফেলা ও বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে আবার ভগবান কোথায়? ভগবানকে পেতে হ'লে চাই দরদ, চাই অনুভূতি—চাই প্রেম—তবেই না ভগবানকে মেলে। হৃদয়ের বিকাশ যিনি আস্বাদ করেছেন, ও রস কি জিনিস তিনিই তা বোঝেন। তাই যাঁরা হৃদয়ের বিকাশ অনুভব করেন তাঁরাই ভগবানের অস্তিত্ব শীঘ্র অনুভব করতে পারেন।

কোন বিষয়ে গবেষণা চালাতে হ'লে যেমন একটা কিছু মাধ্যম দরকার, প্রেমও তেমনি ঈশ্বর-প্রাপ্তির মাধ্যম। এইটে হচ্ছে যাকে বলে 'যাত্রাকেন্দ্র' (starting point)। প্রেম ক্রমে কামহীন হয়ে ভক্তিতে ভরে ওঠে। এইখানেই হ'ল প্রেমের ক্রমবিবর্তনের বৈশিষ্ট্য। প্রেম ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়—ব্যাপ্ত হয় সমগ্র বিশ্বে—অনুভূতি জাগে এমন কিছুর যার অবয়বকে দৃষ্টিপথে আনা যায় না অথচ অবস্থিতি অনুভব করা চলে। প্রেম হ'য়ে ওঠে গভীর—তার বহিঃপ্রকাশ কম—কেবল একটা হৃদয়ের আবেগের। এর পরিণতি ecstasy-তে—সেখানে ঈশ্বর-সত্তা আর মানবসত্তা প্রভেদহীন। এইভাবে প্রেম গভীরতর হ'তে হ'তে সৃষ্টি করে intuition. তখন সমগ্র বিশ্বকে এক বলে মনে হয়—তার ভেতর শুধু একটিমাত্র অনুভূতি জেগে থাকে। এই ভাবের আবেগে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥"

যে বিশ্ব আমাদের চেতনার ভেতর, বাসনার ভেতর, বেদনার ভেতর, কর্ম্মের ভেতর, সর্ব্ব অনুভবের ভেতর স্পন্দিত হয়—সে কি মায়া—সে কি মোহ? এ হচ্ছে বিশ্বাত্মার স্পন্দনের সহিত আমাদের যুক্ত করে দেওয়া। আমরা একমাত্র তাঁরই অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারি। সুতরাং সংসার ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায় নয়। এইজন্য সংসার ও ভগবানে একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে হ'বে—তবেই না তাঁর অনুভূতি জাগবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সংসারে বঞ্চিত করি' তব পূজা নহে।"

সংসারেই সকলের সঙ্গে যুক্ত থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে হবে—

"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।"

তাই ভগবানকে পেতে হ'লে চাই সকলের প্রতি প্রেম—চাই সর্ব্বজীবে ভালবাসা—অনুরাগ। "যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।"

এইরূপ সাধনায়ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব। ইংরেজ কবি বলেছেন—

"He prayeth best who loveth best".

কবি স্কটের মতে—

"For love is Heaven, and Heaven
is love".

সুতরাং বিশ্বপ্রেমই ভগবান লাভের উপায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনার সময় রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে চুপ করে বসে থাকতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—তাঁর মুদ্রিত নেত্রকোণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। তিনি অনুভব করেছিলেন ঈশ্বরের প্রতি

পিতার গভীর ভালবাসা, গভীর অনুরাগ—প্রেম ও ভক্তি। পিতা যেন দীর্ঘ বিরহের পর কাছে পাবার আনন্দে অশ্রু ত্যাগ করছেন—তাইত তাঁর মনে হ'য়েছিল—

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।"

ভগবান রবীন্দ্রনাথের প্রেমাস্পদ। তিনি তাই গাহিয়াছেন—

"যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো মোর পানে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।"

* * *

"তখনো হে নাথ প্রণমি তোমায়
গাহি ব'সে তব গান।"

* * *

"অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার,
শূন্য মনের বৃথা উপহার—
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান,
সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ।"

মাঝে মাঝে জীবনে আসে প্রেমের জোয়ার, তখন তাঁরই কথা মনে হয়—

"নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।"

* * *

"সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবননাথ।"

তিনিই বাহির হতে অন্তরে অনুভূতি জাগাচ্ছেন—

"বাহির হইতে পরশ করেছ
অন্তর মাঝখানে।"

ভগবান সাধারণ চক্ষে দৃশ্য নন। অথচ তাঁর অনুভূতি সর্বদা জাগে। সমগ্র বিশ্বময় তাঁর বাণী ছড়িয়ে আছে—তাঁর কোন সীমা নেই—কোন শেষ নেই। ঈশ্বরপ্রেম অফুরন্ত—সে জোয়ারের আর ভাটা নেই—আছে শুধু টান—তাঁকে ভালবেসে, তাঁর কথা চিন্তা করে একটা আনন্দ আছে—

"অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।"

* * *

"যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা-পানে রবে টানিতে।"

* * *

"তোমার পরশ সখার মতন স্নেহে
বক্ষে আসিবে ছুটিয়া।"

এমনি ভাবে ঈশ্বরকে গভীর অনুরাগ দিয়ে ভালবাসাই তাঁকে লাভ করবার উপায়। তাঁর প্রতি ভালবাসা গভীর হলে প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তাঁর প্রকাশ আমাদের চোখে ধরা পড়ে—

"যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা,
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা।"

ঈশ্বর পুজা চান না, কেবল প্রেমই চান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তুমি চাও নাই পূজা, সে চাহে পূজিতে;
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
অন্তরের অন্তরালে।"

এমনি ভাবে হৃদয়ের টানে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে করেছেন তাঁর অন্তর্যামী—

"অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্ব্বাণ
আমি দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়।"

রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে এত প্রিয় করে নিয়েছিলেন যে তিনি বলেছেন—

"তোমারে বলেছে যারা, পুত্র হ'তে প্রিয়,
বিত্ত হ'তে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়

সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর—তাঁদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।"

আবার বলেছেন—

"তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ
আমারে, প্রিয়তম।"

তাই আকাঙ্ক্ষা করেছেন ভগবানের সাথে মিলনের—

"হোক আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন।"

রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে নানা ভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর কাছে ভগবান সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ। বিপুল তাঁহার ঐশ্বর্য্য—অসীম তাঁহার শক্তি। ভগবানকে তিনি সখাভাবে, প্রিয়তমভাবে —মাধুর্য্যের বিচিত্র রসসম্ভোগের ভেতর দিয়ে তিনি দেখেছেন। এই শেষোক্ত ভাবে কি বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব?

পরমাণু-রহস্য সম্পর্কীয় গবেষণা

শ্রী—

পরমাণুর বিভিন্ন অংশ যথা ইলেক্ট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ প্রচুর গবেষণা করেছেন। চূর্ণীকৃত পরমাণু থেকে যে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধেও গবেষণা কম হয়নি। কিন্তু তার তুলনায় অবিভক্ত পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

কেন এবং কি উপায়ে পরমাণুগুলি বিভিন্ন ধরনে বিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে; পদার্থের ধর্মের সহিত পরমাণুবিন্যাসের কি সম্পর্ক—এই সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান আজও হয়নি।

বৃটিশ বৈজ্ঞানিক পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বৃটেনের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও যে পরমাণুর গঠনরহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে তৎ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেছে।

স্যার লরেন্স্ ব্র্যাগ্ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। স্যার লরেন্স্ একজন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক এবং পরমাণুবিন্যাস-রহস্যের নির্দ্ধারণে রঞ্জনরশ্মির ব্যবহার তিনিই প্রথম করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ১৯১২ সালে গ্রীষ্মাবকাশ কালে তিনি ও তাঁর পিতা শোনেন যে বৈজ্ঞানিক ল আবিষ্কার করেছেন যে কুয়াশার মধ্যে সূর্য্যালোক যেরূপ বিকীর্ণ হয়, রঞ্জনরশ্মিও কেলাসের (crystal) দ্বারা সেইরূপভাবে বিক্ষিপ্ত হয়। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব তাঁরা উভয়েই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলেন বটে, কিন্তু পরমাণুরহস্য-নির্দ্ধারণে এই জ্ঞান-প্রয়োগের কথা তখন তাঁদের মনে উদয় হয়নি।

এই ঘটনার বহুদিন পরে, পরমাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা কালে লরেন্স্ ব্র্যাগ্ একদিন হঠাৎ উপলব্ধি করলেন যে বিক্ষিপ্ত রঞ্জনরশ্মির পরিমাণ পরিমাপ করে পদার্থের মধ্যে কেলাস-রূপে পরমাণুর বিন্যাসপ্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব। সেই সময় থেকেই তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন এবং ফলে অনুসন্ধানী রঞ্জন-

রশ্মির সাহায্যে বহু পদার্থের মধ্যে পরমাণুবিন্যাসের ধরন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়েছে।

ব্র্যাগের পদ্ধতি মোটামুটি ভাবে সরল হলেও কার্যকালে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয় এবং সেই অসুবিধাগুলি নিরসনের উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কেলাসপুঞ্জের মধ্য দিয়ে রঞ্জনরশ্মির যাত্রাপথ ফটো-ফিল্মের ওপর চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য নয়। সেই চিহ্ন হল ফিল্মের ওপর ছড়ানো শত শত কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু। তার অর্থ নিরূপণ করতে হলে গণিত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন।

গুরুতরশ্রমের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে গবেষণাকারীর এক প্রকার স্বজ্ঞা (intuition) থাকার প্রয়োজন যার সাহায্যে সে জটিল গণিতজালের মধ্যে পথভ্রষ্ট না হয়ে অতি সহজেই সত্যে উপনীত হতে পারে।

বৃটেনের রয়াল সোসাইটির অন্যতম সভ্যা এবং বিশিষ্ট নারী-বৈজ্ঞানিক মিসেস ডরোথি হজকিন্ এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই গাণিতিক অসুবিধাগুলির উল্লেখ করেন। অক্সফোর্ডে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা সম্প্রতি পেনিসিলিনের মধ্যে পরমাণুর বিন্যাস-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন যে এই গবেষণাকার্যের শেষের দিকে তাঁদের কুড়ি লক্ষেরও অধিক পৃথক গণনা করতে হয়েছে এবং এই গণনা-কার্যের জন্য একদল গণনাকারীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল।

এই অধিবেশনে অপর একজন নারী-বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম মিসেস ক্যাথলীন লন্সডেল্। ইনি একজন বিখ্যাত কেলাসবিদ্যা-বিশারদ (Crystallographer)। মূল্যবান গবেষণা-কার্যের জন্য ইনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে কি ভাবে কেলাস-মধ্যস্থিত পরমাণুগুলির কম্পন ও গতি নির্ণয় করা যায় তিনি সেই বিষয় বর্ণনা করেন।

পরমাণুর 'কম্পন' এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। পরমাণুগুলি এক ইঞ্চির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগও স্থানচ্যুত না হয়ে একদিনের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মাইল 'ভ্রমণ' করতে পারে। পরমাণু সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ এই জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়। আঘাত, কোমলায়ন (annealing) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার ফলে ধাতুর যে ধর্মান্তর ঘটে তা ভালভাবে বুঝতে হলে পরমাণুর ধর্ম সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

স্যার লরেন্স্ ব্র্যাগ্ বলেন যে সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যই রঞ্জনরশ্মি ও কেলাসবিদ্যা সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন। বেঁচে থাকতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে নূতন নূতন এবং উন্নততর যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে হবে এবং তার জন্য ধাতুর উন্নতি বিধান অত্যাবশক। মৌলিক ধাতু সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভ করতে হলে এবং বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য নূতন নূতন সংকর ধাতু (alloys) প্রস্তুত করতে হলে রঞ্জনরশ্মি গবেষণা অবশ্য কর্তব্য।

অনুসন্ধানী রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ম্যানচেষ্টার, লীড্‌স্, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, লণ্ডন, গ্লাস্‌গো এবং অন্যান্য স্থানের গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে নিত্য নূতন আবিষ্কার হচ্ছে। প্রোটিন, ভাইটামিন, বিভিন্ন ঔষধ, শর্করা, ধাতু, শিলাখণ্ড প্রভৃতি নানারূপ পদার্থ ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে আপন আপন গঠন বৈচিত্র্য ও রহস্যের প্রকাশ করছে।

পরমাণু সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান মানবসভ্যতার জন্য অত্যাবশ্যক। ১৯১২ সালের গ্রীষ্মাবকাশে ব্র্যাগ্-পিতাপুত্র কর্তৃক প্রদর্শিত পথে সেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বৃটেনের তরুণ বৈজ্ঞানিকরা অক্লান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। *

* নিউ দিল্লী বৃটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্ এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

সমালোচনা

Malaria Reader—By Rao Bahadur M. V. Apparow, M. B. E. Published by The Indian Red Cross Society, Ganjam Branch, Berhampur, Ganjam. Pages 94. Price not mentioned.

আমাদের দেশে প্রতিবৎসরই ম্যালেরিয়া রোগে বহু লোকের মৃত্যু হয়। ইহার প্রতি-কারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ সোদ্যমে কাজ করিতেছেন। এই রোগ-সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যসম্বলিত একখানা পুস্তক শিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। আলোচ্য পুস্তক দ্বারা সেই প্রয়োজন মিটিবে সন্দেহ নাই। যদিও মুখ্যতঃ উড়িষ্যাবাসীদের জন্য বইখানি লিখিত, তবুও ইহা অন্যান্য প্রদেশেও আদর লাভ করিবে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অল্পাধিক ভারতবর্ষের সর্বত্রই। বহু চিত্রদ্বারা লেখক তাঁহার আলোচনা সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। পুস্তকখানির বহুলপ্রচারে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

শ্রীশ্রীগীতানয়ী নাটিকা—শ্রীসোমেশচন্দ্র শর্মারায়। আসামবেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। ৬০ পৃষ্ঠা; মূল্য—সাধারণ পক্ষে একটাকা দুই আনা এবং নীতিশিক্ষাদাতা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ছাত্রগণপক্ষে দশ আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি একটি চতুরঙ্ক নাটিকা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায় অবলম্বনে ইহা লিখিত। নীতিশিক্ষাদানই লেখকের উদ্দেশ্য স্থগভীর নীতিবোধ তাঁহার রচনাকে অত্যন্ত প্রেরণা-দায়ক করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীগীতামঙ্গল মহানাটক—শ্রীসোমেশচন্দ্র শর্মারায়। আসামবেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। ১৬৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ২।৷০ টাকা।

ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে গ্রন্থকার কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার 'শ্রীশ্রীগীতানয়ী নাটিকা'র মত আলোচ্য পুস্তকখানিও একটি নাটক—'মহানাটক'। ইহার বিষয়বস্তুও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। নাটকখানি বঙ্গভাষায় লিখিত হইলেও ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত-নাটকের শৈলী স্থানে স্থানে অনুসৃত হইয়াছে। এইরূপ ধর্মভাবোদ্দীপক সুরুচিপূর্ণ রচনার জনপ্রিয়তা দেশবাসীর কল্যাণবোধ জাগ্রত করিবে।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ (২য় সংস্করণ)—শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, গুরুদাস লাইব্রেরী ও লেখকের বাসস্থান ৬৯, কাঁসারিপাড়া রোড, পোঃ ভবানীপুর, কলিকাতা। ২৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।৷০ টাকা।

শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র ওরফে মুনি প্রায় ১৬ বৎসর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে নূতন প্রসঙ্গ কিছু সংযোজিত হইয়াছে। লেখক শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্ত অনেকের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজনীয় রামলাল দাদার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গ করিতেন এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রদত্ত উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই উপদেশগুলি অবলম্বনেই এই পুস্তক লিখিত। উপদেশসমূহ সুসম্বদ্ধ হইয়া যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হইলে এবং ছাপিবার ভুল কম থাকিলে বইখানি সুন্দর হইত।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-পূজা—আগামী ৭ই পৌষ, বুধবার, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর যণ্ণবতিতম এবং ৮ই মাঘ, শুক্রবার, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের সপ্তাশীতিতম জন্মতিথি-পূজা বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

স্বামী জয়ানন্দজীর দেহত্যাগ—গত ৩০শে কার্তিক প্রাতে ৭-৪০ মিনিটের সময় স্বামী জয়ানন্দজী ধানবাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। পরে টাইফয়েড ও নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। স্বামী জয়ানন্দজী 'বাবাজী মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯২০ সনে বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করিয়া ১৯২৬ সনে বেলুড় মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাবাজী মহারাজ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। তিনি কিছুদিন মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষরূপে কার্য করেন। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া অনেকে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। স্বামী জয়ানন্দজীর পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কো—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী ও তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী গত অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন: (১) "মানবীয় স্পন্দনের রহস্য," (২) "আধ্যাত্মিক বিকাশের স্তরসমূহ," (৩) "ভারতে জগজ্জননীর উপাসনা," (৪) "বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ধর্ম," (৫) "তুমি কি ভগবদ্দর্শন চাও?" (৬) "গীতার আচার্য শ্রীকৃষ্ণ," (৭) "অদৃশ্য জগৎসমূহ ও আমাদের উপর ইহাদের প্রভাব," (৮) "অসীমকে উপলব্ধি করিবার উপায়," (৯) "কোথা হইতে, কোথায় এবং কেন?" এতদ্‌ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ধ্যানযোগ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাগণকে সার্বভৌম বেদান্তের সাধারণ তত্ত্বগুলি এবং জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাচার্যগণের উপদেশ শিক্ষা দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-ভবন, কলিকাতা—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৭ সনের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ কলেজের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিনাব্যয়ে আহার, বাসস্থান ইত্যাদি দিয়া কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়। কয়েক জন ছাত্রের নিজ ব্যয়ে থাকিবারও ব্যবস্থা আছে। কলেজের শিক্ষালাভের অপূর্ণত্ব দূর করাই ইহার বিশেষত্ব। ১৯৪৭ সনের আই-এ পরীক্ষায় বিদ্যার্থি-ভবনের একজন বিদ্যার্থী শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তিনজন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী বৃত্তিলাভ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের দমদমস্থ নিজস্ব স্থায়ী বাসস্থান গভর্নমেণ্ট ১৯৪৭ সনের মার্চ মাসে অধিকার করেন। বর্তমানে ইহা কলিকাতা, ২০, হরিনাথ দে রোডে অবস্থিত একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ও সোদপুরে একটি বাগানে পরিচালিত হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় গণপরিষদে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বিল গৃহীত—২৯শে নবেম্বর ভারতীয় গণপরিষদ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে গ্রহণ করেন। গৃহীত ধারাটি এই:—'অস্পৃশ্যতা দূর করা হইল এবং অস্পৃশ্যতা সমর্থনসূচক সর্ব আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইল। অস্পৃশ্যতা হইতে উদ্ভূত যে কোন বাধানিষেধ আরোপ করা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।'

ধর্ম, বর্ণ, জাতি অথবা নারীপুরুষ ভেদে যে-কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করিয়া অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা গৃহীত হইয়াছে।

পরিষদের তপশীলী সদস্যগণ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের এই প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ২৯শে নবেম্বরকে ভারতের পাঁচ কোটি তপশীলীর মুক্তি-দিবস বলিয়া বর্ণনা করেন।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা—গত ১১ই অগ্রহায়ণ র‍্যাভেনশ কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন, "গত দেড় বৎসরকাল আমাদের নেতৃবর্গকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি স্থাপনে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহকে আমাদের রাজনীতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে নিদারুণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বিরাট সামাজিক ও বৈষয়িক সমস্যা সমাধানকল্পে তাঁহারা উৎসাহী ও চরিত্রবান যুবক-যুবতীর সাহায্য চান। সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, শাসনকার্যে যোগ্যতার অপহ্নব এবং মামুলী শাসনপরিচালনা-ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যদের হস্তক্ষেপের জন্য তাঁহারা তীব্র ভাষায় অভিযোগ করিতেছেন। সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থসিদ্ধি করায় নেতৃবর্গ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। স্বাধীনতালাভে আমরা ক্ষমতামত্ত হইয়া মানসিক ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মনে হয়। সাফল্যের মধ্যে আমাদের দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে। অধুনা দেশবাসী পরীক্ষার সম্মুখীন; স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে যে মহৎ গুণাবলীর জন্য আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহার বিকাশসাধন প্রয়োজন।

"চীন, ব্রহ্ম ও মালয়ে যেসব ঘটনা ঘটিতেছে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। মার্ক্সবাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর জন্যই সাধারণ লোক সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, আমাদের সামাজিক সংস্থার মূলগত ত্রুটির জন্যই ঐ আকর্ষণ। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার ফলেই অন্ধ গোঁড়ামির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের বিচ্যুতির মধ্যেই বিপদ নিহিত। সমাজ যদি দুর্বল হয়, যুবসমাজের যদি আশাভঙ্গ ঘটে, সামাজিক সংস্থায় যদি অবিচার ও অন্যায়ের প্রাবল্য হয়, সমাজের উচ্চস্তরে আছে বলিয়াই যদি দুর্নীতির সহিত আপসরফা করিতে হয় এবং গণতন্ত্র রক্ষায় যদি আমরা অপারগ হই, তাহা হইলে জনসাধারণ হতাশায় নূতন পথের সন্ধান করিলে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না।

"নিত্যব্যবহার্য অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাব, খাদ্যবস্তুর দুর্মূল্যতা, মুনাফাবাজি ও মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে সরকারের অক্ষমতার দরুনই অসন্তোষ জন্মে এবং শাসনকর্তৃত্বের বন্ধন শিথিল হয়। বিশৃঙ্খলার দিকেই যদি জনসাধারণের ঝোঁক বৃদ্ধি পায়,

তাহা হইলে তাহা স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার হইবে না, নিজেদের দুর্বলতা ও কর্মকুণ্ঠতার জন্যই তাহা হইবে। ভারতবাসীর পথ দুর্গম। কাজেই মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করিবার অথবা উৎকট প্রতিশ্রুতি দিবার কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ অবস্থায় মানিয়া লইতে হইবে যে, ইহা আত্মতুষ্ট জাড্য অথবা দুর্বলতা বোধ করিবার সময় নহে। ভারতবাসীকে সবল ও সাহসী হইতে হইবে। জনসাধারণের ক্লান্তি ও চূড়ান্ত ধরনের হতাশা দূর করা এবং চোরাবাজার ও মুনাফাবাজি দমন করিয়া সমাজের নৈতিক স্বার্থ রক্ষা করিতে পারাই সাম্যবাদকে আক্রমণ করার একমাত্র উপায়। ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া নহে, পরিকল্পনা রচনা করিয়া নহে—ইহা কার্যে পরিণত করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিলেই ভারতবাসীকে বিচার করা যাইবে।

"ভৌগোলিক সীমানা ও ইতিহাস, জন্মভূমি ও উহার ঐতিহ্যের বলেই স্বদেশানুরক্তি নিরূপিত হইয়া থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জন্মভূমির একটা বৈশিষ্ট্য আছে, উহার জন্য আমরা গর্বানুভব করিয়া থাকি। আমাদের এই দেশের পরিচিত দ্রব্যাদি, উহার পাহাড়, পর্বত ও নদী, উহার প্রান্তর ও উপত্যকা, গ্রাম ও নগরকে আমরা ভালবাসি। উহাদের মধ্যে আমাদের শৈশবের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে; উহাদের সহিত যেরূপ নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করিতাম, অন্য কোথাও সেরূপ করি না। আবার মাতৃভূমির প্রতি শুধু অনুরক্তিই স্বদেশভক্তি নহে। ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের প্রতি আনুগত্যই স্বদেশানুরক্তি। এই দেশে শত সহস্র বৎসর অবিরাম সঙ্ঘর্ষের ফলে একটি সার্বজনীন সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, একটি সমষ্টিগত চৈতন্যের সৃষ্টি হইয়াছে; উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ঐতিহ্য ও মনোভাব, চিন্তা-ধারা ও আচরণ স্থানলাভ করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ ভাষা ও আচার-ব্যবহার প্রচলিত; ইহা সত্ত্বেও সকলেই একটি সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত, একই সংস্কৃতি ও জাতীয়তার উত্তরাধিকারী। এই সংস্কৃতি একটা বিশাল ঐতিহ্য ও উদার চিন্তাধারার বাহক। উহার মধ্যে সার্বজনীন মনোভাবের স্পর্শ রহিয়াছে। যে শাসনতন্ত্র রচনায় আমরা রত, তাহা এই মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"অধুনা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; উহা জগতের প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের সমগোত্রীয়। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা নগরে বসবাস করিত; তাহা ছাড়া তাহারা সুদক্ষ নগরপরিকল্পনাকারী ছিল, প্রস্তর ও ইষ্টকাদি দ্বারা ইমারত নির্ম্মাণ করিত এবং সর্ববিধ স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিত বলিয়া জানা গিয়াছে। তূলা ও রেশম দিয়া কি করিয়া সূতা কাটিতে ও বয়ন করিতে হয়, তাহা তাহারা জানিত। তাহারা গম উৎপাদন করিত, চীনামাটির বাসন প্রস্তুত করিত এবং ভারবহনের জন্য পশু নিয়োগ করিত। পোড়ামাটির দ্বারা নির্ম্মিত একটি মূর্তি গভীর ধ্যানমগ্ন শিব বলিয়া অনুমিত হয়। সেই সুপ্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমানকালেও আমরা ধ্যানী ও করুণার মূর্তিকে ঐতিহ্যরূপে লাভ করিয়াছি।

"সভ্যতার ধারা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত, উহা স্থিতিশীল নহে। অতীত কৃতিত্বই উহার মূলকথা নহে, বর্তমানের বাস্তব রূপায়ণই উহার সার বস্তু। সমসাময়িক মহত্ত্ববর্জিত সভ্যতা অতীতের স্মৃতি মাত্র; উহা পরিত্যক্ত মন্দিরের তুল্য। যে সভ্যতা হইতে বিরাট আদর্শবাদী পুরুষের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে, তাহাই জীবন্ত বলিয়া অভিহিত। প্রদীপ যে জ্বলিতেছে, তাহা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হইতেই বুঝা যায়। ভারতের আত্মাও ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দেদীপ্যমান ছিল। মহাত্মা

গান্ধী আমাদের সভ্যতা হইতে উদ্ভূত মহান আদর্শ-সমূহের প্রতিমূর্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন আসলে সত্যের পূজারী। রক্ত-মাংসের শরীরে যে অসঙ্গতি আছে, প্রকৃতির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান, তিনি তাহা জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এইভাবে তিনি নিজেকে ভগবানের কাজে বিলাইয়া দিবার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সর্বধর্মের মূল-লক্ষ্যই এক।

"ধর্মনিরপেক্ষ অ-সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের অর্থ কেবলমাত্র ঐহিক উদ্দেশ্য অথবা বৈষয়িক আনন্দ ও নিরাপত্তা বিধানই নয়। ইহার অর্থ—যত দিন পর্যন্ত যে সকল ধর্মবিশ্বাস অথবা ধর্মাচরণ নীতিবোধের পরিপন্থী না হইবে, ততদিন পর্যন্ত সেই সকল ধর্মাচরণ, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার রাষ্ট্রে থাকিবে। যেমন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান ব্যবহার করা হইবে, তেমনি প্রত্যেককে পরধর্মসহিষ্ণুতা দেখাইতে হইবে। পরধর্মসহিষ্ণুতার অভাব বিচক্ষণতার অভাবেরই পরিচায়ক। ভারতীয় রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এক ধর্মের উপর নির্ভর নহে। এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, আস্তিক ও নাস্তিক—সকলেরই সমান অধিকার। ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতির উপরই ভারতের জাতীয়তা নির্ভর করিতেছে—ধর্ম ও ভাষার উপর নহে।

"আমরা আজ যে শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছি তাহাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র কিরূপে কার্যকরী করা হইবে তাহারই উপর সবকিছু নির্ভর করিতেছে। আমরা সেবা, ত্যাগ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া মর্যাদালাভ করিলেও আমরা লোভ, স্বার্থপরতা ও হিংসার দ্বারা সমাচ্ছন্ন,—ইহা সত্যই দুঃখের বিষয়। আমাদের সমাজকে এই সকল কলুষ হইতে মুক্ত করিতে হইবে—যেন কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা না দেয়। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি লোক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সমস্ত অসন্তোষ দূরীভূত হইবে—মুক্তির পশ্চাতে এই আশা ছিল; কিন্তু সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উদ্দেশ্য। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের স্খলন পতন ত্রুটি ও শক্তির সমালোচনা করিয়া আমাদের চিন্তাধারাকে বলিষ্ঠ রূপ দিবে, আমাদের কলুষপ্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে এবং আমাদের জীবনকে সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর করিয়া তুলিবে। আধ্যাত্মিক সৃজনী ক্ষমতার দ্বারা—সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও শিল্পের সমবায়-প্রয়াসের দ্বারা আমরা এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারিব। বৈজ্ঞানিক শক্তির সার্থক ব্যবহার, গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের উচ্চাদর্শ ও অবাঙ্-মনসোগোচর সর্বশক্তিমানের প্রতি অগাধ বিশ্বাস—বর্তমান সমাজকে এই সকল আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার কর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়কেই পালন করিতে হইবে।"

মহাভারতের নূতন সংস্করণ—মহাভারতের সমালোচনামূলক সংস্করণ রচনার জন্য মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুণার ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনজন মনীষী নেপাল হইতে সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই কার্য আরম্ভ করেন। এই মহাকাব্যের সুদীর্ঘ 'শান্তিপর্ব' অংশটি এখন মুদ্রিত করা হইতেছে। নেপালের রাজদরবার লাইব্রেরীতে শান্তিপর্বের সর্বাপেক্ষা পুরাতন পাণ্ডুলিপি (১৫১৬ সালের) আছে। যে মনীষী ব্যক্তিগণ নেপালে গিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ডাঃ এস কে বেলভলকর (ইহার সম্পাদক), পুণার অধ্যাপক পি ভি ভট ও আমেদাবাদের অধ্যাপক কে ভি অভয়ঙ্কর। তথায় অবস্থানের সময়ে তাঁহারা উক্ত পাণ্ডুলিপির আলোক-চিত্র গ্রহণ করেন। পাণ্ডুলিপিখানি মৈথিলী অক্ষরে

তালপত্রে লিখিত। আলোকচিত্রের পাতাগুলির সংখ্যা প্রায় ৯ শত।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজের ব্যয় বাবদ এক হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

শান্তি পর্ব সম্পর্কে নেপালের এই পাণ্ডুলিপিখানি ছাড়া আরও দুইখানি পাণ্ডুলিপি এই প্রতিষ্ঠানের হাতে আছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডাঃ আর এস ভাণ্ডারকর প্যারিসের 'বিবলিওথিক ন্যাশন্যাল' হইতে এই পুরাতন পাণ্ডুলিপি দুইখানির আলোক-চিত্রলিপি লইয়া আসেন। প্রথমখানি কাশ্মীরী অক্ষরে ও অপর খানি বাঙ্গালা অক্ষরে তালপত্রে লিখিত।

মহাভারতের সমালোচনামূলক সংস্করণ রচনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা জগতের প্রাচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ভারত সরকার শান্তিপর্বের প্রথম খণ্ডের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং অপর দুই খণ্ডের জন্যও একই পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরীর প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বোম্বাই সরকারও এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়াছেন।

ভারতীয় বিমান-বহর—৯ই অগ্রহায়ণ নয়াদিল্লীস্থ ভারতীয় বিমান-বহর ময়দানে জেট্ চালিত "ভ্যাম্পায়ার" ও "লিবারেটর" বিমানের প্রদর্শনী হয়। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বলদেব সিং, অন্যান্য মন্ত্রিগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাইলটগণ এই অতি-গতিসম্পন্ন বিমানগুলিকে বিলাত হইতে চালাইয়া এখানে আনিয়াছেন।

'ভ্যাম্পায়ার' বিমান ঘণ্টায় ৫ শতাধিক মাইল যাইতে পারে। ইহার ইঞ্জিনের ওজন ৩ হাজার পাউণ্ড এবং ৪ হাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন। এই বিমান এক নাগাড়ে ১৪ শত মাইল যাইতে পারে এবং ৫৯,৪৯২ ফিট উপরে উঠিতে পারে (বিশ্বের রেকর্ড)।

'লিবারেটর' বোমারবী বিমান—এই বিমান ভারী বোঝাও বহন করিতে পারে। অনুসন্ধান-কার্যও চালাইতে পারে। ইহার ইঞ্জিন ৪৮০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট। এই বিমান ১৩ হাজার পাউণ্ড বহন করিতে পারে এবং এক নাগাড়ে ২ হাজার মাইল উড়িতে পারে।

এয়ার মার্শাল সার টি ডব্লিউ এমহার্ষ্ট এবং এয়ার ভাইস মার্শাল সুব্রত মুখার্জী প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিদের সমস্ত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন।

স্বাধীন ভারতের নৌ-বহর—গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ভারতীয় নৌবহরের দ্রুতগামী রণতরী "দিল্লী", নাতিবৃহৎ রণতরী "সাট্‌লেজ" ও "কৃষ্ণা" এবং বৃটিশ রণতরী "নরফোকের" নাবিক ও অফিসারগণকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন:— "আমরা আশা করি যে, নৌবহরের একাংশের কলিকাতায় আগমন আমাদের তরুণদিগকে তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রবক্ষে নাবিকবৃত্তি গ্রহণে প্রোৎসাহিত করিবে। আধুনিক তরীসমূহ সৃষ্টি হওয়ার বহুকাল পূর্বেই বাঙ্গালী নাবিকেরা পৃথিবীর চতুর্দিকে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত। বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের সমুদ্রতটে নির্মিত তরীসমূহ লণ্ডনের বন্দরে পণ্য বহন করিত। সাম্প্রতিক যুদ্ধে নদীমাতৃক বাঙ্গলার নাবিকেরা ইতোমধ্যেই নৌবিভাগায় উজ্জ্বল ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা যেন পুনর্বার দেখাইতে পারি যে, আমরাও সমুদ্র পরিক্রমণে অভ্যস্ত জাতি এবং সমুদ্রের আহ্বান আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি।"

রিয়ার এডমিরাল জে টি এস হল্ বলেন, "জলপথে দেশ আক্রমণে বাধা দেওয়া এবং বাণিজ্যতরীগুলিকে রক্ষা করা যুদ্ধকালে নৌবহরের প্রধান কাজ। সাফল্যের সহিত আক্রমণ প্রতিহত

করিতে হইলে এই দুইটির গুরুত্ব সমধিক। ভারতের উপকূলের দৈর্ঘ্য অনেক; ভারত মহাসাগরও বহুদূরবিস্তৃত। এই অবস্থায় ভারতের নিরাপত্তার জন্য এবং সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন সমধিক। শান্তির সময়ে ঐরূপ নৌবহর গঠন না করিলে যুদ্ধের সময়ে তাহা গঠন করা কখনই সম্ভবপর নয়। 'দিল্লী' আমাদের হস্তগত হওয়ায় আমাদের কাজ ভালভাবেই সুরু হইয়াছে। আমাদের উৎসাহে এবং দেশের লোকের সদিচ্ছায় আমরা শীঘ্রই আশানুরূপ কার্য করিতে সক্ষম হইব।"

ভারতের শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজনীয়তা—গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নয়া-দিল্লীর আরুইন য়্যাম্ফিথিয়েটারে একটি সুইশ টিপিয়া বেতারব্যবস্থায় ভিজাগাপত্তমে সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানীর নির্মিত 'জলপ্রভা' (৮ হাজার টন) নামক জাহাজখানা জলে ভাসাইয়া দেন। ভারতবর্ষে এই প্রথম 'বেতারের' সাহায্যে ভাসান উৎসব সম্পন্ন হয়। "জলপ্রভাকে" সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবার কালে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল বলেন, "জাতীয় পুনর্গঠনের কার্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্বের জাহাজনির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমাদের সকলকে বিশেষতঃ সিন্ধিয়া প্রতিষ্ঠানকে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছে।

"গত মার্চ মাসে ভিজাগাপত্তম হইতে প্রথম জাহাজ ভাসানো হয়। সকল বাধার বিরুদ্ধে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা যে জয়ী হইয়াছে, সেদিনকার উৎসবেই তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। উহার অল্পদিন পরেই আজ দ্বিতীয় জাহাজখানা ভাসানো হইতেছে। এই সাফল্যের জন্য শ্রীবালচাঁদ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই গর্ববোধ করিতে পারেন। কিছুকাল পূর্বেও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শাসন-ব্যবস্থার সহায়তায় বৈদেশিক কায়েমী স্বার্থ আমাদের জাহাজ নির্মাণ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ভারত-শাসন আইনে এখন আর তাহাদের জন্য এ সকল অসংগত রক্ষা-কবচ নাই। ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ ঘাঁটিতে সকল আকারের ও সকল ধরনের জাহাজ নির্মিত হইবে, দশ বৎসর পূর্বেও একথা বলা হইলে দুঃসাহসের কাজ করা হইত।

"ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্প এখনও শৈশব অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে, উহার নিজস্ব জাহাজ থাকা প্রয়োজন এবং দীর্ঘ উপকূল রক্ষার জন্য শক্তিশালী নৌবহরও থাকা আবশ্যক। বাহির হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির জন্য মাশুল বাবদ আমাদিগকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। এভাবে আমাদের কষ্টার্জিত মুদ্রা ব্যয় হইয়া যাইতেছে। বিদেশী বাণিজ্যজাহাজের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ মাল আমদানী-রপ্তানির কার্যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। জরুরী অবস্থায় আমাদিগকে অপরের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ পেট্রলের কথাই বলা যায়। তৈল কোম্পানীগুলি প্রয়োজনীয় তৈলবাহী জাহাজ নিয়োগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আমাদের জন্য তৈল সরবরাহ হ্রাস করা হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আজ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং উহা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখা হইতেছে। বিদেশী শাসনের যুগে বিদেশীদের সহানুভূতির অভাবে আমাদের জাহাজ-শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। ফলে আজ অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা আমরা করিতেছি, উহা বিশেষভাবেই ব্যাহত হইতেছে। যেমন অসামরিক বিমান শক্তির উপরই সামরিক বিমানশক্তি

নির্ভর করিতেছে, তেমনই বাণিজ্য জাহাজবহরই হইল সামরিক নৌ-শক্তির মেরুদণ্ডস্বরূপ। বাণিজ্য না থাকিলে নৌ-শক্তি গড়িয়া তোলাও অসম্ভব হইয়া উঠে।” উপসংহারে সর্দার প্যাটেল বলেন, “গবর্নমেণ্ট জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গবর্নমেণ্ট নিজেই নূতন কাজে হাত দিবেন। বর্তমানে যে সকল প্রতিষ্ঠান জাহাজ নির্মাণের কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কার্যে সাহায্য করা হইবে।”

পরলোকে শ্রীযুক্ত হরিবোলানাথ রায় চৌধুরী—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, বালিয়াটীর (ঢাকা) জমিদার শ্রীযুক্ত হরিবোলানাথ রায় চৌধুরী হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১৬ই অগ্রহায়ণ দিবা দ্বিপ্রহরে বালিগঞ্জস্থ তদীয় বাসভবনে ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা এবং ইহার জনহিতকর কার্য-পরিচালনে হরিবোলা বাবু যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ‘রামকৃষ্ণ মিশন’, ‘বেকার বান্ধব সমিতি’ প্রভৃতি জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল। তিনি স্বদেশপ্রেমিক, পরার্থপর এবং অমায়িক ছিলেন। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

ভ্রম-সংশোধন—‘উদ্বোধনে’র গত অগ্রহায়ণ-সংখ্যার ৫৬৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ‘ভঙ্গে’ স্থলে ‘তল্লে,’ ‘মধ্যে’ স্থলে ‘সব্যে,’ ৫৬৯ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ‘দুঃখতরে’ স্থলে ‘সুখতরে’ এবং ৬১৫ পৃষ্ঠায় ‘মাধমে’ স্থলে ‘মাধ্যমে’ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পুরী

আবেদন

এই প্রতিষ্ঠানটী বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্ররূপে ১৯৩২ সনে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অনতিদূরে শহরের এক প্রান্তে একেবারে সমুদ্রের ধারে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কর্ম্মক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম গ্রহণ অথবা নির্জ্জনে সাধন ভজন ও শাস্ত্রপাঠাদি করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দানই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও পূজা পাঠ ও ধর্ম্মালোচনাদির দ্বারা ইহা আগন্তুক নরনারী-গণের সেবা করিয়া থাকে।

এই পুণ্যতীর্থদর্শনার্থী ভক্তদের স্বেচ্ছাকৃত দানে এই মঠের কার্য্য এ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার দিনে এই ভাবে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতেছে না। এজন্য আমরা ধর্ম্মপ্রাণ বদান্য ব্যক্তিগণকে এই প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য্য-পরিচালনে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :

স্বামী উত্তমানন্দ
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
চক্রতীর্থ, পুরী (উড়িষ্যা)